অনুষ্টুপ

শঙ্খ ঘোষ

বিশেষ সংখ্যা

অনুষ্টুপ

সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক
অষ্টবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৩

শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা

সূচি

১

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
অমিতাভ দাশগুপ্ত শৈলেশ্বর ঘোষ অজিত মুখোপাধ্যায়
অভীক মজুমদার

২

অশোক মিত্র অশ্রুকুমার সিকদার পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়
সুমিতা চক্রবর্তী রবীন পাল মনোতোষ চক্রবর্তী শেফালী মৈত্র
প্রয়াগ শুক্ল

৩

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কুমার রায় বিজিত দত্ত
সুধীর চক্রবর্তী অমিয় দেব শর্মিলা বসুদত্ত
শিশিরকুমার দাশ

৪

ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় সনজীদা খাতুন
দীপেন্দু চক্রবর্তী অশোক মুখোপাধ্যায়

৫

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত রথীন ভৌমিক
দুর্গা দত্ত সুমন গুণ পরিমল ভট্টাচার্য

৬

প্রভাতকুমার দাস দেবব্রত পাণ্ডা

৭

সাক্ষাৎকারের বদলে সাক্ষাৎকার পঞ্জি

৮

পুনর্মুদ্রণ : শঙ্খ ঘোষ
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অশ্রুকুমার সিকদার
পত্র-পত্রিকাপঞ্জি (বিষয় : শঙ্খ ঘোষ)

৯

পঞ্জি : জীবনপঞ্জি গ্রন্থপঞ্জি দীর্ঘবাদন রেকর্ড ও ক্যাসেট
অনুবাদপঞ্জি [বিদেশী ও ভারতীয় ভাষায়]

আমন্ত্রিত সম্পাদক : সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক : অনিল আচার্য

সম্পাদকীয় সহযোগী : অলক ঘোষ

কার্যালয় সচিব : আশিস ঘোষ

কর্মসচিব : অতীশ ঘোষ

বিশেষ সহযোগী : অরুণ কর্মকার ও সুশীল সাহা

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

মুদ্রক :
শ্যামল সাউ । দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

অরিজিৎ কুমার । টেক্‌নোপ্রিন্ট
৭, সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজা প্রিন্টার্স
২২এ, রামচন্দ্র সেন লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৯

বাঁধিয়েছেন : গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স
সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০০৯

RS. 15/-

কার্যালয় : ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়   সুবীর রায়চৌধুরী

অনুষ্টুপ-এর 'শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা' ? তা-ও কি সম্ভব ? অনেকেই চমকে উঠেছিলেন সেদিন, ভ্রূ-মধ্যও কুঞ্চিত হয়েছিল কারো কারো, আজ থেকে প্রায় দু-বছর আগে। নিশ্চয় রাজি হবেন না শঙ্খ ঘোষ, কিছুতেই দেবেন না মত। এইটেই তো আমাদের প্রথা যে গোটা একটা পত্রিকা জুড়ে জীবিত কোনো লেখক সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে সেই লেখকের সম্মতি থাকা চাই, তাঁর কাছ থেকেই জানা চাই তাঁর সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন দিক, নতুবা সম্ভব নয় কোনো উদ্ঘাটন। শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে অবশ্য মত নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি আমাদের মধ্যে, কেননা জানাই তো ছিল কোনো হট্টগোল, প্রচারের কোনো প্রচলতা যেহেতু বিঘ্ন নিয়ে আসে কবিতার নিভৃত সঞ্চারে, এসব পছন্দ নয় তাঁর। বহুদিন আগে লিখেওছিলেন তিনি, "···সেই দুঃসহ আড়ালে বসে সে তৈরি রাখবে একটা দৈনন্দিনের মুখোশ ; তাকে কেউ চিনবে না, আঙুল তুলে বলবে না 'এ লোকটা কবি', আর তার ভিতর থেকে গোপনে জন্ম নেবে নিঃশব্দ কবিতা।" তা ছাড়া, একোণ-ওকোণ থেকে কটাক্ষের সম্ভাবনাও তো থেকে যায় যদি অনুষ্টুপ-এর মতো পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় শুধু শঙ্খ ঘোষই আলোচ্য হয়ে পড়েন। এমন কোনো কিছুর সঙ্গেই যুক্ত হতে চান না এই কবি যা বিজ্ঞাপনসুলভ কিংবা লজ্জার বিন্দুমাত্র কারণ হয়ে উঠতে পারে, এমন কোনো কিছুর উপরেই ভর রাখতে চান না এই কবি যা একদিন সত্তাপ্রাপ্ত হয়ে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইবে তাঁর বিচার-বিবেচনা। তাই কোনো প্রচার নয়, নয় যশ-খ্যাতির মোহ, বরং

> ············চুপ করো
> শব্দহীন হও
> শষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর
>
> লেখো আয়ু লেখো আয়ু

বরং, বুকের মধ্য থেকে ছুঁড়ে দাও সেই হাত—যা 'পবিত্রতম শব্দ', যেমন বলেছিলেন তিনি একবার, '···He does live right in the midst of the society but points his silent finger from within the close intimacy with his fellow beings.'

না, আমরা যাইনি তাঁর কাছে অনুমোদনের জন্য। কাজ শুরু হলে সংগত বাধাই পেয়েছি তাঁর দিক থেকে। কোনো লেখক কিছু জানতে চাইলে বা

কোনো কারণে যোগাযোগ করলে সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করেছেন না লিখবার জন্য। লেখকরাও অনেকে মাঝেমাঝেই থামিয়ে দিয়েছেন লেখা, ভেবেছেন অনেকেই—বুঝি পরিত্যক্ত হলো প্রকল্প। অস্থির হয়েছি, ভীষণ অস্থির হয়েছি, ভেঙে পড়েছি কখনো-বা। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য। ভেবেছি, এই তো স্বাভাবিক, এইরকমই তো দেখতে চেয়েছি তাঁকে, যাঁর বুকে 'গেরুয়া জল', ভিতর আর বাইরের নিরন্তর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে লিপ্ত হওয়ার সন্ন্যাস যাঁর। 'মজ্জার ভিতরে গর্ব কই, উপেক্ষা কই? মুখ ঘুরিয়ে উদাসীন সরে দাঁড়ানো কই? এখন আমরা দাম্ভিক কিন্তু গর্বিত নই, নির্জীব কিন্তু উদাসীন নই, লুপ্ত কিন্তু লিপ্ত নই।'—বলেননি কি তিনি বহুদিন আগে? সে-কারণেই উপেক্ষার প্রতিটি দৃষ্টান্তে আরো ধৈর্যশীল হয়েছি, লাভ করেছি দ্বিগুণ প্রেরণা, মনে মনে বলেছি—এইখানে, হ্যাঁ এইখানে নত হওয়া যায় যখন চারদিকে উক্তি আর যাপনের দুস্তর ব্যবধি থেকে কেবলই উত্থিত হয় শব্দরৌরব। এই গভীরতারই উন্মোচন দাবি করে আজ আমাদের এই চূর্ণ প্রহর, এইটেই আমাদের দায়। এই দায় আরো এই জন্য যে এই কবি কেবলই আমাদের নিয়ে যান বিস্তারের পথে, প্রশ্নহীন জীবনযাপনের ছোটো গণ্ডির বাইরে এক আধুনিকতার দিকে, যে আধুনিকতা জীবনকে দেখতে শেখায় নিরন্তর সব বিচিত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে, এক মুঠোয় ধরতে চায় আমাদের ঐতিহ্য, 'প্রবহমান বিশ্বকাল' আর সমসময়ের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কগুলিকে।

অপরাধবোধ তবু ছিলই, কেবলই ভয়—ছিঁড়ে ফেলছি না তো তাঁর নীরবতার পর্দাখানা? এতদিন ধরে লিখছেন তিনি, লোকে বলবেই—ওই তিনি কবি, ওই তিনি লেখক। শঙ্কা ছিল তবুও, যদি অনভিপ্রেত কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয়! তাই চেয়েছি তাঁর নীরব আর আমাদের কাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য। সবসময় রক্ষা করতে পারিনি তা, কিন্তু দোষ দেব কাকে? শুধু জানি এই স্বীকৃতি আজ থাকা চাই, শুধু জানি আমাদের ঋণ এই স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বের কাছেই, তারই কাছে আমরা কৃতজ্ঞ প্রথমত। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়েই আমরা ছুঁয়ে থাকতে পারি 'আমাদের বেঁচে-থাকাকে গভীরতম আর ব্যাপকতমভাবে'। তাঁর কবিতা 'আমাদের অবিচেতনা আর অবচেতনার সঙ্গে কেবলই যুক্ত করে দেয় আমাদের সময়ের চেতনাকে'। তাঁর মধ্যেই পাই এইরকম অন্তরঙ্গ স্বর:

> এসো ভালোবাসো, এসো সন্দেহ কোরো না, ভালোবাসো
> মাটি ছুঁয়ে কথা বলো, হাতে হাত রাখো, চুপ করো
> পলির প্রসাদে নাও মুছে নাও পাড়ের পাথর
> দেখো তার কাছে এসে দুয়ে আছে আহত মানুষ।
>
> —পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ (৩৬)

এই দু-বছরের মধ্যে একে একে চলে গেলেন ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, সুধীর রায়চৌধুরী। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আমাদের। ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ইচ্ছা ছিল সংখ্যাটি তিনি দেখে যাবেন, কিন্তু আমরা পারিনি কাজ শেষ করতে। আজও যে পেরেছি সে-কথা বলতে পারি না। যাওয়ার আগে নিজের লেখাটি অবশ্য দিয়ে যেতে ভোলেননি ভারতী। এই সংখ্যাটির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন দীপক মজুমদারও। একটি চিঠিতে দীপক জানিয়েছিলেন 'এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়'-এর কবিকে আমরা কীভাবে দেখছি সে-সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তিনি। কিন্তু সম্ভব হয়নি সেই আলোচনা। আজ 'শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা' যখন বেরোচ্ছে তখন এই প্রিয়জনদের স্মৃতিতে ভরিয়ে তুলছি আমাদের যাবতীয় প্রযত্ন।

লেখকরা তাঁদের সুচিন্তিত মতামতই দিয়েছেন, কিন্তু সেই মতামতগুলি একান্তভাবেই তাঁদের নিজের নিজের। তবু কোথাও যদি না পৌঁছয় এই সংকলন, শঙ্খ ঘোষের কোনো পরিচয়ই যদি না বেরিয়ে আসে লেখাগুলি থেকে, তাহলে দায়িত্ব নিশ্চয়ই এই সম্পাদকের।

দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি আমরা, কিন্তু তিন-চার মাস আগেও বুঝতে পারিনি এই সময়ে সংখ্যাটি বের করা সম্ভব হবে। এক যৌথ উদ্যোগেই হতে পারল সেই কাজ—যার মধ্যে আছেন লেখকরা, অনুষ্টুপ-সম্পাদক অনিল আচার্য ও অনুষ্টুপ-এর কর্মীবন্ধুরা, অরিজিৎ কুমার ও টেক্নোপ্রিন্টের কর্মীরা, জয়ন্ত চৌধুরী-বিশ্বজিৎ পাণ্ডা-দুলাল কর্মকারদের মতো বন্ধুরা। এ ছাড়াও আছেন আরো দু-জন যাঁরা সর্বদাই থেকেছেন আন্তরিক। তাঁদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা, আমাদের কৃতজ্ঞতা।

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
২. ২. ৯৪

সম্পাদকীয়

আমি আড়াল চেয়েছিলাম চার কিনারে / কিন্তু প্রভু ভুল কোরো না রাত্রি সকাল / পথই আমার পথের আড়াল।...

"আড়াল", 'শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা'।

পথই তাঁর আড়াল। এমন আড়ালে থাকা এক অনন্ত ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। তিনি সমর সেন। বেগ পেয়েছিলাম সে সংখ্যা করতে। প্রথম দিকে প্রবল আপত্তি জানালেও শেষ দিকে আমাদের পাগলামির সামনে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন 'সমর সেন সংখ্যা'র জন্য উৎসাহ পেয়েছিলাম শঙ্খ ঘোষের কাছে। তার কিছু পরে দেখলাম কী অসাধারণ পরিশ্রম করে তিনি ও অরুণ সেন অরুণ মিত্রকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন। একটি অসাধারণ সংকলন সম্পাদনা করলেন। এই দুটি কাজের ক্ষেত্রে তিনি কাণ্ডারীতুল্য। আর 'অনুষ্টুপ শঙ্খ ঘোষ' সংখ্যার ক্ষেত্রে তিনি বোধ করেছেন প্রবল অস্বস্তি এবং কখনো মনে হয়েছে তিনি আমাদের ভাবছেন হঠকারি। হঠকারি ছিলাম আমরা বরাবরই। কিন্তু আমাদের দুশ্চিন্তা ছিল অন্যত্র। যদি শঙ্খ ঘোষের সম্মানের যোগ্য কাজ না হয়? শঙ্খ ঘোষ সম্পাদনার ক্ষেত্রেও যে অনন্য! তিনি যে কোনও কাজকেই সামান্য স্থান করেন না। মুদ্রণ বিষয়ে তিনি প্রায় বিশেষজ্ঞ। তবু তো 'মূর্খরা' সে-সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'দেবদূতেরা' যেখানে পা বাড়াতে ভয় পায়। আমরা ঝাঁপিয়েছি। পূর্বাপর ভাবিনি। এই মুহূর্তে ভাবতে চাই না। এই কাজটি আমরা করতে চাই। বেশি ভাবলে যে অনেক ভালো কাজ করা যায় না। ত্রুটি থাকবে অনেক। কিন্তু ত্রুটিহীন কাজ করতে পারব এমনটি তো ভাবিনি আমরা। তাঁর নিজের একটি গ্রন্থের ভূমিকায় এ-বিষয়ে আলোকপাত করেছেন শঙ্খ ঘোষ :

'বলে নেওয়া ভালো যে অন্য অসুবিধে আছে এ-বইতে। প্রবন্ধের কাছে অনেক পাঠকের একটি সুনির্দিষ্ট দাবি তৈরি হয়ে যায়, সংগতভাবেই সেখানে তাঁরা আলোচনা শুনতে চান বিস্তারে আর বিশ্লেষে। এই লেখাগুলি সেই পাঠকদেরও নিশ্চয় ব্যাহত করবে, কেননা কবিতা আর কবির সংঘাত-সীমায় দাঁড়ানো উৎক্ষিপ্ত কয়েকটি মুহূর্তমাত্র পাওয়া যাবে এখানে, তার বেশি কিছু নয়।' (ভূমিকা, 'শব্দ আর সত্য')

এই সংকলনে বিক্ষিপ্তভাবে শঙ্খ ঘোষের ব্যক্তিত্বের ও সৃষ্টির ভগ্নাংশ উন্মোচিত হবে কিনা সন্দেহ।

শঙ্খ ঘোষ আড়ালে থাকলেও তাঁর নীরবতা থাকে না যখন প্রতিবাদের প্রয়োজন এসে যায়। আমাদের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি সম্পর্কে সংশয় তাঁর আছেই। কখনো কখনো এই সংস্কৃতি তাঁর কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। আমরা প্রচার ও অহমিকার দাসত্ব করি। ভুলে যাই আমাদের কাজ হবে সত্যের জন্য কখনো কখনো নিজেকে ভুলে সকলের জন্য কাজ করা।

'আমাদের লুব্ধতা ও হীনতা, আমাদের বৃহৎ সামাজিক বাজার—চারদিক থেকে আমাদের ভাষাকে করে তোলে নিঃশীল, নিঃসাড়। আর ততই চারদিকে

জেগে ওঠে শব্দরৌরব।...

যে কেউ এসে বলতে পারেন, আমাদের এ-হলো প্রকাণ্ড এক শব্দজীবী সংস্কৃতি, ফাঁপা, অলস, ভণ্ড।' (লেখকের নিয়তি, শব্দ আর সত্য) এই শব্দজীবী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ শঙ্খ ঘোষ। তিনি তাই প্রতিনিয়ত জড়িয়ে থাকতে চান কর্মযজ্ঞে। উৎসাহিত করেন সৃষ্টিকে। তিনি জানেন খ্যাতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে প্রাতিষ্ঠানিকতার। বহু লেখক ও কবি, এমন-কী যাঁরা সম্পাদনা ও মুদ্রণের সঙ্গে যুক্ত তাঁরাও, অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন তাঁর সংস্পর্শে। তিনি কখনো তাঁর চিন্তাভাবনা জোর করে চাপাতে চান না কারও ওপরে। তিনি এ-বিষয়ে সতর্ক এবং অবহিত। তিনি জানেন, 'প্রতিষ্ঠানে থাকাটাই ভয়ের নয়, প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠাই ভয়ের'।

অনুষ্টুপে শঙ্খ ঘোষের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে অনেকবার। সত্তর দশকে প্রশ্ন উঠেছে হয়তো তাঁর অবস্থানগত বিষয়টি নিয়ে। অনুষ্টুপের প্রথম দিকে শ্যামবাজারের বাড়িতে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম একবার। নির্দিষ্ট দিনে আর একবার গিয়ে তাঁর 'কাব্যনাটক প্রসঙ্গে' লেখাটি নিয়ে এসেছিলাম। তারপর গিয়েছিলাম বহু বছর পরে। অস্বস্তি ছিল। তিনি নিজেই তা কাটিয়ে দিয়েছিলেন উদার বন্ধুত্বে। তাঁর নীরবতা যে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা এবং ভেতরে গুমরে থাকা তার বাস্তব প্রমাণ পেয়েছিলাম প্রথমে 'কবিতার মুহূর্ত' পড়ে। 'লাইনেই ছিলাম বাবা' তার পরেই প্রতিবাদে ফেটে পড়ার নিদর্শন বলে মনে হয়েছে। আজ আগের প্রশ্নের উত্তর সবাই জানেন। আপনকে তিনি ঘৃণা করেন কতখানি তাও জেনেছি তার লেখা পড়ে এবং সান্নিধ্যে এসে।

আমরা শঙ্খ ঘোষ নিয়ে এই কাজটি করেছি সবাই মিলে। কিন্তু কাজের নৌকোটিতে হাল ধরেছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। অর্ধেক রাস্তায় অনেকে সরে গেছেন, তখন পাশে এসে হাল ধরেছেন এমন দু'জন যাঁরা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। সব কাজেই যাঁর সহযোগিতা ছাড়া চলে না সেই অরিজিৎ কুমার এ-ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে পাশে থেকেছেন। সহযোগিতা যেমন পেয়েছি অনেকের কাছ থেকে অসহযোগিতাও কম পাইনি। তবে যাকে নিয়ে এই সংখ্যা তাঁর অস্বস্তি এবং বিরক্তি উৎপাদন করেছি অনেক। হয়তো এই অস্বস্তি ও বিরক্তি বেড়ে যাবে এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি প্রথমেই।

সংখ্যাটি উৎসর্গিত হয়েছে সুবীর রায়চৌধুরী ও ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে। এঁরা দুজনেই অকালে চলে গেলেন। সুবীর রায়চৌধুরী উদ্যোগ নিয়েছিলেন এমন একটি সংকলনের। শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করেছি আমরা। তাঁর সংগৃহীত কয়েকটি লেখাও নিয়েছি। শুধু তাঁর লেখাটি আর পাব না। ভারতী-র এই সংখ্যাটি নিয়ে ছিল প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ। তাঁর সযত্নে লেখা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো বড়ো দেরিতে। সে চলে গেছে তখন।

এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখা একজন অনধিকারীর বিধিসম্মত কর্তব্য।

অনিল আচার্য,

২.২.১৪

অস্ফুট স্তবক, তুমি জেগে আছো মধ্যরাত্রিযামে
স্বপ্নের খোলস ভেঙে তোমার অস্থির দেখা পাওয়া
ভ্রষ্ট হয়ে গেলে দিন ভ্রষ্ট হয়ে গেলে সন্ধ্যাবেলা
বিন্দু বিন্দু পরিত্রাণে ভ'রে যায় আত্মবলিদান।

'স্তবক' / শঙ্খ ঘোষ

একটি চিঠি

প্রিয়বরেষু,

শঙ্খ ঘোষ আমার নিবিড় বন্ধু। সেই কারণেই তাঁর শিল্প বিষয়ে নিরাসক্ত উচ্চারণ আমায় সাজে না। এই দুটি পংক্তি লিখতে-লিখতেই তবুও মনে হলো, একমাত্র বন্ধুর পক্ষেই বুঝি-বা বন্ধুর শিল্পায়নের যথার্থ মূল্যাঙ্কন সম্ভব। ইতিহাসের সৌজন্যে বলতেই হবে, অনেকবারই আমি সেই মরমী সমীক্ষণে মেতেছি। যাঁরা এই চিঠি পড়বেন, তাঁদের প্রত্যেকেই এক অর্থে ভিতরমহলের মানুষ এবং সেই যুক্তিতে ধরে নিতে পারি, এ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে আমি এখানে-ওখানে যা-কিছু বলেছি কিংবা লিখেছি তাঁরা সে বিষয়ে অবহিত আছেন। সুতরাং এখানে সেসব মুগ্ধ মরক্ষেপের পুনরাবৃত্তি অর্থহীন। এই চিঠিতে শুধু আমি যে তাঁকে বুঝতে পারি এই মর্মে একধরণের বিনীত অহংকার ব্যক্ত করব।

আমার ধারণা, দুই বাংলার অবিভক্ত সংস্কৃতির অন্যতম জনপ্রিয় এই মানুষটির স্নায়ব সংবেদন এতই গভীর যে তার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা অনেকেরই সাধ্য নয়। হ্রদের মতন স্বচ্ছ এবং শায়রের মত ঋজু তাঁর প্রকাশভঙ্গি। ঐ প্রত্যক্ষতার আড়ালে এমন একটি সত্তা লুকিয়ে আছে যার নাগাল পাওয়া ভার। আমি হয়তো তাঁর হৃদয়ের সেই প্রত্যন্ত এলাকায় প্রবেশাধিকার পেয়েছি। তাঁর না-বলা বাণীর স্বরলিপি তৈরি করা একমাত্র আমার পক্ষেই সাধ্য, এরকম উদ্ভট দাবি পোষণ করছি না। কিন্তু তাঁর প্রিয়জনতার অন্তর্ভুক্ত কারো-কারো মতই এই স্বরাঙ্কনে আমারও কখনোই কোনো প্রমাদ ঘটেনি। অন্তদিকে আমার এই বন্ধুটিও কি আমার যাবতীয় প্রাতিস্বিক চলনবলন কিংবা মতিগতি প্রকৃতির তাৎপর্য অনায়াসেই ধরতে পারেন না? এই অন্যোন্য স্পন্দ না থাকলে আমরা এ ওর বন্ধুতা আদৌ অর্জন করে নিতে পারতাম না। তাঁর সঙ্গে সংলাপিতায় কোনোদিনই আমার কোনো কৌতুকের টিকাটিপ্পনি আমাকেই জুড়ে দিতে হয় নি। প্রতিটি বন্ধুতার ইতিহাসই হয়তো এরকম স্বতঃসিদ্ধ গুণোল্লেখের উপর ভিত্তি করেই ধ্রুবতা পায়। আমাদের বন্ধুত্বের বেলায়ও তেমনি। যখন দৃশ্যত তাঁর হাত ছুঁইনি, তখনো ব্যাখ্যাবিহীন শব্দসেতু তাঁর দিকে মেলে ধরেছি এবং সেই পরিভাষণের মাধ্যমেই আমাদের সাঙ্কেতিক আদানপ্রদান ঘটেছে। এই খেলাটা, দর্শকদের দেখিয়ে, আমাদের প্রতিদিন খেলতে হয় না। এ খেলা আমাদের চিরদিনের। আমি জানি তাঁর সঙ্গে একযুগ ব্যবধির পরও যদি হঠাৎ কোথাও, জনপথেই হোক কিংবা বিদগ্ধজনের বৈঠকেও এক লহমা দেখা হয়ে গেলেও এই সেতুস্পর্শিতা ব্যাহত হবে না। আমার দিক থেকে তাই তাঁর সঙ্গে সময় সম্মানিত এমন-একটি নির্ভর-

যোগ্যতা গড়ে উঠেছে যাকে কোনো বহিরঙ্গ এলিট-লবিই ভাঙতে পারবে না। কিছুদিন আগেও তাঁর বাড়িতে আলোক সরকারের জন্মদিন ঘিরে আলোড়িত পঞ্চাশের কবিদের অন্তরঙ্গ মোহনামুহূর্ত আমার এই নিরুদ্বেগ প্রত্যয়ের একটি উদাহরণ। ঠিক এই জায়গাটায়, অযথা প্রমাণ প্রদর্শনের গ্রন্থিতে পৌঁছিয়ে, শঙ্খ ঘোষের ব্যক্তিত্বের দিকটা আমি কীভাবে দেখেছি, আপনার এই প্রশ্নের কাছে আমি ঈষৎ থমকে দাঁড়াই। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভা তো সর্বজনবিদিত। চারিত্রগুণে, কাছে দূরে যা-কিছু ঘটছে সমস্তকেই তিনি ছুঁয়ে আছেন। অব্যবহিত এই সান্নিধ্যের ভিতরেও মৌল যে-দৃষ্টিকোণ সজাগ হয়ে আছে সেকথাও তো সবারই জানা। কোনো উৎকোচ-উপঢৌকনেই তাঁর ধনুকের ছিলা নিবৃত্ত করা যায় না, শুভার্থীর কোনোরকম মিথ্যাচরণ প্রশ্রয় পায় না তাঁর। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের আবহমণ্ডলে আমি তাঁর যে-ব্যক্তিত্বকে ভালবেসেছি, তার অবকাশ আরো যে ব্যাপক। যখন আমি বহুদিন আগে আকাশবাণী-র জন্য দান্তে গ্যোয়েটে ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনটি রূপকালেখ্য লিখি তখন থেকেই আমি এদিকে, বিশেষভাবে সচেতন হয়েছি। রেকর্ডিংয়ের ঠিক আগের মুহূর্তেও আমরা মনস্থির করে নিতে পারতাম না কে মেফিস্টোফিলিসের পাঠ নেবে, কোনজন ফাউস্টের। অথবা কোন অনুপলে ভার্জিল ও দান্তের ভূমিকাবদল হয়ে যাবে? রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও শেষ পর্বের দুই বিষম অভিক্ষেপ কীভাবে দুজনের মধ্যে বিপজ্জনকভাবে বিতরিত হতে পারবে? আমাদের এই দোটানা প্রযোজক সুধীন চট্টোপাধ্যায়ের চোখে পড়ে গিয়েছিল। তিনি এককালে অপরূপ গান গাইতেন। বোধহয় সেই সাংগীতিক স্বভাবেরই প্ররোচনায়, একদিন যখন, স্টুডিয়োর প্রদোষে রেখাচিত্রকরের মৃত্যুর জন্য আবহসংগীত চয়ন করছি, সুধীনবাবু বলে উঠলেন : 'আপনাদের নিয়ে আর পারি না। আপনারা দুজনেই যখন দু-দুটো ভূমিকাতেই সিদ্ধহস্ত, মহড়া ছাড়াই দয়া করে একটিকে বেছে নিন-না।' তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানের অন্তিম সূচনা অবধি আমরা এই আপাতবিপরীতের মজাটা বজায় রাখতাম এবং শেষ পর্যন্ত হঠাৎই এক-একটি ভূমিকায় নেমে পড়তাম। একদিন ক্লাস নিতে যাবার মুখে আমাদের মাস্টারমশাই সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সস্নেহে আমাকে একা-ই ঘেরাও করলেন : 'তুমি আর শঙ্খ, মানে তোমরা, কোন রোলের জন্য যে কোন্জন নিযুক্ত ছিলে, তোমাদের প্রোগ্রাম শুনে সেটা অল্পেতেই বুঝতে পারিনি। আর ঠিক সেজন্যই খুব ভালো লেগেছে।' আমি, অপ্রতিভ, তাঁকে : 'স্যার, এখন তো কিছুটা বয়েস হয়েছে, আর রোলকল করবেন না, করলেই কিন্তু কলরোল হয়ে যাবে।' পরিহাস মুলতুবি রেখে প্রসঙ্গত বলতে চাই, শঙ্খ ঘোষের ব্যক্তিত্বে এমন একটি মাত্রা আছে, ব্যক্তি যেখানে ব্যাপ্তির দিশারি। এবং সেটাও কোনো নাটকীয় ঘটমানতা বা কথকতার ফুলঝুরি না ঝরিয়ে।

আগের তুলনায় অধুনা তাঁকে অনেক কথা বলতে হয়। এমন দিন গিয়েছে যখন রঙ্গভরে আমি দীর্ঘায়ত এক-একটি স্তব্ধতা সিনক্রোনাইজ করে দিতাম। পরবর্তীকালে গলার দুরূহ অসুখ সত্ত্বেও তাঁকে যে থেকে থেকেই কেনা তুলে কথা বলতে হয়েছে তার কারণ তাঁর সূক্ষ্ম প্রণোদনা বুঝতে পারার মত সময়োপযোগী মনের সংলগ্ন এখন তেমন বিপুল পরিমাণ নয়। আমার এই হঠকথনে ভুল বোঝার অবকাশ তৈরি হতে পারে, তবু এটা, অনুভূত সত্যের খাতিরে, না বলে আমার উপায় নেই। তাঁর মনোভঙ্গি এবং মতামত জানবার জন্য যাঁরা অহরহ তাঁকে কাছে পেতে চান, তাঁদের ধীশক্তি ও সততা বিষয়ে আমার মনে একতিল সংশয় নেই। সত্যিই তো, সমাজ সভ্যতা ও সাহিত্য বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের বলার কথা কতো অজস্র। সেই সম্ভার নিংড়ে নেওয়াই তো কৌতূহলী বা কৃতবিদ্য সন্ধানীর কাজ। সেদিক থেকে দেখলে কোথাও কোনো গোলমাল থাকার কথা নয়। কিন্তু যখন তিনি দারুণ রকম অসুস্থ, সে সময়েও দেখেছি তাঁর বিশদ নির্দেশনার অপেক্ষায় কাতারে-কাতারে মানুষজন অপেক্ষা করছেন। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে তবেই তিনি একবিন্দু অবসর নিতে গিয়েছেন। এভাবে, মাঙ্গলিক উপচার হয়ে-ওঠার সদর্থক কর্মযোগেই, দিনে-দিনে নির্জিত হয়েছে তাঁর স্বাস্থ্য।

ভয় হয়, গণমাধ্যমের যুগে অতিব্যাখ্যানের দুঃসময় এসে গেছে আজ, আমাদের দেশেও। চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে কর্পূরমঞ্জরীর নান্দনিক মহিমাও বুঝিয়ে দেওয়া যায় না আজকাল। অথচ আমি যে-শঙ্খ ঘোষকে জানি, 'শব্দের ভিতরে অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্য'ই তাঁর উপাস্য একটি শর্ত। তাঁর একটি কথার সঙ্গে আরেকটি কথার ভিতরে অন্তর্গত কথার প্রাণগ্রন্থিই নীরবতা। এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, হাইডেগারের উত্তরসূরি গাডামারের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনার মুহূর্তে সেই কথাটা আমার বারবার মনে হচ্ছিল। সংগতভাবে চুপ করে থাকতে না জানলে মানুষের ভাবনাবিনিময় ব্যর্থ হয়ে যায়, গাডামার এই মন্তব্য করতেই আমি সেই গুণীসমাবেশে শঙ্খ ঘোষের কবিতা তর্জমা করে শোনাই। আমার মনে এখনো গাঢ় এই প্রতীতি, তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্রলক্ষণই সমীচীন শুব্ধতা।

কবিতালেখা ও অধ্যাপনার মধ্যেই স্বভাবতই অনপনেয় একরকম দ্বৈরথ আছে। 'কবি-অধ্যাপক' শব্দটা আদৌ আমার পছন্দসই নয়। আমাদের দেশের অনেক বড়ো কবিই, যেমন জীবনানন্দ বা বিষ্ণু দে, অধ্যাপক হিসেবে তেমন কোনো বিরাট অভিঘাত রেখে যাননি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কোনো কবিকে অধ্যাপক বললেই তাঁর জাত গেল। শঙ্খ ঘোষ অধ্যাপক হিসেবে আজ যে গগনচুম্বী সার্থকতার শিখরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, সেই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো কবি ও শিক্ষকের মধ্যে একধরনের বনিবনা সম্ভব। তাঁর ক্ষেত্রে এই অপ্রতিম সামঞ্জস্যের কারণ এই যে, তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে অধ্যাপক বলতে হয়নি,

তিনি তাঁর কবি-অভিজ্ঞতা উজাড় করে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন। এটা একটি শিবির থেকে আরেক ব্যূহে যাবার মতন বর্ম পরার ব্যাপার নয়। কিংবা ব্রত থেকে বৃত্তিতে সময়ানুগ সংক্রমণের সচেতন অভ্যাসের বালাই এর মধ্যে নেই। কবিতার মাধ্যমে সংস্কারক স্বভাবের অকপট নিষ্ক্রমণ কখনোই তাঁর কাম্য ছিল না। তা সত্ত্বেও কবিতার বোধিচর্যা ও ধ্যানধারণার বিকিরণের ভিতরে যাতায়াতের প্রবণতা ও ক্ষমতা তাঁর মজ্জাগত। এই যাওয়া-আসার বাঁকে-বাঁকে যে তাঁকে মানদণ্ডের কাছে সত্যবান থাকবার প্রয়োজনে, অতিরিক্ত ভাষ্য দিয়ে যেতে হবে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

এখানেই যাপিত উপলব্ধির কথা ওঠে। এই ঝোঁকেই শঙ্খ ঘোষ যখন আমাদের, অনেকটা ক্রুপদী ধরনেই, 'জীবনের ভিতর দিয়ে সাহিত্যকে জানবার কথা বলেন, তাঁর সেই উক্তি তাঁর নিজের আচরিত পারমিতায় বড়ো রকমের তাৎপর্য পায়। কিন্তু নিছক এই সূত্র দিয়েই যদি আমরা তাঁর শিল্পের সামর্থ্য শনাক্ত করতে চাই, তাহলে তাঁর দুজ্ঞের্য় চরিত মানসের প্রতি অবিচার করা হবে। এখানে প্রধানত দুই এষণার দিকে দৃষ্টি রাখা জরুরি ! প্রথম অভীপ্সার ঘরানা চিরায়ত। 'শব্দ আর সত্য'-র (১৯৮২) নিবিষ্ট পাঠক সেই শিকড়ের অভিমুখিতা জানেন। কোথাও স্পষ্টভাবে বিবিক্ত না হলেও বোঝা যায় গ্যোয়েটে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পাচার্যের সত্যান্বেষী শিল্পভূমিকা তাঁর বিবেকেও কীরকম সক্রিয়। তার অর্থ এই নয়, এই দুই কবির রচনাবলীতে তিনি নিঃশর্ত নোঙর করেছেন এবং তাতেই তাঁর যুগজিজ্ঞাসার নিরসন হয়ে গিয়েছে। বরং সমীপসময়ের বিশ্বসাহিত্য ও দেশজ কবিতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত যে সমস্ত শিল্পকৃতির উদাহরণ তিনি জুগিয়েছেন এবং সেই সূত্রে এই শতাব্দীর কাছে আমাদের শুদ্ধি-শুণের যে-অঙ্গীকার জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তা থেকে প্রতিপন্ন হয়, জীবন ও সাহিত্যের সমীকরণের ঐ দুই কিংবা অনুরূপ আরো জনকয়েক পুরোহিতের ব্যাসার্ধ থেকে অনেক দুরূহসাধ্য ক্ষণসাম্প্রতে তাঁর জাগর ঔৎসুক্যের ঠিকানা। এক হিসেবে তিনি ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সাহিত্যদর্পণে শীলিত মনস্কতা দস্তুরমতো নেপথ্যে রেখে এভাবেই বেরিয়ে পড়েন কালান্তরের অমীমাংসিত আবর্তগুলির দিকে। এখানেই সূচিত হয় তাঁর অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রস্বর, যার দুটি পর্যায় ক্রমশ আমাদের চোখে পড়তে থাকে। এরি প্রথম স্বননে 'প্রতিবাদ আর ভালোবাসা' 'হঠাৎ যেন এক বিন্দুতে মিলে' যায় তাঁর কবিতায়। একেবারে গোড়ার দিক থেকেই এ ধরণের আয়োজন তাঁর রচনায় ছিল। কিন্তু বিশেষত ইন্দিরা ইমার্জেন্সির সন্ধিক্ষণ থেকেই শিল্পীর স্ববিবেক বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর তাগিদে শুরু হয়ে গেল মূল্যবোধঘনিম একটি বৃত্ত, প্রকৃত প্রস্তাবে, যার তরঙ্গ এখনো তাঁর প্রত্যক্ষ কোনো দৃশ্য বিষয়-বস্তুর সঙ্গে জড়িত নয় এরকম কবিতাতেও ঝলকঝাপট দেয়। দ্বিতীয় স্বরায়ণের

দ্বিতীয় আদলটাও এরি মধ্যে কখনো পাশাপাশি কখনো পরপর জেগে ওঠে: শিল্পের মধ্যে অঙ্গীকারকে চূড়ান্ত করে তোলার পরই ব্যক্তিমানুষের জগৎটিকে নির্বাণের মতন আত্মবিলোপী প্রবর্তনায় একরকম খারিজ করে দেওয়া। চূর্ণ-চূর্ণ কবিতায় পরিব্যপ্ত হয়ে যায়, তখন শূন্যতা আর শূন্যতা, ক্রমধূসরিম বৈরাগ্যের অভিমান। কখনো-কখনো এক-একটি দ্বিপদী নির্ভর কবিতায়, যেমন 'একুশ শতকে চলে দেশ'-এ ('ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' / ১৯৮৭), দ্বিতীয় ধরায়ণের দ্বি-আদলই ওতপ্রোত হয়ে মিশে থাকে: 'আমার সবটাই মৃত্যু আমার সবটাই জন্ম-দ্বার'। এতক্ষণে আমরা বলতে পারি জন্মের (নতুন প্রজন্মের তো বটেই) উপর তাঁর দৃপ্ত ভরসা আর মৃত্যুর দিকে দৃক্‌পাতের বলিষ্ঠতা, এই দ্বি-দ্বুটি উপপাদ্যের সমন্বয়তায় তাঁর কবিতা নিদিধ্যাসনের দিকে চলে যায়।

যাঁরা মনে করেন নীরন্ধ্র রবীন্দ্রচর্চার ফলে (এবং এ বিষয়ে কারুরই সংশয় থাকতে পারে না যে শঙ্খ ঘোষ সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী প্রজ্ঞানী। তাঁর চিন্তার জ্যামিতি রাবীন্দ্রিকতায় আক্রান্ত হয়েছে, তাঁদের কাছে সদ্যপ্রদত্ত উদ্ধৃতির প্রেক্ষিতে এটুকুই নিবেদন, রবীন্দ্রনাথ যেক্ষেত্রে মৃত্যুকে 'জীবনের দ্বার' বলে মনে করেছিলেন অথবা ঐ মন্ত্রন্যাসে আমাদের চিত্তে একটি একায়তনিক উত্তরণের আলো উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, তাঁর বিষয়ে সবচেয়ে দীক্ষিত ও দীপিত কবি এক মুহূর্তেই কবিতার স্বার্থে তাঁর বিশেষজ্ঞতাকে নির্মম ভাবে স্থগিত করে দিয়ে ত্রৈমাস-মুখাবয়বে আমাদের দিকে তাকান এবং তাঁর সেই দ্ব্যর্থক বীক্ষণ আমার কাছে বড়ো মায়াবী সুন্দর লাগে।

সাজিয়ে দিতে এমন পারঙ্গম আজ? এই মননমুদ্রায় কি কোথাও রবীন্দ্রনাথের এতটুকু অবদানকল্পলতা নেই? আপনাকে যখন এই চিঠি লিখছি, আমাদের স্থানীয় আস্তানায় জড়ো হয়েছেন রবীন্দ্রসন্ধিৎসু আন্তর্জাতিক একরাশ ভাবুক, তাঁদের মধ্যে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই সংখ্যাগুরু। এঁদের জন্য আরব্ধ সেমেস্টারে নিতান্ত সদ্যই রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব-সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুন্দরের সংজ্ঞায়নে শূন্যতাকেও নতুন সৃষ্টির ভূমিকা হিসেবে কতো শক্তিমন্ত জায়গা দিয়েছেন। ভাবাসক্ত মনস্বী কবি এবং রবীন্দ্র-অনুধ্যায়ক, চিন্তন ও সৃজনে শঙ্খ ঘোষেরই তুর্কী সতীর্থ এচেভিং-এর বিশাল ঐশ্বর্যে শূন্যাশ্রয়ী, প্রায়-বৌদ্ধ সেই অনবদ্য চিত্রকল্পগুলিই বেজে উঠেছিল। যে নব অবোধ অবকাশে ঝর্ণাতলার নির্জনে মাটির কলস ভরে নেওয়ার আর্তি প্রত্যাখ্যান। একেবারে রিক্ত না হয়ে গেলে কী করে পূর্ণ হবে মানুষের মৃন্ময় চিদ্‌ঘন ভাণ্ড? এই সমস্ত অনুষঙ্গেই শঙ্খ ঘোষের গদ্য ও কবিতা এবারকার সেমেস্টারে নতুন করে পড়িয়েছিলাম। তাঁর কোনো-কোনো বিকৃতি অথবা ব্যঞ্জনাসর্বস্ব স্বগতোক্তির মধ্যে দিনযাপনের স্ফারিও ফাটল থেকে বাঁশি বাজিয়ে নেওয়ার

অন্তঃসাক্ষ্যগুলি কীভাবে রয়েছে, সেদিকে সংবেদী শ্রোতাদের নজর কাড়তে পেরেছিলাম। বস্তুত তাঁর কবিসমগ্রে আত্মতৃপ্তির অপূর্ব অভাব বিদ্যমান এবং এই অনটনের ভিতরেই কি নব নব নির্মিতির রবীন্দ্রশোভন সম্ভাব্যতা লুকিয়ে নেই? সন্তোষবাবু, এ চিঠি আপনার কাছে পৌঁছুবার কয়েকদিনের মধ্যেই ডার্মস্টাট শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'রবীন্দ্রনাথ : স্মৃতিচর্যা ও পুনরাবিষ্কার' শীর্ষক আলোচনাচক্র, ভারতউৎসবের অন্তিম পার্বণ। এই উপলক্ষ্যে শঙ্খ ঘোষ 'কবি রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে বলবেন, আমরা সবাই সেই প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব ছিলাম। ছাত্রবন্ধুদের কাছে তাঁর প্রত্যাহারের অনিবারণীয় সংবাদ দিতেই সবার প্রবল আশাভঙ্গ হলো। তিনি একদা আমেরিকার আইওয়া শহরে থাকাকালীন আমাকে জৈন-বৌদ্ধ কবিতার যে নিদর্শনী উপহার দিয়েছিলেন, তাঁর ডার্মস্টাটে না আসায় আশাহত একটি ছাত্রীকে তা থেকে কিছু জার্মান তর্জমা সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে দিয়েও তার গ্লানি শমিত করতে পারলাম না।

ডার্মস্টাটে আমার বন্ধুর অনুপস্থিতির কারণ আমি অনুমান করতে পারি। সেমিনার তো অনেক হয়েছে, আবার কেন সাতকাহন? একদিক থেকে আমার শতচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর এই না-সূচক সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিয়েছি : তাঁকে অনর্গল কথা বলতে হবে না। আমিই নাহয় তাঁর ভাবনা চিন্তার নির্যাস পৌঁছে দেব। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তীর্থযাত্রিক স্নাতকেরা তাঁর কাছে, আর সরাসরি পড়তে পারবে না বলে ঈষৎ অস্বস্তি হলেও আমি ভতোটা ভেঙে পড়ছি না। কেন না, এখন থেকে তিনি যতো কম কথা বলবেন, ততো বেশিই সৃষ্টিযজ্ঞে নিমগ্ন হবার সময় পাবেন। সেই সমস্ত রচনা পাঠ করাই হবে তাঁর কাছে নিবেদিত ছাত্রছাত্রীদের গুরুদক্ষিণা।

আপনার চিঠি পেয়েই সাড়া দিলাম। আরো একটু রয়ে সয়ে একটি 'সুচিন্তিত' সমীক্ষা পাঠালে সেটা আপনাদের গ্রন্থনার কাজে লাগত আরো। কিন্তু চিঠি পেয়েই উত্তর দেওয়া আমার স্বভাব। আর তাছাড়া আপনার পত্রের বিভাব খুব জরুরি। আমার বন্ধুকে নিয়ে এরকম একটি স্বয়ম্পূর্ণ এক-ভল্যুম অন্বেষা অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

তাঁর নির্মিত ভুবন এবং নির্মীয়মাণ সুন্দরের মধ্যে আমার, আমাদের এই পরানসখা নিবিড় কোন্ অন্ধকারে পার হয়ে চলেছেন। তাঁর যাত্রা সুগম হোক, তিনি অন্তত শতায়ু হোন, তাঁর হাত থেকে মান-কেড়ে-নেওয়া সহস্রধারে উৎসারিত নতুন সৃষ্টির প্রত্যাশায় এটাই আমাদের কামনা।

আপনারা আমাদের প্রীতিবিনতি জানবেন।

নিত্যপ্রীত্যর্থী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সু নী ল গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

...

সব সময় অনুসরণ করি

আমরা যখন কৃত্তিবাস পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় কার কবিতা থাকবে, তা নিয়ে বন্ধুরা অনেক আলাপ আলোচনা করেছিলাম। এই পত্রিকায় প্রবীণদের কবিতা চাওয়া হবে না, তা আগেই ঠিক হয়েছিল। এই পত্রিকা হবে তরুণতম কবিদের মুখপত্র, প্রবন্ধের জন্য আমরা প্রবীণদের দ্বারস্থ হবো। শেষ পর্যন্ত সকলেই এক মত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, শঙ্খ ঘোষের কবিতা দিয়েই পত্রিকা শুরু করতে হবে। শঙ্খ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা ছাত্র, তাঁর কয়েকটি মাত্র কবিতা পরিচয় ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। আমাদের অনুরোধে শঙ্খ ঘোষ তাঁর একটি কবিতার খাতা দিয়ে দিয়েছিলেন, প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা শুধু 'শ্রী'। প্রথম কবিতাটি 'দিনগুলি রাতগুলি'। কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যায় এই দীর্ঘ কবিতাটির জন্যই কৃত্তিবাস অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা অনেকেই সেই পুরো কবিতাটা মুখস্থ বলতে পারতাম।

তারপর থেকে কৃত্তিবাসের প্রতি সংখ্যাতেই তিনি লিখেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের দলবল বলতে যা বোঝায় তিনি তার অন্তর্গত ছিলেন না। এই দলটি ছিল হৈ চৈ প্রবণ, বেশি আবেগময়, ছন্নছাড়া জীবনের প্রতি আকৃষ্ট। সেই তুলনায় শঙ্খ ঘোষ শান্ত, অতিশয় ভদ্র, মৃদুভাষী, রাত জেগে সারা শহরে ঘোরাঘুরিতে একেবারেই অনভ্যস্ত। কিন্তু তাঁর কবিতার সঙ্গে আমরা সমমর্মিতা বোধ করেছি সব সময়। তাঁর কবিতা ভদ্রতায় শীতল নয়, বরং প্রতিবাদী, কখনো রাগী, এবং একেবারে কথ্য শব্দকেও তিনি সাধু-মর্যাদা দিয়েছেন।

বছর দশেক চলার পর কৃত্তিবাস পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে গেলে তিনি একটি কবিতায় লিখেছিলেন, 'এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়', তাতে খানিকটা আক্ষেপের সুর ছিল। কৃত্তিবাস অবশ্য তার পরেও বেশ কিছু বছর চলেছে, এবং শঙ্খ ঘোষের আনুকূল্য থেকে কখনো বঞ্চিত হয়নি।

মধ্যজীবনে শঙ্খ ঘোষ প্রাবন্ধিক হিসেবেও প্রধান হয়ে ওঠেন। নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পড়ি না। কিন্তু আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর পর শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধই আমাকে সব সময় আকৃষ্ট করেছে। এক সময় আমার

আশঙ্কা হয়েছিল বেশি প্রবন্ধের চাপে এই চমৎকার কবির কবিতা না হারিয়ে যায়। বেশি গল্প-উপন্যাস লিখতে গিয়ে কোনো কোনো কবির যেমন অপমৃত্যু ঘটে। শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে তা হয়নি, কবিতা সব সময় আসে না। তখন ক্লাসিক বিশ্লেষণ বা অন্য ভাষার কবিতা অনুবাদ করাই কবিদের পক্ষে প্রকৃষ্ট কাজ। শঙ্খ ঠিক সেই ভাবেই এগিয়েছেন।

ইদানীং তাঁর সঙ্গে দেখাশুনো হয় কম, কিন্তু তাঁর রচনাধারা সব সময় অনুসরণ করি। এই তো এবারেই বই মেলায় তাঁর নতুনতম কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে 'লাইনেই ছিলাম বাবা'। বইটি আমি সংগ্রহ করার আগেই জয় গোস্বামী আমাকে এক কপি উপহার দিল। সেদিনই বাড়ি ফিরে রাত্তিরে একা বসে বসে সেই কৃশ কাব্য গ্রন্থটি পড়ে ফেললাম বেশ কয়েকবার। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং আদর্শ ভ্রষ্টতায় জন্য তাঁর ক্ষোভ ও বেদনা ছড়িয়ে আছে সমস্ত কবিতায়। আমি ছবি আঁকতে পারি না, তবু একটা কলম নিয়ে শঙ্খ ঘোষের মুখখানি আঁকবার চেষ্টা করি সাদা কাগজে। সেই আঁকিবুকি দেখে কেউ কিছু বুঝবে না। কিন্তু আমি তাঁর মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পাই।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

মানব সম্পর্কে একজন মানুষের দুচার কথা

"জীবিকাবশে শ্রেণীবশে এতই আমরা মিথ্যায় জড়িয়ে আছি দিনরাত যে একটি কবিতার জন্যেও কখনো-কখনো অনেকদিন থেমে থাকতে হয়। উপরন্তু আমি যে আধুনিকতার কথা ভাবি সেখানে মন্থর পুনরাবৃত্তির কোনো মানে নেই, অবাধ প্রগল্ভতার কোনো প্রশ্রয় নেই। তাই কম লিখি বলে আমার ভয় হয় না।"

(শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা—শঙ্খ ঘোষ)

নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের ভূমিকাসূত্রে এই উক্তিতে একদিকে যেমন রয়েছে প্রবল আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ, অন্যদিকে কবির কাব্যমানসিকতারও একটি সুস্পষ্ট ধারণাও এখানে প্রতিফলিত। তিনি যে আধুনিকতার কথা ভাবেন সেখানে যে কোনো মন্থর পুনরাবৃত্তির স্থান নেই 'দিনগুলি রাতগুলি' থেকে 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' পাঠে তা অলক্ষ্য থাকে না। বিবেক নামক যে নাছোড়বান্দা ছায়াটি সারাজীবন কবির সঙ্গী তারই প্ররোচনায় তিনি পূর্ববঙ্গের বস্তালাঞ্ছিত মানুষগুলির জন্য যেমন পথে নামেন, তেমনি যে মতাদর্শে আজীবন বিশ্বাসী সেখানেও কোনো চ্যুতি দেখলে নিজের অপরিমেয় বিদ্বেষকেও সার্থক কবিতার রূপ দিতে জানেন। আর তাই মস্করাপ্রধান দ্ব্যর্থবোধক 'লাইনেই ছিলাম বাবা' লেখেন তখনই যখন তিনি লাইন থেকে প্রতিবাদে বেরিয়ে এসে লিখতে পারেন

"আজ রাত্রি অন্ধকারে মশালের মিছিল চলেছে
মুখগুলি দেখা যায় না, স্লোগানের ফুরালো সময়
গুহায় অক্ষরগুলি সাজানো রয়েছে অবিকল
সমবেত পাঠ হবে আজ ঘন ঘোর শেষ রাতে।"

লেখেন

"আকাশ তোমার মুখ, মাটি ছোঁয়া প্রতিমুহূর্তেই
চোখের কিনারে, যেন ঝলকে ঝলকে ঝরে তারা
বলো তারা মূর্ছা নয় বলো তারা আত্মঘাত নয়"

('গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ', শারদীয় প্রতিক্ষণ ১৪০০)

এই পুনরাবৃত্তিহীন আধুনিকতার কারণেই শঙ্খ ঘোষ বরাবর পাঠকের প্রধান

মনোযোগের কেন্দ্র থাকেন এবং প্রতিষ্ঠানকে পরিহার করে নিজেই হয়ে ওঠেন এক অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান।

না, শঙ্খ ঘোষের কবিতার তুচ্ছতম ব্যবচ্ছেদও এ রচনার উদ্দেশ্য নয়। এই সংকলনে নানা জ্ঞানীগুণীজন তা নিয়ে লিখবেন, তা ছাড়া ঐ ধরন গভীর বিশ্লেষণ আমার কলমসাধ্যও নয়, সম্ভবত সে কারণেই এ সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক আমাকে আমার দেখা শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে সাধারণভাবে দুচার কথা লিখতে বলে ভালই করেছেন। তাছাড়া কবি শঙ্খ ঘোষ আমার কাছে যতটা দেদীপ্যমান, প্রবন্ধ ও গদ্য শিল্পী শঙ্খ ঘোষ তার চেয়েও অনেক বড় তাৎপর্যের মিনার একথা আমি আগে একাধিকবার লিখেছি বলে আমাকে গভীরে না প্রবেশ করে সম্পাদক সাধারণভাবে কিছু লিখতে বলেছেন, সেটাও হতে পারে। একবছর আগেই একটি কাগজে লিখেওছিলাম।

ছন্দের যতনা ভক্ত, গদ্যের কাছে নতজানু
আমি নই সামাজিক মূর্খ কিংবা স্থানু
তাই কি তোমার আয়ু থেকে বারবার স্বাস্থ্য কেড়ে নিয়ে
তোমাকে করেছি কৃশ,
তুমি ক্রমশ হয়েছো দূর, আলো দিয়ে দিয়ে
যেমন সুদূর হয় আকাশের নক্ষত্রপদ্ধতি !
তবুতো তাকাতে হলে ঘাড় বাঁকিয়ে
তাকানো উঁচুতে ঐ শব্দের উন্নতি
দেখতেই হয় ! সরাসরি কে আর তাকিয়ে দেখে মূল ভালবাসা,
তাই কাছে গিয়ে দূরে যাওয়া, দূরে গিয়ে ফিরে ফিরে আসা।

মানুষ শঙ্খ সম্পর্কে নানান জনের বিভিন্ন মত। তারা কেউই মুনির সমান স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন নয় তাই নানান মুনির নানান মত লিখলাম না। তবে অনেকেই বলেন দীর্ঘকালের পরিচিতির পরেও তারা ব্যবহারিক স্তর থেকে কখনই ঘনিষ্ঠতার স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। হ্যাঁ, শঙ্খ ঘোষ বলেন কম শোনেন বেশি। আমি কিন্তু এটিকে একটি মহৎ গুণই বলবো। এই কারনেই তরুণপ্রজন্ম সবসময় তাঁকে ঘিরে থাকে। প্রত্যেকের কথা ও রচনা তিনি মন দিয়ে শোনেন, প্রয়োজনবোধে মন্তব্যও করেন। কিন্তু খারাপ লাগলে কখনই সরাসরি নীতিবাচক কিছু বলে মনে কষ্ট দেন না। আমি প্রায় পনেরো বছর তাকে চিনি। সময়ের এই দীর্ঘ পরিসরে নিজের বা অন্য কারো রচনা নিয়ে যাকে বলে বিশ্লেষণী আলোচনা তা তাঁর সঙ্গে কখনই করিনি। আসলে লেখক পরিচিতির বাইরের মানুষ শঙ্খ ঘোষকে আমি বেশি ভালবাসি। কেননা আমি মনে করি সাহিত্য মানুষের জীবনের একটি

অংশমাত্র, সম্পূর্ণ জীবন নয়। মুদ্রিত গ্রন্থের চেয়ে মানুষ নামক সদাপরিবর্তনময় জ্যান্ত গ্রন্থেই আমার আগ্রহ বেশি। নন্দনতত্ত্বের নানা দিক নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার ও প্রয়োজনে স্বার্থসংলগ্ন কথাবার্তা বলার লোক অনেক আছেন, কিন্তু এই আপাতনিরীহ শান্ত মগ্ন লোকটিকে ভালবাসার লোক বেশি নেই। কখনোই, কোনো অবস্থায়ই বিরক্ত না হওয়া, অন্তত প্রকৃত প্রয়োজনেও অন্তত একবারো বিরক্তি প্রকাশ না করা পাথর ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব কিনা জানিনা। কিন্তু অবিচল শঙ্খ ঘোষ তাও পারেন। তা পারতে ভলে ভলে ক্ষয়ে যেতে থাকেন এবং সেই মানসিক চাপ প্রায়ই তাঁর শারীরিক অসুস্থতায় প্রতিফলিত হয়। চাপা ধরনের মানুষেরাই সুক্ষ্মপীড়নে বেশি কষ্ট পায়। আনন্দ বা দুঃখ দুই-ই ঋষির সম্মান স্থৈর্যে গ্রহণ করেন শঙ্খ ঘোষ।

অনেকই বলেন ঘরে বাইরে সব সময় শঙ্খ ঘোষ একধরনের দূরত্ব বজায় রেখে চলতে ভালবাসেন, কাউকেই ঘনিষ্ট হতে দেননা। কেউ কেউ বলেন "মানুষটির মধ্যে তিনপোয়া বন্ধুত্বের ওপর একপোয়া মাস্টার মশাইয়ের মিশেল" একথাও অনেকে বলেন যে দুহাতের আঙুলের মধ্যে গোনা যায় তার বেশি সাহিত্যসম্পর্কবিযুক্ত বন্ধু তাঁর নেই—বা এর বেশি সংখ্যক লোককে তিনি বন্ধু হতে দিতেই চান না। যারা বলেন তাঁদের মানসিকতায় এই কথাবার্তাগুলোর তাৎপর্য যে কী তা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। কেননা যখনই আমি যাই তখন অনেক সময় পদব্রজবুলিতে (Pedestrian Language-এর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-কৃত বঙ্গীকরণ) তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও আমার অসুবিধে হয়নি কখনো। হ্যাঁ, আমিও বেশিরভাগ সময়েই স্বার্থতাড়িত হয়েই তাঁর কাছে গেছি, কখনো নিজের কাগজের জন্য কখনো বা চাকরীসূত্রে জড়িত পত্রিকার জন্য, লিখা প্রার্থনাই থাকে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। গর্ব করে বলতে পারি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি আমাকে নিরাশ করেননি। আমি কবি শঙ্খ ঘোষকে ভালবাসলেও মানুষ শঙ্খকে অধিক পছন্দ করি এটা সম্ভবত তিনিও বোঝেন, হয়তো সে কারণেও জোর করে লেখা আদায় করার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেন। এবং এ কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক বড় বড় কাগজের রচনাপ্রার্থনার দাবীকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে তরুণকবিদের কাগজে তাঁর অতি স্বল্পপ্রজ কলমের রচনাকে তিনি দিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

শঙ্খ যাঁর নাম, তাঁর তো সবসময় নিনাদিত হয়ে থাকবারই কথা। কিন্তু চুপ মানুষটি তাঁর অক্ষরগুলিকেই একমাত্র কথা বলাতে চান। সেখানেই তাঁর জিৎ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

...

উত্তরাধিকার

আড়ালে-আবডালে আমরা, শঙ্খ ঘোষের নিকটবয়সী-অনুজেরা তাঁকে বলতাম ছোট রবীন্দ্রনাথ। আজ, পশ্চিমের বয়সে এসে বুঝতে পারি—কথাটায় রসিকতার ছোঁয়া ছিল, অগৌরবের নয়।

রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু অসামান্য কবিতা লিখেছেন বলেই তিনি ভারত ও বাংলাদেশের সর্বগ্রগণ্য কবি নন। এই দুই দেশের এমন কি কখনো কখনো আন্তর্জাতিকেরও দুর্দহনে তিনি তাঁর পীড়িত অনুভবের কাব্যরূপ দিয়েছেন, ভিতর-বাইরের প্রতিটি সংকটে তাঁর উচ্চারণ হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে পরিত্রাণের মন্ত্র। দূরত্বের ধূসরতা কাটিয়ে তখন তিনিই হয়ে ওঠেন সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্য। আর, এখান থেকেই আমি যেমন ছুঁতে পারতাম বিষ্ণু দে-কে, তেমনি আমাদের নিজেদের সময়ের আওতায় পেয়ে যাই শঙ্খ ঘোষকে। তাঁর কবিতা অমোঘ হয়ে ওঠে প্রেমে, আত্মদীর্ণতায়, জলপ্লাবনে, খরায়, ভ্রাতৃঘাতে, জরুরি অবস্থার স্বৈরাচারে, নারীত্বের অপমানে, নিহত বিপ্লবীর রক্তোচ্ছ্বাসে, ক্ষমতার মদমত্ততায়। তাঁর কবিতা আমাদের সমবেত পাপের প্রক্ষালন।

শঙ্খ ঘোষ কোনোদিনই বহুপ্রজ নন। তিনি দেখেন, শোনেন, চারপাশের চঞ্চল নীহারিকাকে আত্মস্থ করেন। শুধু তখনই তাঁর কলমের নীরবতার দণ্ড শেষ হয়। আত্মপ্রচার ও বিজ্ঞাপনে আপ্লুত ভোগবাদী পরিবেশে তিনি মানুষকে ফের মানুষের অবস্থানে ফিরিয়ে দিতে চান। 'দেখেছি, যা হল, হবে, মানুষের যা হবার নয়'—জানার পরও, 'অন্ধবিলাপ' লেখার পরও।

এরই পাশাপাশি নিজেকে মিলিয়ে নিতে চেয়ে ও নিজেকে বুঝবার তাগিদে অনলস থেকে যায় তাঁর রবীন্দ্রচর্চা। কঠিন আয়াসে 'বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম, জয় তব জয়'-এর গদগদ, মূঢ় বন্দনার ধারাবাহিক অপমান থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে এনে নির্মোহ অথচ সত্যমূল্যে শঙ্খ ঘোষ ধরার চেষ্টা করেন কর্মে ও কথায় এক হওয়ার প্রয়াসী তাঁর ঐ অনন্য অগ্রজকে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একই সঙ্গে রাম ও রাবণকে আবিষ্কারের কাজে হাত লাগিয়েছেন অনেক তুখোড় কৃতবিদ্য সমালোচক, কিন্তু তাঁর দীর্ঘজীবনব্যাপী কষ্টকর, জটিল আত্মউন্মোচনের রক্তাক্ত প্রয়াসকে শঙ্খ ঘোষের মত আর কেউ আমাদের সাহিত্যে তুলে ধরতে পেরেছেন

কি না, আমি অন্তত জানি না, এবং, খানিকটা দুর্বিনয়ের ঝুঁকি নিয়ে বলি, মানি না। সময়ের তুমুল সংকীর্তনে গলা না মিলিয়ে একা হওয়ার মধ্যে যে বেদনাদায়ক ইতিবাচকতা আছে, তা আমি রবীন্দ্রনাথ ধরে বিষ্ণু দে ছুঁয়ে শঙ্খ ঘোষে এসে কিছুটা অন্তত বুঝতে পারি। সে ব্যক্তিই হোক বা দলই হোক, কাউকে খুশি করার জন্য শঙ্খ ঘোষ কলম চালাননি। তাঁর নিঃসঙ্গতার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাক।

কিশোর বয়স থেকে এই আত্মমর্যাদাবান, স্বল্পভাষী মানুষটিকে দেখে আসছি। সঠিক সময়ে তিনি ভীড়ের ভেতর এসে দাঁড়ান, আবার সঠিক সময়েই তিনি নিরর্থ কোলাহলের মুখের ওপর শাটার নামিয়ে দেন।

'ভারসাম্য' কথাটাকে যদি ভালো অর্থে নেওয়া যায় তার অন্যতম প্রতীক আমার কাছে ঐ অনির্ভরযোগ্য চেহারার মানুষটি। সারাটা জীবন অন্ধ আবেগ, প্রবৃত্তি ও বিপুল অর্থহীনতার স্রোতে ভাসতে ভাসতে, এই বয়সে পৌঁছে, বুকের ভেতর মধ্যরাতের জলকষ্ট টের পাই। নৌকো আমাকে ছেড়ে অনেকদূর চলে যাওয়ার পর অচরিতার্থতার অন্ধকারে—তীরে দাঁড়িয়ে ভাবি—আমি কিন্তু আমার মত করে আসলে শঙ্খ ঘোষই হতে চেয়েছিলাম। আমিও তো সত্যিই তাঁর মত বলতে ও জানতে চেয়েছিলাম—

> "আমার পাপেই উলকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয়পিনাক
> সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে যাক
>
> কোন্ খেতে বা কোন্ খামারে সমবেত লোকজনেরা
> জমছে এসে শস্ত্রপাণি বলো আমায় হে সঞ্জয়"।

পাঠক, অনুগ্রহ করে ওপরের কথাগুলিকে একজন মধ্যবিত্তের আত্মবিলাস বলে গ্রহণ করবেন না। আমি তো বটেই, আমার সময়ের কবি-লেখকেরাও যদি শঙ্খ-দর্পণে নিজেদের মুখগুলো ঠিকঠাক দেখে নেওয়ার বিনম্র ধৈর্য দেখান, বোধহয় মারাত্মক কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে না।

শৈলেশ্বর ঘোষ

...

উৎক্ষিপ্ত জেব্রা ও রাত-জাগা পাখি

'ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক'—এই উক্তির মধ্য দিয়েই শঙ্খ ঘোষের হৃদয়কে, মনকে পড়ে নেয়া যায়। খুবই মানবোচিত এক আকাঙ্ক্ষা। বর্তমানকে কবি চেনেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচলিত। স্বপ্নহীন এক পৃথিবীতে আমাদের বাস, আর সময়ের সাথে সাথে সত্যকল্পনা থেকে দূরে চলে যাচ্ছি আমরা। আমাদের সময়,—'তোমার কোনো মিথ্যা নেই তোমার কোনো সত্য নেই কেবল দংশন'—এই দংশনের জ্বালায় কুঁকড়ে যায় মানুষের দীন আত্মা, আমাদের দুর্বল জীবন, কিন্তু কখনও দু'একটি আত্মা আবার জেগে ওঠে—অন্ধকারে ঘন্টাধ্বনি শুনে এগিয়ে যায় সেদিকে। কে কতটা এগোয় সেটা তার ব্যক্তিগত ইতিহাস. সে ইতিহাসে আমাদের কোন কাজ নাই। কেউ কেউ অবশ্য বলে, দাবি করে, ঐ ইতিহাসও মানুষের দরকার। সে ইতিহাস আমরা পাব যদি কবির রচনার মধ্যে ঢুকতে পারি। কবির সৃষ্টিকর্মের বাইরে তার অন্য একটা মিথ্যা পরিচয় কখনও কখনও তৈরি হয়ে যায়, মানুষ সেটাই তার প্রকৃত ইতিহাস বলে ভাবতে থাকে—আর বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় এই দুধরনের ইতিহাসের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই। শঙ্খ ঘোষ অন্য-ইতিহাস নির্ভর কবি নন, তাঁর হৃদয়, মন, বুদ্ধি সব কিছুরই নিখুঁত পরিচয় তার লেখালেখির মধ্যেই।

তাহলে কী এই কবির পরিচয়? সমাজের দৃষ্টিতে তিনি কি এক বিপজ্জনক কবি? না কি তিনি উদাসীন? তিনি কি সময়ের শবব্যবচ্ছেদ করতে চান, না কি সময়ের স্রোতে ভেসে থাকতে চান? আমার মনে হয় শঙ্খঘোষের ক্ষেত্রে বিচারের এই পদ্ধতি যদি কেউ নেন তবে ভুল করা হবে। তিনি সময়ের ইতিহাস-সচেতন কবি। সময় যত এগোচ্ছে বিশৃঙ্খলা ততই বাড়ছে, কবি অস্তিত্বের বিশৃঙ্খল টুকরোগুলো মানুষকে চিনিয়ে দিতে চান এবং তাদের শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে এনে জীবনকে নতুন একটা রূপ দিতে চান। প্রশ্ন আসে কোন কবিই কি এই কাজে সফল হয়েছেন? আমার মনে হয় প্রথম ক্ষেত্রে, মানে বিশৃঙ্খলাকে চিনিয়ে দেবার ক্ষেত্রে, অনেক কবিই সফল, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবনকে নতুন রূপ দেবার বেলায় ব্যর্থ, কারণ এক বিশৃঙ্খলায় ফিরিয়ে নেবার আগেই নতুন বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। কবির ইচ্ছা এবং উদ্যমটাই সত্য হয়ে থাকে। সমালোচকরা অনেক

রকম মার্কা ব্যবহার করে, অনেক বিশেষণ তারা খুঁজে বের করে—একটা পরিচয় পত্রিকা তৈরি করে নেয়। সেটাও কবির টোটাল স্পিরিটকে না-বুঝে ওঠার ফল।

পঞ্চাশের দশকে যে কবিদল লিখতে শুরু করেছিলেন শঙ্খ তাঁদের মধ্যে এখনও সক্রিয়। শক্তির সহজ আবেগের আবেদন বেশি দিন টেকেনি। উৎপল নিজের টানা গণ্ডিতে আটকে গেছেন, মনে হয় গণ্ডি থেকে বের হবার মন্ত্র উনি ভুলে গেছেন। সুনীলের, সম্ভবত গদ্য লিখতে লিখতে মনে পড়ে যায়, একসময় দুচারটে কবিতা লিখেছিলেন, তাই অভ্যাসবশত এখনও দু'একটা লেখেন। বিনয়কে মনে হয় ইতিহাসের নিষ্ঠুর বলি। স্বাধীনতালাভের সদ্য রোম্যান্টিকতা এবং বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা দুইয়ের যুগপৎ আঘাত নিয়ে তাঁর অস্তিত্ব চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু ঐ আঘাতের তীব্রতা বিনয় সহ্য করতে পারেননি। এঁদের প্রথম দিকের কবিতার তুলনায় শঙ্খ প্রথম দিকে সেভাবে আমাদের অনুভূতির কাছে পৌঁছাতে পারেননি। কিন্তু অন্য চারজন সময়ের সঙ্গে লড়তে না পারলেও শঙ্খ কিন্তু আজও লড়াইটা ছাড়েননি। ক্রমশ নিজেকে স্পষ্ট করেছেন এবং লেখার নিজস্ব পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছেন। আবেগের তীব্রতা তাঁর কবিতায় নেই। সমাজ চেতনার স্পষ্ট প্রকাশ আছে—জীবনের 'উথাল-পাথালে'র মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে চলেছেন তিনি। '৪৭ থেকে' ৭৭ এই তিরিশ বছর এই বাংলার জীবনে বহু ওলোটপালট ঘটে যায়। কবিতার ক্ষেত্রেও ঘটে যায় বেশ কিছু পরিবর্তন। অতি দ্রুত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে যে সব কবিদল আবির্ভূত হন, তাদের পক্ষে সময়ের নির্যাসটুকু বের করে নেয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক আবেগকে ছাপিয়ে দৃষ্টিকে দূরপ্রসারী করতে ব্যর্থ হয়েছেন এঁদের অনেকেই, তবু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জেগে আছেন মনে হয়, শঙ্খ ঘোষ সেই অল্প কয়েকজনের একজন। চরম কোন বিদ্রোহ নেই তার মধ্যে, নেই শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অতি আধুনিক কোন বিপ্লবীয়ানা—কেউ কেউ, শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি আপস করেছেন, বলেও অভিযোগ করেন, তাঁরা বলতে চান শঙ্খ সমাজের এলিট শ্রেণীর কাছে এইজন্যই বেশি গ্রহণযোগ্য। শক্তি বা উৎপলের প্রথম দিকের শব্দপ্রয়োগ আমাকেও যতটা ভাবিত করত শঙ্খর শব্দপ্রয়োগ তা করেনি। তাতে শঙ্খর কবিতার মূল্য কমে যায় না। হতে পারে, জীবনের যে ব্যক্তিগত গণ্ডিতে আমরা বেঁচে থাকি, তার বড় একটা প্রভাব ভাষা ব্যবহারের উপর পড়ে যায়। যত বড় বিপ্লবী কবিই কেউ হোক না কেন, একসময় নিজের ভাষাকেই সে উচ্ছিষ্ট করে ফেলে, কেউ তা পাতে নেয় না। যেটা থাকে তা হ'ল ভিতরের আগুন যেটা নিভে গেলেই কবির মৃত্যু। কবিতা সময়ের সারাংশ। পাঠক হিসাবে আমরা চাইব সময়ের শরীরের প্রয়োজনীয় টুকরোগুলি সেখানে থাকছে কি না এবং কবির চেতনার সাহায্যে তা আবার পুনর্গঠিত হচ্ছে কি না। পুনর্গঠনের এই কাজে শঙ্খ এখনও লিপ্ত। তাঁর

পদ্ধতিই অন্তরকম। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা সাজিয়ে তিনি পাঠককে আছাড় মারতে চান না। প্রায়শই সংক্ষিপ্ত তার বলা। দুএকটি ইশারা, তীর্যকভঙ্গিতে ছেড়ে দিয়ে সরে যান তিনি।

'আ, পৃথিবী! এখনো আমার ঘুম ভাঙেনি'—সংক্ষিপ্ত এই উক্তির মধ্যে তিনি অনেক কিছু বলেন, আমরা বুঝি এই পৃথিবী কিভাবে মানুষকে ঘুমিয়ে দেয়, আর কোন কোন মানুষ কিভাবে বাস্তবিক জেগে থেকেও নিজের সেই অতিবাস্তব ঘুম ভাঙার প্রাণপণ চেষ্টা করে যায়। কারণ কবি জানেন নিজের ঘুম ভাঙলে তবেই না পৃথিবীর ঘুম ভাঙাবার কথা ভাবা যায়। ঘুম ভাঙলেই তো দেখতে পাব জীবনের একটা অভাবিত চেহারা। যে দর্শনটাই জীবনের সার্থকতা এনে দেয়।

অল্পবয়সে এই কবির ছাত্র হিসাবে দূর থেকে তাঁকে দেখেছি। গ্রাম্যতা এবং হীনম্মন্যতাদুষ্ট ছিলাম বলে কাছে গিয়ে কথা বলার সাহস হয়নি। সত্তর-এর দশকের শুরুতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম 'হাংরি জেনারেশন'এর কাগজ - 'ক্ষুধার্তের' জন্য লেখার দাবি নিয়ে। ভয় হচ্ছিল। তখন তাঁর খুব নাম। নামী লোকদের আমার খুব ভয়। সেটা এখনও আছে। এ প্রসঙ্গের অবতারণার কারণ বলছি। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন-এর প্রতিক্রিয়ায় তখন নামী দামি কবি লেখকদের অনেকেই আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা অনুচিত বলে মনে করতেন। তাছাড়া হাংরি লেখকরা যে কিছু নয় এটাও তাঁদের প্রমাণ করার দরকার ছিল। শঙ্খ ঘোষ হাংরিদের লেখা সম্পর্কে লিখলেন, এবং লিখলেন সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করে (মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং দেবেশ রায়ও ঐ সময়ে লিখেছেন)। অন্যের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটার গুরুত্ব হয়ত তত নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা যারা আক্রমণে আক্রমণে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলাম, আমাদের কাছে এই ক'জনের কাজ ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুঃসাহসী বলে মনে হয়েছে। সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের আরও কিছু কর্ণধার 'হাংরি জেনারেশন' মামলায় পুলিশকে নিন্দা করে আমাদের সমর্থন করেছেন বটে, তবে তাদের কথা ছিল যে আমাদের লেখালেখি নিতান্ত তুচ্ছ, তবে পুলিশ যা করেছে তা অন্যায়। সুনীল গাঙ্গুলী তো হাংরি জেনারেশনের পক্ষে সাক্ষিটাক্ষি দিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন যে আমাদের লেখালেখি তৃতীয় শ্রেণীর মার্কিন সাহিত্যের নকল। এই অবস্থায় শঙ্খ ঘোষ এবং উল্লিখিত ঐ তিনজন হাংরি লেখালেখিকে গুরুত্ব দিয়েছে, সমালোচনা করেছেন। সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের মুরুব্বিদের তোয়াক্কা না-করেই তাঁরা এই কাজ করেছিলেন। সংকট মুহূর্তের সিদ্ধান্তই মানুষের চরিত্রকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে।

কবি যেমন একটার পর একটা খোলস ছাড়তে ছাড়তে নিজের মৌলিক সত্তার

কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করে তেমনি সভ্যতার মুখোশ ধরেও টান দেয়, খুলে ফেলার চেষ্টা করে মুখোশের পর মুখোশ। সভ্যতার সঙ্গে তার একটা যুদ্ধ চলছে তো অনেককাল থেকেই। অন্তত আধুনিক কবিতার জন্মকাল থেকেই। কিন্তু যুদ্ধের চেহারা হয় নানারকম। কখনও সেটা র‍্যাঁবো-লত্রেয়ঁ-এর মত হয়, আবার কখনও জীবনানন্দ দাশের মত আপাত সামাজিক একটা আবরণ মুখের উপর টেনে দিলে আজ হয়ত কবির একটা সুবিধে হয় এই যে তার নিরাবরণ মূর্তিটা বাস্তব মানুষকে আতঙ্কিত করে না। ভোগবাদী এই সভ্যতার লোভ এবং নীচতা হৃদয়কে পচা চালকুমড়োয় পরিণত করেছে—গলগও আর কুঁজে যে সব হৃদয় ফলে তাদের হিংস্র দাঁত কবিকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়, কারণ কবির আত্মা মানুষের আদিম সারল্যের আনন্দ পেতে চায়, চলতে চায় সত্য নির্দেশিত রাস্তায়। কবির বিদ্রোহ তাই আর বাইরের দিকে নয়, তার বিদ্রোহ ভিতরের দিকের। সে এখন জনারণ্যে মিশে থাকতে চায়, আফ্রিকার অরণ্য তার দরকার হয় না। আর সারল্য বিষয়ে তার এই জ্ঞান হয়েছে যে ঐ জিনিসটি তার এবং তার মত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হৃদয় ছাড়া আর কোথাও নেই। শঙ্খ ঘোষের সামাজিক মুখশ্রী কাউকে কাউকে বিভ্রান্ত করে। এমন অনেকে আছে, যারা তাঁকে ড্রয়িংরুমের বিপ্লবী বলেও মনে করে। 'আমি কবি, ভদ্রলোক নই'—এরকম ঘোষণা করার দরকার পড়ে না শঙ্খ ঘোষের। শঙ্খ ঘোষের রচনা আমাদের স্পষ্টতই বলে দেয় যে উনি প্রকৃতপক্ষে এক 'নষ্ট' আত্মা। সামাজিক মানুষ কিছুতেই 'নষ্ট' হতে চায় না। মানুষ যাকে 'ইজ্জত' ভেবে মূল্য দেয় কবি তাকে মূল্য দেয় না, কবির সে অর্থে কোন ইজ্জত থাকে না। একটি মেয়ে যখন নানা তীব্রতর চাপে 'নষ্ট হয়ে যাওয়া'র সম্ভাবনার মুখে এসে পড়ে, কাঁদে তখন সে জীবনের বহুমূল্য কিছু হারাচ্ছে এই ভেবে। তখন পর্যন্ত সে সমাজের একজন স্বাভাবিক মানবী। কিন্তু 'নষ্ট হয়ে যাওয়া' সম্পূর্ণ হলে আর সে কাঁদে না, দুঃখ এবং ক্রোধের সংমিশ্রণে নিজের অস্তিত্বের মূল সত্যের কাছে চলে আসে সে। মৃত্যু পর্যন্ত এক নিঃসঙ্গ একক আত্মার যাত্রা শুরু হয়। সমাজে থেকেও সে তখন বিচ্ছিন্ন, একক এবং অসামাজিক। আজকের কবি এবং কবিতা দুই-ই সমাজের চোখে 'নষ্ট'—কবি নষ্ট আত্মার নিঃসঙ্গ যাত্রার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে, শঙ্খ ঘোষ, আমি বিশ্বাস করি, কখনও কখনও একা ঘরে বসে 'নিঃসঙ্গ নষ্ট আত্মার' টেলিভিশন অন করে দেন, নিজেকে বলেন, 'তোমার কোন উৎস নেই···তোমার শুধু জাগরণ'। কবি তো সেই পাখি যার আর ঘরে ফেরা নাই। জীবনস্রোতের গতিপথটাই সে শুধু অনুসরণ করে চলে। 'দেওয়া-না-দেওয়ার জটিল মন নিয়ে পথ চলতে হয় আমাদের, করুণা আর পরিহাস একই সঙ্গে জমে ওঠে মনের মধ্যে, এই বিরোধী বৃত্তির মধ্য থেকেই আমাদের জানতে হয় সত্য।'—শঙ্খ ঘোষ যিনি এই কথা বলেন, তিনি জানেন,

সত্যের পথ যদি জ্ঞান হয় তবে তার জেগে ওঠা ছাড়া অন্যগতি থাকে না। একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি শঙ্খ ঘোষের অন্য কোন গতি নাই।

আর একটা কথা। আমার জীবন অভিজ্ঞতা বলে, বর্তমান সমাজসভ্যতার কাছে কবি আসলে এক ছোটলোক। আর ছোটলোকের মানসিকতা থেকে শুরু করার ফলে কবিকে শেষপর্যন্ত হয়ে উঠতে হয় আক্রমণাত্মক। উচ্চবর্ণের সাংস্কৃতিক ভোজে, 'তাদের পক্ষে' কিছু 'অখাদ্য' পরিবেশন করার কথা ভাবে কবি। এখানেই একটা ভুল হয়ে যায় আমার। এখন বুঝতে পারি এটা কবি মাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী অবস্থা নয়, হতেও পারে না। এটা আমারই মানসিক অবস্থা। অন্য কবিদের মধ্যে এই মানসিকতার বিস্তার ঘটলে আমার ভাল লাগত বলেই ঐ সাধারণীকরণের কথা মনে হয়েছিল।

কারও কারও এই সুবিধা হয়ে যায় যে শ্রেণীবিভক্ত জীবনে থেকেও নিজেকে তিনি শ্রেণীর উর্ধ্বে নিয়ে, সকল শ্রেণীর কাছে সমান গ্রাহ্য হয়ে যান। শঙ্খর ক্ষেত্রেও এই সুবিধাটা আছে বলে মনে হয়। সকলের কাছে (বেশির ভাগের কাছে অন্তত) গ্রহণযোগ্যতাই তাঁর সাফল্য। এ সাফল্যকে ঈর্ষাযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ তিনি অনেকের হয়েও জীবনের অসংগতি এবং ভণ্ডামির সমালোচনা করে চলেছেন।

বিগত ত্রিশ বছরে বাংলা কবিতার একটা বড় অংশ ব্যাপকভাবে গোলমেলে, উচ্চকণ্ঠ এবং প্রতিবাদী চরিত্র নিয়ে ফেলেছে। বুদ্ধি আর হৃদয়ের সংমিশ্রণের শতকরা হিসাবের পর্ব পার হয়ে বাংলা কবিতার একটা অংশ মানুষের মনের অন্ধকার এলাকায় ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক তির্যক এবং অনেকটা কাছের। সমাজ, নীতি আর আদর্শের চাঁকনিতে চাঁকলেই জীবনের শুদ্ধতাটুকু পাওয়া যাবে না, হয়ত পাওয়া যাবে একই সঙ্গে আলো এবং অন্ধকার দুটো পথেরই সমান অভিজ্ঞতার মূল্যে। শঙ্খ উচ্চকণ্ঠ নন কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ আছে। গুলি করে হত্যা করে একজন তার প্রতিবাদ প্রকাশ করতে পারে, আবার হাতের লাঠির ছোট্ট একটা ঘা দিয়েও প্রতিবাদ প্রকাশ করতে পারে। কে কোন পদ্ধতি নিল, তাতে যায় আসে না কিছু। শঙ্খ কোমলভাষী, আর কোমলরা মানুষের আত্মারই এক অবস্থা। যন্ত্রণাপথের অভিজ্ঞতাই মানুষকে এই নম্রতা দান করে।

'সত্য জীবনে পৌঁছবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে রেখেছে আমাদের প্রতিষ্ঠান। সব দরজা বন্ধ। ...কেউ জানেনা যে পরম্পরায় কতগুলি দরজা খুলবার পর দেখা যাবে সম্পূর্ণ আলো।'—প্রতিষ্ঠান বিষয়ে তাঁর এই উক্তিই কি তাঁর সচেতনতাকে বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? প্রতিষ্ঠানের চরিত্র না বুঝেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী হওয়ার একটা ফ্যাশন আজকাল দেখা যাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হয়না যে এর মধ্যে লুকিয়ে

আছে সুবিধাবাদ। আবার একদিনের তীব্র প্রতিষ্ঠানবিরোধী আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এসেছে, আত্মপ্রতিষ্ঠানের কবলে পড়ে। বিপ্লবী দলের মধ্যেই যেমন লুকিয়ে থাকে বুর্জোয়াবীজের ধারকরা, একদিন বিপ্লবের গতিকে খতম করে তারাই, তেমনি ঘোর বিপ্লবীর রক্তের মধ্যেও বুর্জোয়া মূল্যবোধের বীজাণু কাজ করতে পারে। জীবনপ্রতিষ্ঠানের থাবা কাকে কখন কিভাবে মারবে, সেটাই সবচেয়ে ভয়ংকর অজানা। আমরা সচেতন মানুষের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী দুই সত্তার রক্তাক্ত যুদ্ধটা দেখতে পাই। সে কখনও হারে কখনও জেতে। পরিণাম কি হবে তা জানা যায় না। যুদ্ধটা থেমে গেলেই সময় তাকে ছুঁড়ে ফেলে। যে লোক ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হয়ে উঠতে পারে, সে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেই প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করার বিপজ্জনক কাজ করে। এক একটা দরজা খোলা মাত্রই একটু একটু আলো এসে পড়ে আমাদের চেতনারাজ্যে। এর চেয়ে বড় লাভ আর কি হতে পারে! যে বিপ্লবী সমাজ প্রতিষ্ঠানকে ভাঙার জন্য জঙ্গলে গিয়ে লড়াই করতে চায় সে হয়ত প্রতিষ্ঠানকে ভয় দেখায় বেশি, কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হবার বড় ভয় থেকে যায়। তার সমস্ত প্রচেষ্টা মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে। শঙ্খ মৃদুভাষী বলেই হয়ত জীবনপ্রতিষ্ঠানের উপর তাঁর আক্রমণের মাত্রাগুলি কেউ কেউ ধরতে পারেন না। কবিকে বোঝার দায় তো আমাদের, পাঠকদের।

শঙ্খ ঘোষ প্রতিষ্ঠানকে বর্জন করেননি, কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সচেতন। প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের ক্ষতিকর প্রভাব কতটা তা তাঁর অজানা নয়। আগেই বলেছি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজের সত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কবিকেও মুখের উপর একটা আবরণ দিয়ে নিতে হয়। শঙ্খ ঘোষেরও এরকম একটা আবরণ আছে। যে আবরণ সমাজ-প্রতিষ্ঠানের কাছে বিপজ্জনক মনে হয় না। প্রতিষ্ঠান তাকে পুরস্কৃত করে। তাঁর শব্দব্যবহারের নির্মলতাই তাঁর ছদ্মবেশ। তার মুখশ্রীর আপাত অক্ষত কোষগুলি দেখে প্রতিষ্ঠান তাঁকে তাদের মূল্যমানে সুস্থ বলে ঘোষণা করে, এবং কর্কটদুষ্টদের সামনে ঘোষণা করে শঙ্খ ঘোষের কোন অসুখ নাই। কিন্তু আমরা জানি শঙ্খ ঘোষের অসুখ আছে এবং সে অসুখ সারবে না।

আমরা জীবনের যে অঞ্চলে বাস করি সেখানকার আবহমণ্ডলের ওজোন স্তরে ফুটো দেখা দিয়েছে, তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে পুড়তে শুরু করেছে আত্মার কোষগুলি, কিন্তু জীবনের যে অঞ্চলে শঙ্খ ঘোষের বাস হয়ত সেখানকার আবহমণ্ডলের ওজোন স্তর এখনো পুরোপুরি বিপর্যস্ত নয়। কিন্তু তাঁর আবহমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে যে ওলোটপালট শুরু হয়েছে, সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। শঙ্খ ঘোষ ক্রুদ্ধ প্রতিবাদী কবি নন যে তার সম্পর্কে এই প্রস্তাব নেয়া যাবে—এক-দিনের ক্রুদ্ধ কবি আজ পুরস্কার-কলঙ্ক গলায় পরে নিচ্ছেন।

আধুনিক এবং আধুনিকোত্তর (যদি এভাবে বলা যায়) বাংলা কবিতা সম্পর্কে আমাদের এই বিনীত অহংকার কাজ করে যে বাংলা কবিতা এখন নিজের পথ নিজেই কেটে এগিয়ে চলেছে। বাংলার কবিচেতনা বিশ্বকবিচেতনাকে আজ ধারণ করতে সক্ষম। বিশ্বকবিতা আন্দোলনের অতি আধুনিক একটা স্তর বাংলা কবিতা আন্দোলনে গত ৪০ বছরে ধরা পড়েছে বলে আমার ধারণা। একথাটাও সবাই জানেন যে কবিতা লেখা ব্যক্তিগত কাজ হলেও—কয়েকজন কবির কাজের ফলস্বরূপ চিন্তাভাবনা বিশ্বাস ও কল্পনার জগতে আলোড়ন হয়; এটাকেই আমি আন্দোলন বলতে চাই। শঙ্খ ঘোষ এই কয়েকজন কবির একজন। অস্তিত্বের গভীর সংকটের চেতনা থেকেই আধুনিক কবিতার জন্ম। জীবনানন্দ ঘোষণা করলেন পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ এখন—এই ঘোষণার পরেই কেউ কেউ ছুরি হাতে চলে গেল অপারেশন থিয়েটারে, অসুস্থ শরীরটাকে কাটাছেঁড়া করে দেখবে অসুখের মূলটা কোথায়—আবার কারও মধ্যে দেখা গেল বেদনার নীরব কান্না। কেউ উৎক্ষিপ্ত জেব্রা, আবার কেউ রাতজাগা পাখি। স্পষ্ট দেখতে পাই আমাদের মত উৎক্ষিপ্ত জেব্রার দল প্রান্তর ভেদ করে যখন ছুটে চলে যাবে তখন রাতজাগা-পাখি শঙ্খ ঘোষ, প্রান্তরের কোন কাঁটাঝোপের আড়ালে বসে গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে দুচারটি জ্ঞানের শব্দ উচ্চারণ করতে থাকবেন!

অভীক মজুমদার

...

ক্লাসঘরে সমুদ্রের 'শঙ্খ'

'...Concerning whom I may truly say, that of all men of his time whom I have known, he was the wisest and justest and best.'

—Phaedo

১

আমরা যখন ভর্তি হলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৭ সালে, তখন আমাদের বাংলা বিভাগের দক্ষিণদিকের শেষ ঘরটিতে অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট একটি চেয়ার খালি পড়ে থাকত, যদিও অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের জল্পনার কোনো অন্ত ছিল না। ঘরের বাইরে কাঠের ফলকে লেখা—চিত্তপ্রিয় ঘোষ, অনেক নিভৃত বিকেলে সবার অলক্ষ্যে ছুঁয়ে এসেছি সেই অক্ষর—এতটাই উদ্গ্রীব প্রতীক্ষা ছিল আমাদের। ব্যক্তিগত পঠন অভিজ্ঞতাজাত একটা ভালোবাসা ছিল এর মূলে—কৈশোরক ছেলেবেলার প্রিয় লেখক হিশেবে কাল্পনিক সংযোগসূত্রটা অদূর ভবিষ্যতে ঘনিষ্ঠতর হবে, এই স্বপ্নে শঙ্খ ঘোষ বিষয়ে আলাদা একটা আকর্ষণ সে সময় বহন করতাম, মনে মনে। গোপন একটা আশঙ্কাও যে কখনো-সখনো হতো না, এমন নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নম্বর-কেন্দ্রিক ইঁদুরদৌড় এবং আনুষঙ্গিক তত্ত্ব-তথ্য-বিশ্লেষণ-বিচারের তুল্যমূল্য আঁতাকলে শেষপর্যন্ত স্বপ্নটা ভেঙেচুরে যাবে না তো, ক্লাসঘর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে পড়ে, তেমন 'মনখারাপের গর্তে' রূপান্তরিত হবে না তো? এই দোলাচলটুকু বুকে নিয়ে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা—আর এভাবেই একসময় বিভাগে ফিরে এলেন শঙ্খ ঘোষ। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ বাংলা বিভাগে ছাত্র হিসেবে তাঁকে পেয়েছি; মধ্যে মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ সমেত। সিলেবাস মিলিয়ে দেখলে তাঁর কাছে পড়েছি ক্লাসে আংশিক 'আধুনিক বাংলা কবিতা' [স্নাতক স্তরে], আর স্নাতকোত্তর স্তরে নাটক রক্তকরবী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সংবর্ত, মাঝে মধ্যে তাঁর অনুমতিক্রমে ঢুকে পড়েছি বিশেষ পত্র 'রবীন্দ্রনাথ'-এর ক্লাসেও। কিন্তু সিলেবাস দিয়ে আমাদের প্রাপ্তির ভাণ্ডারকে অনুমান করা যাবে না। ১৯৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি যখন প্রায় স্বেচ্ছা-অবসর নিলেন শঙ্খবাবু, তখন বুঝেছিলাম, কেবল আমাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠনের জগতে একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল, যার সমকক্ষ কোনো পরিচ্ছেদও সৃষ্টি

হওয়া শক্ত। কেননা, শ্রীশঙ্খ ঘোষ নামক অধ্যাপকের ক্লাসে আমরা বাংলা সাহিত্য পড়ার পদ্ধতি শিখিনি কেবল, শিখেছি সাহিত্যকে ভালোবাসতে, জীবন-জগৎ সম্পর্কে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে, একটা নিজস্ব মুদ্রায় স্বস্থ সামগ্রিকতাকে, গড়ে তুলতে আর উপলব্ধি করতে, সর্বোপরি বুঝতে পেরেছি শিক্ষক কেমন মানুষ হন, শিক্ষক কেমন মানুষ হওয়ার কথা। ঝোঁকের মাথায় বাক্যটা লিখে ফেলে অবশ্য এবার একটু সন্দেহ-ই হচ্ছে। বলা ভালো, তাঁর ক্লাস-পড়ানোর চালচিত্রে উক্ত উপাদানগুলো যে সমভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সকলের সামনেই, এটুকু ভালো বুঝেছি —'বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি' অথবা 'স্বস্থ সামগ্রিকতা' 'উপলব্ধি' কতটা করতে পেরেছি বা জীবনযাপনে প্রয়োগ করতে পেরেছি সেটা বিচার করলে আমাদের অক্ষম ব্যর্থতাই বড়ো হয়ে উঠবে—তবে আমাদের এই মাস্টারমশাই তাঁর চেষ্টায় অকৃপণ, অক্লান্ত ছিলেন, কোনো ক্ষেত্রেই তার ব্যত্যয় দেখিনি—আমাদের গ্রহণ করার তারতম্য তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি, তিনি চেষ্টা করে গেছেন সবসময়—আমাদের বিচ্যুতির দায়, ক্ষুদ্রতাচর্চার দায়—একান্ত আমাদেরই।

২

ব্যক্তিগত ক্ষমতা-অক্ষমতার বিচার থেকে সরে দাঁড়ানো আত্মরক্ষণের স্বার্থেই প্রয়োজন, অন্তত এক্ষেত্রে। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?' বরং শঙ্খ ঘোষের পড়ানোর ধরণ বা পদ্ধতির নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ উপস্থাপনা করা নিরাপদ। তাঁর ক্লাস-পড়ানোর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে এসেছে, সেই বিশেষত্ব বিষয়ে একে-একে আলোচনা করে আমরা বিবরণে প্রবেশ করব। বৈশিষ্ট্যগুলি এজন্যই আলাদা করে উল্লেখ করব যে, এই স্বভাবজ আচরণগুলির পৌনঃপুনিকতায় বোধহয় শঙ্খবাবু আমাদের কিছু শেখাতে চেয়েছিলেন—

(১) শ্রীশঙ্খ ঘোষ ক্লাসে আসতেন ঠিক সময়ে। প্রবল শারীরিক অসুস্থতা ছাড়া অনুপস্থিত হতে দেখিনি।

(২) শঙ্খবাবু ক্লাসে আসতেন পূর্ব-পরিকল্পনাকে মাথায় রেখে। গতদিনের স্বাভাবিক সংযোগে নতুন বিষয় শুরু হতো—ফলে পারম্পর্য এবং পরবর্তী প্রসঙ্গ উত্থাপনে সমন্বয়-সূত্র একটা ভেতরে ভেতরে থাকত। প্রত্যেকদিনের আলোচনা প্রকৃতপক্ষে একটি কেন্দ্রীয় বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হতো এবং শেষের ঘণ্টা পড়ার মিনিট কয়েক আগে সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তাকার অবয়ব নিত। প্রসঙ্গটি শেষ করে, সামান্য থেমে, পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরেই শঙ্খবাবু তুলতেন নতুন একটি সমস্যা বা বিষয়ের প্রশ্ন, তারপর, ক্লাস শেষ হতো পরের দিন সেই বিষয়ালোচনার প্রতিশ্রুতিতে। ফলে এক বৃত্ত থেকে সাবলীল ভঙ্গিতে অন্য বৃত্ততে সরে যাওয়ার স্রোতস্বল প্রবাহে আমরাও শরিক হয়ে যেতাম খুব সহজে।

(৩) শঙ্খবাবু ক্লাসে আসতেন কেবল পূর্ব-পরিকল্পনা নিয়েই নয়, তথ্যসমৃদ্ধ হয়েও। আমাদের মতো অর্বাচীনদের প্রয়োজনীয় কোনো চিঠি বা আনুষঙ্গিক সমালোচনার অংশ বা কোনো সাহিত্যতত্ত্বের উল্লেখ যত্ন করে লিখিয়ে দিতেন। তাঁর মতো ডাকসাইটে পণ্ডিতও, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেবার প্রতিভায় নির্ভর করে ক্লাসে ঢুকতেন না। তিনি যে কতখানি নিষ্ঠা নিয়ে আমাদের তরলমতি মস্তিষ্কে কিছু মূল্যবান প্রসঙ্গ বোঝাবার চেষ্টায় সতত সক্রিয় সেটা অন্তত সকলেই বুঝতাম।

(৪) আর তৎসত্ত্বেও কিংবা হয়তো সেজন্যই আমাদের যেখানটা বুঝতে একবারে সমস্যা হতো, অকপটে প্রশ্ন করতাম, কেননা তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেবার ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের কাছেই দায়বদ্ধ। এইসব প্রশ্ন সবসময় খুব বুদ্ধিদীপ্ত বা আশাপ্রদ (অন্তত মাস্টারমশাইয়ের কাছে) হতো না, কিন্তু তাঁকে কখনো হতাশ বা ক্রুদ্ধ হতে দেখিনি। ক্লাসেই আবার একই ধৈর্য নিয়ে আরও একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বলতেন অথবা ঘরে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। সেখানেও যথেষ্ট মনোযোগ এবং গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে চাইতেন অনেক ভোঁতা, হাবিজাবি প্রশ্ন [পরে নিজের ক্ষেত্রে বুঝেছি। এখন সেসব নিয়ে বেশ আফসোস হয়।] এবং উত্তর দিতেন অক্লান্ত প্রীতি নিয়ে।

(৫) 'রক্তকরবী' পড়ার সময়, দশটা মতো ক্লাস হবার পর ক্লাসে আমাদের লিখে আনতে বললেন সদ্যসমাপ্ত আলোচনাভিত্তিক একটি নিবন্ধ—'রবীন্দ্রনাটকের বিবিধ পর্ব এবং আবয়বিক রূপান্তর।' আমাদের বোঝাটা কতদূর হয়েছে এবং সমস্যা কোথায়, সে বিষয়ে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকের উত্তরের ভিত্তিতে আলোচনা করলেন। তাঁর ঘরে একে একে ঢুকে নিজেদের বিদ্যেবুদ্ধির প্রগাঢ় পরিচয় (!) দিতে হচ্ছিল। বাড়ি থেকে প্রতিটি উত্তরপত্র খুঁটিয়ে দেখে পাশে পাশে মন্তব্য বা প্রশ্নচিহ্ন দেওয়া। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। যেগুলো মনে হতো জানি, সেগুলোর মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আর ফাঁকি ছিল, সেসবের শুশ্রূষা হতে পারল ঐ মুখোমুখি সংলাপে।

তবে, সেদিন, স্বীকার করা ভালো, তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে স্বগতোক্তির ঢঙে একটা প্রশ্ন মাথায় লাফালাফি করছিল—'মানুষটি এত সময় পান কখন?' প্রশ্নটা মাঝে মাঝেই ফিরে আসত, যখন 'রবীন্দ্রনাথ' বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রীদের ঠিক এরকম 'বাড়ির কাজ' এবং তার প্রেক্ষিতে আলোচনার অধিবেশনে ব্যস্ত-গম্ভীর থাকতে দেখতাম বিভাগের করিডোরে।

(৬) বোঝানোর ক্ষেত্রে যেসব উদাহরণ বা ব্যাখ্যা চলে আসত সেগুলি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যের পরিচিত অনুষঙ্গ। আমাদের চেনা-জানা জগৎ থেকে শুরু হতো বলেই কখনো 'পড়াশুনো' করছি বা 'সাহিত্য' পড়ছি এমন মনে

হতো না। বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সাহিত্যকে জীবনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হতো তাঁর ক্লাসে। সঙ্গে থাকতো সরস মন্তব্য, মজার অভিজ্ঞতা আর আকর্ষণীয় অনুষঙ্গের উপস্থিতি। একটা উদাহরণ প্রসঙ্গত উল্লেখ করি। 'রক্তকরবী' পড়াতে পড়াতে আলোচনা স্বভাবতই গড়িয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপের দিকে। অনেক পণ্ডিতের মতেই নাকি রবীন্দ্রনাটকের সংলাপ বহুলাংশে কৃত্রিম, আলংকারিক কাব্যিকতায় জীবন থেকে বহুদূরে সরিয়ে দেওয়া। সে সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ একটি গল্পের অবতারণা করলেন। গল্পটি তাঁর এক অভিজ্ঞতার। খুব শীতে কাকভোরে উঠেছেন প্রথম ট্রামে, শুনতে পেলেন দুই কণ্ডাক্টরের সংলাপ। বোঝা যায় দুজনেই উচ্চাঙ্গ সংগীত-রসিক। ধ্রুপদী সংগীতের কোনো একটি অনুষ্ঠান ছিল আগের দিন সারারাত, কথা হচ্ছিল সেই নিয়ে। একজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন গান শুনতে। দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করলেন, 'কেমন শুনলি গান?' প্রথমজন তাঁর অভিজ্ঞতার অকপট বিবরণ দিলেন, 'শুনলাম তো ভালই, কিন্তু টিকিট পাইনি, তাই বাইরে মাঠে বসে শুনতে হলো। যা শীত, দাঁতে দাঁতে একেবারে দাদ্‌রা বাজিয়ে দিচ্ছিল।' সংগীত-রসিক সেই সাধারণ কণ্ডাক্টরও সংলাপে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিয়েছিল কথোপকথনের অলংকারে। ফলে, বাইরে থেকে দেখলে 'দাঁতে দাঁতে একেবারে দাদ্‌রা' বাজার বর্ণনা মনে হতে পারে আরোপিত, কৃত্রিম, কিন্তু বাস্তব প্রমাণ তার বিরুদ্ধে যায়। ফলে কথনে অলংকারে আমরা স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যে প্রায়শই প্রয়োগ করি। দেখা প্রয়োজন, সেই অলংকার অভিজ্ঞতার শিকড় ধরে এসেছে কি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্রের সংলাপে বাস্তব প্রেক্ষিত ভুলে যাননি। 'রক্তকরবী'-র প্রেক্ষিতে শঙ্খবাবু দেখিয়েছিলেন কীভাবে এবং কেন রাজা-নন্দিনী-অধ্যাপকের সংলাপের অলংকার আর চন্দ্রা-ফাগুলালের সংলাপে অলংকার ভিন্ন হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সচেতন সংলাপ রচনার জোর স্পষ্ট হয়েছিল এভাবেই আমাদের কাছে, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার চেনা কাহিনী-সূত্রের নির্ভরে।

(৭) শঙ্খ ঘোষের ক্লাসে আরো তিনটি বিষয় বেশ লক্ষণীয়। প্রথমত ক্লাসে ঢুকেই তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে দরজা বন্ধ করে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কেন এমন করেন, এটা প্রশ্ন করলে সহাস্যে বলতেন যে, ক্লাসে ভুলভাল কতকিছু তিনি শেখাচ্ছেন আমাদের, সেসব বাইরে গেলে খুবই মুশকিল। দ্বিতীয়ত বোর্ডে কোনো কিছু লিখে কদাপি না-মুছে যেতেন না। ডাস্টার না থাকলে ক্লাস শেষে ডাস্টার এনে মুছে দিয়ে যেতেন বোর্ড। তৃতীয় বিষয়টি আমরা অনেকেই ব্যক্তিগত-ভাবে সমর্থন করি না। কিন্তু ছাত্র হিসেবে দিনের পর দিন কখনো রেগে রেগে (অবশ্যই মনে মনে) বা কিঞ্চিৎ গম্ভীর বিষাদে হজম করেছি। বিষয়টি লেখক বা প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কিত। যে বিষয়টি তিনি ক্লাসে পড়াচ্ছেন সে বিষয়ে তাঁর

লেখাই থাকুক বা প্রবন্ধ-গ্রন্থই থাকুক, কখনো, কোনো মুহূর্তেও সেকথা উচ্চারণ করতেন না। প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ বিষয়ে তাঁর এই ঔদাস্যের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। 'রক্তকরবী' পড়াতে গিয়ে শ্রীশম্ভু মিত্র লিখিত 'নাটক 'রক্তকরবী'' বইটি মন দিয়ে পড়তে বলেছিলেন আরও দু-একটি বইয়ের সঙ্গে। কিন্তু 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' নামে যে কোনো বই প্রকাশিত হয়েছে আদৌ, একথা তাঁর জানা আছে মনে হতো না। একই কথা বলা যায় সুধীন্দ্রনাথের ক্লাস সম্পর্কে। 'ছন্দের বারান্দা' বইটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলে বোধহয় বলতেন যে, ছন্দ বিষয়ে এমন কোনো বই তিনি পড়েননি।

(৮) শঙ্খ ঘোষের ক্লাস মানে আমাদের কাছে ছিল অসম্ভব খুশির একটা ঘটনা। যে ক্লাসে আদৌ শুকনো পণ্ডিতি হতো না কক্ষনো, যে ক্লাসে আমরা খোলামেলা সহজ আনন্দে সাহিত্য নিয়ে ভাবতে শিখতাম। আমাদের দুটি সুখস্মৃতি আমৃত্যু স্মরণে থাকবে। প্রথমটি সমবেত আইসক্রিম ভক্ষণ (হ্যাঁ, ক্লাসে বসে বসে, স্যারের প্রশ্রয়ে ও উদ্‌যোগে এবং আমাদের পঞ্চাশজনের নাছোড় অনুরোধে), আর দ্বিতীয়টি রক্তকরবীর শেষ ক্লাসের দিন। 'রক্তকরবী' পড়ানো শেষ হতেই নাটকীয় ভঙ্গিতে দরজা খুলে ক্লাসে ঢুকলেন আমাদের আর এক অধ্যাপিকা শর্মিলা বসুদত্ত। তাঁর পাশের বাড়ির গাছ থেকে কয়েক থোকা রক্তকরবী এনে রেখে গেলেন শঙ্খবাবুর টেবিলে, উভয়ের বাক্যবিনিময়ে বুঝলাম এ ব্যাপারটা আগেই ঠিক করা হয়েছিল। আমরা যারা কলকাতার অ্যাসফল্ট-পালিত তারা প্রথম দেখলাম কাছ থেকে রক্তকরবী, পেলাম প্রত্যেকে একটা করে। মেয়েরা চুলে লাগিয়ে নিল সেই ফুল (ছেলেদের তো সে সুযোগ নেই ; ফলে বুকপকেটই ভরসা), আর সারাদিন রক্তিম আভায় ঝলমল করতে থাকল বিভাগ—কারো কারো মনে হয়েছিল অচলায়তনের নিষিদ্ধ, বিধিনিয়মের তালাবন্ধ জানলা এভাবেও খুলে দেওয়া যায়—অন্তত আজও আছেন তেমন ক্ষমতাবান গুরু।

শেষ প্রসঙ্গটা একটু ভিন্ন। সে বিষয়ে বলতে গেলে সামান্য সমালোচনার রেশ হয়তো গলার সুরে মিশে যাবে। সেটি আমাদের প্রতি আমাদের মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্রয়। যেমন ধরা যাক একদিনের ঘটনা। শঙ্খবাবুর গলার অবস্থা সেদিন শোচনীয়। কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, একটু স্বর উচ্চারণ করলেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি যন্ত্রণায় ভরে উঠছেন। এমতাবস্থায় কোনো একটি শ্রেণীর ছাত্র তার একটি পড়াশুনোর সমস্যার কথা জানাল ক্লাস শেষ হতেই। শঙ্খবাবু গলার ঐ অবস্থাতেই ক্লাস নিয়েছেন শেষ অবধি (কেন কে জানে ! কুড়ি মিনিট আগে ক্লাস শেষ করে দিলে কি কোনো অপরাধ হবে ?) তারপর ঐ ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে গেলেন এবং বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সকলের বকুনি অগ্রাহ্য করে

প্রায় দু-ঘণ্টা আলোচনা করলেন তার সমস্যা নিয়ে। কোনোদিন হয়তো করিডোরে মাথা ঘুরে গেল, চারদিক সন্তর্পণে দেখে নিয়ে অসাধারণ লুকোলেন অসুস্থতা এবং ঢুকে গেলেন ক্লাসে—যেন কিছুই হয়নি। কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই কোনো ছাত্র ছাত্রীকে তাঁর কাছে সমস্যা নিয়ে হাজির হয়ে ফিরে আসতে হয়নি; দুর্ব্যবহার পাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। সর্বদা স্নেহশীল প্রশ্রয়ে ছায়া দিয়েছেন আমাদের। আমাদের সৌজন্য, শিষ্টতা, শিক্ষকসুলভ ব্যবহার শেখানোর জন্যই হয়তো এতটা অতিরেকে পৌঁছেছিল তাঁর কর্তব্যচর্চা। 'নিজের শরীরে ব্যস্ত কোর না লোককে' প্রতিদিন অভ্যাস করতে দেখেছি তাঁকে। ফলে, প্রায়শই উদ্বিগ্ন থাকতাম, এই অত্যাচারে হয়তো গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়বেন হঠাৎ। দু-একবার তেমন আশঙ্কা সত্যও হয়েছিল, তবে তাতে ব্যবহারের বা স্বভাবের হেরফের কিছুমাত্র হয়নি। তাঁর এবম্বিধ আচরণের কথা মনে রেখেই, বোধহয়, মাস্টারমশাইদের নাম দেওয়ার 'মহামারী'-তে আক্রান্ত যাদবপুরে শঙ্খবাবু গোপনে উল্লিখিত হতেন 'ভদ্র বড়ো, স্বাভাবিক নয়' হিসেবে।

৩

এই লেখার পাঠকের কি এমন কোনো দুশ্চিন্তা হচ্ছে যে শঙ্খ ঘোষের ক্লাসে কেবল বড়ো বড়ো নাম লোফালুফি আর হাল্কা চুটিচর্চাই হয়েছিল কেবল? যদি মনে হয় তেমন, সে দোষ আমাদের, কেননা পরীক্ষার সময় বেশ অবাক হয়ে লক্ষ করেছিলাম যে সিলেবাস বস্তুটির দিকে আমাদের মাস্টারমশাইয়ের কী স্থেনদৃষ্টি ছিল। তাঁর পড়ানোর কেন্দ্রে ছিলো সিলেবাস, সেটা মুখ্য হয়ে নোটচর্চার পূর্ণগ্রাসে বিলীন হয়নি যেমন, তেমনই উপেক্ষণীয় বিস্মৃতিতেও হারিয়ে যায়নি। তাঁর কাছে যে বইগুলি পড়েছি, প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি তথ্য, প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব সবই কখন যেন মাথায় ঢুকে গেছে—'সাধনা বক্তৃতামালা'র সাল কিংবা রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণের অনুপুঙ্খ তথ্যের জন্য আর বইটই ঘাঁটতে হচ্ছে না, নথিপত্র বা বিদেশি বইয়ের জন্য হা-পিত্যেশ করতে হচ্ছে না নাটকে এক্সপ্রেশনিজম অথবা স্থান-কালের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে, 'সংবর্ত' রচনার সময় পৃথিবীজুড়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কীভাবে চলছিল বা সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত সংস্কৃত-গ্রিক-অনুষঙ্গ বিশ্লেষণের উত্তর দিতেও জড়তা লাগত না। আমরা যেন কোনো ইন্দ্রজালের প্রভাবে এসব বিষয়ে অজান্তেই বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম।

শঙ্খ ঘোষের অসাধারণ শিক্ষকতার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নির্ভর ছিল তাঁর সহজ করে বোঝাবার ক্ষমতা। যে কোনো বিষয়কে স্বচ্ছ সাবলীলতায় বুঝিয়ে দিতে পারতেন, অকারণ পণ্ডিতপ্রবণতা বা জটিল করে তুলে খেই হারানো কোনোটিই তাঁর ধাতে ছিলো না। একেবারে মূল (basic) থেকে ধরে পরিষ্কার যুক্তির

সোপানে এগোতেন, অপরিষ্কার আপ্তবাক্যে কখনো পাশ কাটিয়ে যেতে দেখিনি।*

স্নাতক স্তরে এবং স্নাতকোত্তর স্তরে তাঁর পড়ানোর একটা গূঢ় পার্থক্যও ছিল। স্নাতকস্তরে আধুনিক কবিতা পড়ানোর সময় তিনি জোর দিতেন text-এর ওপর। স্নাতকোত্তর স্তরে প্রেক্ষিতটা ছিলো সামগ্রিক কাব্যকৃতির বৃহত্তর বিন্যাস। অর্থাৎ স্নাতকস্তরে আমরা পড়েছিলাম, বলা চলে, 'বোধ' এবং 'আট-বছর আগের একদিন' কবিতার প্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য, স্নাতকোত্তর ক্লাসে পড়লাম সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমগ্র কাব্যদর্শন এবং কাব্যচর্চার প্রেক্ষিতে 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি।

শঙ্খ ঘোষের অননুকরণীয় ক্লাস পড়ানোর অনুপুঙ্খ বিম্বিত করার সামর্থ্য বা স্পর্ধা আমাদের নেই, ক্লাসে দেওয়া তাঁর দুটি প্রয়োজনীয় তথ্যমূলক সারণী বেছে নিয়ে হুবহু উদ্ধৃত করছি, যদি এভাবে তাঁর পড়ানোর চমকপ্রদ অনন্যতাকে কিছুটাও বন্ধনে ধরা যায়—

(ক) প্রথম সারণীটি পাওয়া 'সংবর্ত' ক্লাসে। সুধীন্দ্রনাথ তথা বাংলা কবিতার আধুনিকতাকে বিশ্বপ্রেক্ষিতের ইতিহাসসূত্রে বুঝে নেবার ক্ষেত্রে—(পরের পাতায় সারণী—১ দ্রষ্টব্য।)

সারণীটি দেখলে একথা বুঝতে পারা যাবে একপলকেই, যে একেবারে বাঁ দিকে দুটি দশককে ভেঙে নিয়ে তার প্রেক্ষিতে স্বদেশী এবং বিদেশী কবিদের জন্মসাল অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। বেশ অবাক লেগেছিল পাশাপাশি এঁদের এমন উপস্থাপনায়, যেমন এ তথ্য আমাদের চমকিত করেছিল যে এলিয়ট আর মোহিতলাল জন্মেছেন একই সালে—1888 খ্রিস্টাব্দে!

---

* যেমন মনে পড়ে, 'রক্তকরবী' পড়ানো শুরু করার দিন আমাদের তিনি বলেছিলেন, 'রূপক', 'প্রতীক', 'সংকেত', 'তত্ত্ব'—এইসব বাদ দিয়ে 'রক্তকরবী' নাটকের গল্পটা কেবল শোনাতে। আমাদের প্রথমে মনে হয়েছিল এ একেবারে অসম্ভব প্রস্তাব। কিন্তু, বলতে গিয়ে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করতে থাকি, ঐসব পরিভাষা আর 'জ্ঞান'শিক্ষের মাথাটা পুরো জমাট হয়ে আছে, নন্দিনী যে একজন মেয়ে আর রাজা-যে একেবারে কর্তৃত্বময় শাসকই একজন, এটা কিছুতেই ভাবতে পারছি না। পরে শঙ্খবাবু নিজেই উদ্ধার করলেন আমাদের সে-যাত্রা, তবৈবচ, জটলাগা, চিন্তার জাল থেকে, আর তারপর ক্লাসে শেখালেন ধীরে ধীরে যে তত্ত্ব-রূপকের বেড়াজালে জীবন থেকে রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর নাটকের বক্তব্যকে দূরে রাখাটা কত অন্যায়, কত ভুল। সহজ বলেই যে তার জোর বেশি, জীবনের সঙ্গে যুক্ত বলেই যে তার মূল্য অসামান্য।

সারণী—১

1820-50	মধুসূদন$_{২৪}$ বিহারীলাল$_{৩৫}$	Baudelaire$_{21}$ Mallarmé$_{৪২}$ Verlaine$_{44}$	Whitmah$_{1৯}$ Dickens$_{১০}$ Hopkins$_{44}$
1850-70	রবীন্দ্রনাথ$_{61}$ দ্বিজেন্দ্রলাল$_{৬৩}$	Rimbaud$_{54}$ Laforgue$_{৬০}$ Claudel$_{৬7}$	Yeats$_{৬৫}$
1870-90	সত্যেন্দ্রনাথ$_{৮২}$ যতীন্দ্রনাথ$_{৮৪}$ মোহিতলাল$_{৮৮}$	Vrle´ry$_{৭1}$ Apollinaire$_{৮০}$ St. John Perse$_{৮7}$	Walter de la Mare$_{71}$ Williams$_{৮৩}$ Frost$_{74}$ Pound$_{৮৫}$ Eliot$_{৮৮}$
1890-1810	নজরুল$_{৯৯}$ জীবনানন্দ$_{৯৯}$ সুধীন্দ্রনাথ$_{01}$ অমিয় চক্রবর্তী$_{01}$ বুদ্ধদেব বসু$_{0৪}$ বিষ্ণু দে$_{০৯}$	Aragon$_{৯1}$ Eluard$_{৯৫}$ Breton$_{৯৬}$	Day Lewis$_{0৬}$ Auden$_{07}$ Spender$_{0৯}$

(খ) দ্বিতীয়টি ঠিক সারণী নয় ; তবে, ধারাবাহিক একটা সূত্র মিলিয়ে নাটকের অগ্রগতির উপস্থাপনা। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী পড়বার আগে বেশ কয়েকজন নাট্যকার এবং তাঁদের নাট্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছিলেন শঙ্খবাবু, তাঁরা মোটামুটি এই ক'জন—

সারণী—২

Æschylus	(B. C. 525-456)
Sophocles	(B. C. 496-406)
Euripides	(B. C. 484-406)
Aristophanes	(B. C. 448-380)

Marlowe (1564-1593)
Shakespeare (1564-1616)
Ben Johnson (1572-1637)

Corneille (1606-1684)
Racine (1639-1699)
Moliere (1622-1673)
Dryden (1631-1700)

Goethe (1749-1832)

Ibsen (1128-1906)
Shaw (1856-1950)

Checkov (1860-1904)
Strindberg (1849-1912)
Maeterlinck (1862-1949)
Hauptmann (1862-1946)

Pirandello (1867-1936)
Brecht (1898-1956)

এঁদের বাছাই করে নিয়েছিলেন শঙ্খবাবু বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবার জন্য। পৃথিবীর নাটকের ইতিহাসে কীভাবে বিষয়-আঙ্গিক-সংলাপ আর action-এর ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা আমাদের দেবার জন্যই এঁদের বেছে নিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যনিরীক্ষাকে বিশ্ব-পটভূমিতে বিচার করতে শিখিয়েছিলেন আমাদের।

যেমন, এই সারণীতে রয়েছে মূলগতভাবে সাতটি গুচ্ছ। বিশ্বনাটকের প্রগতিকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন শঙ্খবাবু, সেজন্যই এই সাতটি গুচ্ছের সুপরিকল্পিত নির্ভর উপস্থাপিত হয়েছিল। গ্রিক নাটকের (ট্র্যাজিডি বা কমেডি, উভয়ক্ষেত্রেই) নিয়তিনির্দিষ্ট সংঘাত থেকে, পরবর্তীকালে চরিত্রগত বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ সংকটে কীভাবে সরে এল নাটক, কীভাবে বিষয় আর অবয়বে জটিলতার অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল ধীরে ধীরে, তার বিবিধ বিন্যাস বিশ্বনাট্যনিরীক্ষার নির্বাচিত ভিত্তিকে কেন্দ্র করে তিনি বোঝাতে চেয়ে-

ছিলেন আমাদের। পাশাপাশি এসেছিল সংলাপ রচনার বিবিধ কৌশল আর বিকাশের কথা। ইবসেন-বার্নার্ড শ থেকে গদ্য ভাষায় সংলাপ রচনার যে মুন্শিয়ানা দেখা গেল, তারই নতুন, গভীর, অনুভূতিময় প্রকাশ পরিস্ফুট হলো স্ট্রিণ্ডবার্গ, মেটারলিঙ্ক, হাউপ্টমান বা চেখভের নাটকে। অন্যদিকে action বা নাট্যক্রিয়ার ধারণাও যে ধীরে ধীরে পালটাল এঁদের হাতে, নাট্যপ্রয়োগের সাহসিক প্রয়াসে, সেগুলিও সযত্নে দেখালেন তিনি। রবীন্দ্র-নাটকের পাঠককে বুঝে নিতে হয় এঁদের প্রয়োগ বা চিন্তনের অভিনবত্ব, কেননা বাংলা নাটকের এই প্রধানতম লেখক আত্মীকরণ করেছিলেন বিশ্বনাট্যচর্চার ঐতিহ্য আর নিরীক্ষা। অন্যদিকে, ব্রেশ্‌ট তাঁর নাটকে যেভাবে আর যে কারণে নাচগান ব্যবহার করেন, রবীন্দ্রনাটকে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না নাচ বা বিশেষত গান। সেই পার্থক্যের স্বরূপ সম্পূর্ণ বুঝে নেবার জন্যই তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন ব্রেশ্‌ট-এর ভেরফ্রেমডুং বা বিযোজন প্রক্রিয়া।

দুটি সারণীর ক্ষেত্রেই একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সবকটির ক্ষেত্রে নিখুঁত সাল লিখতে কোনোদিন শঙ্খবাবুকে কোনো কাগজ বা বই বা নোটবই দেখতে হতো না। এ দুটি ক্ষেত্র ছাড়াও আগে পরে অনেক সময় দেখেছি, সাল তারিখ মনে রাখার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি প্রায় কম্পিউটার-সদৃশ। স্মৃতির ওপর এই সহজাত নিয়ন্ত্রণ কীভাবে তিনি রপ্ত করেছেন সেটা আজও আমাদের কাছে রহস্যাবৃত।

শেষ করব 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থ এবং সেই সূত্রে সুধীন্দ্রনাথের গোটা কাব্যকৃতি বিষয়ে শঙ্খবাবুর দুটি মূল্যবান অঙ্গুলিনির্দেশ উল্লেখ করে। প্রথমটি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির বিষয়গত বিভাগ। রবীন্দ্রপ্রভাবিত 'তন্বী'-কে বাদ রাখলে বলা চলে প্রথমযুগের চারটি গ্রন্থে বিষয়গত এক ধরণের একান্তর বিন্যাস এবং পরিণতি সুধীন্দ্রনাথ বজায় রেখেছেন। অর্কেস্ট্রা আর উত্তরফাল্গুনীতে রয়েছে ব্যক্তিগত প্রেমচেতনার উৎসার, অন্যদিকে ক্রন্দসীতে রয়েছে নৈর্ব্যক্তিক মন। আর 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থে এই দুই জগৎ অনেকাংশে একাকার। দ্বিতীয়টি 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা বিষয়ে। 'সংবর্ত' কাব্যের ২৩টি কবিতার মধ্যে সাতটি কৈশোরক কবিতার পুনর্লিখনকে বাদ রাখলে মূলগত ১৬টি কবিতার আঙ্গিক আর বিষয়গত একটা সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। এই ১৬টি কবিতার মধ্যে

কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত (৬ মাত্রার) → ৫টি
সনেট (মুক্তবন্ধ/মিশ্রকলাবৃত্ত) → ৫টি
মুক্তবন্ধ → ৫টি
ঠাস বুনোট মিশ্রকলাবৃত্ত → ১টি

সনেটগুলিতে সুধীন্দ্রনাথ জীবনভাবনা, দর্শনচিন্তা নিষ্কাশন করছেন ; অভিজ্ঞতার

কথা বলছেন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে আর অনেকাংশে সরাসরি ইতিহাসের কথা আসছে কলাবৃত্তে লেখা কবিতাগুলিতে।

৪

ব্যর্থতাবোধ থেকে অবশ্য রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রীশঙ্খ ঘোষের ক্লাসে পড়ানোর মহাসাগরিক ব্যাপ্তির ছিটেফোঁটাও এই লেখায় প্রতিফলিত হলো না। খুবই আংশিক, অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ এবং অগভীর এই প্রচেষ্টা শিক্ষক শঙ্খ ঘোষের ক্ষমতা সম্পর্কে হয়তো পাঠকমনে অস্পষ্ট একটা ধারণাই তৈরি হবে। তার জন্য শঙ্খবাবু নিজেও অনেকখানি দায়ী। তাঁর ক্লাস-পড়ানোর বিবরণ অবিকৃত-অবিকল তুলে রাখতে দু-দুবার টেপরেকর্ডার এবং আর একবার ভিডিও ক্যামেরার পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি অবিকল প্রত্যয়ে অনুমতি দিতে বিরত থেকেছেন, ক্লাস না নেবার ভয়ও দেখিয়েছেন। তার ফলাফল এ ধরণের লেখা। আমাদের এরকম লেখা আজ তাঁকে পীড়া দিলেও আমরা নিরুপায়। ফরাসি কবি ভিঁঠ তাঁর পিতৃপ্রতিম শিক্ষক গিয়োমদ ভিঁঠকে অমর করে রেখে গেছেন তাঁর পদবিটি গ্রহণ করে—কৃতজ্ঞতার স্মারক হিশেবে। এক্ষেত্রেও আমাদের কপাল মন্দ। কবি শঙ্খ ঘোষকে আমরা আর কী স্মরণীয়তা দেবো! অন্তত টলস্টয় সম্পর্কে গোর্কির উক্তিকে যেন প্রতিধ্বনিত করতে পারি—'মানুষটি অনেকটা ঈশ্বরের মতো।' অথবা, ছোট্ট ক্লাসঘরের সেইসব অমলিন স্মৃতি এলিয়টকে মনে করাতে পারে—'I do not know much about gods, but I think that···' না কি আমাদের মানায় এভাবে বলা—'তিনি অমৃনিধি গুপ্ত, তাঁর মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত'?

অ জি ত মু খো পা ধ্যা য়

আমার বন্ধু শঙ্খ

কিশোর বয়সের অনেক রঙিন স্বপ্ন সময়ের স্রোতে মিলিয়ে যায়। সেই সময়কার কোনো প্রিয়জন সম্বন্ধে আবেগস্পৃষ্ট উজ্জ্বল ভাবমূর্তি পরবর্তীকালে রূঢ় বাস্তবের স্পর্শে ধূসর হতে হতে বিলীন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমার জীবনে একজন সম্পর্কেই অভিজ্ঞতা অন্যরকম। সেই স্বপ্নদেখা বয়স থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত আমার এই সহপাঠী বন্ধুর পর্যায়ক্রমিক উত্তরণ ও সেইসঙ্গে তার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ও মানবিকতার অপূর্ব স্ফুরণ ও বিকাশ বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে দেখেছি এবং আরো দেখে চলেছি। সেই বন্ধু আজকের প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ। ওর বিরল ব্যক্তিত্ব ও সংবেদনশীল মনের সংস্পর্শে আমার ছোটবেলাকার লালিত ভালোবাসার সঙ্গে আজ মিশেছে মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধা। আমার এই অনুভূতি, বোধ করি, তার সাহিত্যকীর্তির জন্য নয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রেই শঙ্খর সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়ন ও সমাদর হয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই আরো হবে। এই দিকটি ছাড়াও, এমন-কিছু আছে ওর ব্যক্তিত্বে যার জন্য ওর প্রতি আমার ভালোভাসা, শ্রদ্ধা-মেশানো সুগভীর ভালোবাসা। তাই শঙ্খর আবাল্য সুহৃদ হওয়ায় আমাকে যখন ওর সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হলো তখন লেখক না হওয়া সত্ত্বেও এই পরিণত বয়সে স্মৃতিচারণ এবং একান্ত প্রিয়জন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবার সুখকর সুযোগ খুশি মনেই গ্রহণ করলাম।

পদ্মাতীরে হার্ডিঞ্জ-ব্রিজ সংলগ্ন ছবির মতো সাজানো আমাদের সেই রেল-কলোনি পাকসি। সেখানে আমাদের ইস্কুল, সহপাঠী শঙ্খ ঘোষ। স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণের মিষ্টিমুখের ছেলেটি সব-কিছুতেই সহপাঠীদের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তারই উদ্যোগে প্রকাশিত হয় আমাদের হাতেলেখা পত্রিকা। বন্ধুদের কারো মধ্যে সৃজনীপ্রতিভা কিছু-মাত্র থাকুক আর না-ই থাকুক, তাদের উৎসাহ দিয়ে কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত করে সে। এইভাবে এক কিশোর সপ্তম / অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রের উদ্যোগে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে এমন এক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে যার ফলে আমরা অনেকেই ভবিষ্যতে কেউ কবি, কেউ প্রাবন্ধিক, কেউ গল্পকার, কেউ-বা চিত্রকর হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। আমাদের মধ্যে একমাত্র শঙ্খই সবার থেকে স্বল্পভাষী, আত্মপ্রচারবিমুখ। সূত্রধারের ভূমিকা নিয়ে সকলের কাছ

থেকে কিছু-কিছু রচনা নিয়ে এবং যেখানে যেটুকু অভাব থাকত নিজের প্রতিভা-দীপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত রচনার দ্বারা তা পূরণ করে সে বের করেছিল আমাদের স্বপ্নের পত্রিকা। এতদিন পরেও সেই অপূর্ব সৃষ্টির সুখানুভূতি স্মরণ করি। এই বিষয়টির উল্লেখ শুধুমাত্র এইজন্য নয় যে ছোটোবেলা থেকেই শঙ্খর সাহিত্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল। আজ যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ও অনন্ত, যেমন ওর প্রচারবিমুখতা কিংবা সাথী-সতীর্থদের অন্তরাল থেকে সাহায্য করে এগিয়ে দেওয়ার প্রয়াস, তা কিন্তু ওর কিশোর বয়েস থেকেই ছিল।

পড়াশোনা ছাড়া সবরকমের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও অনুষ্ঠান, যার মধ্যে সকলের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ সুযোগ থাকত, তাতেই ছিল শঙ্খর আগ্রহ। অনেকেই হয়তো জানেন না ওর কিশোর বয়েসের অভিনয়-দক্ষতার কথা। জীবনের অনেক ভালো-লাগা মুহূর্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে ভুলে যাই, না হয় ভালো-লাগা বোধটাই চলে যায়। কোনোরকম অতিরঞ্জন না করেই বলছি, 'অচলায়তন'-এর পঞ্চক, 'রামের সুমতি'র রাম, 'টিপু সুলতান'-এর টিপু, ইংরেজি নাটক 'দি ডিসকভারি'র পেপে—এইসব চরিত্রে ওর অভিনয় দেখে ছোটোবেলায় যে আনন্দবিহ্বলতার উদ্রেক হতো মনে, এতদিন পরেও সেই অনুভূতি অম্লান। শঙ্খ যে বিষয়ের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করেছে, পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

ওর লেখা 'সকালবেলার আলো' বইটিতে আছে আমাদের সেই ইস্কুল-জীবনের আভাস। একটি কিশোর যে কী মন নিয়ে প্রাকৃতিক সুষমামণ্ডিত আমাদের সেই তীর্থক্ষেত্রে বিচরণ করেছে, সহপাঠী বন্ধুদের প্রতি যে কী গভীর ভালোবাসা তার ছিল, ওই রচনার ছত্রে ছত্রে আছে তার অভিব্যক্তি। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি, রচনাটিতে শুধু নামের হেরফের আছে, আর সবই সত্য।

আমাদের সেই ইস্কুলের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে শঙ্খর সঙ্গী হয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। কিশোর বয়সের দিনগুলো যেন ফিরে পেয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য। ওখানকার আমন্ত্রকগণ শঙ্খ ঘোষকে 'উপ-মহাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব' বলে বর্ণনা করে উপযুক্ত অভ্যর্থনা ও সমাদরের আয়োজন করেছিলেন। ওর মন কিন্তু তখন চলে গিয়েছিল চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার দিনগুলোতে, আসলে ও ভীষণভাবে চাইছিল নানা স্মৃতি-বিজড়িত জায়গাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে। শঙ্খর জীবনে অনেক উত্তরণ ঘটেছে; আজ আমাদের দেশে ও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বাংলাদেশের ঢাকায়ও দেখেছি সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের কী বিপুল শ্রদ্ধা ওর প্রতি। কিন্তু আমরা যারা ওর কাছাকাছি থাকতে পেরেছি তারা উপলব্ধি করি, এ-সব সত্ত্বেও আমাদের ইস্কুলজীবনের জন্য ওর টান এবং সহপাঠী বন্ধুদের

জন্য ওর ভালোবাসা এখনও অটুট। শঙ্খর সাহচর্য আমাদের অনেক ক্লেশ দূর করে, ধুইয়ে দেয় মনের অনেক গ্লানি, আমরা সঞ্জীবিত হয়ে উঠি।

চরম সংকটের মুহূর্তেও প্রশান্তি ও রসবোধ বজায় রাখতে পারে শঙ্খ। সেবার বাংলাদেশ পরিক্রমার শেষে ফেরার পথে ঢাকা থেকে লঞ্চে করে যখন পদ্মা-যমুনার সংযোগ-স্থলের বিস্তীর্ণ নদীবক্ষ অতিক্রম করছি, তখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে উঠল প্রচণ্ড হাওয়া। ক্ষুদ্র লঞ্চ আকাশ-পাতাল দোলায় দুলতে শুরু করল, তীরের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছিল না কোনোদিকে। ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই আলোড়িত বিশাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে ভাবছি : জীবনের শেষ মুহূর্ত সমাগত, কেউ জানতেও পারবে না কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। শঙ্খ তখন উপরে সারেঙের কাছাকাছি ছিল। দেখি, ও কখন নীচে নেমে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলছে : জানিস, সারেং একজনকে একটা বাবলাগাছ নজরে পড়ে কিনা দেখতে বলছে, কিন্তু ওরা বাবলাগাছের হদিশ পাচ্ছে না। ওর স্মিত মুখে মজার অভিব্যক্তি দেখে আমার বুক শুকিয়ে যাওয়া ভয়ের অনেকটাই উবে গেল। আমরা পাশাপাশি পরস্পরকে ধরে দাঁড়িয়ে জীবন-মৃত্যুর মাঝে দুলতে দুলতে একসময় নিরাপদেই তীরে পৌঁছলাম। কিছু-দিন পরে শঙ্খ চিঠিতে লিখেছিল— এখন মনে হচ্ছে সে-দিন আমরা ডুবতে পারতাম!

নিজের শারীরিক কষ্টেও নির্লিপ্ত থাকতে দেখেছি ওকে। বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার কিছু-দিন পরে ও ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে সময়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দেখতে যেতাম ওকে। তখন দেখেছি, ডাক্তার কথা বলতে বারণ করেছে, তথাপি অষ্ট প্রাহরিক আড্ডা থেকে রেহাই নেই ওর। আসলে রেহাই পেতে শঙ্খ একেবারেই চায় না, সকলের মধ্যে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াতেই ওর আনন্দ। নিজের লেখা বা অন্য কাজের জন্য কতটুকু সময়ই বা অবশিষ্ট থাকে ওর। একবার চিঠিতে লিখেছিল : 'অবশ্য রাত বারোটা থেকে ভোর সাতটা পর্যন্ত নিরিবিলিই থাকতে পাই, কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করতেই হয় যে সে সময়ে ক্লান্ত চক্ষু খুবই সুপ্তি কামনা করে।' শান্তিনিকেতনে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে, ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গত দাবিতে রোজ অন্তত পাঁচ ঘণ্টা করে কথা বলতে হয়েছে শঙ্খকে। সংকটজনক দীর্ঘকালীন অসুস্থতার সময়েও অনেকের কাজ দেখে দিয়েছে ও এবং সেটা করেছে ডাক্তার ও পরিবারের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করেই। কাজের দায়বদ্ধতার ব্যাপারে এ-রকম নিষ্ঠা আর কারো মধ্যে দেখেছি বলে আমার তো মনে পড়ে না। বাড়িতেও ওর অবসরের অনেকটাই নিয়ে নিত ছাত্র-ছাত্রীরা। ওর ধারণায়, শুধু কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করেই শিক্ষকের কর্তব্য শেষ হয় না, শিক্ষকের দায় সর্বক্ষণের জন্য। শঙ্খ শিক্ষক, আবার ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টেরও শরিক। অনেকসময়ে অনেকের জীবনের জট মোচন করতেও

উদ্যোগী হতে দেখেছি ওকে। এতটাই ও বিস্তৃত করে নেয় নিজের দায়িত্বের পরিধি, কিন্তু নিজের শারীরিক কষ্ট বা অসুস্থতা সম্বন্ধে সর্বদাই থেকে যায় উদাসীন। ওর শরীরের অবস্থা যখন উদ্বেগজনক তখনও চিঠিতে লিখেছে, শরীরের 'বেশ প্রফুল্লকান্তি দশা'। আবার, একটু নিরাময়ের পথে যেতেই আফসোস করেছে পাছে ওকে আমাদের দেখতে যাওয়া কমে যায়।

'কবিতার মুহূর্ত' যখন বেরোয় তখন আমাকে এক কপি উপহার দিয়েছিল শঙ্খ। দেখি তাতে ও লিখেছে 'আত্ম-কথার পাপের ভাগ অজিতকে'। কিন্তু ওই বইয়ে ওর আত্মকথা কতটুকুই বা আছে। ওর সারা জীবনের চিন্তা-ভাবনার বেশির ভাগই তো ক্লিষ্ট অত্যাচারিত মানুষ নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, কোনো পরিস্থিতিতেই শঙ্খ আত্মকথার পাপের ভাগ নিতান্ত আপনজনকেও দিতে চায় না। এমন অনেক দিন হয়েছে, গিয়েছি ওর কাছে, আমার এবং আমার পরিবারের সকলের খবর জানতে চেয়েছে, গভীর মনোযোগ দিয়ে দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে সমবেদনা ও সহানুভূতি জানিয়েছে। তারপর যখন ওর বিষয়ে খবর নিতে চেয়েছি তখন নিতান্ত অনিচ্ছায় জানিয়েছে ওর পরিবারের কারো উদ্বেগজনক অসুস্থতার কিংবা কোনো বিপর্যয়ের কথা।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো ওর মানসিক প্রসার। আমাদের মতো বন্ধুদের পর হয়ে যাওয়াই তো ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু শঙ্খই রেখেছে আপন করে, দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে আমাদের। ১৯৮৮ সালে শঙ্খ যখন শিমলায় অ্যাডভান্‌স্‌ড ইন্‌স্টিট্যুট অব্ স্ট্যাডিতে পোয়েট ইন্ রেজিডেন্‌স, তখন কিছু-দিন ছিলাম ওর সঙ্গে। ও তখন সমানে ইকবাল অনুবাদ করে চলেছে। একদিন পাঠ করে শোনাল জাভেদনামার অনুবাদ থেকে। শিমলার নিস্তব্ধ পরিবেশে সেই পাঠ শোনাও ছিল এক বিরল অভিজ্ঞতা: ওর সুঠাম স্বর নৈঃশব্দের গহন থেকে উঠে এসে স্পন্দিত করে তুলছে সমস্ত পরিবেশ, আর জেগে উঠছি আমিও। দেখেছি, ওর সঙ্গে থাকলেই প্রাণিত হয়ে যাই, জেগে উঠি প্রতিদিনের মলিনতা থেকে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছি, শঙ্খ আমাদের মানসিক ভরসা। কোনো অহংকার স্পর্শ করতে পারেনি ওকে, আজও ওর কাছে গেলে অনুভব করি আমাদের সেই কৈশোরের উষ্ণতা।

অবসর গ্রহণের পরেও সর্বদায়িক স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে চলেছে ও। শিমলায় 'উপহার পাওয়া মনোরম অবকাশে'ও ও স্বস্তি পায়নি, কেননা সেই সময়টাতে ও নিজের পরিমাপ মতো কাজ করতে পারছিল না। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের দায়িত্বে শঙ্খ যতদিন ছিল, কী অপরিসীম পরিশ্রমই না করছে ও! আজ যখন কোনো ধরাবাঁধা দায়িত্ব নেই তখনও বিশ্রাম নেই ওর। আমি অনেকবার অনুযোগ করেছি, কেন ও প্রচারের আলো থেকে সন্তর্পণে দূরে সরে থেকেছে। আমার যুক্তি ছিল, ওর রচনায় যে বার্তা আছে তা বহুজনের মধ্যে

নিয়ে যাওয়ার জন্যই ওর প্রচার দরকার, নিজের খ্যাতি বৃদ্ধির জন্য নয়। সে বিষয়ে একটা চিঠিতে ও আমাকে লিখেছে : 'সাধ্যমতো কাজ করে যাওয়াই যথেষ্ট, সেই সাধ্যের সীমা-বিচার করে আর লাভ কী। কিন্তু তুই যে লিখেছিস সামাজিক প্রতিপত্তিরও একটা দাম আছে, সেটা মানতে পারি না এইজন্য যে এই প্রতিপত্তির ইচ্ছে তার টানে টানে এমন একটা ঘূর্ণমান চক্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারে যে নিজের ইচ্ছে-বিবেচনা কিছুই আর কাজ করে না তখন। এই প্রতিপত্তির বাইরে থেকেই যতটা দেওয়া যায়, পাওয়া যায়, সেইটেই আমাদের ভালো।'

নির্লোভ, নিরহংকার, স্নিগ্ধ মধুর এই মানুষটি সারা জীবন প্রতিপত্তির বাইরে থেকেই বিনম্র চিত্তে যতটা সম্ভব দিয়ে চলেছে। তার পাওয়ার নিশ্চয়ই কিছু আছে—সেটা আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা।

২

অশোক মিত্র

তখন কবিতা মিতা, প্রিয় থেকে প্রিয় সখী, সুহৃদ, সুন্দর

'বন্ধু হওয়াটা কবিদের ভেবে ছাখো কত সুবিধের'। হয় তো বা। কিন্তু কবিবন্ধু না হয়ে খোদ কবি হওয়াটা সুবিধাজনক কিনা তা নিয়ে, লঘু মুহূর্তের বাইরেও, সংশয়ের সঞ্চার অযৌক্তিক নয়। 'চোখে-ঠোঁটে অসুবিধা, ভিতরে অসুখ': এই বর্ণনা সৃষ্টির রহস্যের গভীরে যিনিই প্রবেশ করতে আঁকুপাকু, তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য। কবিদের ক্ষেত্রে, সন্দেহ হয়, একটু বেশি মাত্রায় প্রযোজ্য।

দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা, যা ছিঁড়েখুঁড়ে খায়। কবিকে ভাষা ব্যবহার করতে হয়, ভাষার মধ্যবর্তিতায় এগোতে হবে তাঁকে। কিন্তু যে-কোনো সামাজিক মানুষকেই তো ভাষা ব্যবহার করতে হয়, কাব্যপ্রণেতার ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে তা হ'লে আলাদা করে উল্লেখ কেন। এটাই প্রথম সমস্যা। কবিকে ভাষার মধ্যে ভাষা খুঁজতে হয়, নিজের জন্য, নিজের মতো ক'রে পরিভাষা খুঁজতে হয়। কী বলতে চাওয়া হচ্ছে, তার শরীরে জড়ানো কেমন ক'রে বলতে চাওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্নের আর্তি। যিনি কবিতার নির্মাতা তিনি খুঁজছেন, অহরহ খুঁজছেন, কোনো স্বপন-চারিণীর সঙ্গে অভিসারে যাওয়ার ব্যাপার নয় এটা, নিজের প্রকাশবিন্যাসকেই শাণিত থেকে শাণিততর করে তোলার তাগিদ, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। অথচ স্পষ্ট, স্পষ্টতা এগুলি তো আপেক্ষিক বিশেষ্য-বিশেষণ, ক-র কাছে যা পরিষ্কারতম খ-র কাছে তা হয়তো কুজ্ঝটিকার আস্তরণে ঢাকা। কবিকে তাই শেষ পর্যন্ত নিজের রুচি-পছন্দ-অনুভূতির কাছে বার-বার ছুটে যেতে হয়, যে-পরিভাষায় নিজেকে তিনি, নিজের বিচার-অনুযায়ী, উন্মোচন করতে সর্বোত্তমরূপে সক্ষম হওয়ার দাবি করতে পারবেন, সেই আবিষ্কারে পৌঁছে গেছেন কিনা। ভাষা, যা কারো একার সামগ্রী নয়, সামাজিক উপকরণ, তার শরীর ছেনে, অথচ নিজের ব্যবহারের জন্য, নিজের মতো ক'রে প্রয়োগের প্রয়োজনে, আলাদা এক ভাষা-আবিষ্কার। 'আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা', এবং-বিধ যন্ত্রণার চিৎকার যে-কোনো মহৎ কবির সামাজিক উত্তরাধিকার। কবিকে তাঁর নিজের মুদ্রায় পৌঁছুতেই হবে, আলাদা-ক'রে-চেনা যায় এমন সংকেত সম্ভাবে। তা চেনা যায়, কারণ সমাজ ব্যবহৃত ভাষা থেকেই তা তুলে আনা হয়েছে।

তা হ'লেও তার একটি বিশেষ আদল, যে-আদল এই বিশেষ কবির পৃথগীকৃত মৌলিকতার পরিচয় বহন করছে। ঘরের মধ্যে ঘর, ভাষার মধ্যে ভাষা, উত্তম থেকে উত্তমতর হ'তে চাইছেন যিনি, অবিশ্রান্ত তিনি খুঁজছেন। সকলেই যে কবি নন, একমাত্র কেউ-কেউ, তার কারণও তাই। কয়েকজন নিজেদের পরিভাষায় পৌঁছে যান, অধিকাংশই অসফল। 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে তোমার সুরে-সুর সুর মেলাতে': নিজেকেই ধাক্কা মারছেন কবি-গায়ক-সাধক, যা বলতে চাইছেন তার সঙ্গে যার নির্ভরে বলতে চাইছেন তা খাঁজে-খাঁজে মিলে যাচ্ছে কিনা। ভাষা হোক বাঁশি হোক রঙের ধুন্ধুমার মেশামেশি-ঠাসাঠাসি হোক, যথাযথতম নিজের মধ্যবর্তিতায় উত্তীর্ণ হ'তে পারার দুরূহ উত্তরাপথ জুড়ে যন্ত্রণাবোধ, অথচ, কোনো জাদুবলে যদি সফলতার শেষে বিন্দুতে পৌঁছনো যায়, আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ, কবি তাঁর ভাষাকে আবিষ্কার করেছেন, তাঁর কপালে জয়তিলক, এখন থেকে অমরাবতী তাঁর কাছে অধরা থাকবে না।

আগ বাড়িয়ে বলা হলো। কারণ আরো একটি মস্ত বোঝাপড়ার কথা এখনো অমুক্ত থেকে গেছে। অধ্যবসায় ও পরিচীকির্ষার অনেকগুলি অধ্যায় পেরিয়ে কবি তাঁর মনোমতো প্রতীকী ভাষায় পৌঁছে গেলেন, যে-ভাষা তাঁর একান্ত নিজের। কান পেতে শুনলে, কিংবা চোখ খুলে ঠাহর করলে, সঙ্গে-সঙ্গে বোঝা যাবে কে বলছেন, কে লিখছেন। কিন্তু এলেবেলে সাধারণ মানুষ, তাঁরা কি এই প্রতীকের গহনে প্রবেশ করতে পারছেন, কবি কি নিজের পরিভাষাকে সাধারণ মানুষের মনের চৌকাঠের সমীপবর্তী করতে পেরেছেন, সাধারণ মানুষ কি হরিষে বিষাদে-আনন্দে-যন্ত্রণায়, অসহায়ত্বের স্তম্ভিত লগ্নে, ঘুমের-জাগরণের-তন্দ্রামগ্নতার মুহূর্তে, ঘাড় নেড়ে মেনে নেবেন, হ্যাঁ, এই পরিভাষা, যাতে অমুক কবির শীলমোহর, তা বুঝে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। উনি বলছেন ওঁর মতো করে, কিন্তু কী বলতে চাইছেন তা আমাদের কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ, ওঁর বলা আর আমাদের শোনা, ওঁর বোঝানো আর আমাদের উপলব্ধি, তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন সমাপ্ত, আমরা ওঁকে অতএব বরণ ক'রে নিচ্ছি, ওঁর কাব্য আমাদের ধাতস্থ, লোকটা জাদু জানেন নিশ্চয়ই, কথা বলছেন নিজের সাংকেতিক ভাষায়। কিন্তু আমাদের কথাই বলছেন, এবং কী ক'রে যেন না মেনে পারছি না, আমাদের মতো ক'রেই বলছেন।

দুটো আপাতবিরোধী অন্বেষণ : কবি নিজেকে আলাদা করছেন, স্বকীয় পরিভাষায় বৃত হচ্ছেন, অথচ, পাশাপাশি, নিজেকে মিলিয়ে দিচ্ছেন, যুক্ত করছেন সমাজ বা বিশেষ সমাজস্তরের ভাবন-অনুভাবনার সঙ্গে। নিজের জন্য অতি-সংবেদনশীল এক প্রতীকী ভাষা আবিষ্কার করতে পেরেছেন : এই দম্ভ স্রেফ শূন্য

কুম্ভের আস্ফালন। ভাষা তো বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের মধ্যবর্তিতা, এই ভাষার রণপায়ে ভর করে কবি যদি সমাজের প্রকোষ্ঠে পৌঁছুতে না পারেন, তা হ'লে তো তা আত্মরতিরই নামান্তর। প্রতীকী ভাষার প্রকৌশল কবির সমাজচেতনার কানে-কানে কিছু নতুন দ্যোতনা পৌঁছে দেবে, সমাজচেতনায় শিহরণ ঘটবে, আবেগের অভিনব লীলাকেলি, অথচ আবেগের শরীর সেঁধিয়ে কোনো নবতর প্রজ্ঞারও অনুপ্রবেশ। এরকম যখন ঘটে, তখনই, আমরা বুঝতে পারি, কবিতা সার্থক, কবিতা তার পরিপূর্ণ হার্দ্যতায় পৌঁছেছে, জয়ধ্বনি করার মুহূর্ত এটা।

তা হলেও আরো কিছু বাকি থেকে যায়। সাধারণ মানুষের কাছে নিজের কথার উপচার নিটোল ক'রে পৌঁছে দিলেই তো নটে গাছটি মুড়োবার নয়। কবি যেমন দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে তো সেই সঙ্গে নিয়েও যেতে হবে, হাত পেতে, পরিশুদ্ধ নম্রতায়, সমাজের কাছ থেকে। সমাজ মানে তো পাড়াপড়শী, কবি তাঁদের নিজের ভাষা বোঝাতে পেরেছেন। সেই ভাষায় এমন কিছু মূর্ছনা-বেদনার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটাতে পেরেছেন, সেই শুমোরে কবির ব্যক্তিসত্তার যদি মাটিতে পা না পড়ে, তা বড়ো সর্বনেশে ব্যাপার হবে। বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মতোই, পড়শীদের সঙ্গে কবির সতত আদান-প্রদানের সম্পর্ক: বৃক্ষউদ্ভিজ্জ থেকে যার নিষ্কাষণ, মানুষ তা-ই গ্রহণ ক'রে টিঁকে থাকে, তেমনি মানুষের নিঃশ্বসিত বৈদেহী উপাদানে নিহিত উদ্ভিজ্জজগতের প্রাণভোমরা। কবি সমাজকে কাব্য-নিবেদন করছেন, কিন্তু সমাজের কাছ থেকে বিনিময়ে গ্রহণ করছেন উপলব্ধিগত প্রেরণা, যা তাঁর কাব্যকে আরো সংহত করবে, শাণিত করবে, পরিশীলিত করবে, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধতর করবে। সমাজচেতনা একটি স্থিরবিন্দুতে তো দাঁড়িয়ে থাকে না, তার গুণগত, প্রকৃতিগত রূপান্তর ঘটছে, কবিকে প্রতিনিয়ত অতএব ওয়াকিবহাল থাকতেই হবে। কবিতা থেকে সমাজের প্রেরণা গ্রহণ, কিন্তু সমাজ থেকেও কবির প্রেরণা ছেঁকে নেওয়া। এই দেওয়া-নেওয়ার পালা যতদিন যতিহীন, কাব্য সমৃদ্ধতর হচ্ছে, সমাজও নতুন অভিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হ'তে পারছে। যে-অশুভ মুহূর্তে এই প্রক্রিয়া, যে-কোনো কারণেই হোক, হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কবিতা আর পৌঁছুতে পারছে না সমাজের দোরগোড়ায়, সমাজও কবিকে অমৃত-মন্ত্রের গোপন সূত্রে দীক্ষিত করতে ব্যর্থমনোরথ হচ্ছে। সার্থকতার স্বর্ণশিখরে যে-কবি উন্নীত হ'তে চান, এমন করাল মুহূর্তের হস্তক্ষেপ থেকে তিনি, সদাসতর্ক, ত্রস্ত হরিণীর মতো পালিয়ে বেড়ান। যিনি মহৎ কবি, এই সংকট তাঁকে স্পর্শ করতে অবশ্যই অপারগ। ঘুরিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, যে-কবিতা মহৎ হিশেবে চিহ্নিত, সমাজকে তা আঁকড়ে ধ'রে থাকে, নিজের সত্তাকে সমাজচেতনা

থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে দেয় না, এই কোজাগর প্রহরাই নিকষ কবিতাকে আত্ম-পরিচয় শেখায়।

শঙ্খ ঘোষ যদিও আলাদা বই লিখে পাঠককুলের সঙ্গে কবিতার মুহূর্তের আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছেন, সার্থক কাব্যপ্রয়াসের ক্ষেত্রে সত্যিই তার আর আলাদ প্রয়োজন নেই। কবি কর্তৃক সংযোজিত টীকা থেকে আমরা হয়তো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাসম্পাতের ইঙ্গিত পাই, কিন্তু সে-সব তথ্য যদি না-জানাও থাকে, যে-কবিতা সর্ব-অর্থে উত্তীর্ণ, তার শরীরেই ইতিহাসের সঙ্কলতা গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা থাকে। পাঠককুল, অমুক তারিখ ঐ লগ্নে কী ঘটেছিল তা যদি না-ও জানেন, মহাভারত অশুদ্ধ হয় না তাতে, তাঁরা তরতর ক'রে, অনু-মানে অনুভবে, কবিতার গহনে প্রবেশ ক'রে যান, ভূগোল পেরিয়ে ইতিহাসে, পর-পর গেঁথে-রাখা কথামালার সোপান বেয়ে তাঁরা পৌঁছন চেতনার প্রান্ততম সোপানে, যেখানে উপলব্ধির পদ্মকোরক টলটল করছে। কবিতার মুহূর্ত তখন আর অনাদি-অনন্ত প্রবাহের শরীর থেকে ছিটকে-আসা খণ্ড-ক'রে-ধ'রে-ফেলা অনুপল থাকে না, তা তখন সদম্ভে বলে, আমিই মহাকাল। অণু-পরমাণু-সদৃশ কোনো অতিক্ষণিক মুহূর্ত থেকে সীমানাহীন সময়বলয়ে আমাদের দমকা ধাক্কা মেরে নিয়ে যায় ব'লেই উৎকৃষ্ট কবিতাকে তার স্বরূপে আমরা চিনে নিতে পারি।

শঙ্খ ঘোষের প্রসঙ্গ ধ'রেই যে-কথা যোগ করা কর্তব্য মনে হয়, কাব্যনির্মাণ বড়ো কঠিন বৃত্তি। কবিকে কর্মী হ'তে হয়, কর্মঠ হ'তে হয়। মাঝে-মধ্যে স্বভাব কবির পুরাবৃত্ত আমরা প'ড়ে থাকি, দৈনিক সংবাদপত্রে এমন কবির অলস উল্লেখ থাকে যিনি ছুরি-চামচে সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজন শুরু করার আগে অনুচর কিংবা অনুচারীকে তলব ক'রে পাশে বসিয়ে কবিতা নির্গত করেন, ঝকঝকে কাগজে তা অনুলিখিত হয়, কবি, যদি খেয়াল করেন, দয়াপরবশ হয়ে সোনালি কলমের খাপ খুলে একটা-দুটো বাক্যবন্ধের সংস্কার ক'রে দেন। সমাজের সরলতম স্তরে এখনো নিশ্চয়ই স্বভাব কবিদের স্বভাববিচরণের স্বতঃসিদ্ধ অধিকার, সেই পরিবেশে কবিকে আলাদা ক'রে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই, প্রয়োজনও নেই : সমাজের গভীর থেকে উঠে-আসা আবেগগুলি এত অপাপবিদ্ধ যে তাদের প্রকাশের জন্য আদৌ কোনো সাংকেতিক ভাষা আহ্বান ক'রে আনতে হয় না, পৃথিবীর প্রথম উষার সামগানের মতো, তাদের স্বভাবই কবিতা, কবিতাই তাদের আদি প্রাকৃতিক রূপ। আমাদের মতো জটিল-কুটিল দেশে, সমাজ যেখানে বহু বিভিন্ন স্তরভেদের যন্ত্রণায় কাতর, অবশ্যই সরলতর কোনো-না-কোনো স্তরে লোককবির সম্প্রদায় আমাদের অভ্যর্থনা জানাবেন। মুস্কিল হলো, যা ইতিহাসের বিচারেও অত্যুচিত, ইতিহাসের খামখেয়ালেই তা হ'তে পারে না, এই স্বভাবকবিরা

এখনো সমাজপ্রবাহের নিয়ামক হ'তে পারেন না, কোনো আদিলগ্নে এই ভূমিকা তাঁরা পালন করেছিলেন কিনা তা শিলালিপি পাঠান্তে অনুধাবন করা অসম্ভব, আপাতত আমাদের শুধু আশা টিঁকিয়ে রাখা যে একদিন-না-একদিন তাঁদের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত হবে, তাঁরাই ইতিহাসকে চালনা করবেন। ইতিমধ্যে আমাদের প্রতীক্ষায় থাকা, এবং যে-সমস্ত সামন্তমন্য চরিত্র, স্রেফ বিষয়-আশয় জাহির ক'রে, স্বভাবকবি পরিচয়ে অমরত্ব দাবি করেন, তাঁদের দিক থেকে উল্টোমুখো হয়ে বসা।

সেই সঙ্গে এটা মেনে নেওয়া, দ্বন্দ্ববিধ্বস্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন সমাজব্যবস্থায় কবিকে কঠোর পরিশ্রমের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, কবিতার ভাষাকে, কবিতার প্রতীককে, কবিতার চিত্রকল্পকে শাণিত থেকে শাণিততর, সংস্কৃত থেকে সংস্কৃততর ক'রে যেতে হবে, ধৈর্যের, কষ্টের, অনুশীলনের পরীক্ষাগুলি, একটির-পর-আর-একটি, অতিক্রম ক'রে-ক'রে। এবং, যে-মুহূর্তে কবিকুশলতা তার অভীষ্ট সংকেতে পৌঁছুলো, ফের অধ্যবসায়ের পালা, এবার শ্রমলব্ধ সন্ধ্যাভাষাকে সরল থেকে সরলতর করতে হবে, ক্রমশ আরো বেশি ক'রে সমাজগ্রহণীয় করতে হবে। মহৎ কবিতাকে আমরা যে-নিটোল রূপে পাই, তা যতটুকু উন্মোচন করে, তার হাজার গুণ বেশি সংগোপনে রাখে। যে-পরিশ্রমের ভিতর দিয়ে, বছরের-পর-বছর ধ'রে কবিকে অগ্রসর হ'তে হয়েছে, কবির পক্ষে ঢাক বাজিয়ে সেই কাহিনী সমাজকে জানানো শুধু অশিষ্টাচারই নয়, সমাজবিবেকের ব্যাকরণবহির্ভূত। তেমন কু-কাজ অবিমৃষ্যকারিতাবশত যদি কেউ ক'রে বসেন, তা হ'লে কবি হিসেবে তাঁর পরিচয় প্রত্যাহৃত হয়: তিনি ব্রাত্য, তাঁর কবিতাও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপযোগ্য।

যেহেতু সকলেই কবি নন, মাত্র কেউ-কেউ, অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ স্বভাব-প্রতিভার গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া কাব্যের মুক্তি সম্ভব নয়। এবং একথাও স্বীকার না ক'রে উপায় নেই এক বিশেষ ধরনের প্রেরণা সত্তাকে সম্যকরূপে অধিকার না করলে কবি-কাহিনীর শুরুতেই শেষ। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের পরিচীর্কিা, অন্তত আমার কাছে, দৃষ্টান্ত। প্রতিভা ও প্রেরণা এই দুই অশ্বিনীকুমারের দিগ্বিজয়স্পৃহা সফলতার জন্য যথেষ্ট নয়, প্রতিভা ও প্রেরণার সঙ্গে প্রার্থনাকে বিনোদনসখী হিশেবে মঞ্চে উপস্থাপন করলেও যথেষ্ট নয়। কবিকে কর্মজীবী হ'তেই হবে, পরিশীলনের পর পরিশীলনের ক্রমানুক্রমিক পরিচ্ছেদ, ভাস্কর যেমন হাতুড়ি-বাঁটালি নিয়ে মূর্তিকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর, স্পর্ধিত থেকে আরো স্পর্ধাযুক্ত ক'রে তোলেন, এমনকি যে-কোনো-সফলতার-শৃঙ্গে-পৌঁছুতে-উদ্গ্রীব নারী বা পুরুষ যেমন প্রতিভার সঙ্গে প্রযত্নের মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন পরিশ্রমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান, কবিকেও অনুরূপ মানসিক তথা কায়িক

তিতিক্ষার পরম্পরা অতিক্রম করে এগোতে হবে। কবির পক্ষেও, অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। আমরা তো আদিম ইতিহাসের সামন্তাশ্রয়ী পটভূমি বহু শতক ধ'রে পিছনে ফেলে এসেছি, সভ্য পৃথিবী ব'লে বর্ণিত হতো যে-সংকীর্ণ ভুবন, তাতে সভাকবির সংখ্যা ছিল অঙ্গুলিমেয়, তাঁরা অল্পে তুষ্ট করতেন প্রায়-নিরক্ষর রাজন্যবর্গকে। সেই সৌভাগ্যের বা দুর্ভাগ্যের যুগান্ত ঘটেছে বহুকাল আগে, এখন কবিকে, ও কবিতাকে, জনতার মুখোমুখি না হয়ে উপায়ান্তর নেই, কবিকে তাই, কবিতানির্মাণের কাজে, প্রায় দিনমজুরের মতোই কর্মঠ হ'তে হবে। শঙ্খ ঘোষের দুই খণ্ডে মুদ্রিত 'কাব্যসংগ্রহ' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প'ড়ে ওঠার পর আমার স্থির প্রত্যয়, বাংলা কাব্যের সাম্প্রতিক অধ্যায়ে প্রতিভার ক্ষেত্রে শুধু নন, পরিশ্রমের ক্ষেত্রেও তিনি সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর বিবেক তাঁকে শান্ত থাকতে দেয় না। কোথাও ভাষা কুয়াশার ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকলে তা পাঠককুলকে অশ্রদ্ধা জানানোর সামিল, যে-অপরাধ একজন সমাজবোধের-যন্ত্রণায়-দীর্ণ কবিতিলকের পক্ষে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। নিজেকে তাই তাড়া দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নিরন্তর, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর, স্পষ্টতম হতে হবে।

কাউকে দুয়ো দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। শুধু বিশেষ এক বিপ্রতীপ আপেক্ষিক অবস্থান নিয়ে সসংকোচ ঈষৎ একটি মন্তব্য করছি মাত্র। শঙ্খ ঘোষের প্রায় সমসাময়িক অসম্ভব শক্তিধর অন্য-এক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য-চর্চার প্রসঙ্গ মনে করলেই আমি যা বোঝাতে চাইছি তা বোধহয় প্রতীয়-মান হবে। কবিতার ভাষা নিয়ে, আমার সন্দেহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আলাদা ক'রে চিন্তা করতে হয়নি। স্বভাবকবির ঐতিহ্য তিনি প্রায় পুরোপুরি টি'কিয়ে রাখতে পেরেছেন: তিরিশ বছর আগে যে-প্রতীকী পৃথিবীতে তিনি বিচরণ করতেন, সেখান থেকে আদৌ স'রে আসেননি, যে-শব্দের সমুদ্রে তাঁর আবেগকেলি, তার তরঙ্গ-উন্মাদনা ঝঞ্ঝাবাত্যা, তার ছন্দ-ছন্দবিকল্পের বিভঙ্গ-নিক্কণ, প্রায় ধ্রুপদী অব্যয়ের গুণাবলীসমৃদ্ধ। এটা যে শক্তি শুধু স্বভাব-অগোছালো, শৈথিল্যেকে পরমধর্ম বলে দাপটের সঙ্গে জাহির করছেন ব'লেই তা না। আসল কারণ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। শক্তির কবিতাকে মঞ্চের কলরোল থেকে আলাদা ক'রে কল্পনা করা যায় না। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের অব্যবহিত আগে এবং পরে, মস্কো-লেনিনগ্রাদ-ওডেসা-টিবলিসে যা খুব প্রাধান্য পেয়েছিল, এক দঙ্গল কবি, তাঁদের কাব্যের ভার অথচ কবিতার শরীর ছাড়িয়ে, শহর-নগরের উল্লেখনীয় চৌমাথায়, নয়তো উদ্দাম মিছিলের শুরুতে কিংবা শেষে, মঞ্চবর্তী হয়ে, সেই কবিতার পঠনের বিন্যাসের সঙ্গে কাব্যের অভিব্যক্তির অনেকাংশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, কবিতায় কী বলা হলো কেমন ক'রে বলা হলো তার উপর, অনেকটাই নির্ভরশীল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দেশগত-সমাজগত পার্থক্য সত্ত্বেও,

সেই ঐতিহ্যের ধারক, পরিভাষার অসম্পূর্ণতাই বলুন, পরিপ্রসাধন বলুন, তা তাই তিনি অবলীলায় এড়িয়ে যেতে পারেন। অন্য দিকে শঙ্খ ঘোষ, তাঁর হয়তো তীক্ষ্ণতর, তীব্রতর সামাজিক দায়বদ্ধতা সত্ত্বেও, স্বভাবের বিচারে অন্য গোত্রভুক্ত। সমাজস্থ সবাই তাঁর কাব্যে অবগাহন করুন এটা তাঁরও কাছে সমান কাঙ্ক্ষণীয়, কিন্তু, তাঁর অভীপ্সা, প্রত্যেকেই একটু আলাদা-আলাদা হয়ে তাঁর কবিতায় প্রবেশ করুন, তাঁর ভাষা, তাঁর সংকেত, তাঁর প্রতীক একের-সঙ্গে-একের মুখোমুখি আলাপের অভিপ্রায়সংপৃক্ত। কবি সমাজের কথা বলছেন, সকলের কথা বলছেন, সবাইকে বলছেন, তবে প্রত্যেককে সম্মান জানিয়ে আলাদা ক'রে কথা বলা তাঁর লক্ষ্য। জনতার মুখরিত কলভাষা সুতরাং তিনি পাশ কাটিয়ে যান। সেই যে বুদ্ধদের বসু জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রতি একদা মুগ্ধতা নিবেদন করেছিলেন : 'সে-পথ নির্জন যে-পথে তোমার যাত্রা', শঙ্খ ঘোষের সমগ্র সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কেও সেই উক্তির প্রয়োগ যথাযথ। শুধু যে-মন্তব্য অতিরিক্ত সংযোজন করা প্রয়োজন, পথ নির্জন হলেও গন্তব্যবিন্দু কিন্তু সামাজিক জিজ্ঞাসা-প্রশ্ন-আর্তি-কাতরতা দ্বারা সম্যক চিহ্নিত।

'দিনগুলি রাতগুলি' থেকে শুরু ক'রে 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' পর্যন্ত, সব মিলিয়ে প্রায় চার দশকের স্বগতকাহিনী। সূর্য-শাসিত সময়ের আয়তনে এই কাহিনীকে মাপতে পারি আমরা, কিন্তু যোজনের মধ্যেও তো অন্য যোজন। আবেগের শরীরে অন্যতর শরীরের আকৃতি, একটু-একটু ক'রে এক অনুভাবনা থেকে অন্য অনুভাবনায় উত্তরণ 'অবশেষে কথার কাকলি তুলে বীথিকুঞ্জ সাজাবে প্রণয়ী, উচ্চকিত পৃথিবীর দুর্বার প্রণয় উপেক্ষা ক'রে, কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্লেষ-ধন্য মেঘ-কুঞ্জ কথার প্রণয়', যদি মনে হয় একটু বেশি বাঙ্ময় সত্তার, তা কি সেই সঙ্গে কবি-কিশোরের অপাপবিদ্ধতাও লিপিবদ্ধ করছে না? তারপর তো অভিজ্ঞতায় একটু-একটু ক'রে অনেক শিহরণের গুঞ্জন, অনেক উদ্বেগের ছন্দপ্রক্রিয়া, অনেক দ্বান্দ্বিকতার প্রজ্ঞা, ভাষা নির্মোকের পরে নির্মোক উন্মোচন করে, কবি তাঁর স্বভাববৃত্তিকে নকল পোষাকে পরিবৃত করেন না, কিন্তু বৃত্তিও একটু একটু করে বুঝতে পারে ঘরের মধ্যে ঘর। যত বেশি অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ, রহস্যগুলি একটু-একটু ক'রে সহজ হয়ে আসে। 'আমি জীবনের কথা বলি যখন তোমার মৃত চোখের পাতার ওপর থেকে অদৃশ্য হাত সরিয়ে নিয়ে কোটরে কোটরে রেখে যাই আমার অধিকারহীন আপ্লুত চুম্বন' : এই বিবৃতি সহস্র তেপান্তর পেরোনোর ইতিকথা বুকে জড়ো ক'রে রেখেছে। এমন নয় যে জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রষ্টির গণিকা কখনো-সখনো রঙিন গলিতে ঢোকার জন্য প্রলোভনের রুমাল ওড়ায় নি। 'ভুবনজোড়া আগুন চায়/জলের নিচে ঘুম / শরীর, তুমি শরীর শুধু—/মন নাই কুসুম?' পর্যায়ে প্রায়-তারল্যের প্রবণতা ব্যাখ্যা করা যায়, তবে ঢালাও সমর্থন করতে গেলে ঢোঁক

গিলতে হয়। ঘৃণা-ব্যঙ্গ-কষাঘাত-অনুযোগ তো সামাজিক মানুষের দিনগুলি-রাতগুলির অমোঘ অনুচ্ছেদ, কিন্তু যে-কবি আমাদের আলোচনার মধ্যবিন্দু, চতুরালি যেহেতু তাঁর স্বভাবপ্রতিভার সঙ্গে সাযুজ্যশূন্য, ইত্যাকার প্রয়োগ একটু কর্কশ ঠেকে, কোনো প্রকৃতিবিরুদ্ধ পাপাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব'লে ঠাহর করি, ঠাহর করি বলেই দ্রুত আমরা মুখ ঘুরিয়ে নিই, আশ্রয় অনুসন্ধান করি নিম্নোদ্ধৃত নিটোল স্বীকৃতির মধ্যে : 'আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় ওই এক মেঘের মতো মানুষ/ওর গায়ে টোকা দিলে জল ঝরে পড়বে মনে হয় / আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় এক মেঘের মতো মানুষ / ওর কাছে গিয়ে বসলে ছায়া নেমে আসবে মনে হয় / ও দেবে, না নেবে ? ও কি আশ্রয়, না আশ্রয় চায় ? / আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় ওই এক মেঘের মতো মানুষ / ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমিও হয়তো কোনোদিন / হতে পারি মেঘ'।

আসলে এই অস্তিত্ববোধই হয়তো শেষ পর্যন্ত কবিতার অঙ্গীকার তথা মুক্তি। কবি, আধুনিক কবি, সমাজের পিতৃত্বকে স্বীকার করতে যে-কবির কোনো গ্লানি নেই, যুগপৎ আশ্রয় ও আশ্রয়প্রার্থী। এই কবির সৃষ্টি সমাজবাসীদের লালন করে, উদ্দীপিত করে। তাঁদের অন্তঃস্থল থেকে আবেগ উথলে ওঠে : 'কবি তুমি যেয়ো না যেয়ো না', কিন্তু এই কবিকে পাশাপাশি অন্য ভূমিকাতেও বৃত হ'তে হয়, সেই ভূমিকার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া স্থগিত রাখলে তা মস্ত সর্বনাশ, কারণ, 'তোমার সমগ্র সত্তা যতক্ষণ না-দাও আমাকে / ততক্ষণ কোনো ত্রাণ নেই', এই ধ্রুব উপলব্ধি কবির চেতনার পরতে-পরতে। শেষ পর্যন্ত কবির সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় পরিচয় তাঁর প্রেমকথা, এই প্রেম, ইতস্তত চঞ্চলতার ঝোড়ো হাওয়া যখন নিভে আসে, আনুগত্যে ফেরায়, সংযমে সংহত হবার মন্ত্রদীক্ষা দেয়, শস্যকণার স্বর্ণসম্পদ থেকে বিষাদ ধুলো-মাটি-কাঁকরের কণাকে বাছাই করবার প্রকরণে দীক্ষা দেয়। সেই অনুশীলনের অধ্যায়ে যখন যবনিকা নামে, কবি নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখন পরম বিশ্বাসে বলতে পারেন, এখন উৎসবের ঋতু, পরিপূর্ণতার ঋতু : 'শব্দ নিশানের উড়াল পথ ধরে, মশাল তুলে দেয় শিল্পী /এমনই গঙ্গার ভঙ্গ মুছে নেয় দ্বিধার দ্বন্দ্বের লজ্জা / তুমি যে আমাদের সঙ্গে যেতে চাও সেটাই আমাদের শক্তি / আমরা বুঝে নেবো জীবনজটিলতা / তোমার চোখে চাই স্বপ্ন'।

সবশেষে একটি বিশেষ প্রশ্ন বর্তমান আলোচককে পীড়িত করে। কবি একই সঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রয়দাতা। কিন্তু এই দ্বৈত ভূমিকা পালনের মুহূর্তে তিনি তো দৃষ্টান্ত স্থাপনও ক'রে যাচ্ছেন : পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত, অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত, যন্ত্রণায় দীর্ণ হবার দৃষ্টান্ত, সবচেয়ে যা বড়ো কথা, আত্মরতির বৃত্তে নিজেকে নির্বাসিত হতে না দেওয়ার মতো মানসিক সাহস সঞ্চারের দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তের উত্তরাধিকার

কবি তো রেখে যান তাঁর অনুজদের জন্য। শঙ্খ ঘোষ নিজেকে নিজের প্রতিধ্বনি হ'তে দেননি কখনো, নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন, সমাজবিন্দুতে অলক্ষ্যনিয়মে ফিরেছেন, কিন্তু প্রতি পর্যায়ে পরিশোধিত পূর্ণায়ততর কবিসত্তা নিয়ে। এবংবিধ উজ্জ্বল উদ্ধার কেন পর্যাপ্ত অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে অসমর্থ, তারও সামাজিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাতে তো অনুশোচনার পরিমাপ সংকুচিত হয় না, যখন দেখি পরবর্তী প্রজন্মবর্তীদের মধ্যে যাঁর উপর সর্বোচ্চ ভরসা ছিল, সেই জয় গোস্বামী পর্যন্ত পরম উৎসাহে ইতিমধ্যেই নিজের কবিতার পুনর্লিখনে মেতে উঠেছেন। ভয়ে বাক্‌রহিত হ'তে হয় তাই। তা'হলে কি, আরো একটু কনিষ্ঠ, জয়দেব বসুদেরও একই হাল হবে? শঙ্খ ঘোষের দীর্ঘ পরিচিকীর্ষা কী শিখিয়ে গেল তা হ'লে বাংলা কাব্যকে?

অশ্রুকুমার সিকদার

...

কালের মাত্রা ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা

সব কবি হয়তো সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন না, তবু প্রত্যেক কবির মধ্যে একজন সমালোচক প্রচ্ছন্ন থাকেন। প্রেরণার বশে বা অবচেতনার উৎস থেকে উঠে আসে, অথবা যেমনভাবেই হয় হোক কবিতার সূত্রপাত, তাকে চূড়ান্ত চরিতার্থতার স্থায়িত্ব দিতে গেলে সক্রিয় হয়ে ওঠে কবির সমালোচনা-বুদ্ধি। সৃজনক্রিয়া আর এই মননক্রিয়া তাই বলে দুটো বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়। একই সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকতে পারে দুই ধরণের মেধা—সৃষ্টির আর সমালোচনার। জীবনানন্দের মতো একজন কবির অথবা সুধীন্দ্রনাথের কাটাকুটি-লাঞ্ছিত পৃষ্ঠায় থেকে যায় সমালোচক-মননের ক্রিয়াশীলতার প্রমাণ। আবার এমন কবি আছেন যিনি ট্রামে-বাসে চলতে-চলতে বা পথে হাঁটতে-হাঁটতে মনে-মনে সেরে নিতে পারেন সেই ক্রিয়াকর্ম আর মনের মধ্যেই যেই সব ঠিকঠাক মিলে যায়, তখনই লিখে ফেলতে পারেন কবিতাটি কাগজের পৃষ্ঠায়। সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সমালোচনাবুদ্ধি কোনো বহিরঙ্গ প্রমাণ রেখে যায় না। অবশ্য কিছু কবিকে আমরা পাই যাঁরা শুধু রচনাকালে নিজের কবিতার সমালোচক নন, যাঁরা কবি-সমালোচক। যাঁরা অন্যের কবিতার সমালোচনা করেন, কবিতা প্রসঙ্গে নিজের ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করেন। বর্তমান যুগটা যেহেতু সমালোচনার যুগ, তাই আধুনিক কালেই কবি-সমালোচকের প্রাদুর্ভাব বেশি। রেনে ওয়েলেকের মতে অবশ্য একই ব্যক্তির মধ্যে এই কবি আর সমালোচকের সম্মিলন প্রায়ই সুখের হয় না। দান্তে, গ্যেটে, কোলরিজের মতো মহান কবি-সমালোচকের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেছেন, তাঁদের দুই সত্তা ছিল পৃথক। তাঁরা যখন কবি তখন সমালোচক নন, যখন সমালোচক তখন কবি নন। ওয়েলেকের এই কথাটা মানা কঠিন, কিন্তু সেই তর্কে আমাদের দরকার নেই। আমরা এলিয়টের মতো কবি সমালোচকের দৃষ্টান্তে দেখি, একজন কবি সমালোচনাপ্রবন্ধ লেখেন আসলে নিজের ধরণের কবিতার পাঠক প্রস্তুত করার জন্য, 'to defend the kind of poetry he is writing'। ফলে কবির সমালোচনা অন্য কোনো কাজে লাগুক বা না-লাগুক, কবির নিজের কবিতা বুঝে নেবার কাজে অনেকটাই লাগে। কারণ একই ব্যক্তিত্বের দুই

ধরণের প্রকাশ তো কবিতায় আর সমালোচনায়। কবিতা বিষয়ে সামান্য আলোচনায়, ভিন্ন কবি বিষয়ে বিশেষ আলোচনায় অনেক ইশারা থেকে যায়, যাকে দিশারি করে প্রবেশ সহজ হয় কবির নিজের কবিতায় নিজস্ব জগতে। শঙ্খ ঘোষের কবিতা আলোচনা করতে গেলে এই পদ্ধতির আশ্রয় নেবার কথা একজন পাঠকের মনে হতেই পারে।

মানুষের সত্তার সমস্যা এই কবির কবিতায় ফিরেফিরে আসে। সেটাই শঙ্খর কবিতার না-ছোড় পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। মানুষের এই সত্তা দেশ দিয়ে ঘেরা, আবার সেই দেশ কালে বিন্যস্ত। একটু অন্তর্নিবিষ্ট বলেই being আর becoming-এর মুখোমুখি যে ছবি দেখতে পাওয়া যায়, অপেক্ষমান পরিবর্তমান নিত্যজায়মান যে অস্তিত্বের ছবি, সেই ছবি গড়ে ওঠে দেশকালের এই বিন্যাসে। সব মানুষের অস্তিত্বই এই দেশের উপর পা রেখে বটে, কিন্তু সেই দেশ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'খণ্ডভূমি', তার কালও খণ্ডকাল, নিতান্ত নিজস্ব আয়ুষ্কাল। কিন্তু প্রকৃত মানবধর্মে সমৃদ্ধ যে মানুষ সে নিতান্ত আমির গণ্ডিতে, সংকীর্ণ দেশ ও সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে বন্দী থাকে না। 'নিজের খোলস ভেঙে মানুষের এই আত্মসচেতন বিস্তারের ইচ্ছে' একদিকে বিশ্বের সঙ্গে আমি-র সংযোগ ঘটায়, অন্যদিকে রবার্ট পেন্ ওয়ারেনের ভাষায় ঘটায় 'chronological time and history'-র যোগ। বিস্তৃত দেশ ও প্রসারিত কালের মধ্য দিয়ে মানুষ আত্মোপলব্ধি করে, এই সত্য রবীন্দ্রনাথের মতো, শঙ্খ ঘোষের মধ্যেও দৃঢ়মূল। তাই রবীন্দ্রনাথ 'মানবসত্য' প্রবন্ধে যে বলেছেন মানুষের জন্মভূমি তিনটি ('প্রথম পৃথিবী।...মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক।...এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত।...তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক।...অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক।...একটা ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত।') তা এই কবির অনুমোদন পায়। তাই দেশগতভাবে 'আমি আর না-আমির জটিল টানাপোড়েনে' এগিয়ে আসে অস্তি। এবং 'ছিন্ন একটা নিমেষও আর একাকী স্বয়ংতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, তার সফলতা গড়ে ওঠে ব্যবধিহীন কালস্রোতের অংশ হিশেবে।'

সাহিত্য বিষয়ে সমালোচনায় এইসব কথা যে তিনি বলেছেন তার সত্য, হয়তো অতো স্পষ্ট করে নয়, শঙ্খর কাছে ধরা পড়েছিল এমনকি তার প্রথম প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছেই। এইভাবেই একজন কবির নিজস্ব নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায় একেবারে গোড়া থেকে। আমাদের অস্তিত্বের একটা দিক আত্মিকতায় কেন্দ্রে থাকে, অন্য একটা দিক থাকে বাইরে মুখ-ফেরানো। বিশ্বগত আর ব্যক্তিগত সামনা সামনি এসে দাঁড়ায়, সমন্বিত হয়। ভিতর-বাইরের দ্বন্দ্ব

আর দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই অস্তিত্ব পায় তার চরিতার্থতা। কবি যখন ভিতর আর বাইরেকে মিলিয়ে নেন, যখন বাইরের বিশ্বকেও আয়ত্ত করেন ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে, যখন বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা, বোধি আর প্রেরণা সমবেতভাবে সংহত হয় চেতনার এক কম্পমান বিন্দুতে, তৈরি হয় যেন শিখার মতো দীপ্যমান একটি রেখা, শঙ্খ, ঘোষ মনে করেন, 'এই রেখাটিকে বিস্তৃত করতে পারার মধ্যেই কবিতা রচনার করণকৌশল লুকোনো।' সকলের সঙ্গে কবিকে পথ চলতে হয়, সকলের জীবনের অংশভাক্ হয়েই নির্মিত হয় কবির ব্যক্তিত্ব। শুধু নিজেকে নিয়ে নয়। সমগ্র সত্তার মধ্য দিয়ে জীবনকে পেতে চান যে কবি, বিশ্বকে তিনি দেখেন সমগ্র স্বরূপে। সেই দেখাই ছন্দে, বাক্‌প্রতিমায়, শব্দের আততিময় বিন্যাসে স্থায়িত্ব পায়। তাই 'আমার আশ্লেষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে নাও', বা 'আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয়' এইসব উচ্চারণ শঙ্খ'র কবিজীবনের সূত্রপাত-মুহূর্তেই শোনা যায়।

> আনন্দে চিরায়ু চাও লগ্ন তুমি প্রত্যহের স্রোতে।...
> উপরে আকাশ ঢাকে প্রকাণ্ড ডালায় বসুধারা—
> নিচে খুলে খুলে যায় সব তুচ্ছ সবুজের মুঠি...।
>
> (ধানে গানে বসুধায়)

ভিতর যেমন বাইরের দিকে যায়, বাহির যায় ভিতরের দিকে, তেমনি প্রত্যহের স্রোত বা অন্ততন ছুঁতে যায় চিরায়ু বা চিরন্তনকে, বেরিয়ে যায় সীমাবদ্ধতা থেকে সীমাহীনতার দিকে। বসুধারার উপর অনন্ত আকাশ তুচ্ছকে অতুচ্ছ করে দিতে পারে।

শঙ্খ যাকে কবিতার মুহূর্ত বলেছেন, 'এইসব মুহূর্তই হলো অতীত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের মিলনমুহূর্ত, নিমেষের মধ্যে সময়টাকে তখন ভাবীকালের দিকে সরিয়ে নিয়ে অতীত হিশেবে ভাবতে পারা যায়।' অতীত বর্তমানের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকে, বর্তমানকে ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে অতীত বলে ভাবা যায়— এইভাবে কালের চিরচকল গতি একটি মুহূর্তে সংহত হয়। দেশনিহিত বর্তমান মুহূর্তকে এইভাবে কবি 'দাঁড় করিয়ে দেন দেশোত্তর সময়ের মুখোমুখি'। এই মুহূর্তটিকে কবি ধরে নিতে পারেন নিরাসক্ত অথচ কৃতজ্ঞ এক অঞ্জলিতে।

> এক মুহূর্তের তাপে কেন্দ্র ও পরিধি কাছাকাছি
> যা ছিল যা হবে তার দুই মুখ কথা বলে এসে—...।
>
> (পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, ৩৭)

হৃদয় আর মেধার সমন্বয়ে কবিকে সেই সৃষ্টির মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকতে হয়। সেই সৃজনের মুহূর্তটি যখন আসে তখন যেন কোনো না-থেকে, এক শূন্যতা থেকে উঠে আসে আশ্চর্য এক সত্তা, কবিতা; প্রচ্ছন্নতা থেকে আলোয়।

এইভাবে কবিতার মুহূর্ত কবিতায় রূপান্তরিত হয় এবং কবিতার মধ্যে ধরা পড়ে এমন এক মুহূর্ত যা বর্তমানে দাঁড়িয়ে ছুঁয়ে আছে অতীতকে, প্রসারিত হয়ে গেছে ভবিষ্যতের দিকে। কবির অন্তর্গত অভিজ্ঞতাসূত্রে ত্রিকালকে একত্র বেঁধে রাখে কবিতার একটি বিন্দুতে, স্থির অথচ কম্পমান। এইভাবে মিলে যায় শঙ্খ ঘোষের কবিতায় দৈনন্দিন আর চিরন্তন, মিলে যায় প্রত্যক্ষকাল আর ধারণাকাল। প্রত্যক্ষকালে প্রতিদিনের সামান্যতা, ধারণাকালে অতীত-ভবিষ্যৎহারা চিরবর্তমানের ধারা।

ক. সমস্ত ব্যসন কান উজ্জ্বলতা ঘুমিয়ে পড়েছে
বাহির দুয়ারে চাবি, আমি নতজানু একা
আমার নিজের কাছে ক্ষমা চাই, পরিত্রাণ, প্রতিটি শব্দের
শান্তি···। (যখন প্রহর শান্ত)

খ. ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়
সমস্ত মিলায়
এমন মুহূর্ত আসে যেন তুমি একা
দাঁড়িয়েছ মুহূর্তের টিলার উপরে, আর জল
সব ধারে ধাবমান জল
প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন
আর, তুমি একা
এত ছোটো দুটি হাত স্তব্ধ করে ধরেছ করোটি
মহাসময়ের শূন্যতলে—··· (অঞ্জলি)

গ. দিনের বেলা যাকে দেখেছিলে চণ্ডাল
আর রাত্রিবেলা এই আমাদের মাঝি
কোনো ভেদ নেই এদের চোখের তারায়···

চতুর্দশীর অন্ধকারে বয়ে যায় গঙ্গা
এক শ্মশান থেকে আরেক শ্মশানের মাঝখানে
আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাই না।

(মণিকর্ণিকা)

ঘ. জাগ্রত মানুষ শুধু রক্ত খায়
দুধারে স্ফুরিত রক্ত খায় তারা পৃথিবীর শহরে বন্দরে
জানা বা অজানা বহু অন্ধ করপুটে
প্রাণের নিশ্বাস খায় তারা
আর দশ দিকে

ডানায় জড়ানো শূন্যে হারানো গলার স্বর খুঁজে মরে একা মধ্যরাত।
(হারানো গলার স্বর)

মুহূর্তের টিলার উপরে দাঁড়ানো মানুষের হাতে ধরা দেয় মহাসময়, 'যে-কোনো মুহূর্তের মধ্যেই আছে চিরন্তনের আভাস, যে-কোনো তুচ্ছের মধ্যেই অতুচ্ছের দ্যোতনা', আর তাই 'ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই' বাস-সহযাত্রীর এই পরামর্শ শুনে মনে জিজ্ঞাসা জাগে,

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে।
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে? (ভিড়)

শঙ্খ নিজেই বলেছেন, 'কথাগুলি যেন স্তর থেকে স্তরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভিড় থেকে দূরে, একারই কোনো কেন্দ্রে, নিজের একেবারে মুখোমুখি।' 'পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন' বাস-কন্ডাক্টরের এই হাঁকের মধ্যেও রণিত হয় গভীর দ্যোতনা, আমাদের সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি। একুশ শতকে যে দেশ চলে তার মধ্যযুগে এগিয়ে চলার দৃষ্টান্তের কোনো অভাব নেই যেহেতু। একই ভাবে একটি বৃষ্টির দিন মিলে যায় অনন্তের সঙ্গে,

বৃষ্টি নয়, বিন্দুগুলি শেফালি টগর গন্ধরাজ

মুছে নিতে চায় তার জীবনের শেষ অপমান
বাসাহীন শরীরের উড়ে-যাওয়া ম্লান ইশারাতে
বৃষ্টি হয়েছিল বুকে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে।
(সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে)

অতীত থেকে বর্তমান আসে, বর্তমান এগোয় ভবিষ্যতের দিকে। কাল-প্রবাহ যেন এক পথ। সময়ের দেশের বাসিন্দা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় তাই কি বারেবারে পথের কথা আসে? পথের যে কোনো বিন্দুকে ছুঁয়ে আছে পিছনের পথ অতীত, আর সেই বিন্দু আবার উন্মুখ হয়ে আছে সামনের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য। পথেই তো উত্তরণ সদর থেকে অন্দরে, যেমন সময়ের দেশ যায় সময়াতীত দেশের দিকে। 'পথে পথে উল্লাস অথই বাঁধে যাকে', 'ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ারহারা পথ', 'ঘরে থাকতে অল্প মতি, রোদে রোদে পথে ঘুরে ফেরা' —প্রথম কবিতাগুচ্ছ থেকেই সুর বাঁধা হয়ে যায়। যেমন শঙ্খ রবীন্দ্রনাটক আলোচনায় দেখিয়েছিলেন পথ শুধু দৃশ্যরূপ নয় সেখানে, তত্ত্বরূপও বটে, তাঁর নিজের কবিতাতেও তেমনি। তাই মুক্তির পথ, উত্তরণের পথের কথা, কাল থেকে কালাতীত, দিনানুদিন থেকে চিরন্তনের পথের কথা বারেবারে মেলে।

'গুরুতর হাজারদুয়ারি ভালোবাসা' কবিকে পথে নামায়। কালপ্রবাহের চেতনা পথের উপমায় রূপ পায়।

ক. আমি খুব ভুল করে এ-রকম বৃষ্টিময় দিনে
ঘর ছেড়ে পথে যাই, পথ ছেড়ে আনন্দ নদীর
নদী চায় আরো ত্যাগ পৃথিবীর সীমানা অবধি
ধারাময় হয়ে যায় আমাদের নির্ভার জীবন··· (ত্যাগ)

খ. দাঁড়িয়ে আছি এই পথের বাঁকে

আর সামনেই
ডালপালাহারা দীর্ঘ বাকল
ঠাণ্ডা আর চুপ··· (পথের বাঁকে)

যদিও 'উপুড় হয়ে পড়েছিলাম খোলা পথের উপর,' কিন্তু তাই বলে কেন্দ্র থেকে সরে যাওয়া নয়।

আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই

তুমি আছো, তুমি। (তুমি)

এই কবির পথ এগিয়ে চলেছিল পদ্মাতীর থেকে কলকাতায়। অপাপবিদ্ধতা থেকে সংঘাতে, রূঢ়তায়। উদ্বাস্তুর অভিজ্ঞতা আর পুনর্বাসনের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে কাটে শেষ-কৈশোর, প্রথম-যৌবন।

কী ছিল বয়স কী ছিল হৃদয়, তখন
পদ্মা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল বিদায়—
আজ মনে জানি তুমি নও তুমি নও
আমিই আমাকে ছেড়েছি মধ্যরাতে। (একা)

এ তো শুধু পরিচিত নিসর্গ ছেড়ে আসা নয়, এ যে নিজের শিকড় ছিঁড়ে আসা। তাই সেদিনের দেশ-ছেড়ে পালানোর লজ্জা পরে গ্লানিতে ভরে দেয়, যখন ১৯৭১-এ বাংলাদেশের জয়ে তিনি না-লিখে পারেন না,

আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই জয়
কিন্তু সে কথা বলা আমার সাজে না···
আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি

তাই আজ যদি দুহাতে তুলতে চাই অভয়
কেঁপে যায় হাত, মনে পড়ে
এত দীর্ঘ দিন আমি কখনোই তোমার পাশে ছিলুম না
না
সুখে না দুখে না লাজে না
তবু তোমার সামনে আজ বলতে চাই জয়
যে কথা আমার বলা সাজে না। (দেশহীন)

অতীত স্নিগ্ধতার স্মৃতি আর বর্তমান কলকাতার বিরোধ ধ্বংস মিথ্যাচার, 'পদ্মা আর কলকাতা, কৈশোর আর যৌবন এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়' কবিতার মুহূর্তে আর এই দুইয়েরই সংঘাতের 'মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন' কোনো মুক্তির দিকে, তৃতীয় সত্তার দিকে। বাইরের পৃথিবী ও ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে নিরন্তর আসা-যাওয়ায় যেমন গড়ে ওঠে তৃতীয় সত্তা, তেমন। তৃতীয় সত্তা ; যেমন পুব বা পশ্চিম থেকে আগত দুই নর ও নারী দেখে 'ওই দক্ষিণ জগৎ / অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জলে ওঠে দূর বন্ধ অন্তরাল ভেঙে।' অতীতের উদ্দাম উধাও বাল্যসহচর পদ্মাতীরবর্তী স্বদেশ মানচিত্র-খণ্ডে রেখায়-রেখায় লুপ্ত, কিন্তু স্মৃতিতে জেগে থাকে ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা, নৌকোর ছলাৎছল, 'শব্দকুহক, নৌকা-কাঙাল, খোলা আজান' বাংলাদেশ, খালযমুনা, ফুলফুলন্ত নির্জনতা। অন্যদিকে বর্তমানে 'আলগা খোলা শ্যামবাজারে / সবার হাতে ঘুরতে-ঘুরতে বিন্দু-বিন্দু জীবনযাপন।'

যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া
দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুনুচির অন্ধকার···

ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল
যাই পাকা সুপুরির রঙে-ধরা গোধূলির দেশ
আমি যাই (দশমী)

আমি যাই ; যেতে হয়েছিল, স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্যত।

যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ধ্বস
তীরবল্লম
ভিটেমাটি
সমস্ত একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিমমুখে
স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল
ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়
এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন। (পুনর্বাসন)

মধ্যদিনে এসপ্ল্যানেডে দারুণ ধায় যে মানুষবিহীন ট্রাফিক, তার মধ্যে দাঁড়ানো শহরপাপীর 'বুক আড়ালে এক শো গ্রাম' থেকেই যায়।

জীবনানন্দের অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন এই কবির পরিস্থিতি। পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশ, যে দেশে 'নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে', যেখানে 'আকাশের রং ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো কোমলনীল', কামরাঙা বাসকের গন্ধে-ভরা রূপসী-বাংলা জীবনানন্দের কবিজীবনের এক স্বতন্ত্র পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে মেলে শতচ্ছিন্ন নগরী কলকাতা। সেই কলকাতার ধূসর বর্ণহীন দিনগুলিতে চালতার পাতা থেকে জ্যোৎস্নায় শিশির-ঝরার, গাজন গানের ম্লান ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাসের স্মৃতি আর জাগে না। এখন 'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়', বোনভায়ের নিয়ত বিপন্ন রক্ত। শঙ্খ ঘোষের কবিতায়, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যে, বর্তমানের মধ্যেই অতীত জেগে থাকে; কবিতায় স্পন্দমান মুহূর্তে দুইয়ের ঘটে উজ্জ্বল একত্র প্রকাশ। মাঝে-মাঝেই মনের মধ্যে

জলের উপর ভাসে আমার ছেড়ে আসা
সারিবাঁধা বদর বদর ডাক

বেজে উঠল অনেক দিনের ঢাক। (বেজে উঠল ঢাক)

এইভাবে যেমন 'আমাদের স্নেহগুলি সঞ্চিত অধীর অন্ধকারে / বীজ হয়ে বেঁচে থাকে উৎসবে ব্যসনে দুঃখে শোকে,' তেমনি ধানখেতে ঢেউ নীলনীলিমা নিয়ে স্মৃতি-শুশ্রূষায় মালিন্য ধোয়ায়।

সভ্যতা অসুস্থ, শুভরাষ্ট্র নেই, পৃথিবীতে অদ্ভুত আঁধার, 'শিবলিঙ্গে বাদুড়ের ছায়া'। জীবনানন্দের ভাষায় 'নরকের মতোন শহর'। বাস্তুহারা এসে যেখানে আশ্রয় নেয়,

এই সেই অনেক দিনের ঘর, তার দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে···
বৃদ্ধা ঠাকুমার নামাবলির মতো মূঢ় দেয়ালের অসহ্য দূরবলোক্য
তর্জনী···

আমি জানি মায়ের এই দম্ভ ঘুচবে না কোনোদিন
অকুলানের সংসারকে ঝুলিয়ে দেবার দম্ভ—···
প্রজাপুঞ্জ বাইরে বেরোয় ঘর ছেড়ে কোন্‌খানে একটু নিশ্বাস মিলবে
শূন্য নীলে কিংবা শহরে
যেখানে ঘর নেই, ঘরের নৈরাশ্য নেই, ঠাকুমার চোখ নেই।
(ঘরে বাইরে)

বিরূপতা-বিতৃষ্ণা জাগায় এই শহর, যেখানে পথিকের প্রশ্নের উত্তরে ভুল-পথ

দেখিয়ে দেয় কলকাতা এবং 'ভিতরে শাবল হাতে ছিল এক পাড়ার বালক'। প্রতিহারী ছিল যে বেড়াল সেই সুযোগ পেয়ে 'আমার একাকী পাখি খুন করে খেয়ে গেছে কাল'। বন্যার সর্বনাশে যখন ধ্বস্ত মফস্বল তখনও নির্বিকারভাবে নগরী ভাস্বতী দীপান্বিতা হতে পারে। বাপজানকে ডাক দিয়ে যে বালক বলে,

কইলকাত্তার নাশে
যার দিকে চাই তারই মুখে আন্ধিকালের মজা পুকুর
শ্যাওলাপচা ভাসে··· (কলকাতা)

এবং প্রতিজ্ঞা করে 'কইলকাত্তায় যামু না', সে কবির হয়েই কথা বলে। কেন-না তিনিও তো এই শহরে 'ছন্দের সংসারে কানামাছি' হয়ে আছেন; এক-একটা দিন চলে যায়, দিনশেষে হিশেব করে দেখা যায় সকাল থেকে কেউ সত্য কথা বলেনি। চোখে লোভ, মুখে শুধু খই ফোটে। শহরে বাবুদের নজর মসৃণ মসলিনে প্রমোশন পেয়ে যাওয়ার দিকে। ভিখারিকে কুড়িয়ে খেতে দেখলে বাবুদের লজ্জা হয়, মাঝে-মাঝে তাঁরা খড়খড়ি তুলে দেখেন বিপ্লব কতো-দূর, আর বাবুদের

এ বাড়িতে
যা যা থাকা উচিত, সবই আছে
মাছ আছে পাখি আছে ফুল আছে।···

আছে সবই। এমন-কী ওরা দুজনেও
বেশ আছে
এত বেশি আছে যে জানে না বুকের মধ্যে কাচে

আসলে লাফায় বুড়ো ব্যাঙ। (ব্যাঙ)

এই শহরের থাবায় লুকোনো বহু বাঘনখ আর লোমশ কাকুতি, চোখের প্রতিটি পক্ষ্মে ধূর্ততা; দুই চোখে জল নয়, লালা। ইড়াপিঙ্গলা সুষুম্নার সুড়ঙ্গরেখা বেয়ে শহরে প্রবাহিত হচ্ছে হাশিশ মারুয়ানা। 'হৃৎপিণ্ডে মাদকের থুৎকার / অন্ধকে পথ দেখায় অন্ধেরা'। কলকাতা যে-সভ্যতার প্রতীক সেই সভ্যতার অসুস্থতায়, বধির সমাজের দৃষ্টিহীনতায়,

আমি দেশকে ছুঁয়েছি পাথরে
তার হৃদয় জাগাতে পারিনি
অন্নপূর্ণা সাজাবার দায়ে
গড়েছি শ্মশানচারিণী। (দেশকে ছুঁয়েছি পাথরে)

কবির তুমি তো অনেক সময়েই আমি। কবি তাই নিজেকেই পরামর্শ দেন,

শহর ছেড়ে সঙ্গ ছেড়ে পালা···
পালা এবার দৌড়ে পালা, পালা
বিদ্যে ছেড়ে সিদ্ধি ছেড়ে পালা। (পালা)

লুণ্ঠনে শোষণে ভ্রষ্টাচারে আত্মপরিচয়হীন ভিখারি এই দেশ, ভিখারি এই দেশের মানুষ। সমাজ-সভ্যতার যে অন্যায় রূপ নিয়েছে শহরের বাক্প্রতিমায়, সেই শহরের পথে-পথে ভিখারিরা—সভ্যতা-সমাজের অন্যায়ের শিকার মানুষের প্রতি মর্মবেদনায় শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বারে-বারে উঠে আসে ভিখারির ইমেজ। একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। শহরের আনন্দময় সকালেও তাঁর নজরে পড়ে,

আঁকিবুঁকি গলি, পথ, দোকান-পসার, ছোটো সিঁড়ি
অন্ধকার ভিজে ঘর কুঁকড়ে থাকে মলিন ভিখিরি···
(সকাল দুপুর সন্ধ্যা)

আমরা দেখি পথের ভিখিরি মাকে, ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেখি সেই ভিখিরি মেয়েকে যে কবির মেয়ের সঙ্গে মমত্ববোধে একাকার হয়ে যায়,

সি আই টি রোডের বাঁকে পাথরকুচির উপর
হাত ছড়িয়ে দিয়ে
ঘুমিয়ে আছে আমার মেয়ে
বুকের কাছে এনামেলের বাটি। (ভয়)

সমাজ ভিখারিকে ভিখারিতে পর্যবসিত করেছে, তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছে, পরিণত করেছে সামাজিক উচ্ছিষ্টে ; তারাও আজ উচ্ছিষ্টজীবী। কবি দেখেন, ভুক্তাবশেষের দিকে লুব্ধ কাকের স্তরে নেমে যায় ইতর শিশুরা ; পরিণত হয় ভিখারিতে।

বুকের মধ্যে কত-যে ভিখিরি রেখেছ
কত দিকে বাটি বাড়াও—
মন্বন্তরে কে আর তোমাকে বাঁচাবে!

কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা চতুর্ভুজা।
তার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছ হঠাৎ উলটো হাতে
আলস্যময় বাটি ভরে যায় করুণাতে করুণাতে! (ভিখিরি)

পুরাণপ্রসিদ্ধ আত্মপরিচয়হীন জাবাল সত্যকাম, সেও যেন ভিখারি—'ওরা হাসাহাসি করে, মুখে থুতু দেয়, ঢিল ছুঁড়ে মারে ···'। ভিখারির হাতে এনামেলের বাটি, শরণার্থীর হাতেও তাই—সারিবদ্ধ জাহাজ জেটিতে নামিয়ে দেয়

'ভালোবাসা'-র দান টন টন শব্দের সাহায্য ! কবি ভিখারি মেয়ের সঙ্গে যেমন নিজের মেয়েকে মিলিয়ে নেন, তেমনি নিজেকেও কখনো-কখনো মিলিয়ে নেন ভিখারির সঙ্গে—'নিচু হয়ে বসে আছি পথের কিনারে, হাতে বাটি / যাওয়া আসা করে লোক, স্রোত আছে, মনোবল নেই।' কিন্তু মনোবল লুপ্ত হয় না, ভিখারি হয়েই কবি গৃহস্থের কানে কথা বলতে চান, ভাঙতে চান তার সব স্থবিরতা। ভিখারির মধ্যেও থাকে জয়, ভিখারিও থোড়াই তোয়াক্কা করে তার পরিস্থিতির, 'বাতুল দুপুরে ডুগডুগি নিয়ে / গান গেয়ে যায় ভিখারি বালক।' নারকীয় শহরের মধ্যে এই গানে বেঁচে থাকে জীবন, জীবনের উত্তরণ। তার মুখে উচ্চারিত করেন কবি অন্যায় পরিস্থিতিকে উপেক্ষা-করা মরিয়া প্রতিবাদ।

ক. আমি তা বুঝেও এমন
বেহায়া শরমখাকী
খুঁটে খাই যখন যা পাই
সুবোদের পায়ের তলায়।
খেতে তো হবেই বাবা
না খেয়ে মরব না কি ! (লজ্জা)

খ. ভিখিরির আবার পছন্দ
ঠিকই পেয়ে যাব যে-কোনো ঠাঁই
আবারও ভাঙার প্রতীক্ষায়
কেটে যাবে দিন আনন্দে। (ভিখিরির আবার পছন্দ)

গ. বেশ করেছি ভেক ধরেছি
বাঁচিয়ে রাখি জান
দূরের থেকে দেখি সবার
দরদভরা টান

গাব না আর গান এবার
গাব না আর গান। (ভিখিরি ছেলের অভিমান)

মরব না, ভাঙার প্রতীক্ষায় থাকব, গাব না আর গান, প্রত্যেকটি কথার মধ্যে নিহিত থাকে প্রতিবাদের স্বর। পায়ের তলায় শব্দের দান কুড়িয়ে নেয় যে ভিখারিরা তাদেরই সমবেত প্রতিবাদে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে 'বাংলা থেকে কিউবা থেকে ঘানা।'

অতিকায় সঙের শহর কলকাতা, ভিখিরিতে ছেয়ে গেছে দেশ। তাহলে কি শহরের কবিতা মৃত্যুর কবিতা, একমাত্র গ্রামময় নিসর্গ-প্রান্তরের কবিতাই

কি জীবনের কবিতা? আপাতত এমন মনে হলেও সেটা ঠিক নয়। এই কবি জানেন, বর্তমান অপমানের মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে মালিন্যমুক্ত স্মৃতিময় অতীত, শহরে পাথরের গায়ে জলজ গুল্ম, সবুজ সবুজ হয়ে থাকা প্রাকৃত পৃথিবী, তেমনি বর্তমানের ভিতর থেকে স্ফুরিত হয় ভবিষ্যৎ। একদিকে যেমন,

আমরা ঘুরে বেড়াব শহরের ভাঙা অ্যাসফল্টে অ্যাসফল্টে
গনগনে দুপুরে কিংবা অবিশ্বাসের রাতে

কিন্তু আমাদের ঘিরে থাকবে অদৃশ্য কত স্বতন্ত্র হাওয়া
ওই তুলসী কিংবা সাঁকোর কিংবা সুপুরির…

(জন্মদিন)

অন্যদিকে তেমনি 'এ কলকাতার মাঝে আছে আরেকটা কলকাতা', দেখে শিখতে হয়। অন্ধ গলিতে যেখানে কুঁকড়ে থাকে মলিন ভিখারি সেখানেও আনন্দের অপার আবেগে চমকে ওঠে হাওয়া। এই শহরেরই পথে-পথে ঘোরে সেই অবিমৃশ্য ছেলে 'ভবিষ্য পাথের জেবে দৃঢ় ক'রে বাঁধেনি যে ঘর', সেই মেয়ে 'আবিষ্ট দুচোখে যার উচ্ছ্বসিত কথা ফেরে স্বপ্ন দিতে নিতে'। সাম্প্রতিকের পেষণ থেকে যেমন মুক্তি মেলে স্মৃতির স্পর্শে, তেমনি মুক্তি মেলে ভবিষ্যতের প্রসারে। শহরের স্তর চলে যায় আকাশের স্তবের কিনারে। মুক্ত ভবিষ্যৎকে জন্ম দিতে গিয়ে এই কলকাতা শহরেরই অবিমৃশ্য ছেলেমেয়েরা রক্তাক্ত হয় 'তোমারই সেণ্ট্রাল জেলে, / তোমারই কার্জন পার্কে।' মাসিমা যখন মারা যান, হাসপাতালে যখন বলির বাজনা, তখন ভাই ছিল ফেরার, যে ভাইয়ের লক্ষ্য ছিল রক্তকরবীর রঞ্জনের মতো রাজার জালাবরণ ছিন্ন করা। এই জালাবরণ ছিন্ন করতে গিয়েই ময়দানের কুয়াশা ক্রটমার্চের মধ্যে পড়ে থাকে কৃষ্ণচূড়া ফুল, নাকি, 'তোমার ছিন্ন শির, তিমির!'

চিতা যখন জ্বলছে, আমার হৃৎকমলে
ধুম লেগেছে, ঘুম লেগেছে চরাচরে, পাপড়ি জ্বলে
এই তো আমার

এই তো আমার জন্মভূমির আলোর কথা। (হৃৎকমল)

আর তাই রোগের অসুস্থতার কথা পার হয়ে নিরাময়ের কথা, অন্তত নিরাময়ের প্রার্থনার কথা। শহরের সভ্যতায় গোপন ক্ষয়, সমূহ পরাভব, বিষাক্ত ফুসফুস ধমনী শিরা, কিন্তু

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান;

পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক। (বাবরের প্রার্থনা)

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় মুহূর্ত অতীত আর ভবিষ্যতের মিলনবিন্দু। সময়ের দেশ চলে আসে সময়াতীত দেশোত্তর পটভূমিতে। জীবনানন্দের মতো তিনিও 'কবিতায় প্রতি মুহূর্তে একই সঙ্গে ধরে রাখেন দুঃখ আর শুশ্রূষা, এই আশা আর ক্ষয়, এই অদ্যতন আর চিরন্তন।' জীবনানন্দের মতো তিনিও লক্ষ্যে আনতে চান প্রত্যহের অতীত একটা ভূমিকে, 'প্রতিদিনকে তিনি দেখতে চান তার সামগ্র্যের পটে, তার গাঢ়তর বোধে'। সেই সমগ্রতার জন্যেই স্মৃতিময় অতীত, সংকটাপন্ন বর্তমান আর প্রত্যাশাময় ভবিষ্যৎ মিশে যায়। বর্তমানের দুঃখ বেদনা বিষাদকে তিনি এড়াতে চান না, এইসব বিক্ষোভকে এড়ানো মানেই সৃষ্টিরও অবসান। অশান্তির আঘাতেই বীণা বাজে। দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা আর বিষাদেই সৃষ্টি; 'sadness' থেকেই 'plenitude'-এ যেতে হবে, যেমন নেরুদা ভেবেছিলেন।

দেশনিহিত সময়কে দেশোত্তর সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার প্রয়োজনে শঙ্খ ঘোষ আরো অনেক কবির মতো পুরাণের আশ্রয় নেন। প্রত্যক্ষকাল থেকে ধারণাকালে যেতে গেলে পুরাণ হয়ে ওঠে এক নিশ্চিত অবলম্বন। আমাদের অবজীবন এবং জীবন পুরাণের মধ্য দিয়ে অধিজীবনকে স্পর্শ করতে পারে, যেহেতু পুরাণের মধ্যে সংহত-নিহিত হয় সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতা উপলব্ধি আর সংস্কার। সব সময় মার্গ-পুরাণ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই; দেশজ পুরাণও হয়ে উঠতে পারে দেশোত্তর সময়কে ধরতে পারার উপায়। 'যমুনাবতী' কবিতাটার কথাই ধরা যাক। কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলনে ১৯৫১ সালে গুলিচালনায় নিহত কিশোরীর নির্ধারিত দেশকালের ঘটনা কালোত্তীর্ণ মহিমা পেয়ে যায় আবহমান ছড়ার ছোঁয়ায়। 'ঘর থেকে ভেসে আসছে আমার ছোটোবোনের ছড়া আওড়ানো···যেন এক দমকায় ফিরে এল এক মাসের পুরোনো সেই কুচবিহারের দিন, ফিরে এলো নাম-না-জানা সেই মেয়েটির আর তার মায়ের মুখচ্ছবি, দুলে উঠলো কয়েকটি শব্দ : নিভন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে !···নানা ছড়ার স্মৃতি একত্র জড়িয়ে গিয়ে, অদেখা সেই মেয়েটির নাম হয়ে উঠল যমুনাবতী, সনাতন বাংলাদেশের কোনো যমুনাবতী সরস্বতী !' বর্তমানের মধ্যে এইভাবে চলে আসে আবহমান সনাতন। নিভন্ত চুল্লিতে আগুন জ্বালানোর কথায় আবার বর্তমান-ছাড়ানো ইঙ্গিতও থাকে। অদ্ভুত আঁধারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ রচনা করে তারা যেন মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের মতো হেতালের লাঠি হাতে বেহুলা-লখিন্দরের বাসরকে পাহারা দেয়।

আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি
যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে
যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
হেতালের লাঠি যেন এ-কাল প্রহরে মনে রাখে
চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে। (হেতালের লাঠি)

মনসামঙ্গলের অতীত স্মৃতি বর্তমানে প্রবেশ করে, বর্তমানকে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে—'আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি / দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর ক'রে।' এখানেও প্রতিধ্বনিত হয় 'আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক' এই প্রার্থনা।

যে-যার আপন সুখে আমরা ব্যস্ত থাকি; বাস করি আত্মকেন্দ্রিকতার নিজস্ব গুহায়, সামাজিক দায়কে মনে করি অপার মূর্খতা। তারই ছিদ্রপথে 'ফেটে যায় জলস্রোত',

তোমাদের হাতেগড়া একাল-ওকাল-জোড়া ব্রিজগুলি ঝলকে মিলায়···
মুহূর্তের তুড়ি লেগে উড়ে যায় সমূহ সংসার
কেননা দেশের মূর্তি
কেননা দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর!···
আমরা সময় বুঝে ঝোপে ঝোপে সরে গেছি শৃগালের মতো
আত্মপতনের বীজ লক্ষই করি নি।··· (আরুণি উদ্দালক)

এই পরিস্থিতিতে কবি সেই মুষ্টিমেয় প্রতিরোধকারীর কথা ভাবেন যারা আরুণি উদ্দালকের মতো নিজের শরীর দিয়ে আল রচনা করতে চায়, জলস্রোতকে বাধা দেয়—'আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও।' কতো বছর হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে, গড়ে ওঠেনি কিন্তু ভারতীয়তার বোধ। আজও আমরা শিকড় খুঁজে পাইনি, গড়ে ওঠেনি আত্মপরিচয় আমাদের। এই পরস্থিতিকে রূপায়িত করতে গিয়ে চলে আসে উপনিষদের ভর্তৃহীনা জবালার পুত্র সত্যকামের কথা, রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতার কথা। 'আমরাও কি নই তা-ই?' পুরাণ আর আমাদের বর্তমান সংকটাপন্ন সময় মিলে যায়, একের আলোয় অন্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একটি মুহূর্তের বিন্দুতে মিলে যায় অতীত বর্তমান; বর্তমানের বিপন্নতা কালোত্তর পটে চিনতে পারে নিজের স্বরূপ।

আমাদের অতিকায় সঙের শহরে, আমাদের নিষ্ঠুর অন্ত্যজ-সভ্যতায়, শ্বেতসন্ত্রাসের দিনগুলিতে 'নিষাদেরা জেগেছে সমাজে। হাতে লাঠি কানে জবা ফুল···।' চারিদিকে যখন শঠময় বিশ্বাসঘাতকতা, চারিদিক যখন মারের জবাব মার ধ্বনিতে মুখর, সম্ভাব্য বন্ধুরা যখন পরস্পরের মরিয়া শত্রু, 'সারি সারি

দাঁড়িয়ে গেছে বশংবদ বরকন্দাজের দল / ইশারা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি', সমাজ যখন দৃষ্টিহীন আর বধির, তখন অপ্রতিরোধ্যভাবে চলে আসে সাম্প্রতিক কালকে বোঝাতে মহাভারতের মৌষলপর্বের পুরাণকথা। জীবনানন্দও দেখেছিলেন আধুনিক সমাজের মধ্যে গভীর অসূয়ার বিষে জর্জর চারিদিকে নবীন যদুর বংশকে। শঙ্খও দেখেন 'মাথায় গিয়েছে মদ', সেই মদ ধৈর্যহীনতার, আধিপত্যের, শক্তিমত্ততার। তাই 'যে-কোনো সবুজ ঘাস/ হাতে নিলে হয়ে ওঠে মূষল মুদ্গর ধ্বংসবীজ···' এবং রীতিহীন খেলায় শেষ হয়ে যায় সমস্ত যাদববংশ। 'সবাই সবার চোখে ঘাতক' আমরা—হাতে আমাদের সবুজ ঘাস হয়ে গেছে ভল্ল কিংবা মূষল। দলে-উপদলে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ছিন্নভিন্ন ছত্রখান আমরা, আমরা আর যাদবও নই, 'অন্ধক বা ভোজ / শৈনেয় বা বৃষ্ণি আমরা আজ···।'

আমাদের এই তীর্থে আজ ভেঙে পড়ার উৎসব···

আমাদের এই তীর্থে ঘোর উৎসব
আমাদের এই তীর্থে শেষ উৎসব

(আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব)

পুরাণ বর্তমান পরিস্থিতিকে উজ্জ্বলতর করে তোলে, পুরাণের মধ্যে বর্তমানের সংকীর্ণতা কালাতীত পটভূমি পায়, পুরাণের প্রতিবিম্বনে জানা যায় বারবার একই পরিস্থিতি পুনরাবৃত্ত হয়। সর্বনাশা ভয়ংকর দিনগুলিতে কবি অনুভব করেন 'আজ দেশজোড়া বারণাবতের / প্রস্তুত সব জতুগৃহ।' নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশের আয়োজন করেছি, জতুগৃহদাহের চক্রান্ত করেছি।

মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি লাক্ষা
কোথাও ধর্ম কোথাও রাজ্য
চর্বিতে শনে ভেলে আর কাঠে
ঘৃণা বিচ্ছেদে দলে উপদলে
স্ফুলিঙ্গপাতে সহজে দাহ্য—
বিদুরেরা শুধু নেই কোথাও। (জতুগৃহ)

মহাভারতের ভারতজোড়া সর্বনাশের মধ্যে অন্তত বিদুরেরা ছিল, এখন হতাশার দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে থাকে কবির উচ্চারণে—'বিদুরেরা শুধু নেই কোথাও।' কে আমাদের পথ দেখাবে, আঁধারে কান্তিময় আলো দেখাবে যাজ্ঞিকের ?

বিহারের আরওয়ালের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড শুধু নিকট-অতীতের জালিয়ান-ওয়ালাবাগের কথা কবিকে মনে করিয়ে দেয় না, এক ঝলকে চলে আসে

মহাভারতের পুরাণপ্রসঙ্গ। বর্তমানের মধ্যে অতীত, আর অতীতের মধ্যে বর্তমান রণিত হতে থাকে।

অন্ধ আমি দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
এবং লোকে বলে এ দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে

কারা এসব রটিয়ে বেড়ায় বলো আমায় হে সঞ্জয়
অন্ধ আমি, কিন্তু তবু এসব আমায় জানতে হবে…

সামান্য এক ছটাক জমি ছাড়বে কেন আমার ছেলে
আমার সঙ্গে ভূমিসেনা আমার সঙ্গে ভূস্বামীরা…

…একাই একশো আমার ছেলে

তারাই জানে শমনদমন, ধ্বংস দিনে ধ্বংস রাতে
ছড়িয়ে যাবে ঘটনা যা সব আরওয়ালে কানসারাতে……

তিনদিকে তিন দেয়াল ঘেরা সাতার রাউও গান্ধীমাঠে
ভিজল মাটি ভিজল মাটি ভিজুক মাটি রক্তপাতে।

অধর্ম? কে ধর্ম মানে? আমার ধর্ম শত্রুনাশন
নিরস্ত্রকে মারব না তা সবসময় কি মানতে পারি?

মারব না কি নিভূমিকে? নিরন্নকে? নিরস্ত্রকে?
অবশ্য কেউ মেরেছিল সেটাই বা কে প্রমাণ করে! (অন্ধবিলাপ)

অতীত-বর্তমান একাকার হয়ে চলে যায় ভবিষ্যতের দিকে। উৎপীড়িত মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে, অত্যাচারী দুঃস্বপ্ন দেখে—'ধানজমিতে ঘাসজমিতে সমবেত লোকজনেরা / ধেয়ে আসছে সামন্তদের…।' বিলাপরত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তো ব্যাসকে বলেছিল, ভবিতব্য এটাই আমার, নিজের পাপেই হবে বংশের সমূহ সর্বনাশ। 'রক্তকরবী'র রাজার মতোই এই ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ পরিবর্তন করে। 'রক্তকরবী'র রাজা জালাবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল, ভেঙে ফেলেছিল ধ্বজার দণ্ড; আর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বলে,

আমার পাপেই উশকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয়পিনাক
সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে যাক… (অন্ধবিলাপ)

দ্বিধান্বিত মানুষ ও সংকটাপন্ন সময়ের নির্যাস এইভাবে পুরাণের মধ্য দিয়ে সাকার হয়ে ওঠে এই কবির কবিতায়। এমন দ্যোতনাময়ভাবে পুরাণ যখন বর্তমান সংকটময় মুহূর্তের কবিতায় স্পন্দিত হতে থাকে 'বর্তমানের মধ্যে অতীত তখন আর জীর্ণভার হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে এক সঞ্জীবিত প্রবাহ।' আর যা প্রবাহিত তাই তো পবিত্র। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে-কথা শঙ্খ ঘোষ বলেছেন সেকথা তাঁর সম্বন্ধেও ফিরিয়ে দেওয়া যায়। তিনিও প্রবাহিত সময় ও স্মৃতির স্পর্শে সাম্প্রতিকের পেষণকে খুলে দিতে পারেন আধুনিকের মুক্তিতে।

কাল থেকে কালোত্তরে, দেশ থেকে দেশাতীতে মুক্তি এই কবির কবিতার প্রধান প্রসঙ্গ। তাই শব্দ চিত্রকল্প ও ছন্দব্যবহারের নিজস্ব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেই মুক্তির সত্যকেই তিনি সঙ্গতিপূর্ণভাবে রূপ দিতে পারেন। শব্দব্যবহার প্রসঙ্গে এই কবি বারেবারে নীরবতার, নিঃশব্দতার কথা বলেন, বলেন গানের কথা। শব্দের মধ্যে তিনি খোঁজেন বাঙ্ময় নীরবতা, 'শব্দমধ্যগত অবাচ্যতা'-কে। বার্তাবিহীন অভ্যাসতাড়িত শব্দব্যবহারের বিরুদ্ধে, শব্দবিলাসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় জড়তাময় শব্দের থেকে পালাতে চান কবি। ভাষার মধ্যে তিনি ধরতে চান নীরবতার অবাধ বিস্তার। কথা-বিরল সাজহীন, দিব্য কার্পণ্যময় সব-মেদ-ঝরানো সারাৎসার, হিমেনেথের নগ্ন কবিতার মতো, এই কবিতা। নীরব থেকে নীরবে নয়, কেননা নীরব কবি বলে কোনো কবি নেই। শব্দের মধ্যেই নিঃশব্দকে ধরতে চান এই কবি। আয়োনেস্কো তাঁর জার্নালে যে-কথা লিখেছিলেন 'There are no words for the deepest experience' সে তো মরমী কবিমাত্রেরই অভিজ্ঞতার কথা! থাকে যদি উপলব্ধির তীব্রতা আর অন্তর্মুখিতা—যে অন্তর্মুখিতায় বাহির বিশ্বও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে—তবেই এই নিঃশব্দের বলয়কে শব্দে আয়ত্ত করা যায়। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দের সীমান্তের বাইরেই থাকে সত্য। সেই সত্যকে বিদ্ধ করতে গেলে শব্দমধ্যগত নীরবতার সন্ধানে আমাদের যেতে হয়। ভাষাকে ভেঙে ভাষার সত্যে পৌঁছুতে গেলে নীরবতাকেই করতে হয় অস্ত্র। এইভাবেই ভাষা ভাষা থেকে মুক্তি পায়, কাল যেমন এই কবির কবিতায় সমকাল থেকে মুক্তি পায়। চলতি কালের চাকল্যে সঞ্চারিত হয় চিরকালের স্তব্ধতা। সত্যকে ধারণ করার প্রয়োজনেই কবি নিজেকে পরামর্শ দেন,

এতো বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো
শব্দহীন হও
শষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর··· (আয়ু)

আকারে-ছোটকবিতাগুলির গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে এই অনুরণনময়

নৈঃশব্দ ; এই নীরবতাই শব্দকে নিয়ে যায় শব্দের বাইরে।

ক. ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে—

ছড়ানো পালক, কেউ জানে না! (রাঙামামিমার গৃহত্যাগ)

খ. শব্দ দিয়ে আগুন দিয়ে ঘিরে
বানিয়েছিলে অসীম সংসারী—
যখন লোকে একলা চলে, তখন
সরিয়ে নাও সমস্ত ঘরবাড়ি। (যখন লোকে)

গ. নিচু হয়ে এসেছিল যে মানুষ অপমানে, ঘাতে
ঝরে গিয়েছিল যার দিনগুলি প্রহারে উজানে
তারই কাছে এসে ওই পাঁজরে পালক রেখেছিলে
তোমার আঙুলে আমি ঈশ্বর দেখেছি কাল রাতে।
(পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ ৫০)

দীর্ঘকবিতায় নয়, সেখানে আরেক ধরণ। আকারে ছোট কবিতাগুলিতে যেখানে লিরিক তীব্রতা তীব্রভাবে সংহত, সেখানেই ভাষার শেষসীমান্তে পৌঁছে কবিতা নীরবতাকে স্পর্শ করে।

এই শব্দগত নীরবতার অন্তদিকে গান। নীরবতার যে অনুরণন তা-ই গানে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে চায়। সব শিল্পেরই সাঙ্গীতিক প্রবণতার যে-কথা পেটার অনেক আগে বলেছিলেন ঠিক সেই অর্থে নয়। আমাদের ভাষা যখন যুধিষ্ঠিরের রথের মতো জীবন থেকে, ভূমিস্পর্শ থেকে অল্প একটু উপরে উঠে যায় তখনই ভাষা গান হয়ে ওঠে। সুরবর্জিত হয়েও গানের ধর্মে আক্রান্ত হয়। তখনই কবিতা প্রতিদিনের সঙ্গে লগ্ন হয়েও 'প্রতিদিনের বাইরে এক ভারহীন অদীন ভুবনে' উত্তীর্ণ হয়। 'এ আমির আবরণ' গ্রন্থে শঙ্খ উল্লেখ করেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিপ্রদাস দুটো কালের কথা বলেছিল—ক্ষুদ্র কাল আর চিরটা কাল। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ক্ষুদ্র কালটাই বড় হয়ে ওঠে, চিরটা কাল থাকে আড়ালে। দৈনন্দিনতার উপরেই দাঁড়িয়ে, ক্ষুদ্রকালের গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে কবিতা যখন নিজেকে প্রসারিত করতে চায় চিরটা কালের দিকে তখন কবিতার মধ্যে এসে যায় বহিরঙ্গ সুরহীনতা সত্ত্বেও গানের সুষমা। 'দিনগুলি রাতগুলি'র অন্তর্গত 'এই প্রকৃতি'র

ঘুরে ঘুরে এই প্রকৃতি কী কথা কয়?
সে বলে যায় প্রেমের মতো আর কিছু নয়!

ইত্যাদি ছত্রগুলি বিষয়ে বা গোটা' ধানে গানে বসুধায়' অংশ পড়ে যে কথা বহুদিন আগে মনে হয়েছিল, এইসব কবিতা বইয়ের পৃষ্ঠায় বন্ধ হয়ে থাকবার জন্য নয়, রৌদ্রে বা জ্যোৎস্নায় ঘুরে ঘুরে গুনগুন করতে করতে আকাশ-আলোর সঙ্গে হঠাৎ আবৃত্তি করে উঠবার জন্যে বা গান হিশেবে গেয়ে উঠবার জন্যে, সেই কথাটাও নতুন করে বলছি না। কাব্যগীতি সুরাশ্রিত, গীতিকবিতায় সুর থাকে না। সুর না থেকেও গীতিকবিতায় এক অশ্রুত সুর মনের শ্রবণে আমরা শুনতে পাচ্ছি। সেই সুরের জোরেই দেশনিহিত থেকেও কবিতায় দেশাতীতের আবরণ এসে পড়ে। ছন্দভাঙা অসংগতির উপর সানাইয়ের সারঙের তান যেমন সুরের চাঁদোয়া রচনা করে।

ক. আমার দুঃখের দিন তথাগত
আমার সুখের দিন ভাসমান!
এমন বৃষ্টির দিনে পথে-পথে
আমার মৃত্যুর দিন মনে পড়ে। (বৃষ্টি)

খ. তার মাঝখানে আজ স্রোতের ভিতরে দাবদাহ
ধ্বংস ওঠে পায়ে পায়ে, মাথার উপরে ধারাপাত
সমস্ত দেয়াল ভেঙে ভেসে যায় গ্রহণের জলে··· (জন্ম)

কবিতার ভাষার শব্দপুঞ্জ বাঙ্ময় নীরবতায় উত্তীর্ণ হয়, উঠে যায় গানের স্তরে। কবিতার এই সঙ্গীত আসে প্রাত্যহিকের ভাষা থেকেই, 'a music latent in the cammon speech of his time.' নিজের সময়ের ভাষাকেই কবি সময়াতীতের দিকে চালিত করেন। 'কবিতা ও তার পাঠক' প্রবন্ধে শঙ্খ লিখেছেন, 'কবি কখনোই ভুলে যান না যে একহাতে এই দেশনিহিত কাল আর অন্য হাতে দেশোত্তর কাল ধারণ করার মুহূর্তেও তিনি পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন অস্থির সমসময়ের সংকটের উপর।' সমসময়ের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তার সবচেয়ে হড়ো প্রমাণ তিনি সমসময়ের ভাষাকেই কবিতার ভাষা হিশাবে নির্বাচন করেন। কিন্তু যদি হুবহু সেই ভাষাই হত তাঁর আশ্রয় আর অবলম্বন তাহলে কবি বন্দী হয়ে যেতেন সমসময়ের গণ্ডিতে। কিন্তু সেই বন্দীত্ব তো কবির মানায় না, কারণ সাময়িকের মধ্য দিয়েই তাঁকে অতিসাময়িককে ছুঁতে হবে, 'chronological time-কে উত্তীর্ণ করতে হবে ইতিহাসে; আর সেই কারণেই হ্বল্টার বেনজামিনের কথায় 'finite language'-কে নিয়ে যেতে হবে 'infinite language-এ। খাঁটি কবিতার ভাষায় সব সময় এই অসীমতা থাকে। জর্জ স্টিনারও "Linguistics and Poetics" প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন literature is language in some degree outside ordinary time.' নিতান্ত বার্তা প্রেরণের সমসাময়িক দায় থেকে কবিতার ভাষা মুক্ত। বারে-

বারেই এই ব্যাপারটা ঘটে, প্রত্যহিকের স্তরে থেকেও ভাষায় অন্য স্পন্দন এসে যায় ; তাকে নিয়ে যায় সময়ের বাইরে, সময়ের দেশ থেকে সময়াতীত দেশে। ভাষায় তো জাতীয় স্মৃতির চাপ থাকেই, সমকালের ভাষায় থাকে চলতিকালের চাঞ্চল্য, তারই মধ্যে কবি সঞ্চারিত করেন চিরন্তনতার স্পন্দ।

ক. সবাই যে-যার পথে ফিরে গেলে ঘোর রাতে নিজের দিকে
ঘুরে বলি,

এতক্ষণ কার কাছে ছিলি
এর মুখে ওর মুখে তার মুখে যার মুখে যার-তার মুখে কেন
চুমু খাস
সবাই যে-যার পথে ফিরে গেলে মনে হয় আমার ফেরার আর
পথ নেই ·· (এতক্ষণ)

খ. ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

একটা দুটো সহজ কথা
বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।···

নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা-কিছু আজ ব্যক্তিগত। (মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)

যেমন ভাষায় তেমনি ছন্দে এবং চিত্রকল্প বা ইমেজে পাই আমরা একই অতিক্রমণ। ছন্দের একটা আঙ্গিক কাঠামো তো থাকেই। সেই কাঠামোর মধ্যে বাক্‌স্পন্দকে ধরার কথা বলেন শঙ্খ ঘোষ। কারণ বাক্‌স্পন্দের মধ্যেই ধরা পড়ে প্রতিদিনের, সমসময়ের তরঙ্গ। বর্তমান সময়ের নির্যাসকে ধরতে হবে কবিতায়, তাই কবিতার ভাষা উঠে আসবে প্রাত্যহিক পৃথিবী থেকে, সাংসারিক জীবনযাপন থেকে। আর সেই কারণেই তার মধ্যে নিহিত থাকা চাই প্রতিদিনের বাক্‌স্পন্দের দোলা। কিন্তু বর্তমানের যেমন উত্তরণ ঘটে চিরন্তনের দিকে, ভাষায় যেমন নীরবতার-গানে এসে যায় অসীমতার ছোঁয়া, বাক্‌স্পন্দেও তেমনি সঞ্চারিত হবে কবির ব্যক্তিগত ছন্দ। ব্যক্তিগত ছন্দই বাক্‌স্পন্দকে নিয়ে যায় সীমাবদ্ধ কালের বাইরে। ব্যক্তিগত ছন্দের প্রবর্তনাতেই থাকে মুক্তির পথ। তাই ছন্দশরীরে বাক্‌স্পন্দকে আত্মীকরণই যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে ধরতে হবে কবির ব্যক্তিগত স্বরের স্পন্দনকে।

ক. আমার চারদিকে দল মাথার ভিতরে বা ধমনীতে বিঁধে যায় দল
দু-হাতে পেষণ করি দু-চোখ বন্ধ করো বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
তোমার শব নিয়ে বানাই দুর্গের প্রাকার··· (দল)

খ. প্রগাঢ় অন্যায় কোনো ঘটে গেছে মনে হয় যেন
কিছু কি দেবার কথা কিছু কি করার কথা ছিল ?
থেমে-থাকা বৃষ্টি বিন্দু হাড় থেকে টলে পড়ে ঘাসে
ভেজা বিকেলের পাশে ডানা মুড়ে বসে আছে আলো ।
(পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ ৫৫)

কবিতার ইমেজে চিত্রকল্পে প্রতিমাতেও একইভাবে সময়ের দেশকে সময়াতীত দেশে পৌঁছে দেবার দায়ে এসে যায় আসক্তির নিরাসক্তির যুগলতা। বাক্‌প্রতিমায় ধরা পড়ে সমসময়, জীবনের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্পর্ক, আবার তার থেকে উত্তরণ। আসক্তি সরে যায় নিরাসক্তির দিকে। পৃথিবীর প্রতি পরিবেশের প্রতি কবির ভালোবাসাই তো বিধৃত হয় কবিতার প্রতিমায়। যেমন, জয়সিংহের সংলাপে প্রকাশ পেয়েছিল জগতের প্রতি তার ভালোবাসা।

দেখ, চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ—বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ ! (বিসর্জন ৩/৪)

যেমন জয়সিংহ এখানে তেমনি আমাদের কবি সংসারকে ভালোবেসে অথচ সংসার থেকে অল্প আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র স্বরূপে দেখতে পান, দেখেন খোলাপথে তার বেদনাময় সৌন্দর্যে। কবিতায় প্রতিমা ব্যবহারে তাঁর আসক্তি সরে যায় তার নিরাসক্তির দিকে। 'লিপ্ত হয়ে থাকার মধ্যেই এই নির্লিপ্ততা থেকে যায় বলে সুন্দরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিষাদ।' নীচের বাক্‌প্রতিমা-গুলিতে সেই বিষাদ আর সৌন্দর্য, সেই আসক্তি আর অনাসক্তি।

ক. রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।
(দিনগুলি রাতগুলি)

খ. যেখানে সে পা দুখানি রেখেছে, সেখানে
কাল বিকেলের শেষ ঝড়ে
পড়ে আছে কুরে-খাওয়া সনাতন মহানিমগাছ।
(মহানিমগাছ)

গ. মেঘ ঘোরাফেরা করে চেতনার অস্থিসন্ধি ঘিরে
মাথা থেকে পা অবধি ধীর হয়ে আছে ঘনজল
হাঁসের ডানার ভারে চোখের পাতায় কোমলতা···। (মুহূর্ত)

ঘ. কী হতভাগ্য সেই দিন যখন গর্জনতেল ভুলে শুকনো
দাঁড়িয়ে থাকে নিঃস্বপ্ন প্রতিমা···। (শিশুরাও জেনে গেছে)

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় এই আসক্তি-নিরাসক্তির সৌন্দর্য-বিষাদ যুগপৎ জড়িয়ে থাকে, যেমন কবিতায় মুহূর্তে থাকে ত্রিকালের স্পন্দন। শঙ্খ ঘোষ বারবার বলেছেন সত্য কথা বলা ছাড়া কবির আর কোনো কাজ নেই। কবিতায় থাকা চাই সত্যের স্ফুরণ। 'কে চায় সুন্দর কথা আর / দু-একটি সত্যি শুধু বলো।' ঠিক যে এই সত্যের অবয়ব পরিবর্তমান কিন্তু ত্রিকালে সমর্পিত হলে সেই পরিবর্তমান সত্য নিত্যতা পায়। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বারে বারে পেয়েছে।

পা র্থ প্র তি ম ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

কবির নন্দনচিন্তা : শঙ্খ ঘোষ

"Art is social, not merely by virtue of its process of production···it becomes social by virtue of its oppositional position to society itself, a position it can o:cupy only by defining itself as autonomous."—Theodor Adorno

কবির নন্দনতত্ত্ব ? পৃথকভাবে কিছু থাকে কি ? তাঁর কবিতার মধ্যেই তো অন্তর্গত থাকে নন্দনচিন্তা। কবি, তাৎপর্যপূর্ণ কবি, যে তত্ত্ববিশ্ব নির্মাণ করেন, ভাঙেন আবার গড়েন, একদিকে তাঁর নন্দনচিন্তা তো সেটাই : বাইরের ইতিহাস ও কবিতার ইতিহাস, বাইরের বাস্তব ও কবিতার বাস্তবের মিথস্ক্রিয়ায় যে অনন্যরূপটি নির্মিত হয়, য়াকবসন-এর ভাবনা আনুযায়ী, তাতে কবিতার শব্দের ক্রিয়া এমনই যে সংযোগী কাজের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে নন্দন-তাত্ত্বিক। বলা যায় এর referential meaning, অর্থাৎ যা চিহ্নিত করে তার সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটি, সাধারণ ভাষায় যেমন থাকে, কবিতায় তেমন থাকেনা, অর্থের ওপর অর্থের অবিরাম খেলায় শব্দটি দাঁড়ায় আর গোটা প্রক্রিয়াটিই নন্দনতাত্ত্বিক। সুতরাং কবির নন্দনতত্ত্ব কবিতাতেই কখনো প্রত্যক্ষে, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে উহ্য থাকে। কবিরা যখন তাই গদ্য লেখেন, এমনকি গল্প-উপন্যাসও, তখন ওই নন্দনচিন্তাই অন্যভাবে অন্যরূপে আসে : মাঝে মধ্যে নিজ কবিতার নান্দনিক চিন্তাই অন্য কবির সূত্রে বিবৃত করেন, আবার নিজের গূঢ়ার্থই নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলতে চান—কবির প্রকল্প তাই তাঁর কবিতার নন্দনভূমিরই প্রসারণ, তাঁর কবিতার জগৎ বোঝাতে আপরিহার্য। শঙ্খ ঘোষের মতো কবির ক্ষেত্রে এ কথা আরও সত্য। শঙ্খ ঘোষের কবিতার জগৎ যতটা স্পেস নির্ভর, ততটা টাইম নির্ভর নয় : সময় বা কাল নিশ্চয়ই তাঁর কবিতার নির্মাণে একটি উপদান কিন্তু সময়ের সঙ্গে তিনি পাল্টেছেন, অর্থাৎ আমরা যাকে কবির নানা পর্যায় বলি, তাঁর কবিতার নানা পর্ববিভাগ করি, এ রকম বিভাজন শঙ্খ ঘোষের কবিতার ক্ষেত্রে করা দুরূহ। আধুনিক জগৎ ও জীবনের যুগপত্তাই তাঁর কবিতার অভিযানে : তাঁর ভাষায় 'বাইরের দিকে মুখ করা' ও 'ভিতরের দিকে মুখ ঘোরানো' একই সঙ্গে সেই' দিনগুলি রাতগুলি'র কবিতা থেকেই অব্যাহত।

'কবিতা হলো অভিজ্ঞতা', 'বিশ্বচলাচলের সত্যকে আবিষ্কার করে নেওয়া তো কবিরই দায়িত্ব', এ উক্তি শঙ্খ ঘোষের। আবার এই অভিজ্ঞতার স্মৃতি ভুলে যাবারও ক্ষমতা থাকা চাই—"যখন রক্তের মধ্যে একেবারে মুছে যাবে এসব, একটির থেকে অন্যটিকে ভিন্ন করে চেনা যাবে না আর, তখনই এসে পৌঁছতে পারে দুর্লভতম কবিতার মুহূর্ত।" রিলকের সূত্রে শঙ্খ ঘোষের এই উক্তি তো এক হিসাবে তাঁরই। প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'তেই রাত্রি ও নৈঃশব্দ্যর শীতের বলিমুখ অন্ধ এ বাতাস-এর পাশাপাশিই যুগপৎ থাকে 'শিশুসূর্য' 'একটি দুর্গের কাহিনী' 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে' এবং 'যমুনবতী'র মতো কবিতা,'নিহিত পাতাল ছায়া'র কিউ, ভিড়, চাবুক কবিতাগুলি,সাধারণত বলা হয় যে কবিতাগ্রন্থ থেকে শঙ্খ ঘোষের কবিজীবনের নতুন পর্যায় শুরু সেই 'বাবরের প্রার্থনা'র পরেও বসানো যায়, আবার ঐ কাব্যগ্রন্থ বা তার পরের কবিতার বেশ কিছু আগে আনা যায়। অর্থাৎ শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতাতেই এই নন্দনতত্ত্বের নির্মাণটি ধরে দেন যে বহুমাত্রিক যুগপত্তাই, simultaneity-ই তাঁর বীক্ষার প্রধান কথা : বহুত্ববাদী দৃষ্টিকোণেই তিনি বেঁধে নেন কবিতার জগৎকে, শব্দকে, ডায়লগকে। প্রথম কবিতাগ্রন্থ দিনগুলি রাতগুলি-র ১৯৫৯—৫৪-তেই শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন :

এই যে নীল অন্ধকার, এই যে সারে সারে
সূর্যরেখা, এই যে মেঘ, এই যে ধূলি—সে যে
আমারই মুখ—আমায় ভেঙে কবিতা করো করো,
রাত্রি তুমি বাঁধো আমায় যৌবনের ভারে

আমাকে সেই কবিতালোকে উজ্জীবিত করো।

কবির নন্দনতত্ত্ব এই কবিতাতেই ধরা আছে : নীল অন্ধকার ও সূর্যরেখা, দুটিই শঙ্খ ঘোষের নন্দনতত্ত্বে বিধৃত। মেঘ, ধূলি অর্থাৎ বাস্তব জগৎ-প্রকৃতি "আমারই মুখ"—এ বিশ্বচলাচল ও কবি আমি পারস্পরিক সম্পর্কে, নানা টানাপোড়েনে নির্মাণ করে কবিতার জগৎ। তাই ওই বাইরের মুখ আর আমি ভিন্ন : আমায় ভেঙেই কবিতা, কবির চৈতন্য-সত্তা নির্মিত মেঘ-ধূলি, ইতিহাস-সময়-সমাজে, তার আত্তীকরণ ও এক অর্থে অবলোপন নিজের মধ্যে ঘটলে কবিতা। সেই কবিতালোকে "উজ্জীবিত" 'করার প্রার্থনায় নন্দনতত্ত্বর আর এক দিক : পুরাণব গলিত মুখ, জরতী ক্লীব ক্লিন্নতা থেকে এই কবিতা, কবিতালোক বাঁচাবে, উদ্ভাসিত করবে। 'কবিতালোকে উন্মথিত করো', 'আমার প্রতি রক্তকণা কবিতা করো করো'—কবিতার এই দৈনন্দিন জীবনে প্রাসঙ্গিকতারই আবেগে চঞ্চল। কবিতা কোনো মিনার-বাসী সৌন্দর্য্য চর্চা নয়, এ বাস্তব বেদান্ত

প্রত্যাহিকতায় স্পৃষ্ট, আবার কবিতালোকই উজ্জীবন। এই উজ্জীবনের নন্দনতত্ত্বেই শঙ্খ ঘোষ তাঁর বাস্তবের ভয়াবহতাকেও কবিতার নান্দনিক বিন্যাসে বেঁধে নিতে পারেন। এই নন্দনবোধ, যা আবার ইতিহাসবোধও বটে, তাঁরে উচ্চারণের সংলাপে আসে :

আমার সবটাই আলো আমার সবটাই অন্ধকার
আমার সবটাই জন্ম আমার সবটাই মৃত্যুদ্বার……

আমার দেয়ালে পিঠ আমাকে বাঁচতেই হবে, তাই
আমার চোখের রক্তে সবার চোখের গান গাই—

দেখো রে মানুষ দেখো, একুশ শতকে চলে দেশ
আমার মৃত্যুরও নেই আমার জন্মেরও নেই শেষ!

শঙ্খ ঘোষের কবিতার নন্দনতত্ত্ব এই, সবটাই আলো, সবটাই অন্ধকার, মৃত্যুর ও জন্মের, কারুর নেই শেষ। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার সত্যটি তিনি জানেন, তবু কবিতালোকের উজ্জীবনের প্রার্থনা, প্রতিরক্তকণাকে কবিতা করার, কবিতালোকে উন্মথিত হবার তীব্র আকুলতা। বস্তুত এই বোধ ও এই প্রার্থনা শঙ্খ ঘোষের দ্বান্দ্বিক যুগপৎ নন্দনতত্ত্বের মূল ভিত্তি। এ নন্দনচিন্তা আসলে এক ইতিহাসবোধ। যাকে বলা হয় তৃতীয় বিশ্ব, সেই বিশ্বের বাস্তবের ইতিহাস শঙ্খ ঘোষের নন্দনচিন্তায় নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর এ চিন্তায় সময় আসে ওই ইতিহাসবোধে, আসলে ১৯৪৯-৫০-এ তাঁর কাব্যজীবনের ঐতিহাসিক পর্যায়ের শুরু, এর আগের গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্‌-ইতিহাসের পর্যায়কে বাদ নিশ্চয়ই দেওয়া যায় না, তবু ওই ঐতিহাসিক সূচনার পর থেকে তাঁর নিজ শ্রেণীর ইতিহাস ও বৃহত্তর বাস্তবের ইতিহাস মূলত পাল্টায়নি, ক্রমিক এক পতনই এর বৈশিষ্ট্য। তিরিশের কবিরা, এমন-কী চল্লিশের প্রথম দিকে যাদের যাত্রারম্ভ তাঁরাও ওঁদের শ্রেণীর বাস্তবে দেখেছেন দ্বান্দ্বিক মুক্তির স্বপ্ন, যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গার মতো বিধ্বংসী কিন্তু চৈতন্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা দেখেছেন, দেখেছেন বীরত্বপূর্ণ কৃষকসংগ্রাম—কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে ওই যুদ্ধ-মন্বন্তর এভাবে আসেনি, দাঙ্গার অভিজ্ঞতাও ৪৬-এর মত বাঙালী কবির অভিজ্ঞতায় ঘটেনি, যদিও দাঙ্গা ভারতবর্ষ জুড়ে ক্ষত সৃষ্টি করেই চলেছে। ৪৭-এর দেশবিভাগে বাঙালী কবি, মধ্যশ্রেণী যে সর্বনাশের গহ্বরে আবদ্ধ হল, তার অভিঘাত অবসন্নতা নিয়ে এল। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন উত্তরোলে শেষ হল, জ্যেষ্ঠ কবির ভাষায় সমুদ্রের আন্দোলন বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ হয়ে গেল। পঞ্চাশের পর অবসন্ন ক্লান্তি, চরিত্রহীন ভাঙন এ ইতিহাসে, শ্রেণীতে লক্ষ করা গেল।

তাই সময়ের উল্লম্ফনে স্বপ্নময় বিকাশে কবি তাঁর কবিতা ও তার নন্দনতত্ত্বকে বাঁচাতে পারেন না—বিশেষত শঙ্খ ঘোষের মত শুদ্ধকবি, যিনি কবিতা লোকে উজ্জীবন চান। সেই কারণেই তাঁর কবিতা ও নন্দনতত্ত্ব সময়ের হাত ধরে চলে না : স্পেস বা স্থানে বাঁচে। ক্রমশ প্রসারিত হয় কবিতার জগৎ, ভাবনা। বাইরের ও ভেতরের, ভবন ও ভুবনের যে সমগ্র মিথস্ক্রিয়া শঙ্খ ঘোষের কবিতার নন্দনতত্ত্বে থাকে, তা কেবল মধ্যশ্রেণীর ইতিহাসে-ভাবনায় আর দাঁড়াতে পারে না। নিজ সত্তার গোপন সৃষ্টিময় যে অন্ধকারের কথা, মূর্খ বাচালতার বিজ্ঞাপনের হাত থেকে নৈঃশব্দের গর্ভিণী যন্ত্রণায় ফেরার কথা তিনি বারবার বলেছেন, তা আর বাস্তব ও শ্রেণীগত অভিজ্ঞতায়, সময়ের অবসন্ন অর্থহীন দৈনন্দিন অস্তিত্বে থাকে না। তাই তাঁকে প্রসারিত হতে হয় স্পেসে। তিনি বলেছিলেন,

আধখানা মুখ বাইরে রাখো, আধখানা মুখ গোপন ঘরে
গলে পড়ে যায়, গলে পড়ে যায়, ঝরে পড়ে যায় অন্ধকারে।

এই আধখানা মুখের-বিভাজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ যেন শ্রেণীরই উক্তি : "সারাদিনের পর অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি আজ বিকেল বেলা।" ১৯৬৭-র বসন্ত গর্জনে তাঁর মনে হয়,

কাগজে তৈরি আমার ভাইয়ের মুখ ঝুলে পড়ে কার্নিশ থেকে বাইরের হাওয়ায়
আর দেখতে দেখতে অবলার ঘুম ভেঙে যায়, দুচোখ ভার।

তবে শঙ্খ ঘোষ নন্দনভাবনায় এই ইতিহাসকে দেশে-স্পেসে দেখেন, তাই বলেন, "জেনো এ আমার মাটি একাল আমার দেশকাল / জালিয়ানওয়ালাবাগ এবার হয়েছে আরওয়াল!" 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'-এর এক শ্বেত প্রতিক্রিয়াকালীন কবিতাবলীতে আসে ব্যঙ্গ : জয়োৎসব ১৯৭২, এ বসন্তে, ইন্টারভিউ, ইত্যাদি কবিতার ব্যঙ্গ ওই নিজ শ্রেণীর বন্ধ্যান অতিক্রম করে স্পেসে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা। 'কোনো যে মানে নেই সেটাই মানে।' শঙ্খ ঘোষের ইতিহাসস্পৃষ্ট নন্দনভাবনায় এটাই স্পষ্ট হতে থাকল। এক ধরনের বিনির্মাণ তাঁর নান্দনিক দৃষ্টিতে আসতে থাকে : নৈঃশব্দ্যমুখরতা, বাইরে-ভেতর মিলিয়ে আদিম লতাগুল্মময় নিহিত পাতালছায়া ও দিনগুলি রাতগুলির সংশ্লেষে শঙ্খ ঘোষ এক বিনির্মিতির দিকে এগোন। আলথুসের যাকে বলেন 'decentred totality' তাই যেন তাঁর কাব্যভাবনায় ও কবিতায় আসে। পুরোনো মানবিক ভাবাদর্শের 'decentering' ঘটিয়ে Subject of Man-এর ধারণার অস্তিত্বের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে থাকেন তিনি। কবিতা এখ, কবিতা কার মধ্যে, কোন বাস্তবে দাঁড়িয়ে, সে দিকেই তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ফেডারিক জেমসনের মতই শঙ্খ ঘোষও হয়তো ভাবেন কবিতার নন্দনজিজ্ঞাসা, কবিতার ভেতরের আকারটির মুখোশ খুলে, ওপর থেকে ধীরে

ধীরে সেই গভীর মূলে নেমে যাবে, যেখানে কংক্রীট বা মূর্তর সঙ্গে কবিতাটি জড়িয়ে আছে। আর তাই এই দ্বান্দ্বিক ভাবনায় খণ্ডিত অনন্বিত মানব অস্তিত্বে, সামাজেও তিনি কবিতার উৎসমুখ শুকিয়ে যেতে দেখেন না' এক 'সমূহ'র জীবন ও দর্শনে দাঁড়ান। কবিতার পৃথক বিশেষ ক্ষেত্রে জীবন বাঁচে, যদিও সমাজে, শ্রেণীতে এক মহাঅধঃপতন, 'ব্রেকিয়ান ফল' প্রকট হয়ে উঠেছে। শঙ্খ ঘোষ সে কারণেই আপাতবাস্তবকে ভেঙে দেন।

কী কবিতা আর কী কবিতা নয়
এটা বলতে বলতে
ওরা আমাকে মাঠের শেষ কিনারে নিয়ে এল।

যেখান থেকে দুটো ঘোড়া
দুই দিগন্তের দিকে রুখে যায় উদ্দাম ব্যথাময়
সেই ছুটে যাওয়ার ছন্দও, ওরা বলল, কবিতা নয়।

কিংবা

নীরবতার মধ্যে জ্বলে উঠছে আগুন
সমুদ্রের মধ্যে জেগে উঠছে ধ্বনি
শরীরের মধ্যে জেগে উঠছে পাতাল

আর কেউ তা দেখতে পায় নি ব'লে
সবাই ওকে নাম দিয়েছে মাতাল।

ওই ছুটে যাওয়ার ছন্দ, আর নীরবতার মধ্যে আগুন ও শরীরের মধ্যে পাতাল-এর এই চেতনা আনে জেমসন কথিত ওই গভীরের কংক্রীটকে খোঁজা, শঙ্খ তাঁর নন্দনতত্ত্বে একেই পেতে চান। 'কবিতা মুহূর্ত চায়, শিকড়ে সর্পিল স্বাধীনতা'—ওই স্বাধীনতা, কিন্তু তা রৈখিক নয়, শিকড়ের এই স্বাধীনতার ধ্বনিই গুঞ্জরিত হয় শঙ্খ ঘোষের বহুমাত্রিক নান্দনিক আকাশে। সর্পিল এই কারণে, বাইরের বাস্তবে ওই স্বাধীনতা নেই, চেনা জগতেও পাথর।

কোন তল থেকে পাবে কথা
স্বরধ্বনি, স্বরধ্বনি চাই।
ডুবুরি নামাতে গিয়ে দেখি চেনা স্রোতের ভিতরে
কেবলই পাথর জমে আছে।
পাথরে পা রেখে এই ব্যঞ্জনশরীর ছুঁয়ে দেখো
নির্বীজ পাথর, সেও ফেটে যাবে সহস্রধারায়।

নির্বীজ পাথর ও সহস্রধারায় ফেটে যাবার স্বপ্ন, এই দুয়ের সংঘাতে শঙ্খ ঘোষ

নির্মাণ করেন এই দুই বাস্তবে এক নন্দনতত্ত্ব, যা ইয়োরোপের নন্দনতাত্ত্বিক পরম্পরার বাইরে। এ মাটিতে দাঁড়িয়েই তিনি পান এদেশের নন্দনতত্ত্ব, বিষ্ণু দে যেমন ইয়োরোপকে গ্রহণ ক'রে, আত্তীকৃত করে আবার তাকে বর্জন করে দেশজ শিকড়ের জলে বাঁচতে চেয়েছিলেন। তিরিশের কবিদের, বিশেষত জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-র পরম্পরা এভাবেই শঙ্খ ঘোষের মধ্যে নতুন মাত্রায় বাহিত হয়। তাই কবি তাঁর কাছে কর্মী, কৃষক হয়ে ওঠে। বলেন, "অনেক দিন মেঘের সঙ্গে কথা বলোনি তাই এত শুকনো হয়ে আছো এসো তোমার / মুখ মুছিয়ে দিই / সকলেই শিল্প খোঁজে রূপ খোঁজে আমাদের শিল্পরূপে কাজ নেই আমরা এখানে / বসে একটি মুহূর্তের শস্যফলনের কথা বলি।" এই ফলন, এর যন্ত্রণা, এর নৈঃশব্দ্যের তর্জনী শঙ্খ ঘোষের নন্দনচিন্তায় প্রধান হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন, "লিখতে হবে নিঃশব্দে কবিতা, এবং নিঃশব্দ কবিতা। শব্দই জানে কেমন করে সে নিঃশব্দ পায়, ঐশ সূত্র না ছিঁড়েও। তার জন্য বিষম ঝাঁপ দেবার দরকার আছে দুঃসহ আড়ালে থেকে। দুঃসহ, কেননা অন্তরাল সহ্য করাই মানুষের পক্ষে সবার চেয়ে কঠিন। কবিকে তো আজ সবটাই খেয়ে ফেলছে মানুষ, তাই মানুষের এই শেষ দায়টা মেনে নিয়েও ঘুরছে সে, অন্তরাল ভেঙে দিয়ে এক শরীর দাঁড়াতে চাইছে অন্য শরীরের সামীপ্যে। তা যদি না হয় তাহলেই সহ্য যায় পেরিয়ে,—কিন্তু তবু সেই দুঃসহ আড়ালে বসে সে তৈরি রাখবে একটা দৈনন্দিনের মুখোশ ; তাকে কেউ চিনবে না, আঙুল তুলে বলবে না, 'এ লোকটা কবি', আর তার ভিতর থেকে গোপনে জন্ম নেবে নিঃশব্দ কবিতা।" দুঃসহ আড়াল ও দৈনন্দিনের মুখোশ বা পার্সোনা, আধখানা মুখ বাইরে রাখো, আধখানা মুখ ভেতরের মধ্যের অস্তিত্বগত আততিতে, বাইরের সাধারণ প্রাত্যহিকতার কবি বলে না চেনার অন্তরালে গোপনে নিঃশব্দ কবিতার জন্ম—সত্তা-রক্তমাংসর অর্থের পর অর্থের গভীরতম স্তরে। শঙ্খ ঘোষ কবিতাকে দেখেন এভাবে অস্তিত্বের, এগজিসটেনস-এর আদিস্তর হিসাবে। কবিকে মানুষ খেয়ে ফেলছে—এই উক্তিতে থাকে তাঁর কাব্য-ভাবনার ইতিহাসবোধ। ১৯৬৬-তে এই অন্তরাল থেকে, ভেতরের নৈঃশব্দ্য থেকে যাত্রা ১৯৭০-এ অন্তমাত্রিক সামঞ্জস্যের কথা বলে, "...সংগীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি করতে চাই দৈনন্দিনের। প্রবল প্রহারের উত্তেজনার মধ্যে আমাদের জীবন। একদিকে হাতে রাখি চাঁদের শিল্প, অন্যদিকে বরফজমা শীতের মাঠে প্রতিবাদরত মেয়েদের ওপর মুদ্গর তোলে গণতন্ত্রী পুলিশ, বর্ণের কারণে, ধর্মের কারণে এদেশে-ওদেশে জীবন হয় জামিন, ফুটপাথে ফুটপাথে জ্যোতির্ময় নিয়তিরেখা রাতারাতি পালটে যায় নিষিদ্ধ ইস্তাহারে, উজ্জ্বল মেধাবী যুবাদের

মাথা থেকে কব্জি পর্যন্ত তৈরি হতে থাকে সামর্থ্যের সংযোগ। বিশাল এই সময়কে তুলে আনবার জন্যই মিশ্রশিল্পের জটিল আয়োজন আজ, কিন্তু নিছক শব্দও কি জানে না তাকে ছুঁতে?'. শব্দের ফাঁপা সংসারের বিরুদ্ধে আমাদের সাবেক ভণ্ডতার বিরুদ্ধে শঙ্খ ঘোষ দাঁড়াতে চান। আর এই সূত্রেই বলেন, "আসলে, যাকে বাইরে দেখি প্রহার বা ক্রোধ, তারই অন্ত পিঠে আছে গহন কান্না। এছাড়া কোনো বড়ো শিল্প নেই।" এই প্রহার-কান্না মিলিয়ে এক স্বেদাক্ত জীবনলগ্ন নন্দনআকাশ শঙ্খ ঘোষের। বড়ো শিল্পের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়, জীবনে তার কোথায় অস্তিত্ব, এটা তাঁর কাছে বড় প্রশ্ন। সংসারের ব্যস্ততা, নির্বোধ উচ্চাশার হানাহানির অবোধচলার উল্টো দিকে তাকালে, তার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করলে, "অমনি দেখা দেয় অন্তরালবর্তী এক রোদসীরেখা, জেগে ওঠে আরেকটা উর্মিময় দেশ। এই দেখাই, চলতি জীবনের আত্মার সঙ্গে এই গোপন সম্পর্কই কবিতা, এইখানেই ধরা দিতে থাকে ভয়াবহ পরিণামহীন মীমাংসাহীন সত্য। আর এই সত্যকেই, এই সম্পর্ককেই আবিষ্কার করে নিতে চায় নীরবতা, শব্দমধ্যবর্তী নিঃশব্দ।" এ নিঃশব্দ শব্দ থেকে পালানো নয়, বরং শব্দকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলা মাত্র, অভ্যস্ত শব্দ সম্পর্কের আলস্য ভেঙে দিয়ে তার মধ্যে সত্যের প্রবাহ নিয়ে আসা। শঙ্খ ঘোষের এই নিঃশব্দ, চলতি জীবনের আত্মার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক শব্দসর্বস্বতা নয়, আবার অর্থহীন নৈঃশব্দে নিমজ্জিতও নয় : তিনি যাকে সত্যের প্রবাহ বলেন তাই চিহ্নক ও চিহ্নিতের অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক, যার বিদ্যুৎ স্পর্শ দৈনন্দিন অভ্যস্ত শব্দে থাকে না। "গোপন" শব্দটির সতর্ক ব্যবহারে শঙ্খ ঘোষ যা বলেন, ভিটগেনস্টেইন বা দেরিদা হয়তো সেটাই বলবেন অন্যভাবে : অর্থের উৎপাদনে ইচ্ছুক সাবজেক্ট মূল উপাদান নয়, একটি ভাষাগত অবয়বই প্রধান যাতে সাবজেক্ট ধরা পড়ে। কবি বা বাচকের উক্তি, লিখিত উচ্চারণের নানা সম্ভাব্য প্রসঙ্গ-প্রকরণ, কবি যে সীমা আরোপ করেন তার মধ্যে আবদ্ধ নয়। আর সেই ১৯৬২তেই শঙ্খ ঘোষ এই নৈঃশব্দ্যের গহন সত্যপ্রবাহর সঙ্গেই বুঝেছিলেন, নতুন শব্দের সৃষ্টি শেষ কথা নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই মূল। "কিন্তু শব্দের নতুন সৃষ্টি কেমনভাবে সম্ভব? তখন আমাদের মনে পড়ে যে গ্রন্থকীটের ভাষা নয়, লৌকিক ভাষা মৌখিক ভাষাই হলো কবিতার অবলম্বন। কবিতার শব্দ নামে পৃথক কোনো বস্তু নেই, সমস্ত প্রচলিত শব্দই কবিতার শব্দ।" এও পুরোনো কথা। শঙ্খ ঘোষ এর সঙ্গেই বলেন, 'মৌখিক ভাষা সম্পর্কে ধারণা আর অভিজ্ঞতা তো সবার একরকম নয়, আবার যুগে যুগে এর একটা স্থানাস্তক্রমণও ঘটে যায় ধীরে ধীরে। কথাটা এই যে মুখের সচল ভাষা তার পরিবর্তমান উজ্জীবনী প্রাণ নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে

যায়, নানাভূমির নানা জলে সেখান থেকে এক-এক অঞ্জলি জল নিয়ে তাঁদের পাত্র পূর্ণ করে নেন। কিন্তু কোথায় সে জল টলটলে, কোথায় বা জীর্ণ উদ্ভিদের শবে জড়া, কোথায় ঘূলিয়ে-ওঠা পঙ্কতিলক, তা কি স্থির বলে দেওয়া যায়।' ১৯১৮-য় রোমান য়াকবসনও ভাষার দুটি স্তর দেখেছিলেন : অবজেকট ল্যাঙ্গোয়েজ ও মেটাল্যাঙ্গোয়েজ। প্রথমটি বস্তু সম্পর্কে বলে, দ্বিতীয়টি ভাষা সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক ভাষাতেও বড় ভূমিকা পালন করে। কেবল আমরা এই ভাষার ব্যবহার ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকি না। শঙ্খ ঘোষ তাঁর কাব্যভাবনায় ব্যক্তির গহন গোপন অন্তরালে যেমন ব্যক্তিক আবার সর্বকালীন সত্তার কথা বলেন, বহির্বাস্তবের বিবেচনায় সামাজিককেও অন্তর্গত করেন, ঠিক তেমনি শব্দের নতুন সৃষ্টিতে কবিতার কালান্তরের, স্বকীয়তার দিকে যেমন দিক নির্দেশ করেন, তেমনি "পরিবর্তমান উজ্জীবনী প্রাণ নিয়ে প্রবাহিত" এই চিত্রপ্রতিমায় পরম্পরা ও লৌকিক ধারাবাহিকতার কথা বলেন। য়াকবসনের মতো, ওই লৌকিক প্রবাহে কবিতার ভাষাকে দেখেও, কবিতার ভাষার বিশেষ চারিত্রকে তিনি মানেন। হয়তো য়াকবসানের মতো তাঁরও মনে হয় "The poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination." এই সংযুক্তি সংশ্লেষণের দিক থেকেই কি কবিতাকে 'পাপহর অগ্নিদেবতা' মনে করেন শঙ্খ ঘোষ? শব্দের জাতবিচার করেন না? আর এই সংশ্লেষণের জন্যই তাঁর আপত্তি শব্দের স্বয়ম্প্রকট অস্তিত্বে? কবিতায় শব্দ তখনই সার্থক যখন, শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, "সমগ্রতার সঙ্গে সমবায়" ছিন্ন না করে। যাকবসনের combination, শঙ্খ ঘোষের সমবায়। আর ফ্রেডারিক জেমসন যেমন রাজনৈতিক চেতনাকে সেই সমগ্র সমূহের চেতনা মনে করেন যার মধ্যে বিশেষ বস্তু ও নানা ব্যক্তির অর্থ থাকে, শঙ্খ ঘোষও কবিতাকে ওই সমগ্রতার সমবায়ে দেখেন, যার মধ্যে শব্দ-ছন্দ-অন্বয় বাঁধা পড়ে, মুক্তি পায়। কবিতায় শুধু অন্বয় নয়,—তিনি এক চেতনার কথা বলেন, যা চোখের সব অভ্যাস ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু এখানেও বাইরের অবয়বে শব্দ-শব্দপরম্পরায় আক্রমণকে শঙ্খ ঘোষ কোন নতুন দ্যোতনায় দেখেন না। এখানেও তিনি সংযোগের কথা বলেন, দুই শব্দের সংযোগ বিন্দুর উপর আক্রমণটাই সবচেয়ে গুরুতর, এখানে যে মৃত বাঁধনে জড়িয়ে থাকে তারা, সেই বন্ধন খুলে দেওয়াই কবির কাজ। আর অদৃশ্য সংযোগ বিন্দুই ছন্দ বা স্পন্দন, ছন্দস্পন্দ। অদৃশ্য শ্রুতিগোচর এই ছন্দের প্রবাহে ভেসে আসে শব্দ। ছন্দের আলোড়ন একই সূত্রে বাঁধা। এই measure of sequence কবিতার বাইরের ভাষায় প্রায় থাকে না। য়াকবসন বলেন, "Only in poetry with

its regular reiteration of equivalent units is the time of the speech flow experienced, as it is······with musical time. শব্দের নূতন সৃষ্টির ভাবনায় শঙ্খ ঘোষও দেখেন Sound symbolism কবিতায় সব থেকে স্পষ্ট, শব্দ ও অর্থের বন্ধনও প্রত্যাহিক ভাষার থেকে তাই পৃথক হয়, পাল্টায়। শঙ্খ ঘোষের ছন্দস্পন্দ এই কাজই করে,দুই কবির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে স্বর, এই স্পন্দ। কবিতা খোঁজে অন্তরঙ্গ ব্যক্তির স্বর : একই শব্দ এই স্বরের ভিন্নতায় অর্থের তারতম্যে যায়। এটা শব্দের সংযোগ বিন্দু, এই দুই শব্দের সংযোগ বিন্দুতে ভেসে ওঠে কবির মুখ।

শঙ্খ ঘোষের কবিতার নন্দনচিন্তায় পাঠকের প্রসঙ্গও ঘুরে ফিরে আসে। এ প্রশ্ন ওঠে, কী ভাবে পাঠক নিজেকে দেখতে চান কবিতার ভিতরে। কবিতা নিজেকে নিজের থেকে বার করে আনবার উপায়, পাঠক সেই নিঃসৃত সত্তাই খুঁজে নিতে পারে। শঙ্খ ঘোষ কিন্তু উলফগ্যাং আইসার-এর মতো সাহিত্যিক টেকসট-এ যে ফাঁক বা শূন্যতা থাকে তা পাঠককে কেমন প্রণোদিত করে অর্থের নির্মাণে, আর এ অর্থ ওই নির্মাণ ছাড়া থাকে না, এসব কথা বলেন না। তিনি এই সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, আমাদের সমগ্র জাতীয় মানসের অভ্যাস কি তেমন সংগত কবিতাসৃষ্টির অভিমুখী ? রচয়িতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় যুগগত আকাঙ্ক্ষার পরিমাণসীমা। শঙ্খ ঘোষ কবি ও পাঠকের সম্পর্ক অন্য ভাবে দেখেন। এই সংকটে তাঁর মনে হয় কবিতাই পাঠকের হাত ধরে নিয়ে যায় আলোর দিকে, তবু পাঠককে তো প্রসারিত করে দিতে হয় সেই হাত। পাঠকের প্রত্যাবর্তনের যে তত্ত্ব একাধিক তাত্ত্বিকের হাতে আজ ইয়োরোপে গড়ে উঠছে, শঙ্খ ঘোষ সে পথের নন। তিনি এই সম্প্রসারণের, নিজেকে নিজের বাইরে আনার অবসরের প্রস্তুতির প্রশ্ন তোলেন। কোনো একটি বিন্দুতে নিজেকে অভিক্ষেপণ করবার, মিলিয়ে নেবার দীক্ষা, দেশের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে তিনি দেখছেন না। মানবিক দায়িত্ববোধ, একাত্মবোধ নেই। বস্তুত "যতক্ষণ পর্যন্ত না তেমন কোনো বোধের সামান্যসীমা প্রস্তুত হবে, ততক্ষণ কবিতার মধ্যে কবি তাঁর যে-অস্তিত্ব দেখবেন এবং পাঠক সেখানে তাঁর যে অস্তিত্বকে খুঁজবেন তার কোনোটাই তাঁদের সত্য শরীর নয়।" এই উক্তিতে স্পষ্ট হয়, শঙ্খ ঘোষের নিঃশব্দের সাধনা, তাঁর শব্দের নূতন সৃষ্টি একবৃহত্তর দায়িত্ববোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কবিতাকে বাস্তবের দেশের জলহাওয়াতেই দাঁড় না করালে, শেষ পর্যন্ত 'সত্য-শরীর' আসে না। শঙ্খ ঘোষ এই চলতি জীবনধারার পঙ্গুতার মধ্যেও কবিতাকে সত্য করে তোলার লড়াইয়ের কথা বলেন, "চলতি জীবনধারায় অতীতকে নিত্যই পুনর্বিন্যস্ত করে নেবার কোনো সতেজ অভিজ্ঞতা আজ আমাদের অল্পই ঘটে।" চলতি জীবন, সতেজ অভিজ্ঞতা ও অতীতের

পুনর্বিন্যাস, কবিতার অনুকূল এই পরিস্থিতি ও উপাদানের উল্লেখেই বোঝা যায়, শঙ্খ ঘোষ কবিতাকে পরম্পরা-বর্তমানের দোলায়, আর ছন্দপ্রবাহের মধ্যে দেখতে চান। "আমাদের এ এক বিদেশিলালনপুষ্ট আত্মপরিচয়হীন বদ্ধছিন্ন সমাজ! এ সমাজে একদিকে রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ করতে হয় এই বলে যে, কনারক বা অজন্তা রয়ে গেছে কনারক বা অজন্তারই কালে, তাকে সচল করে নেবার কোনো সাধনা হয়নি আমাদের জীবনে বা শিল্পে; অন্যদিকে বুঝতে হয় যে পাশাপাশি বসতি করেও নিজেদের মধ্যে আমরা বহন করে চলছি বহু ভিন্ন সংস্কৃতির ভাঙা টুকরো, তার মধ্যে সংগত কোনো সামঞ্জস্য নেই। আর এটা যে কেবল আমাদের সাম্প্রতিক সমাজের বিলাপ তাও নয়। যে বিগত শতাব্দীকে রেনেসাঁস ভেবে আত্মপ্রসাদ বোধ করি, সেইখানেই ছিল সর্বনাশের সূচনা, দেশের মধ্যে দেশহীনতার এই ভয়ংকর পরিমণ্ডলে কবিতার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়।" শঙ্খ ঘোষের কবিতার নন্দনভাবনায় এই বোধও সচেতনতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: ঐতিহ্য বা পরম্পরার ছিন্নতা, দেশের মধ্যেই পরবাসীসত্তার, দেশহীনতার ভয়ংকর বাস্তব যে কবিতাকে তের্যক করে দেয়, এই চৈতন্যের পটেই তাঁর নিঃশব্দ, শব্দ, ছন্দস্পন্দ, সংযোগবিন্দুর ধারণাকে বুঝতে হবে। "তবু এই বিধ্বস্ত মানসিকতার গহনে এখনো হয়তো আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের কিছু অনুষঙ্গ লুকোনো আছে কোথাও। তাকে প্রবাহিত করে নেওয়াই, কবি এবং কবিতার পাঠককে সেই ঐতিহ্যের মধ্যে সচল করে দেওয়াই আজ কবিতার কাজ। নির্জন আত্মস্থতা এই দায়িত্ব বহনেরই একটা গোপন আয়োজন মাত্র।" গহন গোপন ও প্রবাহিত, কবি ও কবিতার পাঠক: এই শব্দাবলীর পাশাপাশি সংস্থিতিতে শঙ্খ ঘোষের নন্দনভাবনার পুরো চেহারাটি স্পষ্ট হয়। উক্তির শেষ বাক্যটিতে ধরা দেয় নিঃশব্দ আসলে বৃহত্তর দায়বদ্ধতারই আর এক দিক। আর এর মধ্যেই চাপা বিদ্যুতের মতো আসে শ্রেণীভাবনা। "আমরা সকলে যে ঠিক একটাই সময়ে বেঁচে আছি, আমাদের সকলের সময় যে একেবারে সমান একথা তত সত্যি নয়। শিক্ষিত মানুষ আর অশিক্ষিত মানুষ, গ্রামীণ মানুষ আর নাগরিক মানুষ, ব্যবসায়ী মানুষ আর মসীজীবী মানুষ—একই মুহূর্তে বেঁচেও কি এরা সবাই একই সমাজের বাসিন্দা? সময়ের যেন ভিন্নভিন্ন কয়েকটি তল তৈরি হয়ে আছে আমাদের ভিন্ন জনের অভিজ্ঞতায়, এরা যে সহজে পরস্পর মিলে যাবে এমন আশা কম।" বর্গ-পার্থক্য শ্রেণী-পার্থক্য একই অভিজ্ঞতাকে ভিন্ন করে, তাই কি ওই সংযোগ বিন্দুর জন্য ঐতিহ্যে ফিরে যেতে হয়? কিন্তু ঐতিহ্যও তো এক হিসেবে বন্দী, নদীর মতো দুধারে সীমা দিয়ে বাঁধা তার প্রবহমানতা: সে এক দেশনিহিত সময়। তাই ঐতিহ্যের ব্যবহারে চাই ইতিহাস চেতনা, চাই পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। শঙ্খ ঘোষ

যে স্পেসে প্রসারিত হন কবিতায় তার মর্মে কিন্তু ওই কালজ্ঞানের স্পর্শ, তবে সময় দেশনিহিত। তাই তাঁর স্পেস সরল বা ফ্ল্যাট নয়। কবিতাকে ডি-সেন্টারড করেই শঙ্খ ঘোষ তাঁর শব্দের মধ্যবর্তী সংযোগবিন্দুর মতো ঐ কালচেতনায় বিভিন্ন শ্রেণী, বর্গের অভিজ্ঞতার পৃথকত্ব পেরিয়ে একটা একই সময়ের বাঁচার মুহূর্তের ভিন্নতা মেনে নিয়েই একটি সংযোগবিন্দু খোঁজেন। শিল্পীর দুই দায়িত্বের কথা বলেন, বাইরের চঞ্চলতা ও ভিতরের ছন্দনির্মাণ সাধারণের বোধে কার্যকারণ-সম্পর্কে বাঁধা না পড়লেও, কবির কাছে গম্য। এই দুয়ের টানাপোড়েনে কবিতার মুহূর্ত একটা কেন্দ্র পেতে চায়। বাস্তবের ভাঙনকে প্রত্যক্ষ করেই, তার অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করেই শঙ্খ ঘোষ একটা সংযোগবিন্দু তাঁর নন্দনচিন্তায় পেতে চান।

তাঁর নন্দনভাবনায় "সত্য" শব্দটি বারবার ঘুরে আসে : বইয়েরই নাম দেন শব্দ আর সত্য। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোনো কবিতার নন্দনজিজ্ঞাসায় সত্যকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন, এটা ভাববার। সত্যসুন্দরের যে অভেদ আগে করা হতো, রোমান্টিকরা করতেন, শঙ্খ ঘোষের সত্য ও কবিতা কি তারই প্রতিরূপ? তিনি বলেন, "কেননা মিথ্যে যে সামাজিক প্রলেপে আমরা ঢেকে রাখি সত্যের মুখ, সেই লেপন মুছে গেলেই ভয় পাই আমরা, তাকে ঢেকেই রাখতে চাই প্রাণপণ। বড়ো সাহিত্য সেই জন্যে অনেক সময়েই আমাদের কোনো-না-কোনো ভয়ের মুখোমুখি নিয়ে যায়, এই ভয়টাই সত্যের অন্যতম এক নিরিখ।" কবিতায় যাকে বলেন মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, সেই বিজ্ঞাপনই সামাজিক প্রলেপ। তিনি উজ্জ্বল মিথ্যার প্রতিপক্ষে ওই ভয়ের সত্যকে দাঁড় করান। এই সত্যের মুখোমুখি হয়েই কবিতার শরীরে আসে সংঘর্ষের কথা, নগ্নতার কথা, আক্রোশ ও উৎপাতের কথা। সত্যসন্ধানী কবির কথা বলেন শঙ্খ ঘোষ : "কবিকে জেনে নিতে হয় যে সকলের কথা বলা আর সকলের জন্যে বলা একই জিনিস নয়।" "শব্দ বাহুল্যের বাইরে দাঁড়িয়ে, বিজ্ঞাপনের বাইরে দাঁড়িয়ে, ভুল আস্ফালনের বাইরে দাঁড়িয়ে সত্যিই যদি নিজেকে, নিজের ভিতর এবং বাহিরকে আপ্রাণ জীবনযাপনের বিভীষিকার সামনে খুলে দিতে পারেন কবি, সেই হবে আজ তার অস্তিত্বের পরম যোগ্যতা, তার কবিতা!" শঙ্খ ঘোষ সত্যের প্রসঙ্গ জোরের সঙ্গে আনেন, কবিতার কাজ হলো 'যা সত্য তাকে সরাসরি বলা', নিজের সত্যের সঙ্গে নিজের কোনো কারচুপি চলে না কখনো। এই সত্য কী, কবির সত্য কী, এর কোনো সংজ্ঞা ফর্মুলা শঙ্খ ঘোষ দেন না। আপ্রাণ জীবনযাপন, নিজের সত্তার এক আততির আভাস দেন : ছন্দ ও অছন্দের দোলায়, মিল অমিলের মধ্যপথে কবি আর জীবনের সংঘর্ষের সম্পর্ককে ধরিয়ে দেওয়ার প্রতিমায়, পালিয়ে যাবার বিরুদ্ধে উদ্যত,শব্দের প্রতিশোধে বাধার এক কবিসত্তার

সত্যের কথা বলেন। এ সত্য বাইরের বাস্তব ও কবির নিঃশব্দ গহন গোপনের সম্পর্কে-সংঘাতে নির্মিত হয়, হয়ে ওঠে। ব্যক্তি-সমাজ, হৃদয়-মেধা, আত্ম-মুক্তি, রহস্য-স্বচ্ছতা, আসক্তি-বিদ্রূপ নিয়ে নানা মুহূর্তের খণ্ডতা, পরস্পর সম্পৃক্ত হতে চায় যে সমগ্রে, সেটিই সত্য। এ সত্য বহুমাত্রিক, কবির হয়ে ওঠার সত্য, তাঁর কবিতার মুহূর্ত আবার কালান্তরের সত্য। মনে পড়ে যায়, থিয়োডোর অ্যাডর্নোর ট্রুথ কনটেন্টের কথা : the truth content of a work is not what it means, but what decides whether it is itself true or false. এই ধারণায় অ্যাডর্নো যেমন প্রচলিত ব্যাখ্যার বাইরে এসে নান্দনিক অর্থকে ঐতিহাসিকভাবে বোঝান, শঙ্খ ঘোষও সত্যের ধারণায় এ সময়ের নান্দনিক ভ্রান্তি এড়িয়ে যান।

আর সত্যচেতনাই শঙ্খ ঘোষকে বারবার নিয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে। শঙ্খ ঘোষ যত গদ্য লিখেছেন, তার বড় অংশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গদ্য গ্রন্থটিও রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই। এই রবীন্দ্রনাথের সমীপবর্তী হওয়া শঙ্খ ঘোষের নন্দনচিন্তার একটা দিক। একথা কোন সময়েই ভাবেননা, তাঁর সময়, তাঁর সমস্যা-সংকট, রবীন্দ্রনাথের সময়-সমস্যারই মতো, কিন্তু মহাকবি যে এ বাস্তবে যাত্রারম্ভ, সত্য-সুন্দর, আনন্দ-মঙ্গল, দ্বন্দ্ব-উত্তরণের এক সমগ্র প্রত্ন-প্রতিমা এখানকার আধুনিকের কাছে, এ বোধ শঙ্খ ঘোষ পেয়ে যান ঐ decentering totality-র ধারণায়। কবিতা বিষয়ী ঠিক, মানুষও তাই, কিন্তু তার প্রকৃত অবস্থা কী, কোন সমাজ দৃশ্যে মানবদৃশ্যে প্রকৃতিদৃশ্যে সে লগ্ন, এই বিবেচনাও যেহেতু শঙ্খ ঘোষের নন্দনভাবনায় লেগে থাকে, সেহেতু রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর কবিতার উজ্জীবনলোকে আসেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। এর অর্থ এই নয়, শঙ্খ ঘোষ কবি হিসাবে রাবীন্দ্রিক। বরঞ্চ তার বিপরীতই। কিন্তু কালচেতনাস্পৃষ্ট দেশচেতনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বময় তৃপ্তিহীন বিকাশকে নিজ বিকাশে, লড়ায়ে লগ্ন করেন। আধেক ভেতরের দিকে, আধেক বাইরের দিকের যে ভাবনা তাঁর, তাতেই রবীন্দ্রনাথ সঙ্গী হন : মহাকবি আপনারে দিয়ে আপনার আবরণ রচনাকে দেখেছিলেন, ভবন ও ভুবনের আধা আধি হয়ে যাওয়া দেখেছিলেন, মুখর কবিকে নিঃশব্দের গহন গোপনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, দেশের মধ্যে দেশহীনতার ভয়ংকর যন্ত্রণায় আমাদের মহাকবি কুঁকড়ে গেছেন, ঔপনিবেশিক বিচ্ছিন্নতায় রাত্রির কালো চুলের গভীরে নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছিলেন —ওই ঔপনিবেশিক বাস্তব আজও বহমান, জালিয়ানাওয়ালাবাগ আজও আরওয়ালে স্তম্ভিত, শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিসত্তা ও নন্দনচিন্তায় সে কারণেই রবীন্দ্রনাথে ফিরে যান। এই অবসন্ন পঙ্গু মৃত্যু-আকীর্ণ বাস্তবেও রবীন্দ্রনাথ এক সংযোগের, দ্বন্দ্বময় উত্তরণের বিন্দু খুঁজে পেয়েছিলেন, তবু শূন্য, শূন্য নয়ের এক

স্বয়ম্ভর, প্রায় objective correlative-হীন এক লড়াইয়ে। গহন অন্তরালের সত্তার নিঃশব্দ চলমানতায়, প্রকৃতি-মানুষের ইতিহাসে তিনি পেরিয়ে যান ওই কবিতাধ্বংসী বাস্তবকে। ঠিক যেমন শঙ্খ ঘোষ করতে চাইছেন : ভয়াবহ বাস্তবের মধ্যেও স্বপ্ন দেখেন, কবিতা ও তার নন্দনতত্ত্বে অতিক্রম করতে চান : 'যন্ত্রের এপারে আমি বসে থাকি বসে থেকে ভাবি যদি একদিন কোনো এক রাত্রিবেলা / অতর্কিত অন্ধকারে তোমার বুকের সব রুদ্ধ পাপড়ি খুলে খুলে শহর / সমুদ্রে নামে / শহর সমুদ্রে নামে স্নান নিতে, ঘুমের ভিতরে।" আমূল ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়েও আয়ো অর্ধেকের খোঁজ তিনি করেন, কেননা, "ভালোবাসা অর্ধেক স্থপতি" এই সব উচ্চারণে একটা সংযোগের, বাঁচবার বিন্দুটি অন্বেষণের তবু শূন্য, শূন্য নয়ের লড়াই : ওই কেন্দ্রচ্যুত সমগ্রকে একটা সংহত সমগ্রে নিয়ে আসার চেষ্টা। এখানেই রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার, ঠিক এমনি উত্তরাধিকার মেনেছিলেন আর একজন অ-রাবীন্দ্রিক কবি, বিষ্ণু দে। শেষ পর্যায়ের তিক্ত, ক্রুদ্ধ কবিতাগুলির মধ্যেও, দুঃসহ বাস্তবের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের পরম্পরাতেই দাঁড়িয়েছিলেন প্রায় নিজ সত্তার কেন্দ্রে। শঙ্খ ঘোষ তাঁর সময়ের ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সামনে যেমন দাঁড়াতে চান রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনের আলোয়, তেমনি জীবনানন্দের মতো মৃত্যুর ছায়ায়। তিনি দেখেন,

> বৃষ্টি হতে থাকে, গঙ্গাকালো হয়ে আছে প্রতিপদে
> নিকষ রাত্রির ঘাট শুয়ে আছে শুচিপ্রতীক্ষায়—
> সারি সারি শব রেখে চুল্লি বসে আছে গ্রাস নিয়ে
> যে-কোনো মৃত্যুই আজ দাবি করে পোস্টমর্টেম।

শঙ্খ ঘোষ প্রত্যক্ষ করেন, 'জাগ্রত মানুষ শুধু রক্ত খায় ...জানা বা অজানা বহু অন্ধ করপুটে প্রাণের নিশ্বাস খায় তারা"—এই ভীষণসত্য শঙ্খ ঘোষ উচ্চারণ করেন, এ ইতিহাস-দৃষ্টিতে যেন মেশে এক অন্ধকার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারে জীবনানন্দ বিষ্ণু দে-র মতো তিনি নিজের গলার স্বরে খুঁজে ফেরেন "এই মধ্যরাত / আরণ্য পাখির গানে শিশির সন্ন্যাসে আর ঘুমন্তজনের পর্বপাতে।" এই গলার স্বর এক মধ্যরাত খোঁজে যখন পাখি ঘুমন্ত মানুষ জাগে, ডানায় জড়ানো শূন্যে হারানো গলার স্বর খোঁজার কথা ওই মৃত্যুর মধ্যেও তিনি বলেন। অন্তবিলাপে, "কোন্ ক্ষেতে বা কোন্ খামারে সমবেত লোকজনেরা / জমছে এসে শস্ত্রপাণি বলো আমায় হে সঞ্জয়" : পুরাণের কুরুক্ষেত্র উলটে যায়, এক বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে শঙ্খ ঘোষ ওই রক্ত-পানকারী জাগ্রত মানুষের অন্তরূপ খোঁজেন : স্পেসের মুক্তি কালখণ্ডের অন্ধকার পেরিয়ে ঘটতে চায় : চাষ আবাদ নেই জানেন, কিন্তু "আছে বীজ, সার, কলাকৌশলও আছে, তবু মানবজমিন পড়ে আছে।" এই 'তবু' শব্দটির উদ্ধত

অস্তিত্বে শঙ্খ তাঁর দুঃস্বপ্নের ইতিহাসকে স্বপ্নময় করে তোলেন, মোটের উপর বেঁচে থাকাটাই ভাল—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে "ঘনময়ূর স্বর্ণোজ্জ্বল তুমি নও কারো তাঁবে", এই স্বাধীন উচ্চারণ করেন। রবীন্দ্রনাথের মতোই বিকৃতি ও ধ্বংসের মধ্যেও এক মশালের স্বপ্নের কথা শঙ্খ ঘোষ বলেন।

শব্দ নিশানের উড়াল পথ ধরে মশাল তুলে দেয় শিল্পী
এমনই গঙ্গার ভঙ্গ মুছে নেয় দ্বিধার দ্বন্দ্বের লজ্জা
তুমি যে আমাদের সঙ্গে যেতে চাও সেটাই আমাদের শক্তি
আমরা বুকে নেব জীবনজটিলতা তোমার চোখে চাই স্বপ্ন।

বিষ্ণু দে দেখিয়েছেন ইয়োরোপের পরিচিত প্রতিভান্বিত আধুনিকদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ কোথায় এগিয়ে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে পরিগ্রহণের বিরাট চেষ্টার কথা বলেন। শঙ্খ ঘোষও তাঁর দীর্ঘ সমাজের পটভূমিকায় নান্দনিক জিজ্ঞাসায় ওই চিরকালের আধুনিকতাকে পরিগ্রহণের তাৎপর্য স্বীকার করেন, "নিজের মধ্যে অনেকখানি জায়গা শূন্য রেখে তিনি তাই মিলনের দিকে এগিয়ে চলেন কেবলই, আত্মবলয় ভাঙা সেই যোগের মধ্যেই আছে তাঁর চিরকালীন আধুনিকতা, সমস্ত আত্মপরাভবের গ্লানি থেকে মানুষকে মাথা তুলতে শেখায় যে আধুনিকতা, অন্ধ প্রাণশক্তির প্রভুত্বকে তুচ্ছ করে দিয়ে কেবলই কোনো চিত্তশক্তির দিকে এগোতে চায় যে আধুনিকতা।" রবীন্দ্রনাথকে ১৯৭০-এর দশকের উত্তাল অভিজ্ঞতায় এভাবেই শঙ্খ ঘোষ পেয়েছেন : আত্মপরাভবের গ্লানি ও অন্ধ প্রভুশক্তির প্রভুত্বের প্রতিপক্ষে তিনি, তাঁর নন্দনচিন্তা যেভাবে কবিতায়, কবিতায় মুহূর্তে নগ্ন প্রশ্নের মুখোমুখি, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতাকে পরিগ্রহণ করেন, আবিষ্কার করেন, পুনরুৎপাদিত করেন।

আসলে ডি-সেন্টারড টোটালিটির চেতনায় শঙ্খ ঘোষ একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতার আধুনিকতাকে পরিগ্রহণ করতে চান, তেমনি তাঁর নিঃশব্দের তর্জনী, শব্দ ও সত্যের সম্পর্কের ধারণা এক রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করে। 'জাগ্রত মানুষ', এই প্রচলিত পজিটিভ ধারণা তাঁর হাতে রক্ত খাওয়ার অনুষঙ্গে নেগেটিভ হয়ে যায়, শ্মশান চিতার আলো তার মৃত্যু-ধ্বংসের-অবসানের অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে জন্মভূমির আলো হয়ে ওঠে, ব্যঙ্গর তীক্ষ্ণ চাবুক তাঁর নিঃশব্দের গহন অন্তরালের সত্তায়, নন্দনচিন্তায় এমন এক জীবনাবেগ আনে যাতে মনে হয় এক বিনির্মাণের প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। এ বিনির্মাণ আসলে একটি নির্মাণই। জোনাথন কুলের যেমন বলেছিলেন, যেহেতু "deconstruction treats any position, theme, origin or end as a construction and analyses the discursive forces that produce it, সেহেতু বিনির্মাণশীল লেখা যে কোনো নিশ্চিন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে।

শঙ্খ ঘোষও এক বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতায় ও নন্দনচিন্তায় আর এক নির্মাণের দিকে এগিয়েছেন : Poetry is language in its aesthetic function,"এ বোধের কোন ব্যত্যয় তাঁর হয়নি। Referential function থেকে "displacement of the centre of gravity" কে সরিয়ে দেয় কাব্যিক ভাষা, poetic signএ অন্তর্গত করেন তাকে কবি, অবশ্যই সংযোগের সেতু না ভেঙে ; মুকারভস্কির এই ধারণাও শঙ্খ ঘোষে লভ্য। কবিতায় কাজ কী— এ প্রশ্নের উত্তরে শঙ্খ ঘোষ মুকারভস্কির মতো ঈসথেটিক ও এক্সট্রা-ঈসথেটিক মূল্যবোধের সম্পর্কের কথা বলবেন। যে সামাজিক বাস্তবের অন্তর্গত কবিতা তা একাধিক তলে গঠিত, প্রত্যেকটিই আপেক্ষিকভাবে স্বয়ংশাসিত : বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক স্তর, ভাষা, নৈতিকতা। এই স্বয়ংশাসন থাকলেও তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া আছে। এই মিথস্ক্রিয়ায় নান্দনিক মূল্যবোধ নির্দিষ্ট হয় একদিকে শিল্প-গঠনের প্রত্যক্ষ বিকাশে, অন্যদিকে সমাজ জীবনের গতি ও পরিবর্তনে। এরই আর এক প্রক্রিয়া টেক্সটের ভেতরে : ওই টেকস্‌ট একসট্রা-ঈসথেটিক প্রক্রিয়ার সামূহিক সংশ্লেষণ, আর এই সূত্রেই বলা যায় ওই গতিময় মিথস্ক্রিয়ার সমগ্রই ফর্ম। শঙ্খ ঘোষও কবিতার অন্তর্গত শব্দ, ছন্দস্পন্দ, এসবের বিবেচনার পরও বলেন, "কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা জীবনের একটা গড়ন খুঁজে নিতে চাই, পেতে চাই জীবনযাপনের একটা মানে।" বলাই বাহুল্য, ওই মুকারভস্কি-কথিত মিথস্ক্রিয়ার কথাও, তিনি নিজের মতো করে বলছেন। বস্তুত দিনগুলি রাতগুলি ও ধূম লেগেছে হৃৎকমলে, এই প্রথম ও ১৯৮৭-র কবিতাগ্রন্থ দুটির মাঝখানের ইতিহাসে পর্যায় বিভাগ করা না চললেও, এদের যুগপৎ প্রবাহ লক্ষণীয় হলেও, সময়ের সঙ্গে ডায়ালগে শঙ্খ ঘোষ যে স্পেসগত মুক্তিতে সংকটের উত্তরণ ঘটান, তাতে অন্তঃশায়ী একটি উপাদান ক্রমশ উপরি তলে চলে আসে। পরতে পরতে নামা তলে যে সত্য ও সত্তার মুখ, মুখোশ বিজ্ঞাপন মিথ্যা সামাজিককে সরিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন, তাতে প্রথম দিকের উপরিতল আড়ালে গিয়ে নীচের তল ওপরে উঠে আসে। শঙ্খ ঘোষের নন্দনভাবনাতেও এটাই ঘটে : নিঃশব্দের তর্জনী ও শব্দ সত্যর যে তল, যে মুখ তাকে অটুট রেখেই অন্য তল, অন্য মুখ সামনে এসে দাঁড়ায়। বহুত্ববাদী, বহু মাত্রিক ভাবনায় এই স্থানবদল স্বাভাবিক। এটা ঘটে দুদিক থেকে। তাঁর কবিতার পাঠক হিসাবে, নন্দনচিন্তার অনুধাবক হিসাবে এই স্থান বিদেশে এ সময়ে দুভাবে দেখতে পাই। শঙ্খ ঘোষ নিশ্চয়ই দেরিদা-পন্থী নন। তবু ক্রমশ, ইয়োরোপের উত্তর-আধুনিকতার যে পট-প্রসঙ্গ, বর্তমানের শূন্যতা, হতাশা, আশাভঙ্গের যে বাস্তব, তাঁর সদৃশ বাস্তব অন্য প্রক্রিয়ায় এখানেও আসে মধ্যবিত্ত অস্তিত্বে : এ মধ্যবিত্ত ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সে বাঁচতে

চেয়েছিল, তার স্বপ্ন ও মুক্তির ধারণাও ওই ডিসকোর্সেই। ফলে মূল বাস্তবের মেরুপ্রমাণ পার্থক্য সত্ত্বেও ভাবনার সংকট এই শ্রেণীতে একরকমভাবেই আসে। গ্রামসি যে optimism of will-এর কথা বলেছিলেন, তা এ বাস্তবেও নেই। ৭০-এর দশক থেকে সাধারণ মানুষও অবিশ্বাস ও পরাজিত মনোভাবে আক্রান্ত। উত্তর-আধুনিক জাক দেরিদার চিন্তায় পাওয়ার বা ক্ষমতা সম্পর্কেই সন্দেহ প্রবল, ক্ষমতার দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার দিকে তাঁর অঙ্গুলিসঙ্কেত। দেরিদার চিন্তাসূত্রে মানুষের অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে : অত্যাচারিত অত্যাচারিত কারণ সমগ্র ব্যবস্থাই অত্যাচার উৎপাদন করে। 'আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে'—এই ব্যবস্থাতেই এই চেতনা বড় হয়। এ সময়েই :

ঝড়ে-ভাঙা লাইটপোস্ট একা পড়ে আছে ধান খেতে
শিখরে জোনাকি, শূন্যে কালপুরুষের তরবারি
যুদ্ধ হয়ে গেছে শেষ, নিঃশব্দ প্রহর দশদিকে
যেদিকে তাকাও রাত্রি প্রকাণ্ড নিকষ সরোবর।

"নিকষ সরোবর", এই শব্দবন্ধটিতে ওই অত্যাচার উৎপাদনকারী ব্যবস্থা। তবে দেরিদা ইয়োরোপীয় শূন্যতায় স্বাধীনতার একান্ত অনুপস্থিতি দেখেন, সব রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে হতাশা ও স্বাধীনতাহীনতার নামান্তর ভাবেন, এ বাস্তবে প্রকৃতি-মানুষের সংযোগ যেখানে এখনও ছিন্ন হয়নি, শঙ্খ ঘোষ তা ভাবেন না। বরং এক রাজনৈতিক চেতনাই তাঁর ভাবনার উপরিতলে চলে আসে, যা ছিল নিঃশব্দ গোপন অন্তরালের নীচের তলে জড়িয়ে।

তবে এই রাজনৈতিক চেতনা প্রচলিত রাজনীতি নয়। ওই গহন সত্তারই আর এক প্রকাশ। বলা যেতে পারে, শঙ্খ ঘোষ তাঁর নন্দন চিন্তায় verbalization-কেই একটি রাজনৈতিক ক্রিয়া ভাবতে শুরু করেছেন। ভাষাই বোধ করি একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে ইতিমধ্যে নির্মিত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকলেও, তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ভাষা একই সঙ্গে ব্যক্তির আবার সকলের। একটি ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার অন্তর্গত নয়, তারই কাজের পরিণতি নয়। কবির ভাষাও আসলে অপরের ভাষা ধার করে নির্মিত : বলা যেতে পারে "all verbalized action is mediated"। শব্দ—কবির একমাত্র হাতিয়ার—ক্ষমতা দেয়, কিন্তু ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বদা নয়, অপরে অংশভাক্‌ও হতে পারে এ ক্ষমতার। কবি তাই প্রবেশ করেন "polity of shared power"-এ, কবিতা যেহেতু এক হিসেবে স্বগতোক্তি সেহেতু তার সংযোগও রাজনৈতিক স্লোগানের মত নয়, এ সংযোগে অনেক তল, অনেক মাত্রা। শব্দের অভিঘাত এখানে নানা জনের কাছে নানা রকম হতে পারে। কবিতার উক্তি পাঠক অর্থাৎ মানুষের উদ্দেশ্যেই, এখানে কবির

নিজ সত্তা প্রসারিত হয় অপর সত্তায়। "It redefines them in their own perceptions, in those of others and by restructuring the conceptual universes in those of others and by restructuring the conceptual universe in which they are perceived". এই intersubjectivity এ রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, অন্তর্গত রক্তের বিপন্ন বিস্ময় ক্রমে এক রাজনৈতিক চেতনার দিকে গিয়েছিল, এ চেতনা ইতিহাসচেতনা। ফ্রেডারিক জেমসন তাঁর পলিটিক্যাল আনকনশাস-এর "মর‍্যাল" দেখেছিলেন এই স্লোগানে, Always historicize। এতে অবজেক্ট ও সাবজেক্ট, বিষয় ও বিষয়ী মেলে। বস্তুর ঘটনার ঐতিহাসিক উৎস এবং ধারণা-বীক্ষার ওই বস্তুকে অনুধাবনের অনস্বীকার্য ঐতিহাসিকতা এই পলিটিক্যাল আনকনশাসে মিলে যায়। পলিটিক্যাল আনকনশাসে ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশানের যে গুরুত্ব শঙ্খ ঘোষের রাজনৈতিক মাত্রায় সেটাই লক্ষণীয়। আসলে এ এক ইতিহাস-চেতনা। ব্যক্তির সত্তা, নৈঃশব্দ, গহন গোপন অন্তরালকে ইতিহাসের চৈতন্যে তিনি বেঁধে দিতে চান। আর এই বেঁধে দেওয়া আসছে বাখতিনীয় এক ডায়ালগ থেকে। ওই ব্যক্তি ও তার চৈতন্য-অস্তিত্ব তাঁর কাছে হয়ে ওঠে the event of co-being। শুধু নৈকট্য ও সংলগ্নতা নয়, বাখতিন যাকে বলেন mutuality of difference, সেটিও শঙ্খ ঘোষের নন্দনচিন্তায় আসে—আর তাঁর বহুবাদিতা এ ডায়লেগে টাইম ও স্পেসের সঙ্গে সম্বন্ধপাতে এক অন্তহীন অর্থের সন্ধান করে। তবে তিনি স্ত্রোয়ুর-উত্তর ভাষাতত্ত্বের চিহ্নতত্ত্বে মজেন না, বরং বাক্যকেই একক ভাবেন। এর মধ্যেই চিহ্নর ভূমিকা। শব্দ ওই বাক্যর প্রসঙ্গে নতুন অর্থ পায়। তিনি জানেন, একটি উক্তি সীমান্তবর্তী ঘটনা, বাচকদের মধ্যে এটা ঘটে, অতএব সামাজিক তাৎপর্যে নিমজ্জিত। আর এই উক্তি কী বলা হল, আর কী বলা হলো না, তার সীমান্তেও স্থিত। আর এই কথিত ও অ-কথিতর যুগপত্তা, বাখতিনের ধারণায়, সবথেকে স্পষ্ট স্বরভঙ্গিতে, পুনঃকথিত ভাষামাত্র এ স্বরভঙ্গিতেই পুনরাবৃত্ত হয় না এমন সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতেই শব্দটি উচ্চারিত হয়। শঙ্খ ঘোষ শব্দ, ছন্দস্পন্দ, নিঃশব্দ, সংযোগবিন্দু সম্পর্কে যা বলেন, তাও তো অনেকটা এ-রকমই। আমরা দেখেছি, স্বরের কী গুরুত্ব তাঁর নন্দন ভাবনায়। আর এই স্বরভঙ্গিতেই অপরের উপস্থিতির আভাস থাকে, সৃষ্টি করে "a kind of portrait in sound of addressee to whom the speaker imagines he or she speaking." বাখতিন যাকে hetero-glossia বলেন, অর্থাৎ 'the situation of subject surrounded by the myriad responses.,' শঙ্খ ঘোষের নন্দনচিন্তাতেও

এই বহুসাড়া দেবার কথা থাকে, একটি কবিতায় এর মধ্যে একটি সাড়া ধরা পড়ে। শঙ্খ ঘোষ বৃহত্তর বাস্তবের সঙ্গে ও নিজের সঙ্গে অন্তহীন ডায়লগে, এক একটি সাড়াকে ধরেছেন, বহুমাত্রিক এই সংলাপে স্ব-চৈতন্যের ক্রমবিস্তারে otherness এর ধারণায় পৌছেছেন। কেন্দ্র ও যেসব কেন্দ্র নয়, তাদের এক differentialসম্পর্কের চেতনায়, এটাই বলেছেন কেন্দ্র একটি আপেক্ষিক ধারণা। দেশ ও কালের সঙ্গে কেন্দ্রবিন্দু পাল্টায়: মানব দৃষ্টির বহুতায় এই পরিবর্তন সামঞ্জস্য অর্জন করে। শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতাশ্রুত নন্দনচিন্তায় 'আমি'কে স্পেসের কেন্দ্রে দেখেন। এলিয়টের 'কবিতার তিনস্বর' প্রবন্ধের উল্লেখে শঙ্খ ঘোষ দেখান, কবির আমি কখনো কথা বলে ব্যাপক শ্রোতৃমণ্ডলের সঙ্গে, কখনও আমি কোনো নাটকীয় চরিত্র, কখনও বা কবির আমি কথা বলে কবিরই সঙ্গে। ব্যক্তিত্বের দ্বিধা বা ত্রিধা বা বহুধার কথা তিনি বলেন। আমি / আমরার সম্পর্কে বলেন: কবি সকলের সঙ্গে পথ চলবেন। সকলের চোখে চোখ রাখবেন, সকলেরই আকাঙ্খা বা দীনতার সমভাক্—"কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর কবিতা হয়ে উঠবে তাঁর ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করে তুলবার আয়োজন মাত্র, এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌছনো তার কাছে আমি থেকে আরেক আমিতে পৌছনোর মতোই তাৎপর্যময়।" অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে, অন্তস্বর চেতনায়, মুক্ত অভিজ্ঞতায়, অ-সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্র বদলে যায়, কিন্তু ওই স্পেসের কেন্দ্রে থাকে আমি: আমি থেকে আরেক আমি। এভাবেই স্থান ও কালের সঙ্গমতায় কবি বেঁধে নেন তাঁর ডায়ালগ। শঙ্খ ঘোষের এই ক্রমনির্মীয়মাণ নন্দনচিন্তা প্রবহমান থাকে, ডায়লগের নানা বাঁকে স্বরের পরিবর্তনে এক political unconscious-এর জন্ম দেয়। এর উজ্জ্বল উদাহরণ ১৯৮৭-তে প্রকাশিত 'কবিতার মুহূর্ত' নামক ১১৯ পৃষ্ঠার বইটি: ইতিহাস চেতনায়, ব্যাখ্যার নতুন কেন্দ্রে বইটি শঙ্খ ঘোষের নন্দন চিন্তার সাম্প্রতিক প্রথম সাক্ষ্য শুধু নয়: এতে তাঁর চিন্তার মূল উপাদানগুলিও পরিগৃহীত।

আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্ব শুধু যে টেক্সট এর অন্তর্গত গঠনটির বিবেচনা করে তাই নয়, পাঠকের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার অন্তর্লীন প্রক্রিয়াটিও দেখে। জোনাথন কুলের-এর মতো তাত্ত্বিক তো স্পষ্টই বলেন, "the real object of poetics is not the work itself but its intelligibility. One must attempt to explain how it is that works can be understood।" যেমন ধরা যাক এই কাব্যাংশটি:

Night is generally my time for walking
It was the best of times, it was the worst of times,

Concerning the exact year there is no need to be precise.

এর ব্যাখ্যা, অনুধাবন নানা ভাবে ঘটে। কেউ 'রাত্রি', 'সময়, 'বছর' ইত্যাদির মধ্যে একটি বিষয়গত সংযোগ দেখেন, কেউ বা মনস্তাত্ত্বিক বা বাইরের পরিস্থিতির ওপর জোর দিতে পারেন, কেউ ফর্মগত নকশাটির ওপর গুরুত্ব দিতে চান — অতীত 'ছিল', বর্তমান 'হয়', এ কীভাবে আসছে ; কেউবা ছত্রগুলির নির্দিষ্টতা-অনির্দিষ্টতা-স্ববিরোধকেই বড় করে দেখেন, ডিকেন্স-এর উপন্যাসের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি দ্বিতীয় ছত্রে কারুর চিন্তাকে বিশেষ আকর্ষণ করে। এঁরা সকলেই কবিতাটির অনুধাবনে যে সহায়তা করেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। শঙ্খ ঘোষের "কবিতার মুহূর্ত" একদিকে কবিতাকে বোধগম্য করার এই কাব্য-তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত, বিশেষ কবিতা রচনার বিশেষ বাইরের প্রণোদনটি, সামান্য উশকে দেওয়াটি তিনি তাঁর কবিজীবনের প্রথম দিকের কবিতা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কবিতা পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ২৫টি কবিতার সূত্রে দেখিয়েছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সতর্ক : এমন অনেক কবিতাই তিনি লিখেছেন, যাদের এই ধরনের বাইরের ধাক্কা ছিল না। এ আমির আবরণ বা নিঃশব্দের তর্জনীতে যে কাব্যতত্ত্বর নির্মাণ দেখি, সে কাব্য-তত্ত্বেও এই ধরনের আলোচনা আসে না। কারণ এই কাব্যতত্ত্ব কবির ভেতরের, নানা আবরণ ও মুখরতার অন্তরালে নিজের নিভৃত সত্তার আবিষ্কারের। এই আবিষ্কারটি কবিসত্তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এটা ঘটলেই তবে বহিরাশ্রয় যথার্থ কাব্যতত্ত্বে, কবিতার শরীরে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আসে, নচেৎ হয়ে যায় একমাত্রিক। শঙ্খ ঘোষের কবিচৈতন্যে বাইরের জগৎ—তার সমাজ-ইতিহাস-জীবন গোড়া থেকেই বিশিষ্ট উপাদান — যমুনাবতী কবিতাটি সেদিক থেকে তাঁর বীজকবিতা। মাঝখানের অন্তর্মুখীনতা দেখা গেল এই চৈতন্যকেই আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। 'কবিতার মুহূর্ত'টি একটি বিশেষ কাব্যতত্ত্বের বই — কবিতাগুলিকে স্পষ্টভাবে বাইরের আপাততুচ্ছ ঘটনার সূত্রে হাজির করায় যে কাব্যতত্ত্বটি গড়ে উঠেবে তা বিপ্লবী ও দ্বান্দ্বিক।

দ্বান্দ্বিক এই কারণে, বাইরের ঘটনাটির বিন্দুটিই কবিতা নয়। ওই কিছুটির ধাক্কায় কবিতাটির মুখ খোলে, কিন্তু সমগ্র কবিতাটি হয়ে ওঠে আরও গভীর ও জটিল প্রক্রিয়ায়, বলা ভাল কবির স্বভাব, কাব্যবোধ, বিদ্যা অর্থাৎ পুরো ভস্ক-বিশ্বের চাপে। শঙ্খ ঘোষ লেখেন, "কিছুদিন আগে এক তরুণ এসে বলেছিলেন, 'যমুনাবতী' কবিতাটি পড়বার পর একটা সন্ধার তাঁর মনে ঘটে, কিন্তু ওরই সঙ্গে অস্ফুটভাবে এও যেন তাঁর মনে হয় যে কোনো সত্য ইতিহাসের বিন্দুকে হয়তো-বা ছুঁয়ে আছে ওই লেখা। সে-ইতিহাস কি জানা যায় কোনোভাবে?' এই পাঠকের দিক থেকে কবিতা অনুধাবনের সাড়া একদিক থেকে 'কবিতার মুহূর্ত'

—আর সাড়া দিচ্ছেন কবি স্বয়ং। কিন্তু এই কাব্যতত্ত্বের একটি মাত্রা, কবিতার বিশেষত্ব ও বিশেষ সময়। শুধু তাই নয়, শঙ্খ ঘোষের কবিতা নির্বাচন থেকেই বোঝা যায়, এই সাড়া দেওয়া সব কবিতার ক্ষেত্রে সম্ভব নয় এভাবে। কিন্তু বহির্বাস্তবের সংযোগের ওপর এই গুরুত্বপ্রদান কাব্যতত্ত্বের একটি দিক ; এসময়ে ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বের একটি ধারায় বহির্বাস্তব, এমন কী লেখক-কবিও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠেছেন। শঙ্খ ঘোষ তাঁর কাব্যতত্ত্বে তার বাইরে থাকেন—কিন্তু এই কবিতার পিছনের এই ঘটনার উন্মাটনে বিপদও থাকে, শুধু ওই ঘটনার আলোতেই কবিতাটি দেখার প্রবণতা দেখা দিতে পারে, অথচ শিল্পের সংগঠনে, রচনার প্রক্রিয়ায় কবিতাটি ঘটনাটিকে ছাড়িয়ে বেড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষও চমৎকার বলেন, "কিন্তু সে ইতিহাস জানা কি জরুরি খুব ? প্রত্যক্ষ কোনো ঘটনার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে থাকে যে লেখা, তাকে নিয়ে এই এক সংকট। ঘটনা থেকে তার মূল সত্যটা যদি কবিতায় পৌঁছে থাকে, তবে নিছক সেই ঘটনাটুকু জানবার আর কী দরকার ? আর, মূল এবং সাধারণ সেই সত্যে যদি না-ই পৌঁছে থাকে লেখা, তবে ইতিহাসটা জেনেই-বা কী লাভ ?" অর্থাৎ বাইরের সত্য কবিতার সত্যে রূপান্তরিত না হলে কবিতার দিক থেকে তার মূল্য থাকে না। শঙ্খ ঘোষের কবিতার মুহূর্তের বৈশিষ্ট্য এই যে বাইরের ঘটনার মুহূর্তটিকেই তিনি শেষ ভাবেন না। তবে এর সঙ্গেই তিনি বলেন, "যদি এমনও হয় যে কবিতাটা ব্যর্থ, কিন্তু কবিতাটির সূত্র ধরে পুরোনো সময়কেই স্পষ্ট করে ছুঁতে চান কোনো পাঠক, সেই বা কী কম।" বস্তুত কবিতাকে এভাবেই সময় ও ইতিহাস লগ্ন করে নেন শঙ্খ ঘোষ। তাঁর ভাষায় "কবিতার অভিমান" থেকে ঘুরে চলে আসেন। এই কবিতা ও বহির্বাস্তব, শিল্প ও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটির তত্ত্বে শঙ্খ ঘোষ কবিতাকে দেখতে চান বৃহত্তর প্রক্রিয়ায়, সমাজের স্থান ও গতির সঙ্গে মিলিয়ে। কবিতার সত্য, তাঁর কবিতার মুহূর্তে, এই বৃহত্তর সত্যের অংশ, তাকে জড়িয়ে "সে-পথের অনুষঙ্গে যে কথাগুলি এসেছে এখানে, সেটাই কবিতাগুলির পরিচয় নয়, সে হলো এর সূচনাবিন্দুমাত্র"—শঙ্খ ঘোষের এই উক্তিতেই কবিতা বা শিল্পর সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কটি ধরা পড়ে। ভিত্তি ও উপরিতলের মিথস্ক্রিয়াটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—সূচনা-বিন্দুর প্রাথমিক অভিঘাতে যে কবিতার জন্ম হলো, কবিতার নিজস্ব গতি-বিকাশ বেড়ে ওঠায় সেই বিন্দুর মুহূর্তটি প্রসারিত হয়। এমন কী তার মূল অনুষঙ্গও নতুন অর্থ পেয়ে যায়। এ গ্রন্থের পঁচিশটি কবিতা ও তার সূচনা-বিন্দু ঘটনাটি মিলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যায়।

আর এই কাব্যতত্ত্বটি গড়ে ওঠে শঙ্খ ঘোষের নিজেরই বিবর্তন উত্তরণের মধ্য দিয়ে। এই উত্তরণের খবর আমরা পাই যেমন তাঁর কবিতায়, তেমনি এই

বইটির দ্বিতীয় পর্যায়ে, শেষ পঁচিশ-ছাব্বিশ পৃষ্ঠার আলোচনায়। "কবিতার মুহূর্ত আর ছোটো" জগৎকে তিনি ভাঙতে চান, ধরতে চান মহাসময়ের জটকে, আত্মবিলোপে নয়, সর্বস্বজোড়া আত্মোদ্ঘাটনে। কবিতার প্রতিস্পর্ধী দ্বিতীয় ভুবন গড়ে তোলার স্বপ্ন, অনর্গল প্রতিমাপুঞ্জের মধ্য দিয়ে পরাবাস্তবতার দিকে অগ্রসর হওয়া, ভাষাকে রিক্ত করার প্রচেষ্টা, শঙ্খ ঘোষের কাছে ১৯৮৩-তে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মনে হয়েছে। অথচ স্বপ্নকে শঙ্খ ঘোষ বাতিল করেন না। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সুস্থ জগতের স্বপ্ন তাঁকে তাই দে'লা দেয়—"কিন্তু স্বপ্নের পথে কেবলই বাধা হয়ে আসে ক্ষুধা, লাঞ্ছনা, ভয়। জীবনজোড়া এরই সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ, তাঁর কবিতাও ইতিহাসজোড়া যুদ্ধ।" ভুবনেশ্বরী একাকী থেকে মহাসৃষ্টির মুখোমুখি হবার, অবচেতন থেকে জেগে ওঠার, সব আভরণ সরিয়ে ভিতরের পৃথিবীর আবিষ্কার, শঙ্খ ঘোষের এই মহাসময়কে ধরার সঙ্গেই যুক্ত। বস্তুত এই দিককেই শঙ্খ ঘোষ ধরে রাখেন—ইতিহাস ও মনোবিদ্যার হাত ধরেই যেন তিনি পৌঁছান তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যতত্ত্বে। ভাঙতে চান পুরনো শিল্পের ধারণা, ভাষার ধারণা।

স্পষ্টই বলেন, "বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা যেখানে এসে পৌঁছতে চায়, তাতে কি শেষ পর্যন্ত কবিতারও কিছু থাকে···এই প্রশ্ন উঠে এল কারো কারো মনে। কিন্তু কবিতার কিছু থাকে কি থাকে না, তার বিচার হবে কী দিয়ে? সে তো আমাদের পুরোনো শিল্পেরই ধারণা দিয়ে? কোনো রচনা বিষয়ে যখন আমরা কোনো সিদ্ধান্ত করি, তখন আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায় সে-বিষয়ে পূর্ববাহিত কিছু কিছু চেতনা, কোনো কোনো প্রাক্-সংস্কার।" বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঠককে বাধ্য করেন সেই মান ভেঙে ফেলতে। "প্রধানত ইঙ্গ-মার্কিন আধুনিকতার বোধ থেকে জেগে উঠছিল তিরিশের যে কবিতাবিষয়ক ধারণা, সরিয়ে দিতে হয় তার চাপ"···তিরিশের কাব্যাদর্শের মূল শুধু ইঙ্গমার্কিন কি না, কেউ কেউ বৃহত্তর তত্ত্বকে গ্রহণ করেন কি না—এ প্রশ্ন এখানে জরুরি নয়। জরুরি শঙ্খ ঘোষের নিজস্ব ভাবনার অনুধাবন, পুরনো শিল্পের ধারণা ত্যাগ করার অভীপ্সা। এ অন্বেষণেই শঙ্খ ঘোষ লিখতে পারেন, "কোনো কোনো শব্দ কেমন অতর্কিতে এসে আঘাত করতে পারে কোনো পাঠকের চেতনায়, কীভাবে তাতে আবর্তিত হয়ে উঠতে পারে বাস্তব অবস্থান বিষয়ে আমাদের চারপাশের ধারণা।" শব্দের, ভাষার, এই অভিঘাত, বাস্তবের মূলে নয় থেকে কবিতার ভাষায় আসার প্রক্রিয়াটির কাব্যতত্ত্ব ছড়ানো "কবিতার মুহূর্তে"র পঁচিশটি কবিতার জন্মভূমির দিক নির্দেশে।

শঙ্খ ঘোষ স্ট্রাকচারালিস্টদের ভাষা-সচেতনাকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করেন না, কিন্তু তিনি কবিতার শেষ ভিত্তি হিসাবে বাইরের মানবিক জগতকেই দেখেন।

ভাষার প্রকৃতিই তাঁর কাছে শেষ কথা নয়, এই ভাষা যে সামগ্রিক জগৎ থেকে আসে সেটার প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন তিনি। আর এ সূত্রেই বাইরের ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও সংঘাতকে কবিতার বিকাশ ও রূপের সঙ্গেই বিবেচনা করেন, ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বিরহিত হিসাবে কবিতার আভ্যন্তরীণ রূপের কথা বলেন না। "কবিতার মুহূর্ত"-তে, কবিতাগুলির সূচনা-বিন্দু, উৎস যেভাবে দেখানো হয়েছে, তাতেই ধরা পড়ে শঙ্খ ঘোষ কবিতার ধারণার 'ঐতিহাসিক' উৎপত্তিকে স্বীকার করেন, এর বাইরের বাস্তবের তাৎপর্যও তিনি মানেন। সূচনা-বিন্দুর প্রক্রিয়াটি কবিতায় কীভাবে ছড়িয়ে গেল, তার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই শঙ্খ ঘোষ করেন না। তিনি শুধু ধরিয়ে দেন প্রাথমিক ধাক্কাটিকে, উৎসটিকে—তারপরের কাজটি পাঠকের। আর সব সমালোচককেই তো হতে হয় ভাল পাঠক। এতে কবি ও পাঠকও মেলেন। ইদানীং রলাঁ বার্ত-এর মতো তাত্ত্বিকরা যে পাঠকের কারককেও প্রায় নাকচ করতে চান, টেক্সট-এর যে কোনো অংশ থেকেই পাঠ শুরু যায় বলেন, শঙ্খ ঘোষের ধারণায় তা গ্রাহ্য নয়। আসলে শঙ্খ ঘোষ কবিতাতে ব্যক্তিগত থেকে মহাসৃষ্টির, বৃহত্তর প্রক্রিয়ার সংলগ্ন হন। আবার ওই বৃহত্তর বাস্তব থেকে শুরু করেন। এই দ্বান্দ্বিকতা তাঁর কাব্যতত্ত্বের বড় কথা। 'আর গান করব না'—সেই ভিখারীগায়ক ছেলেটির এই শিল্পহীন বাক্যটির গুঞ্জন থেকে নির্মাণ হয় 'ভিখারি ছেলের অভিমান' কবিতাটি। কিন্তু এই শিল্পহীন শিল্পের ধারণাই শঙ্খ ঘোষের কাছে পৃথক। রুশ ফর্মালিস্টদের মতো হয়তো মানেন art is a way of experiencing the artfulness of an object' কিন্তু এটা মানেন না বস্তুটি গুরুত্বহীন। বরং তাঁর কাছে ওই ভিখারী বাসযাত্রীদের মন্তব্যর আগেই অন্য মর্যাদা পেয়ে গেছে : "যেন কোনো গানের আসরেই বসে আছি আমরা, প্রিয় কোনো শিল্পীকে যেন একটির পর একটি অনুনয় ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে, একোণ থেকে ওকোণ থেকে।" যাকে বলে defamiliarisation, শঙ্খ ঘোষের কাব্যতত্ত্বে সেটি আসে এভাবে। তিনি গোটা বাস্তবকেই দেখেন নতুন দৃষ্টিতে, ফলে পরিচিতর বদলটা ঘটে বাস্তবের ক্ষেত্রেই, তারপর ওই "পরিবর্তিত বাস্তব" কবিতায় আসে। আর এ সূত্রেই তিনি পৌঁছে যান ব্রেখটের 'alienation effect' এর কাছাকাছি। 'ভিখিরি ছেলের অভিমান' ও 'ভিখিরির আবার পছন্দ' কবিতা দুটি মনে করায় ব্রেখটকে—অথচ এরা একান্তই শঙ্খ ঘোষের কবিতা, তাঁর অভিজ্ঞতার কবিতা। রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতায় যে পরিণতি ব্রেখট-এ বিষ্ণু দে দেখেছিলেন, শঙ্খ ঘোষের এ মুহূর্তের কাব্যতত্ত্বে ও কবিতায় সেটিই কি আসছে এই বাংলাদেশে ?

শঙ্খ ঘোষ, ব্রেখটের মতোই, যান্ত্রিকতার বিরোধী। তিনি জানেন, 'কবিতায়

একটা নিজস্ব আবরণ আছে।' কিন্তু য়াকবসন যাকে বলেন 'dominant' শঙ্খ ঘোষ ক্রমশ সে বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, তার প্রমাণ—'কবিতার মুহূর্ত।' ঐ সূচনাবিন্দুর ধাক্কাটা কবিতায় প্রসারিত, বিস্তৃত, অন্য উপাদানের সংযোগে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ওটাই থাকে dominant বা 'the focusing component a of work of art : it rules, determines and transforms the remaining components'।—কবিতার সামগ্রিক কাঠামোটি এই বিন্দুতেই সংহতি পায়, কেন্দ্রাশ্রিত হয়ে ওঠে। 'যমুনাবতী' কবিতাটিতে ১৯৫১-র কোচবিহারে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর খবর ও আরেক সকালবেলায় জানলার নীচের গলিতে দোকানির আঁচ তোলা—এক মাসের তফাতের দুটি ঘটনার ধাক্কা। দুলে ওঠে কয়েকটি শব্দ "নিভন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে।" 'ডমিন্যান্ট' ওই নিহত কিশোরী ও তার মা—গলির চিত্রটা নয়। কিন্তু গলির চিত্র ও কবির ছোটবোনের ছড়া আওড়ানো, মায়ের খাবারের জন্য ডাক ওই ডমিন্যান্ট-এর সঙ্গে মিশে গেল। যমুনাবতীর আবহমান লৌকিক ছড়াটি নতুন মুক্তি পেল আধুনিক এক মানবিক প্রতিবাদী কবিতায়। প্রথম দুই ছত্রের লৌকিক ছন্দের দোলাতেই এক লোক-সাহিত্যের যুগান্তরের স্মৃতির সাযুহিক টান—দু পৃষ্ঠার এক কবিতা প্রায় মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি পেল—হয়ে উঠল এক মহাকবিতা ওই 'ডমিন্যান্টের' ঐক্যে। এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখতে হয়, এই' ডমিন্যান্ট' আসে শিল্প-সাহিত্যে বহিরাগত বাস্তব থেকে। একই বিশেষ সময়ের কাব্যতত্ত্বকে য়াকবসন একটি বিশেষ ডমিন্যান্ট-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখেন। যেমন ইউরোপে রেনেসাঁস কবিতা ভিস্যুয়াল শিল্প থেকে ডমিন্যান্টকে পায়, রোমান্টিকরা পায় সঙ্গীতে আর বাস্তববাদীদের ডমিন্যান্ট ভর্বল শিল্প। এই যুগভিত্তিক বৈশিষ্ট্য কতটা গ্রহণীয় জানি না, তবে ব্যক্তি-কবির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো কবির বিবর্তনের ও উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ ডমিন্যান্ট বড় হয়ে ওঠে। কবিতার মুহূর্তে ভর্বল-ই আসছে এভাবে। শুধু যমুনাবতী নয়, একাধিক কবিতাতেই শুধু বাইরের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে নয়, বাইরের শব্দ, বাক্য কবিতাকে দুলিয়ে দিয়েছে। শঙ্খ ঘোষ স্পষ্টই দেখেন, "দু চারটে শব্দ এদিক ওদিক করে নিলে তো সংবাদই মূলত ছন্দ হয়ে ওঠে, ছন্দে ছন্দে জাগতে থাকে কত চমকপ্রদ সহাবস্থান।' ঠিক এরকমই বলেছিলেন বিষ্ণু দে—সংবাদ মূলত কাব্য। কদম বলে "এরকম তো কতবার হলো।"* "ফিরে আসছি যখন, কদমের ওই মুখচ্ছবি যা বলতে পারত, তাঁর ধ্বনিগুলি যেন পৌঁছতে থাকে কানে। ঘোষ এখানে শুধু ভর্বল নয়, ভিস্যুয়ালও বটে : মুখচ্ছবির ধ্বনি। "পাশে এক যাত্রী বলেন : সত্যি, লজ্জা হয় এদের দেখলে!" 'লজ্জা' এই মুখের শব্দটি ধাক্কা দেয়

—কবিতা শুরু হয় 'বাবুদের লজ্জা হলো।' 'আর গান করব না'—এই অসহায় প্রতিবাদের বাক্যটিই কবিতা হলো : 'গাব না আর গান এবার / গাব না আর গান।' শঙ্খ ঘোষের কবিতায় এই ডমিন্যান্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; তাঁর কাব্য-তত্ত্বের বিশেষ উপাদান।

শঙ্খ ঘোষ কোনো সময়েই সব আবরণের শেষে কবিসত্তাটির নগ্ন শরীরটিকে ভোলেন না, ভোলেন না কবিতার ভাষাগত কাঠামোটিকে। সেইজন্যই তাঁর কাছে 'পুনর্জন্ম হতে থাকে যেন সেই শব্দগুলির।' কিন্তু কবিতার মুহূর্তে শঙ্খ ঘোষ জানেন ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না তার বাস্তব-মূল থেকে, তার আইডিয়লজি থেকে। আর এ-কারণেই ভাষা একটি সামাজিক ঘটনা। কবিতা সমাজ-অর্থনীতির কেবল প্রতিফলন নয় তাঁর কাছে, কবিতা পুনর্জন্ম, কবিতা ও তার ভাষাই এখানে বস্তু, বাস্তব। কবিতার মুহূর্ত-জুড়ে শব্দের যে সক্রিয়, গতিময়, সামাজিক 'sign' হিসাবে ক্ষমতার কথা ছড়ানো, তাতে বোঝা যায় শঙ্খ ঘোষ শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও অনুষঙ্গ সম্পর্কে সচেতন। শুধু তাই নয়, কদম বা ভিখারীর অভিজ্ঞতা-নিঃসৃত শব্দাবলী আত্মসচেতন, ভিন্ন শ্রেণীর কবির চৈতন্যে অন্য ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে—অসহায় উক্তি প্রতিবাদের হয়ে ওঠে। সে-কারণেই শুদ্ধর পন্থীদের সঙ্গে শঙ্খ ঘোষ মিলতে পারবেন না। তাঁর কাছে ভাষা মৃত নয়। মৌখিক, বাস্তব পরিবেশ-প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিষ্ক্রিয় অনুধাবনের ভাষার সন্ধান শঙ্খ ঘোষ করেন না। তাঁর কাছে হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে মনে হয় 'verbal signs are the arena of continuous class struggle।' শাসকশ্রেণী শব্দের অর্থকে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ করে দেয়, করে তোলে 'uniaccentual', শঙ্খ ঘোষের দ্বান্দ্বিক কাব্যতত্ত্বে এই বদ্ধতাই কাটে, তিনি শব্দে পান 'multi-accentuality।' সে-কারণেই প্রচলিত 'বিপ্লবী কবিতার' শ্রেণীস্বার্থ বা শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিফলন শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় করেন না, বরঞ্চ দেখান ভাষা কীভাবে কর্তৃত্বকে আঘাত করে, বিকল্প স্বরকে নিয়ে আসে, যা আসলে বিপ্লবেরই প্রস্তুতি। যেমন"ভিখিরির আবার পছন্দ" কবিতাটি সম্পর্কে সনজীদা খাতুন লেখেন, "কবিতার বক্তব্যে কোন প্রতিবাদের কথা আসেনি। কিন্তু ধ্বনি-ব্যবহার বৈশিষ্ট্যে, চাপা ক্ষোভ থেকে শেষ পর্যন্ত সমশক্তির দৃপ্ত প্রকাশে বাস্তব অবস্থার প্রতি উপেক্ষা ধ্বনিত হল" (ধ্বনি থেকে কবিতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৪৬-৪৭)। 'কবিতার মুহূর্ত' এই বিকল্প স্বরেরই কাব্যতত্ত্ব —যে কাব্যতত্ত্বে বোঝা যায়, "দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনো", যে কাব্যতত্ত্বে অভিজ্ঞতা তিমিরবরণ সিংহ, নারকেল ডাঙার মাসীমা ও তাঁর ছেলে, কিংবা দেশমনস্ক দীপ্ত এক তরুণী। কবিতার মুহূর্তের কাব্যতত্ত্ব, বিপ্লবের কাব্যতত্ত্ব—যার পেছনে আছে 'রবীন্দ্রনাটক ও কালের

মাত্রা' থেকে নির্মাণ ও সৃষ্টির দীর্ঘ ইতিহাস, আছে এক কবির নিজেকে উত্তরণের যন্ত্রণায়, সাহসের অভিযান। আর আছে মুখের কথার, ভর্বল-এর জনস্রোতস্বিনীর অবগাহন-স্নানে কবিতার, কাব্যতত্ত্বের বেঁচে ওঠার আহ্বান। আর এই আহ্বানেই বেজে উঠবে এক রুচির সমগ্রতার ধ্বনি : কবিতার শরীর চৈতন্য, সামাজিক স্বপ্ন, তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ বিস্তার ও নিভৃত শুদ্ধতা শেষ পর্যন্ত পরিপূরক, এক বহুত্ববাদী আকাশে ডানা মেলে। নানা মুহূর্তের খণ্ডতাকে এক মহাকাব্যিক আধারে ধারণ করার এই নন্দনতত্ত্বই শঙ্খ ঘোষের কবিতার জীবন যাপনের লক্ষ্য ও লড়াই।

তবে কবিতার মুহূর্তর নন্দনতত্ত্বের রাজনৈতিক মাত্রায় মনে হতে পারে, কবিতা, তার ভাষা, তার উৎস বুঝি শুধু বাইরের জগৎ, বাস্তবস্তু। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের সমগ্র কবি-জীবন ও তার গদ্যবিস্তারে এটা সত্য নয়। প্রাত্যহিকের দিনগুলি রাতগুলিকে তিনি উপেক্ষা করেন না ঠিকই, কিন্তু এটাও জানেন ভাষা শুধু বহির্জগতের প্রতিফলন নয়, মুখের ভাষাই কবিতা নয় — উচ্চারণ-উক্তি এক বিশেষ নির্মাণে অর্থ পায়। তাঁরও কি মনে হয় অর্থ এক originary difference-এর ফল। একই সঙ্গে পৃথক, আলাদা নির্মাণ, অন্যদিকে স্থগিত রাখে অর্থাৎ বস্তুর কালিক ও স্থানিক অস্তিত্বের ওপারে যায় এই অর্থ। আর একারণেই লেখা, শঙ্খ ঘোষের কবিতা-গদ্য, উক্তি থেকে গুরুত্বপূর্ণ : উচ্চারণকারী বিষয়ী ও বস্তু বা রেফারেন্স দুইই উহ্য থাকে এখানে। আর এর পাঠে তাই প্রয়োজন হয় বিনির্মাণের। ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত 'লাইনেই ছিলাম বাবা' কবিতার বইটিতে তাই আসে এক উল্টো প্রক্রিয়া। পোস্টমডার্নে শঙ্খ ঘোষের আস্থা আছে কিনা জানি না, কিন্তু এই কবিতার বইটি যেন এখানকার বাস্তবে দাঁড়িয়ে এখানকার এক পোস্ট-মডার্ন টেক্সট্। এই কাব্যর রাজনীতি ও নৈতিকতা সেটাই শেখায়। এ কবিতাগুলোতে পাওয়ার বা ক্ষমতা সম্পর্কেই ঘৃণা ও ব্যঙ্গ স্পষ্ট। কোন ক্ষমতাকেই বিশ্বাস করা যায় না, কে সেটি নিয়ন্ত্রণ করছে সেটা বড় নয়। আর ব্যক্তিও তার শুভাশুভ বুঝতে, আনতে অপারগ। এক ভ্রান্ত representation-এ সে আক্রান্ত। সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত, ক্ষমতাহীন। একারণেই তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে : এক বিনির্মাণের মধ্য দিয়েই শঙ্খ ঘোষ সাধারণের অসহায়ত্ব দেখান। সাম্প্রতিকতম কবিতায় স্বাধীনতার কথা, মুক্তির কথা শঙ্খ ঘোষ বলেন না। ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ, নৈতিকতা ও ক্ষমতার একাসনে বসা সম্পর্কে হতাশা, কোনো মূল্যবোধ বা নীতিশাস্ত্রর এ সময়ে প্রায় অসম্ভাব্যতা, যে কোনো স্বাধীনতা সম্পর্কে হিমশীতল ভবিষ্যৎহীনতা—এ বাস্তবের এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই লাইনে ছিলাম বাবার ধরা দেয়। "তুমিই আবর্ত; তুমি পিণ্ড, তুমি চমৎকার চিতা—" এই শ্লোকে

আমি / আমরার ভয়ঙ্কর মানসক্রিয়া ও বাস্তব উপস্থিত। বিষয়ী প্রায় বাতিল হয়ে যায়, আর বিষয় আসে এক বিনির্মাণের ব্যঙ্গে। 'চাবি তো আমারই, আমি যতটুকু চাই ততদূর / সহজেই যেতে পারো—এই স্বাধীনতা—সে তো আছে।" বড়শি-বদ্ধ এই স্বাধীনতা, সুতো ধরে বসে একজন। "চরিত্রই নেই যার তার আবার ধর্ষণ কোথায়" কিংবা "আগুনই কোথাও নেই—কী হবে-বা জ্বালানির খোঁজে"। এ ধরনের প্রবাদ-সদৃশ উচ্চারণে শঙ্খ ঘোষ বাস্তবের বিনির্মাণ করেন। "আমি" এ কবিতাবলীতে কখনও সাধারণ ক্ষমতাহীন, কখনও ক্ষমতাবান। সোহম্-এর মতো সুকুমার রায়-স্মৃতিবাহী কবিতায় বা 'গানের মতো'য় এক প্রায় একনায়কতন্ত্র রাজনীতিরই ব্যঙ্গ তীব্র হয়ে আসে।

"আমার কাছে না এলে আমার কথা না শুনলে আজ
আমি তো বুঝিনা তুমি কীভাবে-বা হবে জনগণ।"

"আমি যখন মারছি তোমায়
বুঝতে হবে সেসব সময়
মরছ কেবল নিজের নিজের বোমায়

গোটা মগজ আমায় দিয়ো
তবেই হবে দেশপ্রিয়
দেশও হবে অবিস্মরণীয়—"

কিংবা রামপ্রসাদী স্মৃতি জাগিয়ে দেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর শ্যামা ও ইচ্ছাময়ী দুটি কবিতার নতুন নির্মাণে। পূর্বেকার চিন্তা-বিশ্বাস-মূল্যবোধগুলি এর অনুষঙ্গে যা ছিল তা উল্টে যায়। আবার 'তর্পণ' হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক উক্তি : নারীর উক্তি, অথচ শাস্ত্রমতে তর্পণের অধিকার পুরুষের। বুলেট শব্দটি বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। "পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ"—এ এক ভয়ঙ্কর উদ্ঘাটন। ক্ষমতা সম্পর্কে সীমাহীন ঘৃণা। আর 'অধিকার' কবিতাটি ব্যঙ্গ, মর্মান্তিক আত্মউপলব্ধি, সেই 'তোমার' সম্পর্কে সত্য বলা : আজকের রাজনৈতিক ভয়াবহতায় কতটুকু অধিকার সাধারণের, "অধিকার আছে তোমার রাতুল দুপায়ে আমার গলে-যাওয়া শিরদাঁড়া ছুঁড়ে ফেলবার।" বারবার 'অধিকার' শব্দটির উচ্চারণ কবিতাটির ওপরের অর্থ পেরিয়ে এক জ্বালা এক ক্রোধ নিয়ে আসে। কিন্তু এর মধ্যেও শঙ্খ ঘোষ জীবনকে অস্বীকার করতে পারেন না। পোস্ট-মডার্নের সঙ্গে এখানেই তাঁর পৃথকত্ব। তিনি ওই অসহায় অন্ধকারকে স্বীকার করেও প্রশ্ন করতে পারেন : "দেখেনি কি সমস্ত

ভারত আজ রক্তকরবীর ফুলে ভরে দেয় মালা বা পুনম ?" বলেন, "যে-জল তোমার চোখে ছিল না কখনো আমি সেই জল ভরে রাখি ঘটে।" ক্রিয়া ইচ্ছাধীন বিশেষণে অর্থ হারালেও, বিশেষ্য কোথাও নেই জেনেও, সর্বনামে ক্রিয়া-কর্মহীন অন্ধকার কেঁপে উঠলেও শঙ্খ ঘোষ স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্নের ভারতবর্ষের কথা বলেন। তাঁর বিনির্মাণ আসলে নতুন নির্মাণ—এই নির্মাণের সৃষ্টিতেই, আমির আবরণ উন্মোচনে শঙ্খ ঘোষের কবিতা, কবিতার তত্ত্ব আকাশমুখী হয়ে ওঠে।

সুমিতা চক্রবর্তী

...

কবিতার ছন্দ : ভাবনায় ও নির্মাণে শঙ্খ ঘোষ

বাংলা ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাস দীর্ঘ। কোথাও কোথাও কবিতার উপলব্ধির আধার রূপে বিশিষ্ট ছন্দটি কবির কলমে গড়ে ওঠে আপনা থেকেই। ছন্দের কারিগরি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন থেকে কবিতার অবয়ব-নির্মাণের উদাহরণও আমরা পেয়ে যাই অনেক। বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধিকালের ভারতচন্দ্রের রচনায় যে-সব নিদর্শন পাই তার অনেকগুলিই যান্ত্রিকভাবে সংস্কৃত ছন্দের লঘুগুরু স্বর বিন্যাসের সাহায্যে বহিরঙ্গ বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা। আবার অনেক সময়ে কবিতার ছন্দ হয়ে ওঠে ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাব্য-প্রসঙ্গের যথার্থ প্রকরণটি প্রতিষ্ঠা করবারই সাধনা—প্রকৃত ছান্দসিকের প্রতিভার সৃজন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন, হেমচন্দ্র — ছন্দ-সচেতন ছিলেন সকলেই। কিন্তু তাঁদের ছন্দ-সম্পর্কিত ভাবনাকে তাঁরা প্রবন্ধের আকারে রূপ দেননি। সে-কারণে বাংলা ছন্দের বিবর্তনে তাঁদের দান গুরুত্বপূর্ণ হলেও সাধারণভাবে ছন্দ বিষয়টি সম্পর্কে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হবে—এমন কোনো প্রবন্ধ তাঁদের লেখায় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তাঁরা ছন্দোবিদ্ হলেও ছন্দশাস্ত্রবিদ্ নন। ছন্দ নির্মাণই কবির কাজ, ছন্দশাস্ত্র রচনার কাজ কবি করতেও পারেন—না-ও পারেন। সে তাঁদের ইচ্ছাধীন।

কবি-ছন্দাশাস্ত্রীর অবশ্য অভাব নেই বাংলা সাহিত্যে। আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আছেন মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার রায়। তিরিশের কবিদের অনেকেই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন ছন্দ বিষয়ে। অমিয় চক্রবর্তী এবং বুদ্ধদেব বসু স্বতন্ত্র গ্রন্থ না লিখলেও তাঁদের একাধিক পুস্তক-সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা-সূত্রে লিখিত পত্র-প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের চমৎকার বিজ্ঞানমনস্ক আলোচনা আছে। তাঁরা নিজেরা কবি ছিলেন বলে রবীন্দ্রোত্তর কালে বাংলা ছন্দে যে নানা ধরনের বিচিত্র সুরের ও স্পন্দের সমাহার ঘটছিল—কবির শ্রুতি-সূক্ষ্মতায় সেগুলিও তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন সুন্দরভাবে।

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আমরা একদিকে পেয়েছি বিদগ্ধ, গবেষক ছন্দ-শাস্ত্রীদের। তাঁরা ছন্দ বিষয়টিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখে, বিশ্লেষণ করে, তার সূক্ষ্ম কিন্তু সুনির্দিষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করে বিষয়টিকে একটি তত্ত্বগত স্বচ্ছতা

দিয়েছেন। অন্যদিকে আমরা পেয়েছি বেশ কয়েকজন কবিকে। নিয়মের খুঁটিনাটি ও পরিভাষার সমস্যা ইত্যাদির মধ্যে ততটা না গিয়ে আধুনিক কালের একজন কবির কাব্যসৃষ্টির প্রত্যক্ষতার মধ্যে থেকে ছন্দ বিষয়টিকে আত্মস্থ করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। নিজেদের সৃষ্টিকর্মের বাঁকে বাঁকে ছন্দ নিয়ে, ছন্দের পরম্পরাগত নিয়মাদি এবং শ্রুতিগত আভ্যাসিক প্রত্যাশার কম-বেশি বিপর্যয় নিয়ে তাঁরা অনেক ভিতর থেকে ভেবেছেন। ভিতর থেকে—কারণ, সে ভাবনা জড়িয়ে আছে তাঁদের শিল্প নির্মাণের সঙ্গে। অনেক সময়েই তাঁরা কোনো বিধান দেননি, নির্দেশ করেননি সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম। তাঁরা কেবল প্রশ্ন তুলেছেন, কোনো কোনো নতুন দিক নিয়ে ভেবেছেন। ছন্দের কোনো কোনো চলন যখন দেখা যাচ্ছে কবিদের রচনায়, অথচ ছন্দশাস্ত্রীর নিয়মমতে যখন তাকে ঠিকঠাক কোনো জায়গা নির্দেশ করে দেওয়া যাচ্ছে না – তখন সেই চলনের কারণ, শ্রুতিরূপ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে, অথবা যৌক্তিকতা নিয়েও তাঁরা ভেবেছেন। বাংলা কবিতায় সত্যিই কবি ছান্দসিকদের একটু স্বতন্ত্র স্থানই আছে। ছন্দশাস্ত্রবিদদের প্রধান ঝোঁক থাকে নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করবার দিকে, আর কবি-ছান্দসিকের মনের টান আপাত ব্যতিক্রমকে বোঝবার ও বোঝাবার দিকে। শাস্ত্রবিদ খোঁজেন পদ্ধতি, কবি খোঁজেন সম্ভাবনা।

কবির অনুভব-কোণের আছে আরো একটি মাত্রা। যিনি কবিতার স্রষ্টা তাঁর উপলব্ধিতে কবিতার প্রারম্ভিক উৎসারণ মুহূর্তটি এবং প্রকাশের ভাষা কাঠামোটি চলে আসে অঙ্গাঙ্গিভাবে। কবিতার ক্ষেত্রে কবিতার ছন্দ-নকশা— তা গদ্যরীতিই হোক বা মুক্ত ছন্দ, মিশ্র ছন্দ, নিরূপিত ছন্দ, যা-ই হোক—তা-ও চলে আসবে ঐ উৎসক্ষণেই। এক ছন্দে একটি কবিতা প্রথমে লেখার পর কবি ভিন্ন ছন্দে আবার সেই কবিতাকে ঢেলেছেন—এমন উদাহরণ যদিও বিশ্ব-সাহিত্যে একেবারে দুর্লভ নয়—তবু তার উদাহরণ খুবই কম।

একটি ছন্দের নির্দিষ্ট বিন্যাসে একটি কবিতা লিখতে লিখতে কখনো কখনো কবির কলমে এমন কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি চলে আসে – পর্ব-সমতার ঘর-কাটা ছকের মধ্যে যাকে ফেলা যায় না। একজন কবি ইচ্ছে করলে সেই পঙ্‌ক্তিটিকে একটু এদিক-ওদিক করে, দু'একটি শব্দের বদল বা স্থান-পরিবর্তন ঘটিয়ে পঙ্‌ক্তিটিকে কবিতার সামগ্রিক ছন্দের ছকের মধ্যে ফেলে দিতে পারেন সহজেই। অনেক পঙ্‌ক্তির বেলায় তিনি তা করেনও। কিন্তু কোনো কোনো পঙ্‌ক্তির বেলায় তাঁর মন চায় না তেমন ভাবে তাল মিলিয়ে দিতে। তাঁর মনে হয়—ঐ একটুখানি ঢেউ তোলা, একটু ঘা দেওয়া পঙ্‌ক্তির তালছুট্‌, তালের ছন্দেই ঠিকমতো ধরানো গেল তাঁর অনুভূতির রূপ। ছন্দশাস্ত্রবিদ্ তাকে বলতে পারেন 'ত্রুটি' অথবা যদি তিনি উদার হন তাহলে ব্যবহার করতে পারেন দু-কূল

বাঁচানো সমালোচনার ভাষা—'ব্যতিক্রম'। কিন্তু কবি জানেন—তাঁর ঐ ঈষৎ অন্যরকম পঙ্‌ক্তি হঠাৎ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যতিক্রমও নয়। কবির চিত্ততলে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের যে অপৃথক যত্নের স্বতঃস্ফূর্ত দাবি—তারই চাপে ঐ পঙ্‌ক্তিটির ঈষৎ ভিন্নতাময় রূপ। কবি যে-কথা বলতে চান, তার ভাবের যাথার্থ্যের কারণেই একবার একটু ঝোঁক পড়া একটি ভিন্ন সিলেব্‌ল্‌-এ—এই মাত্র।

ক্রমে ছন্দশাস্ত্রবিদকেও মানতে হয়—এরকম একটু এদিক ওদিক করে কখনো কখনো ছন্দ-বিন্যাস করলে তেমন কোনো ক্ষতি নেই। ঘরকাটা ছকের দাগগুলি কোথাও সামান্য সরিয়ে বসালেই মূল ছন্দের ভিত্তি-কাঠামোটি ভেঙে পড়ে না। বরং কোথাও চলে আসে কথ্য চাল বা বাক্‌স্পন্দের স্বাভাবিকতা; কোথাও কবির অভিপ্রেত স্বরটিতে লাগে একটুখানি ঝঙ্কার, কবির কথাটি ঠিকমতো বাজে পাঠকের মনে। পরমুহূর্তেই তা ফিরে আসে কবিতাটির নিরূপিত ছন্দের প্যাটার্নে। এই ধরনের প্রয়োগকে ব্যতিক্রম না বলে বলা যায় নিয়মেরই সম্প্রসারণ। বরং অনেক সময়ে ধাপে ধাপে ছন্দে তাল মেলাবার জন্যই উচ্চারণে নিয়ে আসতে হয় ঈষৎ অস্বাভাবিকতা। স্বাভাবিক উচ্চারণের টানে—অনেক সময়ে দৃশ্য ছন্দোলিপিতে যাকে দেখায় ব্যতিক্রম—সেটিই আসলে বাক্‌স্পন্দের সঙ্গত উচ্চারণ।

কবিতা যখন থেকে লেখা হয়েছে তখন থেকেই কবিরা এইসব সৃজনসম্ভব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। আর, যখনই হয়েছেন তখনই কবিরা মান্য করেছেন নিজেদের শিল্প-সৌষম্যবোধের ব্যক্তিগত নির্দেশ। প্রায় কখনই ফিরে তাকাননি প্রতিষ্ঠিত রীতির প্রশ্নহীন অনুসরণের পথের দিকে। শঙ্খ ঘোষ একটি চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রকে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের অভিমত—"যদি ভারতচন্দ্রের পয়ার-প্রবাহে অকস্মাৎ এমন শ্লোক চলে আসে 'কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে / নখে নখ বাজায়ে নারদমুনি হাসে' তখন তার এই ৭+৭ বিভাগের ব্যতিক্রমকে কি ছন্দ পরিমাপের দিক থেকে স্খলনই বলব, নাকি বলব পরিমিতিলঙ্ঘী ব্যক্তিগত ছন্দের টান? হঠাৎ সাতের তালে নাচিয়ে না দিলে নারদমুনির নখ-বাজানো আমরা শুনতে পেতাম কিনা সন্দেহ এবং সেইটে মনে রাখলে একে কেবল কবির খামখেয়াল অথবা অন্যমনস্কতা ভেবে স্থির থাকা অসমীচীন হয়।" (প্রবন্ধ: 'ছন্দ: নিরূপিত ও ব্যক্তিগত', নিঃশব্দের তর্জনী, প্যাপিরাস, সংস্করণ ১৩৯০, পৃ. ৩৬)

চৌদ্দ মাত্রার পয়ার-কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেও তার ধ্বনিস্পন্দে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন মধুসূদন তা তাঁর অসামান্য ছন্দ জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। ভাবানুসারে যতিপাত ঘটিয়ে তিনিও, তৎসম শব্দাবলীর কিছু আড়ম্বর সত্ত্বেও

স্বাভাবিক বাকস্পন্দের সমান্তরাল বাণীই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

কবিদের এই স্বাধীন বিচরণের আরো নিদর্শন পাওয়া যায় উনিশ শতকের বাংলা কবিতা থেকে। রঙ্গলাল তাঁর 'কর্মদেবী' কাব্যে বাংলা ছন্দের আবহমান স্তবক-বন্ধ এবং পর্ব-সন্নিবেশ-বিধি ভেঙে লিখেছিলেন—

নন সাধু সামান্য মানুষ ভাই! ১২
শাপভ্রষ্ট জনমিলা কাম। ১০
কিছুদিন করি খেলা চলি গেলা নিজস্থান ৮+৮
যথাযোগ্যধাম। ৬

মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দকে এই রীতিতে সাজিয়েই সৃষ্ট হয়েছিল বহু আলোচিত 'বলাকার ছন্দ' বা রাবীন্দ্রিক মুক্তক। 'মানসী'-র (১৮৯০) 'নিষ্ফল কামনা' থেকেও যদি তার সূত্রপাত ধরি—'কর্মদেবী'-র প্রকাশকাল ১৮৬১, রবীন্দ্রনাথের যে-বছর জন্ম হল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে' সঙ্গতভাবেই চমকিত করেছিল কবিতা রসিকদের—তার মিশ্রকলাবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের যাথার্থ্যে। কিন্তু ১৮৬৮-তে প্রকাশিত 'নলিনী বসন্ত' কবিতা-আলেখ্যটিতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহজেই লিখেছিলেন 'কিভাবে গুজরাট-পতি সঙ্গীগণ সহ / করিছে সময়ক্ষেপ'? এরকম প্রয়োগ আরো অনেকবারই আছে তাঁর। অর্থাৎ এই কথাটাই প্রমাণ হয় বারবার—ছন্দ-কাঠামো অবশ্যই আছে, মোটের উপর কবিরা সেটি মান্যও করেন কিন্তু মাঝে মাঝেই সেই সন্নিবেশের একান্ত নিরূপিত তালটিকে তাঁরা একটু নাড়িয়ে দেন। সেই তরঙ্গায়িত ধ্বনির উৎসার কবিতারই প্রয়োজনে, কবির উপলব্ধির সমান্তরাল সুরের দাবিতে।

শঙ্খ ঘোষ বহুদিন ধরে বাংলা ছন্দের রূপ ও বৈচিত্র্য, নিয়ম ও প্রবহমানতা সম্পর্কে ভেবেছেন। আর, যখনই ভেবেছেন তখনই বাংলা ছন্দের নিয়মের এই একটু 'শৈল্পিক অনিয়মের' বিষয়টি তাঁর মনকে অধিকার করেছে। বারবার তাঁর মনে হয়েছে, নিয়মের বন্ধনকে ভাঙা নয়—কিন্তু বাঁধনের কঠিন কষিগুলিকে একটু কোথাও কোথাও আলগা করে নিলে, কয়া অল্প করে খুলে নিলে কয়েকটি গ্রন্থি—ছন্দে এক সজীব, স্বাভাবিক ও স্বতন্ত্র স্পন্দের সৃষ্টি হয়। তাঁর মনে হয়েছে—আধুনিক কবিরা এক বহতা বাকছন্দকেই ধরতে চান তাঁদের রচনায়—অতিনিরূপিত উচ্চারণের আবিষ্টতা মাঝে মাঝে ভেঙে ফেলার সচেতন অভিলাষ নিয়েই। এই দিকটিকে প্রধান করে এগিয়েছে তাঁর ছন্দভাবনা। নিজের কবিতার ছন্দের গড়নেও তাঁর এই ভাবনার চমৎকার রূপাবয়ব দেখতে পাওয়া যায়। এই দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েই আমরা শঙ্খ ঘোষের ছন্দ ভাবনা ও ছন্দ নির্মাণ অনুসরণ করব।

তবু তার আগে, বাহুল্য হলেও, একথাটি একটু বলে নেওয়া যায় যে বাংলা ছন্দের ত্রিধারায় প্রচল গড়নেও অসম্ভব মসৃণ শব্দ বোধের কবিতা। 'নৈয়মিক ব্যতিক্রম'-কে যিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, নিয়মের সু-শৃঙ্খলা যে সম্পূর্ণই তাঁর করায়ত্ত—একথাটি অনুভব করতে কারোরই অসুবিধে নেই। সেই শৃঙ্খলার দিকটারও কিছু পরিচয় এখানে রইল।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দের স্থান বাংলা কবিতার একেবারে জন্মলগ্ন থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। মধ্যযুগীয় পয়ার থেকেই বাংলা ছন্দের প্রথম সচেতন আধুনিক আকার বেরিয়ে এসেছিল। অমিত্রাক্ষরের গম্ভীর অথচ গীতল ভাবতরঙ্গধ্বনি পেয়েছি এই মন্দ্রস্বরা ছন্দটিতেই। অমিত্রাক্ষরের চরণান্তর প্রবাহিত মুক্তগতিতে অন্ত্যমিল ধ্বনির অতিরিক্ত শ্রুতিসাম্য এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রবহমান পয়ার বাংলা কবিতার অন্যতম লাবণ্যময় একটি আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। মধুসূদনীয় উদ্দামতায় রাবীন্দ্রিক সৌষম্যবোধের মিলন-জনিত এক মধুর দীপ্ত রূপসৃষ্টি। এই মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই বিন্যস্ত হয়েছে রাবীন্দ্রিক মুক্তকের উচ্চাবচ তরঙ্গাভিঘাত, এই ছন্দের আধারেই জীবনানন্দের বিষাদ-মন্থর অনুভূতি ও অতল জীবনোপলব্ধির সংহত উচ্চারণ। আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কোনোদিনই গদ্যরীতিতে না লিখেও 'সংবর্ত' (১৯৫৩) কবিতা-গ্রন্থের ভূমিকায় যখন জানিয়েছিলেন—"বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই,..." তখন সেই নির্বিরোধের সম্ভাব্য কাব্যরূপ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মিশ্রবৃত্তেরই ছন্দোরীতি। বাংলা ভাষার কথ্য চাল ও বাক্‌স্পন্দকে চমৎকার মিশিয়েছিলেন তার সঙ্গে। 'জেসন' কবিতার উদাহরণ নেওয়া যায়—

> বহু কষ্টে শিখেছি সাঁতার
> অন্তত স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া শক্ত নয় আর
> নদীতেও নানা বাঁক আছে ;
> সেগুলোর কোনওটাতে ঠেকে গিয়ে বাঁচে
> এমন লোকেও যারা সাঁতারের স-টুকু জানে না

রবীন্দ্রনাথ কি কবিতায় বাক্‌স্পন্দ নিয়ে আসবার কথা ভেবেছিলেন খুব বেশি? 'যেতে নাহি দিব' এবং 'দুই বিঘা জমি' বা 'দেবতার গ্রাস' জাতীয় বিবৃতি প্রধান কবিতার সংলাপ অংশে কখনো কখনো কথ্যভঙ্গি নিয়ে এলেও কবিতাটির অনুভবের সামগ্রিক বয়নে কথ্যভঙ্গির যাথার্থ্য সম্পর্কে তাঁর তেমন কোনো ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না। উপলব্ধির গাঢ়তা প্রকাশের জন্য নয়; গভীরভাবের কবিতায় সরস-তির্যক একটি প্রান্তিক রস সঞ্চারের জন্যই-তাঁর কলমে ঐ কথ্যচালের ধ্বনি-ভঙ্গিমা। ইচ্ছেমতোই তিনি সংলাপ অংশেও

কথ্যচাল বর্জন করে একান্ত কাব্যিক ভঙ্গি নিয়ে এসেছেন। 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কেষ্টা তখন খাঁটি কাব্যিক ভঙ্গিতে বলেছে—'দেশে যাবে ফিরে মা ঠাকুরানিরে দেখিতে পাইবে পুন'। বস্তুতই ভাবঘন উপলব্ধির প্রকাশের ভাষা কাব্যময় করে তোলাতেই রবীন্দ্রনাথের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল বেশি। তাঁর গদ্য-কবিতাতেও 'পদ্যের রঙ ধরানো' বাগ্‌রীতির বাহুল্য সকলেই লক্ষ করেছেন।

কবিতার নিরূপিত ছন্দ সমতার অভ্যস্ত প্রবাহ ভেঙে কথা বলবার স্বাভাবিক ধরনের সুরটি সঞ্চারিত করবার সচেতনতা এবং অভিলাষ সুস্পষ্টভাবে দেখা দিল রবীন্দ্র-উত্তরকালের কবিদের মধ্যে। পশ্চিমী কবিতার উদাহরণ থেকেই যে তাঁরা প্রেরণা পেয়েছিলেন তা বলা বাহুল্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ কবিতার ছন্দ-প্রকরণে বিপুল পরিবর্তনের কাল। বোদলেয়র এর আগে থেকেই ফ্রান্স-এ কিছু কিছু গদ্যরীতির কবিতা রচনার প্রচলন শুরু হলেও বোদলেয়রই প্রথম ১৮৫৫ সাল থেকে লিখতে শুরু করেন Le Spleen de Paris—যে কবিতাগুচ্ছকে তিনি নিজেই বলেছিলেন—'Petit Poemes en prose' (গদ্যে লিখিত ক্ষুদ্র কবিতাবলী)। সম্পূর্ণ সংকলনটির প্রকাশ ১৮৬৯-এ। ফ্রান্স-এর কবিতায় উনিশ শতকের শেষ দুই দশকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল 'vers libre' এবং তার একটি সামান্য আলাদা রূপ 'vers libéré'। এই স্বাধীন ও মিশ্র ছন্দটি সম্পর্কে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের ইংরেজ কবিরা খুবই সচেতন ছিলেন। ১৮৭৫-এর কাছাকাছি সময়ে sprung rhythm নিয়ে দেখা দিলেন হপকিন্স, কিছু পরে হুইটম্যান লিখলেন তাঁর প্রাণশক্তি-সবল দ্রুত-প্রবাহিত ছন্দের কবিতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নতুন আঙ্গিকের প্রয়োজন রূপে কবিরা ব্যক্ত করলেন বাক্‌স্পন্দের কাছাকাছি আসবার অভিপ্রায়।

ত্রিশের কবিদের এই বাক্‌স্পন্দ অনুগামী ছন্দ-নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা—শঙ্খ ঘোষের মতে, মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দোরীতিতেই সর্বাধিক স্বচ্ছন্দ প্রকাশ-আধার পেয়েছিল—"রবীন্দ্র পরবর্তীদের পক্ষে ছড়ার ছন্দের আকর্ষণ যে আর বেশি রইল না তার কারণ এখন বোঝা যায়। চলতি ভাষার প্রয়োগ আর বাক্‌স্পন্দের সৃষ্টিতে তাঁদের সংগত উৎসাহ অক্ষরবৃত্তেই যথেষ্ট প্রশ্রয় পেল। তার অনিয়মিত পদভাগের প্রবাহ এবং চলিত ক্রিয়ার যথেচ্ছ সংকোচন-প্রসারণের ফলে অনেকটাই স্বাধীনতা পেলেন এই কবিরা।" (প্রবন্ধ: 'স্বাভাবিক ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ,' ছন্দের বারান্দা, সিগনেট, ২য় সংস্করণ, ১৩৮২, পৃ. ৩৭)।

প্রথাসিদ্ধ মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের প্রতি শঙ্খ ঘোষের আগ্রহ এবং অনুরাগ সন্দেহাতীত। একদা একটি সংকলনের ('স্বনির্বাচিত', শান্তনু দাস ও রুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত, অনির্বাণ প্রকাশনী, ১৯৭০) অন্তর্ভুক্ত প্রিয় কবিতাটি

বেছে দিতে বলায় তিনি নির্বাচিন করেছিলেন 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' সংকলনের অন্তর্গত 'আরুণি উদ্দালক'।

কেবল অম্বার কণ্ঠ এখনো নদীর জলে 'সুমন, সুমন'
আর আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও
স্পষ্ট হও, বাঁচো—
শুধু মূর্খ অভিমানে বসে থেকে জলস্রোতে কখন যে আরুণি
সুমন তৃষ্ণাদেবতার মূলে একাকার হয়ে যায় তা আমার বোধেও ছিল না।

পয়ারের ধরনে দৃষ্টত সম্পূর্ণ বিন্যস্ত না হলেও উদ্ধৃত অংশটি তার থেকে খুব দূরেও নয়। প্রথম দুটি পঙক্তি ৮+৮+৬ এবং শেষ দুটি পঙক্তি ৮+৮+১০ পর্ব সমবায়ে সাজানো। মাঝে ছয় মাত্রার একটি সংযোজক পর্ব। মাত্রা পরিমাপ চিরাচরিত। কোথাও কোনো ঈষৎ ব্যতিক্রমী সংশ্লিষ্টতা বা বিশ্লিষ্টতা নেই। বাক্যের শব্দ, ধ্বনি ও ব্যাকরণ সমন্বয়ে পরিপূর্ণ কাব্যঝংকার।

এমন উদাহরণ শঙ্খ ঘোষের কবিতা থেকে আরো অজস্র দেওয়া যায়। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৬০) প্রকাশিত তাঁর সুপরিচিত কবিতা 'দিনগুলি রাতগুলি' তরুণ কবির ছন্দবোধ ও ছন্দ চিন্তার অন্যতম উদাহরণ। দেখা যায়, দলবৃত্ত এবং দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রিত চালে রচিত দুটি স্তবক ছাড়া আগাগোড়াই কবিতাটি মিশ্রবৃত্তে লেখা। আবেগ গভীরতার পূর্ণ-সংহত-ঘন গম্ভীর স্বরগ্রামের তুলনায় ভিন্ন ছন্দে রচিত অংশ দুটিকে দুর্বলই বলতে হবে। মিশ্রবৃত্তে রচিত পঙক্তিগুলিকে কবি নানাভাবে সাজিয়েছেন। টানা গদ্যের মতো সাজিয়েও পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন বলাকার ছন্দের মতোই মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দোরীতির উদাহরণ। নীচের অংশটি টানা গদ্যে লিখলেও ৮+৮+১০ মাত্রাবিন্যাসে গঠিত পর্বসমবায়ে সেটি যে অত্যন্ত সুনিয়মিত পয়ার ছন্দের কবিতা তা বুঝতে কবিতা পাঠকের মুহূর্তও সময় লাগে না। উদাহরণটিতে পর্ব বিভাজন-রেখাগুলি আমরা বসিয়ে দিলাম।

এমন আকাশ হবে / তোমার চোখের মতো / ভাষাহীন নির্বাক পাথর, ।। দৃষ্টি তার স্থির হবে / মৃতের প্রাণের মতো / উদাসীন নির্মম শীতল, ।। তুমি আছো সর্বময় / রাত্রির গহনে মিশে / আমি এক ক্লান্তির কফিনে, তুমি যদি মৃত্যু আনো / অবসাদে মৃক আর / কঠিন কুটিল রাত্রি জুড়ে— ।

মোটের উপর এই ভাবেই কবিতাটির অবয়ব গড়েছেন শঙ্খ ঘোষ।

প্রথাসিদ্ধ মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের আর একটি চমৎকার নিদর্শন পাই ১৩৮০-তে তাঁর 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' সংকলনের কবিতাগুলিতে। চার পঙক্তিতে বিন্যস্ত চতুষ্পদীগুলির অধিকাংশই ৮—১০ পর্ব-সজ্জায় মহাপয়ার ছন্দে রচিত। সাধারণতই চরণান্তরে ভাব প্রবাহিত হয়নি। দু'চারটি ক্ষেত্রে হয়েছে। প্রতি

চলনে ভাব-প্রবাহ একটি সমে এসে দাঁড়ালে তারও একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য ফুটে ওঠে কবিতায়। সংস্কৃত দ্বিপদী বা চতুষ্পদীর ক্ষেত্রে প্রায়ই আমরা তা অনুভব করি। সেই সংহত বক্তার এই কবিতাগুলির আধুনিক কাব্যভাষাতেও যেন শোনা যায়।—

প্রতি মুহূর্তের ধান আসক্ত মুঠোয় রাখি ধরে
তার পরে যায় যদি অবাধ সন্ন্যাসে ঝরে যায়
এই মাঠে আসে যারা সকলেই বোঝে একদিন
এক মুহূর্তের মুখ আরেক মুহূর্তে সত্য নয়।

ভাবের প্রবহমানতায় প্রাণ পেয়েছে—এমন একটি চতুষ্পদীও দেখা যেতে পারে—

ঘরবাড়ি ভিজে যায় অশান্ত ধানের মাঝখানে।
রবিউল বসে দেখে। এরকমই মীড় বা গমকে
ভরে ছিল সময়ে স্তরগুলি একদিন, আজ
বাজনা রয়েছে পড়ে, ফিরে গেছে বাজাবার হাত।

এই সংকলনের চার-পাঁচটি কবিতায় কবি ৮+৮+৬ অথবা ৮+৮+১০ মাত্রার তিন পর্বসমন্বিত পঙ্‌ক্তিও রেখেছেন। তবে ছন্দ ভাবনায় যে-দিকটি নিয়ে শঙ্খ ঘোষ প্রথমাবধি ভেবেছেন তা এই নিয়মিত সমমাত্রিক পর্ব-বিন্যাস নয়। তা হল মাঝে মাঝে মাত্রার বা উচ্চারণ-এককের কাল-পরিমাণে কিছু কম-বেশির তরঙ্গ তোলা ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যকে ছন্দের অঙ্গীভূত করে নেবার স্বাধীনতা। সেরকম একটি উদাহরণ এই সংকলন থেকে দেওয়া যায়—ঝড়ে ভাঙা লাইটপোস্ট / একা পড়ে আছে ধান খেতে'। 'লাইটপোস্ট'-কে মিশ্র-কলাবৃত্তের রীতিতে চার মাত্রার প্রথম পর্বাঙ্গটির পাশে রাখার জোরটুকু তিনি নিজে অর্জন করেছেন, পাঠককেও তিনি তা মেনে নিতে ও মানিয়ে নিতে বলেন। অনেক সময়ে এই সামান্য অ-সমতার মূলে থাকে স্বাভাবিক কথ্যচাল ও বাক্‌স্পন্দের চলনটি তুলে নেবার অভিপ্রায়। কিন্তু কখনো কখনো সেরকম কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নয়, কবিমনের শিল্প-সঙ্গতির ভিতর-চাপ থেকেই, কাব্যিক উচ্চারণের দায় থেকেও এজাতীয় অ-সমতা এসে যেতে পারে। কারণ যা-ই হোক, পরিমাপের অনড় কড়াকড়ি যেন কবির সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণের হাতে পায়ে শেকল না পরায়—এই কথাই বারবার নানাভাবে বহুস্থানে বলেছেন কবি-ছান্দসিক শঙ্খ ঘোষ। আমরা তাঁর অভিমতগুলিকে খানিকটা কালানুক্রমে দেখতে পারি, বুঝে নিতে পারি এবিষয়ে তাঁর মনঃপ্রবাহটি। দেখতে পারি—কোথাও কোনো বিবর্তন ঘটেছে কি না তাঁর চিন্তায়। অথবা কোথাও কি দেখা দিয়েছে কোনো স্ববিরোধ?

'নিঃশব্দের তর্জনী' আর 'ছন্দের বারান্দা'—দুটি প্রবন্ধ-সংকলনেরই প্রথম প্রকাশ ১৯১১-এ। প্রথমটির প্রকাশ এপ্রিল-এ, দ্বিতীয়টির ডিসেম্বরে-এ। এই দুটি গ্রন্থের ছন্দ-বিষয়ক ভাবনার কিছু পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) "ছন্দ কি দেখা যায়? অদৃশ্য কিন্তু শ্রুতিগোচর এই ছন্দের প্রবাহের মধ্যে ভেসে আসে শব্দগুলি, ফলে ছন্দের নক্‌শা অত্যন্ত সুনিয়মিত হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন অন্ধভাবে একে অন্যের গায়ে এসে লেগে যায়, অনিবার্যভাবে এসে যায়, তার দ্বারা নিপুণ সুগঠিত একটি পদ্যপঙ্‌ক্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু **সজীব ব্যক্তিত্বের** কোনো লক্ষণ তার মধ্যে প্রায়ই তখন পাওয়া যায় না। তাই এ-ও দেখা যায় যে শব্দ-চেতনাগত আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ইতিহাসে দেখা দেয় এক ছান্দসিক বিদ্রোহ, ছন্দো-মুক্তির সাধনা।"

(শব্দের পবিত্র শিখা, রচনাকাল ১৯৯২, বড় হরফ এই লেখকের)

তাহলে কবিতার ছন্দের ধ্বনি-গত অবয়বের মধ্য থেকে শঙ্খ ঘোষ যার প্রকাশ চাইছেন তা হল শিল্পীর সজীব ব্যক্তিত্ব। বাক্‌স্পন্দ থাকছে কি থাকছে না—সে বিষয়ে এই অংশে তাঁকে ভাবিত দেখা যায় না। কবিকে আলাদা ভাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যে চিনে নেওয়া যায় কি না তাঁর ব্যবহৃত ছন্দ থেকে—এই প্রশ্নটিই প্রাথমিক প্রশ্ন তাঁর কাছে। এই সূত্রে বোঝা সহজ হয়—কেন শঙ্খ ঘোষ—এমনকি, ব্যক্তিগত ছন্দের কথাও বলেন। দুই ব্যক্তির স্বরক্ষেপণ-ভঙ্গির পার্থক্যেও ছন্দ আলাদা হয়ে যাবে—একথা বলতেও বাধে না তাঁর। তাঁর এই কথাটি নিশ্চিতভাবেই সেই ছান্দসিকদের পছন্দ হয় না—যাঁরা ছন্দ-কে মনে করেন বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কাজ সব কিছুকেই নৈর্ব্যক্তিক নিয়মসূত্রে ব্যাখ্যা করা। অথচ শঙ্খ ঘোষ কবিতার ছন্দ-কে কবির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-মাধ্যম রূপেই দেখতে চান। এই কথাটিই তিনি বলেন তাঁর অত্যন্ত নিচু স্বরে ঐ প্রবন্ধেই—

(২) "যেমন দুই ভিন্ন জনের কথা বলার স্বর ঠিক একই রকম নয়, যদিও একই শব্দ হয়তো তারা ব্যবহার করে, তেমনি দুই কবির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে দেয় এই স্বর, এই স্পন্দ। অবশ্য এটা ঠিক যে ভদ্রতার কণ্ঠ একটা রীতির মধ্যে বাঁধা বলে অনেক সময়ে তা সুঠাম কিন্তু নির্জীব, কথা বলবার ঠিক স্বরটি জানা যায় কেবল অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে আলাপনে। **কবিতাও খোঁজে সেই অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বর।**… ব্যক্তিগত ধ্বনির এই আদলটিই সঞ্চারিত করে দেওয়া চাই কবিতার ছন্দের মাঝখানে।"

(ঐ, বড় হরফ এই লেখকের)

একথা হয়তো আমরা বলতেই পারি যে কবিতার ছন্দ সম্পর্কে প্রথমাবধি শঙ্খ

ঘোষের ভাবনায় ছন্দের সঙ্গে কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি জড়িয়ে ছিল। আর, কোনো দুজন কবির ব্যক্তিত্ব ঠিক একরকম হওয়া সম্ভব নয় বলেই সম্ভবত কবিতা-ছন্দের তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' নিয়মানুসরণের ব্যাপারটিকে প্রথম থেকেই তিনি সংশয়ের চোখে দেখেছেন।

এই গ্রন্থের পরের প্রবন্ধটিতেই শঙ্খ ঘোষ সুস্পষ্টভাবে নিজের সিদ্ধান্তটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বলেন যে কবিদের স্ব-কণ্ঠের আবৃত্তি শুনলে 'ব্যক্তিগত ছন্দের' সন্ধান সম্পর্কে আগ্রহ জাগে কারণ কোনো দুজন কবির উচ্চারণ পদ্ধতি, ঝোঁক দেওয়া, বিরাম বা 'পজ'-এর ব্যবহার একরকম নয়। তিনি বলেন—"দুই ব্যক্তির আবেগের মাত্রা এক চালে না চললে ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেও সূক্ষ্ম প্রভেদ সঞ্চারিত হতে থাকে, ফল্গুস্রোতে দেখা দিতে থাকে অনতিলক্ষ্য এক ব্যক্তিগত ছন্দ।" (ছন্দ : নিরূপিত ও ব্যক্তিগত, নিঃশব্দের তর্জনী, রচনাকাল ১৯৬৪)।

ছন্দের অতিনিরূপিত শ্রুতিরূপের মাঝে মাঝে এই মুক্ত ধ্বনির আসা-যাওয়াটিকে কবির ব্যক্তিত্বেরই একটি প্রকাশ বলে গ্রহণ করেছেন শঙ্খ ঘোষ এবং প্রথম থেকেই তিনি বলে এসেছেন যে—এরকম হওয়া ভালো—এমনকি কাম্য। বাংলা ছন্দের 'মুক্তিপথ' এই 'ব্যক্তিগত ছন্দের প্রবর্তনায়' মনে করেছেন তিনি। "অভ্যাসের গণ্ডী ভেঙে নিরূপিত ছন্দ ব্যক্তিগত ছন্দের নিত্য স্বয়ংরচনায় যথার্থ কবি উত্তেজক নূতন দিগন্ত দেখতে পাবেন বলেই আজ ভরসা করা যায়।" (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)

শঙ্খ ঘোষের অভিমতের আলোয় এমনও আমাদের মনে হতে পারে যে, পাশ্চাত্য ছন্দের ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডে হপকিন্স, আমেরিকায় হুইটম্যান অথবা ফ্রান্সে ফ্রী ভার্স-এর প্রবক্তারা অভ্যস্ত ছন্দগঠনের রকমফের ঘটাবার সময় কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের কথাও ভেবেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই একটি বক্তব্য ছিল—আধুনিক কালের দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল বহুমাত্রিকতাকে প্রকাশ করবার জন্য নতুন ছন্দ চাই। কিন্তু সেই নতুন ছন্দের নির্দিষ্ট কোনো আকার বেঁধে না দিয়ে যখন ইচ্ছেমতো যে-কোনো ছন্দের বা গদ্যে রচিত পঙ্‌ক্তি কবিতায় মিশিয়ে দেবার স্বাধীনতা নিলেন কবিরা ফ্রীভার্স-এ, যখন হুইট্‌ম্যান তাঁর বিপুল আবেগস্রোতের প্রবাহবেগে ধরা-বাঁধা পর্ব-মাপের ব্যত্যয় ঘটালেন, যখন হপকিন্স বিশেষভাবে নিজের ইচ্ছেমতো দলগুলিতে ঝোঁক দিতে হবে বলে পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতাকে চিহ্ন-লাঞ্ছিত করে দিতে চাইলেন—তখন তাঁদের সকলেরই নিহিত অভিপ্রায়টি ছিল সেই স্ব-ব্যক্তিত্বের রূপটিকে ছন্দ শরীরে মূর্ত করে তোলা। 'আমার বলার কথাটি আমার মতো করেই ছন্দে আকার নিক'—এই ইচ্ছাটি গোপন ছিল না একেবারেই। এজন্যই ফ্রী-ভার্স-এ বা স্প্রাং রিদম্-এ রচিত কবিতায় ক্ষেত্রে

প্রতিটি কবিতার ছন্দোলিপি হবে আলাদা। একটির বিন্যাস দিয়ে আর একটির, এক স্তবকের বিন্যাস দিয়ে অপর স্তবকের ছন্দোধ্বনি অনুভব করা যাবে না পুরোপুরি। শঙ্খ ঘোষ অবশ্যই ঠিক এ-জাতীয় ছন্দোরূপ নির্মাণের কথা বলেননি। ততটা নিয়মছাড়া হবার ইচ্ছে ব্যক্ত করেননি তিনি। একই স্তবকে বিভিন্ন ছন্দের তাল-লয় পাওয়া যাবে না তাঁর কবিতায়। তবু তিনিও বলতে চেয়েছেন এই কথাটাই যে কবির অভিপ্রায়টিকে ঠিকমতো বহন করবার প্রয়োজনেই ছন্দকে মাঝে মাঝে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে হয় তার বাঁধা মাপের পরিসরটুকু। একে সর্বদা নিয়মে শৃঙ্খলিত করা চলবে না। আবার পুরোপুরি নিয়মহীনতাও নয় এ আঙ্গিক। পুরোপুরি নিয়মহীনতায় তাঁর যেন তেমন সায় নেই। ছন্দের নিয়ম-বন্ধনের মধ্যে থেকেও যে সানন্দ শিল্পরূপ ফুটিয়ে তোলা যায় এবং তাতেও যে শঙ্খ ঘোষ সম্যক আগ্রহী তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর অজস্র নিরূপিত ছন্দের কবিতায়।

রুদ্ধদল এবং মুক্তদলের নিয়মিত বিন্যাসের মধ্যে উচ্চারণ-ভঙ্গি ও স্বরক্ষেপণ-ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে এক একজন কবির ছন্দ-নির্মাণ এক একরকম হয়ে ওঠে। সেই স্বাতন্ত্র্যকে রূপ দেবার কারণেই কখনো কোনো কবির এক একটি পর্ব-কে চোখের দেখায় এবং যান্ত্রিক উচ্চারণভঙ্গিতে মনে হতে পারে ছন্দ-ছুট। কিন্তু আসলে তা যে ছন্দের মধ্যে থেকেই একটু ভিন্ন স্বর, সুর ও ঝোঁকের বিন্যাস— এই প্রবণতাকে আধুনিক কালের কবির স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মবিশ্বাসী কবিচেতনার প্রকাশ বলেই দেখেছেন শঙ্খ ঘোষ। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের গানে—বিশেষ করে তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে আছে বাঁধাছন্দের শাসন থেকে মুক্তির প্রয়াস।—"রবীন্দ্র-পূর্ব বাঙলা গান মোটের ওপর পাঠ্যছন্দের আয়ত্তগম্য। স্বাধীনতম বৈষ্ণব কবিতাও ছান্দসিকের প্রতিষ্ঠিত সূত্রাবলীর সাহায্যে বিশ্লেষণ-যোগ্য" (মুক্ত ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ, ছন্দের বারান্দা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮২, পৃ. ২২) রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দ সম্পর্কে কিছুটা বিতর্কের অবকাশ থাকলেও (গানের ছন্দ সবসময়েই সুরবিস্তার থাকার কারণে আলাদা হয়ে থাকে) তাঁর এই অভিমতে দ্বিমতের স্থান প্রায় নেই যে—"প্রাত্যহিক বাচনের শব্দভঙ্গি, স্বর-ভঙ্গি আর শ্বাসক্ষেপ-ভঙ্গি যে ছন্দে একত্রে বেঁধে নেওয়া যায়, সেই ত্রিবেণীর প্রতি আধুনিক কবির দৃষ্টি…" (আধুনিক ছন্দ, ছন্দের বারান্দা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২)।

স্বরভঙ্গি আর শ্বাসক্ষেপভঙ্গির তারতম্যের ফাঁকগুলি ভরাট করে তোলে কবির অভিপ্রায়ের ভঙ্গিটুকু। এই 'ব্যক্তিগত' ছন্দের ব্যাপারটিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। 'ছন্দের বারান্দা' গ্রন্থের প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে তার নিদর্শন আছে। কখনো সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কখনো উৎপলকুমার বসু, কখনো আর কারো পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন বক্তব্যের সপক্ষে। যদিও পূর্বোক্ত প্রবন্ধে

'প্রাত্যহিক বাচন' বা যাকে তিনি 'বাক্‌স্পন্দ' বলেন—সেই প্রসঙ্গটিও নির্দেশিত হয়েছে তবু বাক্‌স্পন্দ ফুটিয়ে তোলাই শেষ কথা নয়। শেষ কথাটি ঐ ব্যক্তিত্বের চিহ্ন। জীবনানন্দ যখন পয়ার-পঙ্‌ক্তিকে নিয়মিত আঠারো মাত্রায় আবদ্ধ রাখার কথা একেবারেই ভাবেন না—তাকে বিস্তারিত করে দেন—আটাশ, তিরিশ পর্যন্ত—তার মধ্যে বাক্‌স্পন্দ বা প্রাত্যহিক বাচন-ভঙ্গি নিয়ে আসার অভিপ্রায় থাকে না। থাকে ভিন্নতর আবহ-নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা। 'ছন্দের বারান্দা' গ্রন্থের 'শত জলঝরনার ধ্বনি' প্রবন্ধটিতে সেই কথাটিকেই স্পষ্ট করেছেন শঙ্খ ঘোষ।—"জীবনানন্দের অক্ষরবৃত্ত প্রথম থেকেই টেনে আনতে চায় এমন একটা আবহ, এমন একটানা এক সুর, বাংলা কবিতায় যা নূতন। ধুয়ে তিনি সবার সঙ্গে সমান, কিন্তু তার স্পন্দনে নয়।" প্রবন্ধটির শেষে জীবনানন্দের আশ্চর্য নতুন স্বরপ্রবাহময় দলবৃত্ত ছন্দের আবিষ্কারকে তিনি স্বাগত জানান এই বলে যে এর মধ্যে আছে জীবনানন্দের 'গহন বোধের সারাৎসার'। এই কথাটির পরে আর কথা নেই।

শঙ্খ ঘোষের প্রথম দুটি প্রবন্ধ-গ্রন্থে এই দুটি প্রসঙ্গই ফিরে ফিরে এসেছে বারবার। একটি হল কবিতার ছন্দে বাক্‌স্পন্দের মিলন, অপরটি হল কবির বোধ ও ব্যক্তিত্বের সঠিক আধার হয়ে ওঠার জন্য ছন্দের আঁটো। ছকটির প্রয়োজন-মতো সম্প্রসারণ। এর পরে ছন্দ সম্পর্কে যেখানে যা তিনি বলেছেন তাতে বিপরীত কোনো উক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৯৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক ছাত্রের ছন্দ-বিষয়ক এক সম্মিলিত অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ 'বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা' (জিজ্ঞাসা) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেখানে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন—"বাংলা ছন্দের ভিত্তি পরিচয় একরকম তৈরি হয়েছে। আজ আলোচনার দরকার ছিল তার ভিতরকার স্পন্দনের চরিত্র, কবিতার সঙ্গে ছন্দের যোগ। কিন্তু সে আলোচনায় আজও পর্যন্ত উৎসাহ বড়ো কম।" (পৃ. ১৭৭)। 'সিদ্ধার্থ' পত্রিকার বিশেষ ছন্দ সংখ্যায় (অষ্টম সংকলন, আশ্বিন ১৩৮৫) কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরেও তাঁর বক্তব্য একই রকম—"এই যে metre অর্থে ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাঁধা হয়ে গিয়েছিল তার তিন রীতি, পরবর্তী কবিদের এ নিয়ে তেমন আর ভাবতে হয়নি। তাঁরা কেবল দেখেছিলেন যে বাঁধনগুলিকে কোথাও কোথাও অল্প পরিমাণে খুলে দিলে নতুন কোনো ধ্বনি তৈরি হয় কি না এর থেকে।...অক্ষরবৃত্তের যে সংশ্লেষণ আর বিশ্লেষণ প্রবণতা আছে, সে দুটিকেই চূড়ান্ত ব্যবহার করেছেন আধুনিক কবিরা এই চল্লিশ বছর জুড়ে।"

এই বিষয়ে আরো পরবর্তী সময়ের একটি রচনা সংকলিত হয়েছে ১৯৮৮তে প্রকাশিত 'কবিতালেখা কবিতাপড়া' পুস্তিকাটিতে। সেখানে এক কবির কথায়

বলানো হয়েছে—"ছন্দোময় কবিতাকেও ছন্দোহীন বলে ভাবেন অনেকে, তার কারণ কবিতার এই কথা চাল। ..কবিতার ছন্দস্পন্দের সঙ্গে প্রতিদিনের বাক্‌স্পন্দের কীরকম বিচিত্র দেওয়ানেওয়া চলছে কেবলই, আমরা তো ভেবেছিলাম ছান্দসিকেরা আজ সেইটেই খুলে দেখাবেন।' (ছন্দোপকথন, রচনাকাল ১৯৮২, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণ-কমিটি, ১৯৮৮, পৃ. ৭২-৭৩)।

দেখা যাচ্ছে, ছন্দের সুনিরূপিত পর্বসমতা-সাপেক্ষ শ্রুতিধ্বনির এই ব্যতিক্রমী সম্প্রসারণের মূলে বাক্‌স্পন্দের সঙ্গে দেওয়ানেওয়ার আকাঙ্ক্ষাটিই প্রধান বলে এখানে মনে করেছেন শঙ্খ ঘোষ। প্রথম দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থের ('নিঃশব্দের তর্জনী' ও 'ছন্দের বারান্দা') রচনাগুলিতেও বাক্‌স্পন্দের প্রসঙ্গটি আছে প্রধান হয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে কবির যথার্থ আত্মপ্রকাশের তাগিদ অর্থাৎ কবির সজীব ব্যক্তিত্বের অভিব্যঞ্জনার প্রসঙ্গটিও ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার—যা আমরা রচনাংশ উদ্ধার করে দেখিয়েছি। মনে হয়—এই দুইয়ের মধ্যে এক ধরনের অভিন্নতাই অনুভব করেছেন কবি। বাঁধা ছন্দের সাজানো ছকের শাসন মেনে কথা বলবার সময়ে কবিকে অঙ্গীকার করতে হয় আত্মব্যক্তিত্বের এক শমিত ও ছন্দিত আধারের পরিসীমা। নিজের সমস্ত ভাবনাটুকুকে নির্বাধায় উজাড় করে দেবার অবকাশ কোথায় সেখানে? প্রতিদিনের জীবনযাপনের সংঘাতের মধ্য দিয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসে মানুষের ব্যক্তিত্ব। প্রতিদিনের ভাষাতেই মানুষ ঢেলে দিতে পারে তার অনাবরণ উপলব্ধির নির্যাস। শিল্পী যখন তাঁর সেই যাপনের সারাৎসারকে কাব্যে রূপ দিতে চান সম্পূর্ণতায় তখনই তাঁর কাব্য-ভাষায় চলে আসে অপরিহার্য কথোপকথনের চাল—যাকে শঙ্খ ঘোষের অনুসরণে আমরা বলছি 'বাক্‌স্পন্দ'। কাজেই বিরোধ নেই এই দুইয়ের মধ্যে। কবির নির্মিত ছন্দ যেন তাঁর নিজের সঙ্গে নিজেরই বাক্-বিনিময়—তাঁর নিজেরই আত্মিক দ্বন্দ্বময়তার মধ্য দিয়ে পথচলা—তাই ব্যক্তিত্বের আভ্যন্তর রূপ আর বাক্‌স্পন্দ বস্তুত অবিচ্ছিন্নই হয়ে যায়।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা থেকে আমরা কিছু নিদর্শন দেখতে পারি এবার। বুঝে নিতে পারি—কিভাবে তাঁর ভাবনা ও কবিতা-চর্চার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তিনি। উদাহরণ নেওয়া যাক তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি' থেকে।

> "একটি গাছ পিলসুজ ছড়িয়ে পড়ে তাতে
> হঠাৎ জাগা জ্যোৎস্নার শিখার কণিকা কি?
> দুঃখ নেই কার কার? এসো না এই পথে—
> একটি ছোটো গোল কুঁজ মাটিতে মুখ রাখি।
> একটি গাছ পিলসুজ চাঁদের শিখা তাতে।" (পিলসুজ)

বাক্‌স্পন্দের এবং কথ্য উচ্চারণের প্রত্যক্ষতা ভেদ করে সহসা ছন্দোরূপটি নির্ধারণ

করা কঠিন হয়ে পড়ে। হলন্ত দলের প্রাধান্তে মনে হয় না যে রচনাংশটি কলাবৃত্ত ছন্দ হওয়া সম্ভব, কারণ রাবীন্দ্রিক কলাবৃত্তে যুক্তব্যঞ্জনের নমনীয় উচ্চারণের প্রতিধ্বনিতে অভ্যস্ত আমাদের কান। দলবৃত্তের কাঠামোটি কোনোভাবেই যাচ্ছে না দেখে মনে হতে পারে মিশ্রবৃত্ত-ই গ্রহণ করেছেন কবি। কবিতটির পঠন-ভঙ্গিতে দ্রুততা নেই, লালিত্য-ঝংকারও না—চালটি যেন মিশ্রবৃত্তেরই। প্রতিটি পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দটিতে একটি করে হলন্ত দল এমনভাবে বিন্যস্ত যে তাদের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এক মাত্রাও ধরা যায়। সেভাবে ধরলে প্রতিটি পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্বে আমরা আট মাত্রার একটি খণ্ড পেতে পারি। সেই নিয়মেই প্রতি পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বে পাই সাত মাত্রা। আধুনিক কবিতা পাঠকের লোভ হয় রচনাংশটিকে মিশ্রবৃত্তেরই একটি আধুনিক কবিকৃত রূপ বলে ধরবার যেখানে আট এবং সাত মাত্রার দুই পর্বে সাজানো পঙক্তিগুলি। কিন্তু না!

সম্পূর্ণ কবিতাটি চোখের সামনে ধরলেই দেখি কলাবৃত্তে রচিত তার অবয়ব। কয়েকটি স্তবকে তার পর্ব ছয়-মাত্রিক। ছন্দের প্রয়োজনে শব্দ ভেঙেও দিয়েছেন তিনি—

সান্ধ্য শহর / এ কোন্ প্রান্তে / নির্জন নীড় /
বাঁধে কৌশলে ! ॥ চেলেছি আমার /
মুখখানি তার / দুঃখের কুন্ / তলে
পলে পলে…"

আবার কখনো পাঁচ মাত্রায় বিন্যস্ত কবিতাটির পর্ব—

"আমার মাটি যন্ত্রণায় কাঁপে
শিকড়ে তারই অন্ধ আক্ষেপ
তুলেছে বুকে যন্ত্রণার ধারা
পাতা পাতায়, একটি দুটি গাছ!"

বলা বাহুল্য, তারই-কে 'তারি' দেখতে হবে—কারণ শ্রুতির ক্ষেত্রে কোনো ফারাক নেই। 'আক্ষেপ'-কেও মধ্যে ভেঙেছেন কবি। বলে নেওয়া যায় যে, অনেকে ছন্দ বজায় রাখার জন্য শব্দকে মাঝখান থেকে ভাঙা অনুচিত মনে করেন। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ এ-বিষয়ে সংস্কারমুক্ত। প্রায়ই তাঁর নির্মাণে শব্দ ভেঙে ছন্দ তৈরি হয়েছে—দেখা যায়। তিনি যেন ধরেই নিয়েছেন—পাঠক পড়ে নেবেন ঠিকমতো। রবীন্দ্রনাথের বহু-আলোচিত পঙ্‌ক্তি 'মরি মরি অনঙ্গ দেবতাকে' 'মরি মরি অ / নঙ্গ দেবতা'—এভাবে পড়বেন না কেউই।—এ বিষয়ে তাঁর লিখিত মন্তব্যই আছে 'নিঃশব্দের তর্জনী'-তে (প্যাপিরাস সংস্করণ ১৩৯০, পৃ. ৩০)।

কলাবৃত্তেরই একটি বিচিত্রতর বিন্যাস কবি ঘটিয়েছেন আলোচ্য শেষ

স্তবকে···যেটি আমরা উদ্ধার করেছি প্রথমে। কলাবৃত্তের রীতিতে প্রতিটি পঙক্তিকে পাঁচ, চার, পাঁচ, দুই, মাত্রার পর্বে ভেঙে পাঠ করলে মসৃণ হয়ে যায় সবটাই—'একটি গাছ / পিলসুজ / ছড়িয়ে পড়ে / তাতে'। অথচ হলন্ত দলের যোজনায় এবং প্রশ্নচিহ্ন সমন্বিত বাক্স্পন্দে মাপা ছন্দের পরিসীমাতেও জাগে ভিন্ন এক সুর।

এরকমই আরো একটি উদাহরণ "নিহিত পাতাল ছায়া'-র 'ভিড়' কবিতায়—

'ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখ নেই ? চোখে দেখতে পান না ?
'সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান—'

এই স্তবক যে নিখুঁতভাবে ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত তা মনেই থাকে না এই চার পঙক্তি পড়বার সময়ে। মনে পড়ে পরের স্তবকে এসে যেখানে স্পষ্ট পড়তে পারি –

'আরো কত ছোটো / হব ঈশ্বর /
ভিড়ের মধ্যে / দাঁড়ালে !'

প্রথমে স্তবকে বাক্স্পন্দের ঐ ব্যাপ্তিতেই ঐ ছন্দের সার্থকতা···ছয় মাত্রার অবিকলতায় নয়।

এবারে দেখা যাক কয়েকটি অংশ যেখানে অভ্যস্ত পদ্ধতিতে মাত্রা গণনা করতে গেলে রক্ষণশীল পাঠকের আছে একটু ঠেকে যাবার সম্ভাবনা।

"তুমি থেকো তুমি সবার দৃষ্টিগোচর থেকো—
নইলে আমি এ যে কিছুই বুঝতে পারি না।
স্মরণ বিস্মরণ—তার উর্ধ্বে প্রত্যেকে
দেখবে, তুমি মানবী না, স্বপ্নপরী না।"

(সত্তা, নিহিত পাতাল ছায়া)

চমৎকার দলবৃত্ত ছন্দের তাল-লয়-ধ্বনি এবং প্রতি পর্বের প্রথম স্বরে ঈষৎ ঝোঁকসহ উচ্চারণ—সবই আছে। কিন্তু তৃতীয় পঙক্তিতে—যেখানে কবি একটি 'ড্যাশ' চিহ্ন দিয়ে একটা অংশ নির্দেশ করেছেন সেখানে আছে দুই মাত্রা পরিমাণ একটুখানি নীরবতা। ঐ নৈঃশব্দ্যের মাত্রাটিকেও ধরতে হবে কবিতাটি পাঠের সময়ে, নাহলে ছন্দ যাবে স্খলিত হয়ে। আর, ঐ নীরবতাটুকু এক মুহূর্তের জন্য যেন ছুঁয়ে যায় বিস্মরণের অতলতা—যেখানে সত্যিই কোনো শব্দ নেই। 'ড্যাশ'-কে দিয়ে অনেক কথা বলাতে পারেন কবিরা। জীবনানন্দ পদে পদেই বাধায় 'ড্যাশ' ব্যবহার করেন। কোনো কবিতা পাঠক

ভুলতে পারেন না 'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন'—এই পঙ্‌ক্তির নদী শব্দের পরের অনবদ্য বাধার নীরবতাটুকু। এখানে শঙ্খ ঘোষের কলমেও পাওয়া গেল একটি স্মরণীয় নীরবতা। উপরন্তু তিনি ঐ নৈঃশব্দ্যটিকে কবিতার ছন্দের সঙ্গে গেঁথে নিয়েছেন। ভাব ও রূপের এমন যুগলসন্ধি বস্তুতই দুর্লভ।

নেওয়া যাক 'নিহিত পাতাল ছায়া' থেকে আরো একটি উদাহরণ—

বুড়িরা জটলা করে
আগুনের পাড়ায়
দুধারে আঁধার জল
পাতাল নাড়ায়।

প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই এক পর্বিক। এবং প্রথম স্তবকেই পর্ব-সমিতি ঈষৎ ভেঙে যায়। ৮, ৭, ৮, ৬—এইভাবে ক্রমিক মাত্রা রাখা হয়েছে পর্বগুলিতে। অথচ একটু মন্থরভাবে পাঠ করলে কানে লাগে না কোথাও।

আবছায়া জাহাজ ঘিরে
মাতালের সাঁতার
কেউ-কেউ আলোক ভাবে
কেউ-কেউ আঁধার।

দ্বিতীয় স্তবকটি ঈষৎ অন্যরকম প্রথম স্তবক-বন্ধটির চেয়ে। সামগ্রিকভাবেই একটি করে মাত্রা বেড়ে যাবার দিকে যেন কবিতাটির গতি। এখানে পর্বগুলির ক্রমিক মাত্রাসংখ্যা ৯, ৭, ৯, ৭। আগের স্তবকটির তুলনায় আবহমণ্ডল যেন আরো মন্থরতাময় হয়ে উঠেছে। অথচ মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব শব্দ ও আলো-আঁধারি মিলে ঘন হয়ে উঠছে একটি রহস্য। মাত্রাসংখ্যার সম্প্রসারণে আছে সেই মন্থরতার আবেশ। শব্দ-যোজনায় ঈষৎ ধাক্কায় — যেমন 'জাহাজ ঘিরে'-তে হলন্ত দলটির স্থান নির্বাচনের ফলে রুদ্ধ ধ্বনিটির স্পষ্টতা ; 'কেউ-কেউ' এর প্রতিটি 'কেউ' শব্দে অত্যন্ত স্পষ্টই দুটি মাত্রা এবং সুনির্দিষ্টভাবে অন্তিম 'উ' ধ্বনিটিকে রুদ্ধ দলের মতো করে উচ্চারণের দাবি—ইত্যাদিতে একটি পরিবেশের মসৃণতা ও ঘাতময়তা একত্রে উপস্থিত। যে-পরিবেশটিকে 'পাতাল নাড়ায়'—এই ভীষণ বাক্যবন্ধে সংকেতিত করতে চেয়েছেন কবি। একেই বোধহয় তিনি বলতে চেয়েছেন 'কবিতার সঙ্গে ছন্দের যোগ'।

দুটি স্তবক পড়তে পড়তে মনে হয় মিশ্রকলাবৃত্তের মন্থরতা এবং শোষণশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করেছেন কবি যেখানে ছয় মাত্রার পর্ব আর নয় মাত্রার পর্বের মধ্যে খুব বড় রকমের কোনো পার্থক্য কানে বাজে না। কিন্তু তারপরেই দেখা যায় এই মন্থরতা আর শোষণশক্তির আবেশ অটুট রেখে তিনি কলাবৃত্ত ছন্দের একটি

পর্ব বন্ধনেই মিশিয়ে দিয়েছেন মিশ্রবৃত্ত রীতির কবিতায়।—

রাত্রির কুণ্ডলীও
কুয়াশার কাঁপে
বুড়িদের গুটলা নড়ে
অতীতের ভাপে।

এখানে পর্বগুলির ক্রমিক মাত্রা সংখ্যা ৯, ৬, ৯, ৬। কিন্তু বলা যেতে পারে, প্রথম পঙ্‌ক্তিটির ক্ষেত্রে কলাবৃত্ত রীতির পঙ্‌ক্তি থেকে মিশ্রবৃত্ত রীতির সুর শঙ্খ ঘোষ বার করে এনেছেন।

১৯৮০-তে প্রকাশিত 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কবিতা-সংকলনে মিশ্রবৃত্তের অন্তর্গত মহাপয়ার ছন্দে রচিত চৌষট্টিটি চতুষ্পদী সংগ্রথিত। সেখানেও—কখনো উচ্চারণের স্বাভাবিকতায়, কখনো কিছুটা সম্প্রসারিত ধ্বনি বজায় রেখেই কোথাও কোথাও পর্ব-মাত্রার স্বাধীনতা নিয়েছেন কবি। 'ওই কণ্ঠনালী ছিঁড়ে' (সংখ্যা ৩৮) কিংবা 'এই চত্বরের পাশে' (সংখ্যা ২৮) পঙ্‌ক্তিতে 'ই' যখন একটি পরিপূর্ণ দলের উচ্চারণ পায় তখন 'ঝড়ে ভাঙা লাইটপোস্ট' (সংখ্যা ২)-এ 'ই' ধ্বনিটিকে ব্যবহার করা হয় কেবল একটু বিস্তারিত ও সংঘাতময় ধ্বনি নিয়ে আসার কাজে। নাহলে 'ল্যাম্পপোস্ট' লেখা যেত সহজেই। আবার উচ্চারণ-স্বাভাবিকতার দিক থেকে 'দাও ডুবে যেতে দাও'-এর 'ও' যে একটি পৃথক মাত্রার মূল্য পায় এবং 'ফিরে যাওয়া বাওয়া নয়-এর 'ও' যে তা পায় না—তা-ও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন ৪৪ সংখ্যক চতুষ্পদীতে স্পষ্ট করেই।

ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধমালায় যে অভিমত শঙ্খ ঘোষ ব্যক্ত করেছেন, নিজের কবিতায় তার প্রয়োগে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই—তা আমরা দেখলাম। সেই প্রয়োগ সর্বতোভাবে কাব্যরসোত্তীর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু একথাও মনে হয়—এ ধরনের মিশ্রণ তাঁর হাতে খুব বেশি হয়েছে বলে মনে হয় না। অন্তত, যতটা জোরের সঙ্গে তিনি প্রবন্ধগুলিতে এই স্বর ও সুরের মিশ্রণ সমৃদ্ধ জীবন্ত ও ব্যক্তিত্ব জ্ঞাপক ছন্দের প্রয়োজনটিকে উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁর কবিতায় এরকম উদাহরণ আরো অনেক বেশি পাবার প্রত্যাশা ছিল।

সেই তুলনায় শঙ্খ ঘোষ বাংলা ছন্দের ত্রিধারাতেই, প্রচলিত ছকের মধ্যে থেকেই অসাধারণ সাবলীল কবিতা নির্মাণ করেছেন। ছন্দের বন্ধন যে কোথাও তাঁর কাছে শৃঙ্খল হয়েছে এমন মনেই হয় না—ভূষণ হয়েছে বলেই মনে হয়। এর মধ্যেই তিনি বাক্‌স্পন্দকে মিশিয়ে নিয়েছেন অবলীলাক্রমে—যখনই চেয়েছেন তখনই করেছেন। আবার সব কবিতায় বাক্‌স্পন্দ অপরিহার্য নয় এই উপলব্ধি থেকে কাব্যস্পন্দময় কবিতাও তাঁর হাতে কম লেখা হয়নি। সেখানেও তাঁর সাফল্য তর্কাতীত। নিরূপিত ছন্দে লিখেছেন বলে গদ্যরীতি তিনি বর্জন

করেছেন তাও নয়; যখন গদ্যকবিতা লিখেছেন সেখানেও তাঁর শৈল্পিককরণ অনায়াস।

আসলে বোধহয় কথাটা এই—নিরূপিত ছন্দের ঝংকারটির প্রতি বরাবরই শঙ্খ ঘোষের প্রীতিপক্ষপাত। সেই ধ্বনি-শৃঙ্খলার বর্জনে নয়, সেই শৃঙ্খলাময় ধ্বনি-মালিকাকে নিজের ইচ্ছামতো খেলানোতেই তাঁর আনন্দ। খেলাতে তিনি সত্যিই পেরেছেন, কিন্তু যেখানে সেই শৃঙ্খলার পরিগ্রহণ সেখানেও তিনি অ-স্বচ্ছন্দ বা অ-সুখী নন। ছন্দ-শিল্পী শঙ্খ ঘোষকে বুঝতে গেলে সেই দিকটিও উপলব্ধি করতে হবে।

অনেককাল আগে একটি স্মৃতিসকারী আত্মকথনে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন "...বারো বছর বয়সে আমার একদিন শুরু হয়েছিল ছন্দমেলানোর খেলা, একেবারে দায়হীন, প্রগল্ভ। বিষয়ের কোনো ভাবনা ছিল না তখন, যে-কোনো উপলক্ষই ছিল রচনার উপলক্ষ।" (পা তোলা পা ফেলা, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯)। অনুমান করতে বাধা নেই—এই 'ছন্দ মেলানো' বাঁধা ছন্দের নিরূপিত ছকেরই প্রথম অভ্যাস। তাতে যে তাঁর আনন্দ ছিল—তা-ও তিনি বলেছেন। সে আনন্দ তাঁকে ছেড়ে যায়নি আজও। কবিতায় ছন্দ-শৃঙ্খলা ও মিল-বিন্যাস নিয়ে আসার খানিকটা পক্ষেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন একটি প্রবন্ধে—"ভাবতে হয় যে মানবসংঘের চেতনার আরেকটা স্তরকে ছুঁতে চায় কবিতা, যে স্তরে তার মধ্যে লীন হয়ে আছে আবহমান রিচুয়াল। এই স্তরকে গোপনে কাঁপিয়ে দেবার জন্যই কবি নিয়ে আসেন তাঁর লোকায়ত প্রতিমা-ভাণ্ডার, তাঁর ছন্দ-সম্পদ, তাঁর মিল।" (কবি আর তাঁর উপাদান, শব্দ আর সত্য, প্যাপিরাস, ১৯৮২, পৃ. ৪৬-৪৭)।

এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে মত মিলবে না হয়তো সমর সেন কিংবা অরুণ মিত্রের। অরুণ মিত্র—যিনি স্পষ্টই বলেন "কবিতা লিখতে গিয়ে আমি বারেবারেই তাদের কাছে বাধা পেয়েছি বলেই অন্য পথ ধরেছি। এখন তো আমার ছন্দ মিলকে একটা সংস্কার মনে হয়।" (কবিতা, আমি এবং আমরা; পরমা সংকলন, শরৎ-হেমন্ত ১৩৮৪)।

এবিষয়ে বিভিন্ন কবির মনোভাব আলাদা হবেই। অরুণ মিত্রের ভাবনার শরিক সম্ভবত অধিকাংশ কবিই হবেন না। চল্লিশের কবিরা তো ছন্দকে একটা হাতিয়ারই মনে করেছিলেন। আর মিল বিষয়ে অরুণ মিত্রের প্রিয় কবি আরাগঁ-র উক্তি হল—'কবিতার মিল যে এক মানবিক আবিষ্কার, প্রকাশের এক আত্ম-অতিক্রমণ এবং এক প্রগতি তা অনস্বীকার্য।...মিলের সমর্থনে আবার দাঁড়ানোর অর্থ হল যা বলা যায় না তার সামনে এক দরজা খুলে দেওয়া।'

(কবিতার মিল ১২৪০, আরাগঁ, অনুবাদ অরুণ মিত্র, প্রতিক্ষণ, ২-১৬ অক্টোবর, ১৩৮৫)।

নিরূপিত ছন্দের নিটোলতায় শঙ্খ ঘোষের সাফল্যের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে তাঁর মিশ্রবৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলি। আমাদের অনেককালের সঙ্গী, যে-কোনো উপলব্ধিকে ধরাবার মতো প্রশস্ত, একান্ত ঘরের আশ্রয়ের মতো এই বহুচেনা ছন্দটিতেই যেন তিনি পুরোপুরি ঢেলে দেন নিজেকে। মনে পড়ে, একদা স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি বেছে দিতে বলায় তিনি নির্বাচন করেছিলেন 'আরুণি-উদ্দালক'। এই কাতর ও গভীর-নিমগ্ন সুরের বেদনাময় মিশ্রবৃত্ত ছন্দের দীর্ঘ কবিতাটি তাঁর রচনা-সম্ভারের এক স্মরণীয় সৃষ্টি।

রবীন্দ্রোত্তর কবিরা সাগ্রহ ব্যাপকতায় গ্রহণ করেছেন মিশ্রবৃত্তকে। কারণটি শঙ্খ ঘোষ নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। ছন্দটি স্থিতিস্থাপক, অনেকটাই ধারণ করতে পারে কথাভঙ্গিকে। এই ছন্দে ধরানো যায় আবেগ ও দর্শন, প্রশ্ন-সমস্যা-বিতর্ক; প্রাবন্ধিকতা-নাটকীয়তা-প্রবহমান বিবৃতি কিংবা আত্মকথন। ছোট-বড় পর্ব সৃষ্টি করে, নানাভাবে পর্ব বিন্যাস করে ধ্বনি-বৈচিত্র্যও আনা যায় কিছুটা। তার উপর হলন্ত দলকে প্রয়োজনমতো সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পড়বার স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার ফলে অনেক চলতি ও মৌখিক শব্দও একালে ঢুকে পড়তে পারে এই ছন্দে। শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের সম্পর্কে লিখেছেন—"চলতি ভাষার প্রয়োগ আর বাক্‌স্পন্দের সৃষ্টিতে তাঁদের সংগত উৎসাহ অক্ষরবৃত্তেই যথেষ্ট প্রশ্রয় পেল। তার অনিয়মিত পদভাগের প্রবাহ এবং চলিত ক্রিয়ার যথেচ্ছ সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে অনেকটাই স্বাধীনতা পেলেন এই কবিরা।" (ছন্দের বারান্দা, সিগনেট, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮২, পৃ. ৩৭)।

মিশ্রবৃত্তের প্রায়োগিক সার্বিকতার কথা বলতে গিয়ে এখানেও শঙ্খ ঘোষ তাঁর প্রিয় বাক্‌স্পন্দের প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু মিশ্রবৃত্তের যে ভরাগভীর রূপ তাঁর নিজের কবিতায় অক্লেশে বিস্থিত সেখানে সর্বদা যে বাক্‌স্পন্দ এসেছে তা নয়। অস্তিত্বের গহন স্তরকে যখনই ছুঁতে চেয়েছেন তখনই যেন অ-বিকল্প উৎসার ঘটেছে মিশ্রবৃত্ত ছন্দের। অজস্র উদাহরণের দু'তিনটি উদ্ধার করা যাক। সহজ ভঙ্গিতে একখণ্ড নিবিড় উপলব্ধির ভাষারূপ একান্তই সরল মহাপয়ারে—

> যাও চলে যাও, যাও যতদূরে যেতে পারো যাও
> সুপুরিবনের সারি যেদিকে চলেছে অবেলায়
> কেউ কারো মতো নয়, নিজে নিজে বসেছ সকলে

এভাবে থাকার মানে আমারই নিঃশব্দে ফিরে আসা
(কেউ কারো মতো নয়, বাবরের প্রার্থনা)

একালের কবিতা সবসময়ে সরলভাবে সরল কথা বলে না। সমাজ-জীবন ও ব্যক্তিমনের বহু জটিল গ্রন্থির পূর্ণ উন্মোচন আমাদের সাধ্যাতীত। আজকের কবিতা সেই 'জটিল জট' সহ জীবনকে স্পর্শ করতে চায়। সেখানেও কবির সহায় হয়েছে মহাপয়ারের গম্ভীর বিস্তার—

ওই কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ছুটে যায় হিম আর্তনাদ
মেহেদির বেড়া ভেঙে যুবতী জোয়ারে ঊর্ধ্বচারী
যেখানে শিরীষ শাখা বসন্তে ফুটিয়েছিল ফুল—
মেয়েটি উন্মাদ, তবু মা ওকে মেরো না অন্ধ ঘরে।

(সংখ্যা ৩৮, পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ)

বলাকার ছন্দের আদলে পর্ব-বিন্যাসে একালের বহু কবিই মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে ব্যবহার করেছেন। শঙ্খ ঘোষের আরো একটি স্মরণীয় দীর্ঘ কবিতা 'জাবাল সত্যকাম' (তুমি তো তেমন গৌরী নও) এইভাবে লেখা। তারই একটি অংশে একাল কিভাবে পুরাণকালের সঙ্গে মিশে গেছে শব্দ-যোজনা ও ছন্দ-নির্মাণের কৌশলে তা আমরা দেখতে পারি। পর্ববিভাগ সহ কবিতাংশটিদেখানো গেল—

"ছুটে সরে যাই দূরে / ঘরে পরে সদরে অন্দরে ৮+১০
কী আমার পরিচয়। মা ৮+২
শহরে ডকে ও গ্রামে / ফুলে ওঠে পরিশ্রম / গাছে ওড়ে রঙিন বেলুন ৮+৮+১০
কী আমার পরিচয় / মা ৮+২
ধরো নদীতীর শোনো / শব্দ যেন জমেছিল / জাহাজের সারি ৮+৮+৬
জেটিতে জুটায় ভালোবাসা। ১০
টন টন শস্যে মুখ / ঢেকে যায় রৌদ্রহীন / শস্যের শরীর গলে যায় ৮+৮+১০
কী আমার পরিচয় / মা ৮+২

কলাবৃত্তরীতির ছন্দকে যখন শঙ্খ ঘোষ ব্যবহার করেন, সেখানে চোখে পড়ে পর্ব বিভাজন রেখার অতিস্পষ্টতা। যুক্তব্যঞ্জনের জড়তা থেকে কলাবৃত্তের যে সম্ভাবনাকে মুক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার চূড়ান্ত ব্যবহার করে গেছেন নিজেই। পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার কলাবৃত্তে অভাবিতপূর্ব নমনীয়তা সঞ্চার করেছিলেন তিনি। সদরস্ট্রিটের সেই সূর্যোদয় দেখার দিন থেকে পৃথিবীর

রূপে-বর্ণে-ছন্দে সাজানো যে লাবণ্যময় শোভা দেখতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি—সেই ভাবটিই কলাবৃত্তের ঐ মৃদু-ললিত, নৃত্যপর প্রবহমানতায় অভিব্যঞ্জিত হয় সবচেয়ে ভালোভাবে। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ যখন সেই কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তখন প্রতিটি পর্বকে যেন আলাদাভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন সোজা—পরস্পরের দিকে হেলেদুলে পড়তে দেননি একেবারেই। উদাহরণ দিলে কথাটি পরিষ্কার হবে।

১. পাঁচমাত্রার কলাবৃত্ত—

একদা প্রাতে / কুঞ্জতলে / অন্ধ বালি / কা
পত্রপুটে / আনিয়া দিল / পুষ্পমালি / কা

—রবীন্দ্রনাথ

আমি কেবল / দেখেছি চোখ / চেয়ে
হারিয়ে গেল / স্বপ্নে দিশা / হারা
শ্রাবণময় / আকাশ ভাঙা / চোখ।

—শঙ্খ ঘোষ
(শ্লোক, প্রহরজোড়া ত্রিতাল)

২. ছয়মাত্রার কলাবৃত্ত—

কুঞ্জকুটিরে / অয়ি ভাবাকুল / লোচনা
ভূর্জপাতায় / নব গীত করো / রচনা

—রবীন্দ্রনাথ

দুপুরে-রুক্ষ / গাছের পাতার / কোমলতাগুলি / হারালে
তোমাকে বকব, / ভীষণ বকব / আড়ালে।

—শঙ্খ ঘোষ
(আড়ালে, দিনগুলি রাতগুলি)

৩. সাতমাত্রার কলাবৃত্ত—

হেথাও ওঠে চাঁদ / ছাদের পারে
প্রবেশ মাগে আলো / ঘরের দ্বারে

—রবীন্দ্রনাথ

ধ্বংস করে দাও / আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি / স্বপ্নে থাক।

—শঙ্খ ঘোষ
(বাবরের প্রার্থনা, বাবরের প্রার্থনা)

তিনটি উদাহরণেই শঙ্খ ঘোষের রচনায় রুদ্ধদলের স্বাভাবিক ও স্পষ্ট উচ্চারণ কবিতার ছন্দটিকে ধারণ করেছে একটু ভিন্ন স্বর-তরঙ্গে—যেন রুদ্ধ

পদক্ষেপে পথ চলা—হিল্লোলিত পদক্ষেপ-ভঙ্গিমা নয় একেবারেই! এমন হবার কারণ সম্ভবত এই—রবীন্দ্রনাথ বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক হলন্তদলকে পূর্ণ মূল্যে ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠের আবৃত্তি থেকেও বোঝা যায় যে কবিতা পাঠকালে একটু স্বরধ্বনি-প্রান্তিক উচ্চারণই তিনি পছন্দ করতেন, রুদ্ধ দলের চেয়ে মুক্তদলের সংখ্যাই তাঁর কবিতায় বেশি। রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিকভাবে এমন শব্দও বেশি ব্যবহার করতেন যাদের উচ্চারণ কথ্যভঙ্গিতে হলন্ত হলেও কবিতায় প্রায়ই স্বরান্ত হতে পারে।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিরা হলন্তদলের বিশিষ্টতা স্পষ্টতরভাবে রক্ষা করলেন। ফলে কলাবৃত্ত ছন্দকে রবীন্দ্র লেখনীর লীলাচাঞ্চল্য থেকে কিছুটা সরিয়ে এনে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে সবল পদক্ষেপে হেঁটে চলার রাস্তায়। পঞ্চাশের প্রায় সব কবিই একাজে সার্থক। শঙ্খ ঘোষের সার্থকতার আরো কিছু উদাহরণ—

ঝটপট ক'রে ক'হাজার হাঁস
ছিঁড়ে নিতে চায় এ ওর পালক—
বাতুল দুপুরে ডুগডুগি নিয়ে
গান গেয়ে যায় ভিখারি বালক।

(অ্যাম, প্রহর জোড়া ত্রিতাল)

এই অংশটিতে যুক্তব্যঞ্জন নেই বলে যদি প্রশ্ন তোলেন কেউ তাহলে প্রলুব্ধ হব আরও একটি উদ্ধৃতি দিতে—

ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস
কিন্তু মুখে জ্বলবে আলো
পদ্মাভসংকাশ
নেই কোনো সন্ত্রাস

('মার্চিং সং,' বাবরের প্রার্থনা)

বাক্‌স্পন্দকে কবিতায় প্রতিধ্বনিত করে তোলবার প্রসঙ্গ যখনই এসেছে তখনই কবি এবং ছান্দসিকেরা একমত হয়েছেন যে মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্তে এই কথা-উচ্চারণের ছন্দটি স্বাভাবিক ও সাবলীল হয়ে ওঠে। শঙ্খ ঘোষও এরকম কথাই বলেছেন তা আমরা আগে দেখেছি। কিন্তু, যেহেতু তাঁর মতে এই বাক্‌স্পন্দকে জয় করবার সাধনাই আধুনিক কবিদের ছন্দ-সাধনার অভিমুখীনতা—যে-ছন্দে বাক্‌স্পন্দ আগে বিশেষ প্রধান হয়ে ওঠেনি—সেখানেই তাকে ধ্বনিত করতে হবে—এমন একটি ইচ্ছা কবিদের থাকাই স্বাভাবিক। শঙ্খ ঘোষের সেই ইচ্ছা ছিল তা তাঁর কবিতায় প্রমাণিত। কলাবৃত্তের ছন্দের আধারে রচিত কবিতায়

বাক্‌স্পন্দে এত ব্যাপক পরীক্ষা বোধহয় আর কোনো কবি। করেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবির নৈপুণ্য বিস্ময়করভাবে সফল। তিনটি রচনাংশ দেখানো হল –

১. দুপুরে-রুক্ষ গাছের পাতায়
কোমলতাগুলি হারালে—
তোমাকে বকব, ভীষণ বকব
আড়ালে।

যখন যা চাই তখুনি তা চাই।
তা যদি না হবে তাহলে বাঁচাই
মিথ্যে,...

(আড়ালে, দিনগুলি রাতগুলি)

২. তুমি বলে গেলে আড়ালে অনেক কথা।
তারপরে যেই চলে গেলে ক্ষীণ আড়ালে—
এলেন আরেকজন,
বললেন, 'ও: অমুকবাবুর কথা।
আমি যদি ফিরি ডালে-ডালে তবে
উনি তো পাতায়-পাতায়'
বলে তিনি মেতে গেলেন মহোৎসবে।

(আলাপচারি, নিহিত পাতালছায়া)

৩. কথা বলেই বা কী হচ্ছিল
না-ই বললেন কথা—
চুপচাপ থেকে দেখুন না আজ
কদ্দূর যায় রথ।

ভিতরে ভিতরে ঘটছিল কত
জানতেন কিছু তার?
কে না জানে ওতে হতেও পারত
ঘোরতর সংকট।

(মহাজন, বাবরের প্রার্থনা)

শেষের রচনাংশটির প্রথম পঙক্তির 'কী' শব্দটিকে যে দুই মাত্রার পরিসরে উচ্চারণ করতে হবে তা আজকের পাঠক বুঝে নেন স্বাভাবিক ভাবে। পাঠককে এই অভ্যাস অর্জন করিয়েছেন শঙ্খ ঘোষের মত কবিরাই।

তবে নিপুণতা সত্ত্বেও কচিৎ কোথাও মনে হয় দক্ষতার তরবারি চালনা শেষ পর্যন্ত কবিতার কাব্যগুণ উদ্ভাসিত করে তোলার মূল সংগ্রামটি জয় করতে পারল না। 'বাবরের প্রার্থনা'র 'শৃঙ্খল' কবিতায় কবি লেখেন—

শব্দ কোরো না
হেসো না বাচ্চা
চুপ
হাত পা ছুঁড়ো না
দাঁত খুলে রাখো—
বাঃ

শাসকের সন্ত্রাসবাদের প্রতি বিদ্রূপের বাক্‌-ভঙ্গি অনিবার্য ভাবেই ফোটে। কিন্তু তারপর ঐ ভাবেই যখন কবিকে লিখতে দেখি—

সিঁড়ি থেকে সরো
সিঁড়ি থেকে নামো
খুপ—
রির মাঝখানে
মাথাগুঁজে ব'সো
পড়ো।

তখন ছন্দ তথা শব্দবিন্যাসকে কেবলই দক্ষতার চমক দেওয়া শব্দ খেলা বলে মনে হয় 'খুপরির' শব্দটিকে ওভাবে ভেঙে কবিতার সত্যিই কিছু প্রাপ্তি ঘটেনি। অনেক পাঠকেরই এরকম কখনো কখনো মনে হয় যে বিচিত্র বিন্যাসের কুশলতা আয়ত্তে আছে বলেই এই নিয়ে মাঝে মাঝেই একটু খেলাও করে ফ্যালেন। ছন্দ সজ্জার নিপুণতা কবিতার উপলব্ধির যথার্থ প্রকাশ না হয়ে একটু কৃত্রিমই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। তবে এরকম উদাহরণ কমই। কলাবৃত্তকে বহুব্যাপ্ত ও বহুমুখী পরিসর দানের সফলতা শঙ্খ ঘোষের অন্যতম কৃতি।

লোককবির ছড়ার ছন্দ থেকে শিষ্ট কবিতায় যখনই সৃষ্টি হল দলবৃত্ত ছন্দের তখনই তার সঙ্গে যুক্ত হল আধুনিক যুগের জটিল অনুভূতিসম্পন্ন প্রকাশভঙ্গি। দলবৃত্ত ছন্দে লিরিকের সজল-মধুর-সহাস-গভীর করুণ কথা বললেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পলাতকা-য়, 'ক্ষণিকা'য়। একালের কবি ছন্দটিকে বেশ তৈরি অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। শঙ্খ ঘোষের প্রথম যুগে লেখা কবিতা 'যমুনাবতী'তে আছে এই ছন্দের সুন্দর প্রয়োগ—

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা—

মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু-তিনটে গঙ্গা।

তীব্রতা আর কারুণ্যের সম্মিলনের বর্ণাভা এই অংশের ছন্দের ধ্বনিতেও অনুভূত হয়।

তেজস্বিতার ভঙ্গিটি দলবৃত্ত ছন্দে সহজেই ফোটে কিন্তু ভাব-গভীরতার ভিন্নতর তলেও শঙ্খ ঘোষ সহজেই নিয়ে যেতে পারেন আমাদের—এই ছন্দেই। চলমান জীবনের মূল বহমানতাকে স্পর্শ করেন যে গৃহত্যাগী—মূর্তি-মন্দিরের চাপে হাঁপিয়ে ওঠা তাঁর অন্তরাত্মাও প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই ছন্দে—

গলির ভিতর গলির ভিতর গলির ভিতর গলি
খোঁজে নিজের স্বর—
একটি কথা বলব, কিন্তু কোন্ গলাতে বলি
বিশ্বনাথের কেন্দ্রে আছে বিন্দু অনীশ্বর।
(সন্ন্যাস, প্রহরজোড়া ত্রিতাল)

আবার আর একটি কবিতায় দেখা যায়, কবি লিখেছেন—

পিঁপড়ে রে, তোর পাখা উঠুক
আমি যে আর সইতে পারি না!
সারিবন্দী সারিবন্দী সারিবন্দী মুখ
আমি যে আর দেখতে পারি না।
(পিঁপড়ে, নিহিত পাতাল ছায়া)

এখানে দলবৃত্ত-ছন্দ এতটাই নমনীয় যে তাকে কলাবৃত্তের উদাহরণও বলা যেতে পারে। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'সারিবন্দী' শব্দটিকে নিয়ে কলাবৃত্তের ছন্দোলিপিতে একটু অসুবিধে হয়। দলবৃত্ত ছন্দের রীতিতে রচনাংশটিতে ঠিকঠাক চতুর্মাত্রিক পর্ব পেয়ে যাই সর্বত্র। কলাবৃত্তের রীতিতে ছন্দোলিপি করতে গেলে প্রতিটি পঙ্‌ক্তিকে দুটি পর্বে ভাগ করে দ্বিতীয় পর্বে সর্বত্রই পাই পাঁচমাত্রা। কিন্তু প্রথম পর্বটির মাত্রা দাঁড়াবে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ছয় এবং পরবর্তী তিন পঙ্‌ক্তিতে পাঁচ। কাজেই রচনাংশটিকে দলবৃত্ত ছন্দে রচিত বলে ধরে নেওয়া সহজ। তবু কিন্তু পড়তে গেলে কলাবৃত্তের সুর এসে যাবেই বিশেষ করে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে। 'সারিবন্দী' শব্দটির উচ্চারণের ভঙ্গিতে পাঁচমাত্রা ছাপিয়ে যেন ছয় মাত্রার বিস্তারই

২ ১ ২ ১
এসে যায়—সা-রি-বন্-দী। কবিতার ভাবার্থের সঙ্গে এই উচ্চারণভঙ্গি যেন ওতপ্রোত। এইভাবেই এক ছন্দের আধারে ভিন্নতর ছন্দের সুর বেজে ওঠে একালের কবিতায় অথচ সুর কখনো কাটে না।

ছন্দের দিকে চোখ রেখে শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়লে পাঠক অনুভব করবেন যে ছন্দোহীনতায় অর্থাৎ গদ্য-রীতিতে চলে যাওয়া নয়, নিরূপিত ছন্দের বন্ধন

স্বীকার করেই তাকে মাঝে মাঝে ভিন্ন তালে, লয়ে ও স্পন্দে নাড়িয়ে দিতে পছন্দ করেন তিনি। নিজেও সেকথা বলেছেন অনেকবারই। এই আপাত-বিবাদী স্বরগুলির মধ্যে থেকেই যেন জাগে কবিতার ছন্দটির নিজস্ব প্রাণ—কবির উপলব্ধি স্রোতের যথার্থ সমান্তরালতা। এই ব্যতিক্রমী স্বরতরঙ্গের মুখোমুখি হয়ে পাঠক যদি ভাবেন—এ হল ছন্দ-পতন—তাহলে কবির অভিপ্রায়ের কাছাকাছি তাঁর পৌঁছনোই হবে না। জীবনের বিচিত্রতার অভিঘাতে কবিমানসে যে মিশ্রিত অনুভব-তরঙ্গ জাগবে তার যথার্থ আধার হতে গেলে কবিতার ছন্দকেও মাঝে মাঝে হয়ে উঠতে হবে বিমিশ্রিত—এই শিক্ষা কবি ও ছান্দসিক শঙ্খ ঘোষ বাংলা কবিতার পাঠককে নিঃসংশয় ভাবে দান করেছেন।

শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ

কবি হিসেবে শ্রীশঙ্খ ঘোষের যে খ্যাতি, প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর যে মান্যতা, অনুবাদক হিসেবে কিন্তু সেই পরিমাণ আকর্ষণ বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে নেই। থাকার কথাও নয়। অ্যাকাডেমিক অপরিণতমনস্কতায় বদ্ধ এই বাংলায় এর একটি কারণ হয়ত এই যে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তের যেমন 'প্রতিধ্বনি', শ্রীবিষ্ণু দের যেমন 'হে বিদেশী ফুল' (তুমি রবে কি বিদেশিনী) বা 'এলিয়টের কবিতা' কিংবা শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'বোদলেয়র : তার কবিতা' বা 'রিলকের কবিতা' বা 'হেল্ডারলীনের কবিতা' বা, শ্রীঅলোকরঞ্জনের 'প্রেমে পরবাসে', 'ব্রেখটের কবিতা', 'সুরদাস সঞ্চয়িতা,' এমন কোনো বহু বিজ্ঞাপিত, আলোচিত সংকলন তাঁর নেই। আর্থার ওয়েলি বা পাউণ্ড যেমন চীনা কবিতা, পাস্তেরনাক গ্যয়টে বা সেক্সপীয়র, চ্যাপম্যান যেমন হোমার, লিশম্যান যেমন রিলকে, অরুণ মিত্র যেমন ফরাসি কবিতা অনুবাদে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন, তেমন একজন কবি বা এক দেশের কবিতায় শঙ্খবাবু অভিনিবিষ্ট থাকেননি দীর্ঘকাল। তবে বিজ্ঞাপিত বা আলোচিত না হলেও কি সংকলন আদৌ নেই কিছু? আছে। অনূদিত কবিতা সংকলন 'বহুল দেবতা বহুস্বর' (এপ্রিল, ১৯৮৬)-এর কোনো বিজ্ঞাপন, কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি। নিকোলাস গিয়েন বাঙালি কবি বা কবিতা-প্রিয় পাঠকের কাছে কতটুকুই বা পরিচিত? (চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা, ১ম প্রকাশ ১৯৮০)? বরং 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' এবং গিরিশ কারনাডের 'হয়বদন'-এর কথা অনেকে জানেন। অথচ সন্ধিৎসু পাঠক যদি তথ্যসংগ্রহে নামেন তাহলে তাঁর চোখে পড়বে প্রায় ৯৩টি কবিতা ও নাটকের গান, একটি গদ্য বই (ওকাম্পোর লেখা), দুটি নাটক (হয়বদন, চারটি ছোট মেয়ে) ও একটি কাব্য (শাশ্বতের গান: ইকবাল)

কবে থেকে যে অনুবাদের এই বৈচিত্র্যময় জগতে তাঁর প্রবেশ, তা বলা

• পিকাসোর The Four Little Girls-এর আংশিক অনুবাদ বেরিয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 1982 (পৌষ-মাঘ ১৩৮৮) সংখ্যায়। এ ছাড়াও হানটের হাসান লেখকের একটি নাটকের অনুবাদ 'মানুষ' শিরোনামে ছিল 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় ৪৪ সংখ্যায়।

—সম্পাদক

শক্ত। অবশ্য সে প্রশ্ন জরুরিও নয় খুব বেশি। কারণ আমরা তো জানি, একজন যথার্থ সৃজনশীল কবি তাঁর কাব্যাকাশের নীলিমাকে প্রসারিত করতেই নিজেকে বারংবার উপস্থাপিত করেন বিশ্বকবিতার প্রাঙ্গণে। কোনো বিশেষ কবি বা কবিতার অনুবাদ সেই কবি বা কবিতার অন্তর্জগতে প্রবেশে যেমন, তেমনি সৃজনরহস্যের আভ্যন্তরীণ নির্মাণপদ্ধতি সম্পর্কে অনুবাদককে সাহায্য ক'রে থাকে। অনুবাদক যদি কবি হন তাহলে কবিতা রচনার জোয়ার এবং ভাটা দুই পর্বেই অনুবাদ কবিকে সাহায্য করে সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত ও নবসৃজনপ্রয়াসী, এমনকি ভিন্ন পথবর্তী হ'তে। হিমেনেথের রবীন্দ্র-অনুবাদ, বিষ্ণু দের এলিয়ট অনুবাদ, বুদ্ধদেবের বোদলেয়র অনুবাদ প্রভৃতি এ কথার প্রতিষ্ঠা দেয়। শ্রীঅরুণ মিত্র বা শ্রীশঙ্খ ঘোষের অনুবাদ প্রসঙ্গেও এ কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য।

আরো কয়েকটি তথ্য পাঠককে দেওয়া যাক। শ্রীশঙ্খ ঘোষের অনুবাদের ব্যাপকতা ও সামর্থ্যের পরিচয় প্রথম চোখে পড়তে থাকে যখন 'সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত' (১ম সং, ১৩৬২) নামক দিগন্তবিস্তারী অনুবাদের চমৎকার সংকলনটি আমাদের হাতে আসে। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীশঙ্খ ঘোষ ও শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যাঁরা দুজনেই প্রসিদ্ধ কবি। যেহেতু সংকলনটি ছিল নটি দেশ কেন্দ্রিক, সেহেতু প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য ছিল, তাই ভালোলাগা যেমন, তেমনি প্রয়োজনের তাগিদও তাঁকে (এবং অন্যদের) অনুবাদে প্রবৃত্ত করেছিল। তিনি নিজেও বলেন—"এদেশ-ওদেশের কবিতা থেকে অনুবাদ করেছি নানা সময়ে নানা রকমের প্রবর্তনায়, অনেকেই যেমন করেন। অনেকের মতো আমিও একথা জানি যে কবিতার ঠিকঠাক অনুবাদ হয় না কিছুতেই, তবু করতেও চাই অনুবাদ, ভালোলাগার টানে।[১]" এই নানা প্রবর্তনা ও ভালোলাগার টান দুই-ই কাজ করেছে, পরে-ও। পাঠকের কৌতূহল হতে পারে, শঙ্খবাবু কাদের কবিতা অনুবাদ করেছেন তা জানতে। গত ত্রিশ বছরে তাঁর অনুবাদের হিসেব নিলে দেখা যাবে এ পর্যন্ত তিনি তিনজন ভারতীয় কবি ও নাট্যকারের লেখা অনুবাদ করেছেন (চেরবান্দারাজু, ইকবাল, গিরিশ কারনাড)। অভারতীয় কবি ও কবিতার জগতে তাঁর পদচারণার হিসেব এইরকম :—ইংরেজ—২ (কবিতার সংখ্যা ২), জার্মান—১০ (ক. স.—২৪), স্পেনীয়—৪ (ক. স, ৬৪) রুশ—১ (ক. স.—১), ভিয়েতনামী—১ (ক. স. ২২), ফরাসি—২ (ক. স. ৫), চীনা—৩ (ক. স. ৩) জাপানী—১ (ক. স.—১)। সংখ্যার হিসেব দিয়ে নয়, তাঁর লেখালেখি নাড়াচাড়া করে কখনো মনে হবে স্পেনের প্রতি তার অনুরাগ বেশি, কখনো মনে হবে জার্মান। তবে এটা অস্পষ্ট নয়, যে কবিতায় অবয়বের কারুকৃতি বা প্রসঙ্গের অতিরেক

বিদ্যমান তেমন কবিতায় তাঁর আগ্রহ নেই। যে কবিতায় বহুভাষিতা, যাতে উচ্চরোল, তাতে তাঁর আগ্রহ নেই। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর করলে হয়ত চোখে পড়বে নেরুদা বা এলুয়ার, ব্রেখট বা চেরবান্দারাজু, হোচিমিন বা গিয়েন— এঁদের বিপ্লব-স্পন্দিত শিল্প সৃজনের দিকে তাঁর আছে এক অনতিপ্রচ্ছন্ন বিনতি। তবে যে কবিতায় রাজনীতি উচ্চকিত, প্রত্যক্ষ, তাতে তাঁর বিচরণ অনিচ্ছায়, যা অমার্জিত, মন চায় তার বর্জন। আর কলকাতার কিছু মানুষ জানেন এই অনাটকীয়, উচ্ছ্বাসরহিত, বাকসংযত, মৃদুভাষী মানুষটির সঙ্গে নাট্যজগতের যোগটা নিবিড়। কলকাতার ষাট ও সত্তর দশকের ব্রেখট-চর্চা তাঁকেও নিশ্চয়ই প্রাণিত করেছিল। পাঠক এটাও খেয়াল না করে পারেন না, কবিতা, কাব্যময় গদ্য অনুবাদের দিকেই তাঁর প্রবণতা বেশি। হয়ত কবিসত্তা নিয়ন্ত্রণ করেছে অনুবাদকের নির্বাচনকে। স্বভাব কবিত্বে বা তৃতে পাওয়া কবিত্বে তাঁর আস্থা নেই, তাই মাতলামির মাদ্দাসে ভেসে অনুবাদে নামতেও তাঁর আস্থা নেই। সার্থক অনুবাদের জন্য চাই অনুবাদ্য কবিতার ভাষা ও অনুষঙ্গ বিষয়ে জ্ঞান, অনুবাদ্য ও অনূদিত দুই কবিতার ভাষার শব্দ, ধ্বনিস্পন্দন, বাক্যবন্ধন বিষয়ে সতর্কতা এবং অভিধানের সঙ্গে পরিশ্রমময় মৈত্রী। এগুলো তাঁর আছে। তাছাড়া শ্রীযুক্ত ঘোষ নিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক, বহুবিষয়ী পাঠক এবং শব্দসচেতন কবি বলেই সার্থক অনুবাদের কিছু দুর্লভ পরিচয় সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন একবার বলেছিলেন অনুবাদে কিছু পাওয়া যায় না,[২] কোলরিজ যেমন বলতে চেয়েছিলেন কবিতার অনুবাদ অসম্ভব, তেমনি সুধীন্দ্রনাথও বলেন—"আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব।"[৩] এ কথা তেমনি জয়েসের, শঙ্খের, শঙ্খ-সমকালীন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের[৪]। একই কালের সমর্থক অনুবাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"সুবিহিত অছিদ্র অনুবাদ আমার দুঃসাধ্য[৫]।" আর শঙ্খ বলেন, "আমিও একথা জানি যে, কবিতার ঠিক অনুবাদ হয় না কিছুতেই[৬]।" রবার্ট গ্রেভস্ অনুবাদকে polite lie বলুন আর নবোকফ অনুবাদ নিয়ে যতই বিদ্রূপ করুন, বা ওক্টাভিয়ো পাজ অনুবাদকে মূলার্থবহ শব্দ-বন্ধনমাত্র বলুন, অনুবাদ না করে, অনুবাদ না পড়ে আমাদের উপায় নেই। "কার্যত দেখা গেছে, আমরা যারা রুশ, স্প্যানিশ, লাটিন, গ্রীক, চৈনিক প্রভৃতি ভাষা জানি না, তারাও সে-সব ভাষার কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারি দুটি-তিনটি অনুবাদ মিলিয়ে পড়লে, জানতে পাই কবির মন, কী তিনি বলতে চেয়েছেন, হয়তো তাঁর ভঙ্গিরও খানিকটা। মূলের অনেক রমণীয়তা নিশ্চয়ই বাদ পড়ে, কিন্তু যদি সে কবি শুধু শব্দের বেসাতি না-করে কিছু ব'লেও গিয়ে থাকেন—মোটের উপর এমন কোনো দামি জিনিশ পাওয়াই

যাবে, যা হয়তো আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যে নেই, আর যার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সেই সাহিত্যের স্ফূর্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।"[৭] ড্রাইডেন তিন রকমের অনুবাদের কথা বলেছিলেন—আক্ষরিক, অর্থানুগত এবং অনুকৃতি। ১৯৩৩-এ পাউণ্ড ভাষার তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যের (বিষয়কে দৃশ্যকল্পনার অন্তর্গত করে দেওয়া, ধ্বনি ও বাক্‌স্পন্দন যোগে অনুভবের যোগসাধন এবং পূর্বোক্ত দুইয়ের সাহায্যে পাঠকচেতনায় বুদ্ধি বা অনুভবের অনুষঙ্গ জাগরণ) কথা জানিয়ে বলেছিলেন দ্বিতীয়টি অনুবাদে আনা অসম্ভব, প্রথমটি সম্ভব হলেও তৃতীয়টির অভিপ্রায়টুকু মাত্র ধরা যায়।[৮] পূর্বোক্ত ধরণাগুলি ছাড়াও সংক্ষিপ্ত বা কর্তিত অনুবাদ, কবিতার গদ্য অনুবাদ, অর্থউপার্জনী অনুবাদ অবলম্বনে দেশীয় আবহময় অনুবাদের সঙ্গেও সাহিত্যপাঠকের পরিচয় আছে। আসলে মূল কবিতার ভাববস্তুর কোন অংশটি জরুরি, কী তিনি রূপান্তর করতে চান, কী চান বর্জন করতে—এ সম্পর্কে অনুবাদকের উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে প্রাথমিক ব্যাপার।

অনুবাদ ভাষার পবিত্র বিকাশকে এক পরীক্ষার মুখে নিয়ে আসে। তা হল উন্মোচনের পথে লুকোনো অর্থকে কতটা বাইরে আনা যায়, এই দুরূহ সম্পর্কে জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে তাকে কত ঘনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা যায়। সত্যকার অনুবাদ তো স্বচ্ছ, তা আবৃত করে রাখে না মূলকে, আড়াল করে না তার আলোকে, বরং নব সংযোজনে ভাষার শুদ্ধতা দিয়ে আরও বেশিমাত্রায় আলো ফেলে মূলের ওপরে। কিন্তু অনুবাদের প্রকার ভেদের বা উৎকর্ষের বৈচিত্র্য নিয়ে নয়, আপাতত পাঠক জানতে আগ্রহী শঙ্খ ঘোষ কোন ধরনের অনুবাদের পক্ষপাতী। যেটুকু বোঝা যাচ্ছে : তিনি অনুগত থাকতে চান মূল লেখাগুলির কাছে, খ) নিজভাষায় 'পাঠযোগ্য আর স্ফুরণময়' করে তুলতে চান, গ) অকারণ সম্প্রসারণকে প্রশ্রয় দিতে চান না, ঘ) দেশীয়করণের বিরোধী।[৯] শঙ্খ ঘোষ তাই অনুবাদ কথাটির পরিবর্তে 'অনুসর্জন' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। অরুণ মিত্র যেমন বলেন "মূলরচনার বক্তব্য, শৈলী, আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি তার ভাবমণ্ডল অনুবাদে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা অবশ্য কর্তব্য", তেমনি শঙ্খ বলেন "অনুবাদ্য কবিতার মূল নিশ্বাসের কাছে পৌঁছবার জন্য অনুবাদের ছন্দে শব্দে আনতে হয় তেমনি একটা তুলা-রীতি মাত্র।" আর একটা ব্যাপারে এঁরা দুজনেই সজাগ। তা হল "ছন্দ ও মিল অনেক কবিতার অমোঘ অস্ত্র। অনুবাদে তাদের যথাযথ রক্ষা করার প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে না। তবে অনুবাদে তাদের একটা সাদৃশ্য প্রবর্তন নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়।" কিন্তু ছন্দ ও মিল আনতে গেলে নতুন শব্দ যোজনা এবং মূলের শব্দ কিছু বর্জন না করে পারা যায় না। আর শঙ্খবাবু বলেন "ছন্দ আর মিল বজায় রেখে অনুবাদ

করতে গেলে অনুবাদক একধরণের বিপন্নতার মুখোমুখি হবেনই।" বুদ্ধদেব যেমন এ বিপন্নতার মুখোমুখি হয়ে ভাবগম্ভীর কবিতার জন্য আঠারোমাত্রার পয়ার, 'ফ্লয়র দ্যু মাল'-এর রতিমদির অসমান পঙ্‌ক্তির হিল্লোলিত স্তবকবিন্যাসে ব্যবহার করেছেন মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত বা মাঝে মাঝে বাউল ছন্দ ও সাতপাঁচের বিজোড় মাত্রা,[১০] শঙ্খ ঘোষও তেমনি আবহভিন্নতা অনুযায়ী তৎসম ও দেশজ শব্দ, অক্ষরবৃত্ত এবং বদলে মাত্রাবৃত্ত এবং কখনো স্বরবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। তবে সবক্ষেত্রে অরুণ মিত্রের মতো তাঁরও অন্বিষ্ট—অনূদিত কবতাকে বাংলা কবিতার স্বাদবহ করে তোলা। এক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস শব্দ নির্বাচনে, ছন্দ নির্বাচনে কিন্তু কখনই মূলকে ছাপিয়ে নয়। যেমন—(ক) শব্দ প্রয়োগে—পাঁচুই জুন (গিয়েন), চুলোয় যাচ্ছে (তু ফু-অং), খ) ব্রেখটের 'মা' নাটকের গানকে গীতযোগ্য মাত্রাবৃত্তে আনা, জার্মান গানের লয় হয়ত এমন নয়, গ) সাঁওতালি কবিতার কোনো কোনো কবিতায় সাঁওতালি নৃত্যছন্দকে ধরা, ঘ) ইকবালের "জাভেদনামা' অনুবাদে অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্তের বৈচিত্র্য ব্যবহার ইত্যাদি। লক্ষ্য যে শেষ পর্যন্ত বাংলা কবিতা করে তোলা তা বোঝা যায়। সক্রিয় অনুবাদকর্মী মাত্রেই জানেন কাজটা অত্যন্ত কঠিন। কারণ "কবিতার তো শব্দের শুধু অর্থগতমূল্য নেই, আছে ধ্বনিগত মূল্য-ও, তার আবেদন তো শুধু মনের কাছে নয়, অনুধাবনের কাছে নয়, তা কান, জিভ, তালুর কাছেও, আর কবিতাতে যে শব্দার্থগত ও ধ্বনিগত মূল্য, যে যৌক্তিক ও ইন্দ্রিয়গত মূল্য তা এত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত যে তাদের আলাদা করা যায় না[১১]।"

অরুণ মিত্র বা শঙ্খ ঘোষ যে নিজভাষার কবিতা হিসেবে পাঠযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে চান, সেখানেই এক প্রলোভন গড়ে ওঠে মাঝে মাঝে "যান্ত্রিক হবার তাগিদ" এবং মৌলিক হবার আহ্বান"-এর দ্বন্দ্বের মধ্যে।[১২] যাকে বেঞ্জামিন বলতে চান বিশ্বস্ততা ও স্বাধীনতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব। বিষ্ণু দের এলিয়ট অনুবাদ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ একেই বলতে চান "দেশীয়করণের সমস্যা।"[১৩] উদাহরণ হিসেবে বলেন Ash Wednesday হয়ে যায় বিষ্ণু দের অনুবাদে 'চড়কের গান', আসে তমাল উদ্যান, দ্বারকার নির্বাসন পালা, দেবকীমাতা, শ্রীরাধিকার কথা। 'গেরোনশন' কবিতায় খ্রীস্ট হয়ে যান কৃষ্ণ নরসিংহ, আসে পাঞ্চজন্য, কেশরী হুঙ্কার, বংশীরব। শঙ্খবাবু সঙ্গত প্রশ্নই তোলেন—"মূলের পুরাণকে বা অবয়বকে পালটে নিয়ে তাকে কি আমরা অনায়াস দেশীয়করণের দিকে পৌঁছে দিতে পারি?" তা অনুচিত। শঙ্খবাবুর অনুবাদ কবিতাগুলি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি এ পদ্ধতির আদৌ পক্ষপাতী নন, যা তাঁর সমবয়সী কেউ কেউ প্রশ্রয় দেন। বহু বিদেশী অনুষঙ্গ [যেমন—আসটেক

সমাধি, স্পুটনিক, অ্যাকোয়াওয়া, অক্সফোর্ড, (গিয়েনের কবিতা) ড্রাগন, চিংসি, লিউচু (হো চি মিন) ইত্যাদি] যেমন ছিল তেমন রেখেছেন। ব্যতিক্রম হাতে গোনা যাবে হয়ত। এমন দু একটি হল—(ক) নাই বললাম পি ডি অ্যাক্টের কথা (পাভেলের গান) (খ) বা কিছু মুহূর্তজীবী, বেনাহং নামৃতাস্যাম্ (আভেদনামা) (গ) 'হয়বদন-এ বুড়ো আংলার ব্যবহার (ঘ) দি ড্রাই স্যালভেয়েজেস'-এর 'সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্তের' অনুবাদে ছিল—"চৈত্রের দুয়ার প্রান্তে কৃষ্ণচূড়া সারিতে সে ছিল, / অথবা আমের গন্ধে জ্যৈষ্ঠের ভাঁড়ারে।" চৈত্রের এই বঙ্গীয় পরিমণ্ডল এলিয়টের কবিতায় ছিল না। তবে 'বহুল দেবতা বহু স্বর'-এ অন্তর্ভুক্ত করার সময় তিনি এই পরিমণ্ডল-প্রকাশী শব্দগুলি বাদ দেন। এ তাঁর সতর্কতার পরিচয় বহন করে। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যায় গত ত্রিশ বছরে অনুবাদেরও তিনি প্রায়শ পরিমার্জনা করেছেন। তাই 'দি ড্রাই স্যালভেজেস' পরে করা হয় 'দি ড্রাই স্যালোয়েজেস'। তাই কবিতাটির প্রথম ১৪ পংক্তির অনুবাদে অন্তত ৯টি পরিবর্তন আসে। তাই হো চি মিনের কবিতা 'হরবোলা' সংকলনে যখন ছিল তখন নাম ছিল না, সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ছিল, পরে নাম সংযুক্ত হয়, কবিতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। পাঠক এও লক্ষ করবেন 'সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত' কালের অনুবাদের থেকে ব্রেখট গিয়েন বা গিরিশের 'হয়বদন' অনুবাদে এসেছে অনেক বেশি অনাড়ষ্টতা, নমনীয়তা, শব্দের অব্যর্থ প্রয়োগ এবং মিল, বিন্যাসের চমৎকৃতি। কবি ও প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষের মতো অনুবাদকের এই বিকাশ, প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের ইতিবৃত্ত সপ্রশংস বিস্ময়ে লক্ষ করার মতো।

শঙ্খবাবুর অনুবাদের বিষয়ে সাধারণভাবে মন্তব্য করা স্থগিত রেখে আমরা বরং তার কিছু কিছু অনুবাদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইংরেজি দিয়েই শুরু করা যাক। এলিয়টের কাব্যপ্রবাহের এক বিশিষ্ট বাঁকের পরিচয় ধরা পড়েছে 'ফোর কোয়ার্টেস' কাব্যে, তার তৃতীয় কবিতাটির নাম 'দি ড্রাই স্যালভেজেস', 'নিউ ইংলিশ উইকলি' পত্রিকায় ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ বা প্রকাশিত হয় এবং ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার থেকে ওই বছরই ৪ঠা সেপ্টেম্বর কবিতাটি আলাদা ভাবেই মুদ্রিত হয়ে বেরোয়। ড্রাই স্যালভেজেস্ ম্যাসাচুসেটস-এর অন্তর্গত কেপ অ্যান-এর অদূরবর্তী এক পার্বত্য ভূমি, যেখানে এলিয়টের বাল্যস্মৃতি আছে সম্পৃক্ত হয়ে।

এই কাব্যে সবচেয়ে প্রবল যা তা হচ্ছে কালানুভূতি। মুহূর্ত ও মহাকাল নিয়ে বিস্তৃত চিন্তারই ফসল যেন এই দীর্ঘ 'চৌতাল' কাব্য। কালচক্রের মধ্যেই সব কিছু আবর্তিত, না মানুষই কালের নিয়ামক, এই প্রশ্ন নিয়ে কবি এখানে ভাবিত।"[১৪] এই কাব্যের চারটি কবিতাই পাঁচ অংশে বিভক্ত, তাতে

খ্রীষ্টীয় ধর্মভাবনা, গীতার আশ্বাসবাণী, দান্তের পারাডিসোর সুর-এর সঙ্গে বর্তমান বিভ্রান্ত পথিকের জন্য সময় ও জীবনার্থের তাৎপর্য সন্ধান মিলেমিশে আছে। কবিতাটি শক্ত বলেই অনুবাদকরা এটি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এমনকী সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দেও। দুটি অনুবাদ দেখার সুযোগ পেয়েছি। একটি শঙ্খ ঘোষের, অন্যটি জগন্নাথ চক্রবর্তীর। শঙ্খবাবুর অনুবাদটিই আমার বেশি ভালো লেগেছে। জগন্নাথবাবুর অনুবাদটি মূলানুগ হলেও আড়ষ্ট, এবং কবিতার স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ ও শব্দঝংকারের সুষম সম্বন্ধ ঘটেনি। একটু উদাহরণ দেওয়া যাক—I do not know much about gods; but I think that the river / Is a strong brown god—sullen, untamed and and intractable / Patient to some degree, at first recognised as a frontier / usefnl, untrustworthy, as a conveyor of commerce; / Then only a problem confornting the builderof the bridges. (পঙ্‌ক্তি ১—৫)

দেবতার কথা আমি জানি না বিশেষ; শুধু যেন মনে হয় এই
নদী এক সমর্থ ধূমল দেব, অনম্য, অবাধ্য, ক্রোধী,
কিছুদূর সহ্য করে সব, প্রথমে তো মনে হয় সীমাপট;
উপযোগী, কিন্তু নির্ভরতাহীন বাণিজ্যবাহিনী;
তার পরে একমাত্র দুরূহতা জানে শুধু সেতুর নির্মাতা।

(শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ)

দেবতা বিষয়ে আমি বিশেষ জানি না, তবু মনে হয়, নদী
পিঙ্গল দেবতা এক পরাক্রমী—গোমড়ামুখো, বন্য, একরোখা,
ধৈর্যশীলও বটে কিছু, প্রাথমিক পরিচিতি সীমান্ত হিসাবে,
বাণিজ্যিক আদান প্রদানে কাজে লাগে, যদিও নির্ভরযোগ্য নয় খুব,
তারপর সেতু নির্মাতার কাছে সে এক সমস্যা মাত্র, আর কিছু নয়।

(জগন্নাথ চক্রবর্তীর অনুবাদ)

পর্ব বিভাজনের মধ্য দিয়ে যে স্পন্দন ওঠে, যার আবার একটা লয় আছে সেটা জগন্নাথ বাবুর অনুবাদে মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়, ২য় পংক্তিতে 'গোমড়ামুখো' এবং ৪র্থ পংক্তিতে শেষের পাঁচটি শব্দের ব্যবহার তা বুঝিয়ে দেয়। যদিও দুজনেই ব্যবহার করেছেন ভিন্নভিন্ন অক্ষরবৃত্ত।[১৪ক]

কবিতাটির ৫ম পর্বে এসে এলিয়ট নিজেই পংক্তিগুলিকে ক্ষুদ্রতর করেন। এই দুলিয়ে দেওয়া অভিপ্রেত ছিল এলিয়টের, কারণ পূর্বের চারিটি পর্ব ধর্মতাত্ত্বিকতায় যথেষ্ট ভারাক্রান্ত। দুজন অনুবাদকই এ ব্যাপারে সচেতন। শঙ্খ স্বল্পতর মাত্রার (৫+৫+২) মাত্রাবৃত্তীয় পর্বের ব্যবহার করেছেন, জগন্নাথ বাবু নন—

মিলেছে এক অসম্ভব মিলে
ভিন্নতল সত্তা এইখানে,
বিজিত হলো, সম্মিলিত হলো
ভবিষ্যৎ অতীত এইখানে,
গতির কোনো উৎস নেই যার
যা-কিছু তবু চালিত অবিরত, (শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ)

অসম্ভব মিলন এখানে
বিভিন্ন সত্তার মধ্যে হয়েছে বাস্তব,
ভূত আর ভবিষ্যৎ
এখানে বিজিত, সম্প্রীত,
যেইখানে কর্ম মানে গতি
সে-বস্তুর যার আছে গতি
গতির উৎসটি কিন্তু নেই সেই বস্তুর ভেতরে—(জগন্নাথ চক্রবর্তীর অনুবাদ)

পঙ্‌ক্তি সংখ্যা তিনটি ক্ষেত্রে সাত থাকলেও মূল কবিতায় শব্দ-উৎসারিত ধ্বনি যেন মাত্রাবৃত্তের (৫ মাত্রার) দাবি তোলে। জগন্নাথবাবুর অনুবাদের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিও সেকথা বলে, যদিও ২য় ও ৭ম পঙ্‌ক্তিতে তিনি ৮।১০ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে তা কানে লাগে। শঙ্খের লেখাটি সামগ্রিক বিচারে কবিতাই হয়ে উঠেছে, কিন্তু জগন্নাথবাবুর অনুবাদটিতে কবিতার চলনকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিয়েছে গদ্যের ভঙ্গিমা। শঙ্খবাবুর অনুবাদের দু একটি জায়গা সম্পর্কে অবশ্য বলার আছে ;

The starfish, the horse-shoe crab, the whale's backbone ;
The pools where it offers to our curiosity
The more delicate algae and the sea anemone
It tosses up our losses, the torn seine,
The shattered lobsterpot, the broken oar
And the gear of foreign dead men. (১৯—২৪ পঙ্‌ক্তি)

শঙ্খবাবু লেখেন—

হাঙর, কাঁকড়ার খোল, প্রকাণ্ড তিমির শিরদাঁড়া ;
অথবা নিথর জলে সবার উৎসুক চোখে

ধরা পড়ে সমুদ্রের জলজউদ্ভিদ, প্রাণীকুল।
ছুঁড়ে দেয় আমাদের হৃত রত্নগুলি রত্নাকর
ছেঁড়া জাল, ভাঙা দাঁড়, বিধ্বস্ত বল্লম আর
ভিনদেশী মৃতদের জীর্ণ বাস।

আর এক জায়গায় তিনি করেন—

ভাসমান নায়ে ছিদ্র ত্রাসের
কী অনিবার্য ধ্বনি এসে লাগে নিথর শ্রুতিতে

মূলে ছিল—
In a drifting boat with a slow leakage,
The silent listening to the undeniable.

(২ পর্ব, ৬৪—৬৫ পঙ্‌ক্তি)

অতুষ্ট (unpropitiated) এবং business letters-এর বাংলা 'দলিলে দপ্তরে' সম্পর্কে মৃদু অস্বস্তি উড়ে যায় এই অনুবাদের সামগ্রিক সাফল্যে। এখানে শব্দ বোধ স্পষ্টত অভিযাত্রী ছন্দের দারুণ আকর্ষণে। আর সে অভিযান যে দারুণভাবে সফল, তাতে সন্দেহ নেই। ডিলান টমাসের একটি অনুবাদ আমরা পেয়েছি (ছিল কি এমন দিন), যা তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা নয় মোটেই। এ কবিতার পঙ্‌ক্তিবিন্যাস, ভাববস্তু আমাদের ভীষণভাবে মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটিকে। অনূদিত কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তি—'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা' তো জীবনানন্দের কবিতাটির শেষের আগের পংক্তি। হয়ত সাদৃশ্য দেখানোর কৌতূহলী শ্রম এখানে নিয়োজিত হয়েছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে ক্রন্টে পল রোবসন-এর গাওয়া একটি গানের অনুবাদ করেন তিনি, যা 'আমেরিকার জন্য গান' নামে প্রকাশিত। রোবসনের গায়কী আর বাঙলা গায়কীর পার্থক্যই স্বাভাবিক, আবার রোবসনের লেখাটির কাব্যগুণ বা প্রেরণা গুণও তেমন নয়। তাই মাত্রাবৃত্তের আশ্রয় জরুরি ছিল কি না এ প্রশ্ন উঠতে পারে। শব্দচয়নেও একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায়।

এবার প্রবেশ করা যাক জার্মান প্রান্তরে। 'সঙ্গীত গ্রন্থ থেকে' নামে হাইনের লেখা একটি তের পংক্তির কবিতা আমরা পাচ্ছি। প্রেম ও হৃদয় বিনিময়ের বেহিসেবী ব্যবহারের কবিতা। প্রেমের কবিতা হিসেবেও খুব একটা উচ্চাঙ্গের নয়। 'স্তোত্র' কবিতাটি হাইনের নাস্তিতদের দলভুক্তি, জার্মান

জনগণ, মানবতার শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামের কবিতা। অনূদিত কয়েকটি পংক্তি এইরকম—

"তরবারি আমি, আমি শিখা।
অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমিই পথ করেছি আলো, আর যখন
লড়াই শুরু হল, যুদ্ধ করেছি একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে।"

গদ্যভঙ্গির মধ্য দিয়ে সংগ্রামী মনোভাবটা ফুটে ওঠে বেশিমাত্রায়। সুধীন্দ্রীয় হাইনে অনুবাদ আমাদের বিশেষ একটি ধরনের সঙ্গেই মাত্র পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

নানা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক টানে ষাটের দশক থেকে ব্রেখটের কবিতা, ব্রেখটের নাটক বাঙালি পাঠক ও শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করে অধিকতর মাত্রায়। শঙ্খবাবু ব্রেখটের অনেকগুলো রচনা অনুবাদ করেছেন। তার কিছু কবিতা রূপে পরিচিত, আর কিছু নাটকের গান, যদিও বাংলা ব্রেখট বিষয়ক সংকলনে পরিচয়-বিচ্ছিন্ন কবিতারূপেও উপস্থাপিত। 'শয়তানের মুখোশ' পাঁচ পঙ্‌ক্তির ছোট্ট কবিতা, যাতে ব্রেখটীয় চাপা ব্যঙ্গ ধরা যায়। 'a japanese carving'-এর বাংলা 'জাপানি খেলনা' একটু কানে লাগে। 'বই পোড়ানোর উৎসব' ১৯৩৩, ১০ই মে বার্লিনের এক দুর্যোগের স্মৃতিবাহী কবিতা। সত্যনিষ্ঠ লেখককে অব্যাহতি দিয়ে জনচক্ষে হেয় করে তোলার শ্লেষটা এখানে ব্রেখটের অভিষ্ট। এ কবিতাটি উৎপল দত্তও অনুবাদ করেছেন। দুজনের অনুবাদই চিত্রকল্প স্থাপনায় স্বাধীনতা নেয়নি। তবে উৎপল দত্ত অহেতুক নাটকীয়তার ব্যবহার করেছেন। যেমন—দশম পঙ্‌ক্তিতে—

"এমন করেনা, ছিঃ"—মূলে নেই।

'গড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন' কবিতায় ব্রেখট অনেক প্রশ্নের মাধ্যমে যারা সভ্যতার পিলসুজ তাদের অবদানের স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই কবিতাটির একটি অনুবাদ করেছিলেন দীপেন্দু চক্রবর্তী। দুজনের অনুবাদই ভালো। দীপেন্দু একটু ছন্দাশ্রয়ী, শঙ্খ একটু গদ্যাশ্রয়ী এই যা তফাৎ। মজুরের জীবন এখানে আশ্রয় ব'লে ভাষার মধ্যেও সে বৈশিষ্ট্য ধরার চেষ্টা আছে। 'অজেয় লিপি' কবিতায় এক কাহিনীর আভাসে ব্যক্তিত হয়েছে লেনিন ও লেনিনবাদের অপ্রতিরোধ্য অবিনশ্বর তাৎপর্য। একটাও নাট্যক্রিয়া এবং জারগন ব্যবহার না করে লেনিনবাদের চিরঞ্জীবীত্ব অনুবাদকও বাজায় রাখতে পারেন বাংলা ভাষাতে। 'মানবধর্ম' কবিতায় আছে সমকালীন জীবনের অসততা, ভাঁওতা ও মিথ্যের সব ভরপুর, ৮টি স্তবকের ২য়, ৪র্থের মিলবিন্যাসে তা অনুবাদ

পাঠকের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অনুরণন তোলে। 'প্রশ্ন' নামক সনেটটিতে কবি অষ্টকের সীমানা ভেঙে নটি পঙ্‌ক্তিতে সাজালেও কবিতার প্রথমাংশের প্রশ্নময়তা চমৎকার ফুটেছে, মিলের বিন্যাসও সনেটধর্ম অনুযায়ী। ষটকে খুব সামান্য স্বাধীনতা থাকলেও কবিতা হয়ে উঠতে, আবার মূলের স্বাদ অক্ষুণ্ণ রাখতে তা মোটেই বাধা সৃষ্টি করেনি। 'শ্রমিক অভিনেতাদের উদ্দেশে' দীর্ঘ কবিতা। এখানে দর্শকরা অভিনেতাদের প্রস্তুত ও পরিস্রুত হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করছে—

"আমরা বলি নিজেদের পালটে নাও তোমরা, আর মানুষের পৃথিবী যেমন যেভাবে গড়েছে তাকে লোকে আর পালটাতেও পারে তাকে যেরকম ভাবে তেমনি দেখাও তাকে।"

এই যে "বেঁচে থাকা মানুষের কাছে" "শেখার শুরু" এর বিস্তৃত সহায়তা যারা "বিব্রত, নির্যাতিত, পরাধীন, শোষিত" তাদের হাতে—এর সাবলীল অনুবাদ আমাদের, বাঙালী দর্শকের বাঙ্ময়তা হয়ে উঠতে পারে বাঙালি অভিনেতাদের উদ্দেশে।

ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাস অবলম্বনে ব্রেখট লেখেন Die Mutter (১৯৩০-৩১) যা অনেকবছর পরে বাংলায় অনুবাদ করেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও বাসবী রায়। এর গান ও কবিতা অংশের অনুবাদ শঙ্খ ঘোষের। কলকাতার ব্রেখট উন্মাদনা, নতুন নাট্যরীতি সন্ধানের আগ্রহ, অন্য অনেকের মতো শঙ্খ ঘোষকেও যে অনুবাদে আগ্রহী করেছিল সেটা দেখা যায়। দু একটি নমুনা দেখা যাক। তৃতীয় দৃশ্যের গান—"ছেঁড়া জামার গান।" এখানে 'কোট'কে অনুবাদক করেছেন 'জামা।' কোথাও কোথাও সামান্য পরিবর্তন (যেমন ২৩—৩০ পংক্তি) বিন্যাসে থাকলেও বিষয় / প্রসঙ্গগত ভিন্নতা নেই। তবে ১৯৭২-এর অনুবাদে বাংলা গান হয়ে ওঠার যে ত্রুটি ছিল ১৯৮৬-র প্রকাশিত অনুবাদে তা অনেকটা মুক্ত হয়েছে দেখা যায়। ষষ্ঠ দৃশ্যে আছে একটি গান, শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে যা 'মায়ের গান :' কম্যুনিজমের গুণকীর্তন' নামে প্রকাশিত। অতি চমৎকার অনুবাদের খানিকটা এইরকম :

"এ-পথটাই ঠিক, সবাই বোঝে। সহজ।
তুমিও যদি হুজুর না হও, ঠিক বুঝবে।
এতেই তোমার ভালো ; ব্যাপারটা সব জানো
নষ্ট একে নষ্ট বলে বোকায় বলে বোকা
এতেই বরং নষ্ট হবে বোকামি-নষ্টামি।"

ইংরেজি অনুবাদের বড়ো পংক্তিগুলোকে ছোট করে নেওয়া সম্ভব হওয়ায়

যেমন আন্দোলিত ভঙ্গিটা আসে, তেমনি বাংলা গীতযোগ্যতা বাড়ে। ষষ্ঠ দৃশ্যেই আছে বিপ্লবী শ্রমিকদের আর একটি গান, শঙ্খের ভাষায়—"লেখাপড়ার গুণকীর্তন।' অনুবাদটি মোটের ওপর ভালো, সূচনা ও সমাপ্তি অংশে তিনি একটু স্বাধীনতা নিয়েছেন।

Learn what is easiest, for all
Thos whose day has came at last
It is not too late ! (Steve Gooch-এর অনুবাদ)
গোড়ার থেকে পড়ো
দল চালাতে হবে তোমায়, পড়ো
দেরি হয়নি, পড়ো (শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ)

সহজতম জিনিসগুলি শেখো ! যে-তোমার
দিন আগেই এসেছে,
এখনো শেখার সময় যায়নি, কখনো যাবে না।
(লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদ)

লোকনাথের অনুবাদেও ২য় পঙ্‌ক্তি ভিন্ন হয়ে গেছে। শঙ্খের পূর্বাপর ছন্দোবদ্ধতা লোকনাথে নেই, তাই গান হিসাবে ব্যবহারে অসুবিধা প্রকট। শেষের তিন পঙ্‌ক্তি সম্পর্কেও অস্বস্তির কথা উঠবে হয়ত।

Point with your fiinger at every item
Ask how it comes to be there.
It's yon who'll have to give the orders.
(Steve Gooch)

আঙুল ছুঁয়ে সবকিছুকে ধরো।
শুধাও : কোথায় পেলে ?
হাল ধরতে হবে তোমায় ধরো ! (শঙ্খ ঘোষ)

সত্যিই ছন্দান্বিত করার সংকট বিষম।

৭ম দৃশ্যে 'পাভেলের গান' অনুবাদ হিসেবে অধিকাংশ অংশে খুব সুন্দর এবং মূলানুগ। ২য় পঙ্‌ক্তিতে fortresses এর জায়গায় 'প্রায়শ্চিত্ত', ৩য় পঙ্‌ক্তিতে

welfare institutions-এর জায়গায় পি. ডি. অ্যাক্টের কথা ভালো লাগে নি। তবে ২য় ও ৩য় অনুচ্ছেদ অনবদ্য।

"ওদের হাতে কাগজ, ছাপাখানা
ওদের হাতেই কণ্ঠরোধ, মার
(না-ই বললাম রাজাউজীরের কথা।)
পাণ্ডা পুরুত মাস্টারেরাও হাতে।
পয়সা কড়ি কামায় হুকুম ধরে থামায়
বেশ তো, কীই-বা তাতে।
সত্যে ওদের এতই কি ভয় তবে ?
ধ্বংস হয়ে যাবার আগে (খুব দেরি নেই তার)
দেখবে ওরা কীর্তি ওদের সমস্ত চুরমার।" (২য় স্তবক)

এই অংশ একেবারে মূলানুগ, বাড়তি পাওনা বাংলা ছন্দে ধরে দেওয়া অন্ত্যমিল এবং পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে পর্যাপ্ত মিল অনুবাদকের সামর্থ্যকেই তুলে ধরে। এই হল অন্য ভাষার mind's speech এবং poetic nuanceকে অন্য ভাষায় ধরে দেবার কৃতিত্ব। এই প্রশংসা প্রযোজ্য ১১নং দৃশ্যে 'বিপ্লবী শ্রমিকদের গান' এবং ১৪নং দৃশ্যে 'মায়ের আবৃত্তি' অংশের ক্ষেত্রেও। যদিও ব্রেখটের এ নাটকটি এদেশে একেবারেই মঞ্চসফল নয়, তথাপি ভালো সম্ভবনা তৈরি থাকে এমন অনুবাদে, যা অনেক নাট্যকর্মীর হয়ত জানা নেই।

ব্রেখট ছাড়াও তিনি আরও কিছু জার্মান কবিতা অনুবাদ করেছেন। গুন্টের গ্রাস-এর 'ডিম্ববর্তী ভাইসব' গদ্যাত্মক ভঙ্গিতে মুরগির ডিমের প্রতীকে জার্মানির এককালীন সাধারণ মানুষের কথা। এর অনুবাদে শঙ্খবাবু কিছু টিপিক্যাল বাঙলা শব্দ ব্যবহার করেন, বাঙলা কবিতার অন্তর্গত করার জন্য। যেমন—তা দিচ্ছে, বাহাত্তুরে খোকারা, আঁকিবুকি ইত্যাদি। স্তেফান গেয়র্গে-র 'প্রত্যাবর্তন, তৎসম শব্দবহুল, পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত, প্রতি স্তবকে ১ম, ৩য় পঙ্‌ক্তি সমহ্রস্ব, ২য়, ৪র্থ তুলনায় সম-দীর্ঘ। অন্ত্যমিল বিন্যাস অনিয়মিত। গেওর্গ হেইম-এর 'যুদ্ধ (১৯১১)' কবিতাটিও তৎসম শব্দবহুল, দশটি স্তবকে বিন্যস্ত, প্রতি স্তবক চার পংক্তি এবং ১ম, ২য়, ৩য় ৪র্থে অন্ত্যমিলযুক্ত। পল সেলান এর 'মৃত্যুরাগিণী', গদ্যপ্রতিম পঙ্‌ক্তির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে কাব্যময় অন্তঃস্পন্দন, একটি পংক্তি ধ্রুবপদের মতো ঘুরে ঘুরে আসে প্রতিটি স্তবকে। আর লক্ষণীয়, অনুবাদক শেষ পঙ্‌ক্তিতে ছাড়া আর কোথাও যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন না।

ষাটের দশক যদি শব্দ বোধের কাছে হয় জার্মান কবিতার তবে সত্তরের

দশককে বলা যেতে পারে তৃতীয় বিশ্বের এবং স্পেনীয় কবিতার অনুবাদের কাল। আমাদের জানা আছে যে ষাটের দশকে তিনি অজার্মান কবিতারও অনুবাদ করেছেন, জানা আছে সত্তরে করেছেন অস্পেনীয় কবিতারও অনুবাদ। তবু সমান্তরঙ্গের অভিঘাত একেবারে অস্বীকার করা যাবে না, যায় না। আমাদের কাছে অপরিচিত কবি প্রাৎসা-র একটি কবিতা 'বসন্ত' পড়তে পাই 'সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত' কাব্য সংকলনে। তিন স্তবকের অসম পঙ্‌ক্তিযুক্ত মিলহীন রচনাটিতে বিগতযৌবন প্রৌঢ়ের বসন্তস্মৃতির বেদনা খুব একটা খারাপ ধরা পড়েনি। এর পরই নাম করতে হয় চিলির কবি পাবলো নেরুদার। সদ্য উল্লিখিত সংকলনে আছে 'সাঁজাই' —নেরুদার কবিধর্মের মূল সুরকে ধরত কষ্ট হয় না। মানুষের প্রসঙ্গে উদ্ভিদ ও অরণ্যের চিত্রলতাকে জড়িয়ে দেওয়া এবং শূন্যতার মধ্যেও নিরবধি বেঁচে থাকার ইচ্ছা ধ্বনিত অনুবাদেও। এ কবিতাটিও গদ্যছন্দে লেখা, নেরুদার ধরনও অধিকাংশত তাই। নেরুদার আর একটি কবিতা Explico algunas cosas (দুচার কথা বুঝিয়ে বলি) তিনি অনুবাদ করেছেন, যা ১৯৮৮-র একটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটি Residencia en La tierra-র ৩য় খণ্ডের অংশ। এখানে কবি আলঙ্কারিক ভাষায় তাঁর সাহিত্য জীবনের পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের, জীবনার্থ সন্ধানের, স্পেনযুদ্ধে সক্রিয়তার, প্রিয় বন্ধুদের মৃত্যু ও নিগ্রহের কথা বলেছেন। শুদ্ধ কবিতাবাদীদের বিরোধিতা, স্পেনযুদ্ধের অপ্রতিরোধ্য অভিঘাতের দিক থেকে নেরুদার কবিতাবলির মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা সন্দেহ নেই। বাংলায় শঙ্খ ঘোষ ছাড়াও এ কবিতাটি অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অশোক রাহা প্রমুখ। শঙ্খবাবুর অনুবাদটির কিছু জায়গা মনে বেশ অস্বস্তি জাগায়। (নেরুদার অনুবাদ 'বহুল দেবতা বহু স্বর-এ নেই কেন জানি না।)

নেরুদার সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত কবি আন্তোনিও মাচাদো, যিনি 'সত্যের জন্য শিল্প'-তত্ত্বের এককালীন প্রবক্তা, তাঁর একটি কবিতা শঙ্খ অনুবাদ করেছিলেন। 'কবিতা' নামের চার স্তবকের এই কবিতায় এক ঝলমলে বাগান ও ঝরনাতলায় এক বিষাদময়ী সুন্দরীর কলসি ভরতে আসার চিত্রলতা রচনা করেছেন, যা বাঙালির কাছে বেমানান লাগবে না। এর মাঝে-মধ্যে অন্ত্যমিল ও অসম স্তবকবিন্যাস হয়ত মূলের দাবি মেটায়।

স্পেনীয় কবিতা অনুবাদের সূত্রে কিউবার প্রখ্যাত কবি নিকোলাস গিয়েনের লেখা কিছু কবিতার অনুবাদের উল্লেখ করব। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে যাঁর কবিজীবন, যিনি কালো মানুষদের কালো জীবনকে করে তুলেছিলেন তাঁর কবিতার বিষয়, লোকজীবনের রীদম ও নিগৃহীতের ঐতিহ্য ও পীড়নের

প্রেক্ষাপটকে যিনি স্ফুরিত ব্যঙ্গে বিষয় করে তোলেন তাঁর কবিতায়, যাঁকে বলা হয়ে থাকে লাতিন আমেরিকার 'কালো হোমার', সেই নিকোলাস গিয়েনের আস্ত একটি বইই শঙ্খবাবু অনুবাদ করে ফেলেন। বইটির নাম EL Gran Zoo যা ১৯৬৭ সালে স্পেনীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়, ইংরেজি অনুবাদ মেলে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। শঙ্খ ঘোষের বইটিতে আছে EL GRAN ZOO-এর ৩৭টি কবিতা (২টি বাদে) এবং অন্যান্য বই থেকে ১৯টি। 'মহা-চিড়িয়াখানা' নামের এই ছোট্ট বাক্‌বৈদগ্ধ্যময় বইটিতে পুঁজিবাদী পৃথিবী সম্পর্কে ব্যঙ্গপ্রবণ ভঙ্গি আছে। চিড়িয়াখানা ও প্রাণী, অধ্যক্ষ ও দিদিমণি, বাগ্মী ও প্রাগিতিহাসের জাদুঘর প্রতীকী তাৎপর্য পায় এখানে। কিউবার প্রতি আপসহীন আনুগত্য, লোভ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রত্যাখ্যান, এবং কালো মানুষদের মুক্তিকামিতার কথা যে এখানেও ব্যঞ্জিত, তা ধরা না গেলে, কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য এই কবির বাতিস্তার কিউবা থেকে নির্বাসনের তাৎপর্য বইটির সঙ্গে যুক্ত না করলে আলোচ্য বইটির প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিকতাকে বোঝা যাবে না।

সাধারণভাবে বলে নিই এ বইয়ের অনুবাদগুলি এককথায় অপূর্ব। মূলেও ছিল ছোট ছোট পঙ্‌ক্তি, কখনও বা ফ্রি ভার্সের মতো। ভাষার আটপৌরে ভঙ্গি শঙ্খবাবু আনতে পেরেছেন অনুবাদে। পাউণ্ড যে অনূদিত শব্দে বিদ্যুৎ সঞ্চারের, কিছু বৈশিষ্ট্য ও তোজোময়ত উৎপাদনের কথা বলেছেন তা এখানে চমৎকার মিলে যায়। যদিও গিয়েন-এর অন্য ধাঁচের কিছু কবিতা মানবেন্দ্র আমাদের পড়িয়েছেন, কিন্তু শঙ্খবাবুর বইটি থেকেই আমরা কিউবার মতো দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় একজন কবির রচনার সঙ্গে পরিচিত হলাম, আগ্রহ বাড়ল গিয়েন-এর অন্যান্য কবিতা পাঠের জন্য। এ হল এক সভ্যতাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া, তার সঙ্গে মিশে থাকল কবির নিজ-স্বরের প্রসারণ—যেমন বলেন চার্লস টমলিনসন The Oxford Book of Verse in English Translation-এর ভূমিকায়। যা হোক, মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে গিয়ে সামান্য দু-এক জায়গায় অস্বস্তি জেগেছে। যদিও সার্থকতার শক্তিমত্তাকে ছাপিয়ে তা কখনোই বড়ো হয়ে ওঠে না।

'Tenor' কবিতাটির 'বেহালা' নামটি ভালো লাগল না। 'মেট্রোপলিটানা' নিশ্চয়ই ছাপার ভুল। El chulo (দালাল) কবিতার ৩য় পঙ্‌ক্তিটি বাদ দেওয়ার যুক্তি বোঝা গেল না। Aviso: Gran Zoo De la Ilubana (ঘোষণা: হাভানার চিড়িয়াখানা) কবিতাটির ৩য় পঙ্‌ক্তি মূলে ছিল—

La gran paloma fo´sil del jura´sico

The Great bird fossil of the jurassic period—(Robert marquez-এর অনুবাদ)

জুরা পাহাড়ের বিরাট পাখির ফসিল—শঙ্খ

একটু আলাদা নয় কি ?

আর একটি পংক্তি—

máscaras rituales de forma antiaerolitica

ritual masks of the anti-atmospheric type,

আনুষ্ঠানিক মহাশূন্যের মুখোশ—শঙ্খ (R. M. এর অনুবাদ)

'Angela Davis' কবিতাটির অনুবাদ মোটের ওপর সুন্দর, মূলানুগ, কবিতার স্পিরিটটা ধরা পড়েছে ঠিকই। তবে rustproof impulse 'অমলিন তোমার আবেগ' বললে স্বাদের বদল হয়ে যায়, যেমন হয় a la intemperie (যার অর্থ out-doors) কে unsheltered air বা 'দিশেহারা বাতাস' করলে।

perteneces
a esa clase de suenos en que el tiempo
siempre ha fundido sus estatuas
you belong to
that class of dreams in which time
has always forged its statues—R. M. এর অনুবাদ

এর অনুবাদ শঙ্খবাবু যখন করেন—

"আছো তুমি
স্বপ্নের ভিতর দেশে, যেখানে সময়
চিহ্ন রেখে যায় তার"

তখন অনেক কিছু হারিয়ে যায়।

'চিড়িয়াখানা' অংশের তুলনায় 'অন্যান্য কবিতা' অংশে রাজনৈতিক স্বর তুলনায় অপ্রচ্ছন্ন। এখানে কালো মানুষের বেদনা (ধাঁধা, আখ, নিউইয়র্কে এক নিগ্রোর গান) তেমনি উদাসীন মানবতার ওপর কশাঘাত (জবাব দাও তুমি) অনুবাদেও ধরা পড়ে। কোথাও লোকগীতি, লোকগাথার আবহ খানিকটা লোরকার ভঙ্গিতে (শোকে বাঁধা গিটার), কোথাও লোকজীবনের শব্দস্পন্দন (সেন্ সেমায়, আ)। বাংলা কবিতায় তা সঞ্চার করে দেওয়া অত সহজ নয়। বিশেষ করে শেষোক্ত কবিতাটিতে শব্দ ও ধ্বনির সহোদরত্ব এবং ছন্দের দোলা

যেভাবে আনা গেছে, তা নিঃসন্দেহে এক আদর্শ উদাহরণ। এ যেন মূলের বিদ্যুৎদীপ্তিকে ভিন্ন ভাষায় সঞ্চারের দক্ষতা।

ফরাসি কবিতা অনুবাদের স্পষ্টতা দেখে মনে হয়, এই কবিতার জগৎকে অনুবাদে ধরতে তাঁর আগ্রহ কম। বাংলায় নয় নয় করেও ফরাসি অনুবাদের একটা ঐতিহ্য তৈরি হয়ে গেছে। সেখানে অরুণ মিত্র, লোকনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞ সক্রিয় আছেন। তাই যে কবিতার জগৎ তুলনায় উপেক্ষিত বা আজও অস্পষ্ট অথচ যার সাহিত্যমূল্য তর্কাতীতএমন জগতে বিচরণে তাঁর পক্ষপাত। অনুবাদের জন্য তাঁর নির্বাচিত কবিতাগুলির একটা বড়ো অংশ প্রচলিত সংকলনগুলিতে নেই। সে যাই হোক, মুষ্টিমেয় ফরাসি অনুবাদ কবিতার মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় পল এলুয়ার-এর 'মানুষের মাপ' কবিতাটির (অনুবাদে সহযোগিনী শ্রীমতী শুভা দাশগুপ্ত) যা ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি স্পেন গৃহযুদ্ধের ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের যোদ্ধা কর্নেল ফাবিয়ঁ'র স্মৃতিতে রচিত! পাঁচটি অসম স্তবকে কোনো যতিচিহ্ন নেই, আর গদ্যছন্দের সেতু বেয়ে "চিরন্তনের জন্য/ একেবারে আদর্শ এক মানুষ"-এর, দুর্দিনেও ভালোবাসা ও জীবনকে শ্রদ্ধার প্রসঙ্গকে এলুয়ার ছড়িয়ে দেন 'আগামী দিনের মানুষের জন্য।' অনাড়ষ্ট অনুবাদে তা ধরতে কোনো কষ্ট হয় না। জ্যাক প্রেভের-এর পাঁচটা কবিতা তিনি অনুবাদ করেন। 'পারিবারিক' কবিতাটি মিলিয়ে দেখা গেল মূলানুগ। চলতি কথার ছলে জীবন সম্পর্কে, যুদ্ধ সম্পর্কে শ্লেষ অনুবাদেও ধরা গেছে। এই কবিতাটি অরুণ মিত্রও অনুবাদ করেছেন। দুটি অনুবাদের ভাষাতেই রূপকথা-প্রতিম সারল্য আছে, তবে অরুণ মিত্রের অনুবাদটি যেন একটু গদ্যের দিকে, শঙ্খের অনুবাদটি সামান্য একটু পদ্যের দিকে ঝোঁকে। তাই প্রথমজন 'গোরস্তান' এবং দ্বিতীয় জন 'কবর' কথাটি ব্যবহার করেন, প্রথম জন লেখেন 'যুদ্ধ টিঁকে থাকে মা টিঁকে থাকে সে উল বোনে', দ্বিতীয় জন লেখেন 'যুদ্ধ চলছেই মাও চলছেন, তিনি বুনছেন।' অরুণ মিত্রের আরও প্রভের অনুবাদ থেকে মনে হয় গদ্যের চালটাই এখানে বেশি হবে, ভেতরে একটা লয়কারী অনুভব করা যাবে। 'কনডাক্টর' কবিতাটিতে ব্যক্তির নির্দেশ ও চালন যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যদিও অনুবাদে ছন্দের কিছু আতিশয্য ধরা পড়ে। তবে এই স্বরায়ণ শঙ্খের অন্তত তিনটি কবিতা মনে পড়ায়। সে তিনটি হল 'নিহিত পাতাল ছায়া'র 'ভিড়', 'রাস্তা' এবং 'সাপ সৃষ্টি করুন' (বাবরের প্রার্থনা)। 'গান' কবিতার স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের সহাবস্থান এবং 'হেমন্ত' কবিতার শব্দ যোজনার ভঙ্গি শঙ্খের কবিতায় দুর্লক্ষ্য নয়।

১৯৬৫ সালে 'এক্ষণ' পত্রিকায় দান্তের রচনাপঞ্জী সংকলন ছাড়াও একটি

চিঠি এবং 'ভিতা নুওভা' থেকে সংলগ্ন দুটি অংশ অনুবাদ করেন। প্রথমাংশ গদ্যে, যার অনুভব দান্তের কাল পেরিয়ে আজকেরও—"এক বছর হলো তার চিরন্তনতার দিন, আমি বসে ফলকের ওপর আঁকছিলুম দেবদূত, তাকে মনে করে। ছবির রেখার টানে চোখ সরিয়ে দেখি, ওরা আমায় ঘিরে আছে প্রতীক্ষায়, ওদের জানানো চাই স্বাগতম্।" দ্বিতীয় অংশটি ১১নং সনেট, যার প্রথম চতুষ্কটি এরকম—

আমার দু'চোখ আনে, সকরুণ মায়া
কেমন পড়েছে ঝরে ওই মুখভাগে—
জেনেছো যখন কোন্ ঝলসিত রাগে
নিবিড় বিহ্বল আমি বিষাদের ছায়া।

অষ্টকের শঙ্কাসম্মত প্রেমিকের মনোভঙ্গি, ষটকে স্বেচ্ছানির্বাসনের প্রেমঘন অশ্রুসজলতা অনুবাদে রক্ষিত। তেমনি বজায় মাত্রা পরিমাণ, অন্ত্যমিলের কারুকার্য।

ইউরোপ আর আমেরিকার সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত এদেশী পাঠকের কাছে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যকে পৌঁছে দেবার কাজে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণার কথা আজ আর অজানা নয়। সে উদ্যোগে হাত মিলিয়ে অনেককাল আগে শঙ্খবাবু এইমে সেজেয়ার-এর 'নিজের দেশে ফিরে আসা' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি অংশত অনুবাদ করেন। সেজেয়ার মার্তিনিক নামে একটি ছোট্ট দ্বীপের রাষ্ট্রনেতা, 'নেগ্রিচুড' নামে কালো মানুষদের আন্দোলনের উদ্গাতা, লুবুম্বার জীবন নিয়ে লেখা একটি নাটক ও উল্লিখিত কবিতাটির জন্য স্মরণীয়। ইংরেজি থেকে অনূদিত এ কবিতায় গদ্যছন্দের স্পন্দন, পরাবাস্তবময় অসম পংক্তিবিন্যাসে আছে 'লাল পৃথিবী রক্ত পৃথিবী ভাই পৃথিবী'র শাদার হাতে বন্দী মানুষের কথা। কবির সঙ্গে অনুবাদকের স্বদেশেও এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—

একগুঁয়ে ভাগ্য আর
বোবা মাটির সটান আর্তনাদে
ফেটে পড়বে না একদিন এই রক্তের গরিমা ?

অ্যামেকার কবি ও ঔপন্যাসিক রজার মেই-এর একটি কবিতা—"স্বপ্ন দেখা মানুষেরা।" এটিও গদ্যছন্দে লেখা (প্রথম ছয় লাইন বাদে) অনুন্নত দেশের নিগৃহীত মানবতার কবিতাঐতিহ্যে নেই ভাবনা প্রকাশের তির্যক ভঙ্গিমা, আবেগ উন্মোচনের নাগরিক চতুরালি। কবিতার শুরুটা এই রকম—

"স্বপ্ন দেখা মানুষেরা বেঁচে থাকে জীবন পেরিয়ে
তাদের মৃত্যুর সঙ্গে তাদের স্বপ্নের শেষ নয়
রক্তের ক্ষরণ করে তাদের জীবন বয়ে যায়
মাটির গভীরে আর সেখানে তা হয়ে ওঠে বীজ
এক জীবনের ক্ষয়ে হারায় না সে স্বপ্ন তাদের
বীজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মাথা তোলে অজস্র সম্ভারে।

এরপর গর্ডনের জীবন আর মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনানুভবের অপ্রচ্ছন্ন, স্বপ্নিল উষ্ণতা, যা এক আবেগচাপা বুদ্ধিবিলাসী পরাবাস্তবের বিরুদ্ধে অন্য এক পরাবাস্তবের জন্ম দেয়—

"কিন্তু যে স্বপ্নের জন্য বেঁচেছিল ওরা কখনো তো মৃত্যু নেই তার
একটি বীজের কণা ভেঙ্গে গিয়ে জেগে ওঠে একদিন একটি মঞ্জরী"

পশ্চিম ইনডিজের বিখ্যাত কবি কে. ই. ইনগ্রামের কবিতা 'যেন বা এক সোনার জালের ভিতর।' ছন্দাশ্রয়ী দশ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট এই অনুবাদেও আসন্ন জীবনসন্ধ্যার মুহূর্তে 'বন্দীরও কী সুখ, কারণ সে জানে—

"বাতাসে তার হাড়ই হবে বাঁশি
বাজিয়ে যাবে অসম্পন্ন গান।"

ভিয়েতনামের কিংবদন্তীকীর্তিত জননায়ক হো চি মিন ১৩টি জেলার প্রদেশ কোয়াংসির নানা জায়গায় বন্দী ছিলেন। কিন্তু কারাবাস তাঁর স্বপ্ন কল্পনার ও প্রত্যয়ের জগৎকে পারেনি কারারুদ্ধ করতে। ধ্রুপদী চৈনিক রীতির এই জেলে বসে লেখা কবিতাগুলির অধিকাংশই চার পংক্তির। শঙ্খবাবু 'কারা ডায়েরী'র থেকে বেছে নিয়েছেন কয়েকটি কবিতা! মাত্রাবৃত্তে (কখনও অক্ষরবৃত্তে) এই চারপঙ্‌ক্তির কবিতাগুলি অন্ত্যমিল যোগে (২/১ ক্ষেত্রে নেই) উপস্থাপিত করা হয়েছে। দু একটি নমুনা তোলা যাক—

Once awake everyone starts louse-hunting.
At eight the gong sounds for the morning meal
come on, let's go and our stomachs try to fill:
After such long misery happier days must be coming.

(DANG THE BIN এর অনুবাদ)

জেগেছে যেই অমনি সবাই উকুন শিকার করে।
আটটা নাগাদ ঘন্টি বাজে সকালবেলার খাওয়ার,

চলো সবাই, প্রাণটা ভ'রে যা জোটে তাই খাই।
যা দুর্ভোগ সইছি সবাই, আসবে ঠিক সুদিন। (বিষ্ণু দে)

জেগে উঠলেই ব্যস্ত সবহে উকুন বাছার কাজে।
ঠিক আটটায় সকালবেলার খাবার ঘন্টা বাজে।
উঠে পড়ো, চলো, আপাতত সব পেট তো ভরিয়ে নিই—
এত দুর্দশা পেরিয়ে কখনো ভালো দিন আসবেই।

(শঙ্খ ঘোষ)

ইংরেজি অনুবাদে মিল ১, ৪ এবং ২, ৩ পংক্তিতে। শঙ্খ রাখেন ১।২ এবং ৩।৪ পঙ্ক্তিতে, বিষ্ণু মিলের মধ্যে যান না। হো চি মিনের কবিতার স্নিগ্ধতা স্মরণ রাখলে মিলটা বরং মানানসই হয়। শ্বাসাঘাত ভঙ্গিমা যা বিষ্ণু বাবুর, কানে লাগে। ৩য় পঙ্ক্তিতে, 'যা জোটে তাই'(বিষ্ণু) একটু বেশি নয় কি? বিষ্ণু দের অন্য ২১১টি অনুবাদে পদ্যের কোমলতা হারিয়ে যায়,এক একটা কবিতা ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্বে হওয়ার একটানা পড়তে গেলে বারংবার সুর কেটে যায়। এই সমস্যাটা শঙ্খবাবুর অনুবাদে একেবারেই নেই। অনুবাদ যে কতো মূল্যানুগ হয়েও ভিন দেশী কবিতা হয়ে উঠতে পারে তার একটি উদাহরণ দিই—

I've never been fond of chanting poetry ;
But what else can I do in thraldom ?
These long days I'll spend composing poesy :
Singing poems may help in the wait for freedom.

(Dang The Binh)

শঙ্খবাবুর হাতে এর চেহারাটা হয় এমন—

কবিতা আমায় কখনো এমন মাতিয়ে রাখেনি আগে
কিন্তু এখন বন্দীদশায় কী আর করতে পারি?
শ্লোক গেঁথে গেঁথে দীর্ঘ সময় কেটে যাবে, ভাবি আজ
কবিতা হয়তো সহায় আমার মুক্তি-প্রতীক্ষারই।

এমন চমৎকার অনুবাদ হল—সকাল ২, মধ্যশরৎ ২, গোধূলি, গাঁয়ের ছবি, জেলজুয়াড়ির মৃত্যু, একটানা বৃষ্টি ইত্যাদি। এখানে ভাষা ও ভাবনার যে অন্তর্লীন সম্পর্ক তা হয়ত 'উন্মোচিত' হয়নি, কিন্তু তার ভ্রূণস্থ বা প্রগাঢ় অবয়ব যেন উপস্থাপিত হয় চমৎকারভাবে—ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের ভাষা ধার করে এমন মন্তব্য করা যায় নির্দ্বিধায়। এরপর দু একটি কথা। 'ঘুম নেই' কবিতার

শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'পাঁচ কোনা একতারা' যে ভিয়েতনামের পাঁচকোনা সোনালি তারাযুক্ত জাতীয় পতাকা—এটা উল্লেখ করলে পাঠকের সুবিধেই হয়। দু একটি কবিতার ইংরেজি নাম একটু ছোট করে নেওয়া হয়েছে (যেমন—Entering Zingsi District Prison—চিংসি জেলে)। 'সহবন্দীর বাঁশি' কবিতা হিসেবে পড়তে ভালই লাগছে। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে গেলে একটু আলাদা লাগে—

কেঁপে উঠল জেলের ভিতর একটি বাঁশির মীড়

Nostalgically a flute wails in the ward.

কিংবা,

infinite melancholy-র বিশেষণটি বাদ চলে যায়। আবার 'চাঁদিনী' কবিতায় ৩য় পঙ্‌ক্তিতে চাঁদিনীর পূর্বে 'গর্বিণী' বিশেষণটি বাড়তি চলে আসে, যেমন 'মধ্যশরৎ' কবিতায় ২য় পংক্তিতে 'পৃথিবীর' পর 'উপশিরা' কথাটি আসে, যা ইংরেজিতে নেই। And poems should form assault teams যদি করা হয় 'চাই কবিরাও গড়ে তুলবেন সংগ্রাম-সম্বোধি' তাহলে সামান্য বদলে যায় না কি? তবে হো চি মিনের এই চমৎকার অনুবাদগুচ্ছের প্রশংসনীয় দিক এতটা যে এমন খুঁত যে অনুবাদকর্মীর পরিশ্রমের অভ্যন্তরীণ সমস্যার চিহ্ন, কাজে না নামলে বোঝা যাবে না।

সাধারণত পাশ্চাত্য সাহিত্য অনুবাদের দিকেই আমাদের ঝোঁক যদিও প্রাদেশিক সাহিত্যের অনুবাদ বা আলোচনা যে একেবারে হয়নি তা নয়। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা শঙ্খ ঘোষের এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি এরকম—"অন্য দেশ বা অন্য প্রদেশের সাহিত্যচর্চা-জীবনচর্চা প্রসঙ্গে কখনো-কখনো কৌতূহল হয় আমাদের। সেটা যে কেবল অন্যকে জানবার জন্যই তা নয়, তার মধ্য দিয়ে নিজেদেরও যেন খানিকটা নতুনভাবে দেখবার সুযোগ পাই।"[১০] এই সূত্রেই আসে অন্তপ্রদেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীনতা, অহংমন্যতা বা উন্নাসিকতা দূর করার তাগিদ। এই তাগিদেই মানবেন্দ্র যেমন 'আধুনিক ভারতীয় গল্প' তিন খণ্ডে অনুবাদের পরিকল্পনা করেন, তেমনি শঙ্খ ঘোষ করেন চেরবান্দারাজু সিরিশ কারনাড বা ইকবালের অনুবাদ। চেরাবান্দারাজু ছিলেন অন্ধ্রের বিপ্লবী কবিদের একজন, "জনগণের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, অক্লান্ত কর্মী, যাঁকে প্রায় দশবছর ধরে রাষ্ট্র উৎপীড়িত করেছিল।" 'দিগম্বর' কবিগোষ্ঠীর অন্যতম ছদ্মনামিত এই কবি নকশাল আন্দোলনের সূত্রে বাংলাদেশেও আর অপরিচিত থাকেন না। তাঁর রচনার দুটি সংকলন 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার' (১৩৮৭) এবং 'চেরবাণ্ডারাজু ব্যক্তিত্ব ও কবিকৃতি' (১৩৮৫) প্রকাশিত হয়, যাতে শঙ্খ ঘোষের কয়েকটি অনুবাদ আছে। এর কয়েকটি গদ্যছন্দে, যেখানে

আছে প্রজন্মের সুস্থতা ও দায়বদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠা দেবার বাসনা—

এই আমার প্রজন্ম কেবলই এগিয়ে চলে ঠিক আর যথাযথ পথে,
মানুষের রথ সে চালিয়ে নিয়ে চলে তলোয়ারের এমন নতুন
ঝলকানিতে, (নতুন প্রজন্মের কাছে)

কখনো নিঃসংশয় অভিযোগ বা দ্বিধাহীন পক্ষপাত কিংবা অবিচলিত প্রশ্নময়তা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, অথচ যাকে বলে তথাকথিত কবিত্ব তার চিহ্ন থাকে যথেষ্ট মাত্রায় (আমাকে উঠতে দাও সাক্ষীর কাঠগড়ায়), কখনো পাঠক পরিচিত হন নতুন যুগের নব বন্দেমাতরম্-এ—

ভারতী, মা আমার, আমাকে বলো
কোথায়, কোন্ লক্ষ্যে তুমি চলেছ ?
বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! (বন্দে মাতরম্)

কখনো বা মাত্রাবৃত্তের স্বরতরঙ্গে বিপ্লবী সারল্য মূর্ত হয়ে ওঠে —

মাথা থেকে পায়ে অস্ত্র-সাজানো
ভুখাই আমার নাম
সীমাহীন শুধু ছড়িয়ে যাওয়ার
আন্দোলনের শ্বাসের হাওয়ায়
বিপ্লবে পরিণাম। (পরিণাম)

এ কবিতার প্রথম চার পঙ্‌ক্তি (আমি নই কোন ডানাহারা পাখি / একা পড়ে থাকা পিছে, ইত্যাদি) গিয়েনের 'আমি যেন এক ফুলে ভরা গাছ / কাল ছিল ডাল খালি' মনে করিয়ে দেয়। লোকজীবনের ছন্দ, তার সারল্য, পরিচিত চিত্রকল্পের সঙ্গে বিপ্লবী প্রত্যয়ের মেলবন্ধন বাংলাতেও ধরা পড়ে, চেতনার সামীপ্যে আনা সম্ভব হয় বাংলাতেও, অনুবাদকের কবিধর্মের মৌলিক ভিন্নতা সত্ত্বে। এই flexibility একটা কঠিন ব্যাপার, যদিও শঙ্খের সে অনায়ত্ত নয়, তা বারংবার প্রমাণিত। ব্রেখটের গান, হয়বদন-এর গান-ও তো এই নমনীয়তার সাক্ষ্য ও সামর্থ্য বহন করে।

১৯৭৬-এ আমরা পেয়েছি তাঁর কিছু সাঁওতালি কবিতার অনুবাদ। মূল লেখাগুলি ছিল রোমান হরফে, পাশে ইংরেজি অনুবাদ। তার ওপর

নির্ভর করেই অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ করা হয় বাংলায়। শঙ্খের অনুবাদের সংখ্যা দশ—লাগ্‌ড়ে, পাতা, দণ্ড এবং সহরায়—এই চারটি পর্যায়ের দশটি গান বা কবিতা। 'লাগ্‌ড়ে সেরেঞ' নামক নৃত্য-সম্বলিত গানে কথার গভীরতা অপেক্ষা কথার উচ্ছলতা, ভাবতন্ময়তা অপেক্ষা ভাবতরঙ্গ বড়ো হয়ে ওঠে। ভারি চমৎকার তা ধরা পড়ে অনুবাদে—

নাচ বাজনা গান	গাঁয়ের মেলায় বান
নাচ বাজনা গান	মিষ্টি মধুর তান
নাচ বাজনা গান	মিষ্টি মধুর তান
নাচ বাজনা গান	ঠাণ্ডা করে জান, ইত্যাদি।

শব্দের, বাক্যাংশের পুনরাবর্তন মনোচাঞ্চল্যকেই তুলে ধরে, অন্ত্যানুপ্রাস বাড়তি মাদকতা আনে। শেষ পঙ্‌ক্তিতে একটি দৃশ্যগ্রাহ্য চিত্রকল্প (কন্যাদের গ্রামের পটে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা) শ্রাব্যতার সঙ্গে দৃশ্যতাও যুক্ত করে। এই পর্যায়ের দ্বিতীয়টিতে ধ্বনির খেলা নেই, আছে প্রিয়সম্ভাষণের সারল্য। 'পাতা সেরেঞ' (ঝুমুর নাচের মতো) পর্যায়ের একটি অনুবাদে আছে দৃশ্যগ্রাহ্য প্রকৃতির স্নিগ্ধতা। 'দণ্ড সেরেঞ' উৎসবের গান, তাই চড়া সুর তাতে, আর উচ্ছল যৌবনের দোলা। একটিতে প্রকৃতি আর মনের উত্তাপ মিলে মিশে যায়, আর একটিতে টাকা পয়সার নিয়ামক শক্তির কথা, অন্য আর একটিতে বাঁশি বাজিয়ে রাজমহলে যাওয়া ও পাচিল ধ্বসিয়ে দেওয়ার গতিময় চিত্র। অন্ত্যমিল এবং শ্বাসাঘাতের আভাস নৃত্যের সহায়ক।

বুরু হারাম দাড়াম জুলাড় ঞিউরি রেয়াড়'গে
এতম বাঁয়ে বেখেত বাড়ায় ঞে ল : হাড়িয়ার গে

এর অনুবাদ

পাহাড় পথে হাঁটলে দু পা মন জুড়িয়ে যায়
যেদিকে চাও সবুজ সব ডাইনে বাঁয়

মূলের ছন্দকে বাংলায় আনার চেষ্টাটা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। মাঝে মাঝে বাঙালি পাঠকের পাঠযোগ্য করার কথা ভেবে তিনি কিছু বাড়তি মিল দেন, যা মূলে নেই। যেমন—

আঙ্গাঞ লঃ খান মা পানাহি রপ্‌ রপ্‌
পিওয়ী লঃ ভিঞ খান জুরি মেলায়

এর অনুবাদ—

পায়ের নিচে গরম যদি, নে একজোড়া খড়ম
বুকেও যদি গরম তবে আন্ বোঝে মরম।

লক্ষণীয়, খড়ম, হিম্মৎ, লো, প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে গ্রামীণ বনজ গন্ধকে পাওয়া যায়। বিষ্ণু দের 'সাঁওতাল কবিতা' (সন্দ্বীপের চর) কেউ মনে করতে পারেন, কিন্তু তাতে মার্জিত, নাগরিক স্বরের যেমন প্রাধান্য, সাঁওতালি নৃত্যগীতের ধ্বনি, ছন্দ তেমন নেই। 'সহগায়' পর্যায়ের রচনায় বিষয় বৈচিত্র্য আছে, তাতে যেমন সাহিত্যের তেমনি জংলা আবহের স্বাদ বিদ্যমান। এ পর্যায়ের চারটিতে আছে গল্পের আভাস। যেমন—

ও পথে গিয়েছি এ পথে গেছি
একটি কথাও কয়নি কেউ
বলব কী আর, দিদি লো দিদি,
এ পথের মাঝে মেজো কর্তা যে—
তিনিই শেষটা এক খিলি পান
বাঁ হাতে আমায় দিলেন তুলে।

যে সংকলনটি থেকে এই সব উদাহরণ আহৃত, সেখানে শঙ্খবাবু যতটা মূলানুগ, অন্য অনুবাদকেরা অনেকেই নন। তাঁরা পঙ্‌ক্তিসংখ্যা বদলান, পঙ্‌ক্তি বিন্যাস বদলান, যা শঙ্খবাবু কোথাও করেননি!

আর্থার ওয়েলি ডিল্‌সকে তাঁর অনুবাদে rhyme ও literalness কে একত্র করার জন্য বিস্ময়কর দক্ষতার প্রশংসা করেন। তেমন প্রশংসা এক্ষেত্রে শঙ্খ ঘোষেরও প্রাপ্য। এই চমৎকার অনুবাদগুলির একটিও 'বহুল দেবতা বহু স্বর'-এ নেই কেন, কে জানে।

আপাতত তাঁর শেষ বড়ো কাজ, ইকবালের 'জাভেদনামা'র অনুবাদ। শিমলার ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এ নিমন্ত্রিত কবি হিসেবে থাকার সময়ে ফারসি জানা বন্ধুদের সহায়তা নিয়ে ইকবালের এই শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'জাভেদনামা' (১৯৩২) বা শাশ্বতের গানের অনুবাদে অগ্রসর হওয়া। ভার্জিলের হাত ধরে দান্তের প্রেত, শুদ্ধি ও স্বর্গলোক পরিক্রমণের ভঙ্গিতে ইকবালও রুমির সঙ্গে চন্দ্র মঙ্গল বুধ বা শনি মণ্ডলে বিচরণ করেন। যথার্থ অস্তিত্ব কাকে বলে এ প্রশ্নে রুমি জানান—

"বললেন, 'আছে তা-ই আবির্ভূত হতে যা চেয়েছে।
সত্তার আবেগ শুধু নিজেকে প্রকাশ করে ধরা
জীবন মানেই হলো আত্মবোধে নিজেকে সাজানো
নিজের সত্তার কাছে সত্য হতে চাওয়াই জীবন ;

মঙ্গলগ্রহের অভিজ্ঞতা, মর্থদিন নামে কাল্পনিক শহরে পরিক্রমা, সে তো এই ক্লিন, বঞ্চনামুক্ত পৃথিবীরই এক ভবিষ্যৎ স্বপ্নে মুখর –

কেবলই খাটছে যে কিষাণ, পাচ্ছে সে প্রদীপে উজ্জ্বল আলো
তাদের নেই কোনো জমির মালিকের ভয়।

*

বাজারে বেকারেরা ভরে না পথ কোলাহলে
কানের পীড়া নেই আর্ত ভিখিরির কান্নায়।

চন্দ্রমণ্ডল দর্শনে রুমির নির্দেশেও আমরা পাই অপর বোধের এক চিরন্তন চাঞ্চল্য—

বোধময় হে মানুষ, যা কিছু তোমার সামনে আসে
শ্রুতি আর দৃষ্টি দুই বৃত্ত দিয়ে তাকে বেঁধে নাও।
চোখে যদি প্রজ্ঞা থাকে দর্শনীয় হতে পারে সবই।

ভারতীয় ঋষির নটি বাণীতেও ধৃত দেশকালাতীত এক চিরন্তন বোধের পুনরুচ্চারণ। জনরট্ট-এর বাগ্ময়তার ঐশ্বরিক নির্মোকের পরতে পরতে মানবিকতার মহিমা, যেমন যর্ঘমিদ উপত্যকার ধারে রুমির মুখে আমরা শুনব কবি ও কবিত্বের এক মহনীয় সামর্থ্যের চিরভাস্বর সম্বিৎ—

কবি, তার ধর্ম হলো খোঁজা শুধু খুঁজে ফেরা,
আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা, দিনে দিনে রুদ্ধ করা তাকে ;
নিজেরই হৃদয় বলে কবিকে জেনেছে সব জাতি
যে-জাতির কবি নেই সে কেবল স্তূপাকার মাটি
জগতের নকশা বুনে দিতে পারে মত্ততা বা তাপ
নেই যার মদ-তাপ সে-কবিতা নিছক বিলাপ।
মানুষকে গড়ে দেওয়া লক্ষ্য যদি হয় কবিতার
ভাবী কথনের জন্য কবিতাই উত্তরাধিকার।

(শুধু কবি নন, বরং লেখক সম্পর্কে গোর্কির কিছুটা অনুরূপ উক্তি স্মরণে আসে আমাদের)।

'আত্মশক্তি বিকাশের স্বরূপ খুঁজে ফেরার আর্তি' যে তিনটি কাব্যে, তার শেষটি অর্থাৎ এই 'জাভেদনামা'-র ফারাও বা নাদির, গজিব বা ভর্তৃহরি, বুদ্ধ বা টলষ্টয়, বিশ্বামিত্র, জরথুস্ত্র বা নীৎসে, এদের সঙ্গে দেখা-শোনা কথার ভঙ্গিতে কবি শেষপর্যন্ত বড়ো করে তুলতে চেয়েছেন তাঁর কালেরই পৃথিবীকে। তাঁদের শোনাচ্ছেন দেশকালের সাম্প্রতিক দশা আর তাদের কাছে শুনে নিচ্ছেন বিগতের স্মৃতি, আগামীর কল্পনা। এমনকী ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যতন্ত্রের বিরোধকেও তুলে ধরেন, ধরেন তার নিজস্ব ধরনে, যাতে একমত হবেন না এই দুই বাদ সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনো মানুষও, তবু কাব্যের গড়নে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসরণ নিশ্চয়ই আকর্ষণীয়। কবিতার গড়ন এখানে দার্শনিক, তার সর্বাঙ্গে ধর্মপ্রাণতা, তবু একেবারেই অস্পষ্ট নয় 'এক সমাজ মুক্তির স্বপ্ন, লাঞ্ছিত মানুষের জেগে ওঠার স্বপ্ন, বহুকালীন সুপ্তিমগ্ন জড়তা থেকে প্রাচ্যজগতের উঠে দাঁড়াবার স্বপ্ন।'

শোনা যায় অনুবাদের ব্যাপারে ইকবাল ছিলেন স্পষ্টত বিরূপ। ইংরেজিতে অনেকে অনুবাদের চেষ্টা করলেও ব্যর্থতার পরিমাণ যথেষ্ট। আশরার-ই খুদী (১৯১৫)-র অনুবাদে নিকলসন-এর প্রয়াস যে বিজ্ঞজনের কাছে প্রশংসিত হয়েছে তার কারণ তাঁর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে সুপাণ্ডিত্য। তাছাড়া তিনি ছিলেন ইকবালের শিক্ষক। ভিক্টর কিয়েরনান এবং এ. জে. আরবেরী-র কিছু অনুবাদও উচ্চমানের। তবে, 'জাভেদনামা'-র ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে কিনা জানা নেই। শঙ্খবাবুই সর্বপ্রথম তা বাংলায় অনুবাদ করলেন। শুনেছি অবলম্বন ছিল একটি ইংরেজি অনুবাদ এবং এক উর্দুভাষী বন্ধুর সাহচর্য। এ বিষয়ে তাঁর পরিশ্রমের পরিচয় মিলবে অনুবাদ পাঠে, কিন্তু সতর্কতার পরিচয়-ও পাঠে এবং এই উক্তিতে—"ছন্দ বা মিল বিষয়ে ফারসি কবিতার অনেক-দিনের যে ঐতিহ্য, যার ব্যবহার ইকবালের অন্য অনেক লেখায় আছে, 'জাভিদ-নামা'য় তা খানিকটা ভেঙে গেছে। ভাষণের সঙ্গে আবেগ, আখ্যানের সঙ্গে লিরিক এখানে অনায়াসে মিলিয়েছেন তিনি এবং ছন্দেও এনেছেন নানা বৈচিত্র্য। সে কথা মনে রেখে, অনুবাদেও মিল ও ছন্দের ব্যবহারে তালফেরতা আনবার কিছুটা স্বাধীনতা নেওয়া গেছে।" এর কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এখানে। কাব্যের শুরু হয় আখ্যান বর্ণনার এ ভাষায়—

"সাতরঙা এই পৃথিবীতে এসে মানুষ
বীণার ধ্বনিতে বিলাপে জ্বলছে কেবল

অন্তর্দাহে খুঁজছে আত্মজন
যে শেখাবে শোকগাথায় হৃদয় জুড়োতে'।

মিলহীন গদ্যের বিন্যাস বলে চকিতভ্রম হলেও মাত্রাবৃত্ত একটা দোলা সৃষ্টি করে চলে। দ্বিতীয় সর্গে এসে বর্ণনার ভাষায় এসে যায় অক্ষরবৃত্ত—

নাস্তি বা অস্তির যত আনন্দের থেকে ওঠা প্রাণ
কাছের দূরের এই ভুবনকে গড়ে তুলেছিল ;

এই সর্গের দেবদূতের গান আর 'গজল'-এর পঙ্‌ক্তিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যা, পর্বসংখ্যা আলাদা, বরং যে গজল-এ আমাদের কান অভ্যস্ত তাতে এই মন্থরতা নেই। 'নক্ষত্রের গান'-এর তাল, লয় আবার প্রথম দুটির থেকে আলাদা। এর শুরুটা এরকম—

বুদ্ধি তোমার এই জীবনের ফল সৃষ্টি ধারার রহস্যমূল প্রেম ;
ও রূপবাঁধা ধূলির কণা, এসো, স্বাগত এই সীমায় পৃথিবীতে !

আখ্যানের সঙ্গে লিরিক এভাবে মিশে বৈচিত্র্যও আনে, ঐক্যও রাখে। ভাষণের দৃপ্ত আবেগ যা পাঠকের হৃদয়েও করে নেয় অপ্রতিরোধ্য প্রবেশ—

জ্বালাও পাহাড় পাখি জ্বালাও বাগান মরুভূমি
জ্বালাও সাগরতল মাছেরা যেখানে ভাসমান
পাঁজরের নিচে যদি থাকে কোনো শায়কের তেজ
বাজপাখি হয়ে বাঁচো বাজপাখি হয়ে দাও প্রাণ।

আশির দশকের শেষে এসে ইকবাল চর্চার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ একটি প্রবন্ধে। সেখানে তিনি যথোচিত বিস্তারে দেখান, যদিও ইকবাল বহির্বিশ্বে ইসলামের কথা বলেন, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র অঞ্চলের ভাবনার কথা বলেন, তথাপি 'ধর্মকে তিনি ছুঁতে চেয়েছিলেন জীবনকেই সুস্থতর করবার স্বপ্নে'। 'ইকবালের কাছে ধর্ম এসে পৌঁছয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবারই একটা পদ্ধতি হিসেবে'। এবং একটি কবিতায় লেখেন 'সর্বশক্তিমান শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি হলো মার্কসবাদ।" তাই অনুবাদকের নির্বাচন এক বৃহত্তর লক্ষ্যে—"আমাদের নিজেদেরই স্বপ্ন-চরিতার্থ-

তার পথগুলিকে নির্ভুল করবার গরজে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ইকবালকেও আমরা বুঝতে চাই আজ।"[১৭]

বুদ্ধদেব বসুর মত হল—"কবিতা বিষয়ে সবচেয়ে ফলদ মন্তব্য যেমন কবিরাই করতে পারেন, তেমনি তার অনুবাদেও প্রথম এবং সহজ অধিকারী তাঁরাই।"[১৯] কবিরাই একমাত্র পারেন যা অগাধ, যা রহস্যময়, বা কবিত্বকমনীয় তাঁকে তুলে দিতে ভিন্ন ভাষায়—এ বিশ্বাস অন্য অনেকের মত ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের-ও। অন্য ভাষার মতো রসজ্ঞ পণ্ডিত বা খাঁটি অ্যামেচার অনুবাদক বাংলায় থাকলেও গত পঞ্চাশ বছরে শ্রেষ্ঠ বাঙালি অনুবাদকদের নাম করতে গেলে প্রথমেই যাঁদের নাম মনে পড়বে তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অরুণ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষ। এঁরা সকলেই বাংলা ভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। মনীন্দ্র রায় বা মঙ্গলাচরণ' বা সুভাষ, মানবেন্দ্র বা পুষ্কর, দেবীপ্রসাদ বা শক্তি—সামর্থ্যের তারতম্য থাকলেও এঁদের নামও আমরা উল্লেখ করব পরবর্তী পর্যায়ে, আর এঁরাও তো বাংলা ভাষার কবি হিসেবে খ্যাত ও স্বীকৃত। এঁদের এগিয়ে আসাটা সহজদৃষ্ট। বিষ্ণু বা সুধীন্দ্রের মতো বিচিত্রচারী হতে চাননি, যদিও নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে চেয়েছেন, বুদ্ধদেব। তাই বোদলেয়র-এর অনুবাদ শুরু হয় ১৯৫৫ তে, প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ তে। রিলকে বিষয়ে আগ্রহ জাগে ১৯৪৪ সালে, অনুবাদ ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬তে। বুদ্ধদেবের বোদলেয়র, প্রীতির সমদর্শী উদাহরণ বিষ্ণুদের এলিয়ট চর্চা ও অনুবাদ। যেমন অরুণ মিত্রের এলুয়ার, আরাগঁ প্রভৃতি ফরাসি কবিদের অনুবাদ। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে বোদলেয়র, বিষ্ণুর ক্ষেত্রে এলিয়ট এবং অরুণ মিত্রের ফরাসি কবিতার অভিঘাত কারোরই অজানা নয়। শঙ্খ ঘোষ কিন্তু কোনো একজন কবি বা একটি দেশের কবিতায় কোনো স্বল্প বা দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকেন নি (ব্যতিক্রম, গিয়েন ও ইকবালের অনুবাদ)। দ্বিতীয়ত এমন অনেক কবি ও এমন অনেক কবিতা তিনি অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছেন যা অননূদিত, বা বাজার-চলতি সংকলন বহির্ভূত। অবশ্য বলাই বাহুল্য, সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাবৈচিত্র্য অনুবাদ উৎকর্ষের মাপকাঠি নয় কোনোভাবেই। তবে নতুন দেশের কবিতা, নতুন কোনো শক্তিমান কবি যদি বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে গৃহীত হন, তাতে তো কবিতারই ভৌগোলিকতা এবং জলবায়ুতে লাগে নূতনত্বের রঙ। স্বদেশী সাহিত্য সমৃদ্ধকরণের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর, কিন্তু কবি যখন অনুবাদে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর সৃজন ও অনুসৃজনের মধ্যে কি সৃষ্টি হয় না এক দ্বান্দ্বিকতা? অনুবাদ করতে গিয়ে কবি অনেক কিছু শেখেন না সতীর্থ বিদেশী কবির কাছে? এক বিদেশী কবির দরজায় কান পেতে তিনি কি নিজ কল্পনার জগৎকে চিনতে, যাচাই করতে, শানিত করার সুযোগ পান

না? কবি অনুবাদক কি তুলে ধরতে সচেষ্ট হন না কোনো ভিনদেশী কবির mind's speech কে স্বদেশী ভাষায় তুলে ধরতে? বুদ্ধদেব ঠিকই লিখে-ছিলেন—'যখন স্বকীয়ভাবে বলার কথা খুঁজে পাওয়া যায় না (এমন সময় সব কবিরই আসে), তখন পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তির বদলে অনুবাদকর্মই শ্লাঘনীয়, তাতে চর্চার এবং ব্যায়ামের সুযোগ মেলে, 'হাত ঠিক থাকে, লেখক একটা নিয়মের অধীন হ'য়ে অপচয় থেকে রক্ষা পান, এবং এই সচেষ্টতার ফলে হয়তো কবিতার প্রকৃতি বিষয়ে একটু তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি, কলাকৌশলে আরো নিশ্চিত একটু নৈপুণ্য তাঁর আয়ত্তে আসে—যে-উপার্জন তিনি সুদে খাটাতে পারেন পরবর্তী স্বকীয় রচনায়[১৮]। যিনি মৌলিক কবিতা রচনায় নিবেদিত এবং আন্তরিকভাবে অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত তাঁর কাছে mimetic urge অপেক্ষা elective affinity কাজ করে যায় বেশি মাত্রায়, কখনো তা চলে আসে তাঁর বিশেষ বাচনভঙ্গির কাছাকছি. হয়তো ক্রিয়াও করে, সচেতনে না হলেও অব-চেতনে কৌতূহলী পাঠক এ প্রশ্ন তুলতে পারেন, কবি শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে এসব কথা কতদূর প্রযোজ্য? কোথাও এ প্রসঙ্গ তিনি না তুললেও 'মন্ত্র পুনরাবৃত্তি'তে যে তাঁর একান্ত অনীহা, এবং 'দিনগুলি রাতগুলি' 'মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়' এবং 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' যে সমস্বরের আবর্তন নয়, তা কে না জানে। মানবতার সপক্ষে তাঁর কণ্ঠস্বরকে চিরকাল নিঃসংশয় রাখার পিছনে যে মানবতাবাদী কবিতার অনুবাদ কাজ করে যায় না এমন বলা যায় না।

সবশেষে আসা যাক আর একটি প্রসঙ্গে। সেটি যথেষ্ট উচ্চারিত নয়, কিন্তু কবিত্বের বা অনুবাদের প্রশ্নে সেটি গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই। জর্জ স্টেইনার এবং রেনাটো পোগগিওলি দুজনেই বলেন—কবিতার সমস্ত অনুবাদই এক অর্থে ব্যাখ্যা। অনেকটা এরকমই বলেন অরুণ মিত্র—"অনুবাদে কী তাৎপর্য প্রকাশ পাবে তা অবশ্যই সম্পূর্ণ নির্ভর করে অনুবাদকের বোধ ও উপলব্ধির উপর। অর্থাৎ তিনি রচনার কী ভাষ্য করলেন তার উপর।"[১৯] আর শঙ্খ ঘোষও মানেন—"মূল কবির সঙ্গে এখানে মিশে থাকে অনুবাদকেরও সত্তা।"[২] 'সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত'-এর সম্পাদক দুজন অনেককাল আগে বোদলেয়ার-এর 'সন্ধ্যার সুর' কবিতাটির বিভিন্ন অনুবাদ উপস্থাপিত করে স্বরায়ণের ভিন্নতা দেখিয়েছিলেন। এলুয়ার অনুবাদক অরুণ মিত্র যেমন প্রেমকে মুক্তির নির্যাসরূপে ধরতে যান, নিত্য ব্যবহৃত সাধারণ শব্দের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে নীচু গলায় স্বগতোক্তির ঢঙে প্রীতি অনুরাগে কথা বলেন—এলুয়ারের মতই। সুধীন্দ্রনাথ যেমন ১৯৩০-৩১-এ হাইনের কবিতা অনুবাদ করেন "স্বরচিত কবিতার উৎক্রান্তির প্রয়োজনেই"। অলোকরঞ্জন চমৎকারভাবে দেখান রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের হাইনে অনুবাদের পিছনে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন

কবি সত্তার ক্রিয়াকবিতার কথা। শঙ্খের কবিতা-সমগ্র পড়ে পাঠক যেমন তাঁর মনোভঙ্গির একটা চালের পরিবর্তে বহুচালের, সমাজ পীড়ন থেকে সমাজ স্নিগ্ধতার অতিরেকে বিচরণের পরিচয় পান, যেমন তাতে আছে কিছু ব্যঙ্গ, কিছু অনিবার্যের কাছে অসহায়তা তেমনি আত্মস্থ গূঢ়তা, প্রসন্ন গাঢ়তার আভা। তাঁর অনুবাদের মধ্যেও এই পরিচয়ের জগৎকে আমরা আর একবার চিনতে পারি। যেমন তিনি সাহিত্যে জাত-পাতের বিরুদ্ধে, তেমনি সামাজিক জীবনে, এই মনোবৃত্তিই অনুবাদ করায় চেরবাণ্ডারাজুর 'কী আমাদের জাত' বা ইকবালের 'জাভেদনামা' কিংবা লেখায় 'অন্ধ বিলাপ।' যে 'ট্রাজিক জিজীবিষা' সত্তরের দশকে তাঁকে লেখায় শ্লোক, দশক, রক্তদান (প্রহর জোড়া ত্রিতাল) বা তিমির বিষয়ে দু টুকরো (মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়) তা-ই তাঁকে চেরবাণ্ডারাজুর 'নতুন প্রজন্মের কাছে' বা 'তুমি আমাদের' অনুবাদ করায়,. সেটাই কাজ করে গিয়েনের 'অ্যাঞ্জেলা ডেভিস' অনুবাদে। আবার যে ভিন্ন মনোভঙ্গি কাজ করে 'হয়বদন' অনুবাদে (যেখানে রাজনৈতিক নাটককে সমকালীন তাৎপর্যে অন্বিত করে তোলার মরিয়া কটাক্ষ থাকে ভূমিকায়) সেটাই কাজ করে গিয়েনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কবিতার পরিবর্তে 'চিড়িয়াখানা' অনুবাদের জন্য বেছে নেওয়ায়। যে রবীন্দ্রনাথকে নানা দিক থেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন শঙ্খ গত দুদশকে, তাতে প্রতীচ্য মনীষার সঙ্গে সম্পর্কের খানিকটা পরিচয় যদি পরিমাপের চেষ্টা থাকে 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'তে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের চারপাশে সমকালীন ভরেতীয় পরিমণ্ডলকে লক্ষ করার অভিপ্রায়েই করা হয় ইকবালের কাব্যানুবাদ। যে মানুষটি চলনে বলনে একান্ত অনাটকীয় সেই মানুষটি যখন 'বাবুমশাই' বা 'লজ্জা'র মতো কবিতা লেখেন তখন একটু ব্যতিক্রমী মনে হলেও পাঠকের যখন জানা হয়ে যায় ইনিই ব্রেখটের 'মা'র কবিতা ও গান, গিরিশ কারনাডের 'হয়বদন' এবং পিকাসোর একটি ছোট্ট নাটক 'চারটি ছোট মেয়ে' অনুবাদ করেন, পাঠক যখন জানেন মৌল স্বভাবকে বিসর্জন না দিয়েও বিপরীত মেরু পর্যন্ত বিচরণে তাঁর আগ্রহ অপরিসীম তখন আর বেমানান মনে হয় না। শব্দনির্বাচন, মৃদু শ্লেষের ধরন, উত্তেজনার পরিবর্তে আত্মস্থতার ধরন, ব্যাপ্তির পরিবর্তে অতিসংক্ষিপ্তির আশ্রয়ে কাব্যভাবনাকে তুলে ধরার দিক থেকেও আন্তরসাম্যের আরো কিছু কথা বলা যেতেই পারে। কিন্তব্য স, এই পর্যন্তই থাক। কবিতা রসিক বরং আগ্রহী হবেন বেশ কিছু বিদেশী কবিতার চমৎকার অনুবাদই পড়তে। আর এই পড়তে পড়তেই কবি, অনুবাদক এবং পাঠকের মধ্যে এক ত্রিবেণী রচিত হবে, তাঁরা তিনজনই তখন এগিয়ে যাবেন এক সত্তা থেকে আর এক সত্তায়, এগিয়ে যাবেন নিজের গণ্ডিকে ভাঙতে ভাঙতে, জীবনের ও ঐতিহ্যের বিস্তারের মধ্যে।

সূত্র নির্দেশ :

১. সূচনা, বহুল দেবতা বহুস্বর, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৫, নাথ পাবলিশিং

২. "রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: কবিতার অনুবাদ পোড়ো না, ওতে কিছু পাওয়া যায় না।' 'কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। স্বদেশ ও সংস্কৃতি—বুদ্ধদেব বসু, পরিশোধিত ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৭০, পৃ. ১৬৪; যদিও বুদ্ধদেব বসু ভিন্নমত পোষণ করেন। "যাঁরা বলে থাকেন যে অনুবাদ রচনা ও পাঠ করা সময়ের অপব্যয় মাত্র, তাঁদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে শেক্সপিয়র ও কীটস অনুবাদে ভিন্ন গ্রীক বা লাতিন সাহিত্য জানেন নি……উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে, রুশ উপন্যাস সমগ্র প্রতীচীর ধ্যানধারণায় প্রবিষ্ট হয়েছে, প্রধানত ফরাশি ও ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে।"……

(অনুবাদকের বক্তব্য, কালিদাসের মেঘদূত, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮০ এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., পৃ. ১৩)

৩. ভূমিকা, প্রতিধ্বনি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৬২, নাভানা, পৃ. ২৩১.

৪. শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনায় জয়েস বলেছিলেন—"তর্জমা পড়তে নেই, তর্জমা সাহিত্য নয়।"—জয়েস প্রাসঙ্গিক, সাম্প্রতিক, অমিয় চক্রবর্তী, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৬৩। সুনীল বলেছিলেন, "এ বইতে কবিতা নেই, আছে অনুবাদ কবিতা। অনুবাদ কবিতা একটা আলাদা জাত, ভুল প্রত্যাশা নিয়ে এর সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক।"—অন্যদেশের কবিতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৩৭৩, অরুণা প্রকাশনী, পৃ. 'ক'। ক্রোচে, ওর্তেগা ই গ্যাসেট, ভালেরি-ও কবিতার অভীপ্সিত অনুবাদ বিষয়ে ছিলেন সংশয়ী।

৫. কথাটি দেবীপ্রসাদ বলেছেন হুয়ান রামোন হিমেনেথ-এর অনুবাদ কবিতা সংকলন "শিকড়ের ডানা"-র (১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৭২) ভূমিকায়।

৬. বহুল দেবতা বহুস্বর, শঙ্খ ঘোষ, ১ম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৯৩, নাথ পাবলিশিং, সূচনা।

৭. কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৫৭, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৬৭-৬৫ ; অন্যত্র বুদ্ধদেব বলেন—

(ক) অনুবাদ প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যের অংশ করে তোলে ; (খ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনামাত্রেই অনুবাদের মুখাপেক্ষী ; (গ) অনুবাদ বিশেষ দেশ বা মহাদেশের সাহিত্যের ধারাকেই দেয় বদলে ;

(ঘ) অনুবাদের থেকে অতিরিক্ত প্রাপ্তি যুগ ও অনুবাদকের ব্যক্তিত্বের স্বাদ।—অনুবাদকের বক্তব্য, কালিদাসের মেঘদূত, পৃ. ১২-১৪।

৮. Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poetics—Alex Preminger, Macmillan, 1986 edition, p. 866.

৯. বহুল দেবতা বহুস্বর'—এর সূচনা এবং 'কতটুকু এলিয়ট'—ঐতিহ্যের বিস্তার, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৮৯, প্যাপিরাস।

১০. অনুবাদকের বক্তব্য, বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, বুদ্ধদেব বসু, পৃষ্ঠা দশ, ১ম দে'জ সংস্করণ, জুন ১৯৮১।

১১. 'Traduttore Taditore' A note on the Translation of Poetry, A Literary, Miscellany, Tarak Nath Sen, Rupa and Co. 1992, p 102.

১২. "একদিকে যেমন যান্ত্রিক হবার তাগিদ, অন্যদিকে তেমনি মৌলিক হবার আহ্বান, এই দুই পরস্পর বিরোধিতার মাঝখানে তার পথ চলতে হয়।" সাহিত্য অনুবাদের সমস্যা, সৃজন সাহিত্য : নানান ভাবনা—অরুণ মিত্র, ১ম প্রকাশ, মার্চ ১৯৮৭, প্রতিভাস, পৃ. ১২৪।
শঙ্খের সমকালীন আর এক কবিও বলেন—"কবিতার অনুবাদে যেটা কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব তা হচ্ছে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততাএবং নতুন ভাষার প্রাণশক্তি—এ দুটোর মধ্যে বোঝাপড়া করা। উপরন্তু বিশ্বস্ততা বলতে শুধু অর্থের প্রতি বিশ্বস্ততা বোঝায় না, অঙ্গের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রশ্নও আছে।"—অনুবাদ কবিতা, ভাবনার ভাস্কর্য, কেতকী কুশারী ডাইসন, পৃ. ১৭৩-১৭৪, দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৩৯৫। শঙ্খের সমকালীনআর এক বিশিষ্ট অনুবাদক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বেঞ্জামিনের প্রতিধ্বনি করে বলেন "উৎস ভাষাকে নিজের ভাষায় বিমুক্ত করে দেওয়াই আসল কাজ।……মুক্তি ছাড়া বিশ্বস্ততার কোনো অর্থ নেই।"—ভূমিকা, প্রেমে পরবাসে, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৩, নাভানা, পৃ. ১৮। এই 'মুক্তি' তাঁর কোনো কোনো অনুবাদে অসামান্যভাবে বঙ্গীয়তায় সাঙ্গীকৃত, যদিও সবসময় নয়।

১৩. কতটুকু এলিয়ট, ঐতিহ্যের বিস্তার, পৃ, ১০৫।

১৪. ভূমিকা, পোড়ো জমি ও চৌতাল, জগন্নাথ চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ ১১।

১৪-ক. শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এবং তার অনুবর্তীরা আপাতত অক্ষরবৃত্তকে মিশ্রবৃত্ত, মাত্রাবৃত্তকে কলাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তকে দলবৃত্ত বলতে চান। আমি নানা কারণে পুরোনো নাম তিনটিই ব্যবহার করলাম।

১৫. The Task of the Translator, Illuminatons, walter

Bejamin p. 72, Harcourt, Brace & World, 1968.

১৬. ভূমিকা, ঐতিহ্যের বিস্তার।

১৭. কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১৬৭।

১৮. ঐ।

কতকটা এমন কথা শুনতে পাই আর একজনের লেখায়—Translation however provides us with plenty of poetic exercise on the highest level. It is the best way of keeping your tools sharp, until the great job, the great moment. Comes along. More important it is an excrcise of sympathy on the hight level....It is not just his prosody he keeps alert, it is his heart.

The poet as Translator—kenneth Rexroth—The Craft and Context of Translation, The university of Texas Press 1961.

১৯. সাহিত্য অনুবাদের সমস্যা, সৃজন সাহিত্য নানান ভাবনা, ১ম সংস্করণ ১৯৮৭, প্রতিভাস, পৃ. ১২৮।

২০. সূচনা, বহুল দেবতা বহুস্বর।

২১. পাঠক যদি মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত নাম, রোববারে চে গোড়েয়াকে পড়া, চিলির প্রতি প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়েন "এই স্বপ্ন! এই গন্তব্য" সংকলন থেকে, তাহলে তফাৎটা বোঝা যাবে।

মনোতোষ চক্রবর্তী

কবিতায় আত্মপ্রসঙ্গ

> A poet write always of his personal life in his finest work out of its tragedy, whatever it be, remorse, lost love, or mere loneliness; he never speaks directly as to someone at the breakfast table, there is always a phantasmagoria.
>
> (A General Introduction for my Works / W. B. Yeats)

'কবিতার একটা নিজস্ব আবরণ আছে। তার ভিতরে প্রচ্ছন্ন রেখে অনেক কথা বলে নেওয়া যায়, অনেক আত্মপ্রসঙ্গ, কত বলেওছি হয়তো।'—লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ ১৩৭৯ সালের 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় 'পা তোলা পা ফেলা' নামের গদ্য রচনায়। তাঁর কবিতার এই প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসঙ্গ নিয়ে তখন ভাবিত ছিলাম না খুব। ১৩৯১ সালে প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস 'সুপুরি-বনের সারি' পাঠ করার পর চকিতে যেন স্পষ্ট হলো তাঁর কবিতার কিছু রহস্য। ঘর, বাড়ি, আঙিনা সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে যে মামিমা ভেজা পায়ে খালের ওপরে সাঁকো পেরিয়ে চলে গেল তার প্রসঙ্গ কবিতায় যে রহস্যে সমাপ্ত হয়, তার সঙ্গে 'সুপুরিবনের সারি'র ফুল মামিমার অন্তর্ধানের অনেক মিল। আর 'নিহিত পাতাল ছায়া' কাব্যগ্রন্থে 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগ' কবিতটির ঠিক আগেই 'আলাপচারি' শেষ হয়েছে এইভাবে—'দূরে চলে যায়, আরো চলে যায়, সুপুরিবনের সারি'। আবার 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের 'কেউ কারো মতো নয়' কবিতায়—

> যাও চলে যাও যতদূরে যেতে পারো যাও
> সুপুরি বনের সারি যে দিকে চলেছে অবেলায়

এই যে সুপুরিবনের সারি, উপন্যাসের নীলুর মামাবাড়ির সঙ্গে তার কত মিল। সেখানে কাছারি ঘরটার পিছনে সুপুরিবনের সারি, একটা একটা করে নীলুর দাদুর হাতে লাগানো। 'দশমীর পরের পরের দিনই' দেশ ছেড়ে আসতে

হয়েছিল নীলুকে। 'দশমী' নামের কবিতায় এই অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে এইভাবে—

> যাই সুপুরির রঙে-ধরা গোধূলির দেশ
> আমি যাই

'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের 'অশথগুঁড়ির জট' কবিতাটির প্রথম লাইন—'সেই সুপুরিগাছগুলিও এখন আর নেই', আর 'জন্মদিন' কবিতায়—

> দেখা হবে তুলসীতলায় দেখা হবে বাঁশের সাঁকোয়
> দেখা হবে সুপুরিবনের কিনারে

পাশাপাশি মনে পড়ে, 'সুপুরি ডানার শীর্ষে রূপালি জলের প্রভা ছিল' (সেদিন অনন্ত মধ্যরাত)। কৈশোর স্মৃতির স্নিগ্ধ লাবণ্য এসে মনে হয় স্পর্শ করেছে এই চিত্রকল্পটিকে।

উপন্যাসে যেমন পুজোর অনুষঙ্গে কৈশোরে দেশ ছেড়ে আসার বেদনা আছে, কবিতায়ও তেমনি দুর্গাপুজোর নানা অনুষঙ্গ আর দেশ ছেড়ে আসার বেদনা কখনো কখনো আলাদাভাবে, কখনো মিলেমিশে নানাবর্ণের ছবি হয়ে আছে। যেমন 'বেজে উঠল ঢাক' কবিতায় ছবির পর ছবি। দেশ ছেড়ে আসার বেদনা-রক্তিম স্মৃতি। হাজার কাঠির ঢাক বেজে ওঠার শব্দ। 'চোখের পাতায় বইতে থাকে খাল, খালের পাশে শ্যাওলা জমা মঠ।' একের পর এক ছবি—নেমে আসার জমি, যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তাল-সুপুরি, সবাই ঘুমন্ত (সবার চোখে উপুড় করা প্রদীপ)। কেবল জেগে আছে 'পাটাতনের পাঁজর ভাঙা চলন্ত মাস্তুল।' তখন—

> ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে রাখে কেবল দূরের
> মাটি, আমার বিলীয়মান মাটি

নীলুর শেষবার দেশের মামাবাড়িতে যাওয়ার বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের শুরু আর দ্বাদশীতে দেশ ছেড়ে চলে আসার বিদায়পর্বে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। মাঝখানে বোধনের ঢাক থেকে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর বলি, আর দশমীর বরণশেষ, একাদশীতে ফুলমামীর অন্তর্ধান, দ্বাদশীতে বিদায়। চকিতে মনে পড়ে—

১। সহস্রে বাজিয়ে দেব নবমীর ন-হাজার ঢাক (প্রতিভা)
কিংবা, ২। পুজো বাড়ি মনে পড়ে ? নবমীর বলি ? (ব্যভিচার)

উপন্যাসের বর্ণনায়—'সব বাড়িতেই জোড়াবলি, আর অনেক ঢাক মিলিয়ে একসঙ্গে যেন শব্দের ঢেউ ছড়িয়ে যায় গোটা গ্রাম জুড়ে।' (পৃ. ৫২)। 'বেজে উঠল হাজার কাঠির ঢাক' আর নবমীর বলি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় যে ছাপ রেখে গেছে তার উৎস ঐ কৈশোর স্মৃতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

উপন্যাসের নবম পর্বে বর্ণনা আছে আরতিনাচের : 'মাথার ওপরে একটা আর দুহাতে দুটো ধুনুচি নিয়ে ফটিককাকুর আরতিনাচ শেষ হয়ে গেল। ওই-রকম তিন তিনটে আগুন জ্বালা ধুনুচি নিয়ে কেমন এঁকেবেঁকে নাচে ফটিককাকু, গন্ধভরা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যায় সব, চোখ অবশ্য জ্বালা করে একটু।' পাশাপাশি যদি পড়া যায় 'দশমী' কবিতাটি—

যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া
দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুনুচির অন্ধকার

আবার উপন্যাসের দশম পর্বে দশমীর বরণ শেষ হয়ে যাবার পর "মণ্ডপ ছেড়ে আসবার সময় দিদিমা একবার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দুর্গাপ্রতিমার মুখখানার দিকে ; আর বলে, প্রতিবারই বলে : 'ছাখ, ছাখ ভাগবতীর চোখে কেমন জল।' পাশাপাশি 'দশমী' কবিতার লাইন—'ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল।"

এইভাবে কবিতা আর উপন্যাসের মধ্যে তৈরি হয় এক সংযোগ। 'প্রহর জোড়া ত্রিতাল' কাব্যগ্রন্থে 'অবিশ্বাস' কবিতার যখন পড়ি—

খালের ধারে উথলে ওঠে বিসর্জনের ঢাকী
এই দশমীর মিছিলে দেখছিলে

তখন এই সংযোগ আবার স্পষ্ট হয়। 'ফেরা' কবিতায় রয়েছে এক ফিরে আসার রাতের বর্ণনা—

ধক ধক জল কাটছে ষ্টিমার
আরেকবার বাঁক নিলেই
দূরে ওই সারি সারি ঘাটের আলোয় চাঁদপুরের ডক।

উপন্যাসের দ্বাদশ পর্বে বিদায়ের বর্ণনাটি এইরকম—'বসে পড়ে নীলু আসনে। যাত্রা কাজটা শক্ত না। ওই আসনে বসে বড়োদের প্রণাম করতে হবে। একে একে, ধান দুর্বো মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করবেন তাঁরা। তারপর

আমের পল্লব বসানো সিঁদুর মাখানো ঘটের কাছে মাটিতে মাথা রেখে মনে মনে চাইতে হবে বিদায়, আর তারপর সেই কলসের টলটলে জলে নিজের মুখের ছায়া দেখতে হবে নিচু হয়ে, মনে মনে বলতে হবে 'আবার আসব', তারপর উঠে পিছনে দিকে একবারও আর না তাকিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে একেবারে ঘরের বাইরে।' এই বর্ণনার সঙ্গে 'বিদায়' কবিতার শেষ দুটি লাইনের আশ্চর্য মিল—

থালায় ভরা জল। আমি সেইজলে মুখ দেখে
বিদায় নিতে চাই '

উপন্যাস শেষ হয়েছে যে বিদায় বর্ণনায় সেখানে 'প্রণাম মাটি, প্রণাম সাঁকো, প্রণাম ঢাক কাঁসর। টিনের চালা, নিকোনো উঠোন, হাটখোলা, প্রণাম। পাশাপাশি 'ছুটি' কবিতার লাইন—

সবতো ঠিক করাই আছে। এখন কেবল বিদায় নেওয়া,
সবার দিকে চোখ,
যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম।

এই দেশ হারানোর ট্র্যাজেডি থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি লেখেন,

কী ছিল বয়স কী ছিল হৃদয়, তখন
পদ্মা আমাকে দিয়ে দিয়েছিলে বিদায় (একা)

অথবা,

আমার মুখে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত
আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর
দেশজোড়া স্মৃতি। (দেশহীন)

পুরনো দিন বা স্মৃতি এককথায় অতীত চারিতা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় কখনো কখনো অত্যন্ত স্পষ্ট।

কোথায় রেখে দিয়েছিল জোড়াদিঘির পদ্মপাতা
কিশোরবেলার একাকিনী
এখন কেন জটাজুটের ভস্মলেখায় সরিয়ে নাও
চোখের উপর টলোমলো
পুরনো দিন? (ঘণ্টাঘর)

এই চোখের উপর টলোমলো পুরনো দিন 'অলস জল' বা 'ফুলবাজার' কবিতা

ছাড়াও 'জাবাল সত্যকম'-এর মতো কবিতায়ও ঠাঁই করে নেয়—'পদ্মার তুফান দেয় টান নৌকো খান্ খান্।' 'এখন সময় নয়' কবিতায় 'কিংবা উথলে উঠতে ঝোড়ো রাতে পদ্মার মত্ত ভালোবাসায়' পড়তে পড়তে আমাদের মনে পড়ে পদ্মপারের ছোট্ট জন্মভূমিতেই বারো বছর বয়সে শুরু হয়েছিল এই কবির ছন্দমেলানোর খেলা।

এই যে উপন্যাসের বর্ণনার সঙ্গে কবিতার মিল খোঁজার চেষ্টা তাকে কেউ কেউ ভাবতে পারেন এক ধরনের ব্যভিচার। মনে পড়ছে এলিয়টের সাবধান-বাণী, কোনো কবিতার অর্থ কবিতা-বহির্ভূত ঘটনার মধ্যে খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা বহুক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। কিন্তু কবির জীবন-যাপন, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি বা অনুভব, বাল্য কৈশোরের স্মৃতি, তাঁর অন্তর্বিশ্ব ও বহির্বিশ্ব কবিতায় যে ছাপ ফেলবে সে তো স্বাভাবিক। যেমন লিণ্ডন গর্ডন বা পিটার অ্যাক্রয়েড পড়ে এলিয়টের ব্যক্তিজীবনও কবিতার নানা অনুষঙ্গের মধ্যে সহজ যাতায়াতের এক বাতাবরণ গড়ে ওঠে। একটি বাল্যঘটনার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন পিটার অ্যাক্রয়েড। জন্মশহরে তাঁর শেষতম যাতায়াতের কোন এক সময়ে মেরি ইনষ্টিট্যুট-এর মেয়েদের সম্বোধন করে একসভায় এলিয়ট বলেছিলেন এক মজার ঘটনা। এলিয়ট যে বিশাল দোতলা বাড়িতে জন্মেছিলেন তার পাশেই ছিল তাঁর ঠাকুরদা প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুল মেরি ইনষ্টিট্যুট। এলিয়েটের বোনেরা এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। এই স্কুলের মাঠে ছোটবেলায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের বাগান আর স্কুল প্রাঙ্গণের মাঝখানে ছিল একটি পাচিল। এই পাচিলের পেছন থেকে এলিয়ট শুনতে পেতেন বালিকাদের কলকাকলি, কিন্তু তাঁদের দেখতে পেতেন না। পাঁচিলের মধ্যে ছিল একটি তালাবন্ধ দরজা, সেই দরজার ছিল একটি চাবি। অপরাহ্নে যখন মেয়েরা চলে যেত, ছোট্টবালক এলিয়ট তখন চাবি দিয়ে কখনো কখনো দরজা খুলে স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়তেন। মাঝেমাঝে তিনি ছুটি হয়ে যাওয়া স্কুলের শুনশান্ করিডর ধরে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু একদিন তিনি বেশ তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন ওখানে। মেয়েরা তখন জানালা দিয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পালিয়ে এলেন। পাচিল, দরজা, চাবি, করিডর, শিশুদের কণ্ঠস্বরের আওয়াজ—এইসমস্ত অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি 'বার্নট নর্টন' ও অন্যত্র ফিরে ফিরে এসেছে অন্যান্য চিত্রকল্পের মতো। 'দান্তে' প্রবন্ধে এলিয়ট লিখেছিলেন, 'genuine poetry can commnnicate before it is understood'। এই সিদ্ধান্ত মান্য করেও কবিতার বিশ্লেষণে আত্ম-প্রসঙ্গের অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না। যেমন ভালেরি এলিয়ট

সম্পাদিত পত্রাবলী প্রকাশের পর জানা গেল Prelude কবিতার The notion of some infinitely gentle/Infinitely suffering thing, এই লাইনগুলি লেখার পেছনে ছিল এলিয়টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বধিরতা। শৈশবে 'স্কারলেট ফিভার'-এর কারণে হেনরি বধিরতার ভুগেছিলেন। এই তথ্য না জেনেই এতোকাল কবিতাটির রস আস্বাদন করেছি। বাড়তি এই তথ্য, এলিয়টের আত্মপ্রসঙ্গের সূত্রে, চিত্র কল্পটির উৎস নির্ধারণে নিশ্চয়ই সহায়ক। দুটি শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রেও তাঁর যৎসামান্য আত্মজৈবনিক রচনা আর দুটি কিশোর উপন্যাসের (সকালবেলার আলো/সুপুরিবনের সারি) পরিপ্রেক্ষিতে কবিতার কিছু কিছু অনুষঙ্গের রহস্য অনুধাবন করা হয়তো সম্ভব।

কিন্তু উপন্যাসের নীলুর জীবন আর শঙ্খঘোষের আত্মপ্রসঙ্গ কি একাকার করে ভাবা ঠিক? ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'সকালবেলার আলো'। সেখানে নীলুর ছোটমামার গানের প্রসঙ্গ আছে এইভাবে—

'ঠিকই বলে ছোটোমামা! চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে দোপাটি ফুলের পাতা, ইস্কুল বাড়ির দিক থেকে বয়ে আসছে ফিনফিনে হাওয়া, মাঝে মাঝে একটু দোল দিয়ে যায় ডালিম গাছের ডালে, আর সেই খোলা আকাশের নিচে বসে গান গায় ছোটোমামা: 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী— ।' (পৃ. ৬৯ / ২য় সংস্করণ)। একটু আগেই উল্লেখ আছে,—'ডালিম গাছের নিচে মাদুর বিছিয়েই কত রাত্রে গান গেয়েছে ছোটমামা'। নীলুর এই ছোটমামার সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের ছোটমামার যেটুকু অমিল তা' ঐ ডালিম গাছের সঙ্গে আমগাছের। আট বছর পরে লেখা (১৯৭২) 'পা তোলা পা ফেলা' নামের আত্মজৈবনিক রচনায় এই প্রসঙ্গের বর্ণনা—'আর নয়তো আমাদের বাড়ির সামনে জ্যোৎস্না-ধোয়া আমগাছের নিচে যখন গলা খুলে দিতেন ছোটোমামা 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী / তারে বুঝিতে পারিনি।

কিশোর উপন্যাস দুটির আবহে আত্মজীবনের ছায়া পড়েছে এইভাবেই। কল্পনার মিশেল আছে নিশ্চয়ই কিন্তু পরিবেশ ও ঘটনার নানা বিবরণ নিজের জীবন থেকেই নেওয়া। 'সেই পদ্মাপারের ছোট্ট জন্মভূমি' তার অনুভবের শিরায় শিরায় বইয়ে দিয়েছে জলস্রোত। জলের অনুষঙ্গ ছাড়া শঙ্খঘোষের কবিতা প্রায় অসম্ভব। অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ,'অলসজল' কবিতায় 'পা ডোবানো অলস জল' বা 'ছলাৎছল শব্দ', 'ফুলবাজার' কবিতায় 'সেদিন যখন হেসেছিলে সত্যি মুখের ঢেউ ছিল না!' বা 'ছলছলানো মুখোশমালা' কবির বিন্দু-বিন্দু জীবনযাপনেরই চলচ্ছবি। তাঁর কবিতায় অন্ধকার-ও 'ভীষণ তরল'। দে'জ প্রকাশিত 'কবিতা সংগ্রহ' (প্রথম প্রকাশ : ১৩৮০) থেকে কিছু লাইন তুলে দিচ্ছি—

১। আলোর তরল জলে ভেসে যাব করে। (বাড়ি / পৃ. ৮৪)
২। পিছ-দুয়ারে ছায়া খরস্রোতা। (ঘর-১ / পৃ. ৮৫)
৩। (ক) ঘুমন্ত ঘরের নীলজল
(খ) এইরাত মৃদুজলঢেউ (মধ্যরাত / পৃ. ৮৭)
৪। দিঘিভরা অবসান (নিজের আয়না / পৃ. ১০০)
৫। (ক) বুকের গেরুং জল
(খ) সাঁওতালি দিঘিতে
(গ) নীলস্রোত (সুন্দর / পৃ. ১০৭)

কবিতার বিষয় যেখানে 'কিউ' সেখানেও –

জলের সঙ্গে স্রোতের সামনে
মুখের সঙ্গে আলোর সামনে
মানুষ মাছি অন্ধকার একটু নড়ুক চড়ুক (পৃ. ৭৪)

'জল' (পৃ. ৮৪) বা 'খাল' (পৃ. ৮৭) কবিতায় তো বটেই 'যেন কোনদিন' (পৃ. ৮৯) কবিতার অনুষঙ্গে, 'যাবনা সাগরে' কবিতায় জল এক অবশ্যম্ভাবী উপকরণ।

পুরনো খালের নিচে ঘন সবুজের স্রোত
নৌকা ভেসে যায়,
দিগন্তে দুয়ার খুলে মাঝেমাঝে ভেসে যায়
কে যায়, কে যায়? (পৃ. ৯৩-৯৪)

এইরকম আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

জলস্রোত বহুদূরে টেনে নিয়ে যেমন পাথর
জলহীন টলটল শব্দ করে (নাম / পৃ. ৯৬-৯৭)

'বাবার মতো নই' (পৃ. ১০৪) কবিতায় 'গভীরে কী তপ্ত জল' বা 'শুশ্রূষার ধারাস্নানে'; 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' কাব্যগ্রন্থে 'জলস্রোত' নামে কবিতা-গুচ্ছ; আবার 'এই নদী, একা (পৃ. ১১৩) যদি-বা কবিতার নামেই তোলে মৃদুজলঢেউ, 'শুশুনিয়া' (পৃ. ১১৪) কবিতায়ও জল উপস্থিত—'সতেজ ঝর্নার জল ঠোঁটে' বা 'জলই জীবন, দস্যু জল –'। 'ভূমধ্যসাগর', 'আরুণি উদ্দালক', 'জাবাল সত্যকাম' এই কবিতাগুলিতে জলের বিশাল উপস্থিতির পাশাপাশি 'দুই হাতে দুই প্রান্ত' (পৃ. ১১৯) কবিতায় –

(ক) পথের মধ্যে নামিয়ে এনে হঠাৎ তুমি ডুব দিয়েছ জলে
(খ) কোথায় যাবে? জল না আকাশ? কোন্‌খানে কার জলকিনারা থাকা?

শঙ্খঘোষের কবিতায় জল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে।

বিচিত্র অনুষঙ্গে জল ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। যেমন—

১। জল নেমে যায় বটে, জলের অন্ধতায়
তখনো নামে না (খোলামাঠ / পৃ. ১২৮)

২। জলহীন উপবাসে (ভয় / পৃ. ১২৯)

৩। শুধু দেশ ঘিরে ধরে জলময় আঘাতে আঘাতে
মগ্ন প্রাচীরের মতো ধ্বসে যায় আমার স্থিরতা
ওকে তুলে নিয়ে যায় নিশ্চিত অস্থির জলরাশি। (আদমের জন্ম নয় / ১২৯)

৪। তোমার গলিতদেহ ভেসে যায় বারোমাসি স্রোতে (খুকু / পৃ. ১৩৭)

৫। মৃত্যুর আগের লগ্নে জলে জেগে ওঠে নীল গলা : (ঋণ / ১৩০)

৬। তুমি আছো আমি আছি আমাদের ভয় ও বিবেক অনায়াসে মসৃণ
পাতার থেকে অনাবৃত জলে ঝরে যায় (আনন্দ / পৃ ১৪৩-৪৪)

৭। এত যে প্রণয় করো, অতীতের জলস্রোত এড়াতে পারোনা।
(ব্যাভিচার / পৃ. ১৪৬)

৮। বুকের প্রপাত ঝরে যায়
এতগুলি ডিঙা তুমি কোথায় পেয়েছ ভুলে যাই
বুকে প্রপাত ঝরে যায়

জল, এত জল, শুধু চারিদিকে জল খেলা করে
বুকের আকাশ সরে যায়
এমন প্রপাত ঝরে যায় (প্রপাত / পৃ. ১৪৭)

৯। থালায় ভরা জল (বিদায় / পৃ. ১৪৮)

১০। হাঁটুর মধ্যে জলস্রোত (আউট / পৃ. ১৮২)

১১। প্লাবিত সময় ধরে বয়ে আনে জলীয়তা, তার
ভেসে-ওঠা ভেলা জুড়ে অনন্ত শয়ন লাগে ভালো? (মূর্খবড়ো, সামাজিক নয় / পৃ. ২০৫)

১২। জলস্রোতে ভাসে সময় (মুখোশমালা। পৃ. ২০৭)

১৩। ...আর / নিহিত শীতের রাত্রে তালবীথি দেখেছে আগুন / ওই স্বচ্ছ
জলে? (বাজি / পৃ. ২০৮)

১৪। সুপুরি ডানার শীর্ষে রূপালি জলের প্রভা ছিল (সেদিন অনন্ত মধ্যরাত / পৃ. ২১৮)

'বৃষ্টি' (পৃ. ২০৫), মণিকর্ণিকা (পৃ. ২২১-২২), 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের 'বন্দি' (পৃ. ১২), 'সংকেত' (পৃ. ৬২) বা 'সমুদ্র সূর্যাস্ত শবদেহ'

(পৃ. ৬৩) প্রভৃতি কবিতায়ও জলের অনুষঙ্গ উপস্থিত। পাতা উল্টে গেলে চোখে পড়ে এক 'প্রহর জোড়া ত্রিতাল' কাব্যগ্রন্থেই জল কতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'জলের মতন সহজ হব' (পৃ. ২৬) থেকে শুরু করে 'চোখে ঘোলা গঙ্গাজল' (ঘোলাজল/পৃ. ৩৪)

সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর 'নিহিত পাতাল ছায়া' কাব্যগ্রন্থের 'জল' কবিতাটিই যেন ভাস্বর হয়ে ওঠে, যেন ওখানেই 'নিবিড়ের সজলতা' আর 'দিনের রাতের জলভার'-এ বলে দেওয়া আছে জল কেন এত ব্যাপ্ত তাঁর কবিতায় জলহীন শুষ্কতায় কেন-ই বা ভাবা যায় না তাঁর কবিতা। মাত্র চার লাইনের এই কবিতাটি—

জল কি তোমার কোনো ব্যথা বোঝে ? তবে কেন তবে কেন
জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে ?
জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয় ? তবে কেন, তবে কেন
কেনে ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার ?

'The River and the Sea' নামে শৈশবস্মৃতিময় এক গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা ছিল এলিয়টের। বইটি শেষ পর্যন্ত লেখার আর দরকার হয়নি। এই দুটি প্রাকৃতিক শক্তি তাঁর কবিতার মধ্যে এতোটাই উপস্থিত যে, পিটার অ্যাক্রয়েডের ভাষায়, these two natural forces run through all of his poetry, remembered even when they are absent in the landscape of desert or dry rock. 'জল' শঙ্খ ঘোষের কবিতায় এই রকম ব্যাপ্তি নিয়েই উপস্থিত বলে মনে হয়।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে গৈরিকতা, সন্ন্যাস আর কমণ্ডলু। 'কবিতাসংগ্রহ' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি—

১। বুকের গেরুয়া জল (সুন্দর/পৃ. ১০৭)
২। ফিরে যায় গৈরিক গোধূলি (অশুচি/পৃ. ১১৬)
৩। নিথর পাহাড় গৈরিক সন্ন্যাসে
বলে, একি নিছক ভ্রমণ ?··· (ভ্রমণ / পৃ. ১১৯)
৪। কমণ্ডলু হাতে নিয়ে অনায়াসে সরে যাওয়া হাওয়ায় যেমন জল ধ্বনিময়, বিরলতা/পৃ. ১৬৬)
৫। সন্ন্যাসী হয়েছে হাওয়া দু'হাত জেনেছে গৈরিকতা (সন্ন্যাসী হয়েছে হাওয়া। পৃ. ২০৬)
৬। সন্ন্যাসী হয়েছ সবটুকু ?
সবটুকু। (বাকি। পৃ. ২০৮)
৭। (ক) পথ গিয়েছে বৈরাগীদের বুকে৷

(খ) এই গোধূলি অনন্ত সন্ন্যাস
(গ) সঙ্গিনী যায় বৈরাগী গৌরবে

(বৈরাগীতলা । পৃ. ১৭, প্রহর জোড়া ত্রিতাল)

৮। ঝুলির মধ্যে নামঠিকানা, মিলিয়ে যায় দূরে
হাতের কমণ্ডলু, পায়ের খড়ম। (সন্ন্যাস, পৃ. ২৪ ঐ)

শঙ্খ ঘোষের কবিতাকে ,সৌরলোক' বা 'মহাসময়ের শূন্যতল যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়েছে তার মূলেও রয়েছে তাঁর শৈশবের অনুষঙ্গ। যেমন— "ছোটোবেলায় অন্ধকার উঠোনের ইজিচেয়ারে শুয়ে যে রাত্রিবেলার আকাশ দেখাতন বাবা, তার চেয়ে কত ভিন্ন এটা। একদিন এই পৃথিবী নাকি ছিল না, তার আগেও একদিন ছিল না, এই গ্রহতারাময় বিশ্বলোক, এই কথা শুনে তখন বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেত হঠাৎ। না থাকাটা ছিল কোথায়? কোন্ ধারণাতীত পাত্রে? (পা তোলা পা ফেলা)। পাশাপাশি যখন পড়ি 'এখন সময় নয়' কবিতাটি—"এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকত না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকত সেই না-থাকা. কোন্ পাত্রে? অন্তহীন এই নাস্তি যখন হা হা করে এগিয়ে আসে চোখের উপর, দুলে ওঠে রক্ত—যখন তুমি কথা বলো মহাশূন্যে অন্ধকারের ফুটে ওঠার মতন, সেই তোমার ভাষা হোক প্রথম আবির্ভাবের মতো শুচি, কুমারী—শস্পের মতো গহন, গম্ভীর (পৃ. ৯৫ / কবিতা সংগ্রহ)। 'রাত্রিবেলার ক্লাস' নামের গদ্যরচনায়ও রয়েছে এই অনুষঙ্গ—'তারায় তারায় ভরা মস্ত এই খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবতাম তখন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমরা তাহলে কতটুকু? কতই ছোট্ট? নিজেদের এই অণুত্বের বোধ নিয়ে এক রাত্রির ক্লাসেই যেন অনেকখানি বড় হয়ে উঠতাম আমরা।'

বিভিন্ন কবিতায় ছোটোবেলার এই অনুভূতির ছায়া দেখতে পাই। যেমন—

ক) নীল পটভূমি ফলভরে নিয়ে যায় সৌরস্বভাবের দিকে দায়হীন

(বিরলতা / পৃ. ১৬৬)

খ) এত ছোটো দুটি হাত স্তব্ধ করে ধরেছ করোটি
মহাসময়ের শূন্যতলে— (অঞ্জলি / পৃ. ১৭২)

গ) এই অন্ধকার মণ্ডলের গহন থেকে আমার শব্দহীন স্তব যেন পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে যায় স্বর্গীয় ঈথারে (রেডরোড / পৃ. ১৭২)

ঘ) মুহূর্ত মুহূর্ত শুধু জন্মহীন মহাশূন্যে ঘেরা (পাথর / পৃ. ১৭৩)

ঙ) সপ্তর্ষির দিকে উড়ে যায় শহরের ঘর (বেজে উঠল ঢাক / পৃ. ২৩৬)

চ) ঠিক তখনই সৌরধুলোয় অন্ধ,……(বৈরাগীতলা / প্রহরজোড়া

ত্রিতাল পৃ. ১১)

এই যে 'সৌরস্বভাবের দিকে' 'মহাসময়ের শূন্যতল' বা 'স্বর্গীয় ঔথারে' কিংবা 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' কাব্য গ্রন্থের 'বর্ম' কবিতায়—

দাঁড়ায় দুয়ার প্রান্তে সমস্ত বিশ্বের স্তব্ধতায়
শরীর বাঁকিয়ে ধরে দিগন্তের থেকে শীর্ষাকাশ
আর মুখে জ্বলে থাকে লক্ষ লক্ষ তারার দাহন

অথবা, 'শূন্য থেকে শূন্যতায় অস্ফুট নিশ্বাস'—এই সমস্ত কিছুরই উৎসমূলে ছোটোবেলায় ইজিচেয়ারে শুয়ে যে রাত্রিবেলার আকাশ দেখাতেন বাবা কিংবা রাত্রিবেলা ছাত্রদের নিয়ে মাঠে যেতেন মাষ্টারমশাই তার প্রভাব থাকা আশ্চর্যের নয়।

'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থে 'শূন্যের ভিতরে ঢেউ' কবিতার শেষ দুটি লাইন— শূন্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে
সেকথা জানো না?

'সকালবেলার আলো'তে একটি বর্ণনা আছে নীলু, বিট্টু আর গগনস্যারের রূপপুর গাঁয়ের একেবারে ভেতরে যাবার। যেতে যেতে, "এখান থেকেও চোখে পড়ে ত্রিজটা। বা:, এই রকম দেখায় বুঝি এখান থেকে? নীলু দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখুন স্যার, কীরকম দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোথাও কিছু নেই, শূন্য থেকে একটা যেন ঢেউ উঠেছে আকাশে।'

কিন্তু এইভাবে নির্মিত কোন আত্ম-ইতিহাস থেকে কি গড়ে তোলা যাবে শঙ্খ ঘোষের কবিতার গভীরতা ও রহস্যময়তার দর্শন? শৈশব কৈশোরের স্মৃতি তথা ছোটোবেলার কোনো কোনো ঘটনা কবিতার চিত্রকল্পে কখনো কখনো ব্যবহৃত হলেও কবিতার অতল রহস্যের ঠিকানা সবসময় এইসব উপকরণের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।

শেফালী মৈত্র

...

শব্দ ও নিঃশব্দ

'সবটা বলার কথা নয়
কথার শরীরে মাথা রেখে
কেবল হারিয়ে যেতে হয়।'
—শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শব্দ যখন তিরস্কার করে বলে ওঠেন 'এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো / শব্দহীন হও......।'[১] তখন তিনি কাকে বা কাদের শাসন করছেন? কী তাঁর অনুযোগ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি হয়ত বলবেন অনুযোগের হেতু একটা নয়—'অনেক'। একই কথা বার বার ব্যবহার করে যাচ্ছি যন্ত্রের মত—নিষ্প্রাণ উচ্চারণ। প্রায়শ না ভেবে অনেকটা নিত্য কর্মের মত পুনরাবৃত্তি করে যাই নানা শব্দ ও শব্দবিন্যাস—গানে, কবিতায়, গদ্যে। বহুল ব্যবহারে সেই শব্দে আর বক্তা কিছুতেই প্রাণবায়ু সঞ্চালন করতে পারে না। অভ্যাসবশে কথা বলার ফলে শব্দ প্রয়োগ হয়ে যায় নির্গুণ নিরনুভব। 'পুরোনো শব্দগুলিতে শুকনো ছেঁড়া কাগজের মতো খসখসে আওয়াজ হয়, প্রকাশহীন নির্জীবতা তার সমস্ত অবয়বে।'[২] এমন করে মানুষ যদি একটি ভাষার পরিবহণ অক্ষমতা বুঝেও তার নির্জীবতা উপলব্ধি করেও, তাকেই সঞ্চারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম বলে মেনে নেয় তা হলে সমূহ বিপদ। ভাব আর ভাষার সম্বন্ধ হওয়ার কথা অনুস্যূত। এদের মধ্যে আড়াআড়ি সম্বন্ধ বেশীদিন টিকতে পারে না—সম্পর্ক ভেঙে পড়বেই। তখন, হয়, ভাবের রাজ্যে বন্দী থেকে মৌনী হতে হবে অথবা প্রাণহীন ভাষার বেষ্টনে ভাবও হয়ে যাবে অসার। অসার ভাব আর প্রাণহীন ভাষার অবৈধ জোট অসীম অমঙ্গলের জন্মভূমি হতে পারে। এমনই অবৈধ জোটকে অবলম্বন করে সারা দিন—দিনের পর দিন—আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি খেলা খেলি—বড় ক্লান্তিকর বড় গ্লানিদায়ক, এই খেলা। বিশেষ করে যখন 'অভ্যাসবশে কথা বলা আর মিথ্যে বলার এই সমূহ সর্বনাশ শিল্পেও তার চিহ্ন রেখে যায়'[৩] তখনই একটা বিবমিষা থেকে গুলিয়ে ওঠা চিৎকার শঙ্খের গলায় শুনতে পাই—'সুলভ, সুলভ, এত সুলভ

বড় বাজারে।'[৪] এমনই একটা অনুষঙ্গে আমাদের মানে করে নিতে হয় তাঁর অভিযোগের—'এত বেশী কথা বল কেন ?'

তবে কি শব্দজাত মিথ্যায় তিতিবিরক্ত হয়ে শঙ্খ শব্দ থেকে পালাতে চাইছেন, চাইছেন কোন অনির্বাচ্যের একক সাধনায় মন দিতে ? বড় বিষাদ, বড় হতাশা, বড় নিষ্ফলতা থেকে উঠে আসছে এই নৈঃশব্দের সিদ্ধান্ত। তবু শব্দ থেকে পালাতে চান না তিনি—তাঁর চুপ করে থাকা খুব সাময়িক। উদ্দেশ্য: চিত্তশুদ্ধি মাত্র—শব্দকে বাঁচানর আমরণ লড়াই-এর এটাও একটা পর্ব। চলতে চলতে নিজেকে ঘুরে দেখার একটা প্রক্রিয়া। ঘুরে তাকিয়ে কী মুখচ্ছবি দেখছেন কবি ? দেখছেন 'আমরা সব লোকপুরাণের গুঁড়ো মেখে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসছি, হতে চাচ্ছি স্বয়ংপুরাণ'[৫]। এ তাঁর কাছে অসহ্য 'নিষ্ফলা কথায় দিন কাটে দ্রুত, রাত্রে ঘরে ফিরে [দেখেন] হাতে সঞ্চয় ঘটেনি কিছু'।[৬] এরপর বেঁচে থাকার স্পন্দন অনুভব করতে, নির্মাণ আর সৃষ্টির ধারাপাত আয়ত্ত করতে শঙ্খর 'মনে হয় ফিরে এসে স্নান ক'রে ধূপ জ্বেলে চুপ ক'রে নীল কুঠুরিতে / ব'সে থাকি'।[৭] এটাই হয়ত আর একভাবে ওঁর আকৈশোর স্বপ্ন-সহচর শচীনেরও বাসনা ছিল যখন লিখলেন 'কবি নয়তো ঋষির মতো উৎস ছুঁয়ে আসা'[৮]। প্রশ্ন জাগে 'তারপর কী ?' ভাষার ফাঁকি-টুকু ধরিয়ে দিয়ে কবির কাজ কি স্নান করে নীলকুঠুরিতে বসে থাকা, আর মাঝে মাঝে নিজের শুদ্ধতা ভেঙে আমাদের শব্দ-জাত নিরর্থ সম্বন্ধে সাবধান করা, যেমন সাবধান করেছিলেন দার্শনিক হিটগেনস্টাইন ? না, এটা শঙ্খদের পরিকল্পনা নয়। স্নান করে ধূপ জ্বেলে বসে থাকাটাই উদ্দেশ্য নয়—অসংখ্য অসার কথনের প্রায়শ্চিত্তও নয়—এটা একটা প্রস্তুতিপর্ব মাত্র। এর লক্ষ্য একটাই—মিথ্যার জাল কেটে বেরিয়ে আসা।

কৌতূহল জাগতে পারে চুপ করে বসতে হ'লে নীল কুঠুরিতে কেন—হিমালয়ের কোন বা কোন নির্জন দ্বীপ কি আরো যোগ্য স্থান হতো না ? না চুপ করে থাকার জন্য, শব্দহীন হওয়ার জন্য প্রকৃতির আশ্রয় কাম্য নয় 'কেননা প্রকৃতিও বিষম বাচাল'[৯]। নিঃশব্দের একটিই অধিষ্ঠান—মানুষের বুক, 'মৌন জানে শুধু মানুষেরই বুক'[১০]। শব্দের এই উচ্চারণ নিছক আক্ষরিক অর্থে বুঝলে বিপত্তি দেখা দেবে কেননা এই উদ্ধৃতির পরবর্তী অংশে আছে—'দুয়ের মধ্যে সম্পর্কেই আছে মৌনের বীজ'[১১]। দুই বা ততোধিক থাকা আবশ্যিক, এক বা একের পুনরাবৃত্তিতে নীরবতা আশ্রয় পায় না। যদিও দুই-এর স্বরূপ সম্বন্ধে মতের ভিন্নতা থাকতে পারে। কীয়েৰ্কেগার্ডের দুই হলো মানুষ আর ঈশ্বর, আর তাদের মধ্যে সম্পর্কেরই অন্য নাম নীরবতা। সে নীরবতা এমনই লাজুক যে কথা বললে তা ভেঙে যায়। শঙ্খ যে নীরবতার সন্ধান আমাদের

দিতে চাইছেন, নিজেও খুঁজছেন অনবরত, তাও সম্পর্ক নির্ভর। একটা শব্দের সঙ্গে আর একটা শব্দের, একটা পদের সঙ্গে আর এক পদের সম্পর্কের মধ্যে নীরবতা বাসা বেঁধে থাকে। এই সম্পর্ক ঐশ সম্পর্কের মতই পবিত্র এবং গভীর অথচ কখনই নিশ্চল নয়—পরিবর্তনকামী।

শব্দ মধ্যবর্তী অবাচ্যতার স্বরূপের ওপর নির্ভর করছে কবিতা এবং গদ্যের সার্থকতা। শঙ্খ বলেন 'কবিতাতেই বলো আর গদ্যেই বলো, শব্দকে ধরে রাখে তার ছন্দ বা স্পন্দন অথবা একই সঙ্গে বলা যাক ছন্দস্পন্দ'[১২]। সার্থক ছন্দস্পন্দ গড়ে তোলাই সৃজনশীল কবির সাধনা। তাঁর সাধনা নীরবতার সাধনা কিন্তু নীরব সাধনা নয়। শঙ্খ চান ভাষা দিয়ে ভাষার মিথ্যেকে জয় করতে 'নীরব দিয়ে নীরবকে নয়, শব্দ দিয়েই নিঃশব্দকে ধরতে চান লেখক'[১৩]। আর তাই তাঁর কেবলি মনে হয় 'মানে অপমানে। সমস্ত শব্দের কাছে আমার ক্রমেই ঋণ বাড়ে'[১৪]।

কেমন হবে এই নীরবতার সাধনা শঙ্খ সে কথা আমাদের কিছুটা বলেছেন, 'সবটা বলার কথা নয়'। এই সাধনার অভিপ্রায় প্রধানত দুটি। প্রথমটি শব্দ এবং শব্দ-বিন্যাসের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে তার প্রবহমানতা ফিরিয়ে আনা। দ্বিতীয়টি শব্দকে নবীনতার টেনে নেওয়ার অভিযান[১৫]। দ্বিতীয় অভিপ্রায় এক অর্থে প্রথমটির সম্প্রসারণ এবং সম্পূরক। যদিও শঙ্খ মানেন 'কবির শব্দ যেখানে থামে, আলোর সেখানে শুরু'। তবু কবিই পারেন তাঁর নীরবতার সাধনা দিয়ে সেখানে আমাদের পৌঁছে দিতে—সেই সব প্রতিশব্দহীন পরমতায়[১৬]।'

নীরবতার সাধন-প্রক্রিয়া জানতে চাইলে শঙ্খ অত্যন্ত বিপন্ন হবেন। তাঁর এত কথার আয়োজন এই সহজ সত্য উপলব্ধি করানর জন্য যে : নীরবতার সাধনা যাঁরা করেন তাঁরা শিল্পী, তাঁরা 'সৃষ্টি' করেন। এই সাধনা তাঁদের ব্যক্তিগত দর্শন-নির্ভর, এখানে তাঁরা মুক্ত। তবে মনে রাখতে হবে কবির সৃষ্টি অনৈতিহাসিক কোন স্বয়ম্ভু ঘটনা নয়।

প্রতিটি সৃজন ক্রিয়ার মধ্যে একটা আঘাত থাকে, কোন কিছুকে বদলানর ব্যাপার থাকে। ভাষায় সৃষ্টির স্থল দুটি : পদের অর্থ পরিবর্তন ও শব্দের অন্বয় পরিবর্তন। পদের অর্থ পরিবর্তন করে নতুন করে সৃষ্টির সুযোগ কম। নতুন শব্দ সৃষ্টি করে শব্দের ভাণ্ডার অনেকেই সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু শব্দ-সৃষ্টি শিল্প-সৃষ্টির ভেতরের কথা নয়। 'নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই' নাকি 'কবির অভিপ্রায়'[১৭]। কেমন করে হবে এই শব্দের নতুন সৃষ্টি? শব্দের নতুন সৃষ্টি করতে গেলে তার অনায়াস-পারম্পর্য ভেঙে ফেলতে হবে। একটি বাক্য বা শব্দজোটের মধ্যে সাজাবার যে পদ্ধতি তাকে বদলে ফেলতে হবে। 'ঠিক শব্দের উপরেই আঘাত তত জরুরি নয়, যতটা জরুরি মধ্যবর্তী ঐ অংশগুলির উপরে

আঘাত, দুই শব্দের সংযোগবিন্দুর উপরে'[১৮]। শঙ্খ মনে করেন ' দুই শব্দের সংযোগবিন্দুর উপর আক্রমণটাই সবচেয়ে জরুরী, এখানে যে মৃত বাঁধনে জড়িয়ে থাকে তারা, সেই বন্ধন খুলে দেওয়াই কবির কাজ'[১৯]। যে কোন ভাষা-দার্শনিকের মনে কৌতূহলী প্রশ্ন এখানে জাগবেই। শঙ্খ 'অন্বয়গত বিপর্যাস' বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন ? কোন কোন দার্শনিক মনে করেন অন্বয়ের আমূল নবীকরণ কখনও হয় না। কতগুলি বিকল্প শব্দবিন্যাসের নিয়ম আমাদের কাছে খোলা আছে। বাক্যের অর্থবহতা বজায় রাখতে গেলে যা কিছু অন্বয়গত পরিবর্তন সবই এই বিকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। নতুন কোন এতাবৎ অকল্পিত অন্বয়-কাঠামো অনুধাবন আমরা তখনই করতে পারি যখন তা আমাদের পরিচিত কাঠামোর সম্প্রসারণ বা আমাদের পরিচিত কাঠামোতে অনুবাদযোগ্য। এইভাবে এই দার্শনিকরা অন্বয়ের একটা ন্যূনতম মৌল কাঠামো স্বীকার করেন। তাঁরা শঙ্খের সঙ্গে একমত হবেন যে 'মুখের সচল ভাষা তার পরিবর্তমান উজ্জীবনী প্রাণ নিয়ে প্রবাহিত [হয়]'। কিন্তু প্রবহমানতা সত্ত্বেও বলবেন ভাষার একটা অপরিবর্তনীয় আকর বা essence আছে। এই essence টুকু না থাকলে আমাদের ইতিহাসের এপার থেকে ওপারে অনায়াস গমন সঙ্কুচিত হতো। দুই ভিন্ন যুগের মানুষ পরস্পরের কথা কখনই বুঝতে পারত না। শঙ্খ এই ন্যূনতম শৃঙ্খলের অমোঘতা মানবেন কিনা জানি না। কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রে মানবেন না বলেই দিয়েছেন—ছন্দ-মুক্তির শেষ আছে বলে উনি মনে করেন না। অন্বয়গত বিপর্যাস বিষয়ে ক্রমাগত নানা রকম কূট প্রশ্ন করে গেলে শঙ্খ হয়ত মৃদু হাসবেন, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলবেন 'কবির দায় ভাষা বানানোর, ব্যাকরণ বানায় অন্যে'।[২০]

যদিও ব্যাকরণ বানানো, এক অর্থে ভাষা বানানো, আর শব্দার্থ বদলানোও এক অর্থে ভাষা বানানো তবুও কবির ভাষা বানানো অন্যরকম। কবি যখন ভাষা বানান তখন 'প্রতি দুই শব্দের মধ্যে কবির মুখই ভেসে ভেসে সরে যায়, তখন কোনো শব্দকেই মনে হয় না মৃত······[২১]' কবি যখন আমাদের উপহার দেন নতুন ভাষা তাঁর কলম থেকে তখন আমরা পাই 'আমাদের স্নায়ু থেকে ঝরে যায় শেষ পিপীলিকা[২২]।' অথবা 'কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমারই বুকের দিকে / ঘুরেছে সূর্যের মতো শোক'[২৩]। আবার শহরপাপীর মত নতুন ব্যঞ্জনাময় শব্দ বিন্যাসেও ভাষাকে সমৃদ্ধ করছেন কবি। তবে কি রূপক বদলানর কথা বলছেন তিনি ? নাকি কোনভাবে লক্ষণার্থ ও ব্যঞ্জনার্থ বদলাতে চাইছেন তিনি ? ভাষা বদলের কথা নানাভাবে বলেছেন শঙ্খ। কখনও শব্দ শৃঙ্খলার মধ্যেকার সংযোগ আলগা করার কথা বলছেন—যার ফলে অন্বয় পাল্টে পাল্টে যায়। আবার কখনও বলছেন কবিতার ভাষার উচ্চারণ, অন্বয়, শব্দার্থ, বাক্যার্থ

তিরও একটা দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ আছে, যা তার প্রকৃতি গঠন; এই দৃশ্যগ্রাহ্য রূপের সঙ্গে আমাদের চোখের একটা যুক্ত চালাতে হবে।

ছাপার অক্ষরে যখন শব্দ পড়ি তখন শুধু তার অর্থ অনুধাবন করি না তার শব্দ বিশেষ আর শব্দ বিন্যাস 'দেখি'—এভাবে শ্রুতিতে এবং দৃশ্যে যেন একটা সংযোগ ঘটে কবিতার শব্দগুলির মধ্যে, শব্দের বর্ণের যেন নিজস্ব একটা অভিব্যক্তি আছে। শঙ্খ যাকে বলছেন 'শব্দেরও বর্ণেরও হাসিমুখ কান্নামুখ আছে, যেন বর্ণও কেউ ছুটে চলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে ....'।[২৪] তেমনি শব্দ পরম্পরারও যেন একটা দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ আছে। ছাপার অক্ষরে কবিতাটিকে দেখলে তখন ছবি মনে হয়। কখনও মনে হয় যেন পৃষ্ঠার ওপর শব্দ পরম্পরা দিয়ে একটা স্থাপত্য দেখতে পাচ্ছি, যেমন দেখতে পাই শঙ্খর 'পদ্মপল্লব' কবিতাটির দিকে তাকালে। আবার কখনও পৃষ্ঠার ওপর শব্দ পরম্পরা দেখলে মনে হয় গতিশীল কোন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, যেমন, শঙ্খের 'পতঙ্গ' কবিতাটির লাইন বিন্যাস দেখে মনে হয় যেন প্রকৃতই কাগজের ওপর আমরা কিছু ঝোড়ো পতঙ্গ, কিছু উড়ো পতঙ্গ কিছু গুঁড়ো পতঙ্গ দেখতে পাচ্ছি।

তবে অন্বয় পরিবর্তন, অর্থ পরিবর্তন বা শব্দের দৃশ্য রূপকে নিত্য নতুন করে সাজানো এই সবই শব্দের বহিরঙ্গের বদল। শঙ্খ বলেন এই সব বদলও একদিন ম্যানারিজমের রূপ নিতে পারে। তাই আরো গভীর আরো জোরালো আরো অভিনব বদল চাই। চাই শব্দের সংযোগ বিন্দুর ওপর আক্রমণ। সমস্যা হচ্ছে যে সেই সংযোগ বিন্দুগুলো আবার অদৃশ্য—নীরব কতগুলি বন্ধন।

শব্দ মধ্যবর্তী নীরবতাকে অব্যক্তের পরিমণ্ডল থেকে ব্যক্তের পরিমণ্ডলে টেনে এনে সর্বসাধারনের সামনে মেলে ধরা যায় না। মনে রাখতে হবে শব্দমধ্যবর্তী সংযোগকে বলা হচ্ছে অদৃশ্য আর বলা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে কবির আঘাত ও হবে অদৃশ্য।[২৫] সব উচ্চারণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক অনুচ্চারিত দ্যোতনা যা ধরার জন্য চাই দীর্ঘ প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতির প্রাথমিক স্তরের সর্ব প্রথম সোপান হলো নিঃশব্দের পূর্ণতাকে স্বীকার করা। নিঃশব্দকে উপলব্ধি করা অনেক পরের কথা 'কোথায় সে জল টল-টলে, কোথায়-বা জীর্ণ উদ্ভিদের শবে ভরা, কোথায় ঘুলিয়ে-ওঠা পঙ্কতিলক, তা কি স্থির বলে দেওয়া যায়।'[২৬] আর তাই শঙ্খ নানা ছলে নানা অছিলায় আমাদের খুব মৃদু অথচ দ্বিধাহীন স্বরে বলেন —চুপ করো—উপলব্ধি করতে শেখ—জেনো কবি শুধু ছন্দোবদ্ধ লয় সমেত শব্দ কাঠামো রচনা করে না তার অতিরিক্ত কিছু করে। সেই অতিরিক্ত কিছুর অভাবে কবিতা পদ্য হয়ে থাকে, কবিতায় উন্নীত হয় না। ভাষাকে কোন কবি কি করে বাঁচাবেন, বাঁচিয়ে রাখবেন, তা নির্ভর করে তাঁর অভিজ্ঞতা, ধারণা ও প্রেরণার ওপর। তাবলে যেমন তেমন অভিজ্ঞতা, ধারণা ও প্রেরণার

অধিকারীই কবি হতে পারেন কি? শঙ্খ বলেন 'যার ব্যক্তিত্বই প্রস্তুত নয় সে কেমন করে জানবে কাকে বলে মুক্তি?'২৭

২

যা বলার কথা নয়, বা শব্দহীন-নিঃশব্দ-তার অধিষ্ঠান, তার স্বরূপ, তার সংগ্রামী প্রয়োগ ফোটাতে গিয়ে কত কথাই না বলতে হয়েছে কবিকে। নিঃশব্দের ওপর লেখা শঙ্খর বিবিধ প্রবন্ধ যেন সেলিম চিস্তির সমাধির শ্বেত পাথরের জাফরির কাজ। তার পাথরের অংশটুকুর যেমন নক্সা তৈরিতে পাথরের বেষ্টনের মধ্যে যে ফাঁকটুকু দিয়ে আলো খেলে তার শৈল্পিক অবদানও কম নয়, হয়ত বেশী। অথচ শ্বেত পাথরটুকুই হলো অবয়ব ফাঁকগুলি অবয়বাশ্রয়ী অতিরিক্ত জ্যোতনা। এই ফাঁকটুকুর সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে শুরু করতে হবে নিরেট পাথরের জায়গা থেকে। প্রথমে এগুতে হবে 'নেতি' 'নেতি'-র প্রক্রিয়ায়, অবশেষে আলোকে ছোঁয়া যাবে, উপলব্ধি করা যাবে তার শক্তি। জাফরির এই উপমা দিয়ে শঙ্খর কথা খানিকটা হয়ত বোঝা গেল। নিঃশব্দ এখানে শব্দকে, বাক্যকে আশ্রয় করে আছে; তার নিজস্ব কোন স্বনির্ভর অস্তিত্ব নেই। শব্দকে আশ্রয় করে থাকলেও শব্দমধ্যবর্তী নীরবতা স্বরূপত এবং কার্যত শব্দ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরবর্তী কোন পর্যায়ে এককালে যা নিঃশব্দের কোটিতে রয়েছে, যা অনির্বাচ্য, তাকে ভিন্ন বাহনের সাহায্যে কাব্যের কোটিতে এনে প্রকাশ করা যাবে না—নিঃশব্দের রূপান্তর হয় না।

শব্দের সঙ্গে নিঃশব্দের কিছু প্রতিতুলনা চলে। যেমন বলা যায় নিঃশব্দ শব্দ নয়, ব্যঞ্জনা নয়, লক্ষণাই নয়, রূপক নয় এমনই আরো অনেক কিছু নয়। এই নঞর্থক উচ্চারণের পাশাপাশি নিঃশব্দের কিছু সদর্থক পরিচয়ও দেওয়া যায়, যেমন, বলা যায় শব্দজোটের মধ্যে নিঃশব্দ বাসা বেঁধে থাকে। দীর্ঘকাল একই জোটের আশ্রয়ে থাকতে থাকতে সে তার জৌলুস হারায়, তখন চাই নতুনতর শব্দবন্ধ। আর বলা যায় নিঃশব্দ যেখানে বাসা বেঁধে থাকে সেটা যুগপৎ সংগ্রামের জায়গা ও উত্তরণের জায়গা, মুক্তির দিগন্ত—শব্দের দাসত্ব থেকে ছুটি পেতে গেলে আঘাত সেখানেই হানতে হবে। মুক্তি পেতে গেলে সৃষ্টি করতে হবে নতুন শব্দজোট, যা হয়ে উঠবে নবতর নীরবতার আশ্রয়। শুধু যে শব্দজোটের জড়ত্ব থেকে মুক্তি পেতে গেলে আঘাত হানতে হয় তা নয়, শঙ্খ যেন বলতে চাইছেন সব মুক্তির পূর্বলগ্নে থাকে সংগ্রাম, থাকে আঘাত। তিনি এও মানেন যে সৃষ্টি থেকে মুক্তিকে পৃথক করা যায় না। ফলে সব মুক্তির পূর্ব লগ্নে যদি আঘাত থাকে তবে সব সৃষ্টির মূলেও আঘাত আছে।

পরিচিত ধারণার প্রচলিত ব্যাখ্যা দিয়ে শঙ্খর বক্তব্য অনেক সময় ধরা যায়

না। অভ্যস্ত চিন্তার বাইরে না গেলে তাঁর কথা বোঝা কঠিন। ভাঙার কথা বলতে গিয়ে শঙ্খ প্রচলিত ধারণাও ভাঙছেন বারংবার। যেমন, আমাদের সাধারণতঃ মনে হয় মুখোশ আঁটা মানেই সত্যকে ঢেকে কোনা, মেকি হওয়া, অভিনয় করা, বা একটা আবরণ টানা, যা কথাই মঙ্গলজনক নয়। শঙ্খ কিন্তু মুখোশ ব্যবহার করতে চান একটা অভিনব উদ্দেশ্যে। তাঁর হাতে মুখোশ হয়ে যাচ্ছে স্বরূপ বজায় রাখার বর্ম—ভিড়ের মধ্যে বেঁচে থাকার একটা নতুন উপায়। শঙ্খ লিখছেন 'একটি বরং মুখোশ ভালো, মনে হয়। কবি সবারই মধ্যে লুকিয়ে থাকবে ভিড়ে "সবল"—সাজের মুখোশ নিয়ে—এখন আর এর চেয়ে কী হতে পারে ভালো কারণ? এখন ইচ্ছে হয় তার মধ্যে খুব আড়াল থাকতে, কাঁচা জীবন, সবুজ কথার ছায়ায়।......তা যদি না হয় তাহলেই সহ্য যায় পেরিয়ে, কিন্তু তবু সেই দুঃসহ আড়ালে বসে সে তৈরি রাখবে একটা দৈনন্দিনের মুখোশ, তাকে কেউ চিনবে না, আঙুল তুলে বলবে না 'এ লোকটা কবি।'২৮ এতদিন ভেবে এসেছি মুখোশ ধারণ করাটা দোষের, শঙ্খর লেখা পড়ার পরে মনে হচ্ছে মুখোশের নিষ্পাপ ব্যবহারও সম্ভব। এই আড়ালটুকুই পারে মানুষকে খাঁটি রাখতে।

শঙ্খর লেখা পড়তে পড়তে প্রশ্ন জাগে লোকপুরাণের গুঁড়ো গায়ে লেগে থাকা ভাল নাকি ভাল নয়? এই প্রশ্নটা প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে তুললে উত্তর দিতাম 'ভাল'। 'লোকপুরাণ' শব্দটা শুনলে মনে জাগে সাধারণ লোকের যাপিত ঐতিহ্যের কথা। (ভিটগেনস্টাইন সমর্থিত 'ফর্ম অফ লাইফ' গোছের কিছু)। লোকপুরাণ যেন একটা লোকাচার বিধৃত নৈমিত্তিক যাপনের ধরণ যা বলয়ের মত একটা সময়ের মানুষকে ঘিরে থাকে; যাকে ছাড়া সমসময়কে বোঝাই সম্ভব নয়। শঙ্খ যেন চোখে আঙুল দিয়ে বলছেন আমাদের যা ঘিরে রেখেছে তা অতি ব্যবহারে জীর্ণ সেটা অতি জানা হয়ে গেছে, ফলে লোকপুরাণের গুঁড়ো আবির ঝরায় না, অস্তিত্বকে আবিল করে, আমাদের মুখ কাগজের ফুলের মত খসখসে করে ফেলে।

শঙ্খ মনে করেন দুয়ের মধ্যে সম্পর্কেই আছে মৌনের বীজ। তিনি একের পুনরাবৃত্তি আর একের পৌনঃপুনিক উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য করতে চান বলে মনে হয়। একই শব্দের পুনরাবৃত্তি বলতে সেই সব ক্ষেত্র বোঝায় যেখানে একই শব্দের বারংবার উচ্চারণে আমরা কোন বাড়তি দ্যোতনা বা অর্থ পাই না অথবা যেখানে একটা শব্দ বারবার উচ্চারণ করে কোন বাক্যাম্বয় উৎপন্ন হয় 'না'। সে ক্ষেত্রে একটা শব্দ বার বার উচ্চারণ করেও নিঃশব্দ জন্ম নেয় না। শব্দের পৌনঃপুনিক উচ্চারণের স্থান সেগুলো যেখানে একটা শব্দ একবার বলায় যে অর্থ সঞ্চারিত হয় সেখানে ঐ শব্দটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তদ্ভিন্ন কোন দ্যোতনা

পাই। অর্থাৎ একই শব্দ বার বার উচ্চারণ করলেও শব্দ মধ্যবর্তী একটা জোড় পাই যেখানে নিঃশব্দ বাসা বাঁধতে পারে। পাশাপাশি একই শব্দ বসিয়ে শব্দান্বয় তৈরি তখনই হয় যখন একটি শব্দ শোনার পরে মনে মনে পরের উচ্চারণের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে বা যখন উপলব্ধি করা যায় যে পরের উচ্চারণ প্রথম উচ্চারণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যোগ্য। একটি শব্দের পৌনঃপুনিক উচ্চারণে আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা দুই চরিতার্থ হয়। শব্দের পুনরাবৃত্তিতে তা হয় না। বিরল কতগুলি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একটি শব্দ একবার মাত্র উচ্চারণে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যের দ্যোতনা ব্যক্ত হয়। এটা তখনই সম্ভব যখন উচ্চারিত শব্দ অতিরিক্ত বাক্যের অন্যান্য অবয়ব উহ্য থাকে এবং শ্রোতা ঐ উহ্য অংশগুলিকে পুনর্বহাল করতে পারেন। উচ্চারিত শব্দের ক্ষেত্রে গলার স্বর ও অনুষঙ্গ থেকে পূর্ণবাক্যটি ধরার চেষ্টা করি আমরা আর লিখিত শব্দের ক্ষেত্রে যতি চিহ্নের ব্যবহার আর অনুষঙ্গের ওপর নির্ভর করেই বাক্যের প্রচ্ছন্ন অংশগুলি পুনর্বহাল করে থাকি, যেমন, 'আগুন?' বা 'আগুন!'। প্রথম প্রয়োগে প্রচ্ছন্ন বাক্যটি এইরূপ 'ওটা কি আগুন?' আর দ্বিতীয়টি 'সাবধান এখানে আগুন আছে।'

ভাষা, ছন্দ, কবিতা, গদ্য সম্বন্ধে যখন শঙ্খ কথা বলছেন তখন সর্বদাই বলছেন নিঃশব্দের অধিষ্ঠান ঐ শব্দজোট মধ্যবর্তী। কিন্তু ওঁর লেখায় নিঃশব্দের আর একটি অধিষ্ঠানের স্বীকৃতি আছে বলে মনে হয়। যখন বলেন 'মৌন জানে শুধু মানুষেরই বুক' যে মৌনের কাছে স্নান করে ধূপ জ্বেলে চুপ করে আত্ম সমর্পণ করতে চাইছেন—সেটা অবশ্যই শব্দ মধ্যবর্তী নিঃশব্দ নয়। মানুষ যখন নিজের দিকে ফিরে তাকায়, নিজের সঙ্গে বসে—একেবারে সরাসরি মুখোমুখি নিজের শত অভিধা ভেদ করে নিজেকে যখন সে উপলব্ধি করতে চায়, বুঝতে চায় নিজের ব্যক্তিগত স্পন্দনকে, তখন তাকে হতে হয় সম্পূর্ণ নীরব। এই নীরবতা দিয়ে নিজের বুকের মৌনকে স্পর্শ করতে পারলেই, সেই অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত রচনা হবে সৃজনশীল। শঙ্খ লিখছেন : 'কবি তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আমিটিকে "কারো জন্য কোনো মার্জিন না রেখে" (যেমন একটি চিঠিতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ) ছড়িয়ে দিতে চান।' আর তখনই হয় নতুন সৃষ্টি। আমরা কবির লেখার ভিতর দিয়ে জগৎকে নতুন ভাবে পাই আর কবি পান তাঁর মুক্তি।

'কবিকে মনে রাখতে হয় যে বাইরে ছড়ানো উপাদান উপকরণের সঙ্গে প্রতিনিয়ত তাঁর যুদ্ধ, এক-একটি কবিতা লেখা অনেক বিরূপতার মধ্য দিয়ে এক-একটি যুদ্ধের সমাপন'[৩০]। আর এই যুদ্ধের হাতিয়ার সংগ্রহ করার জন্যই তো বার বার কালবোশেখীর ডাঙা ডালে বসে। 'কবি নয়তো ঋষির মতো

উৎস ছুঁয়ে আসা।'[৩১] ঐ যে শঙ্খ বলছেন 'এক-একটি কবিতা এক একটি যুদ্ধের সমাপন।' শুধু কবিতা কেন সব সৃষ্টির জন্য একটা যুদ্ধ থেকে। প্রতি মুহূর্তে কবি, শিল্পী, প্রেমিকের authentic সত্তা প্রকাশ খোঁজে। প্রদ্যুম্ন যেমন মনে করেন 'authenticity একটা ক্রমাগত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। একটা যে কোন সময়ের বিন্দুতে তুমি তাৎক্ষণিক নেস্‌কাকে বানিয়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে প্রখর সজাগ চৈতন্যে নিরন্তর অর্জনের অন্তহীন প্রক্রিয়া, মরণ ছাড়া এই পথ চলায় কোন থামার, আরামের সুযোগ নেই।'[৩২]

সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় একটা দ্বান্দ্বিকতা দেখতে পান শঙ্খ। তিনি বলেন 'কবিতায় যে-সত্যের কথা বলতে চাই, তার আছে এক পরিবর্তমান অবয়ব··· সেই সত্যের সামনে কবির আমি আর তাঁর বাইরের সমাজ কেবলি মুখোমুখি হয়, কেবলই তার সংঘর্ষ, আর সেই সংঘর্ষ থেকে কেবলি আরেকটি তৃতীয় সত্তার উন্মেষ'[৩৩]। এ যেন সার্ত্রের 'বিয়িং-ফর-ওয়ান-সেল্ফ' এবং 'বিয়িং-ফর-আদার্স'-এর মধ্যে সম্পর্ককে নব নব রূপ দেওয়া, এই দু ধরণের বিয়িং-এর মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা। এইভাবে সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে কবি, শিল্পী, প্রেমিক একটা জায়মান তৃতীয় ভুবন সৃষ্টি করে। শঙ্খের জায়মান এই তৃতীয় ভুবনের ভাবনায় প্রদ্যুম্ন দেখতে পান ডায়ালেকটিক দৃষ্টি, তিনি বলেন: 'জায়মান এই তৃতীয় ভুবনের ভাবনায় আমি দেখতে পাই ডায়ালেকটিক দৃষ্টি। ডায়ালেকটিক, কেননা এই দৃষ্টি সমস্ত অস্তিত্বকে, সমস্ত প্র্যাক্সিসকে পরিগ্রহণ করে রয়েছে, ডায়ালেকটিক কেননা এই দৃষ্টি, মেটাফিজিক্সের (নিন্দার্থে) পরিপন্থী।

আর এই দৃষ্টিভঙ্গি ডায়ালেকটিক বলেই তা যুগপৎ রাবীন্দ্রিক ও রবীন্দ্রোত্তর।'[৩৪]

শঙ্খ মনে করেন অভ্যস্ত জীবন যাপন করতে করতে জেগে ওঠে প্রতীক্ষিত বিরোধ, 'এখানেই তুলতে হবে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্যা। আমাদের অস্তিত্ব এমনিতেই ভিতর থেকে নানাখানা হয়ে আছে এবং তার একটা দিক বাইরে মুখ-ফেরানো, অন্যদিক ধরা আছে কেন্দ্রে। এ-দুইয়ের মধ্যে সর্বায়ত সংগতি যতই ছিন্ন হতে থাকে, কবিতা হয়ে ওঠে ততই বেদনারক্তিম, ততই টান টান চেতনা ধরা পড়তে থাকে এই দুই বিপরীতের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে।'[৩৫] তার মানে এই নয় যে সৃজনশীল কবিতা মাত্রই 'নিজেকে নিয়ে কবিতা।' কবিতা সকলের কথা যদিও বলে না, সকলের জন্য কথা নিশ্চয় বলে।[৩৬]

শঙ্খ তাঁর সমস্ত লেখায় 'নিঃশব্দ' পদটি ব্যবহার করেছেন, 'নৈঃশব্দ' পদটি ব্যবহার করেননি। এই শব্দ চয়নের পেছনে একটা বিশেষ চিন্তাধারা কাজ করছিল বলে আমার অনুমান। শব্দহীনতাকে মনীষীরা নানাভাবে বুঝেছেন। কেউ কেউ মনে করেছেন সৃষ্টির শুরুতে একটা শব্দ-হীনতার অবস্থা থাকে,

ভাষা ব্যবহারে সেটা ভেঙে যায়। ক্রমশ যখন ভাষার অসারতা ও তার সীমাবদ্ধতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় তখন আমরা ভাষাকে বর্জন করে স্তব্ধতার সাধনা করি। ভাষার জন্ম হয় নীরবতার কোলে এবং ভাষা যে পরমতায় আমাদের পৌঁছে দেয় সেটাও নির্ভাষ; ফলে শব্দ আর নিঃশব্দ দুটি আলাদা কোটিতে অবস্থান করে—দুই-এর সহবাস অসম্ভব। রিল্‌কে এবং কীয়েৰ্কেগার্ড শব্দ আর নিঃশব্দের এমনই আড়াআড়ি সম্পর্ক স্বীকার করেন। কিছু আধুনিক লেখক আরো এগিয়ে বলবেন, ভাষা ব্যবহারের পূর্বে যে নিঃশব্দরাজ্যে আমরা বিরাজ করি সেখানে একটা অস্তিত্বের সঙ্কট অনুভূত হয়—এটা একটা 'অ্যাঙ্গুয়িশের' মুহূর্ত। ভাষা ব্যবহার করে আমরা এর থেকে মুক্তি পেতে চাই। সার্ত্রের নশিয়া উপন্যাসে রুকেনতাঁ যেমন চেয়েছিলেন,—অ্যাঙ্গুয়িশকে শিল্প-সৃষ্টি দিয়ে ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। লেখার মাধ্যমে রুকেনতাঁ পেতে চান তাঁর অমরত্ব। শব্দকে অতিক্রম করে কোন অনিবার্য পরমতায় পৌঁছনোর লক্ষ্য তাঁর ছিল না। কারণ তিনি জানতেন সাহিত্য সৃষ্টির বাইরে আর সবই ক্ষণিক। রিলকের আস্থা কিন্তু শব্দের চেয়ে নিঃশব্দেই বেশী। ওঁর বিখ্যাত উক্তি 'নিঃশব্দের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই। আমরা প্রত্যেকে জন্মসূত্রে শব্দজগতের বাসিন্দা—উপায় থাকলে আমরা কখনই নীরবতা ভঙ্গ করতাম না।'[৩৭] ভাষা-অতিরিক্ত যে নীরবতার রাজ্য তারই প্রতি মোহ থাকা সত্ত্বেও রিল্‌কে কিন্তু ভীষণ বর্জনের কোন পরিকল্পনা নেননি যেমন নিয়েছিলেন হ্বিটগেনস্টাইন। হ্বিটগেনস্টাইন বলেন আমরা ওঁর বক্তব্য বুঝলে বুঝব ওঁর ট্র্যাক্‌টেটাসে নিজের দার্শনিক মতবাদ ব্যক্ত করতে যে কটি বাক্য ব্যবহার করেছেন তার সবকটিই অর্থহীন। আর এটা একবার বুঝতে পারলে বুঝব ভাষা কত অসার। ভাষার ভূমিকা তাঁর কাছে একটাই : ভাষার কাজ মই-এর মত, সে আমাদের নিঃশব্দের রাজ্যে পৌঁছে দেয়—সেই রাজ্যে পৌঁছনোর পরে ভাষার আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। শুধু তাই নয়, হ্বিটগেনস্টাইন প্রথম জীবনে মনে করতেন ভাষাকে অতিক্রম করলেই একমাত্র জগৎকে সঠিকভাবে 'দেখতে' পারব। চমকে যেতে হয় ভাষা-দর্শনের বিদগ্ধ পণ্ডিতের কাছ থেকে এমন ভাষা বর্জনের পরামর্শ পেয়ে। হ্বিটগেনস্টাইনের কাছাকাছি কথা শঙ্খর লেখার এক জায়গায় মাত্র পেয়েছি। সেখানে উনি লিখছেন : 'এ কথা ঠিক যে, 'কবির শব্দ যেখানে থামে, আলোর সেখানে শুরু'। কিন্তু কবির শিল্পই তো এই যে তিনি পারেন শব্দকে সেই আলোর তটভূমি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।'[৩৮] শব্দ থামার পর যে নিঃশব্দের পালা, যেটা তাঁর আলোর তটভূমি সেই অঞ্চলের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে শঙ্খর আগ্রহ কম, অন্তত তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য পড়ে তাই মনে হয়। তাঁর গোটা আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে শব্দ

মধ্যবর্তী নীরবতায়, কোন পরানীরবতায় নয়।

এই দুই স্তরের নীরবতার পার্থক্য তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট। পরানীরবতায় যে পরমতার বোধ হয় তা কীয়েৰ্কেগার্ডের মানুষ আর ঈশ্বরের সম্পর্কের মত। এই সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায়, এর রসে বিভোর হওয়া যায়, কিন্তু এই সম্পর্কের কোন নবতর উন্নততর রূপ দেওয়া যায় না, কল্পনাও করা যায় না। চরম সম্পর্কের তো আর কোন বিকল্প হয় না, ফলে এখানে নবতর সম্বন্ধ সৃষ্টির কোন তাগিদ নেই, অবকাশও নেই। কবিকে এখানে 'নীরবে নীরব ছুঁয়ে থাকতে হয়।' এমন পরম শব্দহীনতাকে বলা যায় নৈঃশব্দ, যা পরম সত্যের একটা বিশেষণ। এর প্রতিতুলনায় বলা যায় শব্দ মধ্যবর্তী নীরবতার একটা নিজস্ব সত্তা আছে, কবির বক্তব্য প্রকাশে তার একটা স্বকীয় ভূমিকা আছে। শঙ্খ মনে হয় নিঃশব্দ পদটিকে বিশেষ্যের মত ব্যবহার করতে চাইছেন, আর তাই নিঃশব্দের তর্জনীর' পরিবর্তে 'নৈঃশব্দের তর্জনী' লিখলে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিপ্রায় সূচিত হতো।

এই প্রবন্ধ লেখার সময় প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের নানা-পরামর্শ পেয়ে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি।

১. শঙ্খ ঘোষ 'আত্ম' "মূর্খ বড় সামাজিক নয়", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৫৯
২. শঙ্খ ঘোষ, 'শব্দের পবিত্র শিখা' "নিঃশব্দের তর্জনী", প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৯০, পৃঃ ২৬
৩. শঙ্খ ঘোষ 'শব্দ থেকে পালানো' "নিঃশব্দের তর্জনী", পৃঃ ১৮
৪. শঙ্খ ঘোষ 'নিঃশব্দের তর্জনী' "নিঃশব্দের তর্জনী" পৃঃ ১৫
৫. তদেব, পৃঃ ১৪
৬. শঙ্খ ঘোষ, 'শব্দ থেকে পালানো', পৃঃ ১৮
৭. শঙ্খ ঘোষ, 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' "মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়" পৃঃ ৫৫
৮. শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মুক্তি মানেই গান', "মৃত্যুটাকে ভুলতে চাই", ইস্টার্ন পাবলিশার্স ডিষ্ট্রিবিউটারস্, নিউ দিল্লী, ১৯৮৯, পৃঃ ৬৩
৯. শঙ্খ ঘোষ, 'নিঃশব্দের তর্জনী', পৃঃ ১৫
১০. তদেব, পৃঃ ১৫
১১. তদেব, পৃঃ ১৫
১২. শঙ্খ ঘোষ, 'শব্দের পবিত্র শিখা', পৃঃ ৩২-৩

১৩. শঙ্খ ঘোষ, 'লেখকের নিয়তি' "শব্দ আর সত্য", প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১৯
১৪. শঙ্খ ঘোষ, 'অপমান', "তুমি তো তেমন গৌরী নও" দে'জ পাবলিসিং কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ২৪
১৫. শঙ্খ ঘোষ, 'শব্দের পবিত্র শিখা', পৃঃ ৩১
১৬. শঙ্খ ঘোষ, 'শব্দ থেকে পালানো' পৃঃ ২১
১৭. শঙ্খ ঘোষ, 'শব্দের পবিত্র শিখা' পৃঃ ২৬
১৮. তদেব, পৃঃ ৩০
১৯. তদেব পৃ, ৩২
২০. শঙ্খ ঘোষ, 'ছন্দঃ নিরূপিত ও ব্যক্তিগত', "নিঃশব্দের তর্জনী" পৃঃ ৩৮
২১. শঙ্খ ঘোষ 'শব্দের পবিত্র শিখা' পৃ ৩৫
২২. শঙ্খ ঘোষ, 'ভয়' "তুমি তো তেমন গৌরী নও" পৃঃ ৩৫
২৩. শঙ্খ ঘোষ 'খোলা মাঠ' "তুমি তো তেমন গৌরী নও" পৃঃ ৩৩
২৪. শঙ্খ ঘোষ 'শব্দের পবিত্র শিখা' পৃঃ ৩১
২৫. শঙ্খ ঘোষ 'শব্দের পবিত্র শিখা' পৃ ৩২
২৬. তদেব, পৃঃ ২৭
২৭. শঙ্খ ঘোষ 'ছন্দোহীন সাম্প্রতিক', "নিঃশব্দের তর্জনী" পৃঃ ৪৪
২৮. শঙ্খ ঘোষ 'নিঃশব্দের তর্জনী' পৃঃ ১৪
২৯. শঙ্খ ঘোষ 'ছন্দোহীন সাম্প্রতিক' পৃঃ ৪৫
৩০. তদেব, পৃঃ ৪৫
৩১. শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'মুক্তি মানেই গান' পৃঃ ৬৩
৩২. লেখিকাকে লেখা প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের চিঠি ২৩।১।৭৯
৩৩. শঙ্খ ঘোষ 'শব্দ আর সত্য', "শব্দ আর সত্য" পৃঃ ৪১
৩৪. লেখিকাকে লেখা প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের চিঠি ২রা মে, ১৯৮২
৩৫. শঙ্খ ঘোষ 'কবিতার তুমি, "নিঃশব্দের তর্জনী" পৃঃ ১৬
৩৬. 'শব্দ আর সত্য', শব্দ আর সত্য, পৃঃ ৩৫
৩৭. আর. এম. রিল্‌কে, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ইংরাজি অনুবাদ জি. সি. হুস্টন, হোগার্থ প্রেস, লণ্ডন ১৯৫৪
(বাঙলা অনুবাদ আমার)
৩৮. 'শব্দ থেকে পালানো', নিঃশব্দের তর্জনী, পৃঃ ২১

Prayag Shukla

ON TRANSLATING SHANKHA GHOSH INTO HINDI

Translating poetry is a difficult task. It has always been said that poetry cannot be translated, that a poem is lost in translation. Yet poets and translators have always vied in doing translations. Here the reason seems to be simple—a poet or a translator likes someone's poetry and is eager to share his pleasure with other readers of his language. Perhaps the same thing happened to me while trying to translate Shankha Ghosh's poetry into Hindi from original Bengali. I read some of the poems by Shankha Ghosh about fifteen years ago—I liked them so much that I was eager to see how they would appear in Hindi. I translated two or three poems and they were published in *Samkaleen Bhartiya Sahitya*—journal of Sahitya Academy. Before translating the poems I had asked for permission from the poet. I was happy to receive a letter from Shankha Ghosh, giving me the permission for the same. Poems were liked by fellow poets in Hindi and I was urged to do some more translations. Soon an opportunity came in my way. I was invited by 'Vagarth', the poetry centre of Bharat Bhavan, Bhopal' for a translation workshop, where I was to translate some more poems of the poet. I was told that Shankha Ghosh would himself come to Bhopal—we both could sit together and do the translations. I was happy and sent my acceptance. I wrote to Shankha Ghosh again, and asked, which poems he would like to be translated personally. Soon came a notebook, white papers stitched with a handmade paper-

cover, and poems copied by the poet himself in neat hand-writing. No photostat copies, no typed papers but the poems in the poet's own hand-writing—this was enough to inspire me more.

I reached Bhopal. That was in December 1983. The poet had also arrived. We were meeting for the first time, yet it seemed that we had known each other for long. The credit for this goes to Shanka Ghosh. I found him unassuming. warm, very human and very helpful. Soon we were on the task, which I enjoyed immensely. We would sit beside or in front of the lake of Bhopal, would find a place somewhere under a tree, place a table on the terraces of Bharat Bhawan, and spend hours together in reading and translating. Before translating Shankha Ghosh, I had translated some 30 poems of Jibanananda Das. [The translation had been published by Sahitya Academy. In fact this was a translation of the Monograph by Chidananda Das Gupta, which contained about 30 poems of Jibanananda Das. The text was in Eaglish but I had translated the poems from original Bengali.] I found that Shankha Ghosh was himself an ardent admirer of Jibanananda Das, and I would discuss with him the poetry of Jibanananda Das at length. This also helped in establishing an instant rapport with the poet.

We selected the poems, which were small, to begin with, keeping also in mind that the poems selected would be intact in their structure, metre, rhyme, diction etc while being rendered in Hindi. So the first ones were poems like 'Vrishti', 'Jal', 'Peenpare', 'Que', 'Sahaj' etc. Soon I came to terms with other poems, and longer poems like 'Bhoomadhyasagar' were also translated later on.

Shankha Ghosh's poetry has a universal appeal, yet it is deeply rooted in Bengali language and culture. Certain words are used in a very specific context, and the nuances may get

lost in translation. So, I had to be very careful. Discussions with the poet were most rewarding, and to my surprise, I would find that the poet himself had suggested or approved in Hindi the word, which was most appropriate. Shankha Ghosh has an in-built love for the poetic language and with his knowledge and intution, he would often come with the suggestions, which would delight me and would make my task easier.

Translating a poem like 'Bhasha' was a very enriching experience. I would search for the right tone and tune, and would come to Shankha Ghosh with my draft. Reading it aloud would give me a chance to discover for myself what was lacking in the translation. I made many drafts and kept on changing them till we both were satisfied.

In Bengali, Sanskrit words are in common use even today. Take, for instance, 'Jalanjali', 'Bhasman', 'Pad Dhwani' etc., not to speak of words like 'Sandhya Bela'. But in Hindi poets these days avoid using such words as they are not commonly spoken or used among the Hindi-speaking Public. This is not to say that the Sanskrit words [Tatsam] are altogether absent in contemporary Hindi poetry, yet the diction of contemporary Hindi poetry is definitely different from the Bengali one.

The diction of Hindi poetry has changed from Chhayavad,* considerably. The risk in translating Bengali poetry into Hindi lies herein also. One would like to retain certain words of the original, yet would like to use a language as simple as possible—so as to give the feeling that the sensibility of the poet is not 'modern' or contemporary. But these are the challenges, which one faces, in any case, while translating. In the end, it gave me pleasure and satisfaction that the translations were appreciated among the Hindi

* Chhayavad : a movement in Hindi, to which belonged major poets like 'Nirala', Jaishankar Prasad, Sumitranandan Pant and Mahadevi Verma.

reading public, and I was told that they had been liked in Bengali literary circles as well.

Shankha Ghosh's poetry is seemingly 'delicate', yet it has got a well-knit structure, and is very strong in its moral, ethical character. It has an integrity of its own. The words are used with all the music and meaning they possess. One would not like to disturb this structure in translation, but it is very hard to retain the original structure in translation. So I had to struggle for the suitable modes of expression, while translating the poems.

With Shankha Ghosh I had translated about 15 poems. the rest were translated by me alone. It so happened that soon after Bhopal, I was invited to international writing program in Iowa [U.S.A.]. I knew that Shankha Ghosh had been there in the sixties. I wrote to him once again, informing about my visit to Iowa. Shankha Ghosh wrote back to me, and was happy that I was going to the international writing program in Iowa. The letter was full of his Iowa memories. As soon as I reached Iowa in 1984, I sat down to do the rest of the translations. What a coincidence, the poet's poems were being translated into Hindi in such a far-off place where the poet had also once resided. I remember the mornings and evenings of Iowa, where the manuscript of Shankha Ghosh's Hindi translations was completed. The poems were later on published by Rajkamal Paperbacks, along with the Hindi translations on Shakti Chattopadhayay's poems, done by well known Hindi poet Kedernath Singh.

The experience of translating Shankha Ghosh has been rich and rewarding. This took me to Sankha Ghosh's other writings in prose and poetry. Now I have a fair collection of his books with me, and as a reader and translator I can say that to go through the writings of Shankha Ghosh, is an experience, to be cherished.

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

...

সূর্যসাক্ষী শঙ্খ ঘোষ

'কবির অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন, বিশ্ব অভিব্যক্তির নানা-ধারায় তাঁহার যুগযুগান্তরের জীবন প্রবাহিত হইয়াছে, সে নানা জীবনের নানা ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে; অথচ তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় নাই।

এই সমগ্র বীক্ষণের সূত্রপাত করে অজিত চক্রবর্তীই প্রথম রবীন্দ্র-চেতনার বিকাশকে এক সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার চেষ্টা করলেন। অজিত চক্রবর্তী থেকে প্রমথ নাথ বিশী পর্যন্ত রবীন্দ্রবীক্ষণ অবশ্যই আমাদের কাছে খুলে দিয়েছিল সে বিচিত্রিত অন্তঃপুরের বর্ণাঢ্য দ্বার তোরণ। তাঁরা কবিতার সঙ্গে সমমানে রাখার চেষ্টা করেছেন কবির জীবনকে। যথার্থ কবিজীবনের হদিস দিয়েছে এঁদের ব্যবহৃত পদ্ধতিপ্রকরণ। অজিত চক্রবর্তীই প্রথম দেখিয়েছিলেন যেখানে যান্ত্রিকতার কারণে বাণীশিল্প বিবর্ণ পৌনঃপুনিকতায় বিধ্বস্ত হয়ে যেতে বসেছে —(তাঁর বাক্যবন্ধে তিনি 'ডিমাও' ও 'সাপ্লাই' শব্দ দুটি অব্যর্থ তাৎপর্যে প্রয়োগ করেছিলেন)—সেখনে রবীন্দ্রনাথের প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্রোতে সমর্পিত হয়নি। আর্টের সাধনা ও অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে প্রভেদ কোথায় নির্দেশ করতে গিয়ে অজিত চক্রবর্তী যা বলেছেন নামরূপ পাল্টে দিয়ে সে বিশ্লেষণ আমরা আধুনিক নানা মতসংঘর্ষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ অজিত চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রউপলব্ধি এই সত্যের দিশারি হয়ে উঠেছিল যে', জীবনকে পায়রার খাঁচার মতো খোপে খোপে ভাগ করে রাখা সম্ভব নয়—জীবনের ঐক্যভবটি অচ্ছেদ্য।

রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ঠিক কবে থেকে আধুনিক ব্যক্তির আত্মসম্বিতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য অন্বয়ে গাঁথা হয়ে গেল তা সাল তারিখ ধরে বলা কঠিন। স্থিতপ্রজ্ঞ অধ্যয়নশীল অধ্যাপকেরা রবীন্দ্রচর্চাকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা তাঁদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু রবীন্দ্রচর্চাকে ক্লাসরুম-রুটিন থেকে বার করে নিয়ে গেলেন যাঁরা তাঁরা কিন্তু আলাদা মানুষ। প্রথম কথা তাঁরা সকলেই কবি। এই কথা থেকেই আসে দ্বিতীয় কথাটি—জীবিকাসূত্রে এঁরা সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও—আমাদের

আজকের আলোচ্য ব্যক্তিটিকে বাদ দিল—তাঁরা কেউ বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপক নন। আমার অনুরোধ এই মন্তব্যটিকে কেউ হালকা ভাবে নেবেন না। বাংলা-সাহিত্যের পঠন পাঠন যে ভাগে বিশ্ববিদ্যালয়নির্ভর সে ভাগে তাকে একটা দায়বহন করতেই হয়। ব্যাপারটি ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, সে আলোচনার মধ্যে যাবার জায়গা এটা নয়। কিন্তু এটা যে হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রচর্চার অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনকে অবশ্য রক্ষা করতে হবে। অধ্যাপক-বৃন্দ—বাংলা সাহিত্যের পূজনীয় পূর্বাচার্যেরা সে শৃংখলাবিধিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন। তাঁদের কাছে আমদের ঋণ এজন্যই অপরিশোধ্য। একটা জায়গায় কিন্তু ব্যাপারটা ঠেকে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে একটা চলিষ্ণু শক্তি—নিত্য গতিশীল বাংলাসাহিত্য যে তাঁকেই বারবার পাবে চলনদার হিশাবে এটা বুঝে নেবার জন্য পরিবর্তিত দেশ কাল পাত্রের প্রয়োজন ছিল। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালখণ্ডে যখন অভিজ্ঞতার রূপ পাল্টে যেতে লাগল, ওসারে এবং বহরে নতুন টেনশন অথবা উৎকণ্ঠা যখন ভিন্নমাত্রিক হয়ে উঠল, তখনই রবীন্দ্রবীক্ষা বাঙালির জীবনচার্যার সঙ্গে অন্বিত হল।

তিরিশের প্রধানপঞ্চকের অন্যতম ছিলেন বিষ্ণু দে। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছেন নিজ স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে, নিজ চলিষ্ণুতার অংশ হিশাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্ব যখন নানা সংশয়ে উৎকণ্ঠিত ও য়ুরোপীয় ফ্যাশন বদলের রাতারাতি ব্যস্ততায় যখন অনেকেই বিচলিত, তখন অবিচলিত তিনিই একমাত্র বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার স্বরূপ। উপলব্ধি করে-ছিলেন, এই মুদ্রাস্ফীতির কালে, এ যদি আকবরী মোহরই হয়, এর দাম বেড়েই গেছে। লক্ষ করা যায়, এই প্রধান পঞ্চকের ঠিক পরের বয়ঃক্রমের কবিরা—সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অথবা অরুণ মিত্র বা আরো পরবর্তীরা কেউ রবীন্দ্রভাবনায় প্রত্যক্ষে উদ্যোগী হলেন না। তাঁরা তাঁদের আধুনিকতা নিয়ে অবশ্যই তৎপর ছিলেন—কিন্তু সে আধুনিকতার ভরতীয় বটবৃক্ষ-প্রতিমাকে জরিপ করা তাঁরা ততটা জরুরি বিবেচনা করলেন না। এখানেই এঁদের থেকে তরুণতর কবি শঙ্খ ঘোষের কৃতিত্ব। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিবর্ণ গবেষণা-পত্রের করুণ হাস্যকরতায় ফেলে রাখলেন না। রবীন্দ্রনাথ কতটা তাত্ত্বিক এই বিচারে তিনি মনোযোগী হলেন না; তাঁর আধুনিকতা মাপার য়ুরোপীয় থার্মো-মিটারও শঙ্খ ব্যবহারে করলেন না। সে তাপমানযন্ত্রের পারদ ক্ষণেক ওঠে ক্ষণেক নামে। সবচেয়ে বড়ো মুশকিল, এক একজন আবার এক এক কায়দায় সে যন্ত্র ব্যবহার করেন। সে সময়ে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেন একটু বিব্রতও হয়ে পড়ে-ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ কতটা গ্যেটে কতটা নন। তাঁরা ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন এই দুশ্চিন্তায় যে, রবীন্দ্রনাথ তো বোদলেয়ার নন! কেউ বা গভীর উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন এই ভেবে যে, য়ুরোপের হাটে দরহারানো রবীন্দ্রনাথকে আবার কী করে ঠেলে

তোলা যাবে। তুলনামূলক সাহিত্যতত্ত্বের নামে মাঝে মাঝেই এইসব সাহিত্যমূলক তুলনাতত্ত্ব মাথা চাড়া দিয়েছে। এর প্রকোপের জন্য দায়ী অবশ্য আমাদেরই রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রধান স্রোত। ক্লাসরুমের ক্লিশেকণ্টকিত তত্ত্ব-গদগদ আলোচনায় কবিতা প্রায়ই থাকত অন্তর্হিত। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের জীবনাচরণ ও মননজগতের সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রচর্চাকে মিলিয়ে দেখাটা যখন জরুরি হয়ে পড়ল তখনই রবীন্দ্র-অধ্যয়নকে নূতন খাতে বইয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভূত হল। বাংলা সমলোচনা বাংলা সাহিত্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ— সেটা বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয় আগাগোড়া এই সত্যটার দিকে নজর রাখলে যে, এই সমালোচনা সাহিত্য গড়ে তুলেছেন বাঙালি লেখকরা। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে এ কাজ শুরু হয়েছিল। এ সত্যের ব্যত্যয় একবারও দেখা গেল না। সেজন্যই সদাতৎপর বুদ্ধদেব বসু শার্ল বোদলেয়ারের আলোচনায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের অবান্তর আংশিকতাদুষ্ট অবতারণা করলে আমরা বিচলিত হই—কিন্তু তখনও দেখি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে তিনি যে দু-চারটে কথাও বলেন, তা অনেক ম্লান বিবর্ণ স্ফীতকলেবর রবীন্দ্রগবেষণার বই থেকে অধিকতর দুর্লভ।

'এ আমির আবরণ'-এ শঙ্খ যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর আলোচনা পদ্ধতির একটা গভীর পরিবর্তন ঘটল। এর মধ্যে তিনি বিদেশ ঘুরে এসেছেন। ওকাম্পোর গ্রন্থটির নিবিড় পরিচয়ে তিনি সমৃদ্ধ হয়েছেন। তার সূত্র ও অনুষঙ্গ সম্পর্কের আলোচনায় শুরু পরম্পরা পার হতে হতে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিভৃত মনোলোকের দ্বার খোলার গূঢ় আমন্ত্রণ অনুভব করলেন। ১৩৭১ বঙ্গাব্দের 'দেশ'—সাহিত্য-সংখ্যায় 'পা তোলা পা ফেলা' ['কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থে সংকলিত] শীর্ষক আত্মজৈবনিক রচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্মৃতি প্রসঙ্গে প্রথম 'অস্ফুট বসন্ত সঞ্চারে'র কথা শঙ্খ বলেন —সেটা ছিল সেই বিচিত্রিত দরজার বাইরের আহ্বান। এবার তাঁর কাছে পৌঁছল ভিতরের ডাক। এই 'ভিতরের ডাক' শব্দবন্ধটিকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ না করলে শঙ্খের রবীন্দ্রচর্চাকে খণ্ডিত করে ফেলা হয়। তাঁর রবীন্দ্রচর্চার বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি তাঁর নিজের 'হয়ে ওঠা'র গহন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর রবীন্দ্রজিজ্ঞাসাকে মিলিয়ে নিয়েছেন। 'কল্লোল'এর পৌগণ্ড প্রাগল্‌ভ্য থেকে বাংলা রবীন্দ্রচর্চাকে মুক্তি দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব। উল্লেখ্য সে মুক্তি সাধনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে—অচ্ছেদ্যভাবেই জড়িয়ে আছে—এক একজন কবির আত্মাভিব্যক্তির ভাষ্য। তাঁদের রবীন্দ্রভাষ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁদের কবিজীবনের বিশিষ্ট মাত্রায় জীবনবোধ। শঙ্খ আরেকটু এগোলেন। তাঁর রবীন্দ্রচর্চা তাঁর আত্মাভিব্যক্তির সঙ্গেই শুধু যুক্ত নয়—তা অন্বিত হয়ে রয়েছে তাঁর আত্মমোচনের অভিপ্রায়ের সঙ্গেও বটে। যে 'ভিতরের ডাক'-এর কথা বলছি তার মূলে রয়েছে কবি শঙ্খ ঘোষের দেশকাল-সন্ততি সম্বন্ধে সজাগ অবধানতা। দুটো ঘটনা, অন্তত আমি অনুমান করি, শঙ্খকে সেই সজাগ অবধানতায় প্রতিষ্ঠিত

করেছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তিনি লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথের নাটক তখন নতুন তরঙ্গে আন্দোলিত। 'বিসর্জন' এবং 'রক্তকরবী' এই দুটি নাটক মঞ্চায়নের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রছায় কবিভাষার গূঢ়তা সম্বন্ধে তাঁকে যেমন দীক্ষিত করেছে, চল্লিশের দশকের শেষদিকের অতিবামাচারী রবীন্দ্রদূষণ থেকেও তিনি অনুমান করি এই প্রত্যয়ে পৌঁছেছেন যে, মেধা-মনন এবং চলিষ্ণু আধুনিকতার বিচারে যারা সর্বহারা তারাই রবীন্দ্রহারা।

কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটকের শৈল্পিক রহস্য তিনি খুঁজে নিয়েছেন নাটকের টানে তো বটেই, নাটকের সঙ্গে কবিতার—অন্তভাষায় বলতে গেলে গানের সংযোগ ও সাযুজ্যের বিষয়টিও তিনি ভাবেন। তখনই তিনি দেখান কীভাবে সংলাপের গভীর কবিতা আর গানের আলো মিলে মিশে যায়।

তিনিই আবার 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'-র তিনটি ঋতুর গান একত্রে যখন আলোচনা করেন, তখন তাদের একেবারে ভিতরকার প্রচ্ছন্ন নাটকটিকে আবিষ্কার করেন—তখন আর সমালোচনার ইচ্ছা মনে জাগে না। গান তিনটির ভিতরে যে প্রভেদ রয়েছে, তা বুঝিয়ে দিতে গিয়ে তিনি গীতাখ্য কাব্যত্রয়ের প্রচ্ছন্ন ভিন্নতার সুরটুকুকেও ধরিয়ে দেন। আর তখনই আমরা বুঝি এই লেখাটি বহন করছে আরেকটি ভাবী জিজ্ঞাসার বীজ। সে বীজ পরিণতি পেল ১৩৯৩-এর পঁচিশে বৈশাখ দিনাঙ্কে 'যুগান্তর' পত্রিকার 'গানের মধ্যে নাটক' প্রবন্ধে। নাটকে গান থেকে গানের নাটক পর্যন্ত বৃত্তটি যেভাবে রচিত হয়েছে, তাই-ই আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে এ আলোচনা-পদ্ধতির সার্থকতা কোথায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থে তারপরেই তিনি যখন 'আমি তুমি' বৃত্তের বাইরে 'তুই' বা 'তোরা' সম্বোধনের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করেন, তখন বৃথা বাক্যব্যয় অবান্তর বলে মনে হয়। সানন্দ আন্তরিকতায় লেখকের হাতখানি চেপে ধরতে ইচ্ছা করে। এই গ্রন্থের ক্ষুদ্রতম প্রবন্ধটি হ'ল—'এ আমির আবরণ', আর সেটিই সবচেয়ে লক্ষ্যভেদী। আসলে এটা আর সাহিত্য-মূলক প্রবন্ধ নয়। শেষপর্যন্ত এটা হয়ে উঠেছে গদ্যে লেখা হৃদয়-সংবেদী কবিতা। যখন তিনি বলেন :

> 'আত্ম-আবরণ মোচনের প্রবল বেদনায় মথিত হয়ে উঠে এই গানগুলি দাবি করে আমাদের সমস্ত সত্তা, আর তখন মনে হয় এর চেয়ে বড়ো মন্থন, এর চেয়ে বড়ো প্যাশান বা বাসনার তাপ আর যেন নেই আমাদের অভিজ্ঞতায়।'

—তখন আমরা গতানুগতিক অর্থে কাব্যভাষ্য পাঠ করি না। তখন প্রকৃতপ্রস্তাবে একজন কবির ভিতর দিয়ে আর এক কবিকেই অনুভব করা যায়। আর এঁরা কালের অভিজ্ঞান ব্যবহারক্রমেই পৃথক আধুনিক কবি। অতএব শঙ্খের রবীন্দ্রচর্চার মূল তাঁর আপন সত্তার মধ্যে এবং অবশ্যই তাঁর দেশকালের মধ্যেও। এটাও তাঁর কবিতার মতোই তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপার।

তাঁর 'নিজের গান' প্রবন্ধটির ভাবনাবৈভব স্বীকার করেই বলছি, 'নিজের' এই শব্দে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের যে সামাজিক ইতিহাস এবং ব্যক্তির অন্বয়-অনন্বয়ের প্রশ্ন জড়িত ছিল—যার ইঙ্গিত দিতে শঙ্খ ভুল করেননি—অন্য প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে তা সমানুপাতিক হয়নি। অথচ ভালো করেই জানি আমার সে আশা তাঁর কাছেই মিটবে। সে প্রাপ্তি আরো স্পষ্ট হল 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' পড়তে পড়তে। একজন আধুনিক কবির সবটুকু জিজ্ঞাসা নিয়েই তিনি বুঝি নিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার স্বরূপ :

> 'বড়ো প্রতিভা সময়কে আত্মস্থ করে নিয়েই অতিক্রম করে সময়। সেই আত্মস্থতার আয়োজনে সবসময়ে কোনো সামঞ্জস্যময় সম্পূর্ণতাকে নিশ্চয় ছুঁতে পারছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, নানা ভিন্ন কোণ থেকে ধরতে চাইছিলেন আধুনিকের মনকে, পুরোনো অভ্যাস নিয়েও বুঝতে চাইছিলেন সাম্প্রতিক অলিগলি। এরই ফলে মুহুর্মুহু তাঁকে আলোড়িত হতে হয়েছে প্রবল এক আত্মবিরোধে, কিন্তু সাহস নিয়ে সেই আত্মবিরোধকে বরণ করে নিয়েছিলেন বলেই তিনি আধুনিক।'

বলা বাহুল্য এ আধুনিকতা শুধুমাত্র কালধর্মিতা নয়। এর মাত্রা আলাদা এবং এর অর্থও আলাদা। আধুনিকতা শব্দের কাছে কোনো খণ্ডিত অর্থ নিয়ে হাজির হয়নি। তিনি আধুনিকতা বলতে বোঝেন 'হয়ে-থাকা' অপেক্ষা অনেক বড়ো ব্যাপার 'হয়ে-ওঠা'। একজন আধুনিক কবি যখন এভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখেন, তখন আমাদের কাছে সেটা তাঁরও আত্মসমিত্রের যথার্থ মূল্যায়ন। কোনো পরকলা চোখে লাগিয়ে তাঁর রবীন্দ্রদর্শন নয়। আংশিক রবীন্দ্রনাথ কোনো রবীন্দ্রনাথই নয়। শঙ্খ অন্যভাবে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার ১৩৯৩ বঙ্গাব্দের সংস্কৃতি সংখ্যায় বলেছেন :

> 'কেবল নাটক বা গল্প-উপন্যাসেই নয়, তাঁর কবিতারও মধ্যে—বা, সমগ্র সৃষ্টিরই মধ্যে—আছে এই দুই দিক : যেমন-হওয়া-ভালো আর যেমন-হয়ে-থাকের ভিন্ন দুই প্রকাশ।'

এর যে কোনো একটিকে বেছে নিলে তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয় ধরা পড়বে না। চলিষ্ণু জীবন :

> '…যেমন-হয়ে-উঠছের একটা বিবর্তমান রূপ, সেই রূপেই আজ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়, সেইখানেই তাঁর যথার্থ কবিকাহিনী।'

আসলে এ তো শুধু রবীন্দ্রনাথেরই কবিকাহিনী নয়, জীবনানন্দ বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যাঁরাই যথার্থ কবি, তাঁদের সকলেরই কবিকাহিনী এটাই। শঙ্খ ঘোষের কাহিনীও কি এটাই নয়?

'ধূর্জটিপ্রসাদের রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষনামাঙ্কিত আলোচনায় শঙ্খ ধূর্জটিপ্রসাদের একটি উপলব্ধিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'যে পাঠকের মনে কোনো-না-কোনো

মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার নকশা স্থিরভাবে প্রতীয়মান হয়নি, তার পক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র।' শঙ্খ দেখিয়ে দেন ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র শিল্পজগতের নানা খণ্ড অংশের গাণিতিক যোগফল রচনা করা নয়। তিনি বলেন 'দেখতে হবে, সেই সমগ্র কেবলই ধরা দিচ্ছে প্রতিটি খণ্ডের মধ্যে।' এটার জন্য কোনো কৃত্রিম পদ্ধতিকাও তিনি নির্দেশ করেননি। বিশেষ-নির্বিশেষের পণ্ডিতপ্রবণ তর্কেও তিনি মাতেননি। কিন্তু তিনি সমগ্রকে কি কোনো পূর্বানুমানের ভিত্তিতে ধরে নিচ্ছেন, না কি সমগ্রের উদ্ভাসনকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিচ্ছেন? এই অচিন্ত্য ভেদাভেদের রহস্য শঙ্খকে উন্মোচন করতে হয়েছে তাঁর কবিসত্তার প্রাতিভ দৃষ্টির সাহায্যে। যে-শঙ্খ সমালোচনাকে মনে করেন নতুন শিল্পরূপের দিকে যোগ্যতাবে এগিয়ে দেওয়া, যে-শঙ্খ ব্যক্তিগত দুর্যোগ এবং সামাজিক যৌবনের সঙ্কটের অভিঘাতে লেখেন 'বাবরের প্রার্থনা', যে শঙ্খ এস্‌টাব্‌লিশ্‌মেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দায়বদ্ধতা ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না, সেই শঙ্খ যথাসময়ে লুকাচের 'ঘরে বাইরে' আলোচনায় সীমাবদ্ধতা কোথায় তা দেখিয়ে দেন, 'রক্তকরবী'র নতুন ভাষ্যে তিনি মেলে ধরেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিরহস্যের গভীরতাকে। আমরা কেউ কেউ কেমন করে জানিনা বুঝে ফেলেছি রবীন্দ্রনাথের ভাষা এখন আর যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিকের বার্তাবহ নয়, আমরা যারা ভীড়ের মাঝখানে হারিয়ে যাবার ভয়ে অভিজ্ঞান সংকটে ভুগতে ভুগতে এঁচে নিয়েছি 'শেষ বসন্ত'-এর আধুনিক কাব্যভাষা নেই, ওটা আধুনিক কবিতা নয়—তাদের দৈন্য আসলে সমালোচনার দ্বিস্তর দৈন্য। প্রথম স্তরে তা বহন করছে ঐতিহ্যের সঙ্গে বেজাপড়ার অসঙ্গতি, অথবা অক্ষমতা। দ্বিতীয় স্তরে তা বহন করছে বাস্তবকে এবং সেই সূত্রে নিজেকে চিনে নেবার অক্ষমতা। অতঃপর একটা হীনাহংভাব থেকে ব্ল্যাসফেমিকে মনে হায় দুঃসাহস। বস্তুত আমরা যে ইদানীংকালে বিচিত্র রবীন্দ্রসমালোচনা পাই তার কয়েকটি ধরণ খুবই কৌতুকাবহ। সত্যের নেশা যে মিথ্যার থেকেও মারাত্মক তা না বুঝে অনেক কথা বলেছি আমরা—রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষা জ্ঞান ছিল না বলেছি, বলেছি তাঁর লেখায় বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে কম, বলেছি তিনি গল্প্‌ওয়ার্দি থেকে না বলে গ্রহণ করেছেন, এবং বলার চেষ্টা করেছি তিনি যথোপযুক্ত পরিমাণে ইংরেজবিরোধী ছিলেন না, এও বলেছি ইংরাজি গীতাঞ্জলি ইয়েট্‌সহস্তক্ষেপে মহীয়ান। রবীন্দ্রবৈর দেখলে আমার মনে পড়ে 'প্যাঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোনো ছুতা জান না সূর্যের সঙ্গে আমার শত্রুতা!' এর মধ্যে এও বলার চেষ্টা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক নন, কেননা বোদলেয়রের জগতের সঙ্গে তাঁর জগতের দুস্তর পার্থক্য। অথচ একটু স্থির হয়ে আমরা একথাটা কোনোদিন ভাবলাম না, কেন 'রক্তকরবী' এবং 'মুক্তধারা' বিলেতে বা মার্কিন মুলুকে শীতল অভ্যর্থনা পেল, কেনই বা তারা রাশিয়া বা পূর্ব ইউরোপেও সরকারী সমাদর পেল

না। একই সঙ্গে তিনি ধনবাদী উৎপাদন, সাম্রাজ্যবাদ ও রেজিমেন্টেশনবাদী সামাজিক ছকওয়ালাদের আঘাত করেছিলেন—এই তাঁর অপরাধ। 'ডাকঘর' নাটককে কত নতুন মাত্রায় সঙ্কটাপন্ন সভ্যতা গ্রহণ করেছিল সে প্রমাণ কি একেবারেই বিরল? সর্বাত্মক রবীন্দ্রনাথ—না হলে রবীন্দ্রচর্চা একটা ফ্যাশন—একথা না বুঝলে রবীন্দ্রচর্চা খণ্ডিত হতে বাধ্য।

এমন কি যে শোভন ভদ্রতার জন্য বা স্নিগ্ধ সহিষ্ণুতার জন্য আমরা শঙ্খকে ভালোবাসি তা শঙ্খের স্বভাবসঙ্গত হয়েও রবীন্দ্রআগতিক। তা নইলে 'ঘরে বাইরে' প্রসঙ্গে লুকাচের মানবিভ্রম সম্বন্ধে নির্ভুল, শঙ্খের ভাষা এত নম্র হল কেন? তথ্যানুগ বিশ্লেষণের পরেও কেন তিনি একথা বললেন না, যে-অন্তমনস্কতায় এবং ঔদাসীন্যে কলোনির প্রভুরা এই ব্রিটিশ সাবজেক্টটির বিচার করতেন, প্রায় সেই ধরণের প্রভুবাদী অহমিকায় মার্কসবাদী লুকাচও টেক্‌স্‌টটাও ভাল করে পড়ার তোয়াক্কা রাখেন না। এই অপরাধী ঔদাসীন্যের হেতু কি এই নয় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিশ্বজোড়া ধোঁয়াশায় ভারতবর্ষ নামক ব্যাপারটাই অনেকের কাছে আবছা হয়ে গিয়েছিল। ১৯২২ সালে লুকাচ এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন—নেকড়ে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ঘোষণা তার আগে থেকেই য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে। লুকাচের তা জানার দরকার হয়নি, ভারতবর্ষ নামক ব্যাপারের অজ্ঞতার জন্য য়ুরোপের কাউকে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না বলে। শঙ্খের ভাষা ক্রোধকে অভিব্যক্তি দিতে পারে না তা নয়, এখানে কেন তা পারল না?

তবে এ অভিযোগ যৎসামান্য। রবীন্দ্রবিচারে সমগ্রতাবাদী শঙ্খকে জানা যায়, বোঝা যায় তাঁর পদ্ধতি প্রকরণের নির্দেশে। শঙ্খ বলেছেন:

> সমগ্রকে বুঝতে হবে লেখকের চেতনাগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে। একই সঙ্গে যিনি লিখেছেন কবিতা নাটক গল্প গান, এঁকেছেন ছবি—তাঁর সেই বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে একটি-কোনো মূল স্বভাবই তো উদ্‌গত হয়ে উঠতে চায়, একটি কোনো ঐক্যময় চেতনা। বিভিন্ন এই প্রকাশরূপগুলিকে জড়িয়ে নিয়ে ভাববার একটা অর্থ আছে বটে, কিন্তু সে-অর্থ সত্যিকারের মর্যাদা পায় যখন সব কিছুর মধ্য দিয়ে কেবলই সেই কেন্দ্রীয় চেতনাটিকে ছুঁতে পারি আমরা।

সেই ঐক্যময় চেতনাকে যিনি চিনতে পারেন, তিনি আকর্ষণ করে আনতে পারেন বিস্তারিত বিশ্বঐতিহ্যের নানা অংশের প্রতিতুলনা। তাঁর হাতে তুলনামূলক সাহিত্যতত্ত্ব কখনো সাহিত্যমূলক তুলনাতত্ত্বে পর্যবসিত হয় না। 'তিন চণ্ডালী' এবং 'অন্তহীন সিঁড়ি: কাফকা' এই রচনাদুটি এখানে উল্লেখ্য। 'তিন চণ্ডালী' প্রবন্ধে যখন একথা উচ্চারিত হয়—'আসানের মাতঙ্গী আর সতীশচন্দ্রের অম্বিকা এক হয়ে মিলে গেছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে'—তখন দেশকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত

এক সঙ্কটের মুখোমুখি বিস্তারিত রবীন্দ্রনাথকে আমরা অনুভব করি। সর্বাত্মক রবীন্দ্রনাথের বোধ থেকেই জন্মায় রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার অগ্নিবলয় সম্বন্ধে চেতনা। আবু সয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতাকে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন অধিবিদ্যা এবং শিল্পতত্ত্বের যোগে ও সহযোগে। শঙ্খ রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতাকে বুঝে নিতে চেয়েছেন চলন্ত বিশ্বের উত্থাপিত নানা সঙ্কটে মোচড় খাওয়া অস্তিত্বের যন্ত্রণার পটে। কাফকা প্রসঙ্গে তাঁর সর্বাত্মক আধুনিকের ভাষ্যে তাই প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে আমাদের কাছে রবীন্দ্র উন্মোচনেরই আর এক হদিস মেলে :

> এখন আমরা কাফকা পড়ব অন্তত এই উপলব্ধির জন্য যে জীবনের বহির্মণ্ডলে কোনো-এক শূন্যতার বোধ মানেই বিকল নৈরাশ্যের বোধ নয়, পরতে পরতে বিচ্ছিন্নতাকে খুলে দেখাবার মানেই সেই বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নেওয়া নয়। কেবল, কোনোখানেই যে পরম কিছু নেই, একটা উত্তরের পরেই দেখা দেবে নতুন একটি প্রশ্ন, সিঁড়ির পর আরো এক সিঁড়ি, এই কথা বুঝে নিলে অল্পেই আমরা ভেঙে পড়ব না হয়তো, দেখতে পাব সেই রাজদূতের নিরন্তর আসতে থাকা শুধু, সরল কোনো মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে নয়, বরং প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠে ঘূর্ণ্যমান হতে হতে শেষ পর্যন্ত কখনোই যা এসে পৌঁছবে না আমার জানালায়।

এই উপলব্ধি এবং অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথ এবং কাফকা—প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুই সত্তার সহযোগে এক তৃতীয় সত্তাকে পাওয়া গেল। শঙ্খ বারেবারে আমাদের কনভেনশন-ভাঙা এক নতুন রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান। সে রবীন্দ্রনাথ সর্বার্থে এক আধুনিক কবির রবীন্দ্রনাথ।

'ছন্দোময় জীবন'-এর গানের আলোচনায় আমরা পাই রবিজীবনীর নানা পর্বের আলোআঁধারের মেশামেশির বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যার এই পদ্ধতিতেই কেন্দ্রীয় রবীন্দ্রনাথকে ছুঁতে পারা যায় সব থেকে ভাল। তিনি যখন 'জীবন তোমার সুরের ধারায়'-এর 'অন্তবিহীন আলিঙ্গনে' অংশে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশ শ্রীবিলাস রূপকের আলোয় বলেন 'ফাল্গুনী'র পর নতুন গানের স্রোতে এই এক প্রেমের অনুভবকে আমরা ছুঁতে পারি, কিছুদিনের মতো শচীশের পর শ্রীবিলাসকে, তিনি ঠিকই বলেন শচীশের মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের সেই সদ্য-অতীতের রূপায়ণ, 'গীতাঞ্জলি'-পর্বে ছিল যার নির্যাস। উপন্যাসের বিচারে যখন এ কথা বলা হয় উপন্যাসের শেষে শচীশ তার নৈর্ব্যক্তিক জীবনচর্যায় চলে গিয়েছিল এবং প্রকৃতিরই স্রোতের মধ্য দিয়ে চলতে চেয়েছিল যে শ্রীবিলাস, সে এক ব্যক্তিগত প্রেমেরই রূপায়ণে গড়ে তুলতে চেয়েছিল তার জীবনের সব সৌন্দর্য ছবি—তখনই আমাদের সামনে খুলে যায় রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতীক্ষার জগতের দুই রঙ। উপন্যাসবিচার এভাবে হয়তো হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস আর

গানের জগতের আকাশের মিলকে সামনে এনে গানের গূঢ়তার চরিত্রনির্ণয় এভাবে হয়নি। শ্রীবিলাসকে দিয়ে তিনি অনেকগুলি গানের আত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। একটা গৌণ কথা এখানে তুলছি। গানের আলোচনা সুরকে বাদ দিয়ে কতখানি সম্ভব। বিষয়টা আমার মাথায় আরো সাঁধিয়ে দিয়ে গেলেন প্রিয়বর সুধীর চক্রবর্তী। এমন কি তিনি এ কথাও বললেন, যে পদ্ধতিতে আমরা ক্লাসরুমে বৈষ্ণব পদাবলী পড়াই তা অর্থপাঠ কিনা ? কেননা পদগুলি তো মূলত গেয়। সুরের পাখা ছাড়া তারা জীবন্ত হবে কী করে ! সুর এবং কথার সহযোগে রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনা হয়েছে। অরুণ ভট্টাচার্য, সন্‌জীদা খাতুন ও অনন্ত চক্রবর্তীর কথা এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি। কিন্তু স্বাধীন কবিতা হিশাবে এদের স্বনির্ভরতায় কোনো সন্দেহ নেই। নানা যুক্তি এখানে দেখানো যায়। আমি এখানে অনুধাবনীয় একটি তথ্যের উল্লেখ করছি। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে শ্রীশ আবৃত্তি করছিল 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মর ফিরে'। এটি কবিতা হিশাবেই শ্রীশ আবৃত্তি করেছে। উপন্যাসের গানগুলির বেলায় সুর নির্দেশ করা আছে সিন্ধুকাফি বা বাহার ইত্যাদি। এখানে তা উল্লেখ করা নেই। শুধু তাই নয়, এটি যে স্বনির্ভর কবিতাই তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বিপিন শ্রীশকে আবৃত্তি শোনার পর বলছে—'আজকাল তুমি খুব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ।' আরো উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথের গানের জন্মরহস্যের একটি অংশের ইঙ্গিত পাওয়া যায় শ্রীশের আরেকটি সংলাপে। শ্রীশ বলছে, 'আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সুর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে পড়ছিলুম'— এই বলে সে সুর না বসিয়ে আবৃত্তি করে গেল, 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে / বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে।' অর্ধেকটা শোনার পর বিপিন বলল, 'জিনিসটা মন্দ নয় হে—তোমাদের কবি লেখে ভাল। ওহে ওর পরে আর কিছু নেই ! যদি শুরু করলে তবে শেষ করো।' অথচ দুটি লিরিকই পরিষ্কার গান। শঙ্খ গানকে—রবীন্দ্রনাথের গানকে কেবলমাত্র গানের পটভূমিতে বিচার করার পক্ষপাতী নন। বস্তুত এখানেই আমাদের আর সকলের সঙ্গে শঙ্খের প্রভেদ। আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আলোচনা করি, আলোচনা করি ছোট গল্পের, অথবা নাটকের কি ছবির অথবা গানের। অসংখ্য সাধুবাদ সে সব আলোচনার প্রাপ্য। শঙ্খের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ—নানা রশ্মিতে বিকিরিত সূর্য যেমন অখণ্ডনীয়, শঙ্খের রবীন্দ্রনাথও তেমনি অবিভাজ্য। সেজন্যই তিনি আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রবোদ্ধা।

তাই তাঁর সংকলিত 'সূর্যাবর্ত' অবিকল কবিস্বরূপকে আরেকটু গভীরতর মাত্রায় প্রতিফলিত করলে আমি, ব্যক্তিগতভাবে সুখী হতাম। তিনি আমাদের যুগের অন্যতম প্রধান কবি, তিনি কেন বাদ দিলেন 'খেয়া'র 'ঘাটের পথ' কবিতাটি ! 'সানাই'-য়ের 'অবসান' নামক শেষ কবিতাটি অথবা 'শিশু ভোলানাথ'-

এর 'বাউল কবিতাটি যখন শঙ্খ ঘোষের তালিকায় পৌঁছয় না, তখন আমার মনে হয় আমার উপরেই যেন অবিচার হল। এই 'সূর্যাবর্ত'-ও কেন তাঁর রবীন্দ্রনাথ, একান্তভাবে তাঁরই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠল না! তাতে আমরা লাভবান হতাম বেশি। তবে এসব আপত্তি গৌণ। 'ছন্দোময় জীবন'-এর অধ্যায়ে অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই যথার্থ প্রেক্ষিতে। আবেগময় অপরিচয়ের দিকে নিয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গান। আমাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এই কথায় :

> কথার ভার নামিয়ে নীরব হয়ে শুনি, কোন্ বীণায় গান বাজে, নিজের বন্ধন ছেড়ে যেতে হবে অশ্রুনদীর সুদূর পারে; তাহলে এই ব্যথার বাঁশিতেই আনন্দগান বেজে উঠুক, বাসার আশা ঘুচিয়ে দিয়ে সৃষ্টি ছাড়া সুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি আকাশরাশিতে; দুঃখের এই পথকেই সাধনা জেনে হৃদয়ের পথে চলেছি আজ; ভীরুর হাতে তো পৃথিবীর ভার নেই; মায়ের সাগর পাড়ি দিয়ে তোমার পায়ে এনে দেব দুঃখদিনের রক্তকমল; আর এইভাবে একদিন, দুঃখ আমার অসীম সমুদ্র পার হয়ে যাবে, সে তখন হয়ে উঠবে তোমার বীণার তার।

এই ক্যালাইডোস্কোপের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে অন্তর্জীবনের বিচিত্রাভাস পরিলক্ষিত হয়, সেটাই যথার্থ কবিজীবনী। একজন কবির কাছ থেকেই তা আমরা পেতে পারি। 'তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি' — এই বন্ধন ও উন্মোচনের রহস্যকে ঠিকভাবে একজন কবিই জানতে পারেন।

কুমার রায়

...

শঙ্খ ঘোষ : নাট্যবৃত্ত

১. কতবার শঙ্খ ঘোষের কণ্ঠে কবিতা পাঠ শুনতে শুনতে ভেবেছি বাংলা মঞ্চে এমন কণ্ঠের, এবং উচ্চারণ ও ভাবের ঐশ্বর্য নিয়ে ক'জনই বা অভিনেতা আছেন! ঈর্ষা করেছি ওর কণ্ঠের দানা-কে। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ অভিনেতা নন, শঙ্খ কবি,—শঙ্খ ঘোষ আধুনিক কবিতার জগতে একটি অবশ্য উচ্চার্য নাম। আধুনিক কবিতার সঙ্গে কি নাটকের সম্পর্ক আছে? জানিনা—কিন্তু শঙ্খ ঘোষের অনেক কবিতায় নাটক আছে! কবি বিষ্ণু দে একবার আধুনিক কবিতার প্রসঙ্গে নাটকের কথা বলেছিলেন সেটা মনে আছে। রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন,—'প্রান্তিক'-এ '…জয়ে পরাজয়ে,/বিচিত্রিত নাট্যধারা বেয়ে আলোকিত রঙ্গমঞ্চে,/প্রচ্ছন্ন নেপথ্য ভূমে', কিংবা 'নাট্যভূমে উঠে গেল যবনিকা'। কবি হিসেবে শঙ্খর আত্মস্থতা কি দ্বিধাদীর্ণ নাটক এবং কবিতায়? আধুনিক কবিতা নিয়ে কবি বিষ্ণু দে কেন মার্কিন কবি ওয়ালেস স্টীভনস্-এর কবিতার অনুবাদ করবেন—"মঞ্চ সেকালে সাজানোই থাকত, মন শুধু/পুনরাবৃত্তিতে প'ড়ে যেত লিপিতে যা লেখা।/তারপরে থিয়েটার পালটিয়ে/আরেক ব্যাপার হল: অতীত রইল স্মৃতিচিহ্ন শুধু।/আজ তাকে জীবন্ত হ'তেই হ'বে, স্থানীয় বাচন শিখে।/সমকালীন লোকের মুখোমুখি, চিনে জেনে/এ-কালের মেয়েদেরও, যুদ্ধ তাকে নিয়ত ভাবায়,/আর তাকে খুঁজে খুঁজে যেতে হয় যা যথেষ্ট তাই পেতে।/তাকে এখন গড়তে হয় নব-নাট্যমঞ্চ। আর সেই/মঞ্চে তাকে উঠে চিরতৃপ্তিহীন এক নটের মতন/ধীর স্থির ধ্যানময় কথা ব'লে যেতে হয়…।"* কেন বারবার নাটক, মঞ্চ, থিয়েটার নটের কথা ওঠে—আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে? অধুনিক নাট্যের প্রসঙ্গেও তো একই কথা বলতে হয়। তাকেও সমকালীন লোকের মুখোমুখি হ'তে হয়, স্থানীয় বাচন শিখতে হয়,—অবশ্য একথাও স্বীকার করে নিতে হয়—'কবিতার ধ্বনিমাত্র শুনতে অগোচর শ্রোতৃসত্তা কান পেতে থাকে'। নাটকে তা হয় না। কবিতায় মনে যে আবেগ জন্মায় সে যেন দুটি মানুষের, দুটি আবেগের একাত্ম হওয়া। নাটকে তা নয়,—

* ওয়ালেস্ ষ্টিভন্স্-এর 'অব. মডার্ন পোয়েট্রি' কবিতাটির অনুবাদ ধৃত আছে বিষ্ণু দে-র 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা' বইটিতে (প্রতিভাস সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃঃ ১০)—সম্পাদক

বহুমানুষের সঙ্গে একই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা। ব্রেখ্‌ট্‌ এর এপিক নাট্যকাব্যেও কি এই একই কথা চলে না? কিন্তু কেন এসব কথা তুলছি—অধিকার-ভেদ কথাটা ভুলে গিয়ে। আমার আলোচনা তো অন্য। কবি শঙ্খ ঘোষের নাট্য-মনস্কতা কিংবা নাট্য প্রেম নিয়েই তো লিখবার কথা। তাহলে? মনোযোগী নাট্যদর্শক, সুনিপুণ নাট্যবিশ্লেষণে পারঙ্গম শঙ্খ ঘোষকে নিয়েই আমার আলোচনা—কবি শঙ্খ ঘোষ নয়। বরং শঙ্খ ঘোষের কবিতায় নাটক নিয়ে অন্য কেউ গবেষণা করুক। রসদ অপর্যাপ্ত খুঁজে পাওয়া যাবে।

২. শঙ্খ ঘোষের 'সফল কীর্তি শুধু আঙুলে গুনবার নয়। যদি বা গুনে ফেলা যায় তবু 'সময়ের দাঁতের কোটোয়' কিংবা 'অন্ধকার ঘটে' সিঁদুর চিহ্ন দিয়ে রাখা আছে কিছু নাট্যস্মৃতি। আজকের নাটকে মন স্বয়ম্ভু নয়,—তার অতীত আছে। সেই নাট্য স্মৃতি কি শঙ্খ-র 'নানা রঙের দিন—সোনার সরু তারে বাজনা' বাজায় না? নাকি,—'মনের মধ্যে ভাবনাগুলো ধুলোর মতো ছোটে / যে কথাটা বলব সেটা কাঁপতে থাকে ঠোঁটে, / বলা হয়না কিছু'—কিন্তু শঙ্খকে বলতে ইচ্ছে করে—'মাঝে মাঝে ফিরে দেখা ভালো নয়?' 'অতীতের ধারাপাত' হোক না সে ব্যক্তিগত, তবু এরই 'বীজের মধ্যে দশদিক ঘুরে আসা যায়'! কৈশোর এবং কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনের—সেই 'অতীতের জলস্রোত এড়াতে পারোনা।' সেই অতীতের জলস্রোতে অনেক নাটকের অনেক সংলাপ শুনতে পান আজও, শঙ্খ ঘোষের আত্মপরিজন, বন্ধুজনরা। শঙ্খের কণ্ঠে শ্রেষ্ঠ-সংলাপ উচ্চারিত হয়েছিল একদা। তার আজকের পরিচিত পরিমণ্ডলে—যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে এ এক সংবাদ,—শঙ্খ ঘোষ অভিনেতা! লাজুক মানুষটি, স্মিত হেসে, হয়তো আজ এড়িয়ে যাবেন সে কথা।

শঙ্খ ঘোষের বাবা আজীবন শিক্ষক মণীন্দ্রকুমার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বৈয়াকরণ, নাট্যোৎসাহী এবং রবীন্দ্র সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। তাহলে নাটক এবং রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রেই অর্জিত। শুধু তাই নয়,—গোটা পরিবারের মানুষজনও ছিলেন নাটক এবং গানের ভক্ত। ১৯২১ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি মণীন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যপ্রিয় ঘোষের জবানবন্দীতে—'সে-বছর দাদু দুই পুত্রবধূ এবং অন্যান্যদের নিয়ে বাণারিপাড়ায় এলেন খুব ধুমধাম করে। যে যেখানে থাক, পুজোর সময় নিজের গ্রামে (আমাদের ভাষায় 'বাড়ি যাওয়া') কে না আসত। পুজোর দিন-কয়েক আগে বাবা বাড়ি এলেন কলকাতা থেকে, বড় কাকা বেনারস থেকে। বাবা এসেই সাতটা ছেলে জুটিয়ে নিয়ে তাদের তালিম দিলেন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি। তিনদিনের রিহার্সেলেই তা মঞ্চস্থ হলো আমাদের বাড়ির কাছারিঘরে, 'বাণাড়িপাড়া থিয়েটার-এর সিন সিনারি-পোষাক, থিয়েটারের আগে কনসার্টও' বাদ গেলনা, গ্রামভর্তি লোক দর্শক। রঘুপতি সাজেন

সুন্দরকাকু (তখন বয়স ১৪), জয়সিংহ রাঙাকাকু, গোবিন্দমাণিক্য ভাসী পিসিমার ছেলে। উইংসের দুই পাশ থেকে প্রমপট্ করেন বাবা আর বড়কাকা।" তখন অবশ্য শম্ভু ঘোষ জন্মাননি। ১৯২৪ সালের আর একটি বিবরণও উল্লেখ-যোগ্য, '১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতার মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে ভারতবোর্ডিং-এ বাবা যখন থাকতেন, তখন তাঁর ঘরে আমাদের গ্রাম বাণারি-পাড়ার জনা-বিশেক যুবক একত্র হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'বাণারিপাড়া সম্মিলনী'।" তাহলে, 'উত্তরাধিকার সূত্রে' কথাটা মিথ্যে নয়। বানারিপাড়া বরিশাল জেলায়—। এই বরিশাল জেলা মফঃস্বল বাংলার নাট্যচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' প্রণেতা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "মফস্বলে প্রথম নাট্যাভিনয়ের গৌরব বোধহয় বরিশালেরই প্রাপ্য।" সে অবশ্য বহুকাল আগের ঘটনা—১৮৬১ সালে বরিশালে 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নাটকের অভিনয় হয়। ব্রজেনবাবু 'ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত একটি পত্রও উদ্ধৃত করেছেন। তাহলে বংশানুগত এবং দেশানুগত সংস্কৃতির সংযোগ ঘটেছে শম্ভু ঘোষের মধ্যে। শম্ভু ঘোষের নাট্য-সংস্কার এইভাবেই গড়ে উঠেছে—এ কথা বলা যায় বোধহয়। নতুবা, বাঙালী ছেলের একটা বয়সে কবিতা লেখা এবং অভিনয় করার মত শম্ভু-র স্কুল জীবনে অভিনয় করাটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই উল্লেখের যোগ্য নাও হ'তে পারতো, যেমন অনেকের জীবনে একটা পর্বে কবিতা লেখাটা! কিন্তু এক্ষেত্রে অভিনয় তালিকাটা উল্লেখ করতেই হয়। আবারও আদর্শ শিক্ষক মণীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পর্কে আলোচনা উদ্ধৃত করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি। পাবনা জেলার পাকসি চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠের তিনি প্রধান শিক্ষক। তিনি স্কুলে ছাত্রদের বিকশিত করতে চেয়েছিলেন—সেই বিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরই ছাত্র, শম্ভু ঘোষের সহপাঠী অধীর চক্রবর্তী। শ্রী চক্রবর্তী লিখেছেন "...সাধারণ প্রশাসনের কাজ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত কাজ ছেলেরা নিজেরা করবে। অন্যান্য কাজগুলিকে মোট নয়টি বিভাগে ভাগ করা হলো।" এই নয়টি বিভাগের মধ্যে দুটি ছিল—সাহিত্য এবং নাট্যাভিনয় বিভাগ। এই সূত্রে তিনি আমাদের জানিয়েছেন, "আমরা অনেকবার 'গুরু', 'মুকুট', 'অবাক জলপান,' 'বিরিঞ্চি বাবা,' 'মহারাজ নন্দকুমার' ইত্যাদি মঞ্চস্থ করেছি। Herman Ould-এর The Discovery-র অভিনয় পর্যন্ত একাধিকবার আমাদের সতীর্থরা করেছে। এই নাটকটি যখন প্রথম বার অভিনীত হয় আমাদের স্কুলে, তখন নির্দেশনার কাজ অনেকাংশে করেছিলেন আমাদের স্কুলের পরিচালক সমিতির তৎকালীন সভাপতি ইলিয়ট সাহেব। পেশায় এঞ্জিনিয়ার, অক্সফোর্ডের ছাত্র, নাটকের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ।"—সেই পর্বে শম্ভু সব নাটকে অভিনয় করেছিলেন কি না জানা নেই। তবে ১৯৪৫-৪৭ পাকসি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট-এ 'রায়ের স্মৃতি' (রায়), 'টিপুসুলতান' (টিপু), The Discovery তে Pepe এবং 'মুকুট'-এ

ইন্দ্রকুমার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রায় মলাট পার্ট যাকে বলে আর কি! এলেম না থাকলে তো এমন সব চরিত্রে অভিনয় করা যায় না। ওই বয়সে কবি শঙ্খ ঘোষ কতটা বিকশিত জানি না কিন্তু সংগৃহীত তথ্য থেকে তাঁর অভিনেতা সত্তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে পাকসিতে। এরই মধ্যে সংগৃহীত তথ্যে দেখতে পাচ্ছি বানারিপাড়া গ্রামে বিজয়াসম্মিলনীতে তিনি পরপর দুবার 'চাঁদ সদাগর' নাটকে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কল্পনা করি সেই অল্প বয়সে শঙ্খ উচ্চারণ করছেন, "আমার আরাধ্য দেবতা শিবদুর্গা, যে হাতে তাঁদের পূজা করি, সে হাত তাঁদেরি চরণ পূজার জন্য উৎসর্গ করেছি, উচ্ছিষ্ট হাতে অন্যদেবতার পূজা করতে পারি না, পারব না।" মহাসর্বনাশের পরও মনসার পূজায় চাঁদ দ্বিধান্বিত—তবু বেহুলা যখন তাঁর হাতে পদ্মফুল গুঁজে দিয়েছে তখন চাঁদ ডান হাতে চোখ ঢেকে বাঁ-হাতে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে মনসাকে 'শিবাত্মজা' ভেবে নিয়ে। চাঁদসদাগরের উত্থান পতন বিদ্রোহ অসহায়তা সব নিয়ে এমন এক মহৎ চরিত্রে যাঁরা শঙ্খকে নির্বাচন করেছিলেন তাঁরা অবশ্যই তার অভিনয় দক্ষতার কথা ভেবেছিলেন সেই বয়সেও। 'রামের সুমতি,' 'মুকুট' কিংবা 'The Discovery'-তে অভিনয় প্রতিভার প্রমাণ হয়তো স্কুলের অনুষ্ঠানে ততটা দেওয়া যায় না—কিন্তু যে অভিনেতাকে 'টিপু সুলতান' নাটকে 'টিপু' বা 'চাঁদসদাগর' নাটকে চাঁদের চরিত্রে নির্বাচন করা যায় তার অভিনয় ক্ষমতা তো অস্বীকার করা যায় না। সংগ্রহ করা তথ্যে এও জানা যাচ্ছে শঙ্খ ঘোষ ১৯৬০ সালে শিয়ালদা ম্যানশন্ ইনস্টিটিউটে বানারিপাড়া সম্মেলনে 'বিপ্রদাস' নাটকে 'দ্বিজদাস' চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তখন তো শঙ্খ ঘোষ এই নামটির সঙ্গে অধ্যাপক খ্যাতি, কবি খ্যাতি যুক্ত হয়ে গেছে। হায় হারিয়ে গেলেন অভিনেতা শঙ্খ ঘোষ। তখন তো, 'দিনগুলি রাতগুলি' এবং 'নিহিত পাতাল ছায়া'-র অনেক কবিতা লেখা হয়ে গেছে। শঙ্খ অনায়াসে এখন বলতে পারে,—"আমিও আমার ছায়া ভেঙে দিয়ে চলে গেছি দূরে"—সত্যিই অভিনয় করবেন না হয়তো শঙ্খ ঘোষ আর কোনও দিন। কিন্তু 'করোটির মধ্যে তার শব্দ'—সেও কি আজকের শঙ্খ র ওঠে না কোনওদিন? ওঠে নিশ্চয়ই। আজো ভালো অভিনয়কে চিনে নিতে শঙ্খর অসুবিধে হয় না। যা উল্লেখ করা হলো—তা নেপথ্যগৃহের কাজ। কিন্তু সে নেপথ্য-কর্ম শঙ্খর জীবনে আলগা সূত্র নয়।

৩. স্বদেশ, স্ব-গ্রাম, আপন পরিবার-পরিজন শঙ্খ ঘোষের নাট্য ঐতিহ্যকে তৈরি করে দিয়েছিল। এই ঐতিহ্য তাঁর কাছে 'পুরাণ' নয়, 'মৃত তথ্য নয়', 'গত দৈনিক অস্তিত্ব' নয়। নবীন শঙ্খ ঘোষকে এই ঐতিহ্য সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই এগিয়ে যাবার অবলম্বন শঙ্খ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। শঙ্খ ঘোষের বর্তমানের মধ্যে অতীত শুধু স্মৃতি নয়—তা হয়ে উঠেছে এক সঞ্জীবিত প্রবাহ।

শঙ্খ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, শঙ্খ কবি। শঙ্খ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কাজ করে। সমগ্র রবীন্দ্রনাথই তার অবলম্বন। তার জীবনের কেন্দ্র। রবীন্দ্রসৃষ্টির একটা বড় অংশ তাঁর নাটক এবং অভিনয়-প্রযোজনা। স্বভাবতই শঙ্খ উৎসুক রবীন্দ্রনাট্যকে বুঝতে, রবীন্দ্র প্রযোজনার বিশিষ্টতাকে অনুধাবন করতে। আর রবীন্দ্রনাটককে বুঝতে গিয়ে সে বাংলা নাটকের ধারাকেও জানতে চেয়েছে,— বিশ্বের নাটকও এই সূত্রেই তাকে জানতে হয়েছে। শঙ্খর নাট্য-প্রবন্ধ এইভাবেই সজীব হয়ে উঠেছে। শুধু অনন্ত ভাষা সম্পদেই নয়—ভাব—সম্পদ এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, গভীরের সন্ধানে—সে প্রবন্ধাবলী ছাত্রপাঠ্য রবীন্দ্র নাট্যালোচনা, সমালোচনার পেষণকে মুক্ত করে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ করে দেয়। আধুনিক, সর্ব-অর্থে আধুনিক!

১৯৬৫ সালে 'বহুরূপী' নাট্যপত্রে প্রকাশিত হল 'পথের পটভূমি : রবীন্দ্র-নাটক' (সংখ্যা ২৩); 'নাট্যযুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হল ১৯৬৬-তে (সংখ্যা ২৬), তারপর ৩৬ সংখ্যায় শঙ্খ লিখলেন—'পালা বাঁধেন অবন ঠাকুর' (১৯৭১); ৩৯ সংখ্যায় 'বহুরূপীর রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭২); অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর স্মরণে লিখেছেন, 'আগুন যখন জলে ঝাঁপায়' (৪৭ সংখ্যা ১৯৭৭); ৫২ সংখ্যায় 'সংস্কৃত-নাটক ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৯); পিকাশোর জন্ম শতবর্ষে লিখলেন, 'পিকাশো : তুলি থেকে কলমে' (সংখ্যা ৫৭-১৯৮২); ১৯৮৩ সালে ৬০ সংখ্যায়—'আরোপ আর উদ্‌ভাবন'। ১৯৮৫ তে প্রকাশিত ৬৩ সংখ্যায়, 'নৃত্যনাট্য : শিল্পরূপ' এবং ৭০ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রবৃত্ত আর বহুরূপী' (১৯৮৮)। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য আর একটি রচনা—সেটি একটি নাটক। শঙ্খ অনুবাদ করেছেন গিরিশ কারনাড-এর 'হয়বদন' নাটকটি। ১৯৭৪ সালে বহুরূপী পত্রিকার ৪৩ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছে—'ঘোড়ামুখো পালা'—এই নামে।

বহুরূপী নাট্যপত্র ১৯৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার তিন বছর পর আরও একটি নাট্যপত্র 'গন্ধর্ব' প্রকাশিত হল। দেখতে পাচ্ছি সেখানে শঙ্খ ঘোষ ষাটের দশকে লিখেছেন 'রাজা : রহস্য ও প্রকাশ' (সংখ্যা ২২, ১৯৬৪)। এর পর আশির দশকে '৮১, '৮৬ এবং '৮৮ সালে যথাক্রমে—'অভিনয়ের মুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' (৩১ সংখ্যা); 'দুই যাত্রায়' (সংখ্যা ৩৬); এর পর ওই পত্রিকায় ধ্রানুটের হাসান রেক্ভর-এর অনুবাদ নাটক 'মানুষ' প্রকাশিত হল ৪০ সংখ্যায় (১৯৮৮)।

এসব প্রবন্ধের অনেকগুলিই সংকলিত হয়েছে শঙ্খ ঘোষের প্রকাশিত বই-এ। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে এ সব লেখা, অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে। শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাটকে আনন্দ পান; আমরা তাঁর রচনা-সমালোচনায় পেয়ে যাই সেই আনন্দের স্বাদ,—শঙ্খ ঘোষের অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাটক নিয়ে শঙ্খ যখন আলোচনা করতে শুরু করেন—তখন

ঘটনাক্রমে এবং ভাগ্যক্রমে, রবীন্দ্রনাটক মঞ্চে পুনরাবিষ্কৃত হয়ে গেছে। এবং তিনি এইসব প্রযোজনার সংবেদনশীল দর্শক। পূর্বগামী নাট্যতত্ত্ববিশারদদের এ অভিজ্ঞতা ছিল না—এমনকি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রযোজনাগুলির বিশদ আলোচনা এঁদের তত্ত্বালোচনায় স্থান পায়নি উল্লেখযোগ্যভাবে। শঙ্খর আলোচনায় তত্ত্ব যেমন নতুন আলোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে সেইসঙ্গে ঠাঁই পেয়েছে প্রযোজনার সূক্ষ্ম বিচার। 'বহুরূপীর রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রবৃত্ত আর বহুরূপী', এই প্রবন্ধ দুটিতে বহুরূপী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাটকের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ। চরিত্রচিত্রণ, নাট্য সম্পাদনা, নাটকের মঞ্চ ব্যাখ্যা, এমনকি মঞ্চ, আলো, পোষাক ইত্যাদি আলোচনায় সমালোচনায় স্থান পেয়েছে। মঞ্চ এবং নাটকের সঙ্গে তাঁর যে শিকড়ের বন্ধন—তাই সাহিত্যবিচারের সঙ্গে, তত্ত্বের, সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটালেন তার প্রয়োগ-কলাকেও। নাটক বোঝার জন্য মঞ্চরূপকেও গুরুত্ব দিলেন। অনায়াসেই শঙ্খ লিখতে পারেন,—'নাটকের অভিনয়ই নাটকের সর্বোত্তম সমালোচনা।' লেখেন, "সেইজন্য 'রাজা' অথবা 'রক্তকরবী'র দশটি ক্লাসের চেয়ে একরাত্রি বহুরূপীর অভিনয় লক্ষ করা এমন-কী ছাত্রজনের পক্ষেও উপকারী। কেননা তার দ্বারা আপাত-অনড় রেখাসমষ্টির সচল বিন্যাস বোঝা যায়, কণ্ঠস্বরের বিচিত্র উত্থানপতনে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে মনের মধ্যে চিহ্নিত হতে পারে।" ('রাজা : রহস্য ও প্রকাশ')।

রবীন্দ্রনাটক নিয়ে রচিত প্রবন্ধাবলীতে শঙ্খ অনায়াসে তুলনা প্রতিতুলনা করতে পারেন—বিশ্বনাট্যের নাট্যকার, নাট্যতত্ত্ববিদ ও আলোচকদের উদ্ধৃত করে। সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য খুঁজে পান। কিছু কিছু সাদৃশ্যলক্ষণ দেখে যখন কোনো পাণ্ডিত্যাভিমানী রবীন্দ্রনাথকে কুম্ভিলকবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন তখন শঙ্খ ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে দেন (দ্রঃ চতুর্বিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা—'অনুষ্টুপ')। তিনিই তো লিখতে পারেন 'রক্তকরবী, ক্রিসেন্থিমাম' (কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক)। অনেক সময় 'সমতুল্য কিন্তু বিন্যাসে একেবারে সমান নয়'—একথা শঙ্খ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন তাঁর প্রখর নাট্যবোধ থেকে। যেমন গ্রীক নাটক, সোফোক্লেসের 'কলোনাসে ঈডিপাস'-এর-'প্রথমে ঐ অঝোর ঝরণা থেকে শুদ্ধ অঞ্জলিতে নিয়ে এসো পুণ্যজল'—ইত্যাদি অংশের সঙ্গে শঙ্খ মিল খুঁজে পান রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব নাটকে ছদ্মবেশী সম্রাটের সংলাপে,—'ওই কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে ...।' সংলাপে বহিরঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েও শঙ্খ বলেন,—"আমরা নিশ্চয় মনে রাখছি যে এ-অংশটির প্রভেদও বড়ো সামান্য নয়।"—এই কথা বলেই তিনি দায় মুক্ত হতে চান না—নাটক বিশ্লেষণ করেও বুঝিয়ে দেন যে শারদোৎসব যেন 'এক আধুনিক ব্রতকথা'। ('নাচ গান নাটক'—কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক। নাটক-নিয়ে শঙ্খ ঘোষের মনন চিন্তা কতটা গভীর—তার পঠন-পাঠনের পরিধি কত বিস্তৃত,

তার দুটি উদাহরণ দিয়ে এই পর্ব শেষ করবো। একটি ১৯৮৩ সালে লঘু চালে লেখা 'পঞ্চভূত' অনুসারী এবং দ্বিতীয়টি অতি সম্প্রতি গভীর সুরে গভীর কথা বলা। না, শম্ভুর রচনা শৈলী নিয়ে কোনও কথা বলার অধিকার আমার নেই (প্রথমাবধি শম্ভুর গদ্যশৈলীর আমি ভক্ত, মুগ্ধ!)। লঘু ছাঁদে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত 'কলকাতা ২০০০'-এ। (সেপ্টেম্বর—অক্টোবর সংখ্যা ১৯৮৩)। 'নাট্যোপকথন' এই শিরোনামে উৎপল দত্ত রচিত 'গিরিশমানস'-এর সমালোচনা। শম্ভু এখানে অব্যর্থ শরসন্ধানী। শুধু রবীন্দ্র-নাটকই নয়—গিরিশচন্দ্রের নাটকেরও শম্ভু নিবিষ্ট পাঠক সেটা বোঝা গেল। উৎপলের অনেক মনগড়া যুক্তি খণ্ডিত হলো গিরিশচন্দ্রের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই। এ লেখায় চরিত্রের মুখে সংলাপ রচনায় সিদ্ধ বলে মনে হলো শম্ভুকে। আর শেষে নাটকীয় চমকও অপেক্ষা করছিল—যখন অধ্যাপক চরিত্রটি বলে ওঠে: 'আগে তো স্নান করি। পরে ভেবে দেখব।'—এই স্নান করি শব্দটা নিরামিষ নয়; আলোচনার বিষয়টির আবিলতা থেকেও যেন মুক্তি। শম্ভুর স্বভাবকেই যেন খুঁজে পাওয়া গেল।

সাম্প্রতিক লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে 'স্যাস' নাট্যপত্রে (দশমবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৯৩)। প্রবন্ধের নাম: 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে Tussle?' লেখাটির উপলক্ষ্য 'শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র রচিত' চাঁদ-বণিকের পালা নাটকটি। যে নাটক সম্পর্কে শম্ভু এক-দিন বলেছিলেন, 'প্রতিদিনের বাচনরীতির সঙ্গে অবলীলায় মেলানো ছন্দোময় এই নাটক এইভাবে হয়ে ওঠে আমাদেরই জীবনেরই এক কবিতা। বেদনাময়, কিন্তু স্পর্ধিত। বহুস্তরে আর বহুবিস্তারে চাঁদসদাগরের গল্প হয়ে ওঠে আমাদের এই মুহূর্তেরই কোনো গল্প। অভিমানী কিন্তু অভিযাত্রাময়।' শম্ভু বলছেন, বারো বছর আগের এই লেখা আজ পুনর্বিচারের সময় কোনো মন্তব্যই প্রত্যাহরণযোগ্য নয়। কেন নয়, এ কথা বোঝাতে গিয়ে এ দীর্ঘ সমালোচনায় শম্ভু আবিষ্কার করে ফেলেন যে শম্ভু মিত্রের এই নাটকের ভাবনা শুধুমাত্র তাঁর কথিত 'রাজা' নাটকের প্রস্তুতি পর্বের নয়। অনুসন্ধানী শম্ভু খুঁজে আনেন শম্ভু মিত্রের নানান পর্বের লেখা থেকে এ নাটকের ভাবনার সমর্থ ইঙ্গিত। ১৯৪২, ১৯৪৫-এর লেখা 'উলুখাগড়া' এবং 'একটা দৃশ্য', কিংবা আরো পরে লেখা 'ঘূর্ণি', অথবা ১৯৬৩ সালে লেখা ছোট গল্প 'অরণ্যে'—ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলে এনে শম্ভু দেখান যে ভেতরে ভেতরে দীর্ঘ দিন প্রস্তুতি চলছিল এ নাটক রচনার শম্ভু মিত্রের মনে। এবং শুধু তাঁর রচনা নয়, তাঁর অভিনীত চরিত্র এবং নাটকও যেন 'চাঁদ বণিকের পালাতে' উত্তীর্ণ হবার সোপান—সে কথায় শম্ভু 'দশচক্র', 'চার অধ্যায়', 'বিসর্জন'-এরও উল্লেখ করেন, বিশ্লেষণ করেন যোগসূত্রটি। শম্ভু মিত্র কোনো সময়ে বলেছিলেন—তাঁর এই নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে কোনো সরল সম্পর্ক নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানে তাঁর 'বিরোধ আছে, তর্ক আছে। বলতে পারেন

একটা Tussle আছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।' শঙ্খ লিখেছেন, 'আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, কী সেই Tussle'? এই জিজ্ঞাসার উত্তর শঙ্খ নিজেই তাঁর এই লেখায় আবিষ্কার করে ফেলেন এবং আমাদের বিস্মিত করে দেন। শঙ্খর একসময় মনে হয়—'কোথাও কোনো আশ্বাসের কিছু না রেখে স্বপ্ন আর বিশ্বাস আর আকাঙ্ক্ষার সার্বিক ধ্বংস কেন দেখেননি রবীন্দ্রনাথ, বা বলেননি তার কথা'—এইখানেই কি শম্ভু মিত্রের তর্ক বা Tussle? সর্বস্বান্ত হয়ে চাঁদ যে বলে ওঠে তার জীবন 'যেন জলের আল্পনা'। শম্ভু মিত্রের লেখা 'ঘূর্ণি' নাটকে দেবেন-কে বলেছিল তার শ্যালক অবিনাশ—'একটুতো নীচু হতে পারতে আমার কাছে? নিজের জন্য না হও, ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে?......নিজের অহংকার বাঁচানোটাই দায়িত্ব, আর এগুলো দায়িত্ব নয়?'—এই সংলাপ উদ্ধার করে শঙ্খ দেখিয়েছেন—চাঁদও শুনেছিল এমন কথা—চাঁদকেও দিতে হলো মনসার পূজা। অন্ধকারই কি শেষ কথা এ নাটকে? শঙ্খ সুনিপুণ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন সত্যি সত্যি গভীরতর কোনো tussle নেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, বরং "অন্ধকারকে দেখাবার আর তার থেকে বেরিয়ে আসবার কালোপযোগী স্বতন্ত্র একটা মাত্রা পেল নাটকের শেষে—যখন নাটকে বলা হলো—'এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে...।" শঙ্খ অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদ করে তুলে আনেন 'তবু' এই শব্দটিকে। গভীর তাৎপর্য এই তবু শব্দটির খুঁজে পান শঙ্খ। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন—"এ নাটকে যে একাকিত্বের 'আবিষ্কার'—তা কোনো বিচ্ছিন্নতার একাকিত্ব নয়। সে কেবল ভিতর থেকে সংলগ্ন হতে চাইবার প্রতীক্ষাময় এক নেপথ্য! রাজার অন্ধকার ঘর থেকে রানী সুদর্শনার আলোয় বেরিয়ে আসার মতো! নাট্য সাহিত্যের প্রতি গাঢ়তম বোধ এবং মমতা, অভিনয় সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান না থাকলে এমন বিস্ময়কর আধুনিক আলোচনা একটি মহৎ নাটক নিয়ে সম্ভব হতো না। চাঁদ বণিকের পাড়ি দেওয়ার অনুষঙ্গে শঙ্খর স্কুলজীবনের পাঠ্য হার্মান উল্ডের—'দি ডিসকভারি' নামের নাটকটির কথা মনে পড়ে যায়। মাসের পর মাস সফলতাহীন অনিশ্চিত সমুদ্রযাত্রায় কলম্বাস আক্রান্ত হতে যাচ্ছিল সংশয়ক্ষিপ্ত নাবিকদের হাতে—আর তখনই কলম্বাসের উপলব্ধি, শঙ্খ যাকে বলেছেন 'আবিষ্কার'—"When a man is given a vision, he must follow it alone". চাঁদবণিকের অনুরূপ অবস্থায় এই একাকিত্বের অনুভব। কলম্বাসের একমাত্র অনুগামী ছিল তখন বালকভৃত্য পেপে। চাঁদের শিবদাস! পেপে-র উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ-র নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই স্কুল জীবনে উল্ডের নাটকটিতে পেপে চরিত্রে তার নিজস্ব অভিনয়-কথা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পনেরো বছরের 'টানাপোড়েনের ইতিহাস' নিয়ে শঙ্খ লিখলেন 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'। শঙ্খ ভূমিকায় লিখেছেন: 'ছোটোবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে, এ নিয়ে অনেকের মতো আমারও মনে যে সব প্রশ্ন

জেগেছে কখনো, সে-প্রশ্নের খানিকটা বিস্তারিত উত্থাপনই ছিল আমার লক্ষ্য; তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।'—আমরা কিন্তু বেশি-ই পাই এ বই পড়ে। রবীন্দ্রনাথের নির্মাণ ও সৃষ্টির খেলা নাটকের মধ্যেও দেখতে পান শঙ্খ। 'তাসের দেশ' 'বাঁশরী', 'চণ্ডালিকা'—শঙ্খ বলেন, প্রথম দুটি নির্মাণের উদাহরণ—আর নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' হল সৃষ্টি। তাঁর পক্ষেই মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব যে, 'কালান্তর-এর প্রবন্ধগুলিতে যে-কথা বলা হয় তারই একটা শিল্পরূপ থাকে' 'মুক্তধারা', বা 'রথযাত্রা' বা 'রক্তকরবী'-র মতো নাটকগুলিতে। শঙ্খ-ই পারেন এমন বিশ্লেষণ করতে যে, "আঘাতে সংঘাতে ভরা জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কী-ভাবে, সেই আত্মশক্তির প্রস্তুতি ছিল 'রাজা'য়। কিন্তু অভিজ্ঞতার এই রূপটিকে সেখানে আমরা দেখিনি বিশ্বসংকটের কোনো বাস্তবিক ভূমি থেকে। 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'তে দেখা দিচ্ছে সেইটেই, এ নাটকে ইতিহাস এসে পৌঁছচ্ছে তার শরীর নিয়ে।" ব্যাপক একটা ভুল ধারণার অবসান ঘটান শঙ্খ। সচরাচর ভাবা হয় যে রুশভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল 'রথের রশি'র রচনা। কথাটির যে ভিত্তি নেই, তথ্য প্রমাণ দিয়ে শঙ্খ ধরিয়ে দেন সেই ভ্রান্তি। এই প্রসঙ্গে 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দুই যাত্রায়'—প্রবন্ধটিও স্মর্তব্য। আরো অনেক পাণ্ডিতজনের ভ্রান্তি বিনীতভাবে শঙ্খ ধরিয়ে দেন তাঁর 'উর্বশীর হাসি'তে। সেখানে নাট্য প্রসঙ্গও এসেছে, অবশ্যই রবীন্দ্রনাট্য এবং তার গান সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। নাটক শঙ্খকে ছাড়ে না, শঙ্খও নাটককে এড়াতে পারেন না। ১৯৮৯ সালে 'সমগ্র রবীন্দ্রজীবনবোধের একটি কালক্রমিক আভাস' দিতে গ্রামাফোন কোম্পানীর জন্য শঙ্খ সংকলন ও বিন্যাস করেছিলেন—'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : হে মহাজীবন'। এই বিন্যাসের বুনোটে, 'সীমাবদ্ধ এই কবি পরিচয়ে' —নাটক-ও এলো। 'বাল্মিকী প্রতিভা' থেকে 'তাসের দেশ'—অনেক নাটকের অংশ অভিনীত হলো।

৪. শঙ্খ ঘোষের কবিতায় নাটক আছে একথা একবার বলেছি। গদ্য নাটকেও শঙ্খ-র অনেক কবিতার চরণ সংলাপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ১৯৮৭ সালে 'বহুরূপী' 'মিস্টার কাকাতুয়া' নাটকটি অভিনয় করে। সে নাটকে শঙ্খ ঘোষের ছোট দুটি কবিতা ব্যবহার করা হয়েছিল। নাটকেরই সংলাপ যেন! আরো একটু মাতাল করে দাও। / নইলে এই বিশ্বসংসার / সহজে ও যে সইতে পারবে না! / এখনো যে ও যুবক আছে প্রভু! / এবার তবে প্রৌঢ় করে দাও / নইলে এই বিশ্বসংসার / সহজে ওকে বইতে পরিবে না।' ('মাতাল'—নিহিত পাতাল ছায়া)। অবশ্য কোনো চরিত্রের মুখে এ সংলাপ দেওয়া হয়নি, ব্যবহার করা হয়েছিল প্রথম দৃশ্যের অন্তে নেপথ্যে। অন্য কবিতাটি 'আদিম লতাগুল্মময়'-এর 'ক্রমাগত'। নাটকের মূল চরিত্রের মুখের বা ভাবনার সংলাপ হিসেবেই ব্যবহৃত হলো—অবশ্য মঞ্চে নয়,

সেই ভাবনাটা সমস্বরে নেপথ্যে বলানো হল একটা নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করতে—'এই ভাবে ক্রমাগত / কেউ মারে কেউ মার খায় / ভিতরে সবাই খুব স্বাভাবিক কথা বলে / জ্ঞান দান করে / এই দিকে ওই দিকে তিন চার পাঁচ দিকে / টেনে নেয় গোপন আখড়ায় / কিছু-বা গলির কোণে কিছু অ্যাসফল্ট রাজপথে সোনার ছেলেরা ছারখার / অল্প দু চারজন বাকি থাকে যারা / তেল দেয় নিজের চরকায় / মাঝে মাঝে খড় খড়ি তুলে দেখে নেয় / বিপ্লব এসেছে কতদূর / এইভাবে, ক্রমাগত / এই ভাবে, এই ভাবে / ক্রমাগত'। সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থের নামটি-ই কি নাটকীয় নয় ? —একটি নাটকের চরিত্র শুদ্ধ কল্পনায় ভেসে ওঠে এবং কবিতাটি পাঠ করলে, তাকে প্রত্যক্ষও করা যায়,—'লাইনেই ছিলাম বাবা'।

আরও একটি রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনা সূত্রে কিছু কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। ১৯৮৬ সালে 'বহুরূপী' রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকটি প্রযোজনা করে। 'বহুরূপী' 'মালিনী' করবে শুনে বহুরূপীর বন্ধুজন বলেছিল 'এ দুঃসাহস'। 'মালিনী'র শুরুটা যেন একটু আকস্মিক, উপযুক্ত প্রস্তুতিহীন বলে মনে হতে পারে দর্শকদের কাছে—পাঠকের কাছে নয়। নাটক শুরু হওয়া মাত্র মূল চরিত্র সংকট-তাড়িত হয়ে উচ্চারণ করে, 'ভগবন, রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে ; / সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে / আবদ্ধ ভ্রমরী'—ইত্যাদি দর্শকদের হতচকিত করতে পারে, যদি না নির্দিষ্ট স্থান-কালের পরিবেশে তাকে অন্তত সামান্য একটু ধাতস্থ করে নেওয়া যায়। দর্শকের কাছে 'প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে' যাতে দেরি না লাগে —তাই 'জেনেশুনে' মর্মকথাটি বপন করবার ইচ্ছায়—'নটীর পূজা' থেকে সংযোজন করা হল। 'নটীর পূজা' থেকে বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন সংলাপ বা সংলাপাংশ থেকে সংকলন করে এ সংযোজন। ঐতিহাসিক ধর্মবিরোধের আবহাওয়ায়, ঘটনার দ্রুত গতিতে, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিতে, আবেগে, পরিস্থিতিতে, সংলাপের ব্যঞ্জনায় 'মালিনী' এবং অনেক পরের লেখা 'নটীর পূজা'—এ দুটি নাটকের মিল কি আমাদের নজর এড়িয়ে যায় ? প্রাচীন আনুষ্ঠানিক, আচার-সর্বস্ব হিন্দুধর্ম ও নবপ্রচারিত বৌদ্ধধর্মের (রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার এ নাটকে 'নবধর্ম' কথাটি ব্যবহার করেছেন তো 'মানবধর্মকে' বোঝাতেই) দ্বন্দ্বের পটভূমিতেই তো নাটক দুটি লেখা। যাই হোক প্রস্তাবনা দৃশ্যটি সংকলিত করে প্রথমেই যাঁর কথা মনে হলো তাঁর নাম শঙ্খ ঘোষ। সমগ্র প্রযোজনার খসড়া পরিকল্পনা ওঁকে জানিয়ে প্রস্তাবনা-র অংশটি পড়ে শোনান হলো। পরিচিত ভঙ্গিতে হেসে, শঙ্খ সেদিন বলেছিলেন,—'ভালো ভেবেছেন।' এটা সমর্থন হিসেবেই মনে হয়েছিল, তাই ভরসা করে আরও এক দাবি 'বহুরূপী' এই শ্রদ্ধাভাজন কবিকে করে বসল : পুরোনো বাংলা নাটকের 'বিবেক'-এর অনুষঙ্গে, নাট্যপ্রযোজনার সৌকর্যের কথা ভেবে, পুনরপি দুটি জায়গায় সংযোজনের কথা। রবীন্দ্ররচনা থেকেই উদ্ধার করতে হবে সে দাবিও করা হলো। দাবির পেছনে বহুরূপীর প্রোথিত বিশ্বাস

ছিল শঙ্খ ঘোষের নাট্যবোধের উপর। আমাদের সেই বিশ্বাস অমলিন থাকল —শঙ্খ-র সংকলন, প্রযোজনায় সংযোজিত করে। শঙ্খ-র চিঠিটা উদ্ধৃত করছি। ১৯৮৬ সালে ২৭শে মার্চ-এ লেখা এ চিঠি :—

প্রীতিভাজনেষু,

শান্তিনিকেতন যাবার আগে গত সপ্তাহেই এ দুটি অংশ বেছে রেখেছিলাম, কিন্তু যোগ্যতর অন্য কিছু পেতে পারি ভেবে তখন পাঠাইনি। ফিরে এসে এখন বুঝতে পারছি চারিদিকে নানা কাজের চাপে সেই 'যোগ্যতর' আর কিছু ভাবতে গেলে সময় থাকবে না আর।…ব্যবহার করলে মনে রাখবেন, প্রথম অংশটি রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখা থেকে নেওয়া, কেবল সাজানো হয়েছে কবিতার ছন্দচালে, কোরাস-ভঙ্গিতে যাতে উচ্চারিত হতে পারে সেইটে দেখবার জন্য। দ্বিতীয়টি বিষয়ে তো স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলবার নেই। কেবল প্রয়োগ হলে, 'সুপ্রিয়ের প্রস্থান'-ব্যাপারটা এই আবৃত্তির পরে ঘটলেই ভালো।

শুভেচ্ছাতে

শঙ্খ ঘোষ।

বহুরূপী প্রযোজিত 'মালিনী'-তে বিরতি-র দৃশ্যে প্রথমটি ব্যবহার করা হয়েছিল। সামর্থ্যের অভাবে 'কোরাস-ভঙ্গি'-তে উচ্চারণ করা গেল না। বিবেকের মতো সাজেই একজন মঞ্চে এসে আবৃত্তি করে—

"তার পরে হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায় ?
কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা ?
তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ
অন্ধকারের পরপার হতে।
তুমি যাকে তোমার সম্প্রদারের মধ্যে ধরে রেখেছ
পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের
দরজা বন্ধ করে দিয়েছ
সে যে অন্ধকার।
নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়,
সূর্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না।
সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য,
ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি,
কর্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার।
সেখানে দ্বারে একজন ভয়ঙ্কর 'না' বসে আছে,
সে বলছে, না না, এখানে না
দূরে যাও, দূরে যাও।…

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জন করে উঠল,
দূর করো, দূর করো, একে বের করে দাও।
এতো আমার ঘরের সামগ্রী নয়।
এতো আমার নিয়ম কে মানবেনা।
না, এ তোমার ঘরের না,
এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়।
কিন্তু পারিবে না,
আকাশের আলোকে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে—
ফেলতে পারবে না।"

শঙ্খ ঘোষের কাছে বহুরূপীর কৃতজ্ঞতার অবধি রইল না। পরের একটি অংশের জন্য তিনি 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পদধ্বনি' কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধার করে দিলেন—'পদধ্বনি, কার পদধ্বনি···। শঙ্খ-র নির্দেশ ছিল শেষ দৃশ্যের অব্যবহিত আগে সুপ্রিয়র প্রস্থানের আগে এটা শোনা যাবে—বহুরূপীর প্রযোজনায় সেটাই মানা হলো। সুপ্রিয় শূন্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে। শুনতে পাচ্ছে সে শৃঙ্খলিত ক্ষেমঙ্করের পদধ্বনি। আবৃত্তির মধ্যেই মঞ্চের আলো কমে আসে—সুপ্রিয় যেন মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। সেই অন্ধকারের মধ্যেই শৃঙ্খলিত ক্ষেমঙ্কর এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। বহুরূপীর নাট্যভাবনার শরীক হয়ে যান শঙ্খ ঘোষ।

৫. এবারে উপসংহার। 'মুখ', 'প্রতিমুখ', 'গর্ভ', 'বিমর্ষ' পার হয়ে নাটকে আসে পঞ্চমঅঙ্ক উপসংহৃতি। আমার এ-লেখার উপসংহারে একটি প্রত্যাশা, প্রত্যাশা পূরণ হলে—সেটাই হবে শঙ্খ ঘোষ-এর নাট্যবৃত্তের সম্পূর্ণতা।

এই পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ / ১ম ও ২য় সংখ্যায় কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শঙ্খ সেখানে লিখেছেন : আমাদের জীবনযাপনের যে পরিচয়টা স্পষ্ট সেটা আদপে 'অনেকটাই খণ্ডিত'। 'সম্পূর্ণতার মহিমা' কখনো কখনো আমাদের ছুঁয়ে যায়। প্রত্যয় নিয়ে শঙ্খ বলেছেন, 'কাব্যনাট্য যে কবিকেই লিখতে হবে তা প্রায় অনিবার্য, অথবা প্রায় এতোটাই বলা যায় যে কী করে-বা কোনো নাটকই কেউ লিখতে পারেন যদি মূলত তিনি কবি না হন।" "কিন্তু এই 'কবি' শব্দের চারপাশে যে ছেলেমানুষি পরিমণ্ডল অনেকের মনে বিভাসিত হতে থাকে",—সে সম্পর্কে শঙ্খ সজাগ থাকতে চান এবং 'কাব্য-নাট্যের শরীর' যেন 'অস্পষ্ট কবি কবি সংলাপের' প্রচলতায় ভেসে না যায়—সে ব্যাপারেও তিনি সতর্ক করে দেন। বাস্তবতার মাটি থেকে বাংলা নাটকের যে রূপ আজ প্রচল—সেটা শঙ্খ মনে করেন পোড়ো জমি। শঙ্খও লিখেছেন,—'তাই এবার যদি সূচনা দেখি অন্তপ্রান্তে, জলে হাওয়ায় আমরা কেবল প্রতীক্ষা করতে পারি ধৈর্য নিয়ে'। আমরাও প্রতীক্ষা করবো। শঙ্খ তার আত্মবলয় ভেঙে

নাট্যবৃত্তকে সম্পূর্ণ করবেন, এই প্রতীক্ষায় থাকবো। একদিন, শম্ভু নাটক ও কবিতার মিলন বিন্দু আবিষ্কারের কথা বলেছিলেন। শম্ভু বিশ্বাস করেন—'কাব্যনাট্য কবিতার আরেকটা ধরন নয়, কাব্যনাট্য নাটকেরই গরিমাময় প্রকরণ।' শম্ভু-র কাছে আমাদের প্রত্যাশা কাব্যনাটকের না, কাব্য-নাটক এ অভিধায় সিক্ত না করে বলি, গরিমাময় নাটক-এর প্রত্যাশা। সমস্ত সচেতনতা নিয়ে, সজাগ থেকে, সতর্ক থেকে, এবং নাট্যসংস্কার, মঞ্চ অভিজ্ঞতা, নাট্য সাহিত্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে, আধুনিক কবি শম্ভু ঘোষ নাটক নির্মাণ করুন—এই প্রত্যাশাটা কি পূরণ হয়না? সে নাট্যে আমরা দেখবো 'বিপুল বস্তু পৃথিবীকে' আধুনিক কবির মতোই তিনি অঙ্গীকরণ করে নিয়েছেন; আজকের প্রয়োজনের প্রতীকতায় সে নাট্যকাহিনী শম্ভু-এর হাতে বিন্যস্ত হবে; 'কবির কবিতার জগৎ-এর অভিজ্ঞতা থেকে অনুসৃত' নয়—তার স্বতন্ত্র মাত্রা; আবেগ আর কবিতা চাই—'কিন্তু তা চাই' শব্দের মধ্যে, ঘটনার মধ্যে, মুদ্রার মধ্যে ছড়ানো।

কবি আর প্রযোজকের বিচ্ছেদের আশঙ্কা করতে পারেন শম্ভু, বাংলা নাটকে কবিতার সঙ্গে ব্যবধান শম্ভু দেখেছেন,—আবার কোথাও কোথাও সে ব্যবধান অপসৃত হ'তেও দেখেছেন তিনি। মঞ্চে কবিতায় যোগ তৈরি করার 'উভয়তোমুখ' আগ্রহও তিনি দেখেছেন নিশ্চয়ই। শম্ভু! আপনি অন্তত বলবেন না এলিয়টকে উদ্ধৃত করে—'কাব্য নাট্য? সে এক অপ্রাপণীয় লক্ষ্য। আমরা নাটকের মুক্তি চাই। আমরা আপনার হাতে সেই নাটক চাই। শম্ভু ঘোষের নাট্যপ্রবণতা, তার নাট্যবোধের প্রজ্ঞা, তার মরমী উচ্চারণ নাটকের মধ্যে ধরা দিক—এই প্রত্যাশা। এইটাই আজকের ভরতবাক্যের প্রত্যাশা!

১ স্মৃতিকথার উদ্ধৃতি অনুষ্টুপ—বর্ষা সংখ্যা ১৯৯২ থেকে নেওয়া।

২ শম্ভু ঘোষ-এর অভিনয়ের সংবাদ তাঁর দিদির কাছ থেকে, শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষের মারফতে পাওয়া গেছে।

বি জি ত কু মা র দ ত্ত

...

তথ্য ও তথ্যের অধিক

প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস বেশ কিছুকাল রবীন্দ্রচর্চা করছেন। প্রতাপনারায়ণ রবীন্দ্র-রচনায় বিদেশের ঋণ কতটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সে বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী। কেবল ছড়িয়ে ছিটিয়ে নয়, তাঁর অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে রবীন্দ্ররচনায় এমন কতকগুলি গ্রন্থ আছে তার প্রায় সবটাই বিদেশের কোনো কোনো লেখকের অনুকরণ-অনুসরণ। এ জাতীয় রবীন্দ্রচর্চা আগে যে হয়নি এমন নয়, 'চোখের বালি' উপন্যাস সম্পর্কে একদা এই অভিযোগ বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলার শেলী সে কথা বিভিন্নজনের বচনে ও লেখায় বারে বারেই উচ্চারিত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিশ্রম করে লিখতে হয়েছিল দীর্ঘ প্রবন্ধ 'শেলী, রবীন্দ্রনাথ।'

প্রতাপনারায়ণ নিজস্ব গবেষণায় একটি বিশেষ ভাবনাকে নিয়ে মনোযোগী বলে তিনি কেবলই পেয়ে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের চৌর্যবৃত্তি। প্রচুর তথ্যও তিনি সংগ্রহ করেছেন। পরিশ্রম করে লাইনের পর লাইন উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিদেশী প্রভাব, ছায়া, অনুসরণ, হুবহু অনুবাদ খুঁজে পাচ্ছেন। আর কেবল রবীন্দ্রভক্তবৃন্দই নয়, রবীন্দ্রগবেষকরাও বিস্ময় বোধ করছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ক্ষেত্র জরিপের পর প্রতাপনারায়ণ রবীন্দ্রনাটকের সীমানায় পদক্ষেপ করেছেন এইবার। বস্তুত বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতাপনারায়ণ কিছু আলোড়নও তুলেছেন তাঁর আবিষ্কারের চমৎকারিত্বে। কিন্তু যতটা তাঁরা আলোড়িত হয়েছিলেন, ততটা গর্জে ওঠেননি। বিতর্কের ঝড়ও বহে যায়নি সেরকম। অথচ প্রত্যাশিত ছিল একটা আলোচনার অবকাশ।

রবীন্দ্রনাটকের আলোচনা অবশ্য প্রতাপনারায়ণ বাবুর আগে অনেকেই করেছেন। বিশেষ করে সে আলোচনায় মেটারলিঙ্ক, স্ট্রিণ্ডবার্গের রচনার স্মরণ করেছেন সমালোচকবৃন্দ। বিদেশে পত্রপত্রিকায়ও সেসব সংবাদ অল্পবিস্তর ছাপা হয়েছিল। সম্প্রতি প্রদর্শিত (দি টেগোর সেন্টার, ইউ, কে, ডিসেম্বর ২৩, ১৯৯২, এবং কলকাতা তথ্যকেন্দ্র) সংবাদ রবীন্দ্রসম্পর্কিত সংবাদপত্রের ক্লিপিংসে দেখছি 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্কের (Les Aveugles) একটি নাটককে অনুসরণ করেছিলেন। শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক প্রবন্ধের

বইতে (১৯৬১) স্ট্রিণ্ডবার্গের A Dream play-র সঙ্গে রক্তকরবী নাটকের সদৃশতার কথা বলেছিলেন। শঙ্খ ঘোষ যেখানে সদৃশতার উল্লেখ করেছিলেন সেখানে প্রতাপনারায়ণ দেখেছেন 'রক্তকরবী' আসলে ঐ নাটকেরই হুবহু অনুসরণ। নামধাম এমন কি প্রেরণার উৎসও ছিল স্ট্রিণ্ডবার্গের A Dream play। শঙ্খ, যেহেতু প্রতাপনারায়ণের প্রবন্ধে তাঁর প্রবন্ধের উল্লেখ আছে, সেইহেতু কর্তব্য বোধ করেছেন প্রতাপনারায়ণবাবুর আলোচনাটি পরীক্ষা করতে। কিন্তু কেবলই কর্তব্য-বোধ? শঙ্খর প্রবন্ধটি পড়ে তা মনে হয় না। ঈষৎ বিব্রতও হয়েছেন তিনি। 'এই সহজ কথাটাও ধরতে পারিনি যে "রক্তকরবীর", (বা, তাঁর প্রায় সব নাটকেরই) মূল বক্তব্য হলো নির্লজ্জ ইংরেজতোষণের চক্রান্ত।' এ অভিযোগ এবং আরও কিছুর জবাব দিতে গিয়ে শঙ্খ রক্তকরবীর উপাদান-উপকরণের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। সাহিত্যবিচার অথবা নাট্যমূল্য নির্ধারণ তিনি করেননি। শঙ্খ যে প্রতাপনারায়ণের রচনা পড়ে বিচলিত তা বোঝা যায়. যখন তিনি বলেন 'সব-চেয়ে করুণা হয় অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জন্য, কেননা এতটা চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত কোনো পাপই তিনি লুকোতে পারেননি'। প্রতাপনারায়ণ 'পাপ' উচ্চারণ করে-ছিলেন বলে মনে পড়ছে না। শঙ্খর কাছে রবীন্দ্রনাথের পরধাপহরণ পাপ বলে গণ্য হয়েছে এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। আসলে প্রতাপবাবুর 'আবিষ্কারে' তিনি এতটাই আহত হয়েছেন যে ঐ শব্দটিকে শঙ্খএড়াতে পারেননি।

আসলে তথ্যকে উপেক্ষা করে উত্তেজিত সমালোচক যখন কোনো ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান তখন পাপ তো তিনিই করেছেন। সে ভুলগুলি বিচার করেছেন শঙ্খ। প্রতাপবাবু বলেছেন রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী অভিনয় করবার জন্য কোনো আগ্রহই দেখাননি। এই আগ্রহের অভাব সম্পর্কে প্রতাপবাবু অনুমান করেছেন রবীন্দ্রনাথের নাটকটি সম্বন্ধে 'অস্বাস্তি এবং আশংকা'। কেন এই অস্বস্তি আর আশঙ্কা? প্রতাপবাবু মনে করেন রক্তকরবীতে আছে ইংরেজতোষণ। প্রতাপবাবু প্রায় চিন্তা না করেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটিও ঐ একই কারণে অভিনয় করাননি। জনমত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যাবে বলে এই অনাগ্রহ?

শঙ্খ প্রতাপবাবুর দুটি মতই পরীক্ষা করেছেন। ফুটনোটে বলেছেন প্রায়শ্চিত্ত কেবল অভিনীতই হয়নি, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই নাটকে ধনঞ্জয়ের ভূমিকায় নেমেছেন। প্রায়শ্চিত্তের রূপান্তর 'পরিত্রাণ' সাধারণ মঞ্চেই অভিনীত হয়েছে। রক্তকরবীর ক্ষেত্রে প্রতাপবাবুর অভিযোগ আরো গুরুতর। বস্তুত শম্ভু মিত্র রক্তকরবী প্রযোজনার আগে রক্তকরবী কোনোদিন অভিনীত হয়নি এমন একটা জনশ্রুতি চলে আসছিল। সমালোচক যদি জনশ্রুতিনির্ভর অতথ্যের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হন তবে একে পাপ বলেই চিহ্নিত করা উচিত। শঙ্খ এবারে রক্তকরবীর অভিনয় সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রগুলিকে উদ্ধার করে পর পর সাজিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য উদ্ধারেও শঙ্খ আমরা নির্ভর করতে পারি এমন উপাদানকে গ্রাহ্য

করেছেন। রক্তকরবীর রচনাকাল (১৯২৩) থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সময়কার যক্ষপুরী, নন্দিনী, রক্তকরবীর অভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ আগ্রহ বোধ করছিলেন তার চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথের উক্তি, সমকালীন পত্রপত্রিকায় রক্তকরবীর অভিনয় সম্পর্কে সংবাদ, ইত্যাদি বিষয়ে নানা তথ্য শঙ্খ উদ্ধার করেছেন। রক্তকরবীর অভিনয় ধারায় রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন, তাঁর উক্তি থেকেই তা বোঝা যায়। কখনও রাসু অধিকারীকে, কখনও শিশির ভাদুড়ীকে, কখনও অমিতা ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীর অভিনয়ের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। শঙ্খ বলেছেন তিনি তথ্যগুলিকে সাজিয়ে দিচ্ছেন এইমাত্র। এখানেও দেখা যাবে সাল তারিখ অনুযায়ী তিনি তথ্যের বিন্যাস করেন। তবে ইংরেজি এবং বাংলা সাল দুই-ই রক্ষা করেছেন শঙ্খ। এখানে বোধকরি বাংলা সালের পর বন্ধনীতে ইংরেজি সালের উল্লেখ থাকলে আর একটু স্পষ্ট হত তাঁর বক্তব্য। এটুকু পাঠকের উপর বরাত দিয়েছেন তিনি। তথ্যবিন্যাস থেকে এটা বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথ অভিনয় সম্বন্ধে আশঙ্কা বা অস্বস্তি বোধ করেননি কখনও। আসলে রক্তকরবী নাটক অভিনয়ে অভিনবত্ব আনবেন এবং নন্দিনী চরিত্র অভিনয়ের জন্য উপযুক্ত অভিনেত্রী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই নাটকটি মঞ্চস্থ হতে পারছে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে এবারে শঙ্খ চলে যান। রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগ থেকে বিরত হননি। দ্বিতীয় পর্যায়টি শঙ্খ এমনভাবে সাজান যা থেকে যক্ষপুরী থেকে রক্তকরবী নামের পরিবর্তনটি ধরা সহজ হয়ে ওঠে। আবার শঙ্খ স্মৃতিচারণ, চিঠিপত্র, অপ্রকাশিত পত্রের সাহায্য নেন। এবং ১৯৩৪ সালের ৬ এপ্রিল নাট্য নিকেতন মঞ্চে দি টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ দ্বারা নাটকটিকে অভিনীত (বিহার ভূকম্প পীড়িতের সাহায্যার্থে) হয়েছিল তা হ্যাণ্ডবিলের (?) প্রতিলিপি প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্মৃতি অবশ্য মাঝেমাঝে প্রতারণা করে। নিত্যপ্রিয় ঘোষ তাঁর 'ছিন্নপাতা মলিন কুসুম' গ্রন্থে তার প্রমাণ দিয়েছেন। শঙ্খ স্মৃতিচারণার উপর নির্ভর করেই ক্ষান্ত হননি। প্রতিলিপি উদ্ধার করে তার তথ্যের প্রামাণিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শঙ্খ নূতন কিছুই আবিষ্কার করেননি। পরিশ্রম করে নানা জায়গা থেকে তথ্য বিন্যাস করেছেন। তাতেই চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ফুটে ওঠে। আর পাথুরে প্রমাণ (প্রতিলিপি) অভিযোগকারীকে ধরাশায়ী করতে অব্যর্থ অস্ত্র হয়ে রইল।

প্রতাপবাবু নন্দিনী নাম এবং রক্তকরবী ফুল নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। দুই-ই নাকি রবীন্দ্রনাথ স্ট্রিণ্ডবার্গ থেকে গ্রহণ করেছেন। বলাবাহুল্য, নেই নেই করেও রবীন্দ্রভবনে যা আছে তাতে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে অজানা তথ্য বিপুল পরিমাণে সংগৃহীত হয়েছে। প্রশান্তকুমার পাল 'রবিজীবনী'তে তার সদ্ব্যবহারও করেছেন। 'রবীন্দ্রবীক্ষা'ও বেশ কতকগুলি সংখ্যা বেরিয়েছে। প্রতাপবাবু কি সমালোচনার আগে এগুলি দেখবেন না? শঙ্খ রক্তকরবী ফুলের ব্যবহার নিয়ে একের পর এক তথ্য উদ্ধার করেছেন। রক্তকরবী বইটির প্রথম খসড়া থেকে ছাপা-পর্ব পর্যন্ত

জরিপ করেছেন। প্রমথনাথ বিশীর রক্তকরবী নাটকের উৎস-বিচারটি পরীক্ষা করেছেন এবং প্রতাপবাবুর বক্তব্য যে অসার তা দেখিয়েছেন। নন্দিনী নামটি কোনো এক সময়ে খঞ্জনী ছিল, আর কখনও খঞ্জন, সুনন্দা নামটিও বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সবই প্রমাণ করে রক্তকরবী লেখার সময়ে, রবীন্দ্রনাথ স্ট্রিণ্ডবার্গের Daughter-এর দ্বারা প্রভাবিত নন। প্রথম খসড়ায় নন্দিনী তো ছিলই না। এ থেকে প্রতাপবাবু অবশ্য বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ নাটকটি লেখার পর যত বার পাল্টাচ্ছিলেন ততবার স্ট্রিণ্ডবার্গের কথা মনে পড়ছিল। এবং যতক্ষণ না চুরি বিদ্যায় সম্পূর্ণ সাফল্য পাচ্ছেন ততক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু এ যুক্তি খাটে না এই জন্যে যে প্রতাপবাবু বলেছেন 'শারোদৎব' থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্ট্রিণ্ডবার্গকে ভাঙাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যার নাম ছিল নন্দিনী। শঙ্খ মহুয়ার 'নাম্নী'র মধ্যে যে নন্দিনী নামটি পাই সেকথাও ভুলছেন না।

শঙ্খর তথ্যবিন্যাসের এই পরম্পরায় বির্তকের ঝাঁঝ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আরো কিছু আছে। এবং সেখানেই তথ্যের আপাত আচরণ সরে গিয়ে একেবারে ভেতরের সার পরতে পরতে উন্মোচিত হতে থাকে। স্ট্রিণ্ডবার্গের নাটকের মর্ম আর রক্ত-করবীর থিম যে ভিন্ন সুরের এবং ভিন্ন ধঁাচের সেটা বোঝা দরকার। প্রতাপবাবু সেদিকে লক্ষ করেননি এমন নয়, কিন্তু শঙ্খ দেখিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের দুঃখভাবনা, মৃত্যু-ভাবনা এবং আনন্দ-ভাবনার সঙ্গে স্ট্রিণ্ড্বার্গের চিন্তার (যতই তা বিভীষিকা-ময় হোক না কেন) মেরুপ্রতিম ব্যবধান। এমন কি কার সঙ্গে কার 'লড়াই' একথাও বলতে ভোলেন না শঙ্খ। স্ট্রিণ্ডবার্গের Daughter শেষ পর্যন্ত পৃথিবী কুৎসিত, অসুখী, অভাবী, এইটি দেখিয়ে দেন, আর মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গে চলে যান। রবীন্দ্রনাথ বলবেন এই মর্ত্যেই স্বর্গভাবনার কথা। এবং সামর্থ্য আর শক্তি দিয়ে সেই স্বর্গ জয় করতে হবে। স্ট্রিণ্ডবার্গের নাটকে ঋণশোধের কথা আছে। শারোদৎসব নাটকের রূপান্তর ঋণশোধ। প্রতাপবাবু আগে পিছে না ভেবেই বলে দেন এখানে রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া চুরির কথা। শঙ্খ উপনন্দের ঋণশোধ ব্যাপারটি সেজন্যে বিশদ করেন এবং রবীন্দ্রভাবনার মুক্তি চিন্তা ও ত্যাগব্রতের দিকটি উদ্‌ঘাটিত করেন।

তথ্যসমাবেশের মধ্যেও সমালোচকের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি অথবা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গি একটা মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাতে পারে। প্রতাপবাবু তাঁর পছন্দমত সমালোচক / নাট্যকারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্যে। এখানে তার্কিকের আলস্য বা অসাবধানতা ঘটলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা। শঙ্খ এ ব্যাপারে সতর্ক বলেই প্রতাপবাবু যেখানে উদ্ধৃতিটির কিছু অংশ ছেড়েদেন সেখানে তিনি বাকি অংশটি উদ্ধার করে প্রতিবাদের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতাপবাবু স্ট্রিণ্ডবার্গের মঞ্চ পরিকল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর মঞ্চ পরিকল্পনা একই রকম বলেছেন এবং এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্ট্রিণ্ডবার্গ থেকেই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছেন, এমন

অভিযোগ তাঁর। শঙ্খ একের পর এক উদ্ধৃতি দিয়ে স্ট্রিণ্ডবার্গের পরিকল্পনাটিকে স্পষ্ট করেছেন আর তুলনায় রক্তকরবীর মঞ্চায়নকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে তো বলতেই হয় প্রতাপবাবু A Drneam Play খুঁটিয়ে দেখেননি। রবীন্দ্রনাটকে 'পথ' একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। প্রতাপবাবু এখানেও দেখেছেন স্ট্রিণ্ডবার্গের অনুকরণ। অথচ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকেই রবীন্দ্রনাথ পথের সূচনা করেছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে আর স্ট্রিণ্ডবার্গের নাটকের সময় ১৮৯৮—১৯০৪ সালের মধ্যে। আর রক্তকরবীর যন্ত্র? রক্তকরবীতে যন্ত্র খুঁজে পাননি প্রতাপনারায়ণ। কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বক্তব্য জোরালো করবার প্রয়াস পেয়েছেন। শঙ্খর হাতে অস্ত্র ছিল আরও তীক্ষ্ণ। তিনি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের সাহায্য নেন এবং দেখিয়ে দেন। they use every variety of maehinery to fortify themselves or their selfish ends against the dissolving power of beauty and love. মোট সাতাত্তরটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন শঙ্খ ঊনচল্লিশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটিতে। শঙ্খ গোড়াতেই কিঞ্চিৎ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, উদ্ধৃতি-কণ্টকিত প্রবন্ধটি হয়ত অনেকের বিরক্তি জন্মাতে পারে। আসলে এ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। কেননা, আমরা তো বিতর্কমূলক রচনা পড়ছি। সওয়াল জবাব তো থাকবেই। বাংলা গদ্যে বিতর্কিত প্রবন্ধের অভাব নেই। মাঝে মাঝে এই বিতর্ক খুবই ঝাঁঝালো হয়েছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপ এ জাতীয় রচনায় প্রায়ই দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বিতর্কে নেমেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন আর প্রমথ চৌধুরী কারণে অকারণে এই ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপে নিপুণ ছিলেন। শঙ্খর ভাষায় বিদ্রূপের ছোঁয়া নেই। অনুদ্‌বেজিত ভাকিকের ধৈর্য নিয়ে অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। কখনও কখনও চাপা বেদনা প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনর্থক ভ্রান্ত মন্তব্যে। যদিও 'অনুষ্টুপ' পত্রিকাতেই এক সময়ে প্রতাপনারায়ণ বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পড়ার সীমা কত ব্যাপক ছিল তা দেখানো তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন। আর এই অধ্যয়নের ফলে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু লেখা derivative হয়ে পড়েছে। রক্তকরবীর আলোচনায় প্রতাপবাবু আরও অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন। সেই সূত্রে শঙ্খকেও টেনেছেন তিনি। ভালোই হল। এই বিতর্কে 'রক্তকরবী'র শরীরের কাঁটাছেঁড়া হল একটু। কিন্তু সেটা অনিবার্য ছিল।

রবীন্দ্রজীবনীকার এবং রবীন্দ্রসমালোচক এডওয়ার্ড টমসন একদা তাঁর সমালোচনার জন্যে রবীন্দ্রনাথের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সেই সময়ের বাঙালি রবীন্দ্রানুরাগীরাও কেউ কেউ টমসনের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। আজও কি, বাঙালি টমসন সম্বন্ধে সেই মনোভাব পোষণ করছেন? টমসনের বইয়ের অক্সফোর্ড সংস্করণের সম্পাদক হরিশ ত্রিবেদী বলেছেন, বাঙালি আজও টমসনের প্রতি

বিরূপতাকে আঁকড়ে আছে। টমসনের বইয়ের এর আগের সংস্করণে (গুদ্ধি—ইণ্ডিয়া) একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছিল। পরিশিষ্টে ছিল রবীন্দ্রনাথকে লেখা টমসনের কিছু কিছু পত্রের অংশবিশেষ। হরিশ ত্রিবেদী এই পরিশিষ্ট সম্বন্ধে বলেছেন যে, বাঙালির এতকালের টমসনবিরূপতাকে কিছুটা কমিয়ে আনবার 'ফিকির' মাত্র। অর্থাৎ টমসনের রচনাটির (Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist, প্রথম প্রকাশ ১৯২৬) সামগ্রিক মূল্যাঙ্কন বাঙালি করতে পারেনি।

টমসনের শুদ্ধি সংস্করণের পরিশিষ্টটি যোগ করে দিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ। হরিশ ত্রিবেদীর মন্তব্যে শঙ্খ যে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করবেন তা ধরে নিতে পারি। তিনি এর জবাব দিচ্ছেন একটি ছোটো প্রবন্ধে 'টমসন সাহেব আর বাঙালী সমালোচক' (প্রৈতি, ষষ্ঠবর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৩৯৯)। প্রথমে তিনি বলেছেন টমসনের উদ্ধৃতিগুলি কেবলমাত্র প্রশস্তিবাচকই নয়। যদিও রবীন্দ্রপ্রশস্তি আছে—এমন উদ্ধৃতির কথাও শঙ্খ বলেছেন। তারপর তিনি বাঙালি সমালোচকদের বিরূপতার প্রসঙ্গটি বিচার করেছেন।

উদ্ধৃতিগুলিতে যেখানে যেখানে টমসন রবীন্দ্ররচনার প্রতি বিরক্ত হয়েছেন তার পরিচয় আছে বটে তবে শঙ্খ যতটা বলেন ততটা আমাদের মনে হয় না। বিশেষত টমসনের সমালোচনা উদ্ধৃতিতে যা আছে তার কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদ সম্বন্ধে।

শঙ্খ বোধ করি বাঙালি সমালোচকদের বিবরণ দিয়ে হরিশ ত্রিবেদীর মন্তব্যের ভুল ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। অতএব এ প্রবন্ধেও উদ্ধৃতির প্রয়োজন দেখা দিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, তারকনাথ সেন, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, আনন্দ লাল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন শঙ্খ। এঁদের লেখা পড়ে কখনই মনে হবে না বাঙালি টমসন সম্বন্ধে উদাসীন অথবা বিরূপ। বরং একদা যে বাঙালিরা কেউ কেউ টমসন বিরূপতা প্রদর্শন করেছিলেন, আজ যেন তা বিলম্বে হলেও পুষিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমার তো মনে হয়, অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে বারবার টমসনের পরামর্শ চাইতে বলছেন, তখন তিনিও বুঝেছিলেন বড়ো দেরি হয়ে গেছে টমসনকে বুঝতে। আরও একটি তথ্য এখানে যুক্ত হলে ভালো হত বলে মনে হয়। The Golden Book of Tagore (1931) এর উদ্যোক্তারা (রমাঁ রলাঁ ছিলেন, তার বাঙালির উদ্যোগই বেশি) টমসনকে কিছু লিখতে বলেছিলেন। টমসন রবীন্দ্রনাথকে চিঠির আকারে তিনি যেভাবে বোঝেন আর দেখেন তার পরিচয় দিয়েছেন। পত্রটি নিছক প্রশস্তিমূলক বলে মনে করি না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রীতির প্রসঙ্গটি এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। বঙ্গলক্ষ্মীকে তিনি যে ইঙ্গলক্ষ্মীতে পরিণত

করেননি তাতে টমসন কৃতজ্ঞ। আর জানিয়েছেন শান্তিনিকেতনের পরিবেশ এবং সৌন্দর্যের বিস্তারের কথা। ভারতের ঐতিহ্যের প্রতিকৃতি যেন এখানে। এরই টানে মানুষ আসবে। টমসন আরো বলবেন এখানে বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি সূর্য বন্দনার জন্য মালাকরের মতো মালা তৈরি করেন। অন্ধকার সরে গিয়ে আলোর বন্যায় ছড়িয়ে যাবে এই পৃথিবী। এ নিশ্চয়ই আবেগের কথা। বাঙালি টমসনকে ভুললে অথবা তাঁর প্রতি বিরূপ হলে তাঁকে Golden Book-এ নিশ্চয়ই লিখতে বলতেন না। রবীন্দ্রনাথের ক্রিটিক তিনি, কিন্তু তাঁকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই প্রয়াস ছিল টমসনের Rabindranath Tagore : Poet aud Dramatist' বইতে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যার সাত সমুদ্রের কর্ণধার। এক সময়ে সাংবাদিকতার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। ইংরেজি এবং ইওরোপীয় কিছু ভাষা তাঁর আয়ত্তে আছে। বাঙালি হিসেবে তাঁর জন্য আমাদের গর্ব হয়। 'বাঙালী জীবনে রমণী', 'আত্মঘাতী বাঙালী' এবং 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' এবং The Autobiography of an Unrknown Indian এই তিনটি বাঙালি নিন্দাসূচক বই লিখে বঙ্গদর্শন করেছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। বঙ্গদর্শন বলার কারণ তাঁর ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের পর আর কোনো আদর্শকেই মানে না, এবং ভারতচন্দ্রই যে বাঙালি রমণীচিত্রণে সার্থক সেকথা উল্লাসের সঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেছেন। বাঙালি সবকিছুকে ভবের গ্যাসে পুরে দেখে বলেই সে জন্মান্ধ। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভাবনাই তাকে ডুবিয়েছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর কেন যে নাতির জন্য ইংলণ্ডে বসবাসের ব্যবস্থা করে যাননি, হয়ত একদিন নীরদচন্দ্র চৌধুরী সেকথাও বলবেন। বাঙালির ব্যাধি তিনি ধরে ফেলেছেন, এমন কী মৃত্যুও ঘোষণা করেছেন।

এক এক সময় আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি নীরদচন্দ্রের রচনায় মিল, মেকলের রচনার প্রতিধ্বনি। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মনীষার এই ভ্রান্তপথ আমাদের বিচলিত করেছে কিনা জানি না। অন্তত বিশেষ কোনো প্রতিবাদ আমরা দেখতে পাই না। শঙ্খ হরিশ ত্রিবেদীর অজ্ঞ বাঙালি সমালোচনা সম্বন্ধে যেমন প্রতি-বাদে চকিত হয়েছিলেন, তেমনি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মূল্যায়ন সম্বন্ধেও তাঁর প্রতিবাদী বক্তব্য (আত্মঘাতী মনীষা, 'মুক্তাক্ষর এপ্রিল ১৯৯২) উপস্থিত করেছেন। কিছুদিন আগে সত্যেন্দ্রনাথ রায় আনন্দবাজার পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনায় 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' বইটির বক্তব্য সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। শঙ্খ নীরদচন্দ্রের স্মৃতিনির্ভর কিছু কিছু মন্তব্যের গলদ ধরে দিয়েছেন। তথ্য উদ্ধার করে নীরদচন্দ্রের দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের কৌতুকবিলাসকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছেন শঙ্খ। 'সরোজিনী' জাহাজে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও তাঁর ছেলে মেয়েরা। নীরদচন্দ্রের স্মৃতি বলছে জাহাজে ছিলেন কাদম্বরী। কেননা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরানী'।

কাদম্বরীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের 'সারোজিনী' জাহাজে ভ্রমণের আগেই হয়েছিল। সুতরাং তথ্যের জন্য যে আমাদের সাবধান হতে হবে এ তো জানা কথা। শঙ্খ সে কথাটাই স্মরণ করাচ্ছেন এখানে। 'আমি চিনি গো চিনি তোমার ওগো বিদেশিনী' গানটি সম্বন্ধে যে ছেলেমানুষি মন্তব্য করেছেন নীরদবাবু তা আমাদের বিস্মিত করে। নীরদচন্দ্রের মনে পড়েছে লণ্ডনে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিদেশিনীদের সুন্দর মুখ দেখার স্মৃতি ছিল ওই গানে। শঙ্খ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ গান শুনেছিলেন 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে'। হতেও পারে গানটির উৎস ছেলেবেলায় শোনা এই গানটি।

মাঝে মাঝে শঙ্খ প্রমথ চৌধুরীর শ্লেষাত্মক ভাষার প্রলোভনে পড়ে যান। নীরদচন্দ্র লিখেছিলেন 'জীবনস্মৃতি' 'গোড়ী রীতিতে লিখিত'। শঙ্খ মন্তব্য করেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী 'নির্ভাজ বৈদর্ভী রীতিতে' লিখেছেন। বলতে হত না এই কথাটা যদি না নীরদচন্দ্র জীবনস্মৃতির ভাষাকে আক্রমণ করতেন bombastic বলে। নীরদচন্দ্র বলেছেন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ঈশ্বর 'মূলত খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর'। শঙ্খ স্মরণ করিয়ে দেন দাদুর শ্লোক। নীরদবাবু 'গোরা' উপন্যাসের গুণমুগ্ধ। সেই গোরা থেকেই শঙ্খ একটি উদ্ধৃতি তুলে আনেন 'মিথ্যা পাপ; মিথ্যা নিন্দা আরো পাপ, এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মতো পাপ অল্পই আছে'। এর পর বোধ করি প্রতিবাদের জন্য আর কোনো তথ্যেরই প্রয়োজন হয় না।

এক সময়ে শঙ্খ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কিছু ভুল তথ্যপরিবেশনের জন্য সমালোচকদের কাছে কিছু অভিযোগ পেশ করেছিলেন। কেবল ভুল তথ্য নয়, গবেষণার পদ্ধতিপ্রকরণ সম্বন্ধেও কিছু অভিযোগ তিনি সেই সময়ে করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে বিভিন্ন কোষগ্রন্থে এদেশে ও বিদেশে যেসব সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে আমরা একেবারেই নিস্পৃহ। শঙ্খ এরকম বারোটি কোষগ্রন্থে রবীন্দ্রজীবনীর যে তুলকালাম তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা আমাদের গোচর করেছেন। অনাসৃষ্টির যেন কোনো সীমা নেই। যে যা খুশি তাই লিখে গেছেন ইংরেজি কোষগ্রন্থগুলিতে। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। মেরী কারেলিন ডেভিস 'Rabindranath Tagore : India's Shakespeare and Tasso in one (Forum 51/140-44/January 1914) প্রবন্ধে লিখেছেন 'তরুণ হিন্দু কবি ধন মুখার্জীর সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক অনুবাদ করবার ভাগ্য হয়েছিল আমার, নাটকটির নাম চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গল'। মোট পঁয়ত্রিশটি সূত্র ঘেঁটেছিলেন শঙ্খ। এবং ভুলগুলি যথাসাধ্য সংশোধন করে দিয়েছেন ('উর্বশীর হাসি' গ্রন্থ, ১৯৮১)। সাধু উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণ পনেরোটি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। রবীন্দ্ররচনাবলী অবশ্য এর আগেও কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের মনে পড়বে মোহিতচন্দ্র সেনের কথা, মনে পড়বে বিশ্বভারতীর উদ্যোগের

প্রসঙ্গ। এই সংস্করণগুলির পরিকল্পনা নিশ্চয়ই ছিল। লেখার ফর্ম (গদ্য, কাব্য) নিয়ে বিষয় নির্বাচন করেছিলেন মোহিতচন্দ্র, আর বিশ্বভারতী করেছিল কালানুক্রমিকসূচী (এখনও অসমাপ্ত)। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণে'র পরিকল্পনা মূলত বিষয়ানুযায়ী কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি। এই সংস্করণে, বিশ্বভারতী সংস্করণে নেই এমন অনেক রচনা স্থান পেয়েছে, আবার বিশ্বভারতী সংস্করণের মূল্যবান সম্পদ গ্রন্থপরিচয় বাদ পড়েছে (বোধকরি কপিরাইটের কারণে এটি বর্জিত)। বর্জিত অংশ থাকলে ভালো হত, সন্দেহ নেই। এবং পরেও আরও নূতন তথ্য পাওয়া গিয়েছে। পাঠান্তর মেলানোর সুযোগ ঘটেছে সন্দেহ নেই। নূতন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রচনাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশ করেছেন সেখানে সব তথ্য, পাঠান্তর মিলিয়ে নির্ভুল পাঠ দেবার প্রয়াস আছে (যদিও ইতিমধ্যেই প্রকাশিত রচনাবলীতে ভুলের সংখ্যা নগণ্য নয়)। ১৯৬১-র পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশিত 'জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ' সম্পর্কে শঙ্খর আপত্তি অজস্রজায়গায়। বিশেষ করে 'সূচী' নিয়ে নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি: 'পাতার পর পাতা উলটে এখানে চোখে পড়তে লাগল এমন সব নির্দেশ, এমন সব সংবাদ, এমন সব মুদ্রণ, যা বিশ্বাসযোগ্য নয় একেবারে'। শঙ্খ দেখিয়েছেন কোনোরকম সংকলন-নীতিই এই 'সূচী'র নেই। তার মানে গবেষণার পদ্ধতিপ্রকরণ (methodology) বলে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না এই সূচীপত্রে। অগণিত রবীন্দ্র-পাঠক সূচী-কে মেনে নিয়ে যদি থাকেন তবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের ভুলের বোঝা কতটা বেড়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

এ. ই., সীলি, পাস্কালের নাম, পাওয়া যাবে, কিন্তু পোপ, ড্রাইডেন, কিপলিং বা ইবসেন, ক্লবেয়ারের উল্লেখ নেই। 'উপনিষদ', 'বৈষ্ণব পদাবলী'র ব্যবহার রবীন্দ্র-সাহিত্যে একবার মাত্র উল্লিখিত হয়েছে—সূচীতে আছে। বিষয় সূচীতে পাব 'চোখের উপর হইতে পর্দা সরিয়া গেল,' 'আত্মরক্ষার শক্তি অর্জনে জাপানের দৃষ্টান্ত' ইত্যাদি। এভাবে কি বিষয় সূচী তৈরি করা যায়? যায় হয়ত, তবে তা হয়ে উঠবে আর একটি পঞ্চদশ খণ্ডের রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণ। কবিতার নাম রূপে উল্লিখিত হচ্ছে 'আধুনিক কাব্য'। এরকম বেশ কিছু অসংগতি শঙ্খ সংগ্রহ করেছেন ওই সূচী থেকে। শঙ্খ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সম্পাদকদের প্রতি। তিনি চেয়েছেন সতর্কতা, ক্ষমতা, উদ্যম আর ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের 'গভীর এবং সত্য' দায়বদ্ধতা থাকার কথা বলেন শঙ্খ। ওই দায়বদ্ধতার থেকেই 'উর্বশীর হাসি'র মতো প্রবন্ধ লেখন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের গানের রচনাকাল, প্রসঙ্গ, উপলক্ষ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু গভীর জিজ্ঞাসার অভাব আছে সন্দেহ নেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই জিজ্ঞাসা থেকেই 'গীতাবিতান কালানুক্রমিক সূচী' বইটি রচনা করেছিলেন। প্রভাতকুমারের নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার কথা নূতন

করে কিছু বলবার নেই। শ্রমসাধ্য এই সম্পাদনা আমাদের প্রশংসা, অনায়াসেই কেড়ে নেয়। তবু আশংকা যায় না। এমন কিছু তথ্য ছিল যা গবেষক আরেকটু সতর্ক থাকলেই ব্যবহার করতে পারতেন। কালানুক্রমিক সূচীতে বাড়তি কিছু তথ্য আছে। সেটা আমাদের লাভ। আমাদের লোভও বেড়ে যায় সেই কারণে। কিন্তু কালানুক্রমিক সূচীতে পদ্ধতির একসূত্রতা দেখা যায় না। কোথাও তা পাই, কোথাও পাই না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কখনও কখনও সুরারোপ করা হয়েছে। সেই কবিতাও গান বলে চিহ্নিত হয়েছে। এখানে তথ্যপঞ্জীতে সেসব কথা উল্লেখের প্রয়োজন ছিল। আজকে গীতবিতান নামে যে বই পাই তা যে একসময়ে এরকম ছিল না, তাতো অনেকেরই জানা। কিন্তু গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্য সেরকম কিছু বিবরণ প্রত্যাশিত থাকলেও তা পূরণ হয় না। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞা সাবিত্রী দেবীর কাছে শোনা গান-কে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন টি. ভি. র দৌলতে আমরা তা জানতে পেরেছি। এখানে বলে রাখি টি. ভি. কর্তৃপক্ষ এই সাধু কাজটি করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে,' এই গানটি এক অন্ধ ওস্তাদের কাছে শুনে রচনা করেন। ইন্দিরা দেবীর ওই তথ্য সহজেই পাওয়া যেত। সাবিত্রীদেবীর প্রসঙ্গও আসেনি ওই কালানুক্রমিক সূচীতে। শঙ্খ উদাহরণ দিয়ে এগিয়ে গেছেন কালানুক্রমিক সূচীর মধ্যে অভাব আর ত্রুটির প্রসঙ্গ আলোচনায়। এগুলি আমাদের জানা দরকার এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন এ আমির আবরণ খসিয়ে দেবার ইশারা ইঙ্গিত আছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গীতরচনায় কত অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে তা জানতে পারলে রবীন্দ্রনাথকেই গভীর ও সত্যবোধে জানা যায়। এও তো আমাদের দায়। আমাদের দুঃখ এই যে 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রকাশিত (২৫ বৈশাখ, ১৩৯৯) সংস্করণে শঙ্খ প্রদর্শিত ত্রুটিগুলির দিকে নজরই দেওয়া হয়নি। সেই ভুলই রয়ে গেল পাঠক-শ্রোতা-গায়ক সুরকারদের জন্য। শঙ্খ ঘোষের প্রতিবাদও যদি থাকে তবে তার উল্লেখও আমাদের প্রয়োজন।

কেন রবীন্দ্রনাথের গানের এত সব জানার আমাদের ঔৎসুক্য? রবীন্দ্রনাথের গানের সুর যেমন আমাদের মাতায় তেমনি কথা আমাদের মজায়। আর এই কথা এমনই একটা জায়গা জুড়ে নিয়েছে যার সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলতে পারেন 'রবিকার গানের মধ্যেই আছে তাঁর জীবনী।' যদি ওই জীবনের খণ্ডাংশও আমাদের কৌতূহল জাগায় তবে প্রভাতকুমারের বই হবে আমাদের পরম সঙ্গী। আর যদি ওই গানের মধ্যেই কবি জীবনীর পূর্ণতার সন্ধান করি তবে সাল-তারিখ, অনুষঙ্গ, মুহূর্ত, গানের ওই করণকর্ম আমাদের জানতে হবে। যেদিন একটি কবিতা লিখলেন 'এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি' পরের দিনই গান লিখলেন 'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া'। এ সবের কি কোনো যোগসূত্র আছে? কিংবা অন্তঃসঙ্গতি? হয়ত আছে, হয়ত নেই। সে বিচার এখানে নয়,

আমরা কেবল বলতে পারি কবির চিত্তগহনের সহস্র তারের রণনের প্রসঙ্গ। এখন যদি আমার কাছে গান এবং কবিতা রচনার সাল-তারিখ থাকে তবেই তো ওই রণনের তাৎপর্য ধরতে পারব। কিংবা 'ভূমিকা'য় শঙ্খ যখন বলেন 'আজি দখিন দুয়ার খোলা', 'ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া' এবং 'দখিন হাওয়া জাগো জাগো' তিনটি গানের মধ্যে প্রথমটিতে আছে বহির্বসন্তের মদিরতা, দ্বিতীয়টিতে আছে 'আমি'র সঙ্গে তার যোগের ব্যাকুলতা আর তৃতীয়টিতে পাই এ যোগের তাত্ত্বিকতা। তিনটি গানের পরম্পরা আমাদের কেবলই প্রত্যাশার পর প্রত্যাশা জাগিয়ে দেয়। পেয়ে যাই নটরাজ-কল্পনা। প্রথম গানটি রচিত ১৩১৭ সালে, দ্বিতীয়টি ১৩২১ এর ফাল্গুনে এবং তৃতীয়টি ১৩২৯ এর ফাল্গুন। এই সালগুলি অত্যন্ত জরুরি। কেননা নটরাজে (১৩৩৩) পৌঁছুতে দখিন হাওয়ার মর্মে পৌঁছুতে হবে যে! কেমন তথ্য কাজে লেগে যায় রবীন্দ্রনাথের পথে বেরিয়ে আসবার চিত্রমালা প্রসঙ্গ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য গীতালিতে। শঙ্খ পথ ঘরের দ্বন্দ্ব খুঁজে পান গীতাঞ্জলির ৩০টি চিত্রে, গীতিমাল্যের ১১ এবং গীতালির ৪টিতে। পথে বেরোবার আয়োজন দেখেন গীতাঞ্জলিতে ২০, গীতিমাল্যে ১৩ এবং গীতালিতে পাঁচবার এবং পথে বেরোনোর ছবি গীতাঞ্জলিতে ২, গীতিমাল্যে ৬ এবং গীতালিতে ৩৬। এই প্রত্যক্ষ বিবরণ (তথ্য সংগ্রহ) থাকার ফলেই লিখতে পারেন "আর 'গীতালি'তে ঝাঁপিয়ে এল রুদ্রতালে আমির যাবার পথ, কেননা 'পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া'।" বিবরণাত্মক ব্যাকরণ প্রকরণ এখন সাহিত্য সমালোচনায় গৃহীত হচ্ছে। শঙ্খ সেইটিই এখানে প্রয়োগ করেছেন। পাশ্চাত্য সমালোচক স্পারজিয়ন অথবা ডেভিড লজের প্রবন্ধে এরকম গাণিতিক সংখ্যাবস্তু উঠে আসে বারে বারে।

এরকমই একটা ভাবনা তার আলোচনা গ্রন্থগুলিতে জাগতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কোনো কথা উদ্ধৃত করে তৃপ্তি হয় না তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আগে পড়ে বলা বা লেখা আরও রবীন্দ্রসম্ভাবিত। যেমন 'যোগাযোগে'র বিপ্রদাস গান প্রসঙ্গে যে কথা বলে তার সঙ্গে মিলিয়ে নেন তিনি ছিন্নপত্রাবলীর কোনো একটি পত্রের অনুরূপ মন্তব্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে এটাও একটা তথ্য। কিন্তু দ্বিতীয় রবীন্দ্ররচনাটি তথ্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্যে। তারপর শঙ্খ যখন গানের অনুষঙ্গে যোগাযোগ উপন্যাসটি আলোচনা করেন তখন উপন্যাসের বিশেষ স্মরণীয় মুহূর্তের গানপ্রসঙ্গ একের পর এক উদ্ধৃত করেন। এও তথ্য সমাবেশ। কিন্তু এখানে তথ্যকে তিনি তুলে আনেন সঙ্গীতের মাত্রা নির্ধারণে। সে মাত্রা উপন্যাসের টানপোড়েনে মিশে থাকে।

১৯৭৮ সালের গোটা বছর তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শান্তিনিকেতনেরই আশ্রয়ে। 'রবীন্দ্রভবনের অনেক অমূল্য সম্পদ' ব্যবহার করেছেন তিনি, 'দেশবিদেশের নানা পত্রিকার কর্তিকা তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল। শঙ্খ বলেছেন তথ্যের 'অজস্রতায়' তিনি প্লাবিত হয়েছেন।

এর ফল 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' (১৩৮৯)। সেখানে তাঁর রবীন্দ্রমানস উন্মোচনের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, রবীন্দ্র পরিজনের সাক্ষ্য, অথবা দেশে-বিদেশের নানা ব্যক্তির উক্তি, রচনা এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। প্রথম প্রবন্ধেই আমরা দেখতে পাই ক্ষিতিমোহন সেনের দিনলিপি। এই দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে জানাচ্ছেন প্রথমে যুগে তিনি গান বেঁধেছেন বড়োদের অনুরোধে, উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য—'নিজের গান আর গাইতে পেরেছি কবে?' শঙ্খ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার প্রথম যুগ, দ্বিতীয় যুগ অথবা যৌবন আর আর পরিণত বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এখন এই বইতে ক্ষিতিমোহন সেনের পরে শান্তিদেবের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন তিনি। এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কয়েকটি প্রিয় গানের উল্লেখ করেন শঙ্খ। তাহলে তো প্রথমযুগে কিছু নিজের গান ছিল। প্রথম যুগের অনেক গান সম্পর্কে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তার মনে 'চিহ্ন' রেখে গেছে, সেরকম চিহ্নস্মৃতি পরবর্তী কালের গানে তিনি পান না। এ কি তাহলে আত্ম-বিরোধ? দুটি তথ্য আলোচনার মুখটিকে টেনে আনল। এবারে শঙ্খ সে মুখের সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন করবেন।

শঙ্খ দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ব্রতেই নীরবতার সঙ্গে 'লোকের প্রবাহ'র একটা যোগ।

এরপর শঙ্খ আনেন থরো-র ওয়ালডেন গ্রন্থের কথা। রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবনার সন্ধান পান থরো-র গ্রন্থে। অথবা একই প্রযত্নে উচ্চারিত হয় এমার্সনের প্রসঙ্গ। এমার্সনের প্রসঙ্গে রোমান্টিকতার কথা চলে আসে। আর এমার্সের কথা উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য খোঁজেন লেখক। প্রসঙ্গত আসেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, শেলি। থরো বলেছিলেন কবিকে আত্মজীবনই শুধু লিখতে হয়। 'ভালো জার্নাল ছাড়া আর কি কিছু লেখবার আছে তার।' রবীন্দ্রনাথও জানতেন কবির আত্মজীবনী কবির রচনা। রবীন্দ্রনাথের 'আমি' যে স্পেণ্ডারের 'Central I' নয়, অথবা Whitman এর I, Walt Whitman সদৃশ নয়, শঙ্খ তা তথ্য দিয়ে বুঝতে চান। আত্মপরিচয় গ্রন্থে কবিতা লেখার একজন কর্তার কথা বলেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কবির এই মতের বিরোধিতা করেন। শঙ্খ চকিতে ম্যাথু আর্নল্ডের একটি কবিতার টুকরো তুলে আনেন, যেখানে আর্নল্ড বলেন The Central Stream এর কথা।

শঙ্খ লক্ষ করেছেন কবির শেষ পনেরো বছরের লেখায় খ্যাতি-অখ্যাতির টানা পোড়েন। 'খ্যাতি: যেন প্রায় বীজমন্ত্রের মতো হয়ে উঠেছে এই শব্দটি তাঁর শেষ পনেরো বছরের লেখায়'। এই বিষয়টিকে লেখক বিস্তৃত করেন কাদম্বিনী দেবীকে লেখা চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে। এলিয়ট অথবা আঁদ্রে জিদ খ্যাতির চরমে পৌঁছে কিরকম বিব্রত বোধ করেছিলেন, সে তথ্যও উদ্ধার করেন শঙ্খ। রবীন্দ্রনাথ

অ্যাণ্ড্রুজকে এ বিষয়ে লেখেন, কুকুরের ল্যাজে ক্যানেস্তারা বেঁধে, টিনপেটানো শব্দ হচ্ছে। এসব প্রসঙ্গ ছিল নোবেল প্রাইজ পাবার পরের ঘটনাকে নিয়ে। কিন্তু পরিণত বয়সেও এ বিড়ম্বনা থেকে তিনি রেহাই পাননি। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে তিনি চিঠিতে জানান ১৯২৯ সালে সেইকথা। অমিয় চক্রবর্তীকে জানাবেন খ্যাতি-অখ্যাতির টানাপোড়নের কথা, চারুচন্দ্রকে জানাবেন, 'খ্যাতিটাকে নিয়ে উৎফুল্ল কিংবা অবসাদগ্রস্ত হবার জরুরি দরকার নেই'। তথ্যের ভার একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে ? বাধ্য হয়ে শঙ্খ পাদটীকার আশ্রয় নেন সেই—যা তিনি সচেতন ভাবেই এড়াতে চাইছিলেন এই বইতে। সুধীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ, দিলীপকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসুকে বারেবারেই লিখতে হচ্ছে একই বিষয়ে তাঁর অস্বস্তির কথা। চিঠিপত্রের টুকরো ছত্রগুলি অব্যর্থভাবে লেখকের বক্তব্যকে কঠিন ভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর প্রবন্ধটি হয়ে ওঠে মননঋদ্ধ এবং তথ্যসমৃদ্ধ।

এই রকমভাবেই 'ছবি' নামক প্রবন্ধে, শঙ্খ যখন রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন তখন তাঁর মনে পড়ে যায় ইয়েটস্, গ্যোয়েটে, ডিফো, ফ্রাঁসোয়রা মরিয়াকের কথা। এঁরা যে তথ্য হিসেবে উদ্ধৃত হচ্ছেন এমন মনে হয় না। কিন্তু একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মননকে জানতে গেলে এই উদ্ধৃতিগুলি খুবই হৃদ্য এবং মনোরম বলে মনে হয়। এসব দৃষ্টান্ত তথ্যও বটে আবার তথ্যের অতিরিক্ত কিছু। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অন্তর্ভূমিকে স্পর্শ করতে পারি বিশ্ব সাথে বিহার করে। আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' প্রসঙ্গে নির্মলকুমারীকে যে কথা লিখছেন তার সঙ্গে কোথাও বা ঐ দৃষ্টান্তগুলির সারূপ্য কোথাও বা কিঞ্চিৎ তফাৎ। প্যারিসের ছবির প্রদর্শনী উপলক্ষে গুণীজনের মন্তব্য (কঁতেস দ্য নোয়াই) অথবা কুমারস্বামীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেন শঙ্খ। এঁদের তথ্য রবীন্দ্রনাথের উন্মোচনের পথটিকে চিনিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথ কি 'শেষের কবিতা' লেখবার পরে চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে কব্জির জোর হারিয়ে ফেলছিলেন ? কথাটা বলেন রবীন্দ্রনাথই। আর শঙ্খ দেখান ১৯২৮ সালের পর রবীন্দ্রনাথ অনেক জটিল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর আগে বারো দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনটি কবিতা (উল্লেখ নেই, থাকলে ঝগড়া করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারত) লেখেন, মৃত্যুর দেড়মাস আগে 'প্রগতি সংহার' এর সৃষ্টি। এটি কব্জির জোরের অভাব সূচিত করে ? দুটি দৃষ্টান্ত তথ্য হিসাবে মূল্যবান হয়ে ওঠে দিন আর মাসের উল্লেখে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত করতে গিয়ে লেখক একের পর এক নজির স্থাপন করেন রবীন্দ্ররচনা থেকে। ছবি আর কবিতা, ছবি আর গল্প, ছবিআর নাটক—এসব যেন একাকার হয়ে যায় এই 'ছবি' নামের প্রবন্ধটিতে। আর আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের জগতে ভিতর আর বাইরের বিরোধ, তার থেকে মুক্তির সন্ধান—শেষ পনেরো বছরের এই লক্ষণই অনাবৃত হতে থাকে রবীন্দ্র চিত্রকলায়।

'মুখোশে' শঙ্খ কল্লোল-প্রগতি পর্বকে ছুঁয়ে যান। অমিত রায় দিয়েই শুরু করেন। একে একে প্রবন্ধের পরিধিতে চলে আসেন দিলীপ রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র। মুখোশ আর মুখশ্রীর মধ্যে কোন্‌টা ঝরে যাবার যোগ্য আর কোনটি স্থায়ী একথা না বললেও চলে। রবীন্দ্রনাথ যে মুখোশটাকে একেবারে ছাড়তে পারেন না সেকথা ফুটতে থাকে এই প্রবন্ধে, আর শেষ পর্যন্ত শঙ্খ বলেন রবীন্দ্রচনায় এই মুখোশ একেবারে ঝরে যায়নি। এর দায় তাকে তুলে নিতে হয়েছে। সমালোচনা এখানে স্পষ্ট, এই স্পষ্টতা এসেছে তথ্য বিন্যাসের কুশলতায়।

'চালচিত্র' প্রবন্ধে শঙ্খ তথ্যকে আবার সাজাতে থাকেন। উঠে আসে রিলকের কথা। উঠে আসে কাইজারলিং, রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সূচীর নির্দেশিকা। শঙ্খ লক্ষ করেন সমকালীন ইওরোপীয় কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা উদাসীন। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন তিনি অনেকবার। রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি ঘুরেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যত চিঠি লিখছেন, যত সংবাদ জানাচ্ছেন এইসব দেশ সম্পর্কে, তাতে সেখানকার কবি সাহিত্যিকদের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ গীতাঞ্জলির অনুবাদের ঠিক আগে পরে তিনি তো কবি সাহিত্যিকদের নিয়েই চলছিলেন। তারপর পরাধীন দেশের এই কবির বিদেশের ভূমিকার চিত্রচরিত্র পাল্‌টে যেতে লাগল। আমরা যত এগিয়ে যাই ততই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্য-জিজ্ঞাসাকে তেমন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারছেন না। তবে শেষ পনেরো বছরে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে দ্বিধা জাগছিল না এমন নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের উত্তাপ-উত্তেজনা তাঁকে যে বিচলিত করছিল না এমনও নয়। কিন্তু আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ জেনোবিয়ার চিঠির উত্তর দিচ্ছেন নেহাতই সৌজন্যের খাতিরে। ব্যাকুল জেনোবিয়ার পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সরকারি উত্তর দেন। হিমেনেথের আগ্রহও প্রায় উপেক্ষিত হল রবীন্দ্রনাথের কাছে। এ সময় হতবাক হয়ে যাই। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সেসব চিঠির কিছু কিছু শঙ্খ ব্যবহার করেন। এই তথ্য আমাদের নিমজ্জিত করে গভীর যন্ত্রণার মধ্যে। সম্প্রতি 'শাশ্বত মৌচাক' গ্রন্থটি প্রকাশ করে শিশির দাশ আর শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জাপান সম্বন্ধে আমাদের কাছে নতুন তথ্য উপহার দেন শঙ্খ। বেশ কয়েকজন জাপানি কবির নাম করেন, যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখাই করলেন না। রাশিয়ায় গিয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সে সময়ের রুশ কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তার মুগ্ধতার পরিচয় প্রায় পাওয়া যায় না, গর্কি, মায়াকভ্‌স্কি অনুল্লিখিত রাশিয়ার চিঠিতে।

তবু রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'দোলায়িত হয়েছেন গ্রহণ বর্জনের দুই বিপরীত প্রান্তে', নিজেকে ভাঙতে চেয়েছেন, সময়ের সঙ্গে চলতে চেয়েছেন

ঝুঁকি নিয়ে, শঙ্খ তাই মেলে ধরেন আমাদের কাছে। বস্তুত 'চলচিত্র' রচনা তথ্য উদ্ঘাটনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এখানে শঙ্খর পঠনপাঠন তাঁর সঙ্গী হয়ে আছে আদ্যোপান্ত। আর তার বলার কথা যেটা তা উদ্ভাসিত হতে থাকে প্রবন্ধটির প্রতি বিভাগে (Section)।

'নির্মাণ আর সৃষ্টি' পড়তে পড়তে মনে হয় সমালোচক বিষয়গুলির যে শিরোনাম বেছে নিয়েছেন সেগুলির মধ্যে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারে বারে কবির শেষ পনের বছরের রচনাবলীর মুখোশ আর মুখশ্রীর টানাপোড়েন। রবীন্দ্রবীক্ষার এই রকম দৃষ্টিকোণ আমরা ঠিক এর আগে বেশি পাইনি। শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের শেষ পনেরো বছরের রচনাবলীকে গ্রহণ করেছেন। যদিও অনিবার্য-ভাবেই সে অন্তঃপুর আর বহির্ভবনে আগের সৃষ্টি যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং মহিমায় যাতায়াত করেছে। বলা বাহুল্য শেষ, পনেরো বছর নির্বাচনের তাৎপর্য আছে। সমকালীন রবীন্দ্রচিন্তা শঙ্খকে আলোড়িত এবং বিচলিত করেছিল নিশ্চয়ই। আমরা তো বারেবারেই রবীন্দ্ররচনার প্রতি এক রকমের বিরূপতা শুনে আসছিলাম। সমালোচনার গতি প্রকৃতিই বদলে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপতা নূতন কিছু নয়। কিন্তু এই শতাব্দের রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তির পর থেকেই যে রবীন্দ্র আলোচনা আমরা (অ্যাকাডেমিক সমালোচনার কথা এখানে তুলছিই না) পাচ্ছিলাম সেখানে সমাজজিজ্ঞাসাটাই প্রবল হতে আরম্ভ করেছিল। নান্দনিক দৃষ্টিকোণ ছিল না এমন অবশ্য নয়। বুদ্ধদেব বসু একরকমভাবে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা) অগ্রসর হচ্ছিলেন। নেতি নেতি করে তিনি অস্তিতে পৌঁছেছেন। আর সয়ীদ আইয়ুব নান্দনিক এবং দার্শনিক (এ দুয়ের অন্তরঙ্গ যোগে) দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন 'প্রতিবোধ'কে। শঙ্খ এসব রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বাদ প্রতিবাদে যোগও দিয়েছিলেন, আর ধীরে ধীরে একটা জায়গায় পৌঁছতে চাইছিলেন। সেই জায়গাটা আমাদের অপরিচিত এমন নয়। কিন্তু পরিচয়ের গভীরতা ছিল না। বাদী-বিবাদী দুই পক্ষই সমানভাবে তাল ঠুকছিলেন। 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' বইটি যেন এর মধ্যকার সেতু। লেখক কোনো পক্ষই নেন না—তাঁর সেতুর ভিতটাকে একেবারে জমাট করে তোলেন তথ্যের গ্রানিট পাথরে। রবীন্দ্রভবনের তথ্য এ ব্যাপারে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ যত ছবি এঁকেছেন তার কটাই বা আমরা দেখেছি। শঙ্খ সুযোগ পেলেন সব ছবি দেখার। ফলে ছবির জগতের পরিচয় এবং বিশ্লেষণে আমরা নির্ভর করতে পারি সবটাই—তার সঙ্গে মতের মিল না হলেও। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ-রচনা করেছেন। শঙ্খর আলোচনার সঙ্গে এ আলোচনার তুলনা করা ঠিক হবে না। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিকোণের ভিন্নতা সুস্পষ্ট। শঙ্খ যদিও ঐতিহাসিকের ক্রম অনুসরণ করেননি তবু 'আমি' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের 'আমি'র স্বরূপ বুঝতে গিয়ে

একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যায়ের লেখা বিশ্লেষণ করে বলেছেন : 'মনের শেষ পুরস্কার হিসেবে তিনি যা পান তা হলো নিজের মধ্যে সমস্ত জগৎকে ধারণ করবার আনন্দ, জগতের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারার আনন্দ,...'। তথ্যকে বিন্যাস করেছেন সেইভাবে।

কিন্তু কেন পরের আলোচনার মালায় বারে বারে ঘুরে আসে শেষ পনেরো বছরের কথা? শঙ্খ কি সমালোচকদের মধ্যে কোনো সংকট দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর সময়ের বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অভিযান, সার্ত্র-কাম্যুর অস্তিবাদ আর অ্যাবসার্ডবাদ, সমাজ জিজ্ঞাসায় এশিয়ান ড্রামা, ম্যাক্স ভেবার, মার্ক্সবাদ এবং সাব-অলটার্ন ভাবনার সূচনা—এসব রবীন্দ্রবীক্ষাকে কেমন যেন আর শান্ত মনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল না। শঙ্খর আলোচনায় সেই কারণে ঢুকে পড়ে সমকালীন জিজ্ঞাসা এবং সেই নিরিখেই রবীন্দ্রপাঠে অগ্রসর হন তিনি। নান্দনিক বিচারে মুখ্য স্থান অধিকার করছিল শব্দ নিঃশব্দের কথা, চিত্রকল্প অথবা প্রতিমার প্রসঙ্গ। একজন কবি যে প্রতিমার সাহায্যে নির্মাণ করেন কবিতা, তাই কাব্যালোচনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। অমলেন্দু বসু 'রবীন্দ্রায়ণে' লিখলেন রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা সম্বন্ধে। শঙ্খও একটি প্রবন্ধের শিরোনাম দেন 'প্রতিমা'।

রবীন্দ্রনাথের চিত্তেই যে 'কালো দুশ্চিন্তা তার ডিমে তা দিচ্ছে', এইরকম একটা অনির্দেশ্য অথচ আশঙ্কাজড়িত ভাবনা যা দিচ্ছে শঙ্খ চিঠিপত্র থেকে তা উদ্ধার করতে থাকেন। এও লক্ষ করছেন ফুল, ফল, নদী উপমানগুলি এখন কমে আসছে, একেবারেই কমে আসছে রবীন্দ্ররচনায়। থাকলেও তারা নূতন বাস গ্রহণ করছে। সমকালীন ইওরোপীয় চিন্তার সঙ্গে মিল-অমিলের প্রশ্নটা এখানে মুখ্য করে তোলেন শঙ্খ। এবং ইংরেজি আর মার্কিন কবি-কবিতার জগৎ তিনি পরিক্রমা করেন। ঢুকতে থাকে তথ্যের পর তথ্য। প্রবন্ধটি তোড়া বেঁধে দেন তিনি সযত্নে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'চমকপ্রদ আঘাতকারী প্রয়োগে, আমাদের অলস মনকে ঝাঁকুনি দেবার মতো সচেতন কিছু আয়োজন' শঙ্খ লক্ষ করেন। এই প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিতে থাকেন শঙ্খ এর পর একে একে। শঙ্খ সমকালীন বাঙালার প্রিয় কবিদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মুখটি খুলে দেন। এখানে ঠিক তথ্যরূপে আসছেন না জীবনানন্দ। কিন্তু অনেক কবির সাক্ষ্য গ্রহণ করে বিচারক বিষয়টিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন।

'প্রতিমা'র পর 'দৃষ্টি' আর 'মুখশ্রী' দুটি রচনাতেই 'আধুনিকতা' বিষয়টি নিয়ে মনোযোগী হয়েছেন বেশি। আর 'আধুনিকতা' কথাটি বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে উপরে কথিত উপকে-ওঠা সমকালীন সমস্যাগুলি—আইনস্টাইন, ইয়েটস, ব্রেশট, ম্যাকনীস, প্রেরণা-মনন, ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় কাব্যভাবনার সঙ্গে এলিয়ট প্রমুখদের ব্যবধানের স্বরূপ ইত্যাদি। সুতরাং তথ্যের পর তথ্য পেতে থাকি আমরা। একটু যেন বেশি জোর দিচ্ছেন শেষের তিনটি প্রবন্ধে

আধুনিক লেখকদের চিন্তাভাবনার প্রতি, বিদেশী মনীষীদের প্রতি। তিনি নিজেও বুঝে নিতে চাইছেন আধুনিকতার সূত্রে বাস্তব আর পরাবাস্তবের চেহারাটা। রবীন্দ্রনাথ যেন একটু আড়ালে পড়ে যাচ্ছেন। এরকম মনে হলেও সমালোচকের বিশ্লেষণ যে এদিকেই নিপতিত হবে তা বুঝতে পারি গ্রন্থটির ডিজাইনে—পরিকল্পনায়।

আসলে 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' এই গ্রন্থটি তো তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। রবীন্দ্রনাথ রূপভাবনা আর রসভাবনা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একটি চিঠিতে বলেছিলেন সাহিত্যে রূপচর্চার গুরুত্ব। এমন কী সেই লেখায় তিনি একথাও বলেছিলেন : শেকসপীয়র রূপের কবি আর তিনি রসের কবি। শেকসপীয়র বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল আর তিনি মিলিয়ে যাবেন অনেক আগেই। এটা আক্ষেপ না বিচার বলতে পারব না। শঙ্খ তাঁর মতো করে বিচার করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথে ছবি ও গান (রূপ আর রস) মিলে মিশে যায় সেই বিন্দুতে যেখানে সৃষ্টি একটা পরিণত সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করে। রবীন্দ্র-নাথের নৃত্যনাট্য তার দৃষ্টান্ত, ছবিও তার দৃষ্টান্ত।

আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যে তথ্যের কথা বলেছি, অনেকেরই তা ভালো লাগেবে না। বস্তুত কোনটাকে তথ্য বলবো আর কোনটাকে আস্বাদন বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বুদ্ধদেব বসু একবার বলেছিলেন, এক জাতীয় রবীন্দ্রসমালোচনা আছে যা পড়ে আর একবার রবীন্দ্রনাথ পড়ার স্বাদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সেখানে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি সংগৃহীত হয়। সমালোচকের বক্তব্য বিশেষ কিছুই থাকে না। এই অস্বস্তি (কখনো ফাঁকিবাজি মনে হতে পারে) কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। আমার মনে হয় শঙ্খ-র উদ্ধৃতিগুলি তথ্য তো বটেই। আবার এই তথ্যই সৃষ্টির পূর্বেকার পর্ব বা কালটিকে চিনিয়ে দেয়। কোনটি নির্মাণ আর কোনটি সৃষ্টি এ প্রশ্ন জাগান আলোচক নিজেই। আর তথ্যগুলি (উদ্ধারচিহ্নের অজস্রতা লক্ষণীয়) সৃষ্টির গ্রীনরুমকে চিনিয়ে দেয়, সৃষ্টিকে নিশ্চিতরূপে বুঝতে সাহায্য করে। সেজন্য পাদটীকা নয়, নির্দেশ নয়—এসব উদ্ধৃতি রবীন্দ্রবীক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর নিছক তথ্যেরও যে মূল্য আছে, কোনো প্রবন্ধ যে তথ্যের জোরেই ঋজু হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ দিয়েই এই প্রবন্ধ শুরু করেছিলাম।

'নির্মাণ আর সৃষ্টি'র 'মুখোশ' আর 'মুখশ্রী' প্রবন্ধ দুটি আলোচনার মূল দুটি বিন্দু। আর এ দুয়ের টানাপোড়েনে কীভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য বিস্তৃত হয়েছে তাই পরতে পরতে মেলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। তথ্য সেখানে তল্পিবাহক না হয়ে জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করে ওই দুটি বিন্দুকে বৃত্তের কেন্দ্রে রেখে।

সুধীর চক্রবর্তী

•••

রবীন্দ্রনাথের গান ও শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খদা আমার গলায় গান শুনতে এবং অন্যকে তা শোনাতে ভালোবাসেন কিন্তু তাঁকে কখনো রবীন্দ্রনাথের গান আমি শোনাই না। বহুরকমের বাংলা গান, এমনকি দিলীপকুমারের গানও তাঁর সামনে গাইতে পারি অসংকোচে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে ভয় করে। ঠিক তেমনি আমার লেখা, সব রকমের লেখা বা বই, তাঁকে পৌঁছে দিই পড়বার জন্য, কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে লেখা কিছু দিলে মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা থাকে। ভাবি, বুঝি থেকে গেছে কোনো ফাঁক কিংবা তথ্যের ভুল, দিনেন সাল তারিখের অসংগতি, ঠিক, ধরা পড়বে। জানাবেন তা অবিচলিত শান্ত কণ্ঠে, নিশ্চয়ই জানাবেন জানি। সেটা একটা ভরসাও। নিজের লেখা মেরামত করবার পক্ষে সেরা উপায় হচ্ছে শঙ্খদা-কে তা পড়ানো। এমন ধৈর্যশীল শ্রোতা ও সতর্ক পাঠক বিশেষ তো দেখি না। তাঁর থেকে সামান্যই তো ছোট আমি, সাল তারিখের নিখুঁত হিসেবে বড়জোর বছর ছয়েকের বড়ো তিনি, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার অগ্রজের অটল বিশ্বাস রয়ে গেছে। তার কারণ এই নয় যে আমি ঠিক তাঁর পিঠোপিঠি সহোদর অসীমের বন্ধু, আসল কারণ আমি একটা বড়ো একান্নবর্তী পরিবারে অনেক দাদাদের স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ হয়েছি, তাঁদের কাছে কত কী শিখেছি, এখনও তাঁদের সম্ভ্রম ও ভয় করি। শঙ্খদা সম্পর্কে এই লেখাও সভয়ে, সেটা কবুল করে বলা উচিত যে, মানুষটা একেবারেই কঠিন নন, রসিক। যে কোনো জিনিস সম্পর্কে তাঁর যে অনপনেয় শুদ্ধতাবোধ আছে তার কারণ সববিষয়েই তাঁর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা ও ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভালবাসার মানুষ, তাই তাঁর সবচেয়ে উৎকণ্ঠা সেই মানুষটির গানের সর্বাঙ্গীন উন্মোচনে। কিংবা বিস্তারে বলা চলে, সব-কিছুতেই তাঁর নির্ভুত করার প্রবণতা কাজ করে। তাই শঙ্খদার হাতের লেখার ছাঁদ, বানান রীতির নিজস্ব ধরন এবং বইয়ের নামকরণ পদ্ধতির মতো সবতাতেই তাঁর শ্রীমন্ত মন আর যাপনের সানন্দ সংগঠন কাজ করে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গীতবিতানের গানগুলির কালানুক্রমিক বিবরণে যখন ভুল করেন কিংবা শান্তিদেব ঘোষ তাঁর রেকর্ডে গানের তথ্যে অনবধানে ঘটিয়ে ফেলেন অসংগতি তা ঋজু ভাষায় শুধরে দেওয়া শঙ্খদার স্বাভাবিক মনে হয়,

যেন সেটা তাঁর সামাজিক দায়। ঠিক একই ভাবে আমার গদ্যে অজ্ঞতাবশত বানান ভুল থাকলে (এতদিন ধরে লিখেও থাকে বৈকি) সেটাও চিঠি লিখে শুধরে দেন। তাঁর মধ্যে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ প্রবল কিন্তু গোঁজামিল দিয়ে এড়ানোর চেষ্টা কখনও দেখিনি। তিনি একজন প্রধান কবি আমাদের ভাষায়, সেইসঙ্গে একজন কমিটেড মানুষ ও গদ্যলেখক। জীবনের প্রথম বইটি তাঁর বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে এটা মনে রাখলে ভাল হয়।

শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীত সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার স্বকীয়তা বিষয়ে নিবন্ধ লিখতে গিয়ে কিছুটা যে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে গেল তাঁর কারণ লেখাটা সেখান থেকে শুরু করা সংগত। তার একটা ইতিহাসও আছে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের বছরে, 'রবীন্দ্রনাথ মনন ও শিল্প' নামে একটা প্রবন্ধ সংকলনের পরিকল্পনা ও সম্পাদনা করেছিলাম। আমার অনেক দিনের অধ্যাবসায়ে ও ঘোরাঘুরিতে শঙ্খদা সে-সংকলনে একটা লেখা দেন (তখন তিনি গদ্য মোটে লেখেনই না), যার শিরোনাম, 'নাটকে গান, রবীন্দ্রনাথের নাটক'। আজ বলতে বাধা নেই, এই একটা গদ্যই, তাঁর শৈলী ও নিজস্ব বিশ্লেষণের স্বচ্ছতায় তাঁকে গদ্যরচনায় চিহ্নিত করে। রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে শঙ্খদার মৌলিক অধিকার ও কর্তৃত্বকারী অর্জন ঐ প্রথম গান-বিষয়ক রচনাতেই স্পষ্ট। লেখাটি বহুজনের নজর কাড়ে এবং অনেকেই বলেন রবীন্দ্রনাথের নাটকে গান নিয়ে এমন লেখা বাংলাভাষায় আগে লেখা হয়নি। লেখা হয়নি অথচ শঙ্খ ঘোষের লেখায় তা হল, যিনি সে-অর্থে গানের মানুষই হয়ত নন, ব্যাপারটা চমকপ্রদ। কিন্তু আমার পক্ষে চমকপ্রদ নয়, কারণ আমি তো অন্তত জানতাম মানুষটি গানেরই মানুষ। গোটা ঘোষ পরিবারটাই তো গানে পাগল। পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষ সেই গানের আনন্দ সন্তানদের মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীত। চল্লিশ পঞ্চাশ দশকে শঙ্খদাদের সব ভাইবোন কান পেতে সব রকমের রবীন্দ্রগীতি শুনতেন এবং 'গীতবিতান' ছিল তাঁদের নিত্যদিনের পাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের গান কে কটা মুখস্থ বলতে পারে তার একটা পরোক্ষ প্রতিযোগিতা ছিল পরিবারের কিশোর যুবাদের গড়ে ওঠার কালে। শঙ্খদার গানের দীক্ষা এই স্নিগ্ধ বহুজনের পারিবারিক বৃত্তে। রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি চাক্ষুষ বাণীময়তা ও স্মরণের সম্পুটে ভরে রেখেছেন, সেখানে কোনো স্খলন নেই, কারণ রসিক মানুষটি সব অর্থে মেধাবী ও স্মৃতিধর।

রবীন্দ্রনাথের গানকে নানাভাবে জীবনে পাওয়া যায়। আমি যেমন পেয়েছি গায়নের সৌভাগ্যে। রবীন্দ্রনাথের কোনো গান শুনে আনন্দ পাওয়া আর গেয়ে বুঝে নেওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। কণ্ঠে গানের পুনর্জন্ম হয়, গায়কের নিজেরও পুনর্জন্ম। তিনি নিজেও বুঝতে পারেন নিজের কণ্ঠের প্রবণতাগত ধরন। কোন্ গান গাইব এ-নির্বাচনে গায়কের প্রধান বিবেচ্য সুর বা বাণী নয়, যে-গানে নিজেকে সবচেয়ে বেশি দেওয়া যায়, অনর্গলিত করা যায় অন্তঃশীল প্রকাশবাসনাকে—সেই

গান। নিজে যে গান গাইতে পারি, অন্যের কণ্ঠে, বিখ্যাত কারুর কণ্ঠে সেই গান আবার শোনা—আরেকরকম অন্তঃস্থ নির্মাণ। সত্যিকারের গায়ক অশ্রান্তভাবে একই গান গেয়ে গেয়ে, বারেবারে গেয়ে, বুঝে নিতে পারেন তার অন্তঃসার। তবে গান তার অবগুণ্ঠন খুলে আত্মস্বরূপ দেখায়। কিংবা অমিয়নাথ সান্যাল যেমন বলেছেন, ভাল গানের নাকি নিজেরই একটা 'অর্মান' বা আকাঙ্ক্ষা থাকে দক্ষ কণ্ঠকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করার। খুব বড়ো একজন ওস্তাদ কলাবন্ত গান গাইবার পর শ্রোতারা 'ধন্য ধন্য' ক'রে বলেছিলেন : এমন গান গাইলেন কী করে? কী আছে আপনার কণ্ঠে? গায়ক বললেন : কণ্ঠে কিছু নেই। গান আমার গলায় ঢুকে নিজেকে আদায় করে নিয়ে তবে ছাড়ল।

হয়ত এতবড় কলাবন্ত নন সবাই, কিন্তু নিভৃতে আপনমনে, সব গায়ককেই খুঁজে নিতে হয় গানের সত্যিকারের 'বন্দিশ', নিজে গেয়ে এবং অন্যের গান শুনে। পরে, যোগীর যেমন ক্রমশ কর্মত্যাগ ঘটে, গায়কও তেমনই অন্যের গান শোনা কমিয়ে ক্রমশ নিজের গানে মশগুল হয়ে যান। গায়কের গান-শোনা আর শ্রোতার গান-শোনার মধ্যে এইভাবে পার্থক্য ঘটে। শ্রোতার গান-শোনার সমজদারি সারাজীবন থেকে যায়, গায়ক ক্রমশ নিজের মধ্যে গানকে গুছিয়ে নেন। অন্যের গান তখন তাঁর নিজের সম্পদ কিংবা আত্মস্বীকার একটা জানলা খুলে দেয়। তখন সুবিনয় রায়ের গাওয়া গান আর শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত থাকে না, হয়ে ওঠে বিশিষ্ট ভাবে তাঁরও গান। একই ব্যাপার শুনি অমিয়া ঠাকুর, দেবব্রত কি সুচিত্রা-কণিকার গানে।

গান শোনা আর গানের পাঠও যে জাগাতে পারে কোনো নতুন ব্যক্তি-স্বরূপকে তার নমুনা দেখি শঙ্খ ঘোষের রচনায়। গানের 'অর্মান' যেমন করে গুণী কলাবন্তকে আশ্রয় করে নিজেকে দ্যোতনা করে, রবীন্দ্রসংগীত বোধহয় তেমনি অপেক্ষা করে ছিল মেধাবী রসিকের মননচিন্তনের স্পর্শে জেগে উঠবে বলে। অপেক্ষার সেই আকুল ইতিহাস অব্যক্ত হয়ে আছে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে লেখা নিবন্ধ ও বইগুলিতে। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে এঁরাই ছিলেন ঐ গানের সামান্য কজন আলোচক। চারজনই গানের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলেন কিংবা সম্ভবত উল্‌টো অর্থাৎ আগে রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলেন, পরে তাঁর গানকে। কিন্তু তাঁদের মুগ্ধতা ও সম্ভ্রমবোধ ভেদ করে রবীন্দ্রগীতপুরুষ উদ্‌ভাসিত হতে পারেনি। কেননা তাঁরা ছিলেন রবীন্দ্রজীবনের অব্যবহিত এমনকি অনুসারী পরিকর। রবীন্দ্র-সংগীতের 'অর্মান', তার অন্তরালবর্তী সত্তা ও স্বরূপ, এঁদের অনুভবে ধরা পড়েনি। পড়া সম্ভবও ছিল না, কারণ রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী', সেই সময়ের আড়াল তাঁরা পাননি। আত্মীয়তার প্রশ্রয়সীমার বাইরে যেমন নিরপেক্ষ জনসমাজে ধরা পড়ে একজন ব্যক্তির প্রকৃত স্বভাব, তার স্খলন ও সাফল্য সমেত,

তেমনি রবীন্দ্রনাথের গানের স্বভাব ও স্বরূপ নিজেকে ধরা দিতে চেয়েছিল মনস্বী মানুষের রসাবেদনের কাছে। শুধু সুর বা বন্দিশ নয়, তার বাণীবন্ধনের নিগূঢ় অন্তলতা ধরবার জন্য অপেক্ষা ছিল নিপুণ ডুবুরির। আবু সয়ীদ আয়ুব ও শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রগানের রূপসাগরে প্রথম সাঁতারু। কথাটা তথ্যযুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলে একটু ইতিহাস জানা দরকার।

সব কিছুর ধারাবদ্ধ ইতিহাসের মতো রবীন্দ্রসংগীত-আলোচনারও যে একটা ক্রমিক ধারাবাহিকতা আছে তা এখনও কারুর লেখায় রূপ পায়নি। তার একটা সামান্য খসড়া হিসাবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর গান সম্পর্কে প্রথম আলোচনার কৃতিত্ব দিনেন্দ্রনাথের। একটি প্রবন্ধের সীমায় তিনি তাঁর মতো করে রবীন্দ্রসংগীতের মাধুর্য ও অনন্যতা বোঝাতে চেয়েছিলেন। নিজে স্বতোৎসারে গান গাইতেন, শেখাতেন, প্রচার করতেন। রবীন্দ্রনাথের বহুগানের সৃষ্টি-লগ্নের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল, প্রথম দিকের বহু স্বরলিপিও তাঁর করা। শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় এই গানের সম্প্রচার ও লিখনের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপরে। সাহানা দেবী, শান্তিদেব এবং প্রথম যুগের সব শিল্পী তাঁর হাতে গড়া। মঞ্চেও রবীন্দ্র-নাটকের নানা চরিত্রে গান গেয়ে তাঁকে ফোটাতে হত তার প্রকৃত রসরূপ। একথাও সত্য যে, তাঁকে আশ্রয় করে, তাঁর উদাত্ত গায়নভঙ্গির কথা ভেবে সৃষ্ট হয়েছে অনেক রকমের গান। নাটকে গান যোজনার সংখ্যাগত তারতম্য ঘটত 'দিনু' অভিনয় করলে বা না-করলে। এমন মানুষের প্রবন্ধে যেটা ব্যক্ত হয়েছে তা ঐ গানের গায়নগত উপলব্ধি ও আবেগের দিক। সেটাই স্বাভাবিক ও সংগত। গুরুদেবের জীবিতকালে তাঁর বন্ধুপুত্র আজন্ম শান্তিনিকেতনী পরিবেশে লালিত শান্তিদেব ঘোষ মাঝে মাঝে ছোটখাট লেখায় রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে নানা তথ্য ও অনুভব লিখে দেখাতেন তাঁর গুরুদেবকে। সেইসব লেখা এবং পরবর্তী কিছু সংযোজন মিলে তৈরি হয়েছে শান্তিদেবের 'রবীন্দ্রসংগীত' বইটি। ঐ বিষয়ে এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই। এ-বইয়ের কাছে, অন্তত তথ্যের সম্ভারে ও প্রত্যক্ষ বর্ণনার সত্যতায়, আমরা স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের একটা স্পষ্ট বিগ্রহ পাই। যদিও সে-বিগ্রহ ভক্তির ধোঁয়ায় কিছুটা প্রচ্ছন্ন। পূজাবেদির উচ্চতায় রাখা সেই বিগ্রহ সম্পর্কে আবেগ আছে, বিচার নেই। শ্রদ্ধা আছে আমূল কিন্তু অন্তর্ভেদী কোনো উপলব্ধি নেই।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ঠিক রবীন্দ্রসঙ্গীতসমালোচক ছিলেন না। বেশ কটি গান-রচনার নেপথ্য বিবরণ আর রবিকাকার গান গাওয়ার স্মৃতিচারণের বাইরে তাঁর লেখা বলতে আমরা বুঝি 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ত্রিবেণীসঙ্গম' নামে একরকম পঞ্জীকরণের দুরূহ কাজ, যা শ্রমসাধ্য ও মৌলিক। রবীন্দ্রগীতির মৌল রসায়ন বুঝতে তার উপাদানগত বিভাজন এই শীর্ণ বইতে বিরল বিন্যাসে ধরা আছে। সেটাও অবশ্য একরকমের সমালোচনা, পরিমিত বাক্য ব্যবহারে ও সংহত চিন্তার প্রখরতায়।

যেকোনো রবীন্দ্র-সঙ্গীত সংক্রান্ত রচনা ও বইতে এ-বইটির সহায়তা অনিবারণীয়। কিন্তু তবু ইন্দিরার প্রয়াস অনেকটাই সীমায়ত। এতে থিয়েটিক কোন ভাষ্য আমরা পাই না।

রবীন্দ্রনাথের আরেক অনুজ আত্মীয় সৌম্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানত রাজনীতির মানুষ। কিন্তু যেন অনেকটা সাংস্কৃতিক দায় এবং রবীন্দ্রগীতি সম্প্রচারের দায়িত্ব থেকে তিনি এই গান সম্পর্কে নানা সমাবেশে উদাহরণযোগে ভাষণ দিতেন। উচ্চস্তরের বাগবৈদগ্ধ্যে ও অনুভবে তাঁর ভাষণগুলি সমৃদ্ধ হত এবং মনস্ক শ্রোতাদের রসপিপাসা মেটাত। সৌম্যেন্দ্রনাথ যে কেবল রবীন্দ্রস্নেহধন্য পরিবার-বৃত্তের সদস্য ছিলেন তাই নয়, তিনি অত্যবয়সের রবীন্দ্রজীবনের মননচিন্তনের অন্তর্গত ছিলেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে প্ররোচিত করেছিলেন মানুষের জয়গান করে একটা গান লিখতে। সেই প্রস্তাবনা সম্ভাবিত করেছিল 'ঐ মহামানব আসে' গানটি। এ হেন রসিক ও মরমী মানুষটি যে 'রবীন্দ্রনাথের গান' বইতে কিছু সারকথা বলবেন সেটাই প্রত্যাশিত এবং তা বইটিতে প্রকটিত। কিন্তু তবু নিরপেক্ষ বিচারে বলতে হয়, তাঁর রচনা আবেগতাড়িত ও তাৎক্ষণিক লক্ষণে চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথের গানে স্বরলিপি-বিভ্রাট এবং স্বরবিন্যাসে সুরদলন বিষয়ে (তাঁর ভাষায় 'ধর্ষণ') তাঁর বিদ্রূপপূর্ণ রচনা যতটা তৎসাময়িক ততটা গভীরতাস্পর্শী নয়।

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আলোচনা বলতে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত এসব রচনাকেই বোঝায়। এর ফাঁকে কালিদাস নাগ, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, নীহারবিন্দু সেন ও হেমেন্দ্রলাল রায়ের কোনো কোনো দ্যোতক বা নির্দেশক নিবন্ধ মূল বিষয়ে কিছু কিছু আলো ফেলে এই পর্যন্ত। তাতে চকিত উদ্ভাস আছে, আছে মৌলিক উদ্‌ঘাটন, কিন্তু বিষয়টিতে অনুধাবনের ধারাবাহিকতা নেই। হঠাৎ যেন কোনো উপলক্ষে বা কারুর অনুরোধে লেখা, তারপরে দীর্ঘকাল অখণ্ড নীরবতা। রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর কলকাতায় তাঁর গান শেখানোর জন্য একটি দুটি শিক্ষাসত্র গড়ে উঠছিল। প্রথমে 'গীতবিতান', পরে 'দক্ষিণী'। 'দক্ষিণী'-র সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমের প্রণয়ন করতে গিয়ে অধ্যক্ষ শুভ গুহঠাকুরতা নিজে 'রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা' নামে একটি বই লেখেন। বইটি পাঠক্রমমুখী বলে সকলের কাজে লাগে না। তবে রবীন্দ্রসংগীতের বৈচিত্র্য ও বিন্যাস বোঝার পক্ষে কার্যকর, এই পর্যন্ত।

এমনতর প্রায় শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ষাটের দশকের সূচনায় রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা ও লেখালেখির একটা প্রবল বেগ সঞ্চারিত হয় প্রধানত রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষের উপলক্ষ ঘিরে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বা রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতো প্রতিষ্ঠিত সংগীততাত্ত্বিক এ সময়ে কিছু প্রবন্ধে ব্যক্ত করলেন তাঁদের নিজস্ব মতামত। রাজ্যেশ্বরবাবুর মতামত এ ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার এইজন্য যে তিনি আবহমান বাংলা গানের পটভূমি উন্মোচন করে সেই ইতিহাসের পটে রবীন্দ্র-

নাথের গানকে বুঝতে ও বোঝাতে চাইলেন। কাজটা নতুন ও অনুশীলনজাত. কারণ রাজ্যেশ্বরবাবু বাংলাগানের বিচিত্র ধারা সম্পর্কে ক্রিয়াত্মক ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের রচনা তুলনায় অনেক কৃত্রিম ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রসংগীতে সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও ইঙ্গিতধর্মী লেখা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানাভাবে লিখে গেছেন তাঁর গান লেখার ফাঁকে ফাঁকে। 'সংগীতচিন্তা' নামে দুই মলাটের সীমায় সেই রচনাগুলি কয়েক বছর আগে সংকলিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে। নিজের গান ও গানের শিল্প নিয়ে তাঁর ধারণা ও অন্বেষা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ ও দিলীপকুমারের সঙ্গে পত্র-বিতর্কে। সেই চিঠিগুলিও 'সংগীতচিন্তা'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমাদের পক্ষে সংগ্রহযোগ্য হয়েছে। কিন্তু নিজের গান সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত দেওয়া কঠিন। স্রষ্টা বড়জোর বলতে পারেন নিজের সদিচ্ছা ও কৃৎকৌশল বিষয়ে অর্থাৎ গানে তাঁর কোন্ কোন্ উপাদান আছে বা তাঁর গানের ভাবগত প্রত্যয় ও সুরের ধরনটি কেমন। স্রষ্টার সব কথা যে আমাদের মনে ধরে তাও হয়ত নয়। নানা মন্তব্যে তর্ক উজিয়ে ওঠে কিন্তু সমাধান হয় না, কেননা স্রষ্টা তো সামনে নেই।

এত সব ইতিহাস ও চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে ষাটের দশক থেকে রবন্দ্রসংগীতের অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটনের যে-সব প্রয়াস শুরু হয়েছে তার গুরুত্ব বুঝতে হবে। রবীন্দ্র-সংগীতকে 'পান্থজনের সখা' বলে আবু সয়ীদ আইয়ুব যখন সোরগোল তুলে ফেললেন তখন পাঠকসমাজ একটা নতুন দৃকভঙ্গির সম্মুখীন হল। তাঁর মতো মান্যতা সম্পন্ন রসজ্ঞ ও দার্শনিক যখন ঘোষণা করলেন রবীন্দ্রনাথের 'বহুবিচিত্র সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই আমি সবচেয়ে মূল্যবান ও কালজয়ী মনে করি' তখন সকলেই বুঝলেন রবীন্দ্রসংগীতের গুরুত্ব কতখানি, বুঝলেন যে, এ কথা এত জোরের সঙ্গে আগে কেউ বলেননি। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম কবিবিগ্রহের যে প্রতিষ্ঠা তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে ঘটেছিল, এমনকি তাঁকে বলা হচ্ছিল 'বিশ্বকবি', সেখানে ফাটল ধরল। গীতিকার রবীন্দ্রনাথ বা গানের রবীন্দ্রনাথ এবারে কবি রবীন্দ্রনাথের উপরে নিজেকে স্থাপন করতে লাগলেন। আইয়ুব আরও বললেন, 'রবীন্দ্রসংগীতে সুরের শিল্পোৎকর্ষ ও ব্যঞ্জনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু বলবো সুর সেখানে রথ, সারথি নয়, কথার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও আদিগন্ত বিস্তার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছিয়ে দেওয়া তার কাজ।' রঙের উপর রসান চড়িয়ে তিনি এরপর এতটাও বলে বসলেন : 'যাঁরা প্রধানত সুরের রসিক ও সাধক, কথার প্রেমে পড়তে শেখেননি, তাঁরা গায়কই হ'ন আর শ্রোতাই হন রবীন্দ্রসংগীত তাঁদের জন্য নয়'। একথা সাহস করে জানাতে এক ধরনের সত্যদৃষ্টি লাগে কেননা এ তো কেবল সাজানো কথা নয়। এর পিছনে আছে অভিনিবেশ দিয়ে বহু দিনের গান শোনা ও পঠনের তৃপ্তিজাত পর্যবেক্ষণ। সত্যসন্ধী দার্শনিক যখন রবীন্দ্রগীতে পেয়ে যান তাঁর পর্য্যুৎসুক মনের অবলম্বন তখন আমরা সেই

গানকে নতুন প্রেক্ষণে দেখতে শিখি। বুঝি যে, এতদিন সে গানের অবহেলাই শুধু আমরা করে গেছি। আইয়ুব তাঁর রচনায় রবীন্দ্রনাথের গানকে ধরে রবীন্দ্রনাথকেই নিবিড় করে পাওয়ার একটা রাস্তা খুলে দেন যেন।

আইয়ুবের পাশে শঙ্খ ঘোষের নাম এখানে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হবার যোগ্য, কেননা রবীন্দ্রসংগীত শ্রবণ ও পঠনকে মিলিয়ে তাঁর কাব্যবোধ নাট্যবোধ ও সংগীতবোধকে পর্যুষিত করে তিনি এই বিশেষ কলারূপটি সম্পর্কে গত তিন দশক ধরে আমাদের কাছে নতুন বিশ্লেষণ নিয়ে আসেন। পরে ক্রমশ দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির অনুষঙ্গ টেনে শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরপরিধি আরও প্রসারিত করে দিচ্ছেন। গান লিখেছেন যে-রবীন্দ্রনাথ এবং ছবি এঁকেছেন যে-রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আন্তরসাযুজ্য নিয়ে এই প্রথম কোনো উচ্চারণ শোনা গেল। 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' বইটির অন্তর্গত বেশ কিছু নিবন্ধে তিনি নাটকের গানগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করে বোঝালেন রবীন্দ্রনাটকের বিশেষ পরিকল্পনায় গান ঠিক বাইরে থেকে চাপানো কোন উপাদান বা বিনোদন সামগ্রী নয়, তা নাটকেরই অন্তর্গত, হয়ত নাটকেরই বিষয়। মনে পড়ছে, কোনো পত্রিকার তরফে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি বই নিয়ে যদি তাঁকে দেশান্তরে বা চিরতরে কোথাও যেতে বলা হয় তবে কী বই তিনি বেছে নেবেন। তাঁর জবাব : 'গীতবিতান' নিতেই ইচ্ছা করে, কিন্তু সম্ভবত তিনি বেছে নেবেন কোনো নাটক কারণ তার মধ্যে গানও আছে।

এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হল যে রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই সবচেয়ে মূল্যবান ও কালজয়ী মনে করা আবু সয়ীদ আইয়ুবের আর শঙ্খ ঘোষের মতামত খুব কাছাকাছি, তবে শঙ্খ অধিকন্তু মেনে নেন নাটকের আবশ্যিকতা। এই অনুভব ও ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে পঠন-পাঠনে রবীন্দ্রসংগীতের কোনো আলাদা স্বীকৃতি ছিল না। তাঁর গানের চাবি দিয়ে যে খোলা যেতে পারে রবীন্দ্রশিল্পের সমূহ দরজা একথা কেউ বলেননি। রবীন্দ্রসংগীতকে রবীন্দ্রনাথের নির্মাণ ও সৃষ্টির সামূহিক প্রয়াসের অন্তর্গত সূত্ররূপে প্রথম দেখালেন শঙ্খ ঘোষ। পঞ্চাশের দশকে তিনি ও আমরা আগে পরে প্রায় একই শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বে বাংলাসাহিত্য পড়েছি। তাতে রবীন্দ্রকাব্য ও নাট্যের বহু বই পাঠ্য ছিল, উপন্যাসও পাঠ্য ছিল, কিন্তু সেসব পঠন-পাঠনে আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী কখনও রবীন্দ্রসংগীতের কোনো যোগসূত্র অনুসন্ধান করে জানাননি তেমন করে। তখনকার কালে বহুপঠিত রবীন্দ্র-সমালোচনার বইগুলি রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে মন্তব্য করতে কুণ্ঠিত ছিল এবং সম্ভবত অচেতন ছিল। গান হচ্ছে গান, সেটা গায়কদের বা সংগীততাত্ত্বিকদের এক্তিয়ারে এমন হয়ত মনে হত তখনকার সাহিত্যের শিক্ষকদের। রবীন্দ্রনাথের

গান যে অন্য বর্গের, তার মধ্যে যে ধরা আছে 'তাঁর মনেরও ইতিহাস' একথা শঙ্খ ঘোষই প্রথম বললেন।

সাহিত্যের অধ্যাপক, কবি, দার্শনিক ও কথাসাহিত্যিকরা রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের বছর থেকে ক্রমে প্রগল্‌ভ হতে থাকেন রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের গান যে কেবল গায়ক আর তাত্ত্বিকদের এক্তিয়ারে আবদ্ধ নয়, তা যে রুচিমান ও শিক্ষিত বাঙালির আশ্রয়, এমনকি মননক্রিয়ার অন্তর্গত, একথা ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে কিছু রচনা ও বইতে। যেমন আইয়ুব ও শঙ্খ ঘোষ, তেমনি সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও গৌরীপ্রসাদ ঘোষের লেখায় প্রায়শই ফুটে উঠল রবীন্দ্রসংগীতের ভিন্নতর উদ্‌ঘাটন শ্রোতা ও পাঠকের তরফে। আমাদের মনে পড়ে কবি অমিয় চক্রবর্তী 'গানের গান' নামে একটা ছোট নিবন্ধে এবং বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যগান' রচনায় কী নিপুণ বিশ্লেষণে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে (দ্রষ্টব্য 'গীতবিতান বার্ষিকী' ১৩৫০) রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টিলোক ও মর্ম অন্তভাবে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের প্রয়াস, কোনো ধারাবাহিকতায় পরবর্তী কালে পরিণতি পায়নি যতটা পেয়েছে শঙ্খ ঘোষের ভাবনায় স্পষ্টলক্ষ্য যাত্রাপথের আনন্দ পর্যটন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গানকে কবি বা রসিকের চোখে দেখা ও দেখানো সকলের ভাল লাগেনি। যেমন শোনা যায় 'রবীন্দ্রগানের মুক্তধারা' (১৯৮২) বইতে অরুণ ভট্টাচার্যের খেদোক্তি :

> রবীন্দ্রসংগীত আলোচনা বা গবেষণার বিষয়ে ইদানীং একটা হেলাফেলার ভাব লক্ষ্য করি। বহু সাহিত্যিকই রবীন্দ্রগানের বিষয়ে লিখেছেন। কিন্তু সেগুলি রবীন্দ্রনাথের গানের 'কাব্যাংশেরই' আলোচনা। একটি কবিতার পদ তখনই গান হয়ে ওঠে যখন তা সুরে আবৃত হয়ে একটি 'নতুন রূপ' লাভ করে। এই 'নতুন রূপের' আলোচনা এ-যাবৎ বোধ হয় কোন সাহিত্যিকের কাছেই পাইনি। এর কারণ স্পষ্ট। তাঁরা কেউই সম্ভবত বিধিবদ্ধভাবে গান শেখেননি।……রবীন্দ্রনাথ 'মাঝারির দৌরাত্ম্য'কে ভয় করে এসেছেন। রবীন্দ্রগানের আলোচনায় এই মাঝারি সমালোচনার মানদণ্ডেই রবীন্দ্রগানের বিচার হচ্ছে।

এই মন্তব্য সম্পর্কে ক'বছর আগে আমি লিখিতভাবে যে উক্তি করেছিলাম এখানে তা পুনরুদ্ধৃত করছি। আমার বক্তব্য ছিল : 'রবীন্দ্রসংগীতের মর্মগ্রাহী আলোচনায় সুরের সঙ্গে বাণীর দাবিও সমান আগ্রহ জাগায় বৈকি। রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও গায়কীর আলোচনায় যদি বা মাঝারি দিয়ে কাজ চলে কিন্তু তার মর্মোদ্‌ঘাটনে, নির্মাণের অন্তলতা বোঝাতে, কাব্যের সঙ্গে তার ভাবগতমিল-অমিল নির্ধারণে লাগে অনেক বড় মেধা ও সতর্ক সৃজনবুদ্ধি'। এই কাজে বর্তমানে শঙ্খ ঘোষের মতো বড় মাপের লেখক ছাড়া আর কারুর কথা ভাবা যায় না।

দুই

রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ কেবল যে লেখালিখি করে ক্ষান্ত তা নয়, তাঁর উদ্‌যোগ এ ব্যাপারে বহুমুখী সকর্মক। এটা ঠিক যে, তাঁর আগে বিষয়টি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের তুলনায় শঙ্খ ঘোষ অনেক বেশি বিষয়টির সন্নিহিত। কিছু পরিমাণে অধ্যাপনার জীবিকাগত যোগ এবং অনুরাগী পাঠক ও ছাত্র-সমাজের সংস্পর্শে তাঁকে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে ভাবতে ও লেখনী চালাতে হয়েছে। যেমন ধরা যাক তাঁর সর্বমান্য সামাজিক ভূমিকা আর তরুণদের প্রতি প্রশ্রয় তাঁকে এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করেছে যে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এমনকি প্রচার মাধ্যম তাঁর কাছে খুব সহজে এসে নানা কাজ ও ভাবনা দাবি করে। অনেক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র তাঁদের নানা অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে যেসব নতুন বিন্যাস আনতে চেয়েছেন তার বেশির ভাগ উপদেশনা শঙ্খ ঘোষের। ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন ও রবিরঞ্জনীর মতো প্রতিষ্ঠান তাঁদের নানা অনুষ্ঠানের বিন্যাসসূত্রে ও স্মারকপত্রে তাঁদের শঙ্খবাবুকে দিয়ে অনেক লেখা লিখিয়ে নিয়েছেন। অন্যদিকে ১৯৭৮ সালে পুরো বছরটা বিশ্বভারতীর ভিজিটিং ফেলো হিসাবে তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন গানের পরিমণ্ডলে। বহু ধরনের রবীন্দ্রসংগীত শোনার যোগাযোগ, শান্তিনিকেতনের উৎসবমন্ত্রিত অবকাশ যাপনের আনন্দ এবং রবীন্দ্রভবনের লেখ্যাগারে সংরক্ষিত গানের পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের যথেচ্ছ সুযোগ তাকে অনবরত সমৃদ্ধ করেছে। গানের তথ্য বিষয়ে তাঁর বহুদিনের কৌতূহল ও স্মৃতি সেখানে আরেকবার চাঙ্গা করে নিতে পেরেছেন। পরে রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষতার কাজে গানের বিষয়ে নতুন সাংগঠনিক ভাবনা নিশ্চয়ই তাঁকে উদ্বোধিত করেছে। এর বাইরে সংগীত শিল্পীদের দীর্ঘবাদন রেকর্ডের পরিচয়লিপি লেখার সুবাদেও এই গানের সম্পর্কে বেশ কিছু দীপ্ত মন্তব্য উচ্চকিত হয়ে ওঠে। এ রকম দুটি নমুনা :

> কথা যেখানে শেষ হয়ে আসে, আলোর সেখানে শুরু।
>
> রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের পৌঁছে দেয় সেই আলোর কাছে, যেখানে পৌঁছলে শ্রোতারও শরীর হয়ে ওঠে স্বরময়। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেবার জন্য চাই কণ্ঠস্বরের নিজস্ব এক ব্যক্তিত্ব, অল্প গানেই যা মেলে। বহু-শ্রুতিতে যা অবসন্ন হয়ে আসে, যার মর্ম আর পৌঁছতে চায় না আমাদের মনে, ব্যক্তিত্বময় কোনো স্বরের প্রভাবে হঠাৎ তা হয়ে ওঠে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা, চেনা গানও তখন ফিরে আসে অচেনা এক দ্যুতি নিয়ে। গায়ক বা গায়িকার সুরবোধ আর বেদনাবোধ যখন একান্ত হয়ে মিলে যায় কোথাও, কেবল তখনই দেখা দিতে পারে সেই দ্যুতি।

গীতা ঘটকের গানের পরিচিতি দিতে গিয়ে তিনি গানের একটা সত্য, যা গায়ন নির্ভর, তাকে ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর গদ্য ভাবনার অন্তস্তর এক বাতায়ন আমাদের সামনে একেবারে ভিন্ন বিশ্লেষণে খুলে যায়, যখন পড়ি 'একটি রক্তিম মরীচিকা' দীর্ঘবাদন রেকর্ডের পরিচয়-লিপি। তাতে রবীন্দ্রকাব্য ও গানের আড়াল কোন্ গহনলোকে এক হয়ে যায়, মরমী দৃক্‌পাতে জাগে কেমনভাবে কোনো বিশেষ ছবির স্মৃতি তা ব্যক্ত হয় এইভাবে :

> রবীন্দ্রনাথ একবার এঁকেছিলেন দুহাত-তুলে-ধরা এক নারীর ছবি, যার দুপাশ ঘিরে যেন নেচে উঠছে অবিরাম আগুনের হলকা। ধরতে চাওয়া আর ধরতে না-পারার চিরন্তন এক রক্তিম বেদনা যেন জেগে উঠছে ওই ছবিটিতে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কারও হঠাৎ মনে পড়তে পারে 'সানাই' বইটি (১৯৪০) থেকে পাওয়া এক শব্দগুচ্ছ, ছবিটির নাম দিতে ইচ্ছে করে : একটি রক্তিম মরীচিকা।

এখানে বলতেই হবে 'কারও হঠাৎ মনে পড়তে পারে' এমন গৌরববচনটি নিতান্ত তাঁর বিনয়। এটা বিশিষ্টভাবে শঙ্খ ঘোষের মৌলিক অনুধ্যানের অন্তর্গত, তার কোনো শরিক নেই, বড়জোর আছে চমকিত পাঠকের মুগ্ধ বিস্ময়। মুগ্ধতা বাড়ে যখন মন্তব্যের বিস্তারে পড়ি :

> বা, উলটো করে বলা যায়, 'সানাই'তে কয়েকটি কবিতা আছে গানের খুব কাছাকাছি, সেগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে নিলে কারও হয়তো মনে পড়তে পারে ছবিটির কথা।

এখানে 'কারও' বলতে বিশিষ্টভাবে তাঁকেই বুঝতে হবে আমাদের। কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর গানের কোনো সূক্ষ্ম সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথেরই একটি বিশেষ ছবি মনে পড়ার মানসিক প্রক্রিয়া বা প্রবণতা কিংবা অধিকার কি সকলের থাকতে পারে ? তার জন্যে অনেকদিনের প্রস্তুতি এবং রবীন্দ্রনাথের কলারূপের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আত্মস্থ উপলব্ধির অবকাশ চাই। বোধের সেই বিমিশ্র ভাবনা পেরিয়ে তবে 'সানাই'য়ের কবিতা ও গান বিষয়ে বলা যায় এইরকম কথা যে,

> শব্দ বাহুল্যহীন ছোটো সেই রচনাগুলি যেন জ্বলে যাচ্ছে গূঢ় এক বাসনার তাপে, অপসৃত অতীতের এক প্রগাঢ় শোচনায়। প্রণয়স্মৃতি যে রবীন্দ্র-রচনায় এই প্রথম এল এমন নয়, কিন্তু সেই স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো অকৃতার্থতার বেদনা আর কখনো এমন করে ঘিরে ধরেনি তাঁকে, এইখানে যেমন।...আবার ওরই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, অপস্রিয়মাণ এই প্রণয়ের স্মৃতিতে বা বাসনার এই দাহকে তিনি উত্তীর্ণ করে নেন এক প্রশমতায়, আত্মলোকে, ঊর্ধ্বমুখে।

ত্রিপর্বে সাজিয়ে যে-বক্তব্য আমি হাজির করলাম তার মধ্যে অভিনবত্ব আছে বিশ্লেষণে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে দীর্ঘবাদন রেকর্ড বিপণনের

বাণিজ্যিক আয়োজন ১৯৬১ সাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু রেকর্ডে গান-কবিতার এমন বিন্যাস এবং ভাষ্য আগে আমরা পাইনি। শঙ্খ ঘোষ এই রেকর্ডের পরিসরে নিজস্ব বিন্যাসের যে-ছক সাজিয়ে নিয়েছেন এবং রেকর্ডের কভারে দুই হাত তোলা নারীর ছবিটি অধিক বর্ণসম্পাতে সন্নিবিষ্ট করেছেন, তাতে বোঝা যায় এটা নিছক এক বিনোদনের গীতি আয়োজন নয়, তাঁর মনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করাবার কোনো বিশেষ আবেগ ও ক্রিয়াপরতা। তার গান-কবিতা-ছবির অচ্ছেদ্য অন্যোন্য সম্পর্ককে বোঝানোও শঙ্খ-র একটা স্বারোপিত দায়িত্ব। এই জাতীয় বড়ো মাপের তৎপরতায় তিনি পথিকৃৎ কিন্তু নিঃসঙ্গ, কারণ তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের রবীন্দ্রচর্চা বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাধনা অন্য পথে ঘুরে গেছে। তা হয়ে গেছে অনেকটাই ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক। অনুজদের সম্পর্কে তাঁর বেদনা আর ক্ষোভ জেগেছে। তাদের মনে হচ্ছে 'সর্বজ্ঞ, আত্মসম্পূর্ণ, প্রশ্নহীন'। 'জর্নাল' বইয়ে উল্লেখ করছেন :

> দুঃখ করলেন শৈলজারঞ্জন এবারকার শান্তিনিকেতন নিয়ে। কমাসের দায় নিয়ে আছেন এখানে, শেখাতে যান সকালে তিনদিন, বিকেলে তিনদিন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে নিয়মিত আসে এমন নয়। কোনোদিন হয়তো ভরে গেল সব, কোনোদিন ফাঁকা। উনি বলছেন, আর আচমকা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে 'বিসর্জন'-এর লাইন, একটু ভিন্ন অর্থে : 'জানো কি একেলা কারে বলে ?···দিতে চাই নিতে কেহ নাই।' একদিন না কি তবলা বাজাতে বলেছিলেন একজনকে, মুখের ওপর 'না' ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল সে!

কারুর চাহিদায় বা অনুষ্ঠানের উপলক্ষে কথাগুলি লেখেননি জার্নাল লেখক। এ তাঁর একলা মনের কোনো মুহূর্তের ভাবনা, তবু তাতে থেকে গেছে অনভিব্যক্ত ক্ষোভ আর অভিমান। শুধু তো রবীন্দ্রনাথের গানের সমাদরের প্রশ্ন নয়, এটা তাঁর সামাজিক ভাবনার অঙ্গ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো শ্রী ও শমতাপূর্ণ একটা সামগ্রী যা কোনো জাতির বিরলতম অর্জন, তার সম্পর্কে, উপেক্ষা বা অর্ধমনোযোগের হেলাফেলা তাঁকে ভাবিত করে। মন্তব্যের গভীরে রয়ে গেছে শোচনার অনুভব তা মানুষটিকে বুঝিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর সর্বাঙ্গীণ জীবনের অঙ্গ।

'জার্নাল'-এর আরেকটা ছোট লেখায় ঝলকে উঠেছে শঙ্খ ঘোষের আরেক-রকম বিশ্লেষণ। একদিন শান্তিনিকেতনে তাঁর দাওয়ায় বসে শান্তিদেব বলেছিলেন, দু'হাজার গানের মধ্যে 'গুরুদেব' দুঃখের গান লেখেননি বললেই চলে। আশ-পাশের সকলেই যেন কথাটায় সায় দিলেন। জার্নাল লেখকের মনে পড়ে আইয়ুবও যেন এমন মতই পোষণ করতেন। তাঁর মত ছিল : রবীন্দ্রনাথের গানে আনন্দের কথাই বেশি, দুঃখ আছে কম।

এই প্রায় সর্বস্বীকৃত ধারণার বিরুদ্ধে অন্য মত পোষণ করে শঙ্খ ঘোষ যে-অনবদ্য-বোধ ও মননের পরিচয় রেখেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য। বলেছেন :

> 'দুঃখ' শব্দটার ব্যবহার আর তাৎপর্য নিয়ে বোধহয় একটা ভুল ধারণা তৈরি হয় অনেকের মনে। এক হিসেবে এই তথ্য তো অস্বীকার করা শক্ত যে রবীন্দ্রনাথ দুঃখেরই উচ্চারণ করতে চান সবচেয়ে বেশি, পরিসংখ্যানেই তো প্রতিপন্ন করা যায় সেটা। কিন্তু তবু যে এঁদের এভাবে বলতে ইচ্ছে করে, তার কারণ হয়তো এই যে দুঃখের পথ আর দুঃখের পরিণামটাকে (কিংবা বলা যাক, দুঃখপরিণাম) এরা একাকার করে নেন ভাবনার মধ্যে। দুঃখ রবীন্দ্রনাথের পথ, কিন্তু আনন্দ তাঁর পরিণাম। দুঃখ হলো যা বাধা, যা অতিক্রম করে যাবার ; যা অপরিহার্য, কিন্তু অলঙ্ঘ্য নয়। আর অলঙ্ঘ্য যে নয়, এই বোধটাই মানবিক আনন্দের। এটাই শক্তির।
> এভাবেই যদি দেখেন সবাই, তাহলেই আর গানের মধ্যে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে হয়না গায়কগায়িকাকে।

এ কথা বলার মানে হল, লেখক চাইছেন রবীন্দ্রসংগীতের অন্তঃশীল যে-শক্তির বোধ তা তেমন করে না জানলে গায়নটা ঠিক হবে না। দুঃখের গান ইনিয়ে-বিনিয়ে না গেয়ে গাইতে হবে অন্তরের বিশ্বাস থেকে। রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক গায়িকাকে তিনি এমন মননপূর্ণ ভূমিকায় ভাবতে চান। যে-গায়নে ফুটে উঠবে এমনতর সত্য যে দুঃখকে আত্মস্থ করার মধ্যেই আছে তেজ।

এই রকম নানা লেখায় তিনি নবীন অনুভবকে ব্যক্ত করেন যাতে উন্মীলিত হয়ে থাকে তাঁর রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠের বহুস্তর আত্মস্থতা। গানকে কবিতা বা ছবির সংলগ্ন করে দেখা নয় শুধু, উপন্যাসের সঙ্গেও মিলিয়ে দেখা তাঁর একটা মৌলিক দিক। চতুরঙ্গের সমকালে লেখা হচ্ছিল গীতালির গানগুলি, এ খবর আমাদের আগে খেয়াল হয়নি। শচীশের আত্মসন্ধান ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গীতাক্ষ্য রবীন্দ্ররচনার সমলগ্নতা আবিষ্কার শঙ্খ ঘোষের অন্তর্দৃষ্টির আশ্চর্য দ্যোতনায় উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে কতজনই তো মাথা ঘামিয়েছেন, এমনকি ধূর্জটি-প্রসাদ পর্যন্ত, কিন্তু নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালার কেন্দ্রস্থলে তাঁর গানকে রেখে রবীন্দ্রদৃষ্টির অভিনব বিভা শঙ্খর আগে কেউ দেখাননি।

নানা বইতে ছড়িয়ে থাকা শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রসংগীতস্পর্শী রচনাগুলির বাইরে শুধু সেই গান নিয়ে একটা আলাদা বিন্যাসের নতুন রকমের বই 'এ আমির আবরণ'। নিশ্চয়ই একটানে নিবন্ধগুলি লেখা নয়, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে কখনও আত্মপ্রেরণায় কখনও অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গে বা অন্যের চাহিদায় রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এগুলি লিখে দুই মলাটের বন্ধনে বেঁধে দেন। ঘোষণা করেন ভূমিকায় : 'রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। গানের সুর নয়, এ-লেখাগুলির প্রধান লক্ষ্য হলো গানের কথা'।

একথা ঠিক যে কবিতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ গানের দিকে এগোচ্ছিলেন, কবিতার ছন্দ থেকে গানের তালের ফাঁক বুঝে কিংবা হয়ত ছন্দোময়তা থেকে

গদ্যের দিকে। কিন্তু ছন্দ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চলার একটা আলাদা গতিপথ এই প্রথম সবিস্তারে পরতে পরতে উদাহরণের মালা গেঁথে আমরা পেলাম। 'এ আমির আবরণ' অবশ্য স্মরণীয় অন্য কারণে। এই প্রথম একজন কবির চোখে, আধুনিক কবির চোখে, রবীন্দ্রসংগীতের ভাবজগৎ ও তার নানা নিগূঢ় স্তর বিশ্লেষিত হল।

যেমন ধরা যাক 'যোগাযোগ' উপন্যাসে গানের বা সুরের ভূমিকা কোন্ ব্যঞ্জনা বয়ে আনছে সেটা জানিয়ে শঙ্খ বলেন: 'এ উপন্যাসে যখনই সুরের কথা গানের কথা আসে, তখনই তার সঙ্গে আতত হয়ে আসে এক ধর্মেরও কথা। মীরার ভজন অথবা গীতার শ্লোক ভাবতে হয় কুমুর নিজেকে সংহত করে নেবার মুহূর্তগুলিতে, গানের মধ্য দিয়ে তার মুখে এসে লাগে এক অধ্যাত্ম বিভা। যখনই সে বাজায় বা গায়, তার মনে হয় সমস্ত জীবন যেন ভরে গেল এক আলোয়; সেখানে সাংসারিক দুঃখ অপমানের জায়গা নেই কোনো।' নাটক বা চলচ্চিত্রে গান ব্যবহারের কতরকম যুক্তি ও প্রয়োগগত নাট্যিক কারণ আমরা শুনেছি, পড়েছি অডেনের লেখায়। কিন্তু চরিত্রের অন্তর্বর্তী সত্তাকে বোঝাতে গানের প্রয়োগ বা যন্ত্রে সুর বাজানোর মধ্যে আত্মসত্তার আস্বাদন কিংবা আত্মধর্মের সন্নিবেশ রবীন্দ্রনাটকের আগে বা পরে বাঙালি কোনো নাট্যকার ভাবতে পারেননি। 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের মতো গানের ভুবন একটু অন্য রকম সেটা এতদিন কেউ বুঝতে পারেননি। মধুসূদন ও কুমু—অসম দুই পুরুষ-নারীর বিবাহ, যোগাযোগহীনতায় ও অপ্রেমে টলমল করে। বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলে কুমু এসরাজে ভূপালি বাজায়, কুমারীজীবনের চিরসঙ্গী দাদা বিপ্রদাসের সঙ্গে বিচ্ছেদমুহূর্তে কুমু বাজায় কানাড়া-মালকোষের আলাপ। এইভাবে বিবাহিত দিনযাপনের ফাঁকেফোকরে কেবলই আসে কুমুর কণ্ঠে গান কিংবা যন্ত্রে ওঠে সুর। তাতে এমনকি গানের পরিধির বাইরের মানুষ মধুসূদন উজিয়ে ওঠে। স্বামীর ঘর থেকে দাদার কাছে এলে বিপ্রদাস কুমুর কাছে যন্ত্রবাদ্য শুনতে চায়। কুমুর ফিরে যাবার দিনে বিপ্রদাস বলে, 'নে যন্ত্রটা, আমরা দুজনে মিলে বাজাই'। ভৈরোঁ রাগিণীতে আলাপ হয়ে ওঠে যুগলবন্দী। এই পর্যন্ত বিবরণ দিয়ে লেখক বলে ওঠেন, একেবারে আমাদের অভিভূত করে, 'এই এসরাজও হয়ে ওঠে 'যোগাযোগে'র এক চরিত্র'। পরে বোঝাতে চান গান যেমন কুমুর জীবনে পূজা ও প্রেমের সেতু, রবীন্দ্রনাথের গানেও তেমনি আছে গানবিষয়ে একরকমের গান (অমিয় চক্রবর্তী যে গানগুলিকে প্রথম শনাক্ত করেছিলেন 'গানের গান' বলে) যা পূজা ও প্রেমপর্যায়ের সূচনায় 'গীতবিতান'-এ সন্নিবেশ করে রবীন্দ্রনাথ বাঁধতে চেয়েছিলেন সেতু।

'নির্মাণ আর সৃষ্টি' বইয়ের প্রথম অধ্যায় 'আমি'। সেখানে শঙ্খ ঘোষ আমি-র সংকট, সংজ্ঞা প্রসঙ্গ তুলেছেন 'গীতিমাল্য' রচনার সমসময়ে ক্ষিতিমোহনের

সাক্ষ্যে। যেখানে বলা হয়েছে : 'গুরুদেবের মন পূর্ণ! শান্তিনিকেতনের সন্ধ্যার আসরে বললেন, নিজের গান আর গাইতে পেরেছি কবে। প্রথম যুগে বড়োদের অনুরোধে গান বেঁধেছি সমাজের জন্য। রচনা করেছি সামাজিক, পারিবারিক অনুষ্ঠানের গান।' এর পরে লেখকের মন্তব্য : 'শুনে মনে হয়, যৌবনে লেখা গানগুলি নিয়ে কোথাও একটা অতৃপ্তি জমেছিল তাঁর মনে, একে তাঁর মনে হচ্ছিল না ঠিক নিজের গান।'

'নিজের গান' খুঁজে পাবার আকুতি বা অন্বেষণ আমাদের দেশের গীতিকারদের পক্ষে একটা নতুন কথা। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের অর্ধাংশ গড়ে উঠেছিল মঞ্চের চাহিদায়, নাট্যচরিত্রের মুখে ভাষা দেবার জন্য বা বিনোদনের বিলাসে। কিন্তু তবু, 'ওই মহাসিন্ধুর ওপর থেকে' কিংবা 'নীলআকাশের অসীম ছেয়ে' নাট্যান্তর্গত গান হয়েও দ্বিজেন্দ্রলালেরও নিজের গান। তাঁর ভক্তিব্যাকুল শেষবয়সের (প্রথম বয়সে ছিলেন ঘোর নাস্তিক) আর্তি ও আত্মনিবেদন গানদুটিতে ফুটে উঠেছে গভীর ঘন সুরের চলন ও বাণীর সরলতায়। অতুলপ্রসাদের সব গানই আমিত্বময় কিন্তু সে-আমি হল জগৎসংসারে ঘা-খাওয়া আমি, অপ্রেমের আমি। তাতে খেদ ও আত্মপরিবাদের শেষ নেই এবং অবশেষে আছে শোচনা ও আত্মদহনের শান্ততা। রজনীকান্তের গানে নিজেকে নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তিনি আদৌ পাপী ও পাতকী এই বোধ তাঁর সর্বত্র কিন্তু সেইজন্যই পরমেশ্বরের শুশ্রূষা তিনি পাবেনই— এমন একটা অনুভবের নিশ্চিন্ততা তাঁর গানে পরিব্যাপ্ত। জীবন যাঁর তৃষিত মরু, মরণোত্তর ঈশ্বরপ্রাপ্তি যাঁর কাছে রসাল নন্দন, তাঁর গানে আর যাই থাক, আত্ম-সংকট বা আমি-র অন্বেষণ থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের গানে সেটাই মৌল সন্ধান। শঙ্খ ঘোষ সিদ্ধান্ত করেছেন : 'রচনার মুহূর্তেই যখন 'গীতিমাল্য'র গান-বিষয়ে বলতে চান তিনি "নিজের গান", সে কথার তাৎপর্য আরো গভীর বলে মনে হয় যেন। অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এইখানে এসে,'গীতাঞ্জলি'র এই পর্বে পৌঁছে, রবীন্দ্রনাথ যেন পেয়ে গেলেন তাঁর গানের একেবারে নিজস্ব পরিণত মণ্ডল, রূপে আর ভাবে ; এইখানে এসে তাঁকে বুঝে নিতে হলো তাঁর আত্মপরিচয়ের বলয় আর কেন্দ্র, গানেরই মধ্য দিয়ে। এইখানে আছে তাঁর "নিজের গান", কেননা এখানে গানের বিষয় হিসেবে আসে না ব্রহ্মোপাসনা বা প্রেম, আসে না প্রকৃতি অথবা সমাজ, এইখানে তাঁর গানের বিষয় হয়ে আসে কেবলই তাঁর "আমি", অন্য সবই এখানে থাকে শুধু অনুষঙ্গের মতো ছড়ানো।'

হয়ত এমন মন্তব্য থেকে আমাদের সামনে রবীন্দ্রজীবনের একটা ধরতাই মেলে। গানের মধ্যে দিয়ে আত্মতার বিকাশকে দেখানো, আত্ম আবরণ ছিন্ন করার প্রবলতা এবং আত্মসংকট থেকে পরম উন্মীলনে নিজের ব্যাপ্তির আনন্দ। 'উর্বশীর হাসি' বইতে শঙ্খ ঘোষ বহুউদ্ধৃত একটা রবীন্দ্র উক্তি ব্যবহার করে তাকে নতুন তথ্যের আলোকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে যাঁরা

লিখেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁর এ-উক্তি ব্যবহারও করেছেন যে,'প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশাকরি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য'। উক্তিটি যাঁরা ব্যবহার করেছেন তাঁরা সকলেই ধরে নিয়েছেন 'পরিণত বয়স' বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন তাঁর শেষ বয়সকে, বুঝি বা ষাট-সত্তর বয়সকে। শঙ্খ ঘোষ প্রথম লক্ষ করলেন এই মন্তব্যের পরে 'রূপ দেবার' গান হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ গানের উদাহরণ দিয়েছেন সেটি 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন'। এ' তো পরিণত বয়সের গান নয়। লেখকের সপ্রতিভ ভাষ্য ; 'যদি আমাদের জানা থাকে যে, ওই গান লিখেছিলেন তিনি মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে, তাহলে বুঝতে পারি তাঁর মন্তব্যটিতে "পরিণত বয়স" কথাটার তাৎপর্য কোথায় গিয়ে পৌঁছয়।'

পরিণত বয়স বলতে আমরা যে যাপনের পরিণত রূপ ভাবি সেটা ভুল, অন্তত রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। দিন মাস বছরের গড়পড়তা হিসাবে কি তাঁর পরিণতি, নাকি নিজেকে নির্মাণ করার মধ্যে দিয়ে, আত্মবিরোধ ও আত্ম-সংকটের এক একটা স্তর পেরোনো পরিণতি, কোন্‌টা ধরব আমরা? শঙ্খ এ-প্রসঙ্গে নির্ভুল দিশা দেখিয়ে এবারে প্রতিষ্ঠা করলেন এই তত্ত্ব যে, রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর আত্ম আস্বাদনের ও প্রকাশের সবচেয়ে সত্য অভিব্যক্তি। এতে কোনো ছল বা আড়াল নেই। এরপরে ক্রমিকভাবে শঙ্খ ঘোষ তাঁর নিজের অপরূপ গদ্যে লিখে যান :

১. রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের নিয়ে যায় প্রতিদিনের বাইরে···এক অদীন ভুবনে, আমাদের নিবিড়তম সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের গান।
২. রবীন্দ্রনাথের গানও···এক মস্ত প্রাকৃতিক নির্ঝরিণী যেন, তার সামনে দাঁড়ালে বস্তুর সব ভার হাল্‌কা হয়ে যায় হঠাৎ, সরে যায় আমাদের সমস্ত মিথ্যে, সরে যায় সাজিয়ে কথা-বলার সংসার।
৩. রবীন্দ্রনাথের গান নিজেকে রচনা করে তুলবার গান। এ এক বিরামহীন আত্মজাগরণের আত্মদীক্ষার গান : অন্তত সেইখানে সে আমার কাছে ভালো।
৪. 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার', এখানে, এই 'গান' শব্দটি, ঠিক চলিত অর্থে যাকে আমরা সুরে-বসানো-কথা বলে জানি, তা নয় আর। এই 'গান' এখানে কবিতারই অন্য এক নাম, তাঁর শিল্পেরই অন্য এক নাম।
৫. গীতশিল্পী বলেন, গান শুনবার, পড়বার নয়। স্রষ্টা নিজেও আমাদের সতর্ক করে দেন বারেবারে, তাঁর এ-রচনা শুনবার জন্য, পড়বার জন্য নয়। গীতসুধার জন্য পিপাসিত চিত্ত সে-কথা মেনেও নেয় ভিতরে-ভিতরে।

> কিন্তু তবু আমরা, যারা সবসময়েই গান শুনবার সুযোগ পাব না হয়তো, অন্তত মনের মতো গান, আমাদের মনে পড়বে যে দ্বিতীয় সংস্করণ 'গীতবিতান'কে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর নতুন একটি কাব্য হিসেবেই, 'গীতবিতান' পড়তেও চাইব আমরা, সমান উৎসাহে।

শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত-বীক্ষার এটাই একটা আসল কথা যে সেই গান তাঁর কাছে প্রতিদিনের কোনো অর্চনার মতো, তাকে ঘিরে গড়ে তোলা যায় নিজেকে। নিজের প্রশ্নাতুর অস্তিত্বের নানা সংকট ও যাপনগত বিভঙ্গে দেওয়া-নেওয়া চলতে পারে রবীন্দ্রগীতির সমবায়ে। সুর না থাকলেও খুব ক্ষতি নেই, গায়ক-গায়িকা অপ্রতুল হলেও সে-গান চলবে, চলতে থাকবে, নিভৃত পাঠক ও আত্মময় গানের মধ্যে ঘটে যাবে এক গোপন সম্মিলন।

তিন

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু হয়েছিল এই লেখা, শেষ হোক সেইভাবে। দুটি ঘটনা মনে পড়ছে। বেশ ক'বছর আগে একদিন সন্ধ্যাবেলায় শঙ্খদার আগ্রহে ও আমন্ত্রণে তাঁর ঘরে গান শোনাতে গিয়েছিলাম। উনি ডেকেছিলেন অন্তরঙ্গ কজনকে। গান গাইছি, টেপ হচ্ছে। শ্রোতাদের মধ্যে আছেন আরও অনেকের মতো পারিবারিক পরিচারিকাও। দ্বিজেন্দ্রলালের একটা হাসির গান শুনে সবাই হাসলেন, কিন্তু ঠোঁট চেপে, কেননা টেপ চলছে। কাজের মেয়েটা কিন্তু হেসে উঠল হো হো করে; সেই উচ্চকিত হাসির রোল উঠে গেল টেপ-এ। গানের শেষে রুষ্ট শ্রোতা একজন বললেন : 'হাসলে কেন অমন করে?' তার অপ্রতিভ অবস্থা। শঙ্খদা বলে উঠলেন : 'হাসবেই তো। হাসির গানে হাসবে না? টেপ-এ ঐ হাসিটাও তো থাকবে।'

দ্বিতীয় ঘটনা বছর পাঁচেক আগেকার। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে অধ্যক্ষতার কালে শঙ্খদা একবার ডাকলেন উদয়ন ঘরে দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্পর্কে ভাষণ দিতে। প্রায় দু-ঘণ্টার অনুষ্ঠান হল। সভানেত্রী ছিলেন নীলিমা সেন। শ্রোতৃমণ্ডলীতে ছিলেন বিশ্বভারতীর বহু গুণজ্ঞ মানুষ, ছাত্রছাত্রী, সংগীত-ভবনের সুররসিকরা, প্রবীণ আশ্রমিকদের অনেকে। সবাই জানেন রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের তিক্ত অস্বস্তিকর ইতিহাস। সুবিদিত শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রানুরাগীদের দ্বিজেন্দ্র বিদ্বেষ। তবু সেই শান্তিনিকেতনেই দ্বিজেন্দ্র প্রসঙ্গ? শঙ্খদার সেটাই সঠিক মনে হয়েছিল। ঐখানেই তো হবে দ্বিজেন্দ্র প্রসঙ্গ। বিরোধ-বিদ্বেষের ক্ষণতাপ আজকে আর প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে না। তাঁদের দুজনের একটা তো সখ্যেরও ইতিহাস ছিল! তাই উদয়ন ঘরে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ধ্বনি জেগে

উঠল আমার ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। গানের পর গান গাইতে গাইতে মনে পড়ছিল, এখানে এই শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাতেন, দিলীপকুমার ছিলেন কবির স্নেহভাজন, দিনু ঠাকুর গাইতেন দ্বিজ-রায়ের হাসির গান। কতদিন পরে আবার বদলাল পটভূমি। ছিন্ন হল ভুল বোঝাবুঝির আবরণ। শঙ্খদার প্রয়াসে সেটা হতে পারল, কারণ তিনি আসলে গানেরই রসজ্ঞ। গান তাঁকে দেখায় অম্লান অমলিন আলোকরেখা। রবীন্দ্রনাথের গান একান্তভাবে তিনি ভালবাসেন বলেই রবীন্দ্র সমকালের সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পোজারকেও তাঁর জানা চাই, জানানো চাই সকলকে ডেকে। ব্যক্তি বিরোধের ইতিহাস মুছে গিয়ে গানই সেদিন জয়ী হল। অথচ এতবড় কর্মকাণ্ডটি যাঁর উদ্যমে ঘটতে পারল সেই শঙ্খদা সারাক্ষণ বসে থাকলেন শ্রোতাদের একেবারে শেষ পঙ্‌ক্তিতে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

অমিয় দেব

ঐতিহ্যের বিস্তার

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নাকি একবার বলেছিলেন যে বাংলায় লেখা মানেই ঐতিহ্য-পালন কারণ ঐতিহ্যের মূল আকর ভাষা। ভাষাই ঐতিহ্যের মূল আকর কিনা অর্থাৎ ঐতিহ্যের ঠিক বাস কোথায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, এমনকি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত বিস্মৃতিতে ঐতিহ্যের অবলোপ ঘটতে পারে কিনা সে-প্রশ্নও অবান্তর নয়; কিন্তু ঐতিহ্যের পরিধি বোধ করি অনুমেয়। আধুনিকতা বলতে সুধীন্দ্রনাথদের সময়ে যা বোঝাতো তার সঙ্গে ঐতিহ্যের একটা বিরোধ ছিলো বলেই হয়তো সুধীন্দ্রনাথ অমন কথা বলেছিলেন। এই সেদিনও সমাজবিদ্যার অঙ্গনে-অঙ্গনে ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা নিয়ে আমরা তর্ক করেছি যদিও তার মাত্রা কোথাও-কোথাও পাল্টে গিয়ে এখন হয়েছে প্রবাহ বনাম পরিবর্তন। এমনকি ঐতিহ্য-ভাবুক এলিয়টও এক প্রবাহের রূপক ব্যবহার করেছিলেন এবং আমরা যারা এলিয়ট পড়ে অর্ধমানুষ হয়েছি তাদের অনেকের কাছেই প্রবাহ ও ঐতিহ্য তুল্যমূল্য। সময় যে দাঁড়িয়ে থাকে না তা আমাদের এই দরিদ্র দেশকেও বুঝিয়ে বলতে হয় না।—এই সেদিন ছিলাম সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের, আজ হ'তে চলেছি মুক্ত বিপণন-পন্থী, যদিও জগৎ জোড়াই এক ঐতিহ্যসংকীর্ণতাও আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর ইতিহাস যাঁদের কাছে নিপাট পূর্ব-পর তাঁরা কখনো-কখনো এই সংকীর্ণতার সঙ্গেই গুলিয়ে ফেলেন সর্বৈব ঐতিহ্যভাবনাকে—মাটি শুনলেই তাঁরা কেবল হাইডেগার শোনেন না, বাঙালি উত্তর-আধুনিকদের সচেতন ও সদম্ভ স্বাদেশিকতাতেও তাঁরা ভূত দেখেন। ভূত সব ভাবনাতেই হয়তো আছে এবং তা ঝাড়তে-ঝাড়তে এগিয়ে চলার অন্য নামই হয়তো প্রগতি। তাই ঐতিহ্যব্যতিরেকে যেমন বর্তমান অচল তেমনি ঐতিহ্যসম্বল বর্তমানও অচল। না অতি-আধুনিকতা না অনাধুনিকতা—এদুয়ের কোনোটাই নয় শিরোধার্য।

কিন্তু যাঁর ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষে আমার এই এলোমেলো অনুকথন তাঁর কাছে ঐতিহ্য নয় স্বভাষায় ও স্বদেশে সীমাবদ্ধ, তাঁর কাছে ঐতিহ্য এক বিস্তারও। অর্থাৎ আমাদের অবস্থান কেবল আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বসূরীদের সঙ্গেই গ্রথিত নয়—কেবল কুলপঞ্জি ঘাঁটলেই ঐতিহ্য নিরূপণ হ'য়ে যায় না, তার জন্যে চাই এক ব্যাপক সদর্শন। এলিয়ট অনুবাদ করে এক ভিন্নধর্মের ভিন্নদেশী যেশোখুড়োর কথা জানতে

চেয়েছিলেন বিষ্ণু দে, যেমন মালার্মের কাব্যাদর্শ প্রচারে সুধীন্দ্রনাথের মতে স্বল্পভাষীও ছিলেন অকুণ্ঠ, আর বয়স্ক বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিলো বোদলেয়ার বা রিল্‌কে বা হোল্ডার্লিন পড়া আমাদের কর্তব্য। প্রথাকথিত তিরিশের কবিদের এই বিস্তারবোধের উদাহরণ আরো দেওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গোত্তর ভারত বিষয়ে তাঁরা কতটা সচেতন ছিলেন? হ্যাঁ, একটা স্তরে তো ছিলেনই, তবে তা বঙ্গ-সমন্বিত তথা প্রাচীন ভারত বিষয়ে। বুদ্ধদেব বসু যুগপৎ বোদলেয়ার ও 'মেঘদূত' অনুবাদক এবং কেউ-কেউ বলবেন 'মহাভারতের কথা' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। সুধীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গদ্যের ইংরেজি-সংস্কৃতের সম্ভাব্য বর্ণসংকরতা বিষয়ে সজাগ ছিলেন। এবং বিষ্ণুদের অন্ধকারবোধ পর্যায়ের এক প্রধান কবিতার মূলে আছে এক ঋগ্বেদীয় স্তোত্র। সেইসঙ্গেই অবশ্য বিষ্ণু দে সাঁওতাল কবিতারও গুণগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু না সুধীন্দ্রনাথ না বুদ্ধদেব বসু ছিলেন অনুরূপ লোকায়তে সমুৎসুক। একমাত্র অমিয় চক্রবর্তীই কয়েকজন আধুনিক ভারতীয়ের কথা শুনিয়ে গেছেন। তিরিশের আত্মানুসন্ধান করলে হয়তো আরো কিছু মিলবে, কিন্তু তৎকালীন মননের এই সীমাবদ্ধতা বোধকরি অকাট্য। এবং অকাট্য নিশ্চয়ই এর কারণও যদিও বঙ্গোত্তর ভারতে এ-নিয়ে আমাদের মাঝে-মাঝে কথাও শুনতে হয়। তিরিশের আধুনিকতা বিষয়ে যে-প্রশ্ন এখন জমা হয়ে উঠছে তার একটি হয়তো এটিও।

তবে প্রশ্নেরও প্রশ্ন থাকতে পারে। যে-হীনম্মন্যতায়, ধরা যাক, এই পশ্চিমমুখী আত্যন্তিকতার জন্ম এবং যার ফলেই হয়তো-বা অন্য ভারতীয় সাহিত্যে এমন অনাগ্রহ তার বিচার কি নীতির দরবারে না ইতিহাসের অঙ্গনে? যেন এমন হলো যে কুমারণ আশান বিষয়ে কিছুই জানলেন না আমাদের আধুনিকেরা এবং ইকবাল বিষয়ে যা জানলেনও বা তা ঐ 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' বা তদতিক্রান্ত কিছু আপ্তবাক্য? অথচ এমন নয় যে অনুবাদ পাঠে তাঁদের অনীহা ছিলো; তা যদি থাকতো তাহলে তাঁরা নিজেরাও অনুবাদ পাঠ রচনা করতেন না। এমন হতে পারে মলয়ালম বা উর্দু-ফার্সি থেকে তেমন অনুবাদ তখনো হয়নি। কিন্তু অনুবাদ তো খানিক হয় সম্ভাব্য অনুবাদ পাঠকের গরজে। আশান বা ইকবাল বিষয়ে বাঙালি আধুনিকেরা কৌতূহলী, জানতে চাইছেন তাঁদের জগৎ কেমন, কতটা সম বা ভিন্ন রুচির। এমন অবস্থান উৎসৃষ্ট হলে কিছু অনুবাদও হয়তো দেখা দিতো। তবে কি এই যে বাঙালি আধুনিকেরা ধরে নিয়েছিলেন কোথাও কিছু অধুনাপাঠ্য নেই অন্য ভারতীয় ভাষায়—প্রগতি সাহিত্য সম্মিলনের উত্তেজনায় যা একটু-আধটু পড়েছিলেন তা-ই যথেষ্ট? নাকি এই বলবো যে অন্য ভারতীয় ভাষার অস্তিত্ব বিষয়েই তাঁরা তেমন সজাগ ছিলেন না—মাতৃভাষার বাইরে যে-ভাষা বিষয়ে সজাগ ছিলেন তা ইংরেজি, কেউ-কেউ হয়তো সেইসঙ্গে আরো একটি-দুটি ইউরোপীয় ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে? ছাত্র ছিলেন তাঁরা প্রধানত ইংরেজির, রবীন্দ্র-

নাথের পরে যা তাঁদের চমকে দিয়েছিলো তা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য এবং মূলত তারই উদ্ বা অনুবর্তনে অন্য ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্য। কেমন যুগম তাঁদের কাছে এলিয়ট-পাউণ্ড, লরেন্স-জয়েস-ভার্জিনিয়া উল্ফ্ ইত্যাদি ইত্যাদি, কেমন যুগম মালার্মে-বোদলেয়ার-র‍্যাঁবো, রিলকে-হোল্ডার্লিন, আরাগঁ-এলুয়ার, মায়াকভ্স্কি, হামসুন-তুর্গেনিভ-দস্তয়েভস্কি-তলস্তয়, টমাস মান-কাফকা ইত্যাদি ইত্যাদি—এক মনোজাগতিক মানচিত্র যার মূলসূত্র আধুনিকতা।

পাঠক, মার্জনা করবেন, ইতিহাস বলতে গিয়ে নীতি বলে ফেলছি। বাঙালি আধুনিকদের ঐতিহ্যবিস্তারে এই একদেশদর্শিতার উৎস, আমরা সবাই জানি, উনিশ শতকে। যে-ভূত আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন মেকলে সাহেব এবং যে-ভূত আমরা ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলাম নিজেরাও, তার বোঝা যে বিশ শতকের তিনের দশকেও বইতে হবে তাতে অবাক হবার কী! অবাক হবার এইটুকুই বোধ করি যে প্রতীচ্য আধুনিকতার অনুবর্তনের পাশাপাশি কোনো প্রশ্নায়ন তেমন ঘটলো না। একেবারে যে ঘটেনি তা বলা ভুল হবে, তবে তার কোনো প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল না তা হতে পারতো যেমন অন্য ঔপনিবেশিক দেশের সাহিত্যে তেমনি অন্য ভারতীয় সাহিত্যেও আগ্রহ। আমরা যারা আধুনিক-উত্তর, সদর্থে উত্তর আধুনিক হই বা না হই, তাদের কাছে এই দুইই ক্রমে জরুরি হয়ে উঠছে। আমরা বাঙালিরা এখন জানতে চাইছি ও জানতে পারছি অন্য ভারতীয় সাহিত্যে কী ঘটে এসেছে, কী ঘটছে। সেইসঙ্গে অন্য একদা-ঔপনিবেশিক দেশের সাহিত্যেও যেখানে প্রভুর সাহিত্যাদর্শ তো বটেই, প্রভুর ভাষার আধিপত্যও এতদিন ছিলো বলবৎ এবং যেখানে কোথাও-কোথাও পুরো স্বদেশী ঐতিহ্যটাই এতদিন হয়ে রয়েছিলো আচ্ছন্ন যার পুনরুজ্জীবন এখন উপনিবেশ-উত্তর অনৌপনিবেশিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম। তার মানে এই নয় যে ক্রমবর্ধমান প্রথম বা অপস্রিয়মাণ দ্বিতীয় বিশ্বের সাহিত্য বিষয়ে আমরা আপাতত অনাগ্রহী। না, তেমন অগ্নিমান্দ্যের কথা উঠছে না, তবে রুচির নিশ্চয়ই ঘটছে পরিবর্তন। ১৮২৭-এ যাকে গ্যেটে বলেছিলেন বিশ্বসাহিত্য, এবং নিকটতর অর্থে ১৮৪৮-এ মার্ক্স্-এঙ্গেলস্, তার নূতন নূতনতর মাত্রা হচ্ছে প্রতিভাত। 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি' ব'লে আর আমরা পশ্চিমেই অঙ্গুলিনির্দেশ করবো না। আমাদের রাজনীতি এখন ভিন্ন, আমাদের বিশ্বসাহিত্যও তাই ভিন্ন।

অনেক সময়ই আমাদের খেয়াল থাকে না যে ঐতিহ্য ও ইতিহাস শব্দদুটির উৎপত্তিস্থল এক যদিও তাদের প্রচলিত অর্থ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। ঐতিহ্য বলতে আমরা বুঝি যা চ'লে এসেছে, যা আবহমান, আর ইতিহাস তা-ই যা ছিলো এবং কার্যকারণ নিবন্ধন এখনো আছে। সম্প্রতি ইতিহাস শব্দটির দ্যোতনা আরো বেড়েছে—এখন অনেকের কাছেই ইতিহাস কেবল অতীত ও অতীত-সঞ্চালিত বর্তমান নয়, ইতিহাস সেই সদাজাগ্রত পরিকাঠামোও যার দ্বারা আমাদের কর্ম

নিয়ন্ত্রিত এবং যা আমাদের সম্মিলিত কর্মকাণ্ড থেকেই ক্রমোৎপন্ন। অর্থাৎ ঐতিহ্য ও ইতিহাস শুধু পরস্পরসন্নিহিত নয়, পরস্পরসম্পৃক্তও, হয়তো বা অংশত সমার্থকও। যে-বিস্তার নিয়ে আমরা কথা বলছি তা ইতিহাসপ্রসূত—ইতিহাসই আমাদের অন্ত ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে সজাগ ক'রে তুলছে ও ইতিহাসের টানেই এখন আমরা অন্য একদা-ঔপনিবেশিক দেশের সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহলী—ইতিহাসই নির্ধারণ করে দিচ্ছে আমরা কাকে বলবো আমাদের বিশ্ব। তার মানে বিশ্বসাহিত্যের 'বিশ্ব' কোনো ইতিহাস-নিরপেক্ষ সার্বিকতা নয়, নয় কোনো স্থাবর কালোত্তীর্ণতাও—গ্যেটের ঐ ভাবীকথনের মূলে যে তাঁর ইতিহাসবোধই কাজ করছিলো তার অন্যতম প্রমাণ মার্ক্স্-এঙ্গেল্সের ইতিহাসবীক্ষায় সেই একই ভাবনার অনুরণন। রবীন্দ্রনাথ যাকে বিশ্বসাহিত্য বলেছিলেন তাও কোনো নির্গন্ধ পরম নয়—তাঁর 'বিশ্বে'র অন্ত-মেরুতে ছিলো 'গ্রাম্য'। অতএব যদি ইতিহাস আমরা মান্য করি তাহ'লে এমত বিস্তার যে ঘটে, ঘটেছে, ঘটছে তা মান্য করতেও কোনো আপত্তি থাকে না। এবং ইতিহাস-অর্থে ইতিহ-দত্ত এই বিস্তারে ঐতিহ্য-অর্থে ইতিহ-ই হয় পুষ্ট। ঐতিহ্যের এই বিস্তারবোধের জন্যে আমরা ঋণী আমাদের ষষ্টিঋদ্ধ কবি-প্রাবন্ধিকের কাছে। এলিয়টের প্রবাহ রূপকে কেবল উপনদীদের সঙ্গমে ঐতিহ্যপুষ্টির কথা বোঝা যায়, কিন্তু অনাত্মীয় বন্ধুতার-শক্রতার বৃষ্টিতেও যে পুষ্টি ঘটে তা 'বিস্তার' না মানলে বোঝা যায় না। পাঠক, আসুন, আমাদের অগ্রণী বন্ধুর কাছে এ-ঋণ আমরা স্বীকার করি।

যদি ইতিহ হয় পরম্পরাবাহিত বিধিনিষেধ, এমন ভালোমন্দবোধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, এমন অনুজ্ঞা-অবজ্ঞা যার কোনো নির্দিষ্ট উৎস নেই কিন্তু যা আমাদের চৈতন্যের অধিবাসী, যদি ইতিহ হয় আমাদের দৈনন্দিন কর্মপ্রণালীর অন্যতম নির্ণায়ক, সেই কলাকৌশল যাতে আমরা প্রতিকূল পরিবেশেও স্বস্থ থাকতে পারি, যদি ইতিহ হয় স্বভাব, তাহ'লে মানতেই হবে ইতিহ-র পুষ্টি-অপুষ্টি দুইই সম্ভব। অর্থাৎ যে-জল গড়াচ্ছে চৈতন্যপথে তা কেবল বেড়ে-বেড়েই চলছে না, ক'মে-ক'মেও চলছে—তেমন স্থিতিস্থাপকতা ভাবা অসম্ভব যাতে সব জল এসে ক্রমেই জড়ো হ'তে থাকছে। কোনটা বাড়ছে, কোনটা কমছে, কতটা বাড়ছে কতটা কমছে, কী আছে আর কী নেই বা কোনটা কী রূপ পরিগ্রহ করছে ইত্যাদি পরিমাপণ হয়তো পদ্ধতিগতভাবে হয় না, কিন্তু কেউ যদি একাদিক্রমে আনুপূর্ব সন্ধান ক'রে যান তাহ'লে একসময় এসে হয়তো একটা চেহারা মেলে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে-অর্থে সম্ভবত ঐতিহ্যপালনের কথা বলেছিলেন তা মোটেই সবিশেষ নয়, সামান্য, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু তাঁর রচনাসংগ্রহ ঘাঁটলেই দেখা যাবে তাঁর কাছে ঐতিহ্যের কী চেহারা, কতটা গ্রহণ-কতটা বর্জন-সম্পাদিত। জড়বাদের যে-মূল তাঁর গোড়ায় সেই মূলই তাঁর শেষে নয়—অনেকান্ত, জড়বাদ আর ক্ষণবাদের উৎস একান্ত ভিন্ন। তাছাড়া অমন জড়বাদ মানেই তো ভাববাদ বর্জন, তাকে

আর্তি বলি আর না-ই বলি। রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে বললেই তো ফুরিয়ে গেলো না, কোন তারাকে আমি স্বাতী-নক্ষত্র বলে জানি আর কোন তারাপুঞ্জকে উত্তরফাল্গুনী তাও তো জানতে হবে। এমনিই এক জানার নাম 'ঐতিহ্যের বিস্তার', গ্রন্থকার শঙ্খ ঘোষ। তারই পাতা খুলে আমি ব'সে আছি।

১৯৮৯-তে প্রকাশিত এই বইটিতে নিবন্ধের সংখ্যা বারো। তাদের বেশির ভাগই বছরদশেকের মধ্যে লেখা, ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৮, কেবল দুটি একটু দূরে, ১৯৬৫ ও ১৯৫৭-র। নিবন্ধক'টি পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছিলো—সে অর্থে বইটি সংকলন ; এবং সংকলন বলেই এতে একটি নিবন্ধ অন্ত একটি বই থেকেও তুলে আনা হয়েছে। বাকি এগারোটি যেমন পারস্পরিক সাযুজ্যে নতুন ক'রে পড়বার প্রয়োজন আছে, তেমনি এটিও নতুন সামীপ্যে পুনর্বিবেচ্য। এই নিবন্ধক'টি যদি একসঙ্গে ব'সে একই গ্রন্থের অধ্যায়াবলী হিশেবে লেখা হ'তো তাহলে যে-গুরুত্ব পেতো তার চাইতে সংকলন বলে কম গুরুত্ব পাচ্ছে না, কারণ নিবন্ধক'টির অন্তরালে যে ভাবনা-পরিকল্প আছে তা কোনো অংশেই কোনো অধ্যায়ক্রমে নির্মিত ভাবনা-সংকলনের চাইতে খাটো নয়। উপরন্তু এও বলা যেতে পারে যে অনুচিন্তনের ঘনতাহেতু প্রত্যেকটি নিবন্ধের একটি স্বাতন্ত্র্যও আছে যা অধ্যায়ের ক্ষেত্রে অলভ্য। এক বনাম বহুর তর্ক হয়তো এখানে ওঠে না, কিন্তু সংকলনে যে চিন্তার ইতিবৃত্ত প্রকাশ পায় তা বইতে পায় না যদিও বইতে যে যুক্তির ইমারত গ'ড়ে ওঠে তা সংকলনে ওঠে না। আসলে বই আর সংকলনের স্বাদ ভিন্ন। কিন্তু এই ভিন্নতা যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে না মেনে নেওয়া যায় তাহলে প্রত্যাশা-বিপর্যয় ঘটতে পারে—সংকলনের কাছে আমরা চেয়ে বসতে পারি বইয়ের কাঠিন্য ; এবং সেই অনুযায়ী খুঁত ধরতে পারি এটা নেই কেন বা ওটা আছে কিনা ব'লে ব'লে। সুতরাং এই বারোটি নিবন্ধ নিয়ে কোনো দ্বিতল-ত্রিতল সৌধ সাধিত হলো কি না সে-প্রশ্ন আমরা করবো না, দেখবো তারা কোন ভাবনা-পরিকল্পে নিবদ্ধ, কোন চিন্তনপ্রবাহের ঊর্মিমালা।

যে-আন্দোলন প্রথমেই চোখে পড়ে তা এক তারস্ত-আততি। যে-অনীহা থেকে তিরিশের আধুনিকরা ভুগে গেছেন এবং যে-অনীহা থেকে আমরা এখনো অনেকেই ভুগি তার অবসান যে আশু কর্তব্য সে-কথা আর এমন ক'রে কোনো বাঙালি কবি সাম্প্রতিক কালে বলেননি। অমিয় চক্রবর্তী একসময়ে বলেছিলেন, কিন্তু তার পরে তো অনেক দশক পেরিয়ে গেছে—এখনো আমাদের কাছে প্রতিবেশী ভারতীয় সাহিত্যের অস্তিত্ব খুবই অস্পষ্ট। এবং এই আত্মাভিমানের পেছনে যে আছে এক পাশ্চাত্যমুখী দাস্য মনোভাব এবং সেইসঙ্গে এক কৃপমণ্ডূকতা তাও আর কেউ অত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেননি। না, এ নয় কোনো ফতোয়া, কোনো ভারতীয়তা বিষয়ক ঘোষণাপত্র, কোনো কেন্দ্রীয় অনুশাসন, এ একান্তই

ভাষাসমূহের পারস্পরিক নৈকট্যবোধ। আবার এ নয় কোনো ক্ষণিক আত্মীয়তা-সম্ভূত বিলাসব্যসন, কোনো বন্ধ গালিচায় বসে গোলাপ বিনিময়, এ ইতিহাস-সম্মত আদান-প্রদান যার আরেক নাম শ্রদ্ধা। যদি আর কোনো ভারতীয় ভাষার কবিতা শুনলেই আমরা নাক সিঁটকোই—আমাদের আছেন রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ, ওদের কে?—যদি আমাদের অজ্ঞতা হ'য়ে দাঁড়ায় অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্য তাহ'লে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। ভারতভবনের এক আড্ডার কথা শোনাতে-শোনাতে ইতিহাস কীভাবে সব ঘটিয়ে ঘটিয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রোত্তর অন্য ভারতীয় কবিতায় তাও আমাদের জানিয়ে দেন শঙ্খ ঘোষ, জানিয়ে দেন জীবনানন্দ কেবল আমাদের সম্পত্তি নন আর, অন্য ভারতীয় ভাষারও এবং আমাদের অহং যতই ক্ষুণ্ণ হোক না কেন জীবনানন্দকে বোঝবার এলেম অন্য ভারতীয় ভাষায়ও আছে। আর এসব কথা বলেন শঙ্খ ঘোষ নিচু গলায় যেন আলাপচারিতা করছেন, গল্প শোনাচ্ছেন সেবারে ভোপালে কী হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর সাবলীলতা নিয়ে বলতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তুলেছিলেন, শঙ্খ ঘোষের সাবলীলতা নিয়ে বলতে গিয়ে হয়তো বুদ্ধদেব বসুর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তোলা যায়। গত তিরিশ বছর এমন সাবলীল প্রবন্ধ বাংলায় আর ক-জন লিখেছেন, সাবলীল এবং সারবান, সারবান অথচ নির্ভার?

তাঁর ভারত-আত্মতির এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইকবাল-চর্চা। আমরা লিখতে বসলেই আমাদের পরিশ্রম ফুটে বেরোয়, শঙ্খ ঘোষ তাঁর পরিশ্রম প্রচ্ছন্ন রাখেন—এতটাই প্রচ্ছন্ন যে মনে হয় কোনো পরিশ্রমই করেননি, কেবল উপলব্ধি থেকে লিখে গেছেন। অথচ ইকবাল নিয়ে তিনি যে পড়াশুনো করেছেন তার সাক্ষী শিমলার ইনস্টিট্যুট অব এ্যাডভান্সড স্টাডি যেখানে তিনি ফেলো ছিলেন বছরখানেক। আর সেই শ্রমের ফল এই সংকলনভুক্ত নিবন্ধ দুটিই নয়, ইকবাল থেকে তাঁর যে সম্প্রতি কিছু অনুবাদ বেরিয়েছে তাও। হয়তো আরো অনুবাদ বেরোবে, হয়তো আরো লিখবেনও—ধরা যাক ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ নিয়ে—তবু যেটুকু লেখা ও অনুবাদ পড়লাম তাতে মনে হলো ইকবালকে বাদ দিয়ে আমাদের ভারত-ভাবনা অসম্পূর্ণ, বিশেষত এই মুহূর্তে যখন ধর্মের নামে কেউ-কেউ সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বেড়া তুলছেন। ইকবাল ঐ সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ ইকবাল এই সম্প্রদায়ের নন—এর চাইতে বিপজ্জনক কথা আর কী হতে পারে! 'কেন ইকবাল' নিবন্ধে ইকবালের ধর্মাদর্শের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন শঙ্খ ঘোষ। কোনটা জরুরি ছিলো ইকবালের কাছে, ধর্ম না মানবতা? ধর্ম কি ধর্মেরই জন্য, না ধর্ম মানবতার জন্য? এমন কি কিছু আছে ইসলামে যা সাম্যের প্রতিপন্থী, যা দরিদ্রের ও নিপীড়িতের যেমন আশ্রয় তেমনি ধনী ও অত্যাচারীর শক্তিশেল? এবং সেই ইসলাম কি কেবল মোল্লাশাসিত কতিপয় সংস্কার, রক্ষণশীলতারই এক অন্য নাম? কোনো

সরল উত্তর দেননি শঙ্খ ঘোষ। শুধু একথাই বলেননি যে মানবতার রওয়ানা হ'য়ে ইসলামে এসে পৌঁছেছিলেন ইকবাল ; সেইসঙ্গে যেসব সংকীর্ণতার ইকবাল হ'য়ে উঠেছিলেন সমার্থক তার কথাও বলেছেন। জটিল মানস ইকবালের, এক জটিল ইতিহাসে আশ্লিষ্ট। সেই জটিলতার আভাস একবার অর্ধশতক আগে দিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, আর ইকবাল-মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে তার পরিচয় দিলেন শঙ্খ ঘোষ। এবং এই জটিলতার যে এক ব্যক্তিগত মাত্রাও থাকতে পারে তাও বুঝিয়ে বললেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধে। 'কেন ইকবাল' কোনো প্রশ্ন নয়, উত্তর ; কিন্তু 'ইকবাল : প্রতিভার অপচয় ?'—এ একটি প্রশ্ন আছে। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে যে কী সচেতনতা আছে শঙ্খ ঘোষের তার প্রমাণ এই শিরোনাম দুটিও।

তাঁর নিবন্ধাবলী নিয়ে আমি বিশদ আলোচনা করতে বসিনি ; 'ঐতিহ্যের বিস্তার' আমরা যে কোনো সময়ই দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার প'ড়ে উঠতে পারবো। আমি বলছি তাঁর ভারত-আততির কথা। এবং সেই আততিতে যেমন একদিকে আছেন ইকবাল তেমনি অন্যদিকে আশানও যিনি উর্দুর ও ভাল্লাথোলের মতোই বিশ শতকী মলয়ালম কবিতার পথিকৃৎ। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে বছর বারো আগে শঙ্খ ঘোষ আশান পুরস্কার পান এবং আশানের জন্মস্থান কৈক্কর গ্রামে তাঁর থাকার সুযোগ ঘটেছিল সেই সূত্রে। আশান স্মৃতিমঞ্চের দ্বার-পার্শ্বে যে-তৈলচিত্রের উল্লেখ করে তাঁর 'তিন চণ্ডালী' নিবন্ধ তিনি শুরু করেছেন সেই চিত্রের উৎস দীর্ঘ কবিতা 'চণ্ডালভিক্ষুকী' যে আশানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা সে বিষয়ে কারোরই সন্দেহ নেই। এবং 'চণ্ডালভিক্ষুকী' নিয়ে ভাবতে বসলেই যে আমাদের 'চণ্ডালিকা'র কথা মনে পড়বে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ এক তৃতীয় চণ্ডালীর কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যার স্রষ্টা অকালমৃত সতীশচন্দ্র রায়কে আমরা ভুলতে বসেছিলেন। ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন শিকড় আবিষ্কারেরও প্রয়াস খুব সুলভ নয় (সতীশচন্দ্রের দীর্ঘ কবিতাটির পাঠ উদ্ধার ক'রে দিয়ে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তিনি)। 'তিন চণ্ডালী' নিবন্ধটির একটি ইংরেজি অনুবাদও ইতিমধ্যে বেরিয়েছে, মলয়ালম কবি আইয়াপ্পা পানিক্কর সম্পাদিত কুমারন আশান বিষয়ক একটি নিবন্ধ সংকলনে।

দান্তের সপ্তম জন্মশতবার্ষিকীতে লেখা 'চণ্ডীদাস বা দান্তে' নিবন্ধটি এই সংকলনে সংলগ্ন হয়ে আছে 'অন্তহীন সিঁড়ি : কাফকা' নাম্নী নিবন্ধটির যার রচনা ১৯৮৬-তে, কাফকা জন্মশতবার্ষিকীর তিন বছর পর। এই সংলগ্নতা আদৌ আপত্তিক নয়, সচেতন। কাফকাকে বোধহয় আমরা অনেকটা বুঝে উঠতে পারছি কিন্তু দান্তেকে এখনো পুরোপুরি পারিনি—এই রকম একটা প্রস্তাব আছে নিবন্ধ দুটি মিলিয়ে। অন্তত দান্তের চেয়ে কাফকা যে আমরা অনেক বেশি পড়ি তার একটা প্রমাণ বোধকরি ঐ তারিখ দুটোতেও আছে। দান্তে থেকে আমাদের

দূরত্বের অন্যতম কারণ সম্ভবত আমাদের অতীত ঐতিহ্য যেখানে প্রেম ও প্রজ্ঞার মূল্যস্বাতন্ত্র্য শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। ফলে মধুসূদন থেকে শুরু ক'রে আমাদের দান্তে-পাঠে কেবলই মাত্রাসংকোচ ঘ'টে গেছে—অক্ষর, রূপক, নীতি, আত্মা এই চতুর্মাত্রিক তাৎপর্যে কখনো দেখিনি 'কমেদিয়া'কে—তার ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথও নন, নন নিবন্ধ-শিরোনামের উৎস বিষ্ণু দেও। বিস্তার তাই নিতান্ত কাম্য। একথা শঙ্খ ঘোষ কোনো নিতান্ত নিরঞ্জন বিশ্বসাহিত্যের স্বার্থে বলছেন না, বলছেন ইতিহাসের তাগিদে। যে-জটিলতার অঙ্কে এখন আমরা দীক্ষিত হচ্ছি তার টানেই হয়তো আমরা দান্তের অমঙ্গলবোধের পূর্ণতর পাঠ নিতে পারবো, জগৎ যতই দূরের থেকে থাক না কেন তাঁর। কেবল চণ্ডীদাসের সামিল ক'রেই নয়, চণ্ডীদাস ব্যতিরেকী প্রজ্ঞাভূমিতেও তিনি হয়ে উঠবেন প্রতিভাত। এবং 'সালিয়াতে অনূলি স্পেরান্‌কা'-রও নতুন রূপান্তর হবে সম্ভব। তুলনায় কাফকা যে কেবল রবীন্দ্রসান্নিধ্যেই নন, রবীন্দ্রব্যতিরেকীও, তা বুঝতে আমাদের দেরি হয়নি। অথচ কী অনিবার্যভাবে এসে পড়েন রবীন্দ্রনাথ কাফকা পড়তে বসলেই। 'সে যে আসে, আসে, আসে'-র এমন তিতিক্ষা আর কার লেখায় আছে রবীন্দ্রনাথের পরে! 'অন্তহীন সিঁড়ি: কাফকা' নিবন্ধটির মুখ্য আলম্বন তাই সংগতভাবেই রবীন্দ্রনাথ, বিশেষত 'ডাকঘর'-'রাজা' ও 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের কবিতাবলী।

এই আবলম্বন ব্যাপারটার এক আলাদা গুরুত্ব আছে সাহিত্যান্তরের আদান-পর্বে. বিশেষ ক'রে সেই সাহিত্য যখন দূরবর্তী ও ভিন্নদেশীয়। কোনো নিরালম্ব আদানই আদৌ ঘটে কিনা সন্দেহ—নিরালম্ব ও ইতিহাস-নিরপেক্ষ। লুকাচের 'ঘরে বাইরে' পাঠ নিয়ে শঙ্খ ঘোষ ক্ষোভ করেছেন—কেন লুকাচের মতো ইতিহাসচেতন সাহিত্যবিদ্ এত একদেশদর্শী হবেন আর কেনই বা তাঁর তথ্য-নিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথে এসে এমন আলগা হ'য়ে যাবে! এই ক্ষোভের আড়ালে বোধ-করি আরেকটা ক্ষোভ রয়েছে যা সাধারণভাবে প্রতীচীর প্রাচ্য-আদানসংক্রান্ত। তথাকথিত প্রাচীকে নিতান্ত প্রাচ্য বলে দেখবার যে-প্রবণতা তখনো বজায় ছিলো প্রতীচীতে, তারই প্রতিবাদী ছোঁয়া সম্ভবত লুকাচেও লেগেছিলো। কারণ বীতস্পৃহা ব্যতিরেকে অমন নিবন্ধ কেন লুকাচ লিখবেন আর বীতস্পৃহার হেতু নিশ্চয়ই প্রগতিবিরোধী প্রাচ্যবাদীদের অতিস্পৃহা। সম্প্রতি-প্রকাশিত মার্টিন কেম্পশেনের 'রবীন্দ্রনাথ ও জর্মানি' গ্রন্থে যেসব দলিল উদ্ধৃত হয়েছে তাতে ঐ অতিস্পৃহা-বীতস্পৃহার দ্বন্দ্ব আরো স্পষ্ট, যার হাত থেকে রিল্‌কে-টমাস মানও রেহাই পাননি। আর প্রতীচীতে রবীন্দ্রনাথ যে মূলত প্রতীচীরই সৃষ্টি অর্থাৎ প্রতীচীর ইতিহাসই তাঁর মুখ্য আলম্বন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে একটা সন্দেহের অবকাশ এখনো থেকে গেছে। প্রাচী প্রতীচীর (আসলে প্রাচী-প্রতীচী নয়, প্রথম ও তৃতীয় বিশ্ব, কিংবা তার চাইতেও ভালো, অত্যুন্নত বনাম অনুন্নত দুনিয়া) সম্পর্কের যে-টানাপোড়েন পাশ্চাত্য আঠারো শতকেই

শুরু হয়েছিল যার ফলে প্রতীচীই এতদিন বলে দিয়েছে প্রাচীর কিসে মঙ্গল কিসে অমঙ্গল এবং অবোধ্যদৃষ্টিকোণে সংস্থাপন ক'রে এসেছে প্রাচীকে, তার নিরসন কি তাহলে এখনো হয়নি ? জয়েস-কাফকা নিয়ে নতুন ক'রে ভাববার প্রয়াস হতে পারবে লুকাচের, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে না—এতে কি আমাদের অবাক হবার কিছুই নেই ?

পশ্চিম ইউরোপের কোনো-কোনো দেশে শুনেছি আবার রবীন্দ্রনাথে ঈষৎ আগ্রহ জন্মাচ্ছে। নতুন অনুবাদ হচ্ছে, লোকে পড়ছেও। 'দেবতার গ্রাস'-নির্ভর একটি অপেরারও শুনেছি সার্থক সঙ্কায়ন ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথের দুই নবীন অনুবাদক উইলিয়ম রাদিচে ও মার্টিন কেম্পশেন এইসব সুসমাচার আমাদের শুনিয়েও গেছেন। তবে জর্মানিতে 'ভারত-উৎসব'-এর অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত ১৯৯২-এর এক আলোচনাচক্রে শুনেছি উপস্থিত ছিলেন কেবল ভারত-বিশেষজ্ঞ, ভারত-বিদ্যার্থী, ভারত-আগত আলোচক, অভিবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশী—একজনও এমন কেউ নন যিনি নিতান্ত অদীক্ষিত, কোনো জর্মান ভাষার লেখক বা সমালোচক বা বিদ্যার্থী ! আলোচনাচক্রটি রাইন-মাইন অঞ্চলে না ঘ'টে দিল্লি-কলকাতাতেও ঘটতে পারতো। অথচ কাফকা-টমাস মান তো বটেই, লুকাচ বিষয়েও দিল্লি-কলকাতায় যদি এক আলোচনাচক্র আহ্বান করা যায়, তাহলে সকলেই জানি আমরা কেবল জর্মান ভাষার ভাষা-সাহিত্যের নয়, নানান ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের, বিশেষজ্ঞের, বিদ্যার্থীর, লেখক-সমালোচকের অভাব হবে না, এমনকি অন্যান্য বিদ্যার লোকেরাও কেউ কেউ ভিড় করবেন। এবং ধুলিমলিন আলোচনাকক্ষে যে-আবেগ সঞ্চারিত হবে তার ভগ্নাংশও যদি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডে-জর্মানিতে-ফ্রান্সে-ইতালিতে-উত্তর আমেরিকায় কোথাও ঘটে, তাহলে মানতে হবে প্রতীচীর পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

এ নেহাৎ সাংস্কৃতিক সার্বভৌমতার কথা নয়, ইতিহাসের কথা। লুকাচের কাছ থেকে তাঁর 'ঘরেবাইরে' আলোচনায় যা আশা করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ এবং যার অভাবে ক্ষোভ জানিয়েছেন তার সমতুল্য তন্নিষ্ঠাই তিনি এলিয়ট অনুবাদে বিষ্ণু দে-র কাছে থেকেও চেয়েছিলেন এবং না পেয়ে 'কতটুকু এলিয়ট' বলে প্রশ্নও তুলেছেন। অনুবাদও সাহিত্যান্তরের আদান। এলিয়টকে কতটা এলিয়ট হিশেবে পাবো আর কতটা বিষ্ণু দে হিশেবে তার কোনো সর্বসম্মত উত্তর বোধকরি নেই। 'ক্রিসমাসে'র জায়গায় 'জন্মাষ্টমী'র যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর অনুবাদ সংকলন 'প্রতিধ্বনি'র ভূমিকায়। প্রতিধ্বনি শব্দটির মধ্যে সম্ভবত অনুবাদরূপী আমাদের একটি আদর্শ নিহিত আছে—ধ্বনির ব্যঙ্গ (ব্যঞ্জনা অর্থে বলছি) হোক বা না হোক, ধ্বনি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না প্রতিধ্বনি। এইটুকু মানতেই হবে, সটীক বনাম অটীক নিয়ে যে তর্কই তুলি না কেন। 'জন্মাষ্টমী' কি প্রতিধ্বনি না নিজেই ধ্বনি ? এ নিয়ে কথা বলতে বসলেই আমার পবিত্রকুমার

রায়ের একটি মজার ধাঁধার কথা মনে পড়ে। ধাঁধাটি তিনি শুনিয়েছিলেন ১৯৮৭-তে শিমলার এক আলোচনাচক্রে। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'-র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি পাঠ অবলম্বনে রচিত নেরুদার স্পেনীয় পাঠের ডব্লু. এস. মের্ক্‌ইন-প্রদত্ত ইংরেজির শক্তি চট্টোপাধ্যায়-সাধিত বাংলা রূপান্তর কি শেষপর্যন্ত 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'রই বাংলা অনুবাদ ? ধাঁধাই বটে, তবে তার দ্বারা, দার্শনিক কোয়াইন যা-ই বলুন না কেন, অনুবাদরূপী আদানের সত্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায় না, বরং তার বিদ্যুৎপ্রতিমতাই প্রমাণিত হয়।

অনুবাদ ঐতিহ্যের বিস্তার এবং অনুবাদ-বিচার সেই বিস্তারেরই অঙ্গ। এই বিস্তারপর্বে শঙ্খ ঘোষের অবস্থান দ্বিবিধ কারণ তিনি নিজেও অনুবাদক। আর তাঁর যে অনুবাদ আমাদের শিরোধার্য এবং যার দ্বারা আমাদের ঐতিহ্যের এক বিশেষ বিস্তার ঘ'টে গেছে তা ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ। ওকাম্পো-চর্চায় যে-উদ্যম আমরা এখন দেখাচ্ছি, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পটুত্বও, তার সূচনা শঙ্খ ঘোষেই। সেই সূচনারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ গ্রথিত হয়েছে বর্তমান সংকলনে, 'সেও আমি নই : ওকাম্পো'—রবীন্দ্রসৌরভ সত্ত্বেও যা আদৌ রবীন্দ্রনাথের বিজয়া বিষয়ে নয়, নয় অর্তেগা-ই গাসেৎ বা কাইজারলিঙের মর্ম বা নর্মসহচরী বিষয়ে, যা একান্তই ভিক্টোরিয়া নাম্নী মানুষটি বিষয়ে, জীবনভর যাঁর সাধনা ছিলো নারীত্ব নয়, স্বাধিকার এবং 'দক্ষিণে'র আত্মজাগরণ প্রয়াসের সঙ্গে সেই সাধনাকে যিনি সম্পূর্ণ মেলাতে পেরেছিলেন, ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের যিনি আমৃত্যু প্রতিরোধ ক'রে গেছেন, আর্জেন্টিনার নারীমুক্তি আন্দোলনের যিনি ছিলেন কয়েক দশকের 'প্রাণপুরুষ'। আমাদের নিজেদের নারী-আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠছে সেই সময়ে এক এমন আশ্চর্য মানুষের কথা শুনিয়ে শঙ্খ ঘোষ ইতিহাসের প্রণোদনা জুগিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বাংলা ওকাম্পো-চর্চায় এই নিবন্ধটির এক বিশেষ স্থান আছে, কেননা ওকাম্পো বলতেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িয়ে ভাবতে অভ্যস্ত। সেই অভ্যেস ভাঙা উচিত। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকেও যে ওকাম্পোর এটা আদর্শ মূল্য আছে তা জানা উচিত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে রবীন্দ্রসূত্র কর্তিত হ'লো। রবীন্দ্রনাথই আমাদের অত্র হেতু, তাঁকে অবলম্বন ক'রেই আমরা ওকাম্পোতে পৌঁছেছি, তাঁকে বাদ দেবো কী ক'রে! কিন্তু তাঁকে যোগ করবো আমরা অভ্যেসের অন্ধতায় নয়, চেতনার আলোয়। শঙ্খ ঘোষের মতো রবীন্দ্রবিদের কাছ থেকে এ আমাদের শেখবার আছে।

শঙ্খ ঘোষের মতো রবীন্দ্রবিদ্ কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে চাই, কারণ শঙ্খ ঘোষই গত কয়েক দশকের রবিন্দ্রবিদ্যা ও রবীন্দ্রভাবনার পরাকাষ্ঠা। আর কেউ যে কেবল তাঁর মতো এতটা ও এত ব্যাপক ও গভীরভাবে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে লেখেননি তা-ই নয়, আর কেউ তাঁর মতো এতটা শুধু রবীন্দ্রোত্তর নয় তিরিশ-উত্তর বস্তুভিতে স্বস্থ থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখেননি। একথা এখানে বলবার অপেক্ষা

রাখে না, তবু বলছি এ-ই জানাতে যে 'ধূর্জটিপ্রসাদের রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে আলোচনা করবার মতো অধিকার শঙ্খ ঘোষের তুল্য আর কারো নেই। তিনিই বলতে পারেন আমাদের রবীন্দ্রবীক্ষার ইতিহাসে ধূর্জটিপ্রসাদের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ও রূপচৈতন্তের মূল্য কী। তিনিই বলতে পারেন ঐ ব্যাখ্যায় কোথায় অসম্পূর্ণতা, কোথায় অসংগতি, কোথায় দ্বিধা ; প্রশ্ন তুলতে পারেন কেন রূপসচেতন হয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ হঠাৎ-হঠাৎ উক্তিপ্রধান। এবং সবটাই দেখছেন বুদ্ধিজীবী হিশেবে ধূর্জটিপ্রসাদের ভাবনাপরিকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে, এমনকি 'অন্তঃশীলা'র মুখ্য উপজীব্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্য রেখে। যে-দ্বন্দ্বের প্রকাশ এই অন্তর্বাহী উপন্যাসের নায়কের চরিত্রে সেই দ্বন্দ্ব স্রষ্টার নিজের কি না এবং তারই ছোঁয়া লেগেছে কি না তাঁর রবীন্দ্রবিচারেও, এই বিবেচনাও এখানে বিদ্যমান। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের খণ্ড বীক্ষণেও যে পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ রবীন্দ্রচর্চা যে টীকারচনামাত্র নয়, রবীন্দ্রজীবনবোধের অবলোকন, ধূর্জটিপ্রসাদের এই আদর্শের কথা বিশেষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। সেইসঙ্গে আলোচকের নিজ মতাদর্শের এতে কোথায় অবস্থান তাও প্রসঙ্গত তুলেছেন—অবশ্যই ধূর্জটি-প্রসাদকে উদাহরণ হিশেবে ধরে নিয়ে। বের্গসঁতে শুরু করে রাসেল-ক্রোচে হ'য়ে মার্ক্সে পৌঁছেও তিনি শেষ পর্যন্ত স্বস্তি পাননি, 'হয়তো'র আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই দ্বিধাতে সম্ভবত তাঁর রবীন্দ্রদর্শনও আপন্ন, যদিও তাঁর প্রজন্মের অন্যান্যদের মতো তিনিও ছিলেন রীতিমত রবীন্দ্রাপন্ন। শঙ্খ ঘোষকে সেই অর্থে রবীন্দ্রাপন্ন বলা যায় না, যদিও তাঁর মতো সামগ্রিক রবীন্দ্রাদর্শন আনুপূর্বিক রবীন্দ্রবীক্ষার ইতিহাসে খুব বেশি নেই।

'ধূর্জটিপ্রসাদের রবীন্দ্রনাথ' এই 'ঐতিহ্যের বিস্তার' সংকলনে কেন স্থান পেলো তার একটা সসঙ্কোচ তির্যক কারণ ভূমিকায় আছে। তিন দশক পুরোনো "পথের পাঁচালী" নিবন্ধটিও ঐ একই কারণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—'ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দুটাকে ছুঁয়ে থাকা'-র উদ্দেশ্যে। আজ বিভূতিভূষণের জন্মশতবার্ষিকীর অব্যবহিত আগে সত্যজিৎ রায়ের জগজ্জয়ী চলচ্চিত্রের অব্যবহিত পরে লেখা এই বিভূতিভূষণীয় বৈশিষ্ট্য-নির্ণায়ক গদ্য পাঠটির এক বিশেষ মূল্য আছে। প্লট-নির্ভর উপন্যাসের আঁটোসাটো গড়ন অমান্য করে যে-ঢিলেঢালা চেহারা 'পথের পাঁচালী'তে গড়ে উঠেছে, এবং যা শুধু লক্ষই করেননি শঙ্খ ঘোষ পুরো যুক্তিযুক্তও মনে করেছেন, তার সঙ্গে আমরা অনেকে এখন যাকে ভারতীয় উপন্যাসের একাংশের পরিপেক্ষিতে কথাসাহিত্যের মুক্ত রূপ বলে কীর্তন করছি তার গভীর যোগ আছে। বিভূতিভূষণ কবি, এমন কথা শুনতে অনভ্যস্ত ছিলাম না আমরা, কিন্তু বিভূতিভূষণ মুক্তরূপের সাধক একথা আমরা আগে ভেবে দেখিনি। শিরোনামে 'পাঁচালী' শব্দ ব্যবহার নিয়ে এখন আমাদের অনেক কিছু বলবার আছে, কিন্তু তিন দশক চার দশক আগে তার শিল্পমূল্য নিয়ে তেমন সচেতন ছিলাম না আমরা

—কারোর-কারোর মনে হয়েছে ওটা সবলতার নয়, দুর্বলতারই লক্ষণ। উপন্যাস নিয়ে, বিশেষ ক'রে ভারতীয় উপন্যাস নিয়ে, চিন্তার যে-বিপ্লব আমাদের মধ্যে ঘটে গেছে তাতে শঙ্খ ঘোষের কাছে আমাদের কিছু ঋণস্বীকারের প্রয়োজন আছে। বিস্তার-বিচারের পাশাপাশি এমন শিকড়বোধের উদাহরণও সত্যি দুর্লভ।

যে-নিবন্ধটি অন্য-এক সংকলন থেকে তুলে এনে বিষয় সামীপ্য-হেতু এখানে পুনঃসংস্থাপন করা হয়েছে তার নাম "পিকাসো : তুলি থেকে কলম"। 'কল্পনার হিস্টিরিয়া' গ্রন্থে যখন এটা পড়েছি তখন চোখের সামনে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ যাঁর তুলির চাইতে কলম বোধকরি কম চলেনি। এখানে অবনীন্দ্রনাথ আছেন আড়ালে, অনেকটাই রূপকতুল্য। আমরা ভাবছি পিকাসোর তুলি থেকে কলমে রূপান্তর নিয়ে—সেই প্রতীচ্য পিকাসো যাঁর তুলিতে আমাদের ঐতিহ্যেরও বিস্তার ঘটেছে। কী লিখেছিলেন পিকাসো, কখন এবং কেন, আর কতটাই বা তাঁর ছবির জগতের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে এই অন্য পাঠ—এই সব বলতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ পিকাসোর সময়টাকেই তুলে আনেন, দেখেন তাঁকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়ে যাঁদের অনেকেই ছিলেন লেখক—নানান আন্দোলনের পুরোধা, কেবল শিল্পসমূহের পরস্পর-নির্ভরতায় নয়, শিল্পের সমগ্রতায়ও বিশ্বাসী। পিকাসোর মতো সৃষ্টিশীল প্রতিভা যে বিশ শতকের ইউরোপে খুব বেশি ছিলো না একথা আমরা জানতাম এবং প্রতিভার প্রকাশ যে মাঝে-মাঝেই একাধিক শিল্পমাধ্যমে হয় এও আমাদের অজানা ছিলো না, কিন্তু পিকাসোর লেখা কেমন তা আমরা জানতাম না। শুনেছিলাম বটে তিনি লিখেওছিলেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পিকাসো বিষয়ে বাংলায় যা পড়েছি তার ভেতর বিশেষ স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে এই নিবন্ধটি।

বাংলায় প্রোথিত থেকে ভারত ও বিশ্বে বিস্তারের এই যে আততি এর মাত্রা আরো ব্যাপক, বারোটি নিবন্ধে তার আভাসমাত্র মেলে। অর্থাৎ 'ঐতিহ্যের বিস্তার' গ্রন্থটি পড়লেই শঙ্খ ঘোষের বিস্তারবোধ পুরো প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে না, তার জন্যে চাই আরো শঙ্খ ঘোষ পাঠ। অন্তত দুটি অনুবাদগুচ্ছের কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যাদের, অবস্থান এই বোধের ক্ষেত্রে হয়তো কিঞ্চিৎ প্রতীকী। তেলুগু 'বিরসম' কবি চেরবান্দারাজুর সাতটি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ ১৯৮০-তে, 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার' নাম্নী একটি সংকলনের জন্যে। কাছাকাছি সময়ে একজন স্পেনীয় ভাষার কবিরও কিছু কবিতার—একটি দীর্ঘ ও কয়েকটি হ্রস্ব কবিতার—তিনি অনুবাদ করেছিলেন, কিউবার 'কৃষ্ণ হোমার' গিয়েনের। এই সহাবস্থানকে প্রতীকী বলছি এই অর্থে নয় যে প্রত্যেক ভারতভাবনার সঙ্গে একটি বিশ্বভাবনাও থাকবে এবং একে-একে দুইয়ের যোগ না হ'লে আয়োজন ব্যর্থ। প্রতীকী শুধু এই অর্থেই যে বিস্তারের মাত্রা দ্বিবিধ, কেবল বিশ্ব যেমন নয় তেমনি কেবল ভারতও নয়। 'হয়বদন' অনুবাদ হলো গিরীশ কারনাডের, কিন্তু তার আগে থেকেই চলেছে আধুনিক প্রতীচ্য নাটকের

মর্মানুভূতি। কিংবা উল্টো ক'রে বলা যায়, রবীন্দ্রনাটকের আলোচনায় বসে যে-প্রতীচ্য আধুনিকতার কথা বারবার এসে যাচ্ছিলো—আধুনিকতার কথা কেবল নয়, আধুনিকতার উপলব্ধি—তারই অনুবর্তনে বুঝি বা 'হয়বদন' অনুবাদে হাত দেওয়া। এবং প্রসঙ্গ আমাদের যেহেতু বিস্তার তাই মানতেই হবে স্থিতি নয়, গতিই মুখ্য। এই দ্বিবিধ গতিই লক্ষ করেছেন শঙ্খ ঘোষ আমাদের ঐতিহ্যে, লক্ষ করেছেন, অনুকীর্তন করেছেন। তাঁর কাছে আরো অনেক ঋণের মতো এটাও আমাদের ঋণ।

শ মি লা ব সু ম ত

একটিমাত্র উচ্চারণ : ভালোবাসা

১

সুনীলসাগরে শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে

স্নাতক প্রান্তিক বর্ষে পড়ার সময় পাঠ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থটি। বইখানি খুলতেই উৎসর্গ পত্রটি আকৃষ্ট করেছিল, 'বিজয়ার করকমলে'। ক্লাশে বইটি পড়ানোর দায়িত্ব ছিল অধ্যাপক চিন্তাপ্রিয় ঘোষের। প্রথম দিনই ক্লাশে তিনি বললেন এই আশ্চর্য নারী বিজয়া বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কথা।

সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ফিল্মটির মাধ্যমে আমার সুদূর শৈশবে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে / ওগো বিদেশিনী' গানটি। ছিন্ন স্মৃতিতে মনে পড়ে সে সময়ে কে যেন বলেছিলেন এই গানখানি নাকি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে মনে রেখে। অনেকদিন পর্যন্ত এই তথ্যটি আমার মনে আনাগোনা করত। ক্লাসে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নাম শুনে চমকে উঠলাম। ভাবলাম, এইবার হয়তো জানতে পারব রবীন্দ্রনাথের এই বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা হবার এক অত্যাশ্চর্য রোম্যান্টিক ঘটনার কথা। কিন্তু প্রথম ক্লাশেই জানতে পারলাম গানটি লেখা হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে, আর ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, পেরু যাবার পথে, অসুস্থ হয়ে আর্জেন্টিনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হবার সময়— বুয়েনোস আইরেস-এর প্লাসা হোটেলে। অর্থাৎ বিদেশিনীকে নিয়ে গানটি রচিত হবার প্রায় তিরিশ বছর পরে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে আর্জেন্টিনার এক অভিজাত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভিক্টোরিয়া। এর মানে এই দাঁড়ায় যে আমার শৈশবে শোনা সেই তথ্যটি অভ্রান্ত হলে পাঁচ বছর বয়সের এই আর্জেন্টাইন বালিকাকে অপরিচয়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে কল্প দৃষ্টিতে অবলোকন করে সুদূর ভারতবর্ষে বসে গানটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তাহলে কে এই বিদেশিনী? যাকে শারদপ্রাতে অথবা মাধবীরাতে হৃদয়ের মাঝখানে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে একথা জানতেই হয় কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়, হয়তো কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি সূক্ষ্ম প্রেরণা থেকে

অনেক সময় জন্ম নেয় তাঁর শিল্প। তাই রবীন্দ্র-আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ=ভূপতি, চারুলতা=কাদম্বরী দেবী, এবং অমল=রবীন্দ্রনাথ নিজে, এ রকম কোনো সমীকরণ আংশিক নিয়মে মান্য করা সম্ভব নয়। অথবা রবীন্দ্রনাথ—রাণু অধিকারী—এল্‌মহার্স্ট=রাজা—নন্দিনী—রঞ্জন, এ রকম বিচারও বোধ হয় ছকে ফেলে করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিল্পকর্মের কেন্দ্রীয় উদ্দীপন হলো তাঁর আবেগ। কৈশোর সীমানা অতিক্রম করার আগে থেকে অশীতি-বার্ধক্যের পরিণতি পর্যন্ত যাঁর সৃষ্টিধারাটি বিধৃত, জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মুহূর্তে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনি যে ভিন্ন ভিন্ন আবেগের দ্বারা চালিত হবেন একথা তো খুবই স্বাভাবিক। আরও স্বাভাবিক এই কথা যে, প্রত্যেক রোম্যান্টিকের মতো প্রত্যেক শিল্পীর মতো রবীন্দ্রনাথের জীবনে নারীরা আসবেন আবেগের বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। কিন্তু রবীন্দ্ররচনায় বিভিন্ন নারীর আদল খুঁজে পাবার পরিশ্রমী গবেষণা যতই হোক না কেন, এমন কোনো স্পষ্ট নির্ধারক নেই যার দ্বারা কোনো বিশেষ রচনাটি কোনো বিশেষ নারীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে—এমন কথা ভাবা যেতে পারে। তাই আমার শৈশবে শোনা সেই বিদেশিনী সম্পর্কিত তথ্যটি যেমন ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত, তেমনি একথাও সত্যি ওকাম্পোর সঙ্গে দেখা হবার পর তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথ এই গানটির ইংরেজী অনুবাদ তুলে দেন। অর্থাৎ 'দূরে বহুদূরে/স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' যেমন পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়াকে কবি তাঁর স্বপ্নদৃষ্টিতে দেখতে পান, সে-দেখার মধ্যে যেমন কোনো দ্বিধা নেই তেমনি 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে'—লোকান্তর গানের এই কলিটিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের মনে যে নারীরূপ জন্ম নেয় যাকে তিনি বিদেশিনী বলে সম্বোধন করেন সেই নারী সেই প্রেমিকাই হয়তো তাঁর জীবনে নতুনরূপে দেখা দেন সুদূর আর্জেন্টিনায় অপরিচিত এক বিদেশী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরে। ষাটোত্তীর্ণবার্ধক্যে চৌত্রিশ বছরের এই তরুণী তাঁর আবির্ভাবে এবং উপস্থিতিতে তাঁর সেবায় এবং সমর্পণে তাঁর শ্রদ্ধায় এবং ভালোবাসায় এক নতুন রঙের ইশারা এনে দেন। বৃদ্ধ অসুস্থ কবি আর্জেন্টিনায় তাঁর অসহায় একাকিত্বের দিনে উষ্ণ আতিথ্যের ছোঁয়া পেলেন এই বিদেশিনীকে কেন্দ্র করে, যেমন করে সান ইসিদ্রো-র সেই মিরালরিও অট্টালিকায় সেই বিকচ ফুলের বনে, সেই প্লাতা নদীর শান্ত স্নিগ্ধরূপে জীবনের এক নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেলেন তারই আবেশে 'পুরনো ঘাটের ধারে / ফিরে এল কোন্ জোয়ারে / পুরনো সেই কিশোর-প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা।'

বিগত কয়েকটি বছর ধরে একাধিকবার বিদেশ পরিভ্রমণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ক্লান্ত পৃথিবীতে সন্তের ভূমিকা পালনে ব্যক্তিগত শোকস্মৃতির ভারে যে কবি ভেতরে ভেতরে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন 'বলাকা'র (১৯১৬) পর থেকে 'পলাতকা'র (১৯১৮) সেই ছোট গল্পের সম্ভাবনাময় কাহিনী-কবিতাগুলি আর

'শিশু ভোলানাথ'-এর (১৯২২) শিশুময় কিছু কবিতা রচনা ছাড়া যে কবি আর কোনো কবিতা লিখতে পারছিলেন না, 'পূরবী'র কবিতায় সূর্যাস্তবেলার সেই কোমল রাগিনীতে নতুন করে যেন ঝলসে উঠলো গোধূলি আকাশের আলো। সন্ত আর কবির দ্বিখণ্ডনে ক্লান্ত কবির সত্তা যেন নতুন করে শৈল্পিক আশ্রয় পেল তাঁর এই হঠাৎ করে পাওয়া বিদেশিনী সখিটির সামীপ্যে। দেশ থেকে, পরিচিত পরিজনমণ্ডলী থেকে, কাজের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লিওনার্ড এল্মহার্স্ট আর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো—ভিরিশোর্ধ এই দুই বিদেশী যুবক-যুবতীর সঙ্গে সখ্যে আনন্দে প্রফুল্লতায় ভরে উঠল কবির মন। তাঁর সেই প্রফুল্লিত আনন্দের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে 'পূরবী'র অনেক কবিতা। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে এমনই এক সূচনার আভাষ দিয়েছিলেন অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় ঘোষ, তাঁর সেই প্রথম দিনের 'পূরবী'র ক্লাশটিতে।

২

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনই লীলা তব

'পূরবী'র কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কী এক অফুরন্ত আবেগ, ভালোবাসার অপরূপ সাবলীল প্রকাশ। তপোমগ্ন এক সন্ন্যাসীকে যেন তপশ্চারিণী এক নারী তাঁর ভালোবাসার তপস্যা দিয়ে জাগিয়ে তুলছেন, জীবনের দিকে টেনে আনছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই প্রিয় ইমেজ উমা-মহেশ্বরের, ভালোবাসার সেই কঠিনতম অথচ সুন্দরতম প্রকাশ। 'পূরবী'র একের পর এক কবিতা পড়তে থাকি আর মন ভরে যায়। বারবার জানতে ইচ্ছে করে এই কবিতাগুলোর প্রেক্ষাপটকে, রবীন্দ্রনাথের সেই মুহূর্তের কবি মানসকে। জানার আগ্রহে গোগ্রাসে পড়ে ফেলি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের দু'খণ্ড 'কবিমানসী', পড়ে ফেলি বাড়ির সঞ্চয় টেগোর সেন্টিনারি ভলুম-এ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রবন্ধ 'Tagore on the Banks of the Riverplate', আর তার পরে হঠাৎই হাতে এসে যায় শঙ্খ ঘোষের লেখা 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'। ভিক্টোরিয়ার স্প্যানিশ ভাষায় লেখা রবীন্দ্রস্মৃতি চারণার বাংলা অনুবাদ 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ'। মূল স্প্যানিশে লেখা ভিক্টোরিয়ার এই রচনাটির একাংশ হলো টেগোর সেন্টিনারি ভলুম-এ পড়া পূর্বোক্ত রচনাটি যা স্প্যানিশ থেকে ইংরেজি ভাষায় তর্জমাকৃত। অপর একটি অংশ ইংরেজি তর্জমায় প্রকাশিত হয়েছিল ইণ্ডিয়ান লিটারেচর পত্রিকায় ১৯৫৯-এর এপ্রিল—সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। ইংরেজি-স্প্যানিশ উভয় ভাষাবিদ এক বন্ধুর সাহায্যে ভিক্টোরিয়ার রচনাটির বাংলা অনুবাদ শঙ্খ ঘোষের 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ'। আয়ওয়া বাসকালে তাঁর হাতে

এসে পৌঁছেছিল ওকাম্পোর লেখা স্প্যানিশ ভাষার মূল রচনাটি। বলা যায় ইংরেজিতে এই রচনাটির অংশ বিশেষের তর্জমা হলেও শঙ্খ ঘোষের হাতে রচনাটির ঘটলো পুনরাবিষ্কার। ঝরঝরে সহজ অথচ ছন্দোময় গদ্যে ভাষান্তরিত হল ভিক্টোরিয়ার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ। উপরি পাওনা জুটলো বাঙালি পাঠকের বরাতে মূল রচনাটিতে প্রবেশের আগে শঙ্খ ঘোষের মিতকথনে সংযোজিত তিনটি খণ্ড, বিদেশিনী, সঙ্গ নিঃসঙ্গ, বিজয়ার অলিন্দ। মূল রচনাটির চারটি ভাগ। 'খোলা পথের ধারে', 'অলিন্দ', 'নিঃসঙ্গ পুরুষ' এবং 'ভালোবাসা'।

শঙ্খ ঘোষের কাছ থেকে এই অনুবাদটির এবং সংযোজন ও আনুষঙ্গিক তথ্যের একটি বিশেষ মূল্য আছে। রবীন্দ্র-গবেষক শঙ্খ ঘোষের তীক্ষ্ণ মনন ঋদ্ধ অনুসন্ধানে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়েছে। এ এক বিরাট প্রাপ্তি উৎসাহী পাঠকের কাছে। কিন্তু এর থেকেও বড় পাওনা হ'ল কবি শঙ্খ ঘোষের শৈল্পিক অন্তর্দৃষ্টিতে অন্য আরেক সৃজনীসত্তাকে দেখা। ভিক্টোরিয়া তাঁর জীবনে কী কী কাজ করেছিলেন বা কী লিখেছিলেন তার হিসেব নিকেশে তাঁর সৃজনীসত্তার পরিচয় নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই ছোট্ট চারটি টুকরোর মধ্য দিয়ে তিনি যেন নিগূঢ় অনুভবের গীতিময় এক কবিতা রচনা করে গেছেন। যে কবিতার মূল সুরটি বাঁধা আছে যে তারে তার নাম ভালোবাসা। কবি শঙ্খ ঘোষ এই উচ্চারণকেই যেন তাঁর ব্যক্তিগত শিল্পীসত্তা দিয়ে ধরতে পেরেছেন। শিখর না গিরিদরী, শব্দান্তরের এই সূক্ষ্ম বিতর্কের বাইরে গোটা রচনাটিতে যে শব্দটি অ-ভাষান্তরিত সেই ভালোবাসাই যেন একমাত্র প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের শেখানো বাংলা শব্দমালার আর সবই ভুলে গিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া, ভোলেননি কেবল 'ভালোবাসা' শব্দটি। 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' বইটি পড়লে মনে হয় বাংলা শব্দকোষের সমস্ত শব্দকে ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই, মনের মধ্যে যদি জেগে থাকে এই একটি মাত্র উচ্চারণ—ভালোবাসা।

ভিক্টোরিয়া বলেছেন তাঁর জীবনের এক বিশেষ সঙ্কট মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। ব্যক্তিগত জীবনে ভিক্টোরিয়া তখন খানিকটা বিপর্যস্ত। 'গীতাঞ্জলি'-র কবিতা থেকে যে ভিক্টোরিয়া তাঁর মনের প্রশান্তিকে আহরণ করার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর পক্ষে রবীন্দ্র-সাহচর্য এই বিশেষ সময়ে হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে তাৎপর্যবহ। আর্জেন্টিনীয় সমাজ-বিধিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ অগৃহীত। তাই আইনানুগ বিবাহ বিচ্ছেদ না হলেও ১৯২২-এ ভিক্টোরিয়া পেরিয়ে এসেছেন তাঁর ক্লান্ত বিধ্বস্ত দাম্পত্য জীবন। যে পুরুষটিকে প্রথম যৌবনের দাম্পত্য সঙ্গী নির্বাচন করেছিলেন ভিক্টোরিয়া, সেই পুরুষটির অধিকার সচেতন স্বামিত্বের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি। আধিপত্যের পৌরুষদীপ্ত ব্যবহার জীর্ণ করছিল তাঁর সংবেদনশীল তরুণ হৃদয়কে। যে ভিক্টোরিয়া নারীর অধিকারের জন্য, সমাজে নারী-পুরুষ সাম্যের জন্য পরবর্তীকালে লড়াই করবেন তাঁর সেই সংগ্রামের প্রেক্ষাপটটি যেন তৈরি হয়ে যাচ্ছিল তাঁর ঐ দাম্পত্যের

মুক্তিহীন একঘেয়েমিতে। যে 'গীতাঞ্জলি'র কবি তাঁর কাছে ছিলেন এক শান্তির উৎস, এক বিশ্বাসের কেন্দ্র; তাঁর সান্নিধ্যে স্বভাবতই পরিপূর্ণ হয়েছিল ভিক্টোরিয়ার মন। সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তাঁর সমস্ত প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং সত্তা। সেই সমর্পণের সেই সাহচর্যের এক গভীরতম দলিল ভিক্টোরিয়ার এই সংক্ষিপ্ত রচনাটি। 'পূরবী'র কবি ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু স্মৃতিচারণ করলেও এ রকম কোনো সামগ্রিক উচ্চারণ তাঁর কোথাও নেই, তবুও 'পূরবী'র কবিকে বোঝার পক্ষে বড় প্রয়োজনীয় ভিক্টোরিয়ার এই ভালোবাসাশুদ্ধ অন্তর্গামী অবলোকন।

পূরবী পড়তে গিয়ে 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' হাতে পেয়ে কৃতজ্ঞতায় তাই মন ভরে গিয়েছিল—জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত (মৃত্যু—১৯৭৯) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রতি আর শঙ্খ ঘোষের প্রতিও। অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় ঘোষ 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ পড়ানোর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকাব্য পঠনের একটি ধারাবাহিক চর্চার ধারণা দিয়েছিলেন। আর 'পূরবী'র অন্তর্লোককে চিনতে সাহায্য করলেন গবেষক কবি শঙ্খ ঘোষ।

৩

আমি কেমন করিয়া জানাব
আমার জুড়াল হৃদয় জুড়াল

আঁদ্রে জিদ-এর গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ এবং হিমেনেথ দম্পতির স্প্যানিশ অনুবাদ ওকাম্পোর হাতে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হবার আগেই। রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ছিল তিনি স্প্যানিশ ভাষা জানেন না বলে। যে ভাষায় ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁর বিনিময় ঘটতো তা এমন একটি তৃতীয় ভাষা যা রবীন্দ্রনাথ বা ওকাম্পো কারোরই নিজের ভাষা নয়। তাহলে কি ভাষাগত কোনো ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিক্টোরিয়াকে যথার্থভাবে পরিচিত হতে কার্যকর হয়েছিল? এ প্রশ্ন জাগার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে তাঁর ছোট্ট স্মৃতিচারণটিতে ভিক্টোরিয়া নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'গৃহপালিত' অথবা 'বন্য আর নিরীহ প্রাণী' এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন। ভিক্টোরিয়া বলেছেন—'তাঁর দরজার বাইরে মেঝের টালির উপর যে শুয়ে থাকতাম না, তার একমাত্র কারণ এই যে ব্যাপারটা খুব ভালো দেখায় না'—এই একটিমাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কেমন করে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। পশু বা প্রাণীকে বুঝে নিতে, তার অভিপ্রায়, তার মনোভাব, তার ইচ্ছাকে জানতে অনেক সময় কোনো ভাষার প্রয়োজন হয় না। ভিক্টোরিয়া তাঁর পরিচারিকার কথা বলেছেন যাঁর সঙ্গে বিনিময়ের জন্য কী

ভাষা ব্যবহার করতেন রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ারই মাঝে মাঝে কৌতূহল জাগত। আসলে সম্পর্ক যেখানে গভীরতায় অবগাহন করে সেখানে শুদ্ধ অতল হয়ে যায় সমস্ত শব্দ-চাতুর্য। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাই বোধহয় এত সংক্ষিপ্ত এত সংযতবাক্ ভিক্টোরিয়া।

গৃহপালিত পশুর বাক্-প্রতিমায় জিজ্ঞাসা জাগে তবে কি ভিক্টোরিয়া ছিলেন নিতান্তই ব্যক্তিত্বহীনা? রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছের দ্বারা একান্তভাবে চালিত? একথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় ব্যক্তিত্বের সেই সতেজ স্বাচ্ছন্দ না থাকলে নিজের এই বিনম্রতাকে এমন করে প্রকাশ করা যায় না। 'বন্য আর নিরীহ'—এই পরস্পর বিপ্রতীপ শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন ভিক্টোরিয়া সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিত্বের এই রাশ না মানা এবং একই সঙ্গে ভীষণ শান্ত বাধ্য দুটি পরস্পর বিপরীত রূপের কথা প্রকাশ করতে। ভিক্টোরিয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর এই অস্তিত্বের দুটি স্বরূপের মধ্য দিয়ে অথবা বলা যায়, দুয়ের মধ্যে মিলে মিশে একীভূত হয়ে উপস্থিত হয়ে ছিলেন।

কবিতায়, গানে রবীন্দ্রনাথ বারবার এক স্বপনচারিণী-র কথা বলেন, যাকে বুঝে ওঠা তাঁর হয়নি। অথচ যাকে খুঁজতে খুঁজতেই তাঁর দিন কেটে গেছে। ১৯২৪-২৫-এ পূরবীর কবিতায় সেই রহস্যময়ীরই আবির্ভাব ঘটল। এমন কি ছবি আঁকতে শুরু করেও রবীন্দ্রনাথের ছবিতে এক রহস্যময় নারীর ঈষৎ করুণ মুখ মাঝে মাঝেই উঠে আসতে লাগল। দুটো বড় বড় চোখ, তার ব্যঞ্জনাময় নিবিড় দৃষ্টি। এ কোন্ নারী? যিনি কবির লেখায়, ছবিতে এমন করে বারবার উঠে আসেন!

রবীন্দ্রনাথের জীবনে একদিন অকস্মাৎ হারিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী (মৃত্যু-১৮৮৪)। আবার একদিন তেমনিভাবেই হারিয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রী, তাঁর গার্হস্থ্য মাঙ্গল্যের নিত্য সহচরী তাঁর সন্তানের জননী মৃণালিনী দেবী (মৃত্যু-১৯০২)। এই হারিয়ে যাওয়া তাঁর মনের দোসরদের স্মৃতিকে কবি জারিত করে গেছেন তাঁর সমস্ত রচনায়। নতুন বৌঠানের দীপ্তি আর মৃণালিনী দেবীর স্নিগ্ধতা তাঁর বিনোদিনী, আশা, ললিতা, সুচরিতা, দামিনী, ননীবালা—এই পাশাপাশি সহ অবস্থিত অথচ চারিত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি নারীর ভাবমূর্তির সৃষ্টিতে কাজ করেছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু নারীর মধ্যে একই সঙ্গে দীপ্তি আর স্রোতস্বিনীকে তিনি যে দেখতে পেয়েছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিত্বেও তাঁর ঋজু অনমনীয়তা আর তাঁর বিনীত আত্মনিবেদন হয়তো এমনই দুটি পরস্পর সমান্তরাল অথচ একই কেন্দ্রগামী দুটি দিক। ভিক্টোরিয়াকে দেখার পরে রবীন্দ্রনাথের নারীর বিশ্বরূপ দর্শনের নতুন যে একটা দরজা খুলে গিয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভিক্টোরিয়া তাঁর সমাজ-প্রতিবেশে একান্ত পরিচিত নারীদের থেকে আলাদা। ভিক্টোরিয়া তাঁর

কৈশোরের আন্না ভড়খড়, বা যৌবন প্রারম্ভে পরিচিত বিদেশিনীরাও নয়। ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়াই ; তুলনাহীনা এবং বিজয়িনী বা বিজয়া।

'পূরবী'তে বসন্তের নতুন রঙে আবার যেন স্পষ্ট হল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তাঁর এই বসন্ত রাগের পুনরাবির্ভাবে বিদেশী মেয়ে ভিক্টোরিয়া নিঃসন্দেহে এক উদ্দীপক। সংরক্ত আবেগ কবিকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে গেল, আর আবেগেরই ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় জেগে উঠলো তাঁর কবিতামালা।

'বিদেশীফুল', 'অতিথি', 'অন্তর্হিতা', 'আশঙ্কা', 'শেষ বসন্ত', 'বিপাশা,' 'চাবি', 'প্রভাতী', 'মধু', 'অদেখা', 'প্রবাহিনী', 'না-পাওয়া', 'বনস্পতি'—এই কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্যে একান্তভাবে বিজয়ারই দান বলে পরিচিহ্নিত হতে পারে।"—একথা জানিয়েছেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য ('কবিমানসী', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬৬)। এত স্পষ্ট করে বিজয়ারই দান বলা যায় কিনা জানি না, তবে কবিতায় যে নতুন সুরের ছোঁয়া লেগেছে, বিজয়া যে তার প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন-এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বারবারই কোনো বিশেষকে লক্ষ্য করে নির্বিশেষ-এ চলে যাওয়া যে-কবির স্বভাব, তিনিই যেন পূরবীর কবিতাতেও তাঁর সম্ভলক এই অ-সমবয়সী বান্ধবীটিকে কেন্দ্র করে প্রেমের এক চিরন্তন লীলায় পরিক্রমণ করলেন। নাম না জানা বিদেশী ফুল কবির কাছে তাঁর সমস্ত সৌরভ নিয়ে নিজেকে প্রস্ফুটিত করে তুলল। ভাষাহীন সেই প্রস্ফুটন সমস্ত ভাষার বোবা না—বোবাকে অতিক্রম করে কবির কাছে সেই পুষ্প মঞ্জরীর সকল বাণীকে জানিয়ে গেল। হে বিদেশীফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,

'ভাষা কী তোমার।'
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,
চারি দিকে মর্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, জানি, জানি,
সৌরভের বাণী—
নীরবে জানায় তব আশা।
নিশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিশ্বাসের ভাষা'।

(বিদেশী ফুল)

মিরালরিও-র বাগানে বিকশিত বিদেশীফুল নাকি সেই ফুলের সুরভি নিয়ে যে মেয়েটি কবির কাছাকাছি আনাগোনা করে তার সেই নীরবতার ভাষা কবিকে এমন করে জানিয়ে দেয় তার সব কথা। অথবা দ্বারপ্রান্তে আসা সত্বেও নিদ্রাবিষ্ট কবির অমনোযোগে যে অন্তর্হিত হয়ে যায় সে কে ?

'প্রদীপ যখন নিবেছিল
আঁধার যখন রাতি,
দুয়ার যখন বন্ধ ছিল,

ছিল না কেউ সাথি।
মনে হল, অন্ধকারে
কে এসেছে বাহির দ্বারে—
মনে হল শুনি যেন
পায়ের ধ্বনি কার—
রাতের হাওয়া বাজল বুঝি
কঙ্কন ঝঙ্কার
বারেক শুধু মনে হল,
খুলি, দুয়ার খুলি।
ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেনু ভুলি।
'কোন অতিথি দ্বারের কাছে
একলা রাতে বসে আছে
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
মন শুধালো যবে,
বলেছিলেন, 'আর কিছু নয়
স্বপ্ন আমার হবে'।

(অন্তর্হিতা)

ভিক্টোরিয়া নিদ্রিত কবির দরজার বাইরে মেঝের টালির উপর রাত কাটাতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভব নয় বলে পারেননি। আর প্রবাসী কবিও হয়তো এই নির্জন অট্টালিকায় তাঁর আতিথ্যকারিনী মেয়েটির পদশব্দ শুনতে পেয়েছেন তাঁর রুদ্ধ দ্বারের বাইরে। তাঁদের দুজনের এই চাওয়া—পাওয়ায় কবির কবিতায় আবির্ভূত হলেন এক নারী, যাকে দরজা খুলে কাছে টেনে নেওয়া হল না কবির। এই নারীর সৃষ্টিতে ভিক্টোরিয়ার অনুষঙ্গ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এ যে কবির সেই অনুষঙ্গটুকুকে মাত্র নিয়ে নিজেরই মনের মধ্যে তাঁর কল্পনায় তাঁর ভাবনায় সৃষ্ট এক চিরন্তনী নারী সে-কথায় কোনো দ্বিধা থাকে না। কারণ আর যাই হোক ভিক্টোরিয়ার কঙ্কন ঝঙ্কার একটু অসম্ভাব্য ভাবনা। আসলে কবির মনের মধ্যে নারীর যে ভাবমূর্তি, যে নারী 'কন কন কত ছল ভরে' কাঁকন বাজায়, তাকেই হয়তো ভিক্টোরিয়ার আদলের মধ্যে সুপার-ইমপোজ করা হয়েছে। যাটোর্ধ বার্ধক্যে পৌঁছে জীবনের উপবনে বসন্তের আগমনকে কবি প্রার্থনা করেছেন তাঁর সেই চিরন্তনী কাব্যপ্রিয়ার কাছে। এই কাব্যপ্রিয়া এক অর্থে ভিক্টোরিয়াও হতে পারেন, আবার যে কোনো শিল্পীর কাছে যে কোনো স্রষ্টার কাছে যে কোনো সৌন্দর্যের বার্তাবহ-ও হতে পারে।

'বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলে ছিনু তাই
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই। ('শেষ বসন্ত')

৪

'যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়'

ভিক্টোরিয়া প্রভাবিত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের দুই পথিক গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। এছাড়া তাঁকে আকর্ষণ করেছিলেন দান্তে বা রাস্কিনের মত ব্যক্তিত্বরা। অর্থাৎ, বোঝা যায় ভিক্টোরিয়ার মনীষায় যুক্তিবাদ এবং আধ্যাত্মিক দার্শনিকতা একই সঙ্গে আকর্ষক এবং সক্রিয় ছিল। আর এই দুইয়ের বিমিশ্রণে ভিক্টোরিয়ার যে নিজস্ব জীবনদর্শন তৈরি হয়েছিল তার একটা বড় জায়গা ছিল ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান। ভিক্টোরিয়ার নারী ভাবনাও এই অনুসন্ধানের দ্বারা উদ্দীপিত এমন কথা বলা যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে ভিক্টোরিয়ার বিবাদপরিণামী দাম্পত্য নারী-পুরুষ সম্পর্কে তাঁকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হবার দু'বছর আগে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বত্রিশ বছর বয়সে সমাপ্ত হয়ে গেছে আট বছর ব্যাপী ভিক্টোরিয়ার যান্ত্রিক দাম্পত্য। তাঁর স্বামীর ব্যবহার থেকে ভিক্টোরিয়া আরো বেশি করে বুঝতে পেরেছেন নারী সম্পর্কে সম্পত্তিবোধ কত ভুল কত পীড়াদায়ক। নারীর মধ্যে ব্যক্তির অনুসন্ধান আলাদাভাবে নারী হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন নয়, এ তো যে কোনো নারীবাদীরই মূল কথা। তাই ভিক্টোরিয়ার এই ভাবনার মধ্যে আলাদা করে নতুন কোনো চমৎকারিত্ব নেই। কিন্তু কেবল তত্ত্বের জায়গা থেকে নয়, তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে, অনুভব দিয়ে ভিক্টোরিয়া এই ব্যক্তিত্বের স্বরূপকে অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়ার জীবনীকার ডরিস মেয়ার জানিয়েছেন, অর্তেগা, কাইজারলিং এবং রবীন্দ্রনাথ, এঁরা প্রত্যেকেই ভিক্টোরিয়ার জীবনে উপস্থিত হয়েছিলেন একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে। এছাড়া তাঁর আইন সম্মত স্বামী ব্যতিরেকে আর এক আইনজীবী ভদ্রলোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া। গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে দাম্পত্যপ্রতিম এক ঘনিষ্ঠতা। শ্রীমতী কেতকী কুমারী ডাইসনের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিকক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' বইটি থেকে জানা যায় লিওনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার সৌহার্দ্যের কথা। আসলে এই প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের এক-একটি আলাদা মাত্রা তৈরি

করতে চেয়েছেন ভিক্টোরিয়া। কোনো নারী যে একই সঙ্গে একাধিক পুরুষের সঙ্গে সুস্থ এবং সুন্দর সম্পর্ক রাখতে পারে এরকম কোনো ধারণাকেই বোধহয় তাঁর জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন তিনি। অথচ সম্পর্কের এই বহু-মাত্রিকতাকে অনেক সময়েই বুঝতে পারেননি তাঁর ঘনিষ্ঠ পুরুষরা। অর্তেগা বা কাইজারলিং-এর মত সংবেদনশীল ধীমানরাও বুঝতে ভুল করেছিলেন ভিক্টোরিয়াকে। ভিক্টোরিয়ার জীবনের এই ট্র্যাজেডির একটি সুন্দর প্রতিভাস ফুটে ওঠে ডরিস মেয়ারের বইটির শঙ্খ ঘোষ কৃত সমালোচনায় ('সেও আমি নই : ওকাম্পো, "ঐতিহ্যের বিস্তার")।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' ভিক্টোরিয়াকে মুগ্ধ করেছিল। বহিরবয়বের ললিত লোভন লীলা থেকে মুক্ত হয়ে যে নারী পুরুষের কাছে দেবীত্বও নয়, তুচ্ছতাও নয়, দাবি করে সমান অধিকার, কঠিন ব্রতের সহধর্মিতা, সেই নারী মুগ্ধ করে ভিক্টোরিয়াকে। নিজের জীবনেও নিজের ভাবনাতেও এই সমানস্পর্ধী নারীত্বকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। অথচ বারবার আহত হয়ে, প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে।

আমাদের প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ কীভাবে দেখেছিলেন ভিক্টোরিয়ার এই নারীত্ব ভাবনাকে? ভিক্টোরিয়া যে তার দেখা এ-দেশী মেয়েদের থেকে আলাদা সে কথা বহু পরে 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে' রাণীচন্দকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।...... 'মেয়েদের একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে তাদের ভিতরকার জিনিস— ইমোশন। এ যখন একটা ক্যারেকটারের সঙ্গে মিলে রূপ নেয়, তা অতি আশ্চর্য। ......বিদেশে দেখেছি তারা যখন ভালোবাসে তখন তার ইমোশনকে একটা রূপ দেয়, একটা কাজের ভিতর দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করে।' ('আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে'র ইংরেজী অনুবাদ করেন ক্ষিতীশ রায় ১৯৪২-এ। ভিক্টোরিয়া তাঁর রচনার অলিন্দ অংশে এই অংশের কথা বলেছেন।) কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য কি রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল? ১৯১৪ থেকে অর্থাৎ 'স্ত্রীর-পত্র' থেকে রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা অনেক সময় খুব স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল। 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালার মধ্যে পুরুষকে তাচ্ছিল্য করার এক অভিনব প্রকাশ দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু মেজো বৌয়ের আড়াল থেকে যে দিন মৃণাল বেরিয়ে আসে সেদিন মনে হয় এত সরাসরিভাবে এর আগে কোনো নারীর মুক্তির কথা, সমাজ বন্ধনকে তার অস্বীকরণ—প্রকাশ করেননি রবীন্দ্রনাথ। গল্প হিসেবে 'স্ত্রীরপত্র' কতটা শিল্পিত সে মীমাংসার জায়গা এটা নয়, শুধু যে ন'বছরের মেয়েরা একদিন বৌ হয়ে প্রবেশ ক'রে পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে দশের ইচ্ছা বোঝাই করা জীবনটা টেনে টেনে পথের প্রান্তে এসে পৌঁছোয় তারাই একদিন হঠাৎ কোনো বিশেষ মুহূর্তে নিজের মধ্যে অসীম অনন্তের প্রকাশকে অনুভব করে ফেলে। তখন তার মনে হয়—

'আমার সুরে সুরে বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী। /আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা, / মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা। ('মুক্তি'—'পলাতকা') একথা ঠিকই, এর মধ্যে একটা অধ্যাত্মসুরের মৃদু ছোঁয়া থেকে যায়, কিন্তু 'স্ত্রীর-পত্র' গল্পের শেষে মীরাবাঈ-এর উল্লেখ থেকে একথা আমাদের কখনোই মনে হয় না যে 'ধর্মীয় জীবনকে আশ্রয় করেই সে বাঁচবে'। মীরাবাঈ-এর প্রসঙ্গ অনেক পরে 'যোগাযোগ'-এ কুমুদিনীর মুখেও উল্লেখিত হয়েছে। মীরাবাঈ তার পরম প্রার্থিতের জন্য সমাজবিধি, স্বামীর প্রেমালিঙ্গন সব কিছুকে তুচ্ছ করেছিলেন। পাথরের দেবতা নয়, কিন্তু ঘর সংসারের বাইরে, স্বামী সন্তানের বাইরে মেয়েদের যে কিছু প্রার্থিত থাকতে পারে, যা পাবার জন্য বাবা, মা, সখা, সখি সকলের পরিত্যক্ত হওয়াও যায় তারই ইঙ্গিত বোধহয় মৃণালে বা কুমুদিনীতে। কুমুদিনীর পরিণামকেও আমাদের 'ঐতিহ্যিক' বলে মনে হয় না কারণ সন্তানের আসার সম্ভাবনায় কুমুদিনীকে তার স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে হয় ঠিকই, কিন্তু তবুও তো সে সন্তানের জন্যও যাকে ছাড়া যায় না এমন কিছুর সন্ধান করবে একথা বলে যায়।

যে দেশের, যে পরিবেশের পটভূমিতে তাঁর কাহিনীকে স্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হয়তো তাঁর কাহিনীর অন্তরতর কোনো পরিণাম তিনি দেখাতে পারেননি। এ তাঁর সীমাবদ্ধতা না তাঁর প্রতিবেশ এবং পরিবেশের সীমাবদ্ধতা, এ মীমাংসা সহজ নয়। বিদেশিনী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ছাড়াও হেমন্তবালাদেবী বা আশালতা সিংহের মতো এদেশের কোনো কোনো মেয়েও রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে হয়তো সাহায্য করেছিলেন। হয়তো বেলা, রেণুকা, মীরা, এঁদের প্রত্যেকের জীবনের কারুণ্য তাঁকে মেয়েদের প্রতি আরো নরম করে দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর একান্ত নিজস্ব ধরনেই মেয়েদের কথা বলেছেন বা ভেবেছেন এতে কোনো দ্বিধা নেই। 'স্ত্রীর-পত্র', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', 'Personality', 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি', 'রক্তকরবী', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' সবই তাঁর নিজস্ব ধরনের নারী ভাবনা। মায়ের জাত আর প্রিয়ার জাত, এও তাঁর নিজস্ব শ্রেণীবিন্যাস। তা না হলে প্রিয়ার মধ্যেও যে মাতৃত্বকে অনুভব করা যায় একথা কী তিনি জানতেন না? অথবা, 'ঘড়ায় তোলা জল' বললে কোনো মেয়ের প্রতি কোনো পুরুষের মনোভাবজাত কার্পণ্যই প্রকাশ পায়, মেয়েটির কোনো সীমাবদ্ধতা বা কোনো দুর্বলতা নয়, তবুও রবীন্দ্রনাথ এ সব তাঁর একান্ত নিজস্ব নারীতত্ত্বে বিশ্বাস করে গেছেন। এমন কি জীবনের উপান্তে পৌঁছে সোহিনীর মধ্যে ('ল্যাবরেটরি') যখন তিনি কেবল ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির কর্মের সঙ্গেও নারীর নিষ্ঠাকে যুক্ত করে দেখেছেন তখনও পাশ্চাত্য ফেমিনিজ্‌মের আদর্শ তাঁকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। 'আলাপ-

চারী রবীন্দ্রনাথে' ইমোশন এবং কাজের যে যোগ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, ভালোবাসার জন্য যে আত্মত্যাগের কথা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন নিবেদিতার কথা, তাঁর রচনায় তেমন কোনো কর্মের জগৎকে, ইমোশনের তেমন কোনো বড় প্রকাশকে তিনি দেখাতে পারেননি। ১৯২৪-এ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, অথচ দেখা হওয়ার পরের রচনাগুলিতেও ওকাম্পোর মধ্যে ইমোশনের যে বড় প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তা কিন্তু তেমনভাবে কোথাও প্রকাশিত নয়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পেও ল্যাবরেটরিটিকে রক্ষা করার জন্য সোহিনীর যতটা আকুলতা, ল্যাবরেটরির সঙ্গে নিজের কাজের ধারাকে যুক্ত করার জন্যে কিন্তু একটুও আকুলতা নেই। আমরা জানি একজন নারী হিসেবে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যতিক্রমী বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আজীবন তাঁকে ভুলতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের আরামের জন্য, তাঁর শুশ্রূষার জন্য ভিক্টোরিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদিত করেছিলেন। ফিরে আসবার পথে জাহাজের কেবিনের দরজা কাটিয়ে সান ইসিদ্রো-তে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত চেয়ারটি তুলে দিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া। এ যে কেবল একটি আসবাবমাত্র, নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে এই চেয়ারটিকে লক্ষ করে তিনি লিখে গেছেন একটি কবিতা। ১৯৩০-এ প্যারিসে ভিক্টোরিয়ারই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী হয়। কেবল আবেগের সঙ্গে কাজকে মেশানোর এই আন্তর্জাতিক চরিত্রটি এভাবেই বোধহয় দৃঢ়ীভূত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। ভিক্টোরিয়ার প্রিয় ছিল 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস। ভোরবেলায় নিখিলেশের পায়ের ধুলো নিয়ে বিমলার দিনের শুরু করার ছবিটি তাঁকে টানত। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'র মধ্যেই কেবল ঘরে নয়, বাইরের পৃথিবীতেও নারীর যে নিজেকে চিনে নেবার প্রয়োজন আছে নিখিলেশের মুখ দিয়ে সেকথা বলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ভিক্টোরিয়ার লেখা পড়ে মনে হয় তিনিও বোধহয় তাঁর ভালোবাসাকে এইভাবেই ঘর এবং বাহির এই দুই পরিধিতেই ব্যাপ্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই ব্যাপ্তি রবীন্দ্রনাথকে ভেতর থেকে সত্যিই কি কোনো নাড়া দিতে পেরেছিল? রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার মধ্যে যে বিবর্তন সময়ের সঙ্গে পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রকাশ, এখানে ভিক্টোরিয়া কি সত্যিই হতে পেরেছিলেন কোনো যথার্থ উদ্দীপক?

বারবার পুরুষের সৃষ্টির জন্য যে নারীর প্রেরণার প্রয়োজন একথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বারবার তিনি গতির জগৎ 'আর স্থিতির জগৎকে আলাদা করে দিয়েছেন পুরুষ আর নারীর জন্য। কেবলমাত্র পুরুষের প্রেরণা হিসেবে নারীকে ভাবতে ভালোবাসতেন না ভিক্টোরিয়া। বিশ্বাস করতেন না কাজের জগৎটা কেবল পুরুষের জন্য। রবীন্দ্রনাথ এখানে ভিক্টোরিয়াকে ছুঁতে পারেননি।

ভিক্টো'^য়া তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন—' ..সান ইসিদ্রো-তে আমার

সন্তর্পণ দেখাশোনায় কিছুদিন কাটিয়ে যাবার পর যে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে, সে ছিল মস্ত এক সান্ত্বনার মতো।' ('নিঃসঙ্গ পুরুষ'—"ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ", পৃঃ—৭৭, ১ম সংস্করণ)—এখানে লক্ষণীয় 'সান্ত্বনা' শব্দটি (শব্দটি শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ থেকে আমরা পাই)। ভিক্টোরিয়া কী তাহলে বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে চাননি বা বুঝতে পারেননি ? দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইওরোপের পটভূমিতে ভিক্টোরিয়ার যে কর্মময় ব্যাপ্তি তার সঙ্গে কেন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার পরের দীর্ঘ সতেরোটি বছরে তেমন কোনো যোগ তৈরি হল না রবীন্দ্রনাথের ? যে চিঠির প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়া 'সান্ত্বনা'র মত শব্দটি ব্যবহার করছেন সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এরকম কয়েকটি লাইন লিখেছিলেন 'কী দুঃসহ নিঃসঙ্গতার ভার আমাকে বইতে হয়, তোমার পক্ষে তা ধারণা করা শক্ত হবে। বিশেষত আমার অভাবনীয় আকস্মিক খ্যাতির ফলে সমস্ত জীবনের মত চেপে বসেছে এই ভার। আমি যেন এক অভাগা দেশ, কোনো অশুভ দিনে সেখানে এক কয়লাখনির আবিষ্কার হয়েছে।' ('নিঃসঙ্গ পুরুষ'—"ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ", ১ম সংস্করণ : পৃঃ—৭৭)। মনে পড়ে যায় 'রক্তকরবী' নাটকের রাজার কথা—'আমি প্রকাণ্ড এক মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।'—অনুবাদে এই নাটকটি পড়েছিলেন ভিক্টোরিয়া। নাটকটি রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার দেখা হবার আগেই। কিন্তু যে নিঃসঙ্গতার কথা চিঠিতে ভিক্টোরিয়াকে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তা যেন 'রক্তকরবী'র রাজারই নিঃসঙ্গতার মতো। খ্যাতি যেন রবীন্দ্রনাথেরও চারপাশে তৈরি করেছে একটা জাল। রাজার কাছে নন্দিনী প্রাণের প্রতীক। রাজাকে সে জীবনের আনন্দ দেয়, কিন্তু নন্দিনীকে রাজা কি দেয় ? রাজাকে বোঝার জন্য নন্দিনীর যে আকুলতা, আছে কী রাজার সেই আকুলতা নন্দিনীকে বোঝার জন্যে ?

ভিক্টোরিয়া মাত্র দু'মাসের অবসরে রবীন্দ্রনাথকে—কবি বা শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে শুধু নয়, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকেও বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। ভিক্টোরিয়ার কাছে দুর্বোধ্য বাংলা অক্ষরে লেখা কবিতাগুলিতে কী লেখা আছে তা জানার আগ্রহ ভিক্টোরিয়াকে ব্যাকুল করে রাখত। একদিন এই ব্যাকুলতার সূত্রেই কবি তাঁর একটি সদ্য লেখা কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ শোনান ভিক্টোরিয়াকে। পরের দিন আবার যখন পরিশীলিত অনুবাদে কবিতাটি ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দেন, তখন ভিক্টোরিয়া তাতে আগের দিনের আক্ষরিক অনুবাদের অনেকটাই খুঁজে পাননি। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে কবির কাছ থেকে উত্তর আসে তাঁর কবিতার এমন অনেক কিছু থাকে যা পশ্চিমী মানুষের বোঝার কথা নয়। তাই অনুবাদে এই কাটছাট। ঘটনাটি আহত করেছিল ভিক্টোরিয়াকে। আহত করে আমাদেরও। কবি কি তবে নিজের মতো করেই ভাবতে চেয়েছিলেন ভিক্টোরিয়াকে ?

ভিক্টোরিয়ার মতো করে ভিক্টোরিয়াকে ভাবার যে প্রয়াস তাঁর মধ্যে থাকা উচিত ছিল তা কেন নেই ? ভিক্টোরিয়াকে সম্ভবত সে-ভাবে বোঝার চেষ্টা করেননি রবীন্দ্রনাথ, এই অভিমানেই কি বারংবার আমন্ত্রিত হয়েও কোনোদিনই শান্তি-নিকেতনে, ভারতবর্ষে একবারও এলেন না ভিক্টোরিয়া ? অর্তেগা বা কাইজারলিং-এর মতো রবীন্দ্রনাথের কাছেও প্রকাশিত যে ভিক্টোরিয়া তার সম্পর্কে ভিক্টোরিয়াকে কি নিঃশব্দে উচ্চারণ করতে হয়েছিল 'সেও আমি নহি' ?

৫

ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

শঙ্খ ঘোষ তাঁর বইটির নাম দিয়েছেন 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'। ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিচারণটির নাম শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ।' এই নামটি গ্রন্থনাম হিশেবে ব্যবহার না করায় সম্ভবত শঙ্খ ঘোষ তাঁর বইটির মধ্য দিয়ে ভিক্টোরিয়া যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন অথবা দেখতে চেয়েছিলেন সেই আলোচনাকেই প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চেয়েছেন। মূল স্মৃতি-চারণ অংশটির সঙ্গে যুক্ত তাঁর নিজের সংযোজনে। রবীন্দ্রনাথকে জীবনের গভীর-তম ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে নেবার জন্য কীভাবে প্রস্তুত হয়ে আসছিল ভিক্টোরিয়ার মন, মূল স্মৃতিচারণের পূর্ববর্তী অংশে আমরা তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই। 'গীতাঞ্জলি' পড়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়, দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া। গীতাঞ্জলির কবিকে আগে থেকেই চিনে ফেলায় ভিক্টোরিয়ার কাছে রবীন্দ্রনাথ কোনো মৌখিক পরিচয় ছাড়াই অথবা চিঠিপত্রের কোনো আদান প্রদান ছাড়াই ছিলেন পরিচিত। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের কাছে ভিক্টোরিয়া ছিলেন একেবারেই অপরিচিত। তবুও তাঁর সেদিনের জীবনে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল ভিক্টোরিয়ার সেবা-সান্নিধ্য। প্রাতিষ্ঠানিকতার জালে আটকা পড়তে পড়তে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সেদিন পরিণত হয়েছিলেন এক প্রতিষ্ঠানে। তাঁকে এই প্রাতিষ্ঠানিকতার ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে বিচ্ছিন্ন করে এক শিল্পী এবং কবি হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া। রবীন্দ্রনাথের সেদিনের সেই ক্লান্ত এবং অসুস্থ মুহূর্তগুলোতে তাই ভিক্টোরিয়ার উপস্থিতি এক নিঃশব্দ প্রেরণার মতো কাজ করেছে।

শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনের কাছে ওকাম্পো চর্চার জন্য আগ্রহী সমস্ত পাঠকই ঋণী থাকবেন। শঙ্খ ঘোষ ভিক্টোরিয়ার গদ্যবদ্ধ স্মৃতিচারণের অন্তর্লীন কাব্যরূপকে, কাব্য সৌন্দর্যকে তাঁর অনুবাদের মধ্য দিয়ে তুলে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার মতোই মিতবাক্ ভিক্টোরিয়ার এই টীকাকার। কেতকী কুশারী ডাইসনের রচনায় তথ্যনিষ্ঠ গবেষকের বিশাল পরিশ্রমের পরিণাম লক্ষ করা যায়।

তবে সে আলোচনা এখানে বাহুল্য। আমরা কেতকী কুশারী ডাইসনের গবেষণার আলোচনা এখানে করছি না। এই জন্যেই তাঁর ওকাম্পো-কেন্দ্রিক গবেষণার কথা উল্লেখ করলাম যে, তা ওকাম্পো চর্চার সঙ্গে যুক্ত। আর ওকাম্পোকে জানার কৌতূহল বা আগ্রহের সূচনার উৎস মুখে দাঁড়িয়ে আছে অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় ঘোষের কাছে 'পূরবী' পড়ার সেই স্মৃতি আর শঙ্খ ঘোষের 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ।

ওকাম্পোর রচনাসংগ্রহ 'তেসতিমোনিয়েস' থেকে মাঝে মাঝে যে অনুবাদ-অংশ কেতকীর রচনায় উঠে এসেছে তা যে ওকাম্পোকে জানার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী এবং মূল্যবান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো স্পষ্টতই ছিলেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী। একথা জানিয়েছেন ডরিস মেয়ার। তবুও শ্রীমতী নবনীতা দেবসেনের প্রবন্ধ 'বিবাগী ফুলের গন্ধ'তে, ভিক্টোরিয়াকে 'ফ্যাসিজমে বিশ্বাসী' এবং ফ্যাসিজমের সমর্থক বলা হয়েছে। কেন এই অহেতুক আক্রমণ, তার কোনো সঠিক কারণ জানা নেই। শঙ্খ ঘোষের বইটি আলোচনা প্রসঙ্গে বইটির একটি দুর্বলতা হিসেবে ভিক্টোরিয়ার ফ্যাসিস্ট মনোভঙ্গির অনুল্লেখের কথা বলেছেন নবনীতা। তিনি যে কয়েক বছরের ব্যবধানেও একই সিদ্ধান্তে স্থির একথা বোঝা যায় তাঁর 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য প্রবন্ধ' বইটির নতুন সংস্করণেও একই বলার হুবহু পুনর্মুদ্রণে।

আসলে দূর প্রবাসের মানুষ ভিক্টোরিয়া সম্বন্ধে আহৃত আমাদের জ্ঞানের অনেকটাই পরোক্ষ। তাই হয়তো ভুল থেকে যায়। কিছু তথ্যের সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশিয়ে নিজেদের আদলে আমরা তৈরি করে নিই এই প্রায় অজানা মানুষটিকে। শঙ্খ ঘোষ ভিক্টোরিয়ার জীবনের কোনো তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিতে চাননি। তথ্যের অনুষঙ্গে এক শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছেন আরেক শিল্পীকে। ভিক্টোরিয়া নিঃসন্দেহে শিল্পী 'তাঁর শিল্প, অনুভবের একটি বিশেষ ধারা তাঁর রবীন্দ্র-অনুভব। এই অনুভবকে শিল্প-শোভন রূপে তুলে ধরেছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথে'। ভিক্টোরিয়ার এই বিশেষ অনুভবকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য শঙ্খ ঘোষ শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

ওকাম্পোর চর্চা আজ আর জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে কোনো নতুন উৎস সন্ধান নয়। ওকাম্পোর জীবন তাঁর রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর রচনা, তাঁর সম্পাদিত Sur পত্রিকার বিশেষত্ব এসবই আজ অনেকটাই ইচ্ছে করলে জানতে পারা যায়। কিন্তু বহু বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্বের এই অধিকারিণী সম্পর্কে যখন তেমন কোনো তথ্যই বাঙালি পাঠকের কাছে ছিল না তখন 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' বইটি একটি নতুন পথ নির্দেশ দিয়েছিল।

'পূরবী'র ক্লাসে দেখতাম অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় ঘোষ রবীন্দ্রজীবনের সামাজিকতার সঙ্গে যুক্ত করে রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ কাব্যগ্রন্থটিকে কীভাবে পড়া যায় তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। 'বলাকা'র কবি কীভাবে 'পূরবী'তে পথ

বদল করেছিলেন, আর কীভাবেই বা 'পূরবী'র পথ 'মহুয়া'র দিকে অগ্রসর হবে তার একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলাম তাঁর কাছে। যে পথ, যে যাত্রা রবীন্দ্রনাথকে জীবনের জড়ত্ব থেকে চলমান প্রবাহের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেই পথের ইঙ্গিত কীভাবে মিশে আছে 'পূরবী'র এই কাব্যে 'পথিক' অংশের কবিতা-গুলির মধ্যে তার কথা জেনেছিলাম। পথে যেতে যেতে যে কবি অতিথি হয়েছিলেন বিজয়ার দ্বারে, তার অন্তর্মানসকেও বোঝার চেষ্টা করেছিলাম তার কবিতার মধ্য দিয়ে।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর রচনায় ওকাম্পোর প্রতি আগ্রহী করেছিলেন। 'পূরবী' রচনার অনুষঙ্গে নয়, কবির প্রেরণাদাত্রী হিসেবে নয়, আলাদাভাবে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মধ্যে যে গভীর সংবেদনশীলতা, তাকে প্রথম চিনেছিলাম 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' পড়ে। ওকাম্পোর চোখ দিয়ে, এক নারীর চোখ দিয়ে, এক বিশাল পুরুষকে দেখা। আর এই দেখার দৃষ্টিপ্রদীপটি হ'ল ভালোবাসার উদ্ভাসনে উজ্জ্বল। প্রেম নয়, ভালোবাসা এক জ্যোতির্ময় মুক্তিবাহী শব্দরূপ। নিছক কোনো জৈব সম্পর্ক নয়, জৈবতার বাইরে যে মানবিকতা, যে মানবিকতার পটভূমিতে একজন মানুষ সম্পূর্ণভাবে আরেকজন মানুষকে দেখতে পায় তারই ইঙ্গিত-রচনায় বারবার উঠে এসেছে 'গীতাঞ্জলি'র কবিতায় 'প্রভু', 'নাথ'—এরই সমার্থক 'গুরুদেব' শব্দ প্রয়োগে। ইনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গুরুদেব কেবল নন, ভিক্টোরিয়ার গোটা জীবনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ইনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন তার মানস-প্রবাহকে। প্রভুত্বের সামাজিক কোনো জোরজবরদস্তি নয়, মনের মধ্য থেকে তাঁরই উদ্দেশে যেন ফুল হয়ে ফুটে ওঠা। ভিক্টোরিয়াকে চিনতে শিখিয়েছিলেন প্রথম শঙ্খ ঘোষ।

শঙ্খ ঘোষ নিঃসন্দেহে একজন পরিশ্রমী গবেষক। তাঁর সেই গবেষণার বহুচিহ্ন 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে। নতুন দু'একটি করে অনুষঙ্গের সংযোজনও আছে তাঁর সংস্করণভেদে। প্রত্যেকটি শব্দ যেন অনেক ভাবনার প্রতিশ্রুতি বহন করে। লাইনের পর লাইন পড়তে গেলে মনে হয় কেবল গবেষকের মেধা দিয়ে নয়, স্রষ্টার অনুভূতি দিয়ে ভিক্টোরিয়াকে অনুভব করে বইটি লেখা হয়েছে। হয়তো নিষ্ঠাবান কোনো গবেষকের পক্ষে এর থেকেও উজ্জ্বল কোনো গবেষণাগ্রন্থ রচনা করা সম্ভব, কিন্তু এমন সম্পূর্ণতার সন্ধান দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়।

বইটির প্রাপ্তিতে 'মন ভরে যায়'। আরো বড় প্রাপ্তি বইটি পড়ে। ভিক্টোরিয়াকে জানতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, যে উচ্চারণ ভিক্টোরিয়া করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে, সেই একই উচ্চারণ, 'ভালোবাসা'ই করা যায় এই বইটি পড়ে ভিক্টোরিয়াকে ঘিরে।

'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'কে নিয়ে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছিল। আমার যৌবনের সেই প্রভাত বেলায় যে বইটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল

তার কোনো নিরপেক্ষ সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু বলতে পারি আমার এই অনুভূতির কথা। এই বইটি পড়েই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে, চিত্রকলাকে, ভাবনাকে আরো বেশি করে জানার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। আর তৈরি হয়েছিল সাহিত্য, চিত্রকলা, জীবনদর্শন সব বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে নয়, একটি সমগ্রতার মধ্যে দিয়ে দেখার ইচ্ছা। আর সবচেয়ে বড় যে আগ্রহ জেগেছিল তা হ'ল, আমার থেকে প্রায় সত্তর বছরের বড় আর্জেন্টিনার এই বিদেশিনীকে আরো গভীর করে, আরো নিবিড় করে জানার ইচ্ছা। 'গীতাঞ্জলি'র কবি যদি দীক্ষা দিয়ে থাকেন ভিক্টোরিয়াকে জীবনের কোনো নতুন মন্ত্রে, তাহলে সাহস করে বলতে পারি শঙ্খ ঘোষও আমাকে এবং আমার ম'ত অনেককেই দীক্ষা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ওকাম্পোকে জানার নতুন আগ্রহে।

শিশিরকুমার দাশ

...

'আমি দশদিকে চাই' : ঐতিহ্যের বিস্তার

"অন্য দেশ বা অন্য প্রদেশের সাহিত্য-চর্চা জীবন-চর্চা প্রসঙ্গে কখনো কখনো কৌতূহল হয় আমাদের। সেটা যে কেবল অন্যকে জানাবার জন্যই তা নয়। তার মধ্য দিয়ে নিজেদেরও যেন খানিকটা নতুনভাবে দেখবার সুযোগ পাই। তাই দান্তে বা কাফকা, কুমারন আসান বা ইকবাল—এর যে-কোনো লেখকের প্রসঙ্গে ভাবতে গেলে আমাদেরই ভাষার কোনো-না-কোনো লেখকের প্রতিতুলনার কথা এসে পড়ে, অন্তত পটভূমিতে একটা ছায়া থেকে যায় তার।"

এই কথাগুলি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন ১৯৮১ সালে তাঁর 'ঐতিহ্যের বিস্তার' বইটির ভূমিকায়। নানা বিষয়ে, নানা সময়ে, সম্ভবত বিভিন্ন প্রেরণায় বা তাড়নায় লেখা বারোটি প্রবন্ধের সংকলন 'ঐতিহ্যের বিস্তার'। এইরকম একটি বইয়ের হয়তো এইরকম ভূমিকার দরকার ছিল। দরকার ছিল এই স্বয়ং-স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটা ঐক্যসূত্রের ইঙ্গিত দেওয়া। যে ইঙ্গিত পাঠককে সাহায্য করতে পারে পরস্পর নিরপেক্ষ আলোচনাগুলির ভেতরকার একটি গূঢ় সম্পর্ককে খুঁজে নিতে। তবে এমন কথাও ভাবা সম্ভব যে এই গ্রন্থের লেখক ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেকদিন ধরেই চিন্তা করে চলেছেন, ঐতিহ্য সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস অর্জন করেছেন, প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সেই একটি বিশ্বাসের প্রতিফলন। অর্থাৎ একটি পূর্ব কল্পনার দ্বারাই প্রবন্ধগুলি সজ্জিত, এদের মধ্যে আছে একটি মন্ময়তর, যে স্তরে তাদের চিন্তার, দৃষ্টির ও পদ্ধতির গভীর ঐক্য।

আবার একথাও ভাবা সম্ভব যে এই বিষয়গত ভিন্নতাটাই আসল। একটি সক্রিয় মন খুঁজছে বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যের সন্ধানই সেই মনকে আকৃষ্ট করছে "অন্য"-এর প্রতি। আর "অন্য"-কে যতই সে জানছে বা জানার চেষ্টা করছে ততই আবিষ্কার করছে "নিজ"-কে··· "নিজেদেরও যেন খানিকটা নতুন করে দেখবার সুযোগ···"। কিন্তু এই মন্তব্যগুলির আসল মূল্য অবশ্যই এই প্রবন্ধগুলির গ্রন্থনার সমর্থন হিসেবে শুধু নয়। এই মন্তব্যগুলি নানাভাবেই সমস্যাকীর্ণ এবং নানা সমস্যা জাগিয়ে তোলে মনোযোগী পাঠকের মনে। আমাদের দেশে, আমাদের দেশের বিভিন্ন সাহিত্যে অনেকগুলি সমস্যা নিয়ে লেখকেরা চিন্তিত। সেই

সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে আধুনিকতার সমস্যা। আর আধুনিকতার সমস্যার সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে ঐতিহ্যের সমস্যা। শঙ্খ ঘোষ যেহেতু একজন চিন্তাশীল সমালোচকমাত্র নন, তিনি আমাদেরকালের একজন বিশিষ্ট কবি, তাই এই মন্তব্যগুলির তাৎপর্য আরো গভীর হয়ে দেখা দেয় এবং আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সমস্যার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয়ে পড়ে। তিনি কি শুধু স্বীকৃতি জানাচ্ছেন তাঁর এবং আমাদের সাহিত্য-বিচার এবং উপভোগে ভিন্ন সাহিত্য ভিন্ন জীবনচর্চার ভূমিকা, না, তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতার ইতিহাসে এই "অন্য" এবং "নিজ"-এর সম্পর্কের কথাও বলছেন ? আর যদি তাই বলেন, তাহলে এই মন্তব্যগুলিকে বলতে পারি তাঁর কবিতার একটি সাংকেতিক দিশারী।

এলিঅট একদিন ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিক মনীষার সম্পর্ক ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁর কবিতায়, এই সম্পর্ককে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর সাহিত্য সমালোচনার তাত্ত্বিক কাঠামোর মূলদণ্ড হিশেবে। আপাত দৃষ্টিতে এই সম্পর্ক নির্বিরোধ, কিন্তু যে মুহূর্তে প্রশ্ন ওঠে কী এই ঐতিহ্যের প্রকৃতি, আর কেমন এই সম্পর্কের প্রকৃতি, তখনই এলিঅটের বক্তব্য হয়ে ওঠে সমস্যাসংকুল। ঐতিহ্য কি বহু যুগের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, সংবেদনশীলতা ও স্মৃতির একটি সংহত, আকারবদ্ধ স্থির রূপ ? যার কাছে আমরা বারবার ফিরে যেতে পারি, আমাদের পূর্ব পরিচয়ের যথার্থতা জানতে। অথবা এ কি এক প্রবহমান চৈতন্য, তার স্থির কোনো রূপ নেই, অনড় কোনো সত্তা নেই ? অথচ তা আমাদের আত্মপরিচয়ের মূলকেন্দ্র। কেউ কেউ ঐতিহ্যকে গ্রহণ করবেন প্রশ্নাতীতভাবে, কেউ কেউ বর্জন করবেন তার অনেক উপাদান জীর্ণ কিংবা দূষিত কিংবা মৃত বলে। কিন্তু সমস্তকে বর্জন করা যাবে না তাহলে শুরু হবে আত্মপরিচয়ের সংকট, সমস্ত গ্রহণ করাও যাবে না তাহলে হবে আত্মবিস্তারের সংকট। ঐতিহ্যকে নিয়ে গ্রহণ বর্জনের যে তর্ক মানুষের ইতিহাসকে মুখর করেছে তা এক অর্থে অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্ব। ঐতিহ্য জানিয়ে দিচ্ছে আমি শুধু সাম্প্রতিক নই, আমি অতীতের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ আত্মপরিচয়ের পূর্ণতা আসছে একটা দ্বিকালিকতার বোধ থেকে। এই দ্বি-কালিকতার ক্রমটা কী ?

এলিঅট তাঁর বিখ্যাত "ঐতিহ্য ও ব্যক্তিক মনীষা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন সাহিত্যপাঠের জন্য প্রয়োজন একসঙ্গে সাহিত্যের কালিক এবং কালহীন চরিত্রের সামগ্রিক বোধ। ঐতিহাসিক বোধ শুধু অতীতের অতীতত্বের অনুভব নয়, তার উপস্থিতির অনুভব। ঐতিহাসিক বোধের ফলে একজন লেখক যে শুধু তাঁর নিজের প্রজন্মকেই অস্তিত্বের মূলাধার ধরে নিয়ে লেখেন তা নয়, তিনি লেখেন হোমার থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ইউরোপের সাহিত্যের অনুভূতি নিয়ে। সেই অনুভূতির মধ্যে আছে তাঁর নিজের দেশের সমগ্র সাহিত্যের বোধের একটা যুগপৎ অস্তিত্ব। এই যে ঐতিহাসিক বোধ যা কালহীন এবং কালভিত্তিক, যা

একই সঙ্গে কালহীন এবং কালভিত্তিক, তা-ই একজন লেখককে করে ঐতিহ্যবাদী।

বহু বিতর্ক হয়েছে গত অর্ধশতাব্দী ধরে এই বক্তব্য নিয়ে। এলিয়ট যদি অনুসরণ করি তাহলে লক্ষ করি তাঁর মতে ঐতিহ্যে এবং ব্যক্তিকতায় একটা দ্বন্দ্ব আছে। ঐতিহ্যকে আয়ত্ত করতে হয়, তা অনায়াসলব্ধ নয়। আর আয়ত্ত করতে হয় ক্রম বি-ব্যক্তিকতার মধ্য দিয়ে। প্রথমত এরকম মনে করার কোন কারণ নেই যে ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিকতার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থাকবেই। ঐতিহ্যকে আয়ত্ত করতে হতে পারে, তা অনায়াসলব্ধ নয়—একথাও পুরোটা সত্য নয়। ঐতিহ্যের একটা অংশ আমাদের অনায়াস-পাওয়া, এই অর্থে 'অনায়াস' যে আমাদের সমাজের একটা সামগ্রিক স্মৃতি আছে সেই স্মৃতির পথ বেয়ে অতীত আমাদের চৈতন্যে সঞ্চারিত। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন 'হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে / কাজ করে যাও গোপনে গোপনে' তা প্রকৃতপক্ষে এই অনায়াসলব্ধ ঐতিহ্য। য়ুং প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক যাকে বলেছেন সমষ্টির চৈতন্য, তাকেই ইয়েট্স বলেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, মগ্ন চৈতন্যের ভেতরে নিহিত এক স্মৃতি। আর সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারা এবং নিজ সাহিত্যের ধারায় যে যুগপৎ অস্তিত্বের বোধ—যা অর্জনীয় এবং যা এলিয়টের মতে তাঁর কালের সাহিত্যিক-দের অন্যতম অস্বিষ্ট তা কেন শুধু ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তার কোন উত্তর দেননি এলিয়ট। অন্যদিকে আমাদের সাহিত্য যা গত দেড়শ বছর ধরে প্রবলভাবে পশ্চিমী চিন্তার অভিঘাতে চিহ্নিত সেখানে কদাচিৎ প্রশ্ন উঠেছে আমরা সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের সাহিত্যকে যুক্ত করতে পারছি না কেন? অথবা চাই না কেন? শঙ্খ ঘোষ যাকে বলেন ঐতিহ্যের বিস্তার, সেই বিস্তার কোন দিকে? পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা কি সেই বিস্তার? সে বিস্তার তো শুরু হয়েছে অনেকদিন। পূবের সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করা? সে বিস্তার কি আমরা সত্যি চাই? সে কি সাহিত্যের প্রয়োজনে, না সে কি এক অখণ্ড জাতি, অখণ্ড ভূগোল, অখণ্ড সংস্কৃতির রাজ-নৈতিক প্রেরণাজাত সাহিত্যিক দায়িত্ব? শঙ্খ ঘোষের রচনা থেকে এই প্রশ্নগুলি উঠতে বাধ্য।

২

ঐতিহ্যের বিস্তার ব্যাপারটা আদৌ সমস্যামূলক কেন? আমরা যদি গত শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে মনে হবে তা ঐতিহ্যের বিস্তারের ইতিহাস। বিস্তারটা ঘটেছিল পশ্চিমের দিকে। অর্থাৎ বিস্তারটা তত্টা কালিক নয়, যতটা স্থানিক। আমাদের বৈষ্ণব কবিতা-মঙ্গল-কাব্য-সংস্কৃত মহাকাব্যের লোকায়ন-ফয়াসী কাহিনী-সহজিয়া-সুফী চিন্তা নিয়ে যে জগৎ ছিল তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম ইংরেজি সাহিত্য, কিংবা একটু

অভিব্যক্তি করলে, ইউরোপীয় সাহিত্য। তাই যদি হয়, তাহলে ঐতিহ্যের বিস্তার তো ঘটে ইতিহাসে স্বাভাবিকভাবে, কিংবা অনিবার্যভাবে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? আসলে গত শতকে পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যে যোগ তা তো খুব একটা স্বাভাবিকভাবে হয়নি। একটা উপনিবেশে, উপনিবেশের প্রয়োজনে ইংরাজি শিক্ষার শুরু হয়েছিল। এমনকী ইংরেজি সাহিত্যের চর্চাও শুরু হয়েছিল একটা ঔপনিবেশিক প্রকল্প হিশেবে। গ্রন্থ নির্বাচন, পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন সবকিছু থেকেই বোঝা যায়, যে তার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিকতার আদর্শই শক্তি সংগ্রহ করতে চাইছিল। আমরা যে তা সত্ত্বেও সেই সাহিত্যকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছিলাম কিংবা কখনও কখনও আমরা সেই সাহিত্যপাঠের প্রচলিত কাঠামোর বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধী পাঠ তৈরি করতে পেরেছিলাম সে-টা একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। মূলত সেদিন যেভাবে আমরা পশ্চিমকে গ্রহণ করেছিলাম তাতে ঐতিহ্যের একটা বিস্তার যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সেইসঙ্গে খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল আমাদের স্বকীয় ঐতিহ্যের বেশ কিছু ধারা, বেশ কিছু উপাদান। প্রথমত আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম অনেক পরিমাণেই ঐতিহ্যের একটা প্রধান স্রোতের থেকে, যে স্রোত আমাদের লোকজীবনের স্রোত। ইংরেজি সাহিত্য আমাদের সামনে দিয়েছিল কতকগুলি 'মডেল', আমরা সেই 'মডেল'গুলি গ্রহণ করেছিলাম। কোন দ্বিধা ছিল না, কোন সন্দেহ ছিল না তা বলব না। এমনকী আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য তাদের প্রতিহত করতে চায়নি তাও বলব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল নূতনের, যে নূতনের সঙ্গে জড়িত ছিল পশ্চিম। তার ফলে একদিকে একটা নূতন, শক্তিমান সাহিত্য জন্ম নিয়েছিল সন্দেহ নেই, সেই সাহিত্য ছিল 'আধুনিক'। আর যে সাহিত্যাদর্শ হেরে গেল, তাকে আমরা বললাম 'ঐতিহ্যবাদী' বা 'ঐতিহ্য অনুসারী'—যার ব্যঞ্জনার্থ হলো পশ্চাৎমুখী, স্থাবর সাহিত্য। এই 'আধুনিক' সাহিত্যের উৎপাদন হলো শিক্ষিত (অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিত) মধ্যবিত্তের দ্বারা মধ্যবিত্তের প্রয়োজনে। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার জন্য রইল ঐ 'পশ্চাৎমুখী' 'ঐতিহ্যবাদী' সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের এই আধুনিকত্ব আমরা নিরূপণ করতে চাইলাম পশ্চিমের সঙ্গে তার নৈকট্যের প্রকৃতি অনুসারে। আর সেই মানদণ্ড আমরা প্রসারিত করে দিলাম সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যের ক্ষেত্রে—কালে এবং স্থানে। 'কালে' অর্থাৎ আধুনিকতার মানদণ্ড আরোপ করলাম আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে—সংস্কৃতে পালিতে প্রাকৃতে এবং সেইসঙ্গে প্রাক্-ইংরাজ বাংলা সাহিত্যে। আর 'স্থানে' অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে—হিন্দী, মারাঠী, ওড়িয়া, অসমীয়া, কিংবা সিন্ধী বা তামিলে। শঙ্খ ঘোষ উদ্ধৃত করেছেন ভাই বীর সিং সম্বন্ধে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধ থেকে একটি লাইন: আমাদের "সবচেয়ে বড়ো দুরন্ত আধুনিক নানা-প্রদেশীয়

প্রকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের নিরুৎসুক মন"। কিন্তু কেন নিরুৎসুক? শঙ্খ ঘোষ উদ্ধৃত করেছেন জীবনানন্দের একটি লাইন: "মারাঠি, গুজরাটি, তামিল বা হিন্দী কাব্য যদি এ বিষয়ে ফরাসি বা ইংরেজির স্থান নিতে পারত···" অর্থাৎ ফরাসি বা ইংরেজির যে গুরুত্ব বাঙালীর কাছে তার ওপরেই নির্ভর করছে অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তার কৌতূহলের মাত্রা। মিতভাষী কবি শঙ্খ ঘোষ শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা তুলেছেন: "এই অসাড়তার একটা কারণ কি এই হতে পারে যে আমরা ধরে নিয়েছি অন্য অঞ্চল থেকে আমাদের পাবার কিছু নেই? সাংস্কৃতিক ভূমিতে অনেকটাই উন্নত আমাদের অবস্থান। মননে এবং কর্মে অনেকখানি অগ্রসর আমরা, অনেক দিনের পুরোনো সেই অহমিকাই কি আমাদের অন্তরায় হয়ে এল?" কতদিনের পুরোনো এই অহমিকা? শঙ্খ ঘোষ বলেননি, কিন্তু তিনি জানেন যে এই অহমিকার জন্ম আমাদের ইংরেজি আদর্শে একটা নতুন সাহিত্য সৃষ্টির পর থেকে, আর এই পশ্চিমায়নে আমাদের অগ্রবর্তী ভূমিকাই আমাদের মনের মধ্যে একটা বিপজ্জনক বোধের জন্ম দিয়েছে "অন্য অঞ্চল থেকে আমাদের পাবার কিছু নেই"।

আমাদের ঐতিহ্যের বিস্তারে তাহলে স্পষ্টই আমরা স্থির করে নিয়েছি কোনদিকে আমাদের বিস্তারের পথ। ভারতবর্ষ, এমনকী প্রাচ্যভূমির কোন সাহিত্যই বোধহয় আমাদের কিছু দিতে পারে না, অতএব তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের অভাবে ক্ষতি নেই। কিন্তু পশ্চিমই আধুনিকতার উৎস, অতএব পশ্চিমকে আমরা জানতে যদি না পারি তাহলে বিচ্যুত হব আধুনিকতার পথ থেকে। একই সঙ্গে তাহলে কাজ করছে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা আবার শ্রেষ্ঠের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা।

'শ্রেষ্ঠত্বের বোধ' প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে। পৃথিবীতে মানুষের সমাজ ভিন্ন ভিন্ন, আর ভিন্ন ভিন্ন বলেই তার থেকে জন্ম নিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের বোধ। শ্রেষ্ঠত্বের বোধ মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যকে শুধু বাড়িয়ে দেয়নি, তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা বা আধিপত্যের অধিকার বোধ। আমি যদি শ্রেষ্ঠ হই তাহলে অন্যের ওপর আধিপত্যের একটা নৈতিক অধিকার আমার থাকে। যেহেতু 'অন্য'-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘটে যাচ্ছে নিতান্তই ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কারণে 'অন্য'-কে কিছুটা জানার চেষ্টা করতেই হয়। কিন্তু 'অন্য'-কে আমি জানতে চাই আমার রচিত ভালো-মন্দ, উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট, সাদা-কালোর কাঠামোয়। তাকে কিছুটা বুঝি, কিছুটা ভুল বুঝি, কিছুটা একেবারেই বুঝি না, কিছুটা বুঝতে চাই না। একটা পরিচিত এবং কিছু পরিমাণে অস্বস্তিকর উদাহরণ দেওয়া যাক। হিন্দু-মুসলমান ও আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য। এই কথা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক শঙ্খ ঘোষের 'কেন ইকবাল' প্রবন্ধ পাঠে। ইকবালের কথায় আসার আগে আমি বাংলা সাহিত্যের কথা তুলতে চাই। কয়েক শতাব্দী

ধরে বাংলাভাষী মানুষ নিজেদের জন্য একটা বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল। এই যে বাংলাভাষী মানুষ তারা একটা অখণ্ড সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন নয়, তাদের মধ্যে ভাগ আছে, ভেদ আছে; সেই ভেদ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের, আবার ধর্মেরও। একদিকে যেমন তাদের মধ্যে ঐক্য, তেমনই কোন কোন দিকে বিভেদ। এই বিভেদকে আশ্রয় করে সাহিত্যে হয়েছে সংস্কৃতায়ন, কখনো ইসলামিকরণ। সংস্কৃত-নির্ভর ঐতিহ্যধারার পাশাপাশি আরবী-ফারসী নির্ভর ঐতিহ্যধারা অবশ্য দেখা দিয়েছে, তবু আরবী-ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কোন গভীর যোগ স্থাপিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-ঐতিহ্যের প্রাধান্যের কথা তুলেছেন, ইসলামিকরণের কথাও উঠেছে। এসব চেষ্টার পেছনে ধর্মীয় গোঁড়ামি থাকতে পারে, রাজনীতি থাকতে পারে, কিন্তু একথাও সত্য 'অন্য' এবং 'স্ব'-এর মধ্যে প্রতিরোধ চলছিল অবিরাম। 'অন্য'-এর প্রতি সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাস ভয় যেমন আছে 'স্ব'-এর, তেমনই আছে হয় 'অন্য'-কে অবদমিত করার চেষ্টা, নয়তো 'অন্য'-এর দ্বারা অবদমিত হবার সম্ভাবনা।

ইকবাল উর্দু সাহিত্যের এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব, বিদগ্ধদের মতে গালিবের পর তিনি এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা। গালিব এক অর্থে মুগল সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই দুই জগতের মধ্যবর্তী কবি। বাংলাদেশে উর্দু এবং ফারসীর চর্চা হয়েছে যথেষ্টই, তবু গালিবের কাব্য নিয়ে নতুন বাংলা সাহিত্যের ধাঁরা স্রষ্টা তাঁরা সামান্যতম কৌতূহল দেখাননি। ইকবাল সম্বন্ধেও নয়, কিন্তু ইকবাল সম্বন্ধে যেন ছিল একটা সন্দেহ এবং সেইজন্য প্রতিরোধ। শঙ্খ ঘোষ জানাচ্ছেন "প্রায় সব রচনাতেই ইকবাল আহ্বান জানান নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এক সচলতার দিকে। কিন্তু এই সমস্তকিছুরই বাঁধা পথ তিনি দেখতে পান শুধু ইসলামের সাধনায়।" তিনি আরো বলেছেন কেন ইকবাল ইসলামের মধ্যে সমাধান খুঁজেছেন বহু সমস্যার, বলতে চেয়েছেন কীভাবে ইকবালের ইতিহাস গড়ে উঠেছে, সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর চিন্তাকে, বলেছেন তাঁর ইসলামী মনোভাব যেমন হিন্দুকে নিস্পৃহ করে তুলেছে তাঁর প্রতি, তাঁর ইসলাম-সমালোচনার ফলে কীভাবে গোঁড়া মুসলমানের ধিক্কারের লক্ষ্যবিন্দু হয়ে উঠেছেন ইকবাল। অর্থাৎ একদিক থেকে, ভারতীয় রাজনীতির আবর্তের মধ্যে ইকবালের জীবন উন্মথিত হয়েছে। যে একজাতিত্বের জন্য গত দেড়শ বছর ধরে আমরা ইতিহাসের নানা ব্যাখ্যা দিয়েছি, যে একজাতিত্বের সংগীত ইকবালও রচনা করেছেন, সেই জাতিত্বের বোধকে খণ্ডন করে একদিন ইকবাল দেখা দিলেন প্রতিবাদী ভূমিকায়। শঙ্খ ঘোষ 'জাভিদনামাহ্'-র কয়েকটি ছত্রের অনুপম অনুবাদ করেছেন—সেই ছত্রগুলিতে আছে এক দেশের স্বপ্ন, এক ইউটোপিয়ার কথা—তারপর বলছেন "এই স্বপ্নে যিনি এসে পৌঁছেছিলেন একদিন, আজ

তাঁকে আমাদের সম্পূর্ণভাবে লক্ষ করা দরকার আমাদের নিজেদের ইতিহাসকে পরিচ্ছন্ন করে তুলবার জন্য। আমাদের নিজেদেরই স্বপ্ন-চরিতার্থতার পথগুলিকে নির্মূল করবার গরজে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ইকবালকেও আমরা বুঝতে চাই আজ।" ভারতবর্ষের অন্যতম একজন, সম্ভবত প্রধানতম সমস্যাসংকুল কবি ইকবাল। তাঁকে বাংলাদেশের সাহিত্যিক সমাজ বুঝতে চাননি কোনদিনই, আজও নয়। বুঝতে চাইছেন শঙ্খ ঘোষ। সেটা তাঁর ঐতিহ্যবোধের একটা মাত্রার পরিচায়ক মাত্র। আমাদের আধুনিকতাকে আমরা আমাদের ইতিহাসের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার উৎকণ্ঠা থাকলে তবেই ইকবাল আমাদের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ হিশেবে দেখা দিতে পারেন।

৩

এলিঅটের ঐতিহ্য ও ব্যক্তিক প্রতিভার সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইয়েট্স-এর কথা উঠেছিল। ইয়েট্স যে ঐতিহ্যের বিস্তার চাননি তা নয়। কিন্তু তাঁর কাছে প্রধান প্রয়োজন একটা স্বদেশী মূলের। যতক্ষণ না ব্যক্তিত্ব একটি জাতিগত চরিত্র খুঁজে পায়, অর্থাৎ যতক্ষণ না শক্তভাবে দাঁড়াবার মাটি খুঁজে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে স্বদেশী মডেল অত্যন্ত প্রয়োজন। তা নাহলে সে না শেখে গ্রহণ করতে, যা গ্রহণীয়, না পারে বর্জনীয়কে বর্জন করতে। 'দি চাইল্ড অ্যাণ্ড স্টেট' নামক একটি প্রবন্ধে সাহিত্যশিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন শিক্ষা শুরু হোক 'নিজে'র সাহিত্য দিয়ে, তারপর যুক্ত হোক বাইরের সাহিত্য। এলিঅট বলছেন নিকট ও দূরের, অতীত ও বর্তমানের যুগপৎ অস্তিত্বের বোধ। ইয়েট্স বলছেন তাদের সম্পর্ক ক্রমিক। আমরা এই কথাটাকে সামান্য পরিবর্তিত করে বলতে পারি যে ঐতিহ্যের মধ্যে যেমন নানা স্রোত, নানা উপকরণ আছে, আর আছে বলেই সেখানে গ্রহণ এবং বর্জনের প্রশ্ন ওঠে, সেইরকমই ঐতিহ্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে কতকগুলি উপাদান অগ্রাধিকার পায়। সভ্যতার সব ঐতিহ্যকে যদি নিজের করা যেত তাহলে তো সমস্যা ছিল না। কিন্তু সমগ্রকে আমরা কোনদিনই চিনতে পারব না। কিন্তু সমগ্রের একটা বোধ না থাকলে গ্রহণ-বর্জন করাও কঠিন। আর কোনটিকে আমার আগে প্রয়োজন, অধিক প্রয়োজন এই সিদ্ধান্ত যদি নিতে ভুল হয় তাহলে ঐতিহ্যের বিস্তার যথার্থ বিস্তার কিনা সেই প্রশ্ন ওঠে।

এই প্রশ্ন বিশেষ করে আজ উঠছে এই জন্য যে, ইউরোপীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যখন হয়েছিল তখন ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের আধিপত্যের সম্পর্ক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের মতোই সাংস্কৃতিক আধিপত্য আমরা মেনে নিয়েছিলাম। ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে আজও বিশেষ সংশয় আছে বলে মনে হয় না। হয়তো এ বিষয়ে আমাদের সংশয় থাকাটাই অসংগত—এমন কথাও কেউ কেউ বলবেন। কিন্তু এই নিঃসংশয়

শ্রেষ্ঠত্বের কাছে এমনই আমাদের আত্মসমর্পণ যে ইউরোপকে জানার চেষ্টাতেও আমরা ইংরেজি ভাষার কাছে, ইংরেজের কাছে পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট। শঙ্খ ঘোষের গ্রন্থে অন্তত তিনজন ইউরোপীয় মনীষীর কথা আছে। একজন কবি, একজন কথাকার, একজন সমালোচক—দান্তে, কাফকা এবং লুকাচ : এঁদের প্রতিভার বিশালতা নিয়ে আমাদের সন্দেহ নেই বলাটা যথেষ্ট নয়, বলা উচিত এঁদের প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে, এখনও পর্যন্ত এমন আলোচনা হয়নি এঁদের সম্বন্ধে যা নির্ভরযোগ্য। যখন কোন পরিশ্রমী ভারতীয় কোন বিদেশী ভাষা থেকে আমাদের ভাষায় একটি ইউরোপীয় গ্রন্থ অনুবাদ করেন, দেখা যাবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর মনে তার মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়, তার মূল্য তিনি বিচার করতে চান ইংরেজি কোন অনুবাদেরই পরিপ্রেক্ষিতে। এখানেই ব্যাপক হয়ে দেখা দেয় ঐতিহ্য অর্জনের প্রশ্ন।

অর্জনের প্রথম ধাপ অবশ্যই পরিচয়। কিন্তু পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। যা 'অন্য' তার সঙ্গে পরিচয় একটা সূচনামাত্র। পরিচয় গভীর না হলে 'অন্য'কে শুধু খণ্ডিত জানা নয়, ভুল জানা হবে। কারণ 'অন্য'কে জানা সহজ নয়। ইউরোপ একদিন প্রাচ্যকে জানতে চেয়েছিল এবং দেখেছি সে গড়েছিল তার মনের মতো করে, তার স্বার্থে, এক প্রাচ্যের রূপ। সেই প্রাচ্যের কোন উপাদানই সত্য নয় একথা আমি বলব না, কিন্তু এক রহস্যময়, জাদুকরী, আদিম, কালহীন, পরিবর্তনহীন প্রাচ্য যতটা ইতিহাস-সমর্থিত, তার চেয়ে বেশি একটা নির্মাণ। আমরাও কি একটা প্রতীচী ভাবচিত্র নির্মাণ করিনি ? আমাদের প্রতীচীর নির্মাণে সব সময় মধ্যস্থতা করেছে ইংরেজি ভাষা এবং ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা যে শুধু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে প্রতীচীর সাহিত্যকে জেনেছি তাই নয়, অন্যান্য সব সাহিত্য সম্পর্কিত সংবাদ—সে গ্রীক সাহিত্যই হোক, ল্যাটিন সাহিত্যই হোক, মধ্যযুগের ইউরোপের সাহিত্যই হোক, কিংবা আধুনিক ইউরোপের—তাও সংগ্রহ করেছি ইংরেজির মাধ্যমে। শুধু ইউরোপ কেন, আজ আমাদের অনেকেই "তৃতীয় বিশ্ব" সম্বন্ধে উৎসাহী, সেই তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য ও শিল্পকে কিন্তু চিনছি ইংরেজিরই মাধ্যমে। দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্য কিংবা কৃষ্ণ-আফ্রিকার সাহিত্য আমাদের কাছে ইংরেজি ভাষায় মোড়া প্রতীচীর উপহার হিশেবে পেঁৗছেছে। এইসব কথা নিন্দার্থেই বলছি না। বলছি আমাদের কতকগুলি প্রতিবন্ধকতার কথা। ঐতিহাসিক কারণেই এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দেখা দিয়েছিল। ঐতিহাসিক অবস্থার যে কিছু পরিবর্তন হয়নি তা নয়, কিন্তু প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়নি। ফলে আমাদের 'অন্য'কে চেনার প্রয়োজনে অগ্রাধিকার পায় ভারতবর্ষ নয়, তৃতীয় বিশ্বও নয়, প্রতীচীই। আর সেই প্রতীচীকে আয়ত্ত করার জন্য দুর্গমতর পথের সন্ধান করতে আমরা রাজি নই।

দান্তের সঙ্গে একটা পরিচয় হয়েছিল মাইকেল মধুসূদনের, কিংবা হেমচন্দ্রের,

এমনকী কিশোর রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু কেউ বলবেন না যে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের বিস্তারে দান্তের একটা ভূমিকা ছিল। শঙ্খ ঘোষ দান্তের প্রধান কাব্যের কেন্দ্রীয় সমস্যা এবং খ্রিষ্টীয় পাপবোধের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার পার্থক্য দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কীভাবে আমাদের জীবনে আমাদের ধর্মে এবং শেষপর্যন্ত সাহিত্যিক চৈতন্যে "দুই বিপরীতের তেমন কোনো মিলনবিন্দু শেষ-পর্যন্ত ধরা যায়নি"। তবু শঙ্খ ঘোষ ভাবেন "ব্যক্তি আর বিশ্বকে একই আধারে ধরবার এই চিরন্তন আধুনিকতার খোঁজে যত বেশি উন্মুখ হবে বাংলা কবিতা, ততই বেশি আমরা দান্তের সমীপবর্তী হতে থাকব বলে মনে হয়। তাই গত শতাব্দীর শেষার্ধ তাঁকে যেভাবে পেয়েছিল, এ শতকের শেষে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো দাবিতে তাঁকে সার্থকতর রূপে পাওয়া সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়"। ইচ্ছে, বোধ করি, আমাদের হয়। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষার্ধ—বাংলাদেশের গত শতাব্দীর কবিরা—তাঁকে আদৌ পেয়েছিল কিনা সে সন্দেহ আমার প্রবল। নরকযাত্রার ছবি বাংলা কাব্যে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু তা একটা কৌশল, একটা কাব্যিক সজ্জা মাত্র, বড়ো জোর তা কখনও দিয়েছিল কল্পনাকে একটা বড়ো পরিসরে বিস্তারিত হয়ে যাবার সুযোগ। কিন্তু তার বেশি নয়। আর এ যুগ বারবার যে-আধুনিকতার সন্ধান করছে আর সেই সন্ধানে "চিরন্তন আধুনিকতা"-র ভূমিকার কথা উঠেছে কখনও কখনও, কিন্তু কখনও দান্তের সমীপবর্তী আমরা হতে চেয়েছি বাংলা কবিতার আন্দোলনে এমন সাক্ষ্য নেই।

দান্তের সমীপবর্তী হতেই হবে বাংলা কবিতার অবশ্যই এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক নিবিড় মুহূর্তের সঙ্গেই বাংলা কবিতার কোন সম্পর্ক নেই। গ্রীক কাব্যের প্রচণ্ডতা, আবেগ ও উদ্বেগের তীব্রতা, সভ্যতার সংকটের অনেক জিজ্ঞাসা আমাদের স্পর্শ করেনি। স্পর্শ করেনি ল্যাটিন সাহিত্য, তার ঋজু, মার্জিত, স্থির শিল্পিত জগৎ। স্পর্শ করেনি সমগ্র ইউরোপীয় মধ্যযুগ। রাসিন এবং উগো ধরা পড়েননি আমাদের চৈতন্যে, ধরা পড়েনি গ্যেটের বিশ্ববীক্ষা। কিন্তু আমাদের 'আধুনিকতা' ইউরোপীয় আধুনিকতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করেছে প্রবল ভাবেই। আমরা একটা আধুনিকতাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আরেকটা আধুনিকতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছি। কাফকা প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ ভিন্ন ভিন্ন আধুনিকতার কথা তুলেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। "আমাদের চারপাশে সময়ের যে দায়, কাফকা কি তার থেকে সরিয়ে দেন না আমাদের মন? এই প্রশ্ন লুকাচের। ইতিহাসের যে আধুনিক মানুষ তার পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে চায়, তাকে পঙ্গু করে দিতে পারে এই সার্বিক নির্বেদের—এই angst-এর ধারণা। অদৃশ্য অবোধ্য পরম শক্তির কাছে মানুষ কীটাণুকীট, অসহায় বলি মাত্র সে, এই কি হবে আজ মানুষের পরিচয়? …যে-আধুনিকতা এক পরম শূন্যতার বোধের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মনকে কেবল

নিস্তেজ আর সমর্পণময় করে তোলে, বিরুদ্ধ-লড়াইয়ের সম্ভাবনা আর পথ থেকে কেবলই সরিয়ে দেয় যে-আধুনিকতা, সেই ভয়ংকর আধুনিকতার দিকে নিয়ে যান আমাদের কাফকা—ভেবেছিলেন লুকাচ।" আমরাও অনেকে এই "ভয়ংকর আধুনিকতা" নিয়ে সংশয়ী, আবার আমরাও অনেকে লুকাচের সমালোচনাকে একমাত্রিকই মনে করি (প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভার সামর্থ্য সন্দেহাতীত, কিন্তু আদর্শের কাছে প্রতিশ্রুতির বন্ধন তাঁর সমালোচনাকে একমাত্রিকই করে তুলেছে)। কিন্তু এটা বুঝি যে কাফকার জগৎ তাঁর উপলব্ধ, দৃষ্ট, শ্রুত ইউরোপ থেকে উদ্ভূত। সেই জগৎকে আমরা একেবারেই স্পর্শ করতে পারি না তা নয়, সেই জগৎ আমাদের স্পর্শ করে না তাও নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর আণবিক মারণাস্ত্রে সন্ত্রস্ত প্রতীচীর আরো অনেক লেখকের লেখাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পশ্চিমী সভ্যতার চরম সংকট। কিন্তু সেই সংকটগুলিকে সামাজিক সমস্যা হিশেবে দেখা এক জিনিশ আর তাকে উপলব্ধির বস্তু হিশেবে জানা আর-এক জিনিশ। শঙ্খ ঘোষের মুখে যখন শুনি, "এখনো আমরা কাফকা পড়ব অন্তত এই উপলব্ধির জন্য যে জীবনের বহির্মণ্ডলে কোনো-এক শূন্যতার বোধ মানেই বিফল নৈরাশ্যের বোধ নয়, পরতে পরতে বিচ্ছিন্নতাকে খুলে দেখাবার মানেই সেই বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নেওয়া নয়।"—তখন বুঝি এ তাঁর বিশেষ পাঠ, বিশেষ পাঠকের একটি বিশেষ রচনার প্রতি নিজস্ব অভ্যর্থনা। কিন্তু এটা স্বীকার করা কঠিন হবে যে 'বিচ্ছিন্নতা'র বোধ কাফকাতে, সেই বিচ্ছিন্নতা বঙ্গীয় বা ভারতীয় অভিজ্ঞতার বস্তু। আর যা আমার অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত নয়, তাকে কতদূর বুঝতে পারি। হয়তো সে জন্যই আমাদের আধুনিকতারই অনেকটাই অনুকরণ মাত্র, একটি বৈচিত্র্যের সন্ধান, পশ্চিমের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের মধ্য দিয়ে একটা সম্ভ্রান্ততা অর্জনের চেষ্টা।

মনে হতে পারে এ বুঝি শঙ্খ ঘোষকে অন্যায়ভাবে সমালোচনা করা। সমালোচনা নয় একেবারেই। আর যদি কোন সমালোচনা করার চেষ্টা থাকে এসব মন্তব্যে তা প্রকৃতপক্ষে আত্মসমালোচনা। শঙ্খ ঘোষ এমন একজন কবি এবং এমন পথে তাঁর চিন্তার গতি যেখানে প্রেম ও প্রজ্ঞার মিলনই অভিষ্ট। 'চণ্ডীদাস বা দান্তে' প্রবন্ধে তিনি হৃদয়বত্তাকে বলেছিলেন বঙ্গসংস্কৃতির মৌলিক গুণ। বলেছিলেন তার সঙ্গে বাংলা কবিতা যুক্ত করতে চেয়েছে, কখনো কখনো, 'প্রজ্ঞাভূমির দৃঢ়তা'। আমার ধারণায় শঙ্খ ঘোষের নিজের কবিতার লক্ষ্যও তাই, হৃদয়বত্তা ও প্রজ্ঞার মিলন। আর এই মিলনের জন্যই তিনি সাড়া দেন মানুষের ইতিহাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই ঠিকই, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা এক গোষ্ঠীর মানুষের জীবনে মূল্যবান তাকে বুঝে নিতে চাওয়া মানুষ এবং কবি হিশেবে তিনি সম্ভবত এটাই কর্তব্য মনে করেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটা স্থির বিন্দুতে আর তাঁর বিন্দুটি স্থির

বলেই তিনি সাড়া দিতে পারেন দশদিকের আহ্বানে, তিনি আন্দোলিত হন, কিন্তু উন্মূলিত হবার ভয় নেই তাঁর। সেইজন্যই আমি যাকে বলেছি আমাদের আধুনিকতার আন্দোলনে সম্রান্ততা অর্জনের চেষ্টা তাকে তিনি অস্বীকার করেন সহজে। তিনি জানেন তাঁর একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, কিন্তু সেই নিজস্ব ইতিহাস একটি জাতির। একটি সংস্কৃতির ইতিহাসও বটে। আবার এটাও তিনি জানেন যে বিশ্বজোড়া যে 'অন্য', সেই অন্যের অভিজ্ঞতা মানুষেরই অভিজ্ঞতা, তাকে জানা, নিজেকে জানা। প্লেটো বলেছিলেন যদি নিজেকে জানতে চাও তো আরেকটি আত্মাকে জানো। 'ঐতিহ্যের বিস্তার' গ্রন্থের যেটি কেন্দ্রীয় বিষয় তা হলো অন্যকে জানার মধ্যে দিয়ে নিজেকে জানা, এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্যের অভিজ্ঞতার তুলনা, প্রতিতুলনার মধ্য দিয়ে অন্য ও নিজের পার্থক্য স্বীকার করা। তাঁর কবিতার সঙ্গে তাঁর এই দার্শনিক বোধ কতটা যুক্ত, বা কীভাবে এই বোধ তাঁর কবিতাকে একটা বিশেষ মাত্রা দিয়েছে, কীভাবে তাঁর কবিতাকে করেছে "চিরন্তন আধুনিকতার" সমীপবর্তী সে আলোচনার সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু এই বারোটি প্রবন্ধে একটা বিশাল স্থান সৃষ্টি হয়েছে, সেই স্থানগত বিশালতার মধ্যে আমাদের ঐতিহ্যের বোধ হয়ে উঠেছে প্রশ্নসংকুল, সমস্যাকীর্ণ। এই স্থানগত ব্যাপ্তি, (যেখানে রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে নানা সূত্রে আসছেন ইকবাল কিংবা কুমারন আসান, দান্তে, কাফকা, এলিয়ট) দাবী করছে আমাদের চৈতন্যের ব্যাপ্তি। কিন্তু এই ব্যাপ্তি এইজন্য নয় যে তা আমাদের চিন্তা ও কর্মকে একটা বিশেষ সম্রান্ততা দেবে ক্ষমতাবানের সঙ্গে যুক্ত করে ; এই ব্যাপ্তি প্রয়োজন এইজন্য যে তা মানুষের ইতিহাসের একটি পর্বকে আমার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত করবে। ঠিক একই কারণে তিনি বলবেন ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন যে ভারতীয় সাহিত্যধারা যাকে আমরা অবহেলা করেছি উদ্ধত অহমিকায়, তার কাছেও যেতে হবে শিক্ষা নিতে। কারণ তা-ই আমাদের যুক্ত করবে আর একটা ব্যাপ্তির সঙ্গে। ঐতিহ্যের কথা যখনই আমরা বলি তখনই বলি তার কালিক মাত্রার কথা, অতীত আর বর্তমানের সম্পর্কের কথা কিন্তু ঐতিহ্যের যে বিস্তার তা শুধু কালিক নয়, স্থানিকও বটে। আর তার ফলে আমার নিজস্ব বাংলা থেকে বিস্তারিত হতে চাই বৃহত্তর ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষ থেকে, অব্যবহিত ইতিহাস-ভূগোল-রাজনীতির সীমান্ত পার হয়ে আরো বড়ো বিশ্বে। অবশ্যই এই বিস্তারের প্রেরণা সহজ সরল অনায়াস নয়, অনায়াস নয় এই বিস্তারের প্রক্রিয়া। এর সঙ্গে জড়িত আছে আমাদের 'অন্য'-এর প্রতি মনোভাব, ক্ষমতার চক্রান্ত, আধিপত্যের রাজনীতি। কিন্তু তার মধ্য দিয়েই তো ক্রমাগত আবর্তিত হয়ে চলেছে মানুষের ইতিহাস, মানুষের কবিতার ইতিহাস এবং আধুনিকতার ইতিহাস। 'ঐতিহ্যের বিস্তার' শুধু সেইজন্যই এক স্মরণীয় রচনা : এক সংবেদনশীল কবির আত্মজিজ্ঞাসা।

8

ভা র তী ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

•••

নির্মাণের কুয়াশা থেকে সৃষ্টির রৌদ্রে : শঙ্খ ঘোষের গদ্য

এক

'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে।'

শুধু গান কেন, লেখাও লেখকের একলার নয়। সেখানে লেখকের চেতনার এক প্রচ্ছন্ন প্রান্তে রয়েছে তাঁর পাঠক, যাঁর জন্য তাঁর লেখা। যখন লেখেন সেই মুহূর্তে লেখক একলা, হয়তো সেই মুহূর্তে নিঃসঙ্গতাই তাঁর পরম কাম্য, সর্জ্যমান সেই মুহূর্তে লেখক জানেন এই লেখা দিয়েই গড়তে হবে পাঠকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সেতু, তাঁর ভাবনাকে সঞ্চারিত করতে হবে তাঁর পাঠকের মধ্যেও। ভাবনা লেখকের আর পাঠক গ্রহীতা। এই দেওয়া-নেওয়ার মাঝখানে রয়েছে উভয়ের মধ্যস্থিত সেই সেতু, লেখকের ভাবনা প্রকাশের সেই রীতি, তাঁর শৈলী, যা এক লেখককে স্বতন্ত্র করে তোলে অন্যদের থেকে। পাঠক তো বহুচারী, কেবল একজনের লেখা পড়ে পাঠক তৃপ্ত নন। কাজেই লেখককে আয়োজন করতে হয় পাঠকের মনোরঞ্জনের, তাঁর যে ভাবনা তিনি পাঠককে উপহার দিতে চান তাকে সাজিয়ে তোলার দায়ভার নিতে হয় তাঁকে, নিজের লেখাকে বিশিষ্ট করে তুলতে হয়। তবু তাঁর এই বৈশিষ্ট্য, তাঁর এই প্রাতিস্বিকতা, সে কেবল অলংকরণ নয়, কেবল তাঁর রচনার আভরণমাত্র নয়, সে তাঁর ব্যক্তিত্বের ফুটে ওঠা, সে তাঁর অস্মিতার পরম ঐশ্বর্যের প্রতিভাস।

ছন্দোবদ্ধ কবিতাই হোক অথবা গদ্যময় প্রবন্ধ—যে কোনো রচনার মধ্যেই লেখক রেখে যান তাঁর সেই ফুটে ওঠার অমোঘ পরিচয়। তাতেই তিনি হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র, একক ও অনন্য। বহুচারী পাঠকও তাঁকে চিনে নেন, জেনে যান এই ভবে তাঁর রীতি বা শৈলী বা স্টাইল, যা দিয়ে লেখক গড়ে তোলেন নিজের ভাবনার সেই অবয়ব যা পাঠককে সাহায্য করবে তাঁকে আলাদা করে চিনে নিতে।

বস্তুত, লেখকের কাজ যেন দুভাগে বিভক্ত; এক, নিজের মধ্যে তাঁর ভাবনার নির্মাণ; দুই, ভাষায় সেই ভাবনার প্রতিরূপ সংস্থাপন। এই দুইয়ে মিলেই সম্পূর্ণ তাঁর সৃষ্টি। এ যেন একই বাড়ির অন্দরমহল আর বাহিরমহলে

মিলে সম্পূর্ণতার আয়োজন। এই দুইয়ের মধ্যে যে জোড়, সেই জোড় নিপুণ হাতে মেলানোই শিল্প, সেই মেলানোতেই শৈলী সার্থক।

কেবলমাত্র কবিতাতে নয়, গদ্য রচনাতে-ও এই জোড়মেলানোর কাজে সফল শঙ্খ ঘোষের গদ্যরচনা এক বিশিষ্ট গদ্যশিল্পীর নিদর্শন। প্রথমত এবং শেষত কবি হলেও শঙ্খ ঘোষের গদ্যরচনার পরিমাণ চোখে পড়ার মত। মূলত কবি এই গদ্যকার এই মুহূর্তে আমাদের সমসাময়িক প্রবন্ধকারদের অন্যতম। সাহিত্যের ইতিহাসে কবিদের গদ্যরচনা, বিশেষত সমালোচনা-কর্ম কোনো নতুন কথা নয়। সিডনির 'আন অ্যাপলজি ফর পোয়েট্রি' কবিকে নতুন ভূমিকায় হাজির করেছিল। পরে সেই ভূমিকায় হাজির হয়েছেন আরো অনেকে; ড্রাইডেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কোলরিজ থেকে এলিয়ট, অডেন। য়ুরোপেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি, যদিচ অনেক সময়েরই কবি গদ্যের লেখনী তুলে নিয়েছেন সমসময়ের ঘাত প্রতিঘাত থেকে তাঁর প্রিয়তমা কবিতা কল্পনালতাকে আড়াল-আবডাল করতেই। কবির এই ভূমিকা ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে, সূক্ষ্ম হয়েছে। আত্মম্ভরিতাও ঘটেছে কখনো, যে আত্মম্ভরিতায় এলিয়ট একমাত্র কবিকেই নিখুঁত সমালোচকের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তো সহস্রভুজ, তিনি লেখেননি এমন বিষয় কই। লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ অনেকে এবং আমরা লক্ষ করি যে কবির লেখনী গদ্যেও পারঙ্গম এবং কবি আলাদা, গদ্যকার আলাদা, কবি হলে গদ্যকার হওয়া যাবে না ইত্যাকার কথা আর বলা যাচ্ছে না, বরং এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে পাওয়া সমালোচনাভিমুখী গদ্যরচনার এক উল্লেখযোগ্য অংশই চলে যাচ্ছে কবিদের ভাগে। এলিয়টের অসতর্ক উক্তিকে পরিহার করতে চাইলে-ও একথা অস্বীকার করা যাচ্ছে কই যে কবিরাই চলে আসছেন সমালোচকদের প্রথম সারিতে!

কবি-সমালোচকের এই ধারারই উল্লেখযোগ্য প্রতিভূ শঙ্খ ঘোষ। কেবল মাত্র কবিতার ব্যাখ্যাতা হিসেবে নয়, আমাদের সময়ের অন্যতম প্রধান রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে, শিল্প ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুধাবক হিসেবে এবং শিল্প ও জীবনের বহুমুখীনতার প্রতি দায়বদ্ধ মানুষ হিসেবে তাঁকে গদ্যের লেখনীও তুলে নিতে হয়েছে, এবং তাতে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার ধারা যে ক্রমশই লাভবান হচ্ছে একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাঁর গদ্যের পরিকাঠামো মূলত গড়ে উঠেছে তাঁর কেন্দ্রীয় ভাবনাগুলির ভিত্তিভূমিতে, আর তাঁর গদ্যরচনার সঙ্গে পরিচিত পাঠক মাত্রেই জানেন তাঁর ভাবনার জগৎ অধিকার করে আছে কবিতা, কবিতার বহু সুর ও বহুল স্বর— বহু প্রসারিত ও ব্যাপক অর্থে, আর রবীন্দ্রনাথ। 'কল্পনার হিস্টিরিয়া' প্রকাশিত-

হওয়ায় বোঝা যায় অবনীন্দ্রনাথের প্রবল প্রতিভা তাঁর মনোযোগ কতখানি অধিকার করে রেখেছে। 'ছন্দের বারান্দা' ছন্দ-সংক্রান্ত আলোচনা কত মনোজ্ঞ হতে পারে তার সাক্ষ্য দেয়। 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', 'এ আমির আবরণ', 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' আর 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'তে তিনি বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে—সম্ভবত তাঁর সং থেকে প্রিয় বিষয়। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবি কবিতা বা সাধারণভাবে সাহিত্য বিষয়ে এত গদ্য লেখেননি আমাদের ভাষায়।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর গদ্যনিবন্ধের বইগুলি হলো—কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক (১৯৬৯), নিঃশব্দের তর্জনী (১৯৭১), ছন্দের বারান্দা (১৯৭২), ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৩), এ আমির আবরণ (১৯৮০), উর্বশীর হাসি (১৯৮১), শব্দ আর সত্য (১৯৮২), নির্মাণ আর সৃষ্টি (১৯৮২), কল্পনার হিস্টিরিয়া (১৯৮৪), ঐতিহ্যের বিস্তার (১৯৮৯), কবিতা-লেখা কবিতা-পড়া (১৯৯০)[1]। অন্তরঙ্গ-জাতীয় গদ্য রচনার মধ্যে রয়েছে জার্নাল (১৯৮৫), ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম (১৯৮৬) ও কবিতার মুহূর্ত (১৯৮৭)। এছাড়া ছোটদের জন্য তাঁর কিছু গদ্য রচনা আছে। এই তালিকার বইয়ে-ও তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি এখনো পুস্তক-রূপ পায়নি। এই প্রবন্ধে অবশ্য তাঁর গদ্যরীতিপ্রসঙ্গে আমরা নিবন্ধের বইগুলির মধ্যে আলোচনা সীমায়িত রাখব।

দুই

'মাঝখানে অনেকদিন আমরা সৌম্য আয়তনের চতুর্ধারে ঘুরেছি, মনোরম উদ্যানে কিংবা পথের ধুলোয়। কখনো শৌখিন অবসর, কখনো চতুর বক্রতা, কখনো প্রমত্ত আহ্বান, কচিৎ-বা ছিন্ন রক্তপাতে ভরে গিয়েছে কবিতা। এর মধ্যে একরকম তৃপ্তি ছিল হয়তো, যাকে বলা যায় ছোটো ছোটো সম্পূর্ণতার তুষ্টি। কেননা কবিতার জগৎকে মাঝখানে অনেকদিন দেখেছি বহির্জীবনে দুর্নাম, বহির্জীবনের রূপে অথবা রূপহীনতায় যেন সে জীবন-নামক আদিম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশের পথ ভুলে গিয়েছে।' [দেশ / বর্ষ ২৯ / সংখ্যা ২১ / ৩০ মার্চ, ১৯৬২]

"রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী জানিয়েছিল যে তার রঞ্জন শঙ্খিনী নদীর মতো 'সে যেমন ভাসতে-ও পারে তেমনি ভাঙতে-ও পারে।' সন্দেহ নেই যে রঞ্জন চরিত্রের এই বর্ণনা নাট্যবিষয়ের বড়ো একটি সূত্র, কিন্তু তার জন্য কি প্রয়োজন

[1] এই নিবন্ধটি যখন লেখা হয়, তখন পর্যন্ত 'ছন্দোময় জীবন' প্রকাশিত হয়নি। —সম্পাদক

ছিল শঙ্খিনী নদীর সঙ্গে আকস্মিক এই তুলনা? একি নিতান্ত সাজিয়ে বলা নয়? এই প্রশ্ন খানিকটা থমকে যায় পরিণতির দিকে অনেকটা এগিয়ে, যখন ওই একই শব্দগুচ্ছ আবার ফিরে আসে অধ্যাপকের মুখে।' [কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, ১৯৬৯]

'আমরা চাই হৃদয় অথবা মেধা, জাদু অথবা যুক্তি, রহস্য অথবা স্বচ্ছতা, ব্যক্তি অথবা সমাজ, শমতা কিংবা ক্ষোভ, নম্রতা বা বিদ্রোহ, আসক্তি বা বিদ্রূপ। আমরা নির্বাচন করে নিই এর মধ্যে যে কোনো এক দিক, মনে করতে থাকি সেইটেকেই জীবনের সম্পূর্ণতা, জীবন থেকে ছিন্ন করে নিজেকে ক্রমে রুদ্ধ করতে থাকি মতির একটা গণ্ডিতে আর সেই গণ্ডির জাল ফেলে আমরা ধরতে চাই ওর মধ্যে কবি বা কবিতার জগৎ।' [শব্দ আর সত্য, ১৯৮২]

'আর সেই আলোয় আমরা দেখতে পাব রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি তার আত্মসচেতনতা নিয়ে এগিয়ে আসছে সেইখানে, ক্রমেই যেখানে আমরা এগিয়ে যাই অতীতের মেলোডি থেকে আধুনিকের এক হার্মোনির দিকে, যেখানে আমরা ছিন্ন একাকী দিশাহারা মানুষকে কেবলই এক যোগের দিকে উন্মুখ দেখতে পাই, আত্মকেন্দ্রের বাইরে এসে বিশ্বপ্রকৃতির আর বিশ্বইতিহাসের সঙ্গে কোনো অন্তর্মূল যোগ, কেননা মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয় হচ্ছে এই যে মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।' [নির্মাণ আর সৃষ্টি, ১৯৮২]

শুরুতে গদ্য এসেছিল আমাদের দিনযাপনের ভাষা হয়ে, প্রতিদিনকার জীবনের রুক্ষ ধূসর মালিন্যের ছোঁয়া-লাগা হয়ে, প্রয়োজনের বাহন হয়ে। সব ভাষাতেই মানুষ প্রথম কথা বলছে গদ্যে, কিন্তু তার প্রথম সাহিত্য রচনা করেছে পদ্যে, এমন-কী সে যে কথা বলছে গদ্যে, এই স্বীকৃতিটুকুও গদ্যকে দিয়েছে অনেক দেরিতে। অনেকেই জানেন মলিয়েরের Le Bourgeois Gentilhomme নাটকের পল জুর্দ্যাঁর কথা, যে অবাক হয়ে যায় শুনে যে জীবনভর সে গদ্যে কথা বলেছে। প্রতিদিনের চেনা গদ্যকে চিনতে, তার শক্তি ও সম্ভাবনাকে জানতে দেরি হয়েছে মানুষের। তাই সাহিত্যের ভাষা হিসেবে সে বেছে নিয়েছিল তার প্রতিদিনের প্রতিকাজের ভাষা থেকে একটু দূরসংস্থিত —পদ্যের ভাষাকে। কবিতাই তাই সাহিত্যের প্রথম উচ্চারণ, আর গদ্য রইল মানুষের কাজের ভাষা হয়ে, যদিচ উভয়েরই উৎস ছিল একই—মানুষের মুখের ভাষা বা বচন। অথচ এ-ও সাহিত্যের এক প্রহেলিকা যে কালক্রমে পদ্যের বিস্তৃত সাম্রাজ্য গেল গুটিয়ে, পদ্যের ব্যবহার সংকুচিত হতে হতে ঠেকল এসে কেবল কবিতায় বা কখনো সখনো কাব্যনাট্যে, আর জায়গা বদলিয়ে গদ্য এল

স্বয়োরানীর আসনে। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—মানুষের জ্ঞানের অগণিত শাখা-প্রশাখা গদ্যেই খুঁজে পেল নিজের নিজের সম্ভাবনা উন্মোচনের পথ। এত রকম বিষয়ের চর্চা গদ্যকে-ও সমৃদ্ধ করে তুলল। সাহিত্য-ও খুঁজে পেল নতুন যুগের নতুন মানুষের উপযোগী মাধ্যম—গদ্যেই, যা তার মুখের ভাষা বচন থেকে পৃথক।

গদ্যের ইতিহাস তাই এক ধারাবাহিক নির্মাণের ইতিহাস। কালক্রমে গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-সমালোচনা—সবকিছুর জন্যই সচেতন গদ্যের নির্মাণ আর কখনো কখনো সেই গদ্য নির্মাণকে অতিক্রম করে সৃষ্টির মুখোমুখি।

বিভিন্ন সময়ে লেখা শঙ্খ ঘোষের গদ্যের যে নমুনা চতুষ্ক দিয়ে প্রবন্ধের এই পর্বটির শুরু, কালানুক্রমিক সেই উদ্ধৃতি সাজানোর লক্ষ্য শঙ্খ ঘোষের গদ্যরীতির চুম্বক উপস্থাপন তো নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে এ-ও দেখতে চেষ্টা করা কোথায় সেই বুফোঁ কথিত **Style is the man himself**-এর যাথার্থ্য, আর এ-ও দেখা যে নির্মাণের কুয়াশা থেকে কেমন করে গদ্য পৌঁছয় সৃষ্টির উজ্জ্বল রৌদ্রে।

তিন

শঙ্খ ঘোষের গদ্যরচনাগুলি মূলত আলোচনাভিত্তিক, কাজেই সেখানে তাঁর প্রধান কর্তব্য কোনো না কোনো বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা। কিন্তু কেবল আলোচনার জন্য আলোচনা নয়, নীরস, নীরক্ত, লাবণ্যহীন গদ্যময় নিবন্ধ নয়—শঙ্খ ঘোষের আহৃত উত্তরাধিকার বিশাল ও ব্যাপক—রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে গদ্যনিবন্ধের যে ধারা নতুন খাতে বয়ে গেছে সেই ধারারই তন্নিষ্ঠ চারণ তিনি। আমরা লক্ষ করি, বিশেষ করে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নিবন্ধসাহিত্য অর্জন করে নিয়েছে এক বিশেষ মান, যখন বিষয়বস্তু এবং তার শৈলী উভয়-ই হয়ে উঠছে সমান গুরুত্বের অধিকারী, এবং পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে উভয়েরই সমান আকাঙ্ক্ষা। কখনো কখনো এমন-ও হয় যে কোনো একটি প্রবন্ধের বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র লিখনরীতি ও সাহিত্যগুণের আকর্ষণেই প্রবন্ধটি পড়া হয়ে যায়। কথাটা আপাতবিরোধী মনে হলে-ও সত্যি যে তথ্যভার তার মূল আকর্ষণ হওয়া উচিত, অলিখিত নিয়মটা এরকম হলেও, অনেক সময়ে তথ্য বা তত্ত্বের পাশাপাশি আরো একটা আকর্ষণ তৈরি হয়ে ওঠে প্রবন্ধের—সে তার রীতি, নিবন্ধকারের বলার বিশেষ ভঙ্গি বা স্টাইল। নিবন্ধের বিষয় তো নিশ্চয়ই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—কিন্তু এ-ও সত্যি যে বিষয়ের সেই

পরিবেশনভঙ্গিটি-ও কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে চার্লস ল্যামের কথা নিশ্চয়-ই মনে পড়ে যাবে আমাদের—কত সামান্য সব বিষয়ে নিয়ে তাঁর সেই 'এসেজ অফ্ ইলায়া'—অথচ কি অসামান্য তাঁর সেই তুচ্ছ, সামান্য কথাগুলি বলবার ভঙ্গি। 'স্বপ্নসন্ততি' [Dream Children] নিয়ে তাঁর সেই অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ—প্রবন্ধের স্টাইল কী হতে পারে, কতদূর বিস্তৃত ও নমনীয়, তার ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত সেখানে রেখে গেছেন তিনি। যখন লেখেন কীভাবে তিনি কমলাকুঞ্জে কমলালেবুর মতো পেকে উঠতে চান রৌদ্রে বা যখন লেখেন যে দ্বাদশ সীজার এর মূর্তি হয়ে যান, বা সূচনা থেকেই যখন তিনি কথা বলে চলেন অস্তিত্বহীন, অবয়বহীন তাঁর কল্পসন্তানদের সঙ্গে—তাঁর এই কল্পনার লাগাম-উধাও কথাবার্তা-ও যখন বলেন, সবসময়েই পরম বিশ্বাস্য মনে হয় তাঁকে—এইখানেই তাঁর স্টাইলের জিত, আর এইখানেই তিনি হয়ে ওঠেন মঁতেইন-এর প্রবন্ধধারার সবচেয়ে সার্থক উত্তরসূরি। এ তুলনাটা একটু প্রান্তিক হতে পারে, কিন্তু প্রবন্ধ রচনার স্টাইল কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এ তুলনা হয়তো সেই কথাটাই আর একবার মনে করিয়ে দেবে আমাদের।

শঙ্খ ঘোষের গদ্যরচনার রীতিই এখানে বিশেষ বিবেচ্য, কাজেই গদ্যরচনার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে ঘটে উঠবে না। তাঁর গদ্যরচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন তাঁর প্রবন্ধগুলি বা আলোচিত বিষয়গুলি তাঁর বৈদগ্ধ্য ও নিজস্ব ভাবনার আলোকপাতে কতখানি উজ্জ্বল। কিন্তু এ-ও সহজেই লক্ষ করা যায় যে তাঁর প্রবন্ধের একটা নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছে, একটা বিশেষ শৈলী, এবং এমন-কী 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'র মতো গ্রন্থে-ও পাঠক পেয়ে যান একটা সহজ কথা বলার ভঙ্গি, যেন সেখানে এক কবির বিষয়ে কথা বলছেন আরেক কবি—এমন একটা ভাবনা প্রথমেই আমাদের চিন্তাকে স্পর্শ করে।

কবি যখন গদ্য লেখেন তিনি কি তাঁর কবিসত্তাকে ছেড়ে আসেন, না কি তাঁর কবিসত্তা ও নিবন্ধকার চরিত্র সমান্তরালভাবে এগোতে থাকে? কবি ও নিবন্ধকার একই ব্যক্তি হলে সম্ভাব্য বিপদসমূহের মধ্যে এই দুটো সম্ভাবনা-ই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। শঙ্খ ঘোষের গদ্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর গদ্যরচনায় কখনোই তাঁর এই দুই সত্তা পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে না এবং কখনো-ই সমান্তরাল গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে চায় না। তাঁর নিবন্ধকার সত্তা যখন দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় স্ফূর্তি পায়, [বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন কেননা যে কোনো পাঠকই জানেন তাঁর গদ্যরচনার বিষয়বৈচিত্র্যের এবং বিষয়প্রাচুর্যের কথা] তাঁর কবিসত্তা তখন তার সম্পূর্ণ সহযোগী। ফলত তাঁর গদ্যরীতির মধ্যে সমন্বয়

ঘটে গদ্যের ঋজু সামর্থ্য ও কবিত্বের লাবণ্যের। কবিতার নয়, কবিত্বের, যে কবিত্ব থাকে 'রচনার নিহিত নির্যাসে'। বস্তুত, শঙ্খ ঘোষের গদ্যে এই দুই সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা টের পাই না, বরং দেখি যে এই দুইয়ের জটিল ও সূক্ষ্ম সংমিশ্রণে তাঁর গদ্য হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে যে নমুনাচতুষ্ক উপস্থিত করা হয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে কালের দূরত্ব বিস্তর। পড়লেই বোঝা যায় লেখাগুলির একটির সঙ্গে অন্যটির বিদ্যুৎসঞ্চারী পার্থক্য কোথায়। কিন্তু তবু একটি সাধারণ সূত্র সবকটি লেখার মধ্যেই সঞ্চরমান থাকে, এবং তাকে চিনে নিতে পাঠকের ভুল হয় না। মনে হয় খুব একটা ভুল বলা হবে না যদি সেই সাধারণ লক্ষণটিকে চিহ্নিত করি শঙ্খ ঘোষের গদ্যের কাব্যিক চলন বলে। প্রথম উদ্ধৃতিটির ও শেষের উদ্ধৃতিটির মধ্যেকার গুণগত পার্থক্য স্বয়ম্প্রকট, তবু এই লক্ষণটির জন্যই উভয়ের স্রষ্টা যে একজন একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অথচ তাঁর গদ্যের এই কাব্যিক চলন বা স্ফূর্তি, অনুধাবনে ধরা পড়ে, এ কেবল তাঁর ভাষার বাইরের অলংকরণ নয় বা বাইরে থেকে আরোপিত এক লঘু কাব্যময়তা মাত্র নয়, তাঁর গদ্যের এই বিশেষ চরিত্র নিহিত তাঁর রচনার নিহিত চারিত্রে। মিডল্‌টন মারি লিখছেন : Style is organic, not the clothes a man wears, but the flesh, bone and blood of his body. [The Problem of Style, Page 122]

আধুনিকরা হয়তো মারিকে রীতিবিদ হিসেবে প্রাচীন বলবেন, কিন্তু এখানে মারি স্টাইলের এক শাশ্বত ধর্মের দিকে নির্দেশ করছেন। তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত নিবন্ধগ্রন্থ 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' থেকে তাঁর শেষতম গদ্যরচনা সম্পর্কেই একথা সত্যি যে তাঁর গদ্যের এই কাব্যিক চরিত্র, এ এক আরোপিত বা চেষ্টাকৃত রীতিমাত্র নয়। তাঁর গদ্যের স্বচ্ছ, তরতরে কাব্যিক ভঙ্গির প্রাণরস সঞ্চিত থাকে তাঁর বক্তব্যের অন্তরে। মূলত তাঁর বিষয় কবি বা কবিতা বলে লেখার অন্তর্নিহিত সুরটি কবিতাকে কেন্দ্র করে রণিত হয়, ফলে এই কাব্যিক গদ্যভঙ্গি তাঁর গদ্যে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। মনে করা যাক 'শব্দ আর সত্য' গ্রন্থের প্রথম লেখা 'লেখকের নিয়তি' থেকে তাঁর দু-চারটি গদ্য লাইন :

'আর সকলে মিথ্যা বলে বলুক, দু-চারজনের কাছে আমরা সত্য চাই।
আর সকলে ভ্রান্ত করে করুক, দু-চারজনের কাছে আমরা ব্রত চাই।'

পাঠক যদি মনে-মনে না পড়ে এই পঙ্‌ক্তিগুলো জোরে উচ্চারণ করেন, তাহলে শঙ্খ ঘোষের গদ্যের অন্তর্নিহিত কাব্যিক গুণ সহজেই কানে বাজবে তাঁর।

'বাংলা ছন্দ' [সাহিত্যচর্চা] নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখে-

ছিলেন "ছন্দ, রিদম্, এটা যে শুধু পদ্যেরই প্রাইভেট প্রপার্টি তাতো নয়, গদ্যের শিল্পরূপেরও তাতে অধিকার আছে।" বা আরো বিশেষ করে বলেছেন : "গদ্যে ছন্দের মত 'সুনিয়মিত, সুপরিমিত ও সুনির্দিষ্ট' ধ্বনিবিন্যাস নেই, অর্থাৎ মিটার নেই, এ তো জানা কথাই, কিন্তু ছন্দস্পন্দ আছে, রিদম্ আছে ; গদ্য ছন্দকে স্বীকার না-ক'রে তাই উপায় কী।" বা "বিশ্বসাহিত্য থেকে গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি যদি সংগ্রহ করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে তার কোনোটিই ছন্দচ্যুত নয়। গদ্য যখন সাহিত্য হয়েছে, আর্ট হয়েছে, তখন ছন্দস্পন্দন জেগে উঠেছে অনিবার্যভাবেই।"

[সাহিত্য চর্চা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬]

শঙ্খ ঘোষের গদ্যে আছে সেই অন্তর্লীন ছন্দ বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন ছন্দস্পন্দ। 'এ আমির আবরণ'-এর 'মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়' নিবন্ধের কয়েকটি গদ্য পঙ্‌ক্তির পাশাপাশি রাখছি 'নিহিত পাতালছায়া' কাব্যগ্রন্থের "এখন সময় নয়,' কবিতার কয়েকটি চরণ :

'কেবলই একটি তরুণীর কথা শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথের গানে, কেবলই শুনি যাওয়ার কথা। কিন্তু কোথায় যাব ? কোন মরণলীলায় ?

[এ আমির আবরণ, পৃঃ ১৬]

'এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকত না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকত সেই না থাকা, কোন্ পাত্রে' ?

[এখন সময় নয় / নিহিত পাতালছায়া]

প্রথম উদ্ধৃতিটি গদ্য থেকে আহৃত, দ্বিতীয়টি গদ্যকবিতার। কিন্তু কত সহজেই উঠে আসে এই দুই উদ্ধৃতির অন্তঃস্থিত ছন্দের সাদৃশ্য, আর পরপর পড়ে গেলে সেই ছন্দসাদৃশ্য সহজেই কানে বাজে পাঠকের।

শঙ্খ ঘোষের গদ্যের অনুধাবনে ধরা পড়ে তাঁর গদ্যরচনার এই ছন্দস্পন্দ এক অভ্যন্তরীণ উৎসার। শব্দের সচেতন প্রয়োগ তাঁর ভাষায় ধ্বনিমাধুর্য যোগ করে। অসামান্য ভাষাপ্রয়োগ তাঁর গদ্যরীতির বিশেষ সহায়ক। 'এ আমির আবরণ'-এ লিখেছেন : 'ঘরকে তিনি করে তুলবেন তাঁর আত্মস্থতার মুদ্রা' বা 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'তে : 'তারপর পঁচিশ বছর বয়স হলো, বাইরের সঙ্গে তাঁর অন্য এক সম্পর্ক, সকরুণ মূলতানে গুন্‌গুন্ তাঁর গানের সুর গিয়ে পৌঁছচ্ছে নারকেলডালে। আর তারপর আজ, আবার তিনি একা, মধ্য বয়সের সঙ্গীরা সব কখন সরে গিয়েছে চিরদিনের অন্তরালে' ; বা 'শব্দবাহুল্যের বাইরে দাঁড়িয়ে, বিজ্ঞাপনের বাইরে দাঁড়িয়ে, ভুল আস্ফালনের বাইরে দাঁড়িয়ে, সত্যিই যদি নিজেকে, নিজের ভিতর এবং বাহিরকে আগ্নেয় জীবনযাপনের বিভীষিকার সামনে খুলে দিতে পারেন কবি, সেই হবে আজ তাঁর অস্তিত্বের

পরম যোগ্যতা, তাঁর কবিতা' [শব্দ আর সত্য]—এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে সহজেই ধরা পড়ে যে লেখার থীম এবং ভাষাপ্রয়োগ একাত্ম হলে কেমন করে গড়ে তুলতেও পারে এক স্ফূর্ত ছন্দস্পন্দ যা কবিতার 'ফর্ম'-নিরপেক্ষ। 'নিঃশব্দের তর্জনী'র 'ছন্দোহীন সাম্প্রতিক' প্রবন্ধটি বিশেষ করে নজর করব আমরা একবার, কেননা বিষয় এবং গদ্য একাত্ম হয়ে উঠেছে এখানে, এখানে তাঁর রীতি হয়ে উঠেছে প্রবলভাবে মাব্রি-কথিত 'Organic': 'ছন্দের এই অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত স্রোত তৈরি হলে তার ওপর কবি ভাসিয়ে দেন তাঁর শব্দমালা, তখন পরিচিত শব্দগুলি একটু একটু করে তার পাপড়ি খুলে নিতে পারে'। বলা যায় তাঁর গদ্যের ছন্দস্পন্দ শব্দের ধ্বনিমাধুর্যের কাছে অনেকটাই ঋণী হয়ে থাকে। নিবন্ধের ভাষায় এই অনায়াস প্রতিমার ব্যবহার এক অভ্যন্তরীণ ছন্দ তৈরি করে যা 'মিটার'-এর বিকল্প হয়ে ওঠে এবং আমরা দেখতে পাই কেমন করে তাঁর গদ্যের স্রোত একটু একটু করে ছন্দস্পন্দকে পাপড়ি মেলতে সাহায্য করে।

'নিঃশব্দের তর্জনী' থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে আনছি শঙ্খ ঘোষের গদ্যের ছন্দস্পন্দ লক্ষ করার জন্য।

'তবে কি ফিরে যাওয়া প্রকৃতিতে? প্রকৃতি, সে তো ছাড়ে না কখনো, তার সঙ্গে রয়ে গেছে দিনরাতের লড়াই; কিন্তু ফিরে যাওয়া নয়। কেননা প্রকৃতিও বিষম বাচাল। যৌন জানে শুধু মানুষেরই বুক, দুয়ের মধ্যের সম্পর্কেই আছে যৌনের বীজ, যেমন জানতেন কীয়ের্কেগার্ড। সেই বীজ ফিরে পেতে চায় শুধু যাপনের নির্যাস। যাপন, যাপন। আছি, আমি আছি—এই ধ্বনি যখন শোনা যায় প্রশ্বাসের আবর্তে, কেবল তখনই দলবাঁধা সব শব্দ ধাবিত হয়ে চলে যেতে চায় শেষহীন নীরবের দিকে।' [১৯৬৬]

কেবল কবিতার নয়, গদ্যেরও যে ধ্বনিসৌন্দর্য থাকে এই পঙ্‌ক্তি কটি পড়লে তা আর পাঠকের শ্রবণকে এড়িয়ে যেতে পারে না। বুদ্ধদেব বসু যেমন নিজের সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'তে অবনীন্দ্রনাথের 'আলোর ফুলকি'[২] থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তিকে কবিতার চেহারায় সাজিয়ে দিয়েছিলেন তেমন করে যদি এই উদ্ধৃতিটিকে সাজিয়ে দিই, কবিতা বলে কি ভুল করবেন না নতুন পাঠক? আর সব জেনে-ও পুরোনো পাঠকের-ও কি অলস ভ্রম হবে না, ইচ্ছে হবে না পঙ্‌ক্তি কটিকে সত্যিই কবিতার চরণ ভাবতে? বস্তুত গদ্যে যে ধ্বনি মাধুর্য এবং ছন্দস্পন্দ সম্ভব, গদ্যে, বিশেষত নিবন্ধের ভাষায় সেই ধ্বনি সৃজন করতে পারেন খুব কম গদ্যকার। শঙ্খ ঘোষের গদ্যরীতিতে ধ্বনির এই স্বতোৎসার তাঁর গদ্যকে বিশিষ্ট করে রাখবে।

২. এই প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দের বারান্দা' বইয়ের 'গদ্যকবিতা আর অবনীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি দেখে নিতে পারেন পাঠক। —সম্পাদক

চার

ভাষা সম্পর্কে ওয়াল্টার হিল্টনের একটি স্মরণীয় উক্তি মনে পড়ে: 'By itself language is like water, tasteless and cold.' এই বাক্যটির বিবিধ ব্যঞ্জনা ও প্রয়োগকে এই মুহূর্তে কাজে না লাগিয়ে কেবল আক্ষরিক অর্থে বাক্যটিকে দেখা যায়। ভাষার এই জলীয় চরিত্র, স্বাদহীনতা ও শীতলতা—এ কীসের দ্যোতক? ভাষাকে প্রয়োগ করেন লেখক, এবং শব্দের দ্যোতনা সূচিত হয় তাঁর প্রয়োগে। শব্দ তো আসলে প্রতীক, কোথাও বস্তুজগতের, কোথাও ভাবজগতের। শব্দের একটা আপাতসীমাবদ্ধতা আছে যাকে হিল্টন হয়তো নাম দিচ্ছেন শীতলতা, জলীয়তা বা স্বাদহীনতা। শীতল স্বাদহীন শব্দ তবে কীসে পায় মুখরতা, কেন তবে জীবনানন্দের শব্দপ্রয়োগ বিদ্যুৎসঞ্চারী হয়ে ওঠে? কেন 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল', এই বাক্যের শব্দকটির পরপর অবস্থান এত অমোঘ?

ভাষার এই বর্ণহীন, নিরাকার জলীয়তাই তবে লেখকের প্রয়োজনে, তাঁর অস্মিতাকে ব্যক্ত করার জন্য। মাটি ছানে কুমোর, গড়ে তোলে প্রতিমা; লেখকের কাছে শব্দ সেই মাটির মতোই, তিনি গড়েন শব্দের প্রতিমা। শব্দচয়ন এবং শব্দবিন্যাস বা শব্দসংস্থান তাই লেখককে চিনে নিতে বা তাঁর রীতিকে বুঝে নিতে এত জরুরি।

শব্দই কবির আয়ুধ। কবি জানেন কীসে শব্দ বাজবে মন্দ্রস্বরে বা মেদুরতায়। শব্দকে বাজাতে জানেন কবি, নিংড়ে নিতে পারেন তার অন্তঃস্থ ব্যঞ্জনার মীড়-গমক-মূর্ছনা, এ তার সহজাত অধিকার। গদ্য লেখার সময়ে কবি হিসেবে শব্দের জাদু-প্রয়োগের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান শঙ্খ ঘোষ। তাঁর গদ্যরীতি অন্যদের থেকে বিশেষ হয়ে ওঠে, বা বাংলা গদ্যে এক নতুন খাত তৈরি করে, তবে পেছনে তাঁর এই অভিজ্ঞতা কাজ করে। তাঁর শব্দ ব্যবহারের ধরন একেবারে তাঁর নিজস্ব, অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত বা অনাবশ্যক কঠিন শব্দব্যবহারের ঝোঁক তাঁর নেই। স্বভাবত তিনি সংযমী ও মিতকথক, কিন্তু শব্দের নিহিত সম্ভাবনা উন্মোচন করে আনতে তাঁর কার্পণ্য নেই। তাঁর মিতকথন প্রায় দৃষ্টান্তের পর্যায়ে নীত এবং সেকাজে তাঁর ভাবনার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে তাঁর শব্দপ্রয়োগ। 'এ আমির আবরণ'-এ যখন তিনি লেখেন, 'অল্প দিনের মধ্যেই সম্ভব হবে তাঁর ব্যাহত বিদেশযাত্রা' (পৃ: ৪৫) বা 'বিশ্বভূমিকায় যেভাবে সত্যবাণী নিয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁকে' (পৃ: ৫০) বা 'কিন্তু সে মৃত্যু কেবল জীবনের অপবাহুল্যকে ঝরিয়ে দেওয়া'—এই বাক্যগুলির নিহিতার্থের প্রাচুর্য পাঠককে সচেতন করে তোলে তাঁর গদ্যরীতির এই চারিত্র

সম্বন্ধে। এই অনায়াস মিতকথনের দৃষ্টান্ত তাঁর গদ্যরচনার যে কোনো অংশে চোখ রাখলে পাঠকের চোখে পড়বেই।

কিন্তু এ-ও নয় তাঁর শব্দমঞ্জুষার অন্যতম ঐশ্বর্য। 'নিঃশব্দের তর্জনী'র একাধিক প্রবন্ধে শব্দকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রমাণ করে শব্দকে কতটা গুরুত্ব দেন তিনি। 'আমাদের জীবনযাপনকে ঘিরে ধরেছে পল্পপালের মতো শব্দাবলি, কিন্তু ক্রমে টের পাই যে অল্পে অল্পে তার পরিবহণ গেছে নষ্ট হয়ে' [নিঃশব্দের তর্জনী, পৃঃ ১৮]। 'নির্ঘনা নিরন্তুত্তব শব্দপ্রয়োগ' কীভাবে শব্দকে সীমিত করে দেয় আর কথা বলা কীভাবে মিথ্যা হয়ে ওঠে তার দিকে তর্জনী তুলে ধরেন তিনি এবং এর থেকে সিদ্ধান্তে আরোহণ করেন : 'নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায়' [ঐ, পৃঃ ২৬] কারণ তিনি জানেন 'রক্তবীজের মত নিত্যই নতুন শব্দ বেড়ে যায় না। শব্দের নতুন ব্যবহারের জন্য যা চাই তা হলো এর অনায়াস পারম্পর্য ভেঙে ফেলা' [ঐ, পৃঃ ৩০]। 'নতুন শব্দের সৃষ্টি' নয় তাহলে, 'শব্দের নতুন সৃষ্টি'র ওপরেই জোর দেন তিনি। সেই কারণে তাঁর লেখায় অচেনা-অপরিচিত শব্দের ভিড় নেই, কেননা শব্দের অভ্যন্তরীণ ব্যঞ্জনার উজ্জ্বল উদ্ধারেই তাঁর আগ্রহ বেশি। একথা ঠিক যে 'নিঃশব্দের তর্জনী'তে তাঁর আলোচনাগুলি কবিতা-কেন্দ্রিক, কিন্তু তাঁর গদ্যের পাঠক টের পান যে কবিসত্তাকে তিনি পরিহার করেন না, কারণ তা সম্ভব নয়, তাঁর গদ্য ও কবিতা সমান্তরাল রেখায় চলে না, এবং তার গদ্য কবিতা নয়, কিন্তু কবিত্বই তাঁর গদ্যের নিহিত নির্যাস। এই কারণে তিনি অ-পরিচিত বা অল্প-পরিচিত শব্দগুলিকে এড়িয়ে চলতে পারেন। 'নিঃশব্দের তর্জনী' ও 'শব্দ আর সত্য'—এই প্রবন্ধ সংকলন দুটিতে তিনি কবিতা এবং তৎসংক্রান্ত অজস্র নতুন ভাবনার সূত্রপাত করেন—কিন্তু শব্দ সংস্থানের এমনই এক প্রয়োগমাধুর্য তাঁর লেখনীর আয়ত্তাধীন যে অনায়াসে গড়ে নেন শব্দের নতুন তাৎপর্য। শব্দ কেবল অভিধানের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শব্দের-ও থাকে সুরের মত অজস্র সম্ভাবনা, যে সম্ভাবনা থাকে নিপুণ স্রষ্টার অপেক্ষায়। তাঁর মেজরাব লেগে শব্দ ওঠে জেগে, তখন সে আর কেবল অক্ষরের নির্দিষ্ট অর্থময় সমষ্টিমাত্র নয়, তখন তাঁর অনন্ত অজস্র সম্ভাবনা বেজে ওঠে সঠিক হাতে। যে কোনো ভাষার ইতিহাসের নিবিড় চর্চা আমাদের দেখাতে পারে শব্দ কেমনভাবে বিস্তৃত হয়, ব্যাপক হয় ও বহুতর অর্জন করে। শব্দের ব্যঞ্জনা জন্ম পায়, জন্মান্তরও পায়। ঠিক ওয়াল্টার হিল্টনের মতো করে নয়, একটু অন্যভাবে আই. এ. রিচার্ডস্-ও শব্দের এই চারিত্রের কথা বলেন : '**Words have no intrinsic literary characters [Principles of Literary Criticism, Allied Publishers, Indian Reprint, 1989, P-104].**

সমসাময়িক কোনো কোনো গদ্যকারের গদ্য পাঠকালীন দুরূহ শব্দ সন্ধান করার বদলে শঙ্খ ঘোষের গদ্যে পাঠক পান তাঁর পরিচিত শব্দের চৌহদ্দির আরাম, যদিচ তাঁকে সক্রিয় রাখতে হয় তাঁর মননকে, কেননা শঙ্খ ঘোষের গদ্য আগাগোড়াই বুদ্ধিদীপ্ত গদ্য। যে পাঠক প্রবন্ধপাঠে নিজের মনীষাকে, নিজের মননের সক্রিয়তাকে একটু যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চান, দুরূহ শব্দের বেড়াজাল না ভেঙেও তিনি পাবেন শব্দের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করার নূতনত্ব। হয়তো-বা তাঁর গদ্যের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বা আবু সয়ীদ আইয়ুবের গদ্যের মিল পাওয়া যায় কিছু কিছু। কিন্তু বুদ্ধদেবের গদ্য ছিল অনেক রমণীয়, আবেগে শিথিল-ও বা কখনো, কেমন একটা অব্যক্ত স্বাদুতায় আচ্ছন্ন, যেখানে শঙ্খ ঘোষের গদ্যে আবেগ থাকলে-ও শৈথিল্য নেই কখনো, আর সবার ওপরে সেখানে যুক্তিনির্ভর অনুভবের কঠোর শৃঙ্খলা। আবু সয়ীদ আইয়ুবের গদ্যও স্বচ্ছন্দ, স্ফূর্তিময়, বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু তাঁর লেখায় নেই শঙ্খ ঘোষের কাব্যিক মেজাজ, আর তাছাড়া কবি কবিতা ও পাঠক—এই ত্রিভুজের গঠনবৈচিত্র্য এত ব্যাপক হয়ে আসেনি তার লেখায়, কাজেই তার গদ্য এতটা পরীক্ষিত-ও হয়ে ওঠেনি। পরিচিত শব্দের সৌহার্দ্যের মধ্যে থেকেও যে কত দুরূহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন শঙ্খ ঘোষ, তার অজস্র নমুনা ছড়িয়ে আছে তার নিবন্ধগুলিতে। "সন্দেহ নেই যে আধুনিক কালে কবিতা যখন ছাপার কাগজ থেকে পড়া হয়, ধ্বনি-গুণই একমাত্র গুণ থাকেনা, ভাবতে হয় তার দৃশ্যগুণও। শ্রুতিতে দৃশ্যে একটা সংযোগ চাই শব্দগুলির মধ্যে, যেন শব্দেরও বর্ণেরও হাসিমুখ কান্নামুখ আছে, যেন বর্ণও কেউ ছুটে চলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, সিটওয়েল দেখেন এক এক শব্দে এক-একরকম রঙ বা স্পর্শের আভাস, র‍্যাবো তার স্বরমালায় লিখে রাখেন 'আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ সবুজ, ও নীল।' যদি বর্ণেই এত রূপরঙ, তবে শব্দে আর শব্দের পরম্পরায় আরো কিছু আছে নিশ্চয়, দৃশ্যতই কবিতা একটা প্রকৃতিগঠন অর্জন করে নেয়, আর কবি তাই তাকে ভেঙে ভেঙে নিত্য নূতন গড়ন বানান" [নিঃশব্দের তর্জনী, পৃঃ ৩২]—এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে যে বিষয়টি আলোচনা করছেন গদ্যকার, বিষয়টি খুব সহজ নয়। কিন্তু আধুনিক শব্দতত্ত্ব সংক্রান্ত এই গদ্যপঙ্‌ক্তি কটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে গদ্যভঙ্গির অনায়াস বয়নে। বিশেষত পাঠক অবশ্যই লক্ষ করবেন একটি-ও শব্দ অপরিচিত বা কম-ব্যবহৃত নয়।

যে কোনো গদ্যকারের পক্ষেই যা শ্লাঘার বিষয় হতে পারে সেই 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'তে তার ভাষা যেন আরো ঘন হয়ে আসে, হয়ে ওঠে আরো মন্দ্র। সহজ শব্দবিস্তারের যে লাবণ্য ঘিরে রাখে তার ভাষাকে তার-ই চকিত অভিঘাত টের পাই :

'যা ছিল তরল রূপকে ছড়ানো, চতুরঙ্গ উপন্যাকে একদিন তা ঘন হয়ে এল প্রতীকে বা প্রতিমায়। একটির সঙ্গে অন্য ছবি সেখানে গাঁথা হয়ে যায় এমন সংগতিতে, সামান্য ইশারায় সেখানে সম্ভব হয়ে ওঠে এমন এক বহুস্তর বেদনার প্রকাশ যে আধুনিক কোনো মন মস্ত এক ভর পেয়ে যায় সেখানে'।

[নির্মাণ আর সৃষ্টি, পৃঃ ১৭০]

বা অন্যত্র যখন

'এক-একটা মুহূর্ত আসে, এক-একটা অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়াই আমরা, ব্যক্তিগত এক আবেগ তৈরি হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে, এসে পৌঁছয় কোনো ব্যক্তিগত ভাষা। কিন্তু আধুনিক কবি তৃপ্তি পান তখন, যখন একই মুহূর্তে সে-আবেগ হয়ে ওঠে যেন কোনো বহির্বিষয়েরও বেদন। ভাষার মধ্যে এসে মেলে তখন দুই তল, রূপক অর্থে নয়, কিন্তু চকিতে চকিতে ইঙ্গিতের কোনো স্ফুরণের মধ্য দিয়ে তার যাওয়া-আসা চলতে থাকে ব্যক্তি থেকে সমাজে, প্রকৃতি থেকে চেতনায়। অতীত থেকে আগামীতে।' [ঐ, পৃঃ ২৮৭]

এই গদ্যের দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাই ভাষা যেন 'ছেড়েছে তার সকল অলংকার'। তাঁর গদ্যের শক্তির উৎস যতটা তাঁর ভাবনায় নিহিত, ততটাই যেন তাঁর শব্দ প্রয়োগে। এখানে যেন ভাবনা আর শব্দবয়নের এক নিবিড় টানাপোড়েন, কেউ কারো প্রতিস্পর্ধী নয়। শব্দ অলংকার নয় শব্দ বোধের গদ্যে, শব্দ তাঁর বাক্যবয়নের মাধ্যম মাত্র। শব্দ বিন্যাস এখানে সচেতন, কিন্তু শব্দের নির্মাণ নয়, শব্দ আর বিষয়ের ঐকতানই তাঁর অভিপ্রেত। ভারী শব্দ বা দুরূহ অপরিচিত শব্দ প্রায় বিরল তাঁর লেখায়। তাঁর গদ্যে এক আশ্চর্য লঘুপক্ষতা আছে, পাঠ দ্রুত হয়ে ওঠে, আছে এক ঘনীভূত তারল্য— বিষয় সেখানে ঘনীভূত অথচ আছে এক তরল চলন। 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'র উদ্ধৃতি দুটি থেকে নিশ্চয়ই নজরে পড়বে কেমন করে 'শব্দের নতুন সৃষ্টি' সম্ভব করেন তিনি। মনে হয় তিনি পারেন শব্দের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিতে—শব্দকে উজাড় করে তার থেকে বেছে নিতে পারেন তাঁর প্রয়োজনীয় তাৎপর্য। হয়তো প্রধানত তিনি কবি বলেই শব্দ এতটা বশংবদ হয়ে ওঠে তাঁর যে পরিচিত অতি ব্যবহৃত শব্দের মধ্যেও তিনি গড়ে তোলেন প্রতীকী দ্যোতনা, অনায়াস প্রতিমা এবং গভীর অর্থময়তা।

পাঁচ

কবি যেমন সচেতনভাবে গড়ে তোলেন তাঁর কবিতা, নানান উপকরণ দিয়ে, ছন্দ-মিল-যতির বিভঙ্গে, তেমন দৃশ্যমানভাবে সচরাচর গদ্যকে গড়ে তোলেন না কোনো গদ্যকার। এমনকী গদ্যকবিতাতে-ও কবিকে ধরতে হয় এক অন্তর্লীন ছন্দ, কিন্তু গদ্যকারের তেমন কোনো দায় নেই। হয়তো এই অর্থে গদ্যকার উপভোগ করেন এক স্বাধীনতা। গদ্যকার হিসেবে এই স্বাধীনতাকে আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক করে নিতে পারেন শঙ্খ ঘোষ। কেবলমাত্র শব্দ-চয়ন বা গদ্যের অন্তঃশীলা ছন্দের উজ্জ্বল উদ্ধারে নয়—শব্দবিন্যাস, বাক্যবয়ন, বাক্যযোজনা, অনুচ্ছেদ-গঠন, এমন-কী বিষয়ের উপস্থাপনাতে-ও তাঁর প্রবল স্বাতন্ত্র্য।

যে কোনো পাঠক শঙ্খ ঘোষের গদ্যের যে বৈশিষ্ট্যটি অনায়াসে চিনে নেন তা হচ্ছে তাঁর বাক্যগঠনরীতি। তাঁর গদ্যে সরল, যৌগিক বা জটিল—সব রকম বাক্য থাকলে-ও নিঃসন্দেহে জটিল বাক্যগঠন-ই প্রাধান্য পায়। মনে হয় জটিল বাক্যের এই প্রাধান্য তাঁর গদ্যকে কথ্য ভঙ্গির নিকটবর্তী করে, কেননা মুখের বচনে আমরা সাধারণত অনর্গল জটিল বাক্য বুনে যাই, কোনো রকম যতি ছাড়াই। তাঁর বিভিন্ন গদ্যরচনা থেকে এপর্যন্ত যে কটি উদ্ধৃতি এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে তার যেকোনোটিতেই জটিল বাক্যের প্রাধান্যের প্রমাণ মিলবে। কখনো কখনো জটিল বাক্যগুলি আপাত-দৃষ্টিতে অতিরিক্ত বড়-ও মনে হয়। কিন্তু তাঁর প্রায় কথা-বলা-ভঙ্গি বাক্যগুলিতে জটিল বাক্যের গঠনকে একটা আপাত-সরলতা এনে দেয়। 'কল্পনার হিস্টিরিয়া' থেকে একটি জটিল বাক্য বেছে নিচ্ছি এখানে: 'সাহিত্যাদর্শের নূতন আধুনিকতার সামনে বিভ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ কেবলই তখন মনে করছেন যে ভাষার জগৎটাকে আর চিনতে পারছেন না তিনি, বাক্যের সৃষ্টি বিষয়ে নানারকম সংশয় জাগছে মনে, আবার সেই সংশয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্য ভর চাইছেন ছবিতে বা গানে' [পৃঃ ২০]। এরকম দীর্ঘ ও জটিল বাক্যবয়নই তাঁর সাধারণ রীতি, কিন্তু এ ধরনের বাক্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর গদ্য যে ক্লান্তিকর হয় না তার কারণ অবশ্য নিহিত থাকে তাঁর অনুচ্ছেদ গঠনের মধ্যে। একটা অনুচ্ছেদ তিনি কেবল জটিল বাক্য দিয়ে গঠন করেন না, সবরকম বাক্য মিলিয়েই রাখেন সেখানে। এই নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশে সংকলিত 'নিঃশব্দের তর্জনী'র উদ্ধৃতিটির দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি। এই অনুচ্ছেদটিতে তিনি বাক্যগুলিকে সাজিয়েছেন এইভাবে: সরল→জটিল→সরল→জটিল→সরল—ক্রিয়াহীন শব্দগুচ্ছ→জটিল। হয়তো এই বিন্যাস বদলে যায়, অন্য ক্রমে বাক্যগুলিকে সাজানো হয়।

কিন্তু মোটামুটিভাবে এই তাঁর সাধারণ রীতি। তাঁর বাক্যের দৈর্ঘ্য অপ্রতিসম (asymmetrical) এবং বিন্যাসে বৈচিত্র্য থাকে বলে ক্লান্তিকর হয় না।

W. I. Turner তাঁর Stylistics গ্রন্থে জটিল বাক্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে প্রাচীন গ্রীস ইউরোপ এবং মানবজাতির জন্য যা উত্তরাধিকার রেখে গেছে তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী হচ্ছে জটিল বাক্যের প্রচলন। শঙ্খ ঘোষের গদ্যে জটিল বাক্যগুলির নানান প্রয়োগ দেখা যায়। জটিল বাক্যরচনায় অনায়াস সাফল্য তাঁর গদ্যের অবয়বে যোগ করে এক দ্রুতি, অন্তনির্ভরশীলতা বা পারম্পর্য। বিভিন্ন ধরনের বাক্যবিন্যাস ও বাক্যসমাহারের ফলে তাঁর অনুচ্ছেদগুলিতে এক স্বতন্ত্র নকশা ফুটে ওঠে।

অনেক সময়েই দেখা যায় তাঁর গদ্যরচনায় এককেটি অনুচ্ছেদ শুরু হচ্ছে প্রশ্ন-বোধক বাক্য দিয়ে, এবং কখনো একটি নয়, পর পর দুটি বা তিনটি অনুচ্ছেদেও এরকম ঘটে। এক্ষেত্রে এমন নয় যে সব সময় প্রশ্নগুলি তাঁর নিজের ; কখনো পাঠকের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি তিনি অনুমানে ধরছেন ও তার থেকে এগোতে চাইছেন নিজের আলোচনার দিকে। এইভাবে তাঁর অনুচ্ছেদগুলি অর্জন করে নিজস্ব এক গড়ন, গড়ে ওঠে বিভিন্ন চরিত্রের বাক্যের এক জটিল আলোছায়াময় নকশা। প্রশ্নবোধক, অস্ত্যর্থক বা নঞর্থক বাক্য, জটিল-সরল জটিল বা বিপরীত ক্রম—এইভাবেই তাঁর অনুচ্ছেদগুলির অন্তসংগঠন নির্মিত হয়। বিভিন্ন চরিত্রের বাক্যের সন্নিবেশে এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাক্যের সহাবস্থানে তাঁর গদ্যে একধরনের বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়, যার ফলে গড়ে ওঠে পাঠকের সঙ্গে তাঁর এক নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। তাঁর রচনায় প্রশ্নবোধক ব্যক্যের বহুল উপস্থিতি-ও লেখক-পাঠক সম্পর্ককে সৌহার্দ্যমণ্ডিত করে।

শঙ্খ ঘোষের বাক্য গঠনরীতির একটি অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ হলো তাঁর জটিল বাক্যের মধ্যে প্রায়শই গর্ভিত বাক্য বা Parenthesis-এর উপস্থিতি, দুটি বাক্যের মধ্যে আরেকটি বাক্যাংশের অনুপ্রবেশ। 'শব্দ আর সত্য' থেকে তুলে দিচ্ছি একটি দীর্ঘ বাক্য : 'কিন্তু সে জায়গা থাক বা না-ই থাক, কবিকে শুধু বলে যেতে হয় তাঁর কথা, একেবারে নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্ঘাটন, তার [illegible] তুচ্ছতা পরাভবসুদ্ধ তার উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকবার কষ্ট আর উত্থান এমন ভাষায় তাকে বলতে হয় এসব, যা পছন্দ করবে না তাঁর চার-পাশের [illegible] পাঠক, যারা পয়সা দিয়ে আরাম কিনতে চায়' [শব্দ আর সত্য, পৃঃ ৩৭]। স্পষ্টতই একাধিক গর্ভিত বাক্য থাকার ফলে বাক্যটির অন্বয় বেশ জটিল, কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে তা-সত্ত্বেও বাক্যটিকে প্রায় মুখের বলা ভাষার কাছাকাছি মনে হচ্ছে আমাদের, পড়ে যাওয়া যাচ্ছে দ্রুত এবং যে বিষয়ে তিনি বলছেন এখানে, তাঁর এই না থেমে অনর্গল বলে যাওয়া থেকে বিষয়টির কেন্দ্র

থেকে পাঠকের চিন্তা সরে যেতে পারছে না। ওয়াল্টার ন্যাশ Parenthesis সম্পর্কে লিখছেন : It can certainly convey the studied impression of the stage aside, but more often than not it is a reflection of the writer's confidence in the easy discursive relationship he has established with his reader." [Walter Nash : Designs in Prose, Longman, London, 1980, pp 147-148]। মনে হয় শঙ্খ ঘোষের গদ্যে গর্ভিত বাক্যের ব্যবহার সম্পর্কে ন্যাশের এই উক্তি খেটে যায় যদিও একথা ঠিক যে গর্ভিত বাক্যের প্রাচুর্য তার গদ্যের অন্বয়কে জটিল করে। কিন্তু একই সংগে সিরিয়স গদ্যের ওপরে হালকা করে বুলিয়ে দেয় সামান্য নাটকীয়তা, যা নিবন্ধের মধ্যে একটা ঘরোয়া কথা-বলা বাতাবরণ তৈরি করে।

শঙ্খ ঘোষের গদ্যের 'আত্মগত ভঙ্গি' বা তার স্বভাবনম্র যুক্তি অবতারণা যে কোনো পাঠক-ই লক্ষ করে থাকবেন। তাঁর এই ঈষৎ চাপা ও নিচু কণ্ঠস্বর অনেকটাই উদ্‌গত হয় বহুল পরিমাণে গর্ভিত বাক্য ব্যবহার থেকে। ওয়াল্টার ন্যাশ উল্লেখ করেছেন : "The parenthesis can be used with witty effect as a form of typographical sotto voce." এই sotto voce বা নিচু কণ্ঠস্বর শঙ্খ ঘোষের গদ্যের এক অন্যতম সম্পদ এবং এও স্বীকার্য যে parenthesis এর ব্যবহার থেকে তিনি নিংড়ে বার করে নেন তার সমস্ত গুণগুলি।

তার গদ্যরীতিকে চিনে নেওয়ার আর এক অন্যতম চাবিকাঠি হলো তাঁর গদ্যে প্রচলিত অন্বয়ের ব্যাপক বিপর্যাস। অন্বয়ের বিপর্যাস পদ্যের এক স্বাভাবিক লক্ষণ কিন্তু গদ্যেও এর ব্যবহার নতুন নয়। বস্তুত নিজেকে শক্তিশালী করার পর্বে গদ্যকে খুঁজে নিতে হয়েছে নানান অলংকরণ, এ তারই একটি। মাইকেল মধুসূদন তাঁর গদ্যনাটকের ভাষায় বা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের গদ্যে ব্যবহার করেছেন অন্বয়গত বিপর্যাস। রবীন্দ্রনাথের গদ্যেও অন্বয়ের ব্যাপক বিপর্যাস, বিশেষত তার শেষজীবনের গদ্যে। অবশ্য দেখা গেছে যে সূচনাকাল থেকেই গদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে শব্দবিন্যাসের বিপ্রতীপ ক্রম, এমন-কী প্রাচীন পারসিক শিলালিপিতেও গদ্যের বিপ্রতীপ ক্রমের কথা শুনি আমরা।

সাধারণত বাংলা গদ্যের পদসজ্জার স্বাভাবিক ক্রম হলো কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া বা Subject-object verb ক্রম। শঙ্খ ঘোষের গদ্যে এই স্বাভাবিক পদসজ্জা প্রায়শই বিপর্যস্ত। 'এ আমির আবরণ' থেকে উদ্ধৃত করছি কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :

'জন্মে নিতে-না-নিতেই মরে যায় মুহূর্ত, পেতে-না-পেতেই হাতছাড়া হয়ে যায় পাওয়া। এই এক মৃত্যুগহ্বর ঘিরে আছে আমাদের সমস্ত জীবন। কিন্তু সেই মরণলোক থেকে উঠে আসে স্মৃতির পর স্মৃতি, কানাকানি হতে

থাকে এ পারে ওই-পারে। জীবনের দায় থেকে পালাই না আমরা, দু-হাত দিয়ে ধরতে চাই তার সমস্ত প্রত্যঙ্গ, মুখে নয় কোনো গ্লানির চিহ্ন, অমলের সৌন্দর্যে ভরে যায় দশদিগন্ত, নিজেকে উদ্‌গত করে তুলতে চাই উদ্ভিদের মতো সজীব—কিন্তু তারই মধ্যে বুকের পিছনে ধ্বনিত হতে থাকে ক্লান্তিহীন এক গোপন স্বর : 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার'।

এই জোয়ার থেকে জেগে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গান।"

[এ আমির আবরণ, প্যাপিরাস, ১৯৮০ পৃঃ, ২৪]

এই উদ্ধৃতিটি থেকে দেখা যাবে প্রতিটি বাক্যেই কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া, এই ব্যাকরণগত পদসংস্থান বিধ্বস্ত, এবং ক্রিয়াপদ প্রতিটি বাক্যেই মাঝখানে এসে যাচ্ছে। কিন্তু এমন নয় যে বিশেষভাবে এই উদ্ধৃতিটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। বস্তুত শঙ্খ ঘোষের যে কোনো গদ্যনিবন্ধ থেকেই চার পাঁচটি বাক্য তুলে আনলে দেখা যাবে এই একই ধরনের পদবিন্যাস বা বাক্যের অন্তঃসংগঠন। তাঁর গদ্যের যে ধ্বনিমাধুর্য ও অন্তর্লীন ছন্দোময়তা পাঠককে মুগ্ধ করে, তা যে কতটা এই নির্মিতির ওপর নির্ভরশীল বোঝা যাবে যদি আমরা এই উদ্ধৃতিটিকে ব্যাকরণগত ক্রমে একবার নিজেরা সাজিয়ে নিয়ে পড়ি, অর্থাৎ যদি প্রতিটি বাক্যের ক্রিয়াপদটিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করে নিই। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি মাত্র বাক্য এখানে করে দেখছি আমরা। শেষ পংক্তিটি ছিল : 'এই জোয়ার থেকে জেগে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গান।' এটি হবে 'রবীন্দ্রনাথের গান এই জোয়ার থেকে জেগে ওঠে।' আপাতদৃষ্টিতে খুবই সামান্য এই অদল-বদল, কিন্তু শ্রবণ-সচেতন পাঠক ধরে ফেলবেন বাক্যটির শ্রুতিমাধুর্য কতখানি কমে যায় তুচ্ছ এই রদবদলে। বস্তুত শঙ্খ ঘোষের গদ্যের যে লাবণ্যের কথা উল্লেখ করেছি তা অনেকাংশে এই বিপর্যাসের কাছে ঋণী।

এমন নয় যে শঙ্খ ঘোষের গদ্যে কেবলমাত্র কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া বা S.O.V. এই বিন্যাস বদলে যায়। বস্তুত তাঁর গদ্যে বাংলা বাক্যের প্রচলিত পদসংস্থানের ক্রমটি প্রায়শই নানাভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয়। সাধারণত বাংলা গদ্যের প্রচলিত পদক্রম হলো—কর্তা—কালাধিকরণ—স্থানাধিকরণ—গৌণকর্ম—মুখ্যকর্ম—ক্রিয়া। আমরা এতক্ষণ দেখেছি ক্রিয়াপদের বদলি হওয়া। অন্য দু-একটি বাক্য থেকে দেখা যেতে পারে শঙ্খ ঘোষের গদ্যরচনায় বিপর্যাস কত ব্যাপক। দুটি বাক্য বেছে নিচ্ছি 'ঐতিহ্যের বিস্তার' থেকে [কোনো বিশেষ কারণে নয়, কেবলমাত্র সামনে পড়ল বলেই, অর্থাৎ খুব ইচ্ছে করে বা খুঁজেপেতে নয়] এবং দেখাতে চাই বাক্য দুটির গঠন। (ক) বাক্যটি এইরকম : 'মারাঠিতে একবার জীবনানন্দের কবিতা অনুবাদ করবার ইচ্ছে হয়েছিল দিলীপের' [পৃঃ ১৩]। দেখা যাক বাক্যটির বিন্যাস ব্যবস্থা :

মারাঠিতে	একবার	জীবনানন্দের কবিতা অনুবাদ	করবার
অধিকরণ	ক্রিয়া বিশেষণ	কর্ম	অসমাপিকা ক্রিয়া

ইচ্ছে হয়েছিল	দিলীপের
ক্রিয়া	কর্তা

অন্য বাক্যটি হলো (খ)

ব্যক্তিগত এই	সংকটকে	ভিক্টোরিয়া
বিশেষ্যের বিশেষণ	কর্ম	কর্তা

কেবল	ব্যক্তিগত	ভাবেননি	ঠিক
বিশেষণীয় বিশেষণ	গৌণকর্ম	ক্রিয়া	ক্রিয়া বিশেষণ

মনে হয় এই দুটি বাক্যের বিশ্লেষণ যথেষ্ট ধারণা দিতে পারে আমাদের শঙ্খ ঘোষের গদ্যের বৈচিত্র্যের চরিত্র সম্বন্ধে।

এতক্ষণ আমরা দেখেছি কীভাবে গদ্যকার শঙ্খ ঘোষ নির্মাণ করেন তাঁর রচনার ক্ষুদ্রতম একক, বাক্যটিকে, কিভাবে করেন বাক্যের অন্তঃসংগঠন, এবং কীভাবে করেন অনুচ্ছেদ সজ্জা। মূলত এ তাঁর রচনার বহিরঙ্গ নিয়ে বিস্তার। এবার একটু দেখা যেতে পারে তাঁর বাক্যগুলির অন্তর-চরিত্র।

'এ আমির আবরণ'-এ শঙ্খ ঘোষ লিখছেন : শ্লেগেল একবার লিখেছিলেন, নিজের সঙ্গে কথা বলা আমাদের ভাবনাপদ্ধতির এক স্বাভাবিক রীতি'। [পৃঃ ৫৬]। শঙ্খ ঘোষের নিজের গদ্যরীতিও এই নিজের সঙ্গে কথা বলা রীতিরই এক প্রকাশ। তাঁর যে কোনো রচনাতেই স্বয়ম্প্রকট এক আত্মকথনের ভঙ্গি। অবশ্যই এর উৎসার কতকটা তাঁর আলোচনা পদ্ধতি থেকে।

শঙ্খ ঘোষের গদ্যরচনাগুলি মূলত আলোচনা ভিত্তিক [এ নিবন্ধে গদ্য-লেখাগুলির বিষয় নিয়ে চর্চা করার অবকাশ ছিল না, কাজেই ধরে নিতে হচ্ছে বিষয়গুলি পাঠকের পরিচিত] বলে সেগুলি গড়ে ওঠে বিভিন্ন তথ্য-যুক্তি-দৃষ্টান্ত নির্ভর বোধোদ্দীপ্ত কোনো অনুভবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু গদ্যরচনার শুরু থেকেই মোটামুটি তাঁর আলোচনা-পদ্ধতি অনেকটা ওই শ্লেগেলীয় নিজের সঙ্গে কথা বলা রীতির অনুরূপ। নিবন্ধে যখন তিনি নিজের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তির জাল বিছোতে থাকেন, মনে হয় নিজের সঙ্গেই তিনি কথা বলছেন। কিন্তু এই ভঙ্গিকেও বিশিষ্ট করে রাখে তাঁর নিজস্ব বিনম্র ভঙ্গি। যা ধ্রুবনিশ্চিত বলে জানেন তাকেও কখনো তিনি পাঠকের ওপর চাপিয়ে দেন না। নিজের যুক্তিগুলি তিনি পর-পর বিছিয়ে যান pedantry-বর্জিত ভঙ্গিতে এবং নিজের সিদ্ধান্তে পৌছন। তাঁর এই বিনম্র ভঙ্গিকে অনেকে ভুল করেন মৃদু বা নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি বলে, কিন্তু পাঠক-লেখকের আধুনিক সম্পর্কের জটিলতম উদ্ঘাটন-ই তাঁর এই রীতির অবচেতনে কাজ করে।

নিজের সঙ্গে কথা বলে যেন নিজেকেই বোঝাতে চাইছেন, বা ঈপ্সিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছেন—এটাই তাঁর গদ্যরীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র বললে খুব একটা ভুল হয় না। তাঁর এই রীতি অবশ্য গড়ে উঠেছে পরস্পর নির্ভর কিছু রীতির অন্তর্বয়ন থেকে। এইরকম-ই বিশিষ্ট একটি রীতি হলো তাঁর নিবন্ধে বহুল সংখ্যক প্রশ্নবোধক বাক্যের অবস্থান। তাঁর গদ্যরচনার যে কোনো উদ্ধৃতিতেই দেখা যাবে এক বা একাধিক প্রশ্নবোধক বাক্যের উপস্থিতি। 'ঈশ্বরের এক মুহূর্ত' প্রবন্ধ থেকে একটি অনুচ্ছেদের সূচনাংশটি হাজির করছি:

'প্রেরণার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা? কথাটির কি মানে হলো কিছু? অভিজ্ঞতা তো উপাদান, সঞ্চয়। সেই সঞ্চয় কি সৃষ্টির শেষ কথা? সৃষ্টির মুহূর্তে তার কি প্রত্যাশা নেই কোনো আঘাতের? বেগের? প্রেরণার? অভিজ্ঞতার কি কিছু মূল্য ছিল না রোমান্টিকদের কাছেও?

[শব্দ আর সত্য, পৃঃ ৬২]

বস্তুত তাঁর লেখায় প্রশ্নবোধক বাক্যগুলির চরিত্র বহুকৌণিক। কখনো এই প্রশ্নগুলি তাঁর নিজের প্রশ্ন, কখনো সেগুলি পাঠকের, বা পাঠকের মনে আসতে পারে এমন প্রশ্ন, বা কখনো সেগুলি প্রশ্নের আকারে উপস্থিত হলেও আদৌ সেগুলি প্রশ্ন নয়—সেগুলি তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতামত, যাকে তিনি বিনম্র প্রশ্নের আকারে উপস্থিত করলেও সেগুলিই তাঁর প্রশ্নের উত্তর। যেমন, 'অভিজ্ঞতার কি মূল্য ছিল না রোমান্টিকদের কাছেও?' তাঁর এই প্রশ্ন যেন এক স্বয়ম্প্রকট উত্তর—একথা খুবই স্পষ্ট যে তিনি বলতে চান, ছিল, এবং এই প্রশ্নবোধক বাক্যটি যেন এক অস্ত্যর্থক বাক্যের (affirmative sentence) ছদ্মবেশ মাত্র। আর এই প্রশ্নবোধক বাক্যমালার মধ্য দিয়ে অনেক সময় তিনি যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির বিন্যাসও গড়ে নেন সহজেই। উক্তি-প্রত্যুক্তি, যুক্তি-পাল্টা যুক্তির যে ছক তাঁর গদ্যরচনায় বিশেষ ভূমিকা নেয়, অনেক সময়েই তার নির্মাণ কেন্দ্রায়িত হয় প্রশ্নসূচক বাক্যমালাকে ঘিরে।

পাঠকমাত্র-ই লক্ষ করে থাকবেন তাঁর বাক্যগুলিতে কমা চিহ্নের ব্যবহার কম, অনেক সময়েই কোনো যতিচিহ্ন না দিয়ে তিনি একাধিক পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করে যান। বাক্যগত অব্যয় (sentential adverb)-এর ব্যবহারও তাঁর লেখায় বহুল। মূলত এগুলিকে তিনি কাজে লাগান পাঠকের সঙ্গে নৈকট্য স্থাপন করতে। যখন তিনি 'মনে হয় যেন', 'হয়তো' ইত্যাদি শব্দ দিয়ে তাঁর স্থিরনিশ্চিত অনুভবগুলিকেও ব্যক্ত করেন, এই নিরহংকার স্বাধীনতা পাঠককে সুযোগ করে দেয় বিষয়গুলিকে সহজে গ্রহণ করতে। এর ফলে গড়ে ওঠে লেখক-পাঠকের নিবিড় একাত্মতা। প্রাচীন অলংকারবিদরা বক্তা, দ্রষ্টা এই তিন ভূমিকায় লেখককে কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু

শঙ্খ ঘোষ পাঠক-লেখকের আধুনিক সম্পর্কে বিশ্বাসী, তাঁর লেখায় বাক্যগত অব্যয়ে প্রাচুর্য বস্তুত সেই আধুনিক সম্পর্কের নির্মাণকে সম্ভব করে তোলে।

সাত

বুদ্ধদেব লিখেছিলেন ছন্দ বা মিল পদ্যের প্রকার নয়, 'গদ্যের শিল্পরূপের'-ও তাতে অধিকার আছে। আলোচনাটা গদ্যের এই শিল্পরূপকে ঘিরেই। আমরা জানি মানুষের একালের প্রয়োজনের বাহন গদ্য আজ আর কেবল প্রয়োজনের বাহন হয়ে থেমে নেই। সবরকমের জ্ঞানের পরিবহন হয়ে কাজ করতে করতে গদ্য অর্জন করেছে অমিত বৈভব এবং সেই বৈভব গদ্যের অবয়বে যোগ করেছে শিল্পসুষমার দ্যুতি, গদ্য হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভর। রবীন্দ্রনাথের হাতেই গদ্য, বিশেষত নিবন্ধের গদ্য, হয়ে উঠেছিল শিল্পিত প্রতিমা ; রবীন্দ্রপরবর্তী নিবন্ধকারেরা সেই ধারার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেননি আদৌ, গদ্যের শিল্পরূপসৃষ্টিতে তাঁরা স্বাধিকার প্রতিপন্ন করেছেন। একথা অসংগত নয় যে বাংলা গদ্য নির্মাণের যুগে নেই আর, তার স্থিতি এখন সৃষ্টির উজ্জ্বল মুহূর্তে।

'রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা [রবীন্দ্রায়ন, ২য় খণ্ড, সম্পা, পুলিন বিহারী সেন, ১৯৬০] বা 'দুই বসন্তে' [দেশ, ১৯৬২] থেকে 'আত্মঘাতী মনীষা' [যুক্তাক্ষর, এপ্রিল'৯২] বা 'টমসন সাহেব ও বাঙালী সমালোচক ; প্রৈতি, জুলাই, '৯২] পর্যন্ত শঙ্খ ঘোষের গদ্যের বিস্তার তিরিশ বছর জুড়ে। এই দুই প্রান্তসীমার মাঝখানে রয়েছে তাঁর অজস্র গদ্য-সম্ভার যা আজ বাঙালী নিবন্ধ পাঠকের অমোঘ আকর্ষণবিন্দু। তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কবিতাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সনিষ্ঠ গদ্য-চর্চায় তিনি গড়ে তুলেছেন নিজস্ব এক গদ্যরীতি—রীতিগত অনুধাবনে এ নিবন্ধে যাকে আমরা ধরতে চেয়েছি।

গদ্যের শিল্পরূপ দাবি করে, নির্মাণ নয়, সৃষ্টির মুহূর্তকে, যখন গদ্য হয়ে উঠতে পারে ভাবনার সক্ষম বাহন, লেখকের চিন্তার সঙ্গে পূর্ণতঃএকাত্ম। গদ্যের পাঠক শোনেন সৃষ্টির সেই ঈপ্সিত পদশব্দের প্রবহমান ধ্বনি যখন তাঁর শ্রবণে ভেসে আসে এমন কিছু কিছু শব্দ ও বাক্যের ঝংকার :

'যা কিছু ঝাপসা আর অনিশ্চিত আমাদের জীবনে, তার প্রতি আমাদের অনুরাগ ; সত্যের মুখচ্ছবি আমাদের ভয় পাইয়ে দেয়, এই সাধারণ জীবন যে যাপন করছে সে জানে না, নদী কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে। এই অনিশ্চয় থেকে মুক্তি আসে যখন, খুলে যায় তখন অস্পষ্ট অনুভবের পোষাক,

নগ্ন নির্যাস নিয়ে মন দাঁড়ায় এক উপলব্ধির কাছে, এই দাঁড়ানোই হলো ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানো।' [এ আমির আবরণ, পৃঃ ৫৭]

'আর, যদি তা না হয় ? যদি সত্যিই একটিও তৃণ উৎপন্ন না হয়, একজন-ও তৃষ্ণার্তের কণ্ঠ না ভেজে ? তবুও আপনাকে বলতে হবে, কেননা মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বলাটাই লেখকের স্বযাচিত নিয়তি। ঠিকমতো বলতে চেয়েছিলেন বলেই তো এত অসাড়তার মধ্যে, এত জলহীনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা। সেই তো লেখকের জীবন।' [শব্দ আর সত্য, পৃঃ ১৮]

মনে হয় গল্পের শিল্পরূপ পাঠকের চোখকে আর কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারে না।

দী পে ন্দু চ ক্র ব র্তী

...

জার্নালে শঙ্খ ঘোষ

'তবু, নিন্দে মনে হয় ভালো। প্রশস্তির চেয়ে পুরস্কারের
চেয়ে বড়ো সর্বনাশ আর নেই।' শঙ্খ ঘোষ, জার্নাল, পৃঃ ৭২।

আজকের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষই বোধ হয় সেই মানুষ যিনি নিন্দের চেয়ে প্রশস্তি পেয়েছেন বেশি. এবং প্রশস্তির মত পুরস্কারও পেয়েছেন বড় মাপের, তবু কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে মগজ বিক্রি করেননি। অতএব প্রশস্তি বা পুরস্কার অন্তত তাঁর ক্ষেত্রে সর্বনাশা হয়ে দাঁড়ায়নি। অতি বড় নিন্দুকও তাঁর ছিদ্রান্বেষণে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয়না। বাগাড়ম্বরপ্রিয় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মাঝখানে তাঁর মিতভাষণ ও পরিমিতি বোধ যেমন ব্যতিক্রম মনে হয়, তেমনি উগ্র প্রগতিশীলতার শ্বাসরোধ করা পরিবেশে তাঁর ভারসাম্যবোধ যেন হঠাৎ খুলে-যাওয়া এক জানালার মত। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজে এমন ব্যক্তি সত্যিই দুর্লভ যিনি সব গোষ্ঠীর কাছেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। শঙ্খ ঘোষ নিজস্ব যোগ্যতায় সেই জায়গাটা দখল করে আছেন, যা অনেকের অনায়ত্ত থেকে গেছে। বড় কাগজ থেকে ছোট কাগজ, বড় প্রতিষ্ঠান থেকে ছোট প্রতিষ্ঠান, প্রবীণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি থেকে নবীন শিক্ষার্থী, কারোর পক্ষেই শঙ্খ ঘোষকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ তিনি যে সবাইকে খুশি করার মত কথা বলেন এমন নয়, বরং আঘাত যেখানে প্রাপ্য সেখানে তাঁর আঘাত কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। আনন্দবাজারের শ্রমিক ধর্মঘট হলে যে-কজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন, আবার উৎপল দত্তের গিরিশচন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থ নিয়ে উচ্ছ্বাস তুঙ্গে উঠলে তিনিই তথ্য ও বিশ্লেষণ সহযোগে গ্রন্থটি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ছেড়েছেন। যেখানেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর অভিযান সেখানেই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি—মানবতাবাদী সত্যজিৎ রায়ের মত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে তিনি অনাগ্রহী। আবার ঋত্বিক ঘটকের মত প্রতিবাদী মাতলামিতেও তাঁর সায় নেই। বোধহয় খানিকটা সমর সেনের সঙ্গে মেলে, আপসহীনতার বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশে ও আচরণে। তবু বলতে হয়, সমর সেন

কম কথা বললেও কিছু কথা ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলতেন, শঙ্খ ঘোষ যেখানে সদা সতর্ক কথায় ও আচরণে। ঠিক কথা ঠিক সময়ে ঠিকভাবে বলা শুধু নয়, তার আগে ও পরের ঠিকঠাক নীরবতাও তাঁর ব্যক্তিত্বকে এমন অনন্য করে তুলেছে যে তাঁর সম্বন্ধে শুধু শ্রদ্ধাই নয়, কৌতূহলও ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

সুতরাং তাঁর জার্নাল হাতে পেয়ে যে কোনো গুণমুগ্ধ পাঠক আশা করতে পারেন যে এই সেই গ্রন্থ যেখানে মানুষ শঙ্খ ঘোষকে আরো কাছে থেকে দেখা যাবে। জার্নাল অবশ্য ডায়েরি নয়, মেমোয়ারও নয়, আত্মজীবনী তো নয়ই, আত্মপ্রকাশের কোনো বাধ্যবাধকতা সেখানে নেই। তবু জার্নাল তো প্রবন্ধ নয়, গবেষণা নয়, সভা-সমিতির ভাষণ নয়, সব কিছু গুছিয়ে বলে পাঠকের সমীহ আদায় করার প্রয়োজন তাতে নেই, নৈর্ব্যক্তিক বচনের চেয়েও অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তির সুযোগ সেখানে বেশি। জার্নাল, ডায়েরি, নোটবুকের অমিল থাকলেও মিল এখানেই। লেখকের যে-মুখটি আমাদের দিকে তার বিপরীতে আর একটা মুখ থাকে যা একটু একটু করে ফুটে ওঠে এ তিনের পাতায়।

শঙ্খ ঘোষের জার্নালে বোধ হয় তাঁর চেনা মুখটিই দেখা যায়, অন্য মুখটি উঁকি দেবে দেবে করেও দেয় না। তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির মতই তাঁর জার্নাল পরিশীলিত বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল। 'কবিতার ভাষা', 'বিশ্বাস-অবিশ্বাস' 'এপিক আর ট্র্যাজিক', 'টলস্টয় আর সিনক্রেয়ার' ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর বিচার ও বিশ্লেষণ স্থানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেই এক সম্পূর্ণতার চেহারা নিয়ে হাজির হয়। কোনো একপেশে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়, সুচিন্তিত মতামত, পরিমার্জিত অনুভব, এবং তার সতর্ক সংযত প্রকাশ প্রতিটি প্রসঙ্গে। পরিচিত ব্যক্তিমানুষ সম্বন্ধেও শঙ্খ ঘোষ যখন 'নিভৃত এবং ব্যক্তিগত' কিছু লেখেন জার্নালে তাতে একটি দুটি ব্যক্তিগত ভাল লাগা বা না লাগার মন্তব্য থাকলেও তিনি দ্রুত চলে যেতে পারেন নৈর্ব্যক্তিক শিল্প জিজ্ঞাসায়। 'ভাস্কর ১' যদি ব্যক্তি মানুষ সম্বন্ধে শঙ্খ ঘোষের আগ্রহ প্রমাণ করে, 'ভাস্কর ২' লেখায় তিনি কীভাবে ব্যক্তি মানুষ থেকে ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিকতার আলোচনায় প্রবেশ করতে পারেন। যদিও এসব লেখা 'ছিন্ন ছিন্ন মুহূর্তের ভাবনা আর অনুভবের প্রকাশ, তবু শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, 'ঘনতা আর ধারাবাহিকতার অভাবে' তা অনেকের কাছেই সুখপাঠ্য হবে না এমন আশঙ্কার কারণ নেই। কেননা সংক্ষিপ্ত হলেও এ-সব লেখা খাপছাড়া নয়। শঙ্খ চৌধুরী, রামকিংকর বা অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে শঙ্খ ঘোষের পর্যবেক্ষণ এমনিতেই মূল্যবান আমাদের কাছে, এবং তা আরো উপাদেয় হয়ে ওঠে তাঁর পরিচিত লিখন রীতিতে। অমিয় চক্রবর্তী হাঁটতে হাঁটতে বলেছিলেন ইয়েটস কেমন গরু-মহিষের ক্ষেত্রে moderate ears কথাটা প্রয়োগ করেছিলেন, এবং এবারে শঙ্খ ঘোষের সরস টিপ্পনি—'আশা

করি এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন যে আমাদের পাশ দিয়ে বেশ কয়েকটি গরু হেঁটে গেল তাদের moderate ears নিয়ে।'

বলা বাহুল্য, কবিরা সাধারণত আসল গরুর চেয়ে সাহিত্যের গরু নিয়ে বেশি মাথা ঘামান। শঙ্খ ঘোষ কবি হয়েও আসল গরুর দিকে তাকাতে ভোলেন না, কিন্তু শান্তিনিকেতনে বসে লেখা জার্নালে শান্তিনিকেতনের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না। শান্তিনিকেতনের অতীত তার বর্তমানের চেয়েও বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে তাঁর কাছে, তাই রবীন্দ্রনাথ ঘুরে ফিরে আসেন। আধুনিক শান্তিনিকেতনের কোনো প্রশ্ন তার পিছু পিছু আসে না। কোনো কোনো মুহূর্তে শঙ্খ ঘোষকেও যেন মনে হয় আর এক রবীন্দ্রনাথ—যেমন 'এই মুহূর্তে' : 'এইখানেই এটা শেষ, এ-কথা জানি বলেই নিঃশেষে পেতে চাই একে, কোনোখানে ফাঁক না রেখে, ভবিষ্যতের জন্য কিছু ফেলে না রেখে। আর তখন প্রতিটি মুহূর্তই হয়ে উঠতে পারে সুন্দর। আনন্দে সুন্দর, বিষাদে সুন্দর।' আনন্দ, সুন্দর, ভালবাসা, আধ্যাত্মিকতা এই সব শব্দ দিয়ে যে-আবহ রচিত হয় তা মূলত রাবীন্দ্রিক। 'সকাল শুরু হয়েছিল চাঁপাফুলে, রাত এল বেলফুল নিয়ে (প্রাকৃতিক)।' এমন বাচনভঙ্গিতে শোনা যায় রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠস্বর। দিল্লির জনৈক লেখক শঙ্খ ঘোষকে 'incorrigible romantic' বলেছিলেন। তিনি এই পিঠ-চাপড়ানো বাহবার জবাব দিয়েছেন জার্নালে। তাতেও পাওয়া যায় রাবীন্দ্রিক বিশ্বপ্রেমের ছায়া। 'মধ্যরাত' তো আস্ত রবীন্দ্রনাথ, ছন্দে ও সুরে।

এটা অভিযোগ নয়, একটি বৈশিষ্ট্যের চিহ্নিতকরণ। জমিদার হয়েও অন্তরঙ্গ রচনায় রবীন্দ্রনাথ পার্থিব স্তর ছেড়ে যেতে পারলেই যেন স্বস্তি পেতেন। শঙ্খ ঘোষের জার্নালে তার খানিকটা মিল পাওয়া যায়। তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধেও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যে-সচেতনতা পাওয়া যায় তা এখানে অনেকটাই অনুপস্থিত। নিভৃত রচনায় তার দায় যে নিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বোধহয় এইখানেই কি খুলে যায় শঙ্খ ঘোষের এ-আমির আবরণ? উঁকি দেয় অন্য আমির রেখাচিত্র? জার্নালে কয়েকটি মুহূর্ত পাওয়া যায় যেখানে তিনি নিজের সঙ্গেই সোজাসুজি কথা বলেন, যেমন 'মন', 'অবসাদ', 'নেপথ্য'। কিন্তু তিনি বেশিক্ষণ 'আমি' কথাটা ব্যবহার করতে নারাজ, 'আমি'কে সরিয়ে 'আমরা' এসে যায়, ফলে যে-মুখটি একঝলক দেখি তা মিলিয়ে যায়, এসে পড়ে সব লেখক, সব পাঠকের প্রতিনিধি হিসেবে সেই মুখটি যার কোনো ব্যক্তিক আবেদন নেই।

শঙ্খ ঘোষ নিজেই জার্নালে লিখেছেন ডায়েরি বা চিঠিপত্র প্রসঙ্গে—'কারো স্মৃতিকথা বা জীবনী ডায়েরি বা চিঠিপত্র, এসব যত টানে, এমন আর কিছু

নয়। …যে-কোনো পাতা ওলটাতে ওলটাতে অল্প-জানা কোনো লেখকের চারপাশে যে রঙবেরঙের চালচিত্র তৈরি হতে থাকে, ভালো লাগে সেটা। লেখককে বুঝবার জন্যে সে চালচিত্রের যে খুবই দরকার আছে তা না-ও হতে পারে। তবুও, জানলে মনে হয় না যে মানুষটির খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি অল্পসময়ের জন্য ?

শঙ্খ ঘোষের জার্নাল পড়ে যদি কারোর মনে হয় তিনিও লেখকের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ লেখকের মুখটি দেখতে পাচ্ছেন না, তবে তার কারণ শুধু ক্ষীণ দৃষ্টি এমন কথা বলা যাবে না। গিন্‌সবার্গ নাকি জন-সমক্ষে নগ্ন হতে আপত্তি করতেন না আক্ষরিক অর্থে, পুরনো ব্রাহ্ম-সমাজের রুচিবাগীশতা এমন ছিল যে কেউ-কেউ নাকি নিভৃতে নগ্ন হতেও লজ্জা পেত। অধিকাংশ মানুষের অবস্থান বোধ হয় এই দুয়ের মাঝখানে। শুধু শারীরিক স্তরে নয়, মানসিক স্তরেও অন্যের সামনে নিজেকে নগ্ন করাটা অনেক সভ্য মানুষ বরদাস্ত করতে পারে না। শঙ্খ ঘোষের কাছেও মনে হয় সভ্য আচরণের দাবি অগ্রগণ্য—'অনেক বয়স্ক মানুষের চালচলন আজকাল ভালো করে লক্ষ করি, তাঁদের আচরণের মধ্যে কোনটা মনে হয় অসংগত বা আঘাতপ্রদ, ভাবতে চেষ্টা করি তা। সেটা যে ঠিক তাঁদের বিচার করবার জন্য তা নয়, সে হলো নিজেকে সতর্ক করবার জন্য।' এই সতর্কতাই যেন শঙ্খ ঘোষের জার্নালের প্রধান শক্তি ও দুর্বলতা। আর পাঁচটা জার্নালের মত এখানে পাতায় পাতায় আমিত্ব জাহির করার প্রচেষ্টা নেই, আবার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণটির প্রাধান্য দেখে মনে হয় লেখক জার্নালের অছিলায় যেন প্রবন্ধের বীজ বপন করে চলেছেন।

বস্তুত জার্নালের দ্বিতীয়াংশে যে-রচনাগুলি আছে তার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবেই—'এই লেখাগুলিও দস্তুরমত প্রবন্ধ নয়, প্রবন্ধের বীজ মাত্র।' একই কথা বলা যেতে পারে অধিকাংশ লেখা সম্বন্ধে। 'কবিতার ভাষা' বা 'এপিক আর ট্র্যাজিক'-এর সঙ্গে 'জীবনানন্দ : গদ্যপ্রতিমা' বা 'রিলকে : মার্ন্টে থেকে এলিজি'র কোনো মৌল পার্থক্য নেই এই দিক থেকে।

মনে হয় শঙ্খ ঘোষ শান্তিনিকেতনে যখন-যেমন-খুশি লিখতে বসেও তাঁর নির্দিষ্ট পাঠকবর্গের কথা ভুলতে পারেননি। ভূমিকায় 'অল্পবয়সীদের' কথা বলেছেন তিনি, কিন্তু বয়স্ক পাঠকও তাঁর জার্নাল সমানভাবে উপভোগ করবেন, যাঁরা শঙ্খ ঘোষ বলতেই বোঝেন এক সতর্ক নিরাসক্ত চিন্তাবিদ। যদি কেউ এই persona-র আড়ালে আমাদেরই একজনের মত কোনো আটপৌরে মানুষকে খোঁজেন তবে কিঞ্চিৎ হতাশ হতে হবে।

আঁদ্রে জিদ তাঁর জার্নালকে বলেছেন 'intimate confidant', ঠিক যে-

অর্থে শঙ্খ ঘোষের জার্নাল কোনো অন্তরঙ্গ আলাপ নয়, তা অনেকটা অধ্যাপকীয় lecture notes-এর মত। তাঁতে যা পাওয়া যায় তার মূল্য অনেক, যা পাওয়া যায় না তা ব্যক্তি মানুষের অপ্রকাশিত রেখাগুলি। শঙ্খ ঘোষও আঁদ্রে জিদের মত অবসাদ বা লিখতে না পারার কথা বলেন, কিন্তু তাতে নিতান্তই ব্যক্তিগত কোনো প্রতিক্রিয়া তেমন নজরে পড়ে না, যেমন পড়ে আঁদ্রে জিদের জার্নালে। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার নানান স্তর, নানান পর্ব জিদের জার্নালে ধরা থাকে, কারণ তিনি তাই চেয়েছিলেন। শঙ্খ ঘোষ তেমনভাবে জার্নাল লিখতে বসেননি। কোনো দীর্ঘকালীন পরিকল্পনাও ছিল না তাঁর। তাঁর জার্নালের টুকরো টুকরো লেখার সন তারিখও নেই। বোঝা যায় শঙ্খ ঘোষ যখন-যেমন-খুশি লিখে গেছেন, পূর্বপরিকল্পিত জার্নালের কোনো ছক মানেননি। সেরকম পরিকল্পনা থাকলে আমরা হয়তো জানতে পারতাম শান্তিনিকেতনে তিনি কীভাবে দিন কাটাতেন, জানতে পারতাম কিছু নিতান্তই ব্যক্তিগত সম্পর্কের অজানা দিক, কিছু পারিবারিক কথাও। প্রতিষ্ঠিত লেখকের কাছে পাঠকের এই কৌতূহল তথাকথিত খ্যাতির বিড়ম্বনা হিসেবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু পাঠকেরা বড় নাছোড়। পূজিত প্রতিমার পশ্চাৎদিকে তাদের উকিঝুঁকি কেউ ঠেকাতে পারেন না। আর গবেষকেরা তো মনে করেন সেটাই তাঁদের অধিকার।

শঙ্খ ঘোষ এখনও অনেক লিখবেন আমরা আশা রাখি। সেই লেখার মধ্যে আর একটি জার্নালের অপেক্ষায় থাকবো আমরা যেখানে আমরা কবি, প্রবন্ধকার, অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের অতিরিক্ত কিছু পেয়ে যাবো।

সন্‌জীদা খাতুন

•••

নীরব নির্ঘোষের বিপদ

আমার তরুণ অধ্যাপক-বন্ধু হুমায়ুন আজাদকে বলছিলাম, শঙ্খ ঘোষের কবিতা নয়, তাঁর গদ্যরচনার সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশি। তাই, তাঁর 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে কিছু লিখব। কেতকী কুশারী ডাইসনের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' বইখানি হুমায়ুনের কাছে আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম। আছে জানিয়ে, তিনি শঙ্খ আর কেতকীর একটু তুলনা উপস্থিত করলেন। বললেন, 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' বেশ 'মধুর' 'মনোরম' রচনা। আরো, কেতকীর রচনা 'পুরুষালি'। কথার সুরে স্পষ্টত শঙ্খ নিন্দিত আর কেতকী নন্দিত। হুমায়ুন বাস্তবিক কেতকীর অনুরাগী।

আমার সন্দেহ, হুমায়ুন রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কোনো কোনো গদ্যরচনার ভাষাকে মনে মনে 'মেয়েলি' বলে থাকেন। এ সন্দেহের কারণ, শঙ্খের গদ্যে রবীন্দ্র-অনুসরণেই সহজতার সাধনা এসেছে বলে আমার বিশ্বাস। শঙ্খ ভাষাকে যথাসাধ্য সহজ এবং মুখের কথার কাছাকাছি আনতে চেষ্টা করেন। তাতে সময়ে সময়ে ভাষা, সম্ভবত, জোর (পুরুষালি ভাব?) হারায় (পেলব হয়?)।

আমি যতদূর বুঝেছি, শঙ্খের মূল চেষ্টা আড়ষ্টতা পরিহার করে স্বাভাবিকতার বিন্যাস। এইজন্যেই 'নির্মাণ ও সৃষ্টি' নাম না-দিয়ে লেখেন 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'। কোনো একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর জন্যে লেখা রবীন্দ্র সঙ্গীত-আলোচনার শিরোনামে ছাপানো-লেখার 'ও' অব্যয়ের জায়গাতে 'আর' লিখেছিলেন হাতে কেটে, দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ যে শেষ বয়সের গদ্যতে সংশোধন করতে গেলে সহজতর পদ ব্যবহার করতেন, সেকথা শঙ্খ তাঁর এক লেখাতে উল্লেখও করেছেন। সেইটেই শঙ্খেরও ধারা বলে মনে হয়েছে আমার। এখন, সহজ ভাষায় গুরু বা গম্ভীর বক্তব্য লেখা হলে, গুরুত্ব দিয়ে তা গ্রহণ করা আমাদের স্বভাবে নেই, এ সচরাচর দেখি। তাছাড়াও, শঙ্খ ঘোষ তাঁর লেখাতে রবীন্দ্রনাথের লেখার যে-ধরনের উদাহরণ

মাঝে মাঝে তুলে ধরেন, তার বড়-বেশি-কথ্য ধরনটি শঙ্খেরই রচনা মনে হলে সে-লেখা অসংহত ঠেকতে পারে। সোজা কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করি-না-করি, শঙ্খকে তো স্বভাবত প্রশ্ন করতে পারি হাজার বার!

নমুনা তুলে বলি, যেমন, শঙ্খ লিখেছেন—'কাজেকর্মে তাঁর চকল পরিচয় এতটাই আমাদের চিত্ত অধিকার করে থাকে যে সহসা আমরা দেখতে পাই না ভিড় থেকে তার পালিয়ে যাবার না-নৌকোটিকে' ('ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' পৃঃ ৭)। সাবধানী শঙ্খ কিন্তু 'না-নৌকো' লিখে সঙ্গে সঙ্গে তারকাচিহ্ন দিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখাতে ঐ 'না-নৌকো'র ব্যবহার দেখিয়ে দিয়েছেন। তবু সে-দোষ বর্তাবে শঙ্খেরই ললাটে, আমি যা বুঝি। রবীন্দ্রনাথের এমন আরো বাক্য বা বাক্যাংশ শঙ্খ ব্যবহার করেছেন নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করতে। যেমন, 'জানি না যখন জানির আঁচলে গাঁটছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখন মন বলে, ধন্য হলেম'। (ঐ পৃঃ ৬)। শঙ্খ ঐ আদলেই লিখে যান—'একই সঙ্গে সত্যি এই কথা যে ও গানে তিনি আছেন এবং তিনি নেই।' (ঐ)।

ক্রিয়াপদগুলোকে প্রায়শঃ কর্তা বা কর্মের আগে টেনে আনেন শঙ্খ। 'কবিতায় বা গানে ফিরে-ফিরেই একজন বিদেশিনীর কথাই বলেন রবীন্দ্রনাথ, বলেন এক অপরিচিতার নাম…'। বা, 'অনেক সময়ে আমরা ঘুরেছি এই কৌতূহল নিয়ে, জানতে চেয়েছি তার ইতিবৃত্ত'…(ঐ পৃ. ৩)। এই স্টাইলই বুঝি খেয়েছে শঙ্খকে। কিন্তু এই যে,—কেতকীও তো বাক্যকে এরকম ঘুরিয়ে লিখেছেন! অনুবাদে অবশ্য। 'আমি তাঁর কথা বলাকে যেমন জেনেছি, তেমনি জেনেছি তাঁর যৌবনের মুহূর্তদেরও' ('রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে,' পৃ. ৪৫)। (অপ্রাণীবাচক 'মুহূর্তে'র সঙ্গে 'দের' প্রত্যয়ের ব্যবহারে পুরুষালি ভাব তৈরি হয়, বলা যায় না মনে হয়। পুরুষালি ভাব তো জানি শক্তপোক্ত হাড়গোড়ে! তবে কেতকীর অসঙ্কোচ ইংরেজি শব্দ ব্যবহারেই কি পৌরুষ? বড্ড ভাবাচ্ছে।)। কেতকীর নিজের কাহিনীতেও ক্রিয়াপদ-বিপর্যাস পেলাম। 'অনামিকার মনে আছে এক বোঁচকা ব্যথা, যেটা ক্রমশ হয়ে উঠেছিলো একটা শক্ত পাথর, একটা নিনাদ, যার দুন্দুভিটা ছিল অদৃশ্য; একটা চেষ্টা, সাঁতার-কাটা স্থলচরের মতো নাটকটাকে জলের উপরে রাখবার; একটা চেতনা, যে ঐ সময়ের আগেকার তার সমস্ত জীবন বর্তমান দিনগুলি ও রাতগুলির সঙ্গে মোকাবিলা ক'রে লগ্নোচিত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার জন্য প্রস্তুতিপর্ব।' (পৃ. ৩০)

না, পংক্তিদৈর্ঘ্যও অবশ্যই নয় পুরুষত্বের পরিচয়বহ। কারণ 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথে'র প্রথম সংস্করণের চতুর্দশ পৃষ্ঠায় বোর্হেসের ভাবনা এবং কর্মের

প্রসঙ্গে শঙ্খ কমা, সেমিকোলন, ড্যাস-সহযোগে টানা এগারো লাইনের একটি বাক্য ছেপেছেন। পৌরুষ-রহস্য বোঝা গেল না।

শঙ্খের লেখার আর-এক বৈশিষ্ট্য, কারও লেখার বক্তব্যে আপত্তি হ'লে তাঁদের নামোল্লেখ এড়িয়ে, অনেক সময়েই, নিজের মত এবং যুক্তি বিন্যাস করতে করতে তাঁদের কথাগুলো আভাসে উত্থাপন করেন। যেমন বলেছেন 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথে'র 'বিদেশিনী' প্রসঙ্গে। বুদ্ধদেব বসুর 'কবি রবীন্দ্রনাথ' বইতে রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশিনী'কে শনাক্ত করবার চেষ্টার রকমটিকে শঙ্খ যে-লেখাতে যোগ্যভাবে প্রতিহত করেছেন, সেখানে বুদ্ধদেব বা তাঁর গ্রন্থের নাম করেননি। 'সূত্র-নির্দেশে' এসেছে নাম। এই বক্রতা থেকে, আড়াল রেখে কথা বলবার মেয়েলি-ধরনটি চোখে পড়তে পারে বটে। ভাষাকেও অত নমনীয় রাখলে 'পুরুষালি' ধাঁচ আসবে কোত্থেকে! এর পিছনে স্বভাবের যে-বিনম্রতা তাকে পুরুষসিংহেরা অপৌরুষেয় ভাবতেই পারেন। ঐরকমের বাঁকা, আর, হুমায়ুনের ধারায় বলি, মানিনী-ভাব আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে তর্কের শেষেও শঙ্খ প্রকাশ করেছিলেন। সেই-যে 'প্রশ্ন' নিয়ে তর্ক। এইরকম কিছু লিখেছিলেন—'সাগর পারের কথা উঠল যে? আমার বুঝি নির্বাসন?' আরো যেমন, 'শব্দ নিয়ে খেলা'র লেখাতে একটি শিরোনাম দিয়েছিলেন—'ও গেল কোথায়?' 'পুরোহিত' 'ভৌগোলিক' এইসব বানানে ঔ-কার বর্জনের প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে ওরকম লিখেছিলেন। এই-যে মৃদুস্বরে কটাক্ষ হেনে কথা-বলা—এ মেয়েলি বৈকি! এই ভঙ্গির সরসতা অবশ্য আমার কাছে বেশ উপভোগ্য ঠেকে।

প্রশ্ন করতে করতে এগিয়ে যাওয়া শঙ্খর লেখার অপর এক কায়দা। ভেবে-চিন্তে লেখা নয়, যেন লিখতে লিখতে ভাবা। ভান অবশ্য। শিল্পমাত্রেই যে-কলা বা কৌশল। পাঠকদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়ে একসঙ্গে জবাব খুঁজে-ফেরার ভাব। বুদ্ধদেব বসুর 'বিদেশিনী' সন্ধানের জবাবে যেমন লিখেছিলেন—'নিজেরও অগোচরে আমাদের নিভৃত এক মন আছে—বেদনাময় সুন্দরকে স্পর্শ করবার এইসব মুহূর্তে চকিতে জেগে ওঠে সেই মন। এই জেগে-ওঠার কী নাম দেব? এই মনেরই সংযোগ কি সবকিছুকে মায়াময় করে তোলে না, এনে দেয় না অপরিচয়ের ছায়া? এই জেগে ওঠাই প্রতিদিনের আড়ালে বসে-থাকা সেই বিদেশিনী কর্মকৃতিময় সংসারের বাইরে গেলে তবে তার সঙ্গে আমাদের দেখা-শোনা হয়।' (ঐ পৃ. ৪)। ঐ প্রসঙ্গকেই বিশদ করতে আরও ঐরকম প্রশ্ন আর উত্তর সাজিয়েছেন লেখক পরের অনুচ্ছেদেও। 'এটা লক্ষ করবার বিষয় যে গান আর সুরের কথা বলার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে ভাবেত হয়েছিল এই শব্দটি ('বিদেশিনী')। কথায় সুরের টান এসে পৌছলে কথা যেন ছেড়ে যায় তার

বুদ্ধিময় অর্থের বৃত্ত। ছেড়ে কোথায় যায়? নিবিড় কোনো গান শুনতে শুনতে অনেক সময়ে আমরা টেরও পাই না মন কখন সরে গেছে তার ভাষা থেকে, অনেক দূরে। দূরে কোথায়? কার সঙ্গে তখন যুক্ত হতে চাই আমরা? আমাদের ভিতরকার মনের সঙ্গে।' (ঐ ৪-৫)। এই সহজ হার্দ্য ভঙ্গিতে পূর্ববর্তী ভাষ্যকারের ঘোষণার প্রতিবাদের প্রবলতা রইল না, অথচ, পাঠকদের অনিবার্যভাবে টেনে নেওয়া হল ভাবনার সহযাত্রায়। সবটুকু আলোচনা উদ্ধৃত না-করেও বোঝানো গেছে নিশ্চয়, এ যাত্রা উপরিতলে বিচরণ মাত্র নয়। বক্তব্যের গভীরে, রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশিনী' ভাবনার মর্মগত সত্যে আমাদের পৌঁছে দেয় এই রচনার ধারা। এ ভাবেই বাস্তব বিদেশিনী-প্রণয়িনী-সমাকীর্ণ বুদ্ধদেব সাধিত ব্যাখ্যা পরাহত হয়।

'বিদেশিনী' প্রসঙ্গের বিচিত্র উন্মোচনের শেষে শঙ্খ তাঁর বক্তব্যকে অকস্মাৎ যুক্ত করে দেন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে। 'চেনা এবং চেনা নন, নারী এবং নারী নন' —এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজয়াকে দেখে বলেন—'এই ভিক্টোরিয়াও তাঁর বিদেশিনী, তাঁর সুন্দরের সহচরী'। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য পূর্বতন ব্যাখ্যাকে যে-আশ্চর্য মৃদুতার সঙ্গে ছেদন করলেন, এখানেই পরিচয় শঙ্খের নীরব নির্ঘোষের। শঙ্খের রচনার ঐ নম্রতাই তাঁর পরুষ আচরণের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখবার সময় আর পরিবেশ না-পেয়ে গল্প গাছা করবার মতো করে শঙ্খের ভাষারহস্যের সন্ধানে খানিক এলোমেলো পায়চারি করলাম। পাঠকের বৃথা শ্রমের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে করজোড়ে মার্জনা প্রার্থনা করি।

অশোক মুখোপাধ্যায়

বাংলা বানান ও শঙ্খ ঘোষ

'শঙ্খ ঘোষের বানান' অথবা 'বানান বিষয়ে তাঁর ভাবনা' কি কোনো লেখার বিষয় হতে পারে? তিনি কবি সমালোচক প্রাবন্ধিক, বাংলা ভাষায় লেখেন। সে ভাষার শব্দের বানান তো নির্দিষ্ট থাকারই কথা। কোনো একজন বিশেষ লেখক তার হেরফের করতে পারবেন না। যদিও বা তা হয়ে যায় ভুল করে, তাহলেও তো ছাপার সময় শুধরে দেওয়ার কথা। এমনটাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু তা না হয়ে কোনো একজনের বানান বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার সুযোগ যে পাওয়া যাচ্ছে, তার কারণ একটাই। এতদিনের ভাষা বাংলা। কিন্তু সে ভাষার অনেক শব্দ এখনও একাধিক উপায়ে লেখা হচ্ছে। তার কোনটা ভুল আর কোনটা শুদ্ধ তার বিচার তর্কাতীত নয়। একই শব্দের নানা বানানের কোনটাকে নেব, মান্য বলে মানব তাও স্থির হতে পারছে না। তাই বানান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন, লেখায় মধ্যে একই শব্দের একাধিক বানান লিখে বসেন না—এমন লেখকদের যদি চিহ্নিত করা যায়, তবে একই সঙ্গে তাঁদের লেখা বানান নিয়ে আলোচনা আমাদের কোনো সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করতে পারে।

এর উদ্দেশ্য হয়তো একটাই। ভবিষ্যতে কোনোদিন হয়তো বাংলায় একই শব্দের একাধিক বানান থাকবে না—এই অবস্থায় আসা যায় কিনা? এমন এক আপাত অসম্ভব ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা? সেই তাগিদেই আমাদের দেখতে হয় কোন শব্দ কীভাবে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রাজশেখর বসু, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু বা আরও অনেকে। এই তালিকায় অবশ্যই যোগ হয়ে যায় শঙ্খ ঘোষের নাম। তিনি যে বানান লেখেন তার পিছনে একটা যুক্তিনির্ভর ভাবনা থাকে, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ প্রবণতা অভ্যাসকে ছাপিয়ে ওঠে এই যুক্তিনির্ভরতা। তবে তা অন্য সবাই মেনে নেবেন, একমত হয়ে যাবেন তাঁর সঙ্গে—সে আশা অবশ্য করেন না কেউই, তিনি তো নন‌ই। তাঁর লেখায় আমরা একবার 'বলবো, কিছু পরেই 'বলব' অথবা 'বোলবো' পাই না। একই রচনায় হালকা ছাড়া

হাল্কার সহাবস্থান দেখা যায় না। বানান সচেতন লেখক তিনি। যেমন ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর তালব্য-শ-প্রিয়তা হাত ফসকে বেরিয়ে-যাওয়া কোনো অনভিপ্রেত ব্যাপার নয়। ভেবেচিন্তেই তিনি লিখেছেন। সব লেখকেরই এই ব্যাপারটি কিন্তু থাকে না। অনেকেই যা হাতে আসে লিখে দেন, বাকিটা বিনাশর্তেই ছেড়ে দেন প্রুফরিডারের হাতে। যা করার করে দিয়ো হে-গোছের লাইসেন্স দিয়ে দেন। এই প্রেক্ষিতে শঙ্খ ঘোষের সচেতনতাই এই লেখার ভিত্তিভূমি।

এবার একটু পিছিয়ে আসতে হয়। অনেকবার আলোচিত কিছু কথা আবারও না বলে নিলে এ রচনার পটভূমি স্থিরীকৃত হবে না।

১. বাংলায় কিছু শব্দের বানানের রকমফের হওয়ার উপায় নেই। যে শব্দ সংস্কৃত থেকে সংস্কৃত রীতির বানান নিয়েই বাংলায় এসেছে, যাদের বলা হয় তৎসম শব্দ, তারা এই দলের। এদের বানান যে একেবারেই বদল হয়নি তা নয়, তবে সে পরিবর্তন সামান্য। শ্রীমান্, ধনবান্-এর হস্‌চিহ্ন বাদ গেছে। সততঃ, সাধারণতঃ, প্রধানতঃ—এইসব শব্দে বিসর্গ দেওয়া হয় না এখন। তদ্ভব, অর্ধতৎসম শব্দেরও একাধিক বানান দেখা দিল। গিন্নি, গিন্নী; পুজো, পুজো; ব্যাবসা, ব্যবসা। কিন্তু এই রূপভেদও তেমন জটিল হয়ে উঠেনি। ক্রমে (খুব ধীরে যদিও) একটা স্বাভাবিক সমাধানের দিকে যাচ্ছে। হাতি, পাখি, গিন্নি, বাড়ি, গাড়ির ব্যাপক স্বীকৃতি তার একটা প্রমাণ।

২. যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি শব্দ প্রতিবর্ণীকৃত কিংবা পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় চলছে তাদের বানানের জটিলতা নানা ধরনের। আপশোষ, আফশোষ আপশোস, আপশোশ, আফশোস; আপস, আপোশ; খুশী, খুশি, খুসী; খৃষ্ট, খৃস্ট, খ্রিস্ট, খ্রিষ্ট, খ্রীষ্ট, খ্রীস্ট।

৩. সাধুভাষায় বাংলা ক্রিয়াপদের বানানে সমতা ছিল। বলিব; পৌঁছাইবে; করিয়াছিল; দৌড়াইতেছে। চলিতে নানা চেহারা এসে গেল। বলব, বলবো, বোলবো; পৌঁছবে, পৌছবে, পৌঁছাবে, দৌড়াচ্ছে, দৌড়োচ্ছে, দৌড়চ্ছে। এ ছাড়াও আরও কতরকম সমস্যা।

৪. এসব ছাড়াও ভালো, ভাল; বড়ো, বড়; ছোটো, ছোট; সাদা, শাদা; কিংবা এগারো, এগার,—এ প্রশ্নগুলোও রইল অমুত্তরিত। আরো, আরও; কারো, কারও; হয়তো, হয়ত; আজও, আজো এরাও সমস্যা হয়ে আছে।

৫. এরপর থাকছে জোড়া কিংবা না-জোড়ার প্যাঁচ। একরকম, এক রকম; স্বাভাবিকভাবে, স্বাভাবিক ভাবে। হাইফেন হবে কি হবে না? রাজা-প্রজা; রাজাপ্রজা; আদান-প্রদান, আদান প্রদান।

৬. বাংলায় প্রচলিত দুটো সংস্কৃত শব্দের সমাসবদ্ধ রূপ কেমন হবে ? মন্ত্রিসভা, মন্ত্রীসভা ; নভশ্চর, নভোচর, নভচর ; বিদ্যুৎলতা, বিদ্যুল্লতা।

৭. আরও আছে। উদ্‌বাস্তু, উদ্বাস্তু ; উদ্‌বোধন, উদ্বোধন ; বাগ্‌দেবী, বাগ্দেবী।

এই তালিকা দীর্ঘতর করার প্রয়োজন নেই। এবার প্রশ্ন শঙ্খ ঘোষের লেখা থেকে কিংবা তাঁর পরামর্শে কি আমরা এই সব সমস্যার কোনো উত্তর পেতে পারি ? যে উত্তরের ভিত্তি আবেগ, অভ্যাস কিংবা নিছকই ভালো লাগা নয়। যা হবে যুক্তিনির্ভর—সে যুক্তি হতে পারে ব্যাকরণ সংগতির কিংবা প্রচলনের বারংবারতার, কিংবা বাংলা ভাষারীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য। ব্যাকরণের ব্যবহারটা হতে পারে প্রধানত তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে। এটাই আগে নেওয়া যাক।

নানা বয়সের ও নানান বিষয়ের লোক বাংলায় লিখবেন—এটা সবাই চান। বানান শেখার সব চেয়ে প্রশস্ত সময় স্কুলে পড়ার সময়টা, আর এই সময়ে সবাই বাংলা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটিতে দুরন্ত হয়ে উঠবে—এটা আশা করা বাতুলতা। এছাড়া ব্যাকরণকে ভয় পাওয়াটাই ছাত্রছাত্রীর স্বাভাবিক ধর্ম। ব্যাকরণের মারপ্যাচের মধ্যে না গিয়েও কীভাবে স্কুল-পড়ুয়াদের শুদ্ধ বানান শিখতে ও লিখতে প্রাণিত করা যায় সে বিষয়ে তাঁর একটা বই আছে। কুন্তক ছদ্মনামে লেখা 'শব্দ নিয়ে খেলা'। এক কথায় বলা যায়, এমন বই বাংলায় আর দ্বিতীয়টি নেই, আর যে পদ্ধতিতে এটি লেখা তা-ও 'সেকেণ্ড টু নান'। এতে আছে ছত্রিশটি ছোটো ভাগ, যাকে হয়তো 'এপিসোড' বললেই সিরিয়াল-দেখা ছেলেমেয়েরা ও তাদের অভিভাবকরা ভালো বুঝবেন। এর প্রথম পর্ব 'শব্দ ভাঙার খেলা', শেষ 'হবার যেটা সেটাই হবে'। এর প্রতি পৃষ্ঠায় যে কথা যে ভাবে বলা আছে, তা যে ওভাবে বলা যায় সেটাই ভাবা যায়নি এর আগে। এ প্রসঙ্গে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। শ্রীমান-এ কেন দন্ত্য-ন অথচ ণত্ববিধি মেনে ম্রিয়মাণ-এ 'ণ', এই নিয়ে ধাঁধায় পড়ি। আর এইরকম অবস্থায় শঙ্খ ঘোষের দ্বারস্থ হওয়াটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রশ্নের উত্তরের আগেই তিনি সম্ভবত প্রশ্নকর্তার জ্ঞানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে নিয়ে শতৃ শানচ্‌ বতুপ্‌ মতুপ্‌ নিয়ে ব্যাকরণের জটিলতায় ঢুকলেনই না। বললেন, দেখে নিতে হবে 'মান' কিংবা 'বান'-এর আগের শব্দগুলোর কোনো মানে হয় কিনা। যদি হয় তবে সর্বদাই দন্ত্য-ন, না হলে ণত্ববিধি অনুযায়ী 'ণ' অথবা 'ন'। শ্রীমান্‌-এর আগে 'শ্রী' কথাটার মানে হয়। তাহলে 'ন' হবে। 'ম্রিয়'-র কোনো মানে আছে ? নেই। তাহলে ণত্ববিধি অনুযায়ী তা হবে মূর্ধন্য-ন ; বর্ধমানের বর্ধরও কোনো মানে নেই। তখন ণত্ববিধি অনুযায়ী

তা হবে দন্ত্য-ন। একটা ওয়ার্নিংও দিলেন। এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। সেরকম কিছু পেলে যেন একবার জিজ্ঞাসা করি। এই অসামান্য উত্তর থেকে পরে নিজেই খুঁজে পেয়েছিলাম উত্তরের না-বলা অংশটা। অবশ্য তাতে সময় লেগেছিল অনেক।

কিন্তু কথা হচ্ছিল 'শব্দ ভাঙার খেলা' নিয়ে। হরিনাথ বাবু 'উজ্জলা' সিনেমাহলের সামনে দিয়ে যেতে হলেই চোখ ঢাকেন। ভুল বানানে অর্থাৎ ব-ফলাহীন 'উজ্জলা'য় তাঁর আপত্তি। এইখানেই উঠে আসে একটা প্রশ্ন নন্তুর বয়ানে, 'কেন, ভুল কেন হবে? বাংলা বানান তো সব রকমই হয়।' এটা সত্যিই আজ একটা বাজার-চলতি কথা। নন্তু এ কথাও শুনেছে 'রবীন্দ্রনাথই না কি করে দিয়ে গেছেন এইসব। তারপর থেকেই বাংলা বানান না কি সোজা হয়ে গেছে খুব। কোনো নিয়ম আর না মানলেও চলে।' এই ধরনের কথাবার্তা আপনি আমিও শুনেছি। স্কুলে কলেজে যাঁরা বাংলা পড়ান তাঁদেরও অনেকের এইরকমই বিশ্বাস। হয়তো বা এই ধারণা ভাঙতেই তাঁকে কলম ধরতে হয়। আর তাঁর পাঠক পাঠিকা হিসেবে বেছে নেন ছোটোদের—ক্যাচ দেম ইয়ং।

প্রথম প্রেসক্রিপশন শব্দটাকে ভাঙার। 'শব্দ আবার ভাঙে কেমন করে? শব্দ কি বাদাম?' এইভাবেই এগিয়ে চলে 'শব্দ নিয়ে খেলা'। 'অনেক শব্দই ভাঙা যায়। অনেক সময়েই দেখবি কয়েকটা ছোটো ছোটো টুকরো মিলে তৈরি হয় একটা গোটা শব্দ। টুকরোগুলি ভেবে নিলেই বানানের ঝামেলা অনেকটা কমে যায়।' এই প্রথম আমরা মাতি শব্দ ভাঙার খেলায়। 'উৎ' আর 'জ্বল' মিলে হল উজ্জ্বল। এই জ্বল থেকে ব-ফলাটা বাদ দিলে তা 'জল'। মানেই পালটে যাবে। 'যার জ্বলবার কথা ছিল, সে তো গলে যাবে তখন।' প্রশ্ন ওঠে দুটো 'জ' এল কোত্থেকে। '...উৎ-জ্বল কথাটাই খুব আঁটোসাঁটো করে বলতে গেলে ৎ-টাই জ-এর মতো শোনায়, তাই হয়ে যায় উজ্জ্বল। একটা নিয়ে নিলি, তার বদলে' একটা দিবি না? এখানে ৎ-এর বদলে জ'। শব্দ ভাঙার এই কায়দাটা একবার মাথায় ঢোকাতে পারলে অনেক বানানই সহজ হয়ে আসে। নিজে নিজেই নিয়ম বার করে নেওয়া যায়। ওই টানেই তিনি শিখিয়ে দেন সত্তা, সত্ত্ব আর স্বত্ব-র গূঢ় রহস্য। সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো তত্ত্বের মধ্যে না গিয়েও বানান আয়ত্ত করার যে পদ্ধতি তিনি এই ছোট্ট বইটায় দেখিয়েছেন তা তাঁর আগে অথবা পরে কেউ পারেন-নি। বাংলা বানান বিষয়ে তো বই অনেকগুলোই আছে এখন।

টুম্পি, নন্তু আর কাবু ও মাঝে-মধ্যে বৌদির সংলাপের মধ্যে দিয়ে বইটি এগিয়ে চলে যে চালে তা-ও এক কথায় অভিনব। তাই সরস্বতীর কাণ্ডেও

আমাদের প্রয়োগ করতে হয় ওই ভাঙাভাঙির প্রণালী। 'সরস্ হলো জল।' আর 'বান্' জুড়ে দিলে বোঝায় 'আছে'। দুয়ে মিলে সরস্বান্, তার স্ত্রীলিঙ্গে 'বতী' অর্থাৎ সরস্বতী। 'যেমন ধর স্রোতস্বান্—স্রোতস্বতী। তেজস্বান্—তেজস্বতী।'

ওই কাণ্ডেই পাই 'বলব আরো? ধনবান্ পুণ্যবান্, রুচিবান্—'

'এই এই এই। দাঁড়া দাঁড়া। বলে গেলেই হলো? রুচিবান্ আবার কী? ওটা হবে না। বল রুচিমান্।

'কেন? তা কেন বলব?

'না যদি বলিস, তাহলে তোকে বলব বুদ্ধিবান্। কিছুতেই তোকে বুদ্ধিমান্ বলব না। কী? কোন্‌টা বলিস, বুদ্ধিবান্ বা বুদ্ধিমান?

'বুদ্ধিমান্।

'সেইরকমই হলো রুচিমান্। আরো এ-রকম দেখবি? শ্রীমান ধীমান্ অংশুমান্ আয়ুষ্মান্।'

এইভাবেই এগিয়ে চলে বানান শেখার আসর। কিন্তু প্রয়োগের অথবা ব্যবহারের বিষয়টাও ভুলে যান না তিনি। 'শব্দ তো পালটেও যায় মুখে মুখে। রুচিবান্‌কেও কি ঠেকানো যাবে ভাবছিস? নম্বরই জয় হবে।"

জানি না এখানে কোনো বেদনাবোধ কাজ করে কি না। কারণ ব্যাকরণের কচকচির মধ্যে না গিয়েও কিশোর-পাঠ্য (এবং বড়োদেরও) বানান শেখার পদ্ধতি নিয়ে তাঁর 'শব্দ নিয়ে খেলা' বইটি তার শেষ অধ্যায় 'হবার যেটা সেটাই হবে'। এখানেও বোধহয় কিছু অসন্তোষের ছোঁয়া পাই। 'ছেলেমেয়েরা ভুল শিখলে আমরা রাগ করি, কিন্তু ঠিক শেখাবার গরজ আছে কার?'

কোনো সন্দেহ নেই এই 'ঠিক শেখাবার' গরজেই এই বই। যখন কেউ কিছু করছেন না, তখন তাঁকেই কাজ করে দেখাতে হয় যে পারা যায় অনেক কিছুই, পারার ইচ্ছেটা চাই অবশ্যই। ব্যাকরণের তত্ত্বের মধ্যে প্রায় না গিয়েই তৎসম শব্দের বানান রহস্য ধরিয়ে দেওয়া ছাড়াও এই বইতে বিদেশি শব্দের বাংলা বানান নিয়ে কিছু কথা আছে। কথাটি খুবই সহজ সরল। যেখানে বানান নির্ধারণের কোনো উপায় নেই, যেমন, শাদা অথবা সাদা, সেখানে যেকোনো একটা মেনে নিলেই হয়। আর এই মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ঝোঁক সম্ভবত 'শ'-এর দিকে যদি উচ্চারণটি ইংরেজি এস কিংবা তার কাছাকাছি না হয়। হলে 'স'। কিছু উচ্চারণও দেন তিনি।

'শব্দ নিয়ে খেলা' 'ছোটদের জন্য লেখা। তাই অনেক বিষয়ের কূট তর্ক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এই বইতে। আশা ছিল বানান বিষয়ে একটা বৃহত্তর বই তাঁর কাছ থেকে আমরা পাব। একটা সময় হয়তো ছিল (আজও আছে

কিনা বলতে পারব না) যখন তাঁর যুক্তিনির্ভর বানান পদ্ধতি সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও বহুজনগ্রাহ্য হত। যেমন একটা সময়ে 'চলন্তিকা'র বানান অনুসরণ করতেন অনেকেই। এখনও অনেক জায়গাতেই শুনি, 'আমরা সংসদ-কে অনুসরণ করি।'

এর মধ্যে বানান (এবং কিছুটা প্রয়োগ) বিষয়ে 'বাংলা—কী লিখবেন, কেন লিখবেন' নামে আনন্দবাজার পত্রিকার 'ব্যবহার বিধি' প্রকাশিত হয়েছে। এর সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই কাজের পক্ষে নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য ব্যক্তি। নানান জায়গায় কিছু আলোচনা ছাড়া শঙ্খ ঘোষের কাছ থেকে কোনো লেখা আমরা পাই নি। ১৯৯১-এর মে মাসের 'প্রতিক্ষণে' অরুণ সেনের "বানান—বিষয়ক প্রস্তাব 'বাঙলা বানান ও বিকল্প বর্জন' নামে বেরিয়েছিল। (জেনেছি বানান নিয়ে অরুণ সেনের একটা বইও বেরিয়েছে সম্প্রতি—এখনও দেখিনি যদিও)। বানান বিধি বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের চিন্তার আরও কিছু আভাস পাই অরুণবাবুর 'প্রস্তাব' বিষয়ে তাঁর একটি লেখাতে যা বেরিয়েছিল 'প্রতিক্ষণ'-এর ডিসেম্বর ১৯৯২ সংখ্যায়। এই লেখাটা যে বহুলোকে পড়েছেন—এমন প্রমাণ পাই নি। এমনকী বিষয়টি নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদেরও অনেকেই সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি পত্রিকার ওই সংখ্যাটা। তাই হয়তো একটু বেশিই উদ্ধৃতি-চিহ্নের দেখা মিলবে পরের অনুচ্ছেদ-গুলোতে।'

তিনি লিখছেন "বানান লিখে সমতাপন্থী যে-কোনো ভাবনার দিকে এগোতে গেলে রীতিমতো দিশেহারাই লাগে।" আমি 'এগোতে' বানানটা লক্ষ করি—তিনি কি তাহলে পৌঁছানো, দৌড়োনো, পিছোতে অর্থাৎ মাঝের ওই ও-কারটা রাখার পক্ষপাতী? পূর্বপ্রসঙ্গে যাই। "এক-এক সময়ে এক-এক ধরণের বানানের দিকে ঝুঁকে পড়ি অল্পবিস্তর আমরা সবাই।" এখন এতদিন পর তাঁর মনে হয় "সমস্তাগুলি যে কীভাবে মিটবে, তার স্পষ্ট কোনো ধারণা করতে পারি না।" উল্লেখ করেন এক বন্ধুর ভাবনার কথা যিনি মনে করেন নানা বিকল্প একসঙ্গে চলতে থাকলে ক্ষতি কী। । "বিকল্পবর্জন কি সত্যিই খুব জরুরি—প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।" সেই সঙ্গেই "বিকল্পের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শেষ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কতদূর সম্ভব, এ নিয়ে আমার সংশয় দিন-দিন বেশ জোরালোই হয়ে উঠছে।" এই সংশয়ের কারণ যতটা না তাত্ত্বিক, তার চেয়ে বেশি ব্যবহারিক। কারণ বিষয়টা এত জটিল হয়ে গেছে, বিশেষত ব্যক্তিগত অভ্যাসের দরুণ, যে অতি সতর্ক লেখকও অজান্তেই বিকল্পের গর্তে পড়ে যান। তিনি কিছু উদাহরণও দিয়েছেন। তবে সত্যি যদি অভ্যাস-গত বাধা ধীরে ধীরে (হয়তো বা অতি ধীরে) অতিক্রম করা যায়, তবে তাঁর

মত যে বিকল্প বর্জনের দিকে এ নিয়ে বোধহয় সন্দেহ নেই। কিন্তু একই শব্দের একাধিক বানান, যার দুটোই শুদ্ধ, এমন থাকলে কোনটিকে নেব, সে বিষয়ে কী মত? বলা বাহুল্য এ কথাটা সহজে বলা যাবে না। লেখার আয়তন বাড়তেই থাকবে। তবে কিছু নমুনা দেওয়া যায়।

অনেক তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণেই 'ঈ'-কার অথবা 'ই-কার দুটোই চলতে পারে এরকম বলা আছে। সেখানে আমরা "ই"-কারকেই নেব—এই প্রস্তাব অনেকেই করেছেন। তিনি এ মতকে নির্বিচারে সমর্থন করেন বলে তো মনে হয় না। "ধরনি তরনি তরি-র মতো শব্দগুলোকে যদি আজ ব্যবহার করতে শুরু করি, তাহলে কি সেটা প্রচলনের উলটা দিকে গিয়ে নতুন এক জটিলতাই তৈরি করবে না?" জট আরও আছে। মন্ত্রিসভা না মন্ত্রীসভা? এই বিষয়ে তাঁর মত পরিষ্কার। "সর্বত্রই ঈ-কে রক্ষণীয় বলে গণ্য করলে কেমন হয়, দুটি তৎসম বাংলা শব্দের নিজস্ব সংযোগ হিসেবে?" এইখানে এই 'বাংলা শব্দের উল্লেখটা লক্ষণীয়। তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, বিদেশি যে জন্মসূত্রেই থাক না কেন শব্দের, বাংলায় তাকে বাংলা শব্দ হিসেবে গণ্য করতে আমাদের আপত্তি কী? তিনি উদাহরণ তুলে দেন রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে—স্বামীপ্রীতি, স্বামীভক্তি। আসে বুদ্ধদেব বসুর লেখা থেকে প্রণয়ীযুগল, বিনয়ীতম, বিরোধীদল। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পূর্ববর্তীদ্বয়।

এখানেই আমরা ধরতে পারি শঙ্খ ঘোষের যুক্তিনিষ্ঠা, আর একই সঙ্গে প্রচলনের প্রতি সম্মাননা। আর সেটা ব্যক্তিগত অভ্যাস সংস্কার কিংবা পছন্দের উর্ধ্বে। বড়োই আক্ষেপের বিষয় যে তিনি তাঁর বানান-ভাবনা নিয়ে একটা বড়ো-গোছের বই লিখে দিলেন না আমাদের জন্য, যাতে আমরা উপকৃত হতাম। তবে আশা ছাড়ছি না। দেবেন কি তিনি?

...

বাংলা বানান ও শঙ্খ ঘোষ

'শঙ্খ ঘোষের বানান' অথবা 'বানান বিষয়ে তাঁর ভাবনা' কি কোনো লেখার বিষয় হতে পারে? তিনি কবি সমালোচক প্রাবন্ধিক. বাংলা ভাষায় লেখেন। সে ভাষার শব্দের বানান তো নির্দিষ্ট থাকারই কথা। কোনো একজন বিশেষ লেখক তার হেরফের করতে পারবেন না। যদিও বা তা হয়ে যায় ভুল করে, তাহলেও তো ছাপার সময় শুধরে দেওয়ার কথা। এমনটাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু তা না হয়ে কোনো একজনের বানান বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার সুযোগ যে পাওয়া যাচ্ছে, তার কারণ একটাই। এতদিনের ভাষা বাংলা। কিন্তু সে ভাষার অনেক শব্দ এখনও একাধিক উপায়ে লেখা হচ্ছে। তার কোনটা ভুল আর কোনটা শুদ্ধ তার বিচার তর্কাতীত নয়। একই শব্দের নানা বানানের কোনটাকে নেব, মান্য বলে মানব তাও স্থির হতে পারছে না। তাই বানান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন, লেখায় মধ্যে একই শব্দের একাধিক বানান লিখে বসেন না—এমন লেখকদের যদি চিহ্নিত করা যায়, তবে একই সঙ্গে তাঁদের লেখা বানান নিয়ে আলোচনা আমাদের কোনো সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করতে পারে।

এর উদ্দেশ্য হয়তো একটাই। ভবিষ্যতে কোনোদিন হয়তো বাংলায় একই শব্দের একাধিক বানান থাকবে না—এই অবস্থায় আসা যায় কিনা? এমন এক আপাত অসম্ভব ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা? সেই তাগিদেই আমাদের দেখতে হয় কোন শব্দ কীভাবে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রাজশেখর বসু, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু বা আরও অনেকে। এই তালিকায় অবশ্যই যোগ হয়ে যায় শঙ্খ ঘোষের নাম। তিনি যে বানান লেখেন তার পিছনে একটা যুক্তিনির্ভর ভাবনা থাকে, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ প্রবণতা অভ্যাসকে ছাপিয়ে ওঠে এই যুক্তিনির্ভরতা। তবে তা অন্য সবাই মেনে নেবেন, একমত হয়ে যাবেন তাঁর সঙ্গে—সে আশা অবশ্য করেন না কেউই, তিনি তো ননই। তাঁর লেখায় আমরা একবার 'বলবো, কিছু পরেই 'বলব' অথবা 'বোলবো' পাই না। একই রচনায় হালকা হাল্কা

হালকার সহাবস্থান দেখা যায় না। বানান সচেতন লেখক তিনি। যেমন ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁর তালব্য-শ-প্রিয়তা হাত ফসকে বেরিয়ে-যাওয়া কোনো অনভিপ্রেত ব্যাপার নয়। ভেবেচিন্তেই তিনি লিখেছেন। সব লেখকেরই এই ব্যাপারটা কিন্তু থাকে না। অনেকেই যা হাতে আসে লিখে দেন, বাকিটা বিনাশর্তেই ছেড়ে দেন প্রুফরিডারের হাতে। যা করার করে দিয়ো হে-গোছের লাইসেন্স দিয়ে দেন। এই প্রেক্ষিতে শঙ্খ ঘোষের সচেতনতাই এই লেখার ভিত্তিভূমি।

এবার একটু পিছিয়ে আসতে হয়। অনেকবার আলোচিত কিছু কথা আবারও না বলে নিলে এ রচনার পটভূমি স্থিরীকৃত হবে না।

১. বাংলায় কিছু শব্দের বানানের রকমফের হওয়ার উপায় নেই। যে শব্দ সংস্কৃত থেকে সংস্কৃত রীতির বানান নিয়েই বাংলায় এসেছে, যাদের বলা হয় তৎসম শব্দ, তারা এই দলের। এদের বানান যে একেবারেই বদল হয়নি তা নয়, তবে সে পরিবর্তন সামান্য। শ্রীমান্, ধনবান্-এর হস্‌চিহ্ন বাদ গেছে। সততঃ, সাধারণতঃ, প্রধানতঃ—এইসব শব্দে বিসর্গ দেওয়া হয় না এখন। তদ্ভব, অর্ধতৎসম শব্দেরও একাধিক বানান দেখা দিল। গিন্নি, গিন্নী ; পুজো, পুজো ; ব্যাবসা, ব্যবসা। কিন্তু এই রূপভেদও তেমন জটিল হয়ে উঠেনি। ক্রমে (খুব ধীরে যদিও) একটা স্বাভাবিক সমাধানের দিকে যাচ্ছে। হাতি, পাখি, গিন্নি, বাড়ি, গাড়ির ব্যাপক স্বীকৃতি তার একটা প্রমাণ।

২. যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি শব্দ প্রতিবর্ণীকৃত কিংবা পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় চলছে তাদের বানানের জটিলতা নানা ধরনের। আপশোষ, আফশোষ আপশোস, আপশোশ, আফশোস ; আপস, আপোশ ; খুনী, খুনি, খুসী ; খৃষ্ট, খৃস্ট, খ্রিস্ট, খ্রিষ্ট, খ্রীষ্ট, খ্রীস্ট।

৩. সাধুভাষায় বাংলা ক্রিয়াপদের বানানে সমতা ছিল। বলিব ; পৌছাইবে ; করিয়াছিল ; দৌড়াইতেছে। চলিতে নানা চেহারা এসে গেল। বলব, বলবো, বোলবো ; পৌছবে, পৌঁছবে, পৌঁছাবে, দৌড়াচ্ছে, দৌড়োচ্ছে, দৌড়চ্ছে। এ ছাড়াও আরও কতরকম সমস্যা।

৪. এসব ছাড়াও ভালো, ভাল ; বড়ো, বড় ; ছোটো, ছোট ; সাদা, শাদা ; কিংবা এগারো, এগার,—এ প্রশ্নগুলোও রইল অমুত্তরিত। আরো, আরও ; কারো, কারও ; হয়তো, হয়ত ; আজও, আজো এরাও সমস্যা হয়ে আছে।

৫. এরপর থাকছে জোড়া কিংবা না-জোড়ার প্যাঁচ। একরকম, এক রকম ; স্বাভাবিকভাবে, স্বাভাবিক ভাবে। হাইফেন হবে কি হবে না ? রাজা-প্রজা ; রাজাপ্রজা ; আদান-প্রদান, আদান প্রদান।

৬. বাংলায় প্রচলিত দুটো সংস্কৃত শব্দের সমাসবদ্ধ রূপ কেমন হবে ? মন্ত্রিসভা, মন্ত্রীসভা ; নভশ্চর, নভোচর, নভচর ; বিদ্যুৎলতা, বিদ্যুল্লতা।

৭. আরও আছে। উদ্‌বাস্তু, উদ্বাস্তু ; উদ্‌বোধন, উদ্বোধন ; বাগ্‌দেবী, বাগ্দেবী।

এই তালিকা দীর্ঘতর করার প্রয়োজন নেই। এবার প্রশ্ন শঙ্খ ঘোষের লেখা থেকে কিংবা তাঁর পরামর্শে কি আমরা এই সব সমস্যার কোনো উত্তর পেতে পারি ? যে উত্তরের ভিত্তি আবেগ, অভ্যাস কিংবা নিছকই ভালো লাগা নয়। যা হবে যুক্তিনির্ভর—সে যুক্তি হতে পারে ব্যাকরণ সংগতির কিংবা প্রচলনের বারংবারতার, কিংবা বাংলা ভাষারীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য। ব্যাকরণের ব্যবহারটা হতে পারে প্রধানত তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে। এটাই আগে নেওয়া যাক।

নানা বয়সের ও নানান বিষয়ের লোক বাংলায় লিখবেন—এটা সবাই চান। বানান শেখার সব চেয়ে প্রশস্ত সময় স্কুলে পড়ার সময়টা, আর এই সময়ে সবাই বাংলা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটিতে দুরস্ত হয়ে উঠবে—এটা আশা করা বাতুলতা। এছাড়া ব্যাকরণকে ভয় পাওয়াটাই ছাত্রছাত্রীর স্বাভাবিক ধর্ম। ব্যাকরণের মারপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়েও কীভাবে স্কুল-পড়ুয়াদের শুদ্ধ বানান শিখতে ও লিখতে প্রাণিত করা যায় সে বিষয়ে তাঁর একটা বই আছে। কুন্তক ছদ্মনামে লেখা 'শব্দ নিয়ে খেলা'। এক কথায় বলা যায়, এমন বই বাংলায় আর দ্বিতীয়টি নেই, আর যে পদ্ধতিতে এটি লেখা তা-ও 'সেকেণ্ড টু নান'। এতে আছে ছত্রিশটি ছোটো ভাগ, যাকে হয়তো 'এপিসোড' বললেই সিরিয়াল-দেখা ছেলেমেয়েরা ও তাদের অভিভাবকরা ভালো বুঝবেন। এর প্রথম পর্ব 'শব্দ ভাঙার খেলা', শেষ 'হবার যেটা সেটাই হবে'। এর প্রতি পৃষ্ঠায় যে কথা যে ভাবে বলা আছে, তা যে ওভাবে বলা যায় সেটাই ভাবা যায়নি এর আগে। এ প্রসঙ্গে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। শ্রীমান-এ কেন দন্ত্য-ন অথচ ণত্ববিধি মেনে ম্রিয়মাণ-এ 'ণ', এই নিয়ে ধাঁধায় পড়ি। যার এইরকম অবস্থায় শঙ্খ ঘোষের দ্বারস্থ হওয়াটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রশ্নের উত্তরের আগেই তিনি সম্ভবত প্রশ্নকর্তার জ্ঞানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে নিয়ে ত্ত শানচ্ বতুপ্ মতুপ্ নিয়ে ব্যাকরণের জটিলতায় ঢুকলেনই না। বললেন, দেখে নিতে হবে 'মান' কিংবা 'বান'-এর আগের শব্দগুলোর কোনো মানে য় কিনা। যদি হয় তবে সর্বদাই দন্ত্য-ন, না হলে ণত্ববিধি অনুযায়ী 'ণ' থবা 'ন'। শ্রীমান্-এর আগে 'শ্রী' কথাটার মানে হয়। তাহলে 'ন্' হবে। ম্রিয়'-র কোনো মানে আছে ? নেই। তাহলে ণত্ববিধি অনুযায়ী তা হবে ন্ত্য-ন ; বর্ধমানের বর্ধরও কোনো মানে নেই। তখন ণত্ববিধি অনুযায়ী

তা হবে দন্ত্য-ন। একটা ওয়ার্নিংও দিলেন। এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। সেরকম কিছু পেলে যেন একবার জিজ্ঞাসা করি। এই অসামান্য উত্তর থেকে পরে নিজেই খুঁজে পেয়েছিলাম উত্তরের না-বলা অংশটা। অবশ্য তাতে সময় লেগেছিল অনেক।

কিন্তু কথা হচ্ছিল 'শব্দ ভাঙার খেলা' নিয়ে। হরিনাথ বাবু 'উজ্জলা' সিনেমাহলের সামনে দিয়ে যেতে হলেই চোখ ঢাকেন। ভুল বানানে অর্থাৎ ব-ফলাহীন 'উজ্জলা'র তাঁর আপত্তি। এইখানেই উঠে আসে একটা প্রশ্ন নন্তর বয়ানে, 'কেন, ভুল কেন হবে? বাংলা বানান তো সব রকমই হয়।' এটা সত্যিই আজ একটা বাজার-চলতি কথা। নন্ত এ কথাও শুনেছে 'রবীন্দ্রনাথই না কি করে দিয়ে গেছেন এইসব। তারপর থেকেই বাংলা বানান না কি সোজা হয়ে গেছে খুব। কোনো নিয়ম আর না মানলেও চলে।' এই ধরনের কথাবার্তা আপনি আমিও শুনেছি। স্কুলে কলেজে যাঁরা বাংলা পড়ান তাঁদেরও অনেকের এইরকমই বিশ্বাস। হয়তো বা এই ধারণা ভাঙতেই তাঁকে কলম ধরতে হয়। আর তার পাঠক পাঠিকা হিসেবে বেছে নেন ছোটোদের—ক্যাচ দেম ইয়ং।

প্রথম প্রেসক্রিপশন শব্দটাকে ভাঙার। 'শব্দ আবার ভাঙে কেমন করে? শব্দ কি বাদাম?' এইভাবেই এগিয়ে চলে 'শব্দ নিয়ে খেলা'। 'অনেক শব্দই ভাঙা যায়। অনেক সময়েই দেখবি কয়েকটা ছোটো ছোটো টুকরো মিলে তৈরি হয় একটা গোটা শব্দ। টুকরোগুলি ভেবে নিলেই বানানের ঝামেলা অনেকটা কমে যায়।' এই প্রথম আমরা মাতি শব্দ ভাঙার খেলায়। 'উৎ' আর 'জল' মিলে হল উজ্জ্বল। এই জ্বল থেকে ব-ফলাটা বাদ দিলে তা 'জল'। মানেই পালটে যাবে। 'যার জ্বলবার কথা ছিল, সে তো গলে যাবে তখন।' প্রশ্ন ওঠে দুটো 'জ' এল কোত্থেকে। '...উৎ-জ্বল কথাটাই খুব আঁটোসাঁটো করে বলতে গেলে ৎ-টাই জ-এর মতো শোনায়, তাই হয়ে যায় উজ্জ্বল। একটা নিয়ে নিলি, তার বদলে একটা দিবি না? এখানে ৎ-এর বদলে জ'। শব্দ ভাঙার এই কায়দাটা একবার মাথায় ঢোকাতে পারলে অনেক বানানই সহজ হয়ে আসে। নিজে নিজেই নিয়ম বার করে নেওয়া যায়। ওই টানেই তিনি শিখিয়ে দেন সত্তা, সত্ত্ব আর স্বত্ব-র গূঢ় রহস্য। সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো তত্ত্বের মধ্যে না গিয়েও বানান আয়ত্ত করার যে পদ্ধতি তিনি এই ছোট্ট বইটায় দেখিয়েছেন তা তাঁর আগে অথবা পরে কেউ পারেন-নি। বাংলা বানান বিষয়ে তো বই অনেকগুলোই আছে এখন।

টুম্পি, নন্ত আর কাকু ও মাঝে-মধ্যে বৌদির সংলাপের মধ্যে দিয়ে বইটি এগিয়ে চলে যে চালে তা-ও এক কথায় অভিনব। তাই সরস্বতীর কাণ্ডেও

আমাদের প্রয়োগ করতে হয় ওই তাড়াতাড়ির প্রণালী। 'সরস্ হলো জল।' আর 'বান্' জুড়ে দিলে বোঝায় 'আছে'। দুয়ে মিলে সরস্বান্, তার স্ত্রীলিঙ্গে 'বতী' অর্থাৎ সরস্বতী। 'যেমন ধর স্রোতস্বান্—স্রোতস্বতী। তেজস্বান্—তেজস্বতী।'

ওই কাণ্ডেই পাই 'বলব আরো? ধনবান্ পুণ্যবান্, রুচিবান্—'

'এই এই এই। দাঁড়া দাঁড়া। বলে গেলেই হলো? রুচিবান্ আবার কী? ওটা হবে না। বল রুচিমান্।

'কেন? তা কেন বলব?

'না যদি বলিস, তাহলে তোকে বলব বুদ্ধিবান্। কিছুতেই তোকে বুদ্ধিমান্ বলব না। কী? কোন্টা বলিস, বুদ্ধিবান্ বা বুদ্ধিমান?

'বুদ্ধিমান্।

'সেইরকমই হলো রুচিমান্। আরো এ-রকম দেখবি? শ্রীমান ধীমান্ অংশুমান্ আয়ুষ্মান্।'

এইভাবেই এগিয়ে চলে বানান শেখার আসর। কিন্তু প্রয়োগের অথবা ব্যবহারের বিষয়টাও ভুলে যান না তিনি। 'শব্দ তো পালটেও যায় মুখে মুখে। রুচিবান কেও কি ঠেকানো যাবে ভাবছিস? নম্বরই জয় হবে।"

জানি না এখানে কোনো বেদনাবোধ কাজ করে কি না। কারণ ব্যাকরণের কচকচির মধ্যে না গিয়েও কিশোর-পাঠ্য (এবং বড়োদেরও) বানান শেখার পদ্ধতি নিয়ে তাঁর 'শব্দ নিয়ে খেলা' বইটি তার শেষ অধ্যায় 'হবার যেটা সেটাই হবে'। এখানেও বোধহয় কিছু অসন্তোষের ছোঁয়া পাই। 'ছেলেমেয়েরা ভুল শিখলে আমরা রাগ করি, কিন্তু ঠিক শেখাবার গরজ আছে কার?'

কোনো সন্দেহ নেই এই 'ঠিক শেখাবার' গরজেই এই বই। যখন কেউ কিছু করছেন না, তখন তাঁকেই কাজ করে দেখাতে হয় যে পারা যায় অনেক কিছুই, পারার ইচ্ছেটা চাই অবশ্যই। ব্যাকরণের তত্ত্বের মধ্যে প্রায় না গিয়েই তৎসম শব্দের বানান রহস্য ধরিয়ে দেওয়া ছাড়াও এই বইতে বিদেশি শব্দের বাংলা বানান নিয়ে কিছু কথা আছে। কথাটি খুবই সহজ সরল। যেখানে বানান নির্ধারণের কোনো উপায় নেই, যেমন, শাদা অথবা সাদা, সেখানে যেকোনো একটা মেনে নিলেই হয়। আর এই মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ঝোঁক সম্ভবত 'শ'-এর দিকে যদি উচ্চারণটি ইংরেজি এস কিংবা তার কাছাকাছি না হয়। হলে 'স'। কিছু উচ্চারণও দেন তিনি।

'শব্দ নিয়ে খেলা' 'ছোটদের জন্য লেখা তাই অনেক বিষয়ের কূট তর্ক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এই বইতে। আশা ছিল বানান বিষয়ে একটা বৃহত্তর বই তাঁর কাছ থেকে আমরা পাব। একটা সময় হয়তো ছিল (আজও আছে

কিনা বলতে পারব না) যখন তাঁর যুক্তিনির্ভর বানান পদ্ধতি সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও বহুজনগ্রাহ্য হত। যেমন একটা সময়ে 'চলন্তিকা'র বানান অনুসরণ করতেন অনেকেই। এখনও অনেক জায়গাতেই শুনি, 'আমরা সংসদ-কে অনুসরণ করি।'

এর মধ্যে বানান (এবং কিছুটা প্রয়োগ) বিষয়ে 'বাংলা—কী লিখবেন, কেন লিখবেন' নামে আনন্দবাজার পত্রিকার 'ব্যবহার বিধি' প্রকাশিত হয়েছে। এর সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই কাজের পক্ষে নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য ব্যক্তি। নানান জায়গায় কিছু আলোচনা ছাড়া শঙ্খ ঘোষের কাছ থেকে কোনো লেখা আমরা পাই নি। ১৯৯১-এর মে মাসের 'প্রতিক্ষণে' অরুণ সেনের "বানান—বিষয়ক প্রস্তাব 'বাঙলা বানান ও বিকল্প বর্জন' নামে বেরিয়েছিল। (জেনেছি বানান নিয়ে অরুণ সেনের একটা বইও বেরিয়েছে সম্প্রতি—এখনও দেখিনি যদিও)। বানান বিধি বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের চিন্তার আরও কিছু আভাস পাই অরুণবাবুর 'প্রস্তাব' বিষয়ে তাঁর একটি লেখাতে যা বেরিয়েছিল 'প্রতিক্ষণ'-এর ডিসেম্বর ১৯৯২ সংখ্যায়। এই লেখাটা যে বহুলোকে পড়েছেন—এমন প্রমাণ পাই নি। এমনকী বিষয়টি নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদেরও অনেকেই সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি পত্রিকার ওই সংখ্যাটা। তাই হয়তো একটু বেশিই উদ্ধৃতি-চিহ্নের দেখা মিলবে পরের অনুচ্ছেদ-গুলোতে।'

তিনি লিখছেন "বানান লিখে সমতাপন্থী যে-কোনো ভাবনার দিকে এগোতে গেলে রীতিমতো দিশেহারাই লাগে।" আমি 'এগোতে' বানানটা লক্ষ করি—তিনি কি তাহলে পৌঁছানো, দৌড়োনো, পিছোতে অর্থাৎ মাঝের ওই ও-কারটা রাখার পক্ষপাতী? পূর্বপ্রসঙ্গে যাই। "এক-এক সময়ে এক-এক ধরণের বানানের দিকে ঝুঁকে পড়ি অল্পবিস্তর আমরা সবাই।" এখন এতদিন পর তাঁর মনে হয় "সমস্যাগুলি যে কীভাবে মিটবে, তার স্পষ্ট কোনো ধারণা করতে পারি না।" উল্লেখ করেন এক বন্ধুর ভাবনার কথা যিনি মনে করেন নানা বিকল্প একসঙ্গে চলতে থাকলে ক্ষতি কী। । "বিকল্পবর্জন কি সত্যিই খুব জরুরি—প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।" সেই সঙ্গেই "বিকল্পের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শেষ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কতদূর সম্ভব, এ নিয়ে আমার সংশয় দিন-দিন বেশ জোরালোই হয়ে উঠছে।" এই সংশয়ের কারণ যতটা না তাত্ত্বিক, তার চেয়ে বেশি ব্যবহারিক। কারণ বিষয়টা এত জটিল হয়ে গেছে, বিশেষত ব্যক্তিগত অভ্যাসের দরুণ, যে অতি সতর্ক লেখকও অজান্তেই বিকল্পের গর্তে পড়ে যান। তিনি কিছু উদাহরণও দিয়েছেন। তবে সত্যি যদি অভ্যাস-গত বাধা ধীরে ধীরে (হয়তো বা অতি ধীরে) অতিক্রম করা যায়, তবে তাঁর

মত যে বিকল্প বর্জনের দিকে এ নিয়ে বোধহয় সন্দেহ নেই। কিন্তু একই শব্দের একাধিক বানান, আর দুটোই শুদ্ধ, এমন থাকলে কোনটিকে নেব, সে বিষয়ে কী মত? বলা বাহুল্য এ কথাটা সহজে বলা যাবে না। লেখার আয়তন বাড়তেই থাকবে। তবে কিছু নমুনা দেওয়া যায়।

অনেক তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণেই 'ঈ'-কার অথবা 'ই-কার দুটোই চলতে পারে এরকম বলা আছে। সেখানে আমরা "ই"-কারকেই নেব—এই প্রস্তাব অনেকেই করেছেন। তিনি এ মতকে নির্বিচারে সমর্থন করেন বলে তো মনে হয় না। "ধরনি তরনি তরি-র মতো শব্দগুলোকে যদি আজ ব্যবহার করতে শুরু করি, তাহলে কি সেটা প্রচলনের উলটো দিকে গিয়ে নতুন এক জটিলতাই তৈরি করবে না?" জট আরও আছে। মন্ত্রিসভা না মন্ত্রীসভা? এই বিষয়ে তাঁর মত পরিষ্কার। "সর্বত্রই ঈ-কে রক্ষণীয় বলে গণ্য করলে কেমন হয়, দুটি তৎসম বাংলা শব্দের নিজস্ব সংযোগ হিসেবে?" এইখানে এই 'বাংলা শব্দের উল্লেখটা লক্ষণীয়। তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, বিদেশি যে জন্মসূত্রই থাক না কেন শব্দের, বাংলায় তাকে বাংলা শব্দ হিসেবে গণ্য করতে আমাদের আপত্তি কী? তিনি উদাহরণ তুলে দেন রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে—স্বামীপ্রীতি, স্বামীভক্তি। আসে বুদ্ধদেব বসুর লেখা থেকে প্রণয়ীযুগল, বিনয়ীতম, বিরোধীদল। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পূর্ববর্তীদ্বয়।

এখানেই আমরা ধরতে পারি শঙ্খ ঘোষের যুক্তিনিষ্ঠা, আর একই সঙ্গে প্রচলনের প্রতি সম্মাননা। আর সেটা ব্যক্তিগত অভ্যাস সংস্কার কিংবা পছন্দের উর্ধ্বে। বড়োই আক্ষেপের বিষয় যে তিনি তাঁর বানান-ভাবনা নিয়ে একটা বড়ো-গোছের বই লিখে দিলেন না আমাদের জন্য, যাতে আমরা উপকৃত হতাম। তবে আশা ছাড়ছি না। দেবেন কি তিনি?

...

শঙ্খ ঘোষের দু'টি কবিতা : 'কলহপর' এবং 'হৃৎকমল'*

শঙ্খ ঘোষের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প'ড়তে গিয়ে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'দিনগুলি রাতগুলি'-র একটি কবিতা 'কলহপর' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র অন্তর্গত 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে'-র 'হৃৎকমল' কবিতাদুটির মধ্যে যে-সম্পর্ক অনুধাবন করলাম তা আমার অন্যতম প্রিয় কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা-বিবর্তনের বৃত্তরেখাক্রম (দেরিদা-কথিত Parergon বা পারেরোর্গো) বুঝতে সাহায্য ক'রবে ব'লে আমি এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

'কলহপর' কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে 'যত তুমি বকোঝকো মেরেকুটে করো খুচিখুচি— / আমি কিন্তু বলব এসবেই আন্তরিক রুচি'। নিছক প্রেমের কবিতা, কোনো ছক নেই তাতে, অথচ 'আমি' এই কবিতাটিতেই 'সে-তে সাধারণ হ'লো ('আকাশে বিচিত্র মেঘ নানা ছন্দে তোলে যে অপেরা / তাতে খুন হতে হতে রুক্ষ চুলে বাড়ি ফিরে আসা / পোড়া-মুখে চিহ্ন তার অকুণ্ঠ বিস্মিত ভালোবাসা'), এবং 'সে', যে আসলে 'আমির'-ই প্রকারভেদ, তার প্রার্থনায় প্রতিধ্বনিত হ'লো পৃথিবীর জন্যে প্রার্থনা—

'অসম্ভব, অসম্ভব প্রিয়
আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয় !'

সচেতন বা অচেতনভাবে শঙ্খ ঘোষ এই নিছক প্রেমের কবিতায় যে ছক বা নকশা তৈরি ক'রলেন, তা-ই নানাভাবে বিবর্তিত হ'লো 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' পর্যন্ত। দ্বিতীয় বই 'নিহিত পাতাল ছায়া' (রচনা ১৯৬০-৬৬ / প্রকাশ ১৯৬৭)-র 'বিপুলা পৃথিবী' কবিতায় এই ধরনের পঙক্তি রচিত হ'লো 'একদিন সে এসে দাঁড়িয়েছিলো ভুল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা / ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল লাগে বারে-বারে।' তৃতীয় বই 'তুমি তো তেমন গৌরী নও'-তে (রচনা ১৯৬৭-৬৯ / প্রকাশ ১৯৭৮, শঙ্খ ঘোষের আকাদেমি পুরস্কার পাবার পরের বছর) আবার পাচ্ছি 'তবু কেন / আমি যদি এতই অশুচি তবে পথিকেরা আজও কেন জল চায় / আমার দুয়ারে ?', চারনম্বর বইতে 'আদিম লতাগুল্মময়'—(রচনা ১৯৭০-৭১, প্রকাশ ১৯৭২)-এ আছে 'পাথর' যার প্রথম লাইনদুটি হ'লো :

* 'কলহপর' (দিনগুলি রাতগুলি—রচনা ১৯৫১-৫৪। প্রকাশ ১৯৫৬)
'হৃৎকমল' (ধুম লেগেছে হৃৎকমলে—প্রকাশ ১৯৮৭)

পাথর, নিজেই আমি দিনে দিনে তুলেছি এ বুকে
আজ আর নামাতে পারি না।
... ...
মুহূর্ত মুহূর্ত শুধু জন্মহীন মহাশূন্যে ঘেরা
কার পূজা ছিল এতদিন ?
একা হও একা হও একা হও একা হও একা,"

পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' (রচনা ১৯৭২-৭৩/ প্রকাশ ১৯৭৪)-তে পাই—

'শরীরের মধ্যে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে, ডাক্তার
জানি না তার নাম।' ('শরীর')

এবং

ঘুমোতে পারি না, প্রতি হাড়ের ভিতরে জমে ঘুণ
পা থেকে মাথায় ওঠে অশালীন বীজাণুবিস্তার
ঘূর্ণমান ডাক দিই : কে কোথায়, সিস্টার সিস্টার—
('হাসপাতাল : নার্স ১')

পুরস্কৃত ষষ্ঠ বই 'বাবরের প্রার্থনা'য় (রচনা ১৯৭৪-৭৬ / প্রকাশ ১৯৭৬) দেখি

'কিন্তু বলতে পারি না, কেননা তার আগেই
তুমি নিজে
নিজের হাতে ধ্বংস করো আমার ধ্বজা, আমার আত্মা।' (ধ্বংস করো ধ্বজা)'

সপ্তম কাব্যগ্রন্থ 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' (রচনা ১৯৭৬-৮০ / প্রকাশ ১৯৮০) আছে—

গলিতে গলিতে দেশ ছেয়ে যাক। যায়নি এখনো ?
ভাসন্ত শবের পাখি সূর্যের কুহরে উড়ে যায়।
(পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ—৫)

তার পরের বই 'বন্ধুরা মাতি তরজায়' (রচনা ১৯৭৬-৮০। প্রকাশ ১৯৮৪) আছে 'স্লোগান'—

দুই হাতে দুই মশাল দিও
শান্তি চাই, অশান্তিও। ('স্লোগান')

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত, এবং ১৯৮২-৮৩-তে রচিত, 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'-তে আছে

দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনো।
('দেশ আমাদের আজও কোনো')

এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সর্বশেষ বই-তে 'ঘুম লেগেছে হৃৎকমলে' (রচনা ১৯৮৪-৮৬ / প্রকাশ ১৯৮৭) পড়ছি আমরা

> চিতা যখন জ্বলছে, আমার হৃৎকমলে
> ঘুম লেগেছে, ঘুম লেগেছে চরাচরে, পাপড়ি জ্বলে
> এই তো আমার
>
> এই তো আমার জন্মভূমির আলোর কথা। ('হৃৎকমল')

অর্থাৎ পুরো একটি বৃত্ত রেখাঙ্কন হ'লো, যে 'ভুবন' তিনি চেয়েছিলেন প্রথম কবিতার বই 'দিনগুলি রাতগুলি'-র একটি কবিতায়, সেই ভুবন হলো 'এই তো আমার / জন্মভূমির আলোর কথা'। 'হৃৎকমল' শব্দটি প্রাচীন বাংলা কবিতা ও সংগীতের একটি শব্দ। যাকে motif বা ধুয়া হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন শঙ্খ তাঁর 'ঘুম লেগেছে হৃৎকমলে' গ্রন্থে—মাঝখানে অন্য আরো কবির মতো তাঁরও নিঃসঙ্গতা, সমাজ-মানুষ ও জড়-অনড়ের দ্বন্দ্বে রক্তক্ষরণ, স্বদেশের প্রতি অভিমান, মিছিলে নামবার সঙ্কল্প, যার প্রকাশশৈলী এতোই মার্জিত যে মনেই হয় না তিনি মিছিল স্লোগানের কথা ব'লছেন, শরীরের ঘুণ বা ব্যাধির অভিজ্ঞতা, এবং শেষপর্যন্ত এই মার্ক্সীয় 'line'-এর পর্যান্তে জন্মভূমির আলোর কথা।

এবার ঐ দুটি কবিতার কাছে আবার ফিরে আসি, 'কলহপর' এবং 'হৃৎকমল'-এর কাছে। একটি মিষ্টি মেয়েকে এক তরুণ কবি বলছেন

> 'যত তুমি বকোঝকো মেরেকুটে করো কুচিকুচি—
> আমি কিন্তু তবু বলব এসবেই আন্তরিক রুচি',

অলোকরঞ্জনের প্রথমদিকের কবিতাতেও 'যত্রতত্র মধ্যাহ্নভোজন' সেরে নেবার আত্মদানময় বিনয় হয়তো আছে, হয়তো আছে আমাদের কবিতাতেও। আমরা সবাই তো একসময়ে তরুণ ছিলাম। কল্পনা ক'রে নিতে পারি, ঝুলি-কাঁধে এক তরুণ কবির একটু দেরি হয়েছে আসতে, বান্ধবী বাসস্টপে বা পার্কের রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর কবিবর আসতেই যে যেখকড় বকুনি দিয়েছে, তার উত্তরে কবি, কবি শঙ্খ ঘোষ ব'লছেন 'আমি কিন্তু বলব এসবেই আন্তরিক রুচি'। অভিভাবকদের যে-উক্তি অনুচ্চারিত আছে তা হলো 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পারা যায় না, হয় কবিতা, নয় পলিটিক্স, যেমন ধরুন আমার—ইত্যাদি'। আমার একটি কবিতার কয়েকটি লাইন এই সূত্রে উল্লেখ করছি

> 'এখন যদি বাংলাদেশে থাকতে পারতেন
> তাহলে দেখতেন, রেলিংগুলো বড় হ'য়ে ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে গেছে,

সিজিমামারা কবিতার খাতা হতে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়—
আপনার হাতের বেত ঘরের একপাশে পড়ে আছে!

—ক্লাসের ঘণ্টা আর বাজে না
(নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি—
প্রথম প্রকাশ / মার্চ, ১৯৭৫
আনন্দ পাবলিশার্স—)

এখানে নিজের কথা বলিনি আমি, বলবার কোনো প্রত্যক্ষ পটভূমি ছিলো না আমার, তবু বলেছি অন্ত কোনো কোনো তরুণদের বিষয়ে, যাঁদের সঙ্গে তরুণোচিত আত্মীয়তা অবশ্যই সম্ভব, অন্তত ভেবে তো নেয়া যেতে পারে, তাদের সঙ্কল্প, সংগ্রাম, ব্যর্থতার বিবরণ।

শঙ্খ ঘোষের 'কলহপর'-এ আরো দু'একটি আকর্ষণীয় পঙক্তি আছে—'অভ্যাস মরে না জেনে দুই চোখে তুমি তোলো তীর / তা সত্ত্বেও বিনাস্নানে ভালো লাগে মধ্যাহ্নভোজন'। সেই তারুণ্যরঙিন বাউণ্ডুলেপনার কথা, যে বিষয়ে বাঙালি কবিরা কেউ কেউ খুবই অভিজ্ঞ, অন্যেরা তাদের সম্পর্কে শুনেছেন। 'ঘুম লেগেছে হৃৎকমলে'-র 'হৃৎকমল' কবিতায় আছে 'চিতা' শব্দটি, যা তার আগের বইগুলিতে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে, আর জল'তে জল'তে পুড়ে যাবার কথা অনেক বাঙালি কবিই বলেছেন, অনেকের গোপনদহনের ভাবনা, কারো কারো পুড়ে ছারখার হবার ধারাবিবরণী, কিন্তু শঙ্খ ঘোষের মতো এতোটা ঋজুভাবে নয়। 'চিতা যখন জলছে'—নিশ্চয়ই, শঙ্খদা, চিতা যখন জলছে॥

রথীন ভৌমিক

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ : প্রবাহিত জীবনের ধ্বনি

প্রায় চল্লিশ বছর, কবিতা লেখার প্রায় প্রথম দিকে, শঙ্খ লিখলেন : 'দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগরে-বন্দরে / যেখানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ পদপুটে—'···'মাগো, আমার মা—/ঝড় নেমেছে দুয়ারে তার ঝঞ্ঝা লাগো-লাগো'। কবিতা-জীবনের শুরুতেই, এ কোন্ উচ্চারণ যাতে মথিত হয়ে ওঠে আমাদের সমস্ত কাতরতা? নিছক কল্পনার বিলাপ হলে লাইন ক'টি হয়ে উঠতো সুন্দর রচনামাত্র, কিন্তু সত্যি তা তো নয়। শঙ্খের এই লাইন ক'টিতে শব্দের এই অভিজাত সন্তর্পণ ব্যবহার এক ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উঠে আসে। আসলে স্পষ্ট হয়ে আসে কবির নিজেকে গড়ে তোলার ছবিটা।

পদ্মাপাড়ের সেই ছোট্ট জন্মভূমি। যার একদিকে নদী একদিকে বন। যার 'মুক্ত আকাশের নিচে নিঃশব্দ নির্জনে, চারিদিকে খোলা পড়ে আছে পৃথিবী'—এই ছবির মধ্য থেকে উঠে আসে এক কিশোর। যে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় দশদিগন্ত। যে দেখতো 'বিকেলবেলা মাঠের ওপার থেকে বান্ধবীদের আসতে দেখে ফুলদি যখন আধোপরিহাসে হাত ছড়িয়ে গাইতে গাইতে এগোত 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না / শুকনো ধুলো যত' আর তখন তার 'অনেক দূরে সরে যেত মন, জেগে উঠত একটা অলক্ষ্য স্পন্দন,...এক অস্ফুট বসন্তসঞ্চার···তার ঐশ্বর্যের শেষ ছিল না কোনো।' সে এসে পড়ল বিস্তার থেকে বন্ধনে, সংকীর্ণ স্নিগ্ধ আবেষ্টনে 'কলকাতার এই বিশাল বিরূপ সমাবেশে, তার যত দাম্ভিক চালচলনে।' না, নিজেকে সরিয়ে তিনি নেননি।

ফলে 'জেগে ওঠে প্রতীক্ষিত এক বিরোধ; বাইরের আর ভিতরের নিরন্তর সংঘর্ষ'। আসলে প্রত্যক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে দেখার, তাকে লক্ষ করার ইচ্ছা উঠে এসেছিল। আর এই দেখতে গিয়েই তিনি টের পেয়ে যান: 'মানুষের মুখ অনেক সময়েই উলটো দিকে ঘোরানো; যে ভাবে সে আছে, সেভাবে সে নেই। সে যা বলে, ঠিক তা-ই সে বলে না।' ছোট্ট জন্মভূমির সেই কিশোরটি তখন যৌবনে পা রেখেছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও মন থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি সেই-নিজেকে। যে এই শহরের সমস্ত কলরোল বুকে নিয়েও একা। তাই তাঁকে অভিমান আর বেদনায় বলতে হলো: 'আরো একটু মাতাল করে

দাও / নইলে এই বিশ্বসংসার / সহজে ও যে সইতে পারবে না।' সইতে পারেননি, বলতেও তেমন করে পারেননি, বিনিময়ে নিজেকে ছিঁড়ে ফেলেছেন এক অজানা অপরাধের দায়ে : 'বলতে পারিনা। আর তাই / নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন।' ক্লান্তি নয়, জীবনের ভিতরে যে জীবন সেখানে এক অজানা কান্না ছুঁয়ে যায়। 'যেখানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ করপুটে' শব্দক'টি বার বার ছুঁয়ে যায় ঠিক প্রশ্ন রেখে। এ কার করপুট? এ কার রক্তচাপ? জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিরন্তর সংঘর্ষ আর অভিজ্ঞতায় বুঝে নিতে চান একে : 'এত যে নিশান ওড়ে, সব নিশানের কেন্দ্রে আমাদেরই রক্তচাপ দেখি'।

দেখার কথাতো ছিলো স্বপ্ন। স্মৃতি আর স্মরণের। পূজা আর পরিচয়ের। কারণ শঙ্খের সামনে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি দিয়েছিলেন দুহাত ভ'রে 'এক ব্যথাময় পৃথিবীর নিবিড়তা, তার ঐশ্বর্যের শেষ ছিল না কোনো।' তার দিব্য ঘনতা আর উদ্ভাস যখন তাঁকে প্রসাদিত করতে উঠে এলো, তখনই (সেই শঙ্খের) কবিতার কথাগুলি শুনি আমরা : 'নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল / মৃত্যুরই গান গা।' গোধূলির সূর্যের মতো স্নিগ্ধ একটি ছবির কাছে পৌঁছতে চেয়েছিলাম আমরা যারা, এক সময়ে দেখলাম বিপরীত এক প্রতিমার জেগে ওঠা। মৃত্যুর ছবি নিয়ে আসা। না, শুধু মৃত্যু নয়, জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে আমাদের এই যে যাপন, তার বিপন্নতা আর ছলনা, তার অস্তিত্বের সর্বগ্রাসী ক্ষয়ের দিকেই নির্দেশ করছে।

কবির কিশোরদিনের অনুভূত স্বপ্নের ভার জীবনের এমন কিছু মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, যার পরিণতিতে তাঁর ভালোবাসার পরিধি ব্যক্তিবিন্দু থেকে সরে গিয়ে এই প্রবহমান জীবনের সঙ্গে জড়িত হবার আকুলতায় আসক্ত হয়ে উঠেছিল। কেননা তিনিও হয়তো একথাই জেনেছিলেন, যেমন জেনেছিলেন জীবনানন্দ : 'এ যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো / চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের'। আবৃত হয়ে ছিল তাঁর প্রাত্যহিকের ছবি, চোখ পড়ে ছিল পথের পরে, কিন্তু অচেনা তার ছবি। আর তাই বেদনার এমন আক্ষরিক উচ্চারণ উঠে এলো 'যমুনাবতী' প্রতিমা রচনায় : 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে / যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে'। কবিতাটি কোন্ ইতিহাসকে ছুঁয়ে আছে, তা আমরা হয়তো সবাই জানি। আর জানি বলেই এই কবিতাটির গুরুত্ব আমাদের ছুঁয়ে যায় বেশি। যৌবনের শুরুতে যে সংঘর্ষ আর চাপের মুখে দাঁড়িয়েছিলেন কবি, ১৯৫১-র ঘটনাটি তাঁকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরলো। তাই ঘটনাটি এক স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে দাঁড়ায় শঙ্খের কবিতাভাবনায়। একে কী বলবো? রক্তিম সংকেত? সেই কিশোরী কন্যা, যার বিয়ের লগ্ন সমাগত—চল্লিশ বছরের পুরোনো ঘটনা, শুধু সাধারণ ঘটনা নয় 'ছোটো অথচ তাৎপর্যময় ঘটনা।'

তারপর, তাঁর কলমের মুখে অনিবার্য হয়ে ওঠে 'নিঃশব্দ কবিতা'। কেননা 'এখন ইচ্ছে হয় তার মধ্যে খুব আড়াল থাকতে, কাঁচা জীবন, সবুজ কথার ছায়ায়'। এবং তারই পরিণতিতে সেই অন্তরালের 'ভিতর থেকে গোপনে জন্ম নেবে নিঃশব্দ কবিতা'। সেই 'দলবাঁধা সব শব্দ' চলে যায়, চলে যাবে 'শেষহীন নীরবের দিকে'। আর এর বিপরীত মুখে, কলরোল-কবিতার দিকে শঙ্খের তীব্র আর তির্যক অভিমান : 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।'

এই হচ্ছে শঙ্খ। নিনাদ নয়, সংহতির ঘনতা আর 'ছোটো অবসর'। গভীর এবং গাঢ়, নিঃশব্দ সঞ্চার তাঁর উচ্চারণ। অক্লান্ত আরক্তিম এক আকাঙ্ক্ষা তাঁর রণে এবং রণনে। আর এরই জন্য তিনি অনলস ঘুরেছেন সক্ষম শব্দের সংগমে। আপন ঘরের ঠিকানায়। নির্জন থেকে নির্জনতর হয়ে উঠেছে কবির ভিতরের আমি। যে আমি অজস্র বিঘ্নের মধ্যেও অবিরত ঘুরে চলে মহাকালের রথে। তার অস্তিত্ব সত্যের প্রেক্ষিতে রচিত। আসলে 'অভিজ্ঞতার বিস্তার যত বাড়ে, ততই স্পষ্ট আর পরিণত হয়ে ওঠে কোনো ধারনা, কখনো এমন-কী পালটেও যায় কোনো-কোনো বোধ।' অর্থাৎ কবির জগতে এক-একটা বড়োরকমের উদ্দীপন আসে, যা পরিপার্শ্বের সমবায়ে জ্ব'লে ওঠে শুধু নয়, তাঁর ভিতরে যে-সুর লেলিহিত থাকে, মুক্তি পায় বন্ধনের গণ্ডি থেকে। তার ধাক্কা মাঝে মাঝে এতটাই সুদূর, যে সারা জীবনেই ছাপিয়ে যায় সেই মুক্তির বিন্যাস এবং পরিধি। 'নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে'। আর প্রাত্যহিক জীবনাচরণের সঙ্গে এই অভিমান এমনই এক ধরনের নিশ্চিতি পায়, যেখানে রঙকরা আঙ্গিক বা প্রকরণ বা কৌশল নয়, থাকে স্পষ্টি। থাকে উন্মোচন। আর তখনই 'দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে বিষণ্ন নাবিকের গান।' নিরুদ্দেশ দিশেহারা এক ভুবনের ক্ষয় এবং গ্লানির মধ্যেও খুঁড়ে আনতে চান জীবন আর স্বপ্ন কথা। যদিও 'চোখের পাতায় এসে হাত রাখে প্রথ বেলপাতা' (পাঁজর…৪) তবুও তিনি শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন : 'আমাদের হেরে যাওয়া লাজে? / ওই হাত নিয়ে তুমি কোথায় পালাবে তাবো যে-হাতে সূর্যের রেখা আছে?'।

আসলে সংযোগ সাধন চাই। তাই আর বাইরের দিকে, প্রচার প্রসারণের দিকে যাওয়া হলো না তার। তাঁর চারপাশে আবর্তিত জটিল গড়নে ফরমায়েস আর বাণিজ্য সামাজিক যোড়কে মুড়ে চালাবার প্রবণতা রয়েছে লক্ষ ক'রে তাঁকে 'সরে আসতে হলো যে-কোনো সভ্য থেকে দূরে।' নির্জনে আর নীরবতায়।

হয়তো দুএকটিই মাত্র কবিতা বাদ দিলে, 'যমুনাবতী' কবিতাটিই কবি শঙ্খের কবি জীবনের ভিতরের দিকে তাকাবার অথবা প্রবেশ করবার দরজা। তারপর নিরন্তর সংঘর্ষ আর সংঘাত। নিজেকে এবং অন্যদের দেখতে চাওয়া আর দেখতে পাওয়া, এই নিয়েই তৈরি হয় তাঁর লড়াই। বদল হয় অনেক অভিজ্ঞতার। ক্রমশ

স্পষ্ট হয় তাঁর উচ্চারণ। আসে গভীরতা, মনন এবং সংযম। শুভ এবং ঋজু। 'কাঁধে বাঁক, আর পায়ের নিচে প্রণামের মতো পড়ে আছে / সকাল বেলার আলো'—'ছবি'তে জয়কে খুঁজে নেবার ছবি। এ-কবিতা পূর্ণ মিলনের, নিজ অস্তিত্বের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের অভিঘাত অনুভবের কবিতা। এ ছবি স্তবের, নম্র বিশ্বাসের। এরই মাঝে 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'।

অনেক আঘাত, অনেক সংঘাতের দিনগুলির পুঞ্জিত মান-অভিমান সুখ দুঃখের ভাষা অনুসরণ করেছেন যে নীরব ভাষাকে ধরবার জন্য, তা কবির অলক্ষ্য জীবনবেদ : 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'। 'যমুনাবতী' আর 'ছবি'র-র মাঝখানের অগাধ এবং গম্ভীর জলরোল। নিঃশব্দ অন্তর্মুখী। 'ছবি'-র প্রস্তুতি। 'ছবি' কেন? শঙ্খের সমগ্র কাব্যজীবনের যে আকাশ, সেই 'আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে' 'ছবি' কবিতাটি। এক পরমের স্বপ্নে বিদ্ধ। সে পরম 'যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি'। আমিই সূর্যপ্রতিভা। আমিই জ্যোতিঃস্বরূপ। আমিই জয়।

আর 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'-কে চিনে নিতে হলে, কবির চলমান জীবনের চারদিকে এই যে সংঘাত, সংঘর্ষ আর শব্দের বেড়াজাল রচিত হয়েছিল, তাকে জেনে নেয়া ছিল একান্ত জরুরী। কেননা এরই প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'।

চৌষট্টি স্তবকের দীর্ঘ কবিতা। কিন্তু সত্যিই কি দীর্ঘ কবিতা? তা তো নয়। অল্প প্রকরণ? সে তো বাইরের চেহারা নিয়ে কবিতার সীমানা ছাড়ানো। তার চেয়ে বড়ো কোনো দায় নেই তার। যতটা সে বাইরে, তার চেয়ে অনেক গোপন সে ভিতরে ভিতরে। নির্জনে আর নীরবে। রচনার অবয়ব শেষ কথা নয়, শুধু বেজে ওঠ 'অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে'।

'পুরোনো বন্ধুর দল'-ই প্রধান হয়ে ওঠে কবি শঙ্খের কবিতায়। তাঁর এই অতীত স্মৃতি যে এই প্রথম এলো তা নয়, এই অনুরাগ লিপ্ত হয়ে আছে আরও অনেক কবিতায়। কিন্তু তাঁর অন্তরীণ দাহ বোধ করি এখানে তাঁকে যতো ঘিরে ধরেছে, এরকম খুব বেশি নেই। রঙে, স্মরণে, তাপে 'অতীতের জন্য এই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এসে মিলে যায় ভবিষ্যতের কোনো প্রতীক্ষা।' যদিও তিনি হয়তো বলেন 'আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে'। না, শঙ্খ এ-কথা বললেও, আমাদের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে তাঁর বিশ্বাস 'আমাদের হেরে যাওয়া সাজে'।' (ভাস্কর)। নাইলে 'ভাসন্ত শবের পাখি সূর্যের কুহরে উড়ে যায়' (পাঁজরে…৫) কী ক'রে? 'ভাসন্ত শব' মৃত্যুর প্রতিমা আর 'পাখি' গতি আর মুক্তি। আর 'সূর্য'? জীবনদেবতা। অমৃত স্বরূপ। আলো। নয় কি? আর এখানেই জেগে আছে 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'-তে চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা, সেই মহাসত্তার মিলন লাভ। কারণ কবিতাটির মধ্য দিয়ে আসলে আপন মগ্ন সত্তা তথা চৈতন্য

আর অস্তিত্বকেই দেখা আত্মপ্রতিসরণের মধ্য দিয়ে। না, কোনো ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পর্ক এখানে আমরা কল্পনা করব না। আসলে এটা অন্তরের উপাসনা পূর্ণ হবার বাসনায়। অবশ্য শঙ্খের ভাবনা অনুযায়ী আত্মিকতাই যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, তবে এ-নির্মাণও এক আধ্যাত্মিকতা। পংক্তির পর পংক্তির মধ্য দিয়ে এক অখণ্ড আয়তনে ঘনিয়ে ওঠা সত্যের জন্য, আত্মার সঙ্গে আত্মার সেতু নির্মাণের জন্য বিশ্রামবিহীন তপস্যা। প্রতিটি স্তবকের আয়তনে ধরতে চান পরবর্তী স্তবককে, সাধনার স্তর অতিক্রমণের মতোই। না, নিছক বা বিশেষ কোনো ঘটনাপ্রবাহ উঠে আসে না এখানে, সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে, কেঁপে ওঠে কবিতার সমগ্র শরীর জুড়ে অমোঘ এক পৃথিবী ও মানুষ সম্পর্ক, যাকে ঘিরে আছে, বিষণ্ণ শবের মিছিল সত্ত্বেও, এক আলোকবৃত্ত। 'ভেজা বিকেলের পাশে ডানা মুড়ে বসে আছে আলো।' (পাঁজর…৫৫) এই পর্বে পৌঁছতে দিনের পর দিন তাঁকে প্রত্যক্ষ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তৈরি করে নিতে হয়েছিল নিজেকে। অর্থাৎ এই কবিতার বিশ্বাস-বিন্দুতে প্রিয় প্রতিমাগুলি মানুষ, পৃথিবী পুরোনোদিন আর আমি। আর 'পিছনে অলীক হাতে তালি।'

অন্যদিকে 'যমুনাবতী'-র পরবর্তী এই তিরিশ বছর কবিতা যাঁদের হাতে গড়ে উঠতে পারত, বেশি করে সামাজিকতা আর সমকালীনতার দোহাই পেড়ে এক অনিয়ন্ত্রিত সৃষ্টির পরিচয় নিয়ে উঠে এলেন তাঁরা। না, কবিতার বর্ণময়তায় তাঁদের কোনো ঘাটতি ছিল এরকম বলি না আমি। শব্দের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, আঙ্গিক এবং প্রকরণের নিখুঁত বিন্যাস, কবিতার ছবিতে একটা নিবিড় আবহ যে অনায়াস ছিল, একথা স্বীকারে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু 'নতুন একটা সময় আসছে স্পষ্টই, আমরা এখনো এক দ্বিধাচ্ছিন্নতার মধ্যে টলমল করছি। আমাদের চেতনাকে সেই ভাবী সময়ের দিকে প্রস্তুত করে দেবার ঠিকঠিক ভাষা কি আমরা জানি? জানি না বলেই সত্যিকারের আধুনিকতাকে ওই সব কবির দল ছুঁতে পারেননি। আর 'এর জন্য যে পৌরুষ চাই তা বড়ো সুলভ নয় কোনোদিনই।' বড়ো সুলভ নয়, যা ছিলো না ওই কবিদলের মধ্যে, বিশ্বাসের ঘনতা আর মেধা আর মনীষার ভর।

তাই একদিকে বিপর্যস্ত অস্তিত্ব অন্যদিকে মনন ও মেধার অপসৃতি নিয়ে চলতে হয়েছিল কবি শঙ্খকে লড়াইয়ের অবসর নিয়ে। ফলে কবির মধ্যে যেমন নির্মম ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছিল, সেইমতো সূর্যসন্ধানের চরণপর্বে পৌঁছবার এক অনমনীয় প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছিল। সেই কারণেই তাঁকে এক ঔদাসীন্যের পরিবেশে শিখে যেতে হয়েছিল জীবনকে খুঁজে নিতে।

'অবসন্ন ফিরে দেখি ঘাসের উপরে শুয়ে আছে

পুরোনো বন্ধুর দল
শিশির মাখানো শান্ত প্রসারিত হাতগুলি বাঁকা।' (উৎসর্গ/পাঁজরে…)

একটা ছবি। বিপুল সংবর্ধতার নিয়েই এ-ছবির ইতিহাস। সঞ্চরমান জীবনের অনবদ্য প্রতিমা। মিশ্র এর গোপন উদ্ভাস। যেন চারিদিক ঢেকে গেছে সঘন কুয়াশায়। তারই মাঝে ঝ'রে পড়া অসংখ্য শিউলির ছবি। যেন শুয়ে আছে। ক্লান্ত কিন্তু উজ্জ্বল মুক্ত শরীর। এ তো প্রতিদিনের জীবন, অথচ প্রতিদিনের জীবন থেকে অনেকখানি দূরে। রক্তিম অথচ উদাসীন স্মৃতি ভারাক্রান্ত এ-ছবির রঙ কবির গোপন ক্ষরণজাত।

স্বপ্নের রণন যে কত আর্ততা নিয়ে তাড়িত করতে পারে, বুঝতে পারি শঙ্খের এই একটা কবিতাতেই। 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'-র 'উৎসর্গ' নামাঙ্কিত কবিতাটি। কাকে উৎসর্গ ? পুরোনো বন্ধুদের।

'ভোর এল ভয় নিয়ে' এরকম ভাবে শুরু কবিতাটির। কাকে ভয় ? স্বপ্নকে ভয় ? তাহলে 'স্থির অমাবস্যা' ? সে কি আত্মতাহীন অন্ধকার ? আর শিয়রে তার 'আমি দাঁড়িয়ে আছি' সপ্ততল প্রসারিত হয়ে 'দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে।' এই অন্ধকার সে কি আমারই (কবির) অন্তর্গত অমাবস্যা ? অর্থাৎ আত্মচেতনহীন আমারই মুখোমুখি আমি ? যে-আমি 'আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে।' অর্থাৎ যে-আমি সূর্যের শরীর ছুঁয়ে আছে। তাহলে কি এটাই মনে হয় না আমাদের যে ভুল-আমির সঙ্গে সত্য-আমির দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ নিজেরই সঙ্গে নিজের মুখোমুখি হওয়া আর হয়ে ওঠার পরিণামে পৌছনো ? অর্থাৎ আত্মর সঙ্গে পরম আত্মর বিরোধে 'আমার সন্ততি স্বপ্নে থাকে' এরকম সদর্থক গৌরবে পৌছনোই এখানে শঙ্খের অভিপ্রায় অভিমান। এরই নাম তো আত্মনির্মাণ ? এই আত্মনির্মাণ আর আত্ম আবরণ মোচনের মথিত বিস্তারই 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'। 'উৎসর্গ' তাই নান্দীপাঠ। তান বিস্তারের সূচক। না কি নিভৃত অন্তঃপুরে প্রবেশের দরজা ? যে ভাবেই ভাবি না কেন, 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'-র প্রস্তুতি-পর্ব এটাই—আর তাই এর মস্ত মর্যাদা গোটা ছবিটাকে বুঝে নেবার জন্য !

তাহলে এ কবিতা 'বাঁচা দিয়ে সমূহ প্রবাহ পাব ব'লে / এই দুই অন্ধ চোখ ভিজিয়ে নিয়েছি অন্ধকারে'-র নীরব আর নির্জন আয়োজন, যেখানে বিষণ্ণ বিলাপের সঙ্গে শব্দ আর সুন্দরের গূঢ় আবেদন এক সুস্থিতি উপার্জনের প্রণত প্রয়াস। এর কি কোনো গূঢ় ভূমিকা ছিল ? সত্যের কঠিন ভূমিকা ? ছিল : 'দীর্ঘকাল জুড়ে স্মৃতির মধ্যে বয়ে বেড়ানো বিরাট একটা সময়ের ক্ষত', যা কালানুক্রমে সাজানো নেই ঠিক, নেই কোনো তথ্যের সম্প্রচার। শুধু যে-ক্ষত

ছিল ভিতরে ভিতরে তারই সম্প্রসার ঘটে গেল কবিতার ভাষাতে। এ-ভাবেই কবির অন্তর বোধকরি সেজেছিল মানবের পূজার নৈবেদ্য সাজাতে। আর সেইজন্যই তিনি 'আরাম থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে সহ্য করতে চাইছেন দুঃখ'। 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ কঠিন সত্যের মুখোমুখি হবার জন্য যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাকেই খুঁজেছেন শঙ্খ, আর এ-উক্তি তারই প্রেক্ষায়। 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'-র কবির মনেও কি এমন কোনো বেদনা বেজেছিল? নইলে সেই দিব্যসুরে মথিত হয়ে উঠবে কেন তাঁর পংক্তি : উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। কেন? আলস্যমথিত অন্ধকারে জেগে ওঠার জন্য?

আর এই অবসানে পৌঁছতে গেলে 'এইসব যাওয়া আসা কিছু কষ্ট রেখে যায়'। আর 'তার মাঝখান থেকে চুরি করে তুলে নিতে যাই / প্রতিরোমাঞ্চের কাছে আমাদের যৌথ দিনগুলি।' এইটি মনে রাখলে কবির মনোরূপের প্রতিটি মুহূর্তকে চিনতে পারি, কী গভীর দুঃখ বিরহ আর মৃত্যু মিলে গেছে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনাচরণের সঙ্গে আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়া এক উন্মোচনের মোহনায়, যেন অনেকটাই বলতে চান এরকম ভাবে 'কঠিন বাধা লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি।' অর্থাৎ কবি ভাঙতে চাইবেন সেই ভয়ের দিনগুলিকে, যেখানে রয়ে গেছে ত্রাণের আশ্বাস, ক্রমশ পরিণত-র জায়গায় এসে : চিতা যখন জ্বলছে / তোমরা চাও আমি আলোর কথা বলি / বলব আলোর কথা। (হৃৎকমল)

যখন তিনি লেখেন এই কথাগুলি তখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তাঁর 'সুন্দর' নামের কবিতাটির পংক্তি : 'তুমি কি সুন্দর নও? বেঁচে আছ কেন পৃথিবীতে?'

প্রশ্ন। শুধু প্রশ্ন। এই এক কবি শঙ্খের আলাদা চরিত্র। তাঁর সমগ্র রচনা জুড়ে, কি কবিতা কি গদ্য, একের পর এক প্রশ্ন চিহ্ন। প্রশ্নে প্রশ্নে একাকার। যাঁরা তাঁকে জানেন, এই প্রশ্নগুলির সামনে দাঁড়ালে দেখতে পাবেন, এই প্রশ্নগুলির মধ্যেই রয়েছে কবির ভিতরের চেহারা এবং চরিত্র। এই ভাবেই তিনি খুঁজে আনতে চান তাঁর 'মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে' তাকে। এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে 'যতদূর ফিরে চাই আদি থেকে উপান্ত অবধি / কথা নয়, বাঁচা দিয়ে সমূহ প্রবাহ ব'লে'। (পাঁজরে…১৩)

অনেকদিন আগে 'এই নদী, একা' কবিতাটিতে তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন 'আমি কি অনেক দূরে সরে গেছি?'। অনেক দূরে সঞ্চারিত হয়ে চলে আসে এই অসহায়তা 'বলতে পারি না। আর তাই / নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন' (ধ্বংস করো ধ্বজা)। আমরা জানি এ কোনো আবেগসর্বস্বতা নয়, এই বোধই তাঁকে অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে যায় এক মুহূর্ত থেকে আরেক মুহূর্তে। একেবারে মর্মমূল পর্যন্ত। কেননা এও এক ভালোবাসারই রূপ। তিনি বেঁচে

থাকতে চান। 'একটাই তত্ত্ব আছে কবির কাছে আর তাঁর কবিতার কাছে, সে হলো তাঁর বেঁচে থাকার তত্ত্ব। তিনি বেঁচে আছেন, সর্বতোভাবে বেঁচে থাকতে চান তিনি, জীবনকে ভালোবাসেন। যা কিছু সেই জীবনের পথে, জীবনের সুস্থতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেই সব কিছুকে ভাঙতে চান তিনি।' (বিশেষণ হীন কবিতা / কবিতালেখা কবিতাপড়া)

আর তাই 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'-র স্তবকগুলি যখন এক এক ক'রে অতিক্রম করি, তখন মনে হয় 'এইসব লেখা তার মানে খুঁজে পাবে বলে আসে' (পাঁজরে···১১) কবির কাছে। মানে? কিসের মানে? 'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা / জানি হে জানি তাও হয়নি হারা'।

'বৃন্ত ঝাঁকা হয়ে গেছে বৃন্তের ভিতরে জল ঝাঁকা
জলের ভিতরে আমি আমার উপরে ওঠে জল
ছোটো ছোটো ঘাত লেগে বৃন্ত ভেঙে বৃন্ত বেড়ে যায়
আচম্বিতে জলস্রোতে সমস্ত বৃন্তের অবসান।' (পাঁজরে···৭)

এ অনন্ত প্রতিমা-মাধ্যম আত্মমোচনের। কবির অন্তরে যে কবি, সে এক জীবনসংগীতের সুরে সুরে মিলতে চায়। ভিতর মুক্তি পায় পূর্ণ থেকে পূর্ণের লক্ষ্যে। কেননা 'ফিরে যাওয়া যাওয়া নয়, সেই আরো কাছাকাছি আসা' (পাঁজরে···৪৪)। যে ফিরে গিয়েছে, এটাই হয়তো প্রত্যক্ষ, 'তোমার শরীর নেই, তোমার আত্মাও আজ ঢেকে গেছে ঘাসে'; কিন্তু 'যতটুকু দেখে গেলে ততটুকু নয়, আরো আছে' কারণ রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন 'তোমার পথে চলা যখন / ঘুচে গেল, দেখি তখন / আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চলো সাথে'।

'মনে পড়ে আমাদের কলকল্লোলিত সন্ধ্যাগুলি / ··· করোটির মধ্যে তার শব্দ ওঠে আজও দিনরাত' (পাঁজরে ··৪৫) যেগুলি অনেক বছর আগে 'নামহীন লুপ্ত হয়ে গেছে' এক বাস্তব পরিণাম। তার মানে কি এই যে বসুপৃথিবী, যেখানে 'জেগে ওঠে শুকনো এক করোটি মাত্র। সেই করোটি যেন শুনতে পায়: বাইরের জগতে প্রচণ্ড এক শব্দতরঙ্গ উঠছে নামছে, বধির হয়ে আসে আমাদের সমস্ত চেতনা···বেজে উঠছে একটা টাকা পয়সা লেনদেনের ঝন্ ঝন্' (শব্দের প্রতিশোধ/ শব্দ আর সত্য), যে বিচ্ছিন্নতার কথাই বলে নিয়ত, সে-ই শেষ কথা নয়, শেষ শব্দ নয়? করোটির মধ্যেও সেই 'অশরীরী ছন্দের কালো ঝাউ' শব্দ তোলে, প্রশ্ন তোলে 'প্রগাঢ় অন্যায় কোনো ঘটে গেছে মনে হয় যেন / কিছু কি দেবার কথা কিছু কি করার কথা ছিল?'

এই আত্মক্ষরণ, এই তো মানবিক। এই কবি বুঝেছিলেন: 'এসব চাপের বাইরে হঠাৎ হঠাৎ চোখের কোণে যে মেঘ খেলে যায় একটু, সেই মেঘটাই মানবিক। তাকে কেন মিথ্যে বলে ভাবব? একদিনের সেই মেঘই তো আমাদের

অনেকদিনের সম্বল হতে পারে' (জার্নাল)। এই মেঘই তো আমাদের চেতনায় শিশির হয়ে ঝ'রে পড়তে পারে। আর তখনই গড়ে উঠতে থাকে দুর্লভতম কবিতা। 'কবিতার এক লাইন যেমন অনিবার্যভাবে টেনে আনে তার প্রতিমূখী আরেক লাইনকে, দুটিতে মিলে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে যেমন কোনো কথা, ঠিক তেমনই এই কবির রক্তিম রণনক্লান্ত অতীত আর ক্লিষ্ট বর্তমান ধরে তৈরি হয়ে উঠেছে এই কবিতার লাইনের পর লাইন, স্তবকের পর স্তবক। বিরামহীন, আত্মবিস্তার। কারণ 'কিছু কি দেবার কথা কিছু কি করার কথা ছিল?'। ঠিক দ্বিতীয় সত্তার পাশাপাশি অবিরাম চলা অবসান আর সমর্পণের জন্য।

এই একটি কবিতা 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' লিখবার জন্য কবি শঙ্খকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে দীর্ঘপথ। দীর্ঘ বছর। মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে কত জীবনের, কত মানুষের, কত মৃত্যুর, কত হিম আর্তনাদের, কত মুখ আর মুখোশের। নইলে জীবনের মূল প্রশ্নগুলিই তো গড়িয়ে যাবে অবহেলায়। রিলকে-র কথা বলতে গিয়ে শঙ্খই বললেন : একটি কবিতা লিখবার জন্য দেখতে হয় কত শহর, কত মানুষ, কত বস্তু,···কত পাখির উড়াল···ছোটো ছোটো ফুলের কত ভঙ্গি। ··· বসতে হয় তাকে মুমূর্ষুর পাশে, জানলা খোলা ঘরে কোনো মৃতের পাশে।' বসতে হয় তারও পাশে যে 'তাকে অন্ধ বানায়।'

এই অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্বই তাঁর প্রতিটি কবিতায় নেমে আসে। তাই তো তিনি বলতে পারেন 'খুব অল্প ভালো লাগে এইসব বহু বিচ্ছুরণ / থান থান হতে থাকা রঙ করা সামাজিকতায়।' আর পরক্ষণেই প্রচণ্ড ধিক্কারে বলে ওঠেন বরং, বলা ভালো, চিৎকার করেন 'নিঃসাড় ধুলায় দাও উড়িয়ে সে লেখার অক্ষর / যে লেখায় জ্বর নেই, লাভা নেই, অভিশাপও নেই।' এও আর এক আমির পরিচয়। এরই কয়েক বছর পর ঘৃণার সংঘাতে জ্বলে ওঠা এক গাঢ় ক্ষোভ, চিৎকার নয়, শান্ত অথচ অমোঘ উচ্চারণ জেগে ওঠে এই কবির কণ্ঠে আরোয়াল হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে :

> 'উশকে উঠুক উশকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক
> সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে যাক'

আপাত নম্র অথচ কঠোর এই কবি জীবনের আরম্ভকে সামনে রেখে অবিচল এক ইতিহাসের নান্দনিক প্রবক্তা হয়ে রইলেন। এখানে মনে রাখা জরুরি তিনি আবার এলেন সীমায়তনে।

তবু একদিকে 'যমুনাবতী' অন্যদিকে 'অন্ধবিলাপ', মাঝে 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ', এক অখণ্ড আয়তনের কবিতায় কবি শঙ্খ, যাঁর যাত্রা শুরু পদ্মার ওপার থেকে। সত্য আর মেকি প্রজন্মের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আলোর নিশানা তাঁর আজও অটুট। তাঁর যে 'কাঁধে বাঁক'। বুকের গভীরে প্রবাহিত জীবনের ধ্বনি। পাঁজরে

দাঁড়ের শব্দ। একে বুঝতে হলে কবিজীবনের সমগ্র আয়তনটিই বুঝে নিতে হবে আমাদের।

তাই শঙ্খের উক্তি দিয়েই দিশাময় কবিতাটির শীর্ষ মূল্যায়নে আসি : 'এ হলো সেই বোধের কবিতা, সেই বিশ্বাস আর ভালোবাসার, সেই মজ্জার আর সামর্থ্যের, তিতিক্ষার আর প্রস্তুতির।'

এই বোধহয় শেষ কথা।

দুর্গা দত্ত

নির্বাক মুখ, সবাক চোখ

১

"ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ শর প্রয়োগ দেখিয়া আমি অনেক সময় ব্যথা পাইয়াছি বটে, কিন্তু একবার সাধনায় প্রকাশিত 'জাবালি সত্যকাম সংবাদ' পড়িয়া সে দুঃখ গিয়াছিল......" রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বোধহয় রামেন্দ্রসুন্দরের অভিষ্ট ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠ প্রতিভাস, আর সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ'-এ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'দ্বিজোত্তম' 'সত্যকুলজাত' সত্যকামের স্বরূপ।

অবশ্য 'কথা ও কাহিনী'তে বা এই সময় পর্বে রবীন্দ্রনাথের 'ভারত সন্ধান' কীভাবে পুরাণ-অনুষঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সে-কথা সবারই জানা। এমনকী মহাভারত-কেন্দ্রিক নাট্যকবিতাগুলিতে যেভাবে মানবধর্মের সঞ্চার ঘটবে তার থেকেও একটু ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ'-এর প্রকৃতি। সত্যময় প্রজ্ঞার যে প্রতিফলন দেখা যায় গুরু গৌতমের মধ্যে, তারই আলোতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সত্যকামের অকপট উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ'-এ 'দ্বিজোত্তম' 'সত্যকুলজাত' সত্যকামের প্রতিষ্ঠা ঘটছে সত্যদ্রষ্টা গুরুর নিরিখে। পরিপ্রেক্ষিত-ই এখানে গুরুত্বপূর্ণ, সত্যকামের পরিচয়হীনতার বেদনা ততটা তীব্র হয়ে নেই।

রবীন্দ্রনাথের সত্যকাম প্রসঙ্গের সত্তর বছরেরও পরে শঙ্খ ঘোষের কাছে ফিরে এল ছান্দোগ্য উপনিষদের এই কাহিনী। 'কবিতার মুহূর্ত'-তে জানিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ কীভাবে ভারতীয়তার ধারণায় প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে গৃহাভিমুখী রাতের কলকাতার রাস্তায় বুনে তুলেছিলেন এই কবিতা। তাঁর মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ'-এর কথা, ছান্দোগ্য উপনিষদের 'জাবাল সত্যকামে'র কথা। কিন্তু কতটাই পৃথক হয়ে গেল তাঁর সত্যকাম রবীন্দ্রনাথের সত্যকামের থেকে। শঙ্খ ঘোষের সত্যকামের কাছে আত্মবেদনাই ঋজুরেখ হয়ে উঠেছে। উঠে এসেছে কিছু অমোঘ প্রশ্ন। যে জিজ্ঞাসা বার বার ঘুরে ঘুরে আবর্তিত হবে সেখানে গৌণ হয়ে যান গুরু, কেন্দ্রে চলে আসে প্রশ্নমুখর একজন সচেতন মানুষ আর তার হৃদয়, যে আত্মপরিচয়

সন্ধানী। রবীন্দ্রনাথের সত্যকামের থেকে অনেক দূরবর্তী এই সত্যকাম সন্ধান করে তার দেশ-পরিচয়, তার সামাজিক ব্যক্তি-পরিচয় আর তার গোত্র-পরিচয়ের নিশানা।

অনেক না-বলা কথা অনেক দিনের অনেক জিজ্ঞাসা কীভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল এই কবিতায় তা-ও জানিয়েছেন কবি সেই মুহূর্তটির সূচনার অভিজ্ঞতায়। আমরাও এই কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, শুধুই ভারতীয়তা সন্ধানের বেদনা নয়, এই কবিতার মধ্যে কীভাবে জেগে ওঠে দেশ-বিভাগোত্তর মানুষের খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়ার ছবি, গঙ্গা-পদ্মার এপার-ওপারের টানাপোড়েনে জমতে থাকা দেশকে বোঝবার বেদনা। মাথা তোলে আত্মপরিচয়ের সমস্যা।

রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ'-এর 'জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে' বাক্যবন্ধকে সরাসরি আত্মস্থ করে নিয়ে পরিচয়হীনতার বেদনায় ঘন হয়ে ওঠে শঙ্খ ঘোষের সত্যকাম। 'কী আমার পরিচয় মা ?'—প্রশ্নবাকাটির মুহুর্মুহু সংঘর্ষে জলে উঠতে থাকে দেশ-কাল গ্রাম-শহর স্মৃতি ও সত্তায় মোড়া জীবন ও জগৎ। বোঝা যায় তাঁর সত্যকাম ধারণ করে নিচ্ছে অনেক দিনের অনেক বিন্দু বিন্দু বেদনার অঝোর ধারা। কবির সময়ের ভাষ্য হয়ে উঠছে এই কবিতাটি। অনেক জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে একজন ভারতীয়ের বেদনা।

কিন্তু এরই ভেতর থেকে একেবারে লৌকিক প্রত্যক্ষতায় যেন উঠে আসতে চায় গ্রাম-শহর সম্পর্কেরও কোনো ইঙ্গিত। যে কোনো সুন্দর কবিতাতে যেমন অনেকরকম আয়তনের অনেক বৈচিত্র্যময় স্তরের আভাস পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বেদনার উৎসের আভাস থাকে সেখানে, 'জাবাল সত্যকাম'-এর মধ্যেও সেরকম স্পর্শ করা যায় দেশ সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের বিভিন্ন উচ্চাবচ সংঘর্ষে জলতে থাকা একজন আধুনিকের সংকটকে। ঋজু টান টান এই দীর্ঘ কবিতার শরীরে কখনো কখনো কোনো পঙ্‌ক্তিতে বা তার সমবায়ে ফুটে ওঠে গোপনে গোপনে বহমান এক আর্ত অভিজ্ঞতার সজল রেখা। ধরা পড়ে গ্রাম-জীবন থেকে সদ্য-উঠে-আসা এক অবাক কিশোরের নগরের দিকে এগোনোর ছবি। গ্রাম-শহরের সম্পর্কের বিরুদ্ধতার মধ্যে যে প্রত্যাখ্যান ও আগ্রাসনের ইতিহাস থাকে, গ্রহণ-বর্জনের ঠোক্কর থাকে, তার যন্ত্রণা যেন ভাষারূপ লাভ করে এখানে। "পরিচয় ? কেন পরিচয় চাও প্রভু ? / ওই ওরা বসে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই সিদ্ধ পরিচয় ?" কিম্বা "ওরা হাসাহাসি করে, মুখে থুতু দেয়, ঢিল ছুঁড়ে মারে, আমি / পরিচয়হীন / জলস্থল সর্বজল আমার বিলাপে কাঁপে পরিচয়-হীন"—পঙ্‌ক্তিগুলি ছান্দোগ্য উপনিষদ বা রবীন্দ্রনাথের সত্যকামের উচ্চারণ থেকে যেমন অনেক দূরে সরে যায়, তেমনি শঙ্খ ঘোষের সত্যকামের বিচিত্র অথচ সংহত বেদনার মধ্যেও যেন একটি প্রাকৃত সত্যকে ধারণ করতে চায়। রবীন্দ্র-

শঙ্খের সত্যকামের অকপট সত্যভাষণের পরিপ্রেক্ষিত অনেক প্যাসিভ, অনেক দূরবর্তী বেদনার বিবৃতি যেন—

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো—সবে বিস্ময় বিকল,
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।

কিন্তু শঙ্খ ঘোষের সত্যকাম সরাসরি ও প্রত্যক্ষ, আত্ম-অভিঘাতে জর্জর তার অভিজ্ঞতা। উত্তমপুরুষের প্রত্যক্ষবাচনে রক্তমাংসের শরীরে যেন জেগে উঠতে চায়। কবিতাটি রচনার সূচনামুহূর্তে শেয়ালদা-য় গৃহমুখী মানুষের চলচ্ছবি দেখে কবির মনে হয়েছিল, "ওই পার্ক স্ট্রিট আর এই শেয়ালদা, এ কি একই দেশের ?" পার্ক স্ট্রিট আর শেয়ালদা যেন প্রতীকী চেতনামাত্র। অভিজাত-অনভিজাত, গ্রামীণ আর নাগরিককে একই মুঠোয় ধরতে চায় এই অভিজ্ঞতা। তাই একক একটি পঙ্‌ক্তিতে 'পরিচয়হীন' কথাটি যেন চারদিককে ছিন্ন করে দিয়ে জ্বলে ওঠে পরিচয়-হীনতার স্বভাবে। গ্রামের গন্ধ মুছে যায়নি যার শরীর থেকে সেই গ্রামীণ তরুণের নিহিত আর্তনাদ আর সত্যকামের হাহাকার একই সুরে আছড়ে পড়ে পঙ্‌ক্তি-গুলির মধ্যে। অবশ্য এরকম কোনো তরল সিদ্ধান্ত এখানে নেওয়া হচ্ছে না যে, গ্রামজীবন আর নগরজীবনের কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাত ও সংযোজনই এ কবিতার কেন্দ্রে প্রাধান্য পেয়েছে। যদিও বিদ্যুচ্চমকের মতো কিছু কিছু উচ্চারণ যেন এই সংঘর্ষের দিকটিকেই চকিতে চিহ্নিত করে যায়। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় মাঝে মাঝেই এই সমস্যা উঠে আসবে তাঁর কবিতার বহুতল আয়তনের মাঝখানে। কখনো কখনো দেখা যাবে এই বেদনার সরাসরি প্রতিফলনও।

২

কিন্তু অনেকটাই আলাদা এই বেদনা স্মৃতিভারাক্রান্ত কোনো রোম্যান্টিক কবির নস্টালজিক ঘনঘটার চেয়ে। হতেই পারে এরকম যে শৈশব-কৈশোরের অভিজ্ঞতা আর গ্রামজীবনের যাপিত সময় একাকার হয়ে আছে; হতে পারে এরকম যে শহর জীবনের পাথুরে সান্নিধ্যে ফিরে ফিরে আসছে সেই শ্যামল সময়; আর একজন বিধুর কবির কাছে তো তা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। পঞ্চাশের কবিদের কবিতাতে এই স্বভাবের প্রবল দাপট লক্ষও করা যায়। এমনকি শঙ্খ ঘোষেরও প্রথম পর্যায়ের কবিতাতে তার যথেষ্ট আভাস আছে। অনেক পরের কাব্যগ্রন্থ

'নিহিত পাতালছায়া'-র কিছু কিছু কবিতাতেও আছে স্মৃতিভারাক্রান্ত সময়ের মন্থর মুখ। যেমন 'অলস জল' কবিতাতে—

'কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম ? মাঝি আমার বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই
শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই
স্মৃতি আমার শহর......'

কিংবা কাব্যগ্রন্থে বিন্যস্ত ঠিক এর পরের কবিতা 'ফুলবাজার'ও চরিত্রধর্মে এরই কাছাকাছি। কবিতাটি শুরু হচ্ছে মন্ময় স্মৃতিটানের মধ্যে—

'পদ্ম তোর মনে পড়ে খাল যমুনার এপার-ওপার
রহস্যনীল গাছের বিষাদ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ?
স্পষ্ট নৌকো ছই ছিল না ভাঙাবৈঠা গ্রাম-হারানো
বজ্রমুঠোয় ডাগর সাহস ফলফুলন্ত নির্জনতা
আড়াল বাঁকে কিশোরী চাল ছিটকে সরে মুখের জ্যোতি
আমরা ভেবেছিলাম এরই নাম বুঝি বা জন্মজীবন...

আর এরই বৈপরীত্যে প্রশ্ন তোলেন কবি—

'কিন্তু এখন তোর মুখে কি মৃণালবিহীন কাগজ আভা ?'

এবং কবিতাটির শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে পৌঁছে 'জন্মজীবন' থেকে অনেক দূরে সরে যায় অভিজ্ঞতা। শহরের কংক্রীট এ্যাসফল্টের ক্যাম্বিশে আকাশের পাণ্ডুর রঙ এসে লাগে অন্তিম পঙ্‌ক্তিগুলিতে। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া যেন নিটোল কোনো সম্ভাবনা। প্রশ্নভঙ্গিমায় উচ্চারণ করেন কবি—

'তবু কি তোর ইচ্ছে করে আলগা খোলা শ্যামবাজারে
সবার হাতে ঘুরতে-ঘুরতে বিন্দু-বিন্দু জীবনযাপন ?'

কোনো জোরালো আঘাত বা প্রত্যাখ্যান নয়, যেন অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, মানিয়ে চলা নগর জীবনের ভেতরেও মোচড় দিয়ে ওঠে ফেলে আসা সময়ের সহজ অথচ রহস্যময় জীবনের স্পন্দন।

৩

১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে তাঁর কবিতায় বা গদ্যে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে যাপন সংক্রান্ত ভাবনা, সামাজিক মানুষের খণ্ডবৈচিত্র্যের দিনের তির্যক ছবি, দেশ-ভাবনার এক জাগ্রত চালচিত্র। আর এরই মাঝে মাঝে চকিতে উঠে আসে গ্রাম-শহরের সম্পর্কের জটিল আন্তর্বয়ন। 'নিহিত পাতালছায়া'-র প্রকাশ-

কাল ১৯৬৭। 'জাবাল সত্যকাম' কবিতাটি লিখছেন ১৯৬৬-র শেষের দিকে কোনো একসময়ে। এই সময়পর্বেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রক্ষেপণমূলক গদ্যরচনা 'সকালবেলার আলো', লিখছেন ১৮৬৪ সালে, প্রথম প্রকাশ ঘটছে ১৯৭২ সালে। আর এই বছরেই কবি শঙ্খ ঘোষের ধারাবাহিক উন্মোচনের অন্তর্মুখী ইতিহাস ধরা পড়ছে 'পা তোলা পা ফেলা' প্রবন্ধটিতে। এমনকী 'সকালবেলার আলো'-র পরিপূরক হিশেবে যে 'সুপুরিবনের সারি' গ্রন্থটির প্রকাশ ঘটবে তারও অনেক পরে, তারও বেদনাতুর আভাস থেকে যায় এই সময়েরই কোনো কোনো কবিতায়। 'নিহিত পাতালছায়া'-র 'আলাপচারি' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিতে উঠে আসে—'ঘুরে চলে যায়—আরো চলে যায় সুপুরিবনের সারি।' —আর এ কাব্যেরই 'ছুটি' কবিতায় লিখেছিলেন তিনি—

'সব তো ঠিক করাই আছে। এখন কেবল বিদায় নেওয়া
সবার দিকে চোখ,
যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম।

কী নাম।
আমার কোনো নাম তো নেই ? নৌকো বাঁধা আছে দু'টি,
দূরে সবাই জাল ফেলছে সমুদ্রে—
ছুটি, প্রভু, ছুটি !'

আপাতভাবে মনে হতে পারে এই বিদায়ের ইঙ্গিত যেন কোনো মৃত্যু-ভাবনাকেই দ্যোতিত করে, অনামা পরিচয়হীন কোনো একজনের দূরগামী কোনো অনন্ত ছুটির জগৎকেই দেখিয়ে দেয়। কিন্তু বোঝা যায় এই ছুটির মধ্যে জমে আছে মাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, দেশ-এর মধ্যে প্রোথিত কোনো মানুষের শেকড়ের যন্ত্রণা। ঋত্বিক ঘটকের অনেক ছবির মতোই রক্তমাংস হয়ে, হৃৎপিণ্ড হয়ে গ্রামময় বাংলাদেশ এই কবিতাতে জেগে থাকে। আর এর অনেক পরে 'সুপুরিবনের সারি'তে দেশভাগের পর নীলুর শেষবারের মতো নিজের দেশ ছেড়ে চলে আসার দীর্ঘশ্বাসে লাগে কবিতার টান। এবং সেই দীর্ঘশ্বাস প্রণামের মতো নিচু হয়ে ছুঁয়ে থাকে সমস্ত বাংলাদেশকে। 'ছুটি' কবিতাটি যেন পূর্বজ হয়ে ধারণ করে থাকে 'সুপুরিবনের সারি'-র অন্তিমপর্বের বিষণ্ণতাকে।

'শেষ ? হ্যাঁ শেষ। প্রণাম তোমায় শেষ। প্রণাম তোমায়, এই হাদশীর বিকেল। প্রণাম, ওই খালের মুখে নদীর জলের ঢেউ। প্রণাম তোমায় তুলসীতলা, মঠ। প্রণাম ফুলমামি। প্রণাম, তবে প্রণাম তোমায় সুপুরিবনের সারি।'

৪

সত্যকামকে নিজের শেকড় বা শেকড়হীনতায় চিহ্নিত করে নিয়ে অন্তর্মুখী যাতনাকে কবি প্রকাশ করছেন যে সময়ে, তারই কাছাকাছি সময়ে দেখা দিচ্ছে অনুরূপ অভিজ্ঞতা। গ্রাম আর শহরের সম্পর্কের বিন্যাস, ক্ষোভের সঙ্গে কিছুটা বিদ্রূপের সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে লক্ষ করা যায়। চতুর সবজান্তা সমালোচক যে নগরসমাজ তার অস্থির চেহারাটি সর্বত্র যেমন, তেমনি করেই লক্ষ করেছিলেন এক রোববার বাসের মধ্যে। আর এই সবজান্তা সমাজের প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যানের নির্মম ভঙ্গি লক্ষ করেছিলেন বাস-ড্রাইভারের নির্বাক মুখে, তার সবাক চোখে। 'কলকাতা' কবিতাটির সূচনামুহূর্তে কবির মনে জেগে উঠেছিল, 'কোথায় দেশ তার? কলকাতায় নাকি বাইরের কোনো গ্রামে?' এমন-কী এরই অনুষঙ্গে কবিরও মনে হয়েছিল তাঁর পূববাংলার ছোট্ট শহরের কথা, বড়ো এই শহরের মধ্যে অনেক-কিছুই যে তাঁর অচেনা ছিল, তার কথা।

রচনা মুহূর্তের অভিজ্ঞতা, গ্রামীণ মানুষের বেবাক স্তব্ধতা গ্রাম-শহরের সংঘর্ষকে নিয়ে দানা বাঁধল কবিতায় একেবারে আঞ্চলিক উপভাষার ধরণে। গ্রাম থেকে জীবিকার সন্ধানে আসা এক গ্রামীণ তরুণের অভিজ্ঞতার দর্পণের সঙ্গে মিলে গেল শঙ্খ ঘোষের নিজস্ব শ্লেষের ধরণ, আয়রণির নির্মম রূপ। প্রাত্যহিক গ্রামীণ মানুষের সম্বোধনের সুতোয় ধরা পড়ল সারহীন সমাজের ফাঁপা দিকটি; ভুল নগরবৃত্তকে প্রত্যাখ্যান করবার ঝোঁক।

> বাপজান হে
> কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সকলেই সব জানে
> আমিই কিছু জানি না
>
> আমারে কেউ পুছত না
> কইলকাত্তার পথে ঘাটে অন্তসবাই দুষ্ট বটে
> নিজে তো কেউ দুষ্ট না
>
> কইলকাত্তার লাশে
> যার দিকে চাই তারই মুখে আড্ডিকালের মজাপুকুর
> শ্যাওলা পচা ভাসে
>
> অ সোনাবৌ আমিনা
> আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমি তো আর
> কইলকাত্তায় যামু না

এরই কাছাকাছি সময়ে লেখা 'পা তোলা পা ফেলা' নামের প্রবন্ধটি। তাঁর কবিতা-রচনার সূচনাপর্বের আন্তর-ইতিহাস ধরা আছে এই তাৎপর্যময় সংক্ষিপ্ত

রচনাটিতে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে কবি এগোচ্ছেন তাঁর কবিতার পথের দিকে। এই গদ্যেও দেখা দিল তাঁর তরুণ বয়সের ভিন্ন ভিন্ন সংঘাতমুখর মুহূর্ত। গ্রাম ও শহরের টানাপোড়েন ও বিন্যাস এখানেও উঠে এল সরাসরি।

(১) ...অস্পষ্ট ভাবনার ভয়ে ছোটোবেলায় যে কুঁকড়ে যেতাম লেপের মধ্যে, তার চেয়ে কত ভিন্ন ধরণে গুটিয়ে গেছি সেদিন কলকাতার এই বিশাল বিরূপ সমাবেশে, তার দাম্ভিক চালচলনে...

(২) ...সেই রহস্যময় পড়ন্ত দুপুরের চেয়ে কত ভিন্ন ধরণের রহস্য নিয়ে পৌঁছল কলকাতার জটিল উপদ্রবময় দিনগুলি—গরিব, অসংবৃত, যুধ্যমান...

(৩) ...বহিরাগতের ভীরুতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল অনেক...

(৪) ...আর কলকাতা, কলকাতা খুলে দিল সাম্প্রতিকের দরজা। একদিনে নয়, দিনে দিনে। সেখানেও ছিল বহিরাগতের ভীরুতা, জানা ছিল না কোন দিকে আছে পথ। স্টুডেন্টস্ হলের মুখ লুকোনো ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছিল যে বন্ধু, সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল আমার লেখার খবর, অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের পিছন বেঞ্চ থেকে সামনের দিকে টান দিয়েছিল যারা, তারা কবি ছিল না কেউ, ছিল কবিতার প্রেমিক

—এই ছোট্ট প্রবন্ধটিতে এরকম অনেক ইঙ্গিত আছে যেখান থেকে ধরা পড়ে শঙ্খ ঘোষ কীভাবে তাঁর পুববাংলার মফঃস্বলের জীবনাভিজ্ঞতাকে আস্তে আস্তে সইয়ে নিচ্ছেন নগর কোলকাতার কঠিন আঘাতের মুখে। কিন্তু এই সহাবস্থানের মধ্যেও তলিয়ে যাচ্ছে না একজন গ্রামীণ তরুণের অন্তর্গত বেদনা। গ্রাম আর শহরের সমাজ-অর্থনীতির কোনো জটিল চেহারার বিশ্লেষণে নয়, তাঁর নিজস্ব স্বভাবে সহজ মানবিক অনুভূতিতেই ফিরে ফিরে আসছে 'বাপজান হে'-র যুবকটি, বা সতাকায়ের 'ওরা থুতু দেয় ঢিল ছুঁড়ে মারে'—জাতীয় অনুভূতি।

৫

'যাদবপুরে যারা পড়তে আসে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু থাকে গ্রাম থেকে সদ্য উঠে আসা যুবক, এই প্রথম তারা কোনো জাঁকজমকের শহরকেন্দ্রে এসে পৌঁছল। একটা ভীরু কাঁপুনি তাদের সমস্ত চোখেমুখে লেগে থাকে তখন, নিজেকে সন্তর্পণ ভাবে প্রচ্ছন্ন রাখবার আয়োজনে বিব্রত থাকে তারা। তারপর কেউ কেউ মানিয়ে নেয়, পরিণত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কেউ-বা পারে না তা, বরং নতুন এই আধোজানা সংস্কৃতির সংঘর্ষে একেবারে উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে, উন্মাদ হবার ঘটনাও ঘটে যায় কখনো কখনো।

...উদ্ধৃতিতে নিম্নরেখাঙ্কন প্রবন্ধ লেখকের।

এদের মুখের দিকে তাকালেই মনে পড়ে নিজের অল্প বয়সের কথা। মনে পড়ে সে-আমলের প্রেসিডেন্সি কলেজে পরম অভিজাত পরিবেশের মধ্যে কতদূর অসহায় পরিত্যক্ত লেগেছিল নিজেকে, পদ্মাপারের ছোটো রেলকলোনি থেকে পৌঁছনো এই এক অর্বাচীন আমি। আবরণে আচরণে উচ্চারণে যে দূরত্বের বিচ্ছেদ তৈরি হয়েছিল সেদিন, ভিতরে ভিতরে সেই ভীরুতা আজও কাটিয়ে উঠতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এদের মুখচ্ছবিতে তাই নিজেরই আদল দেখতে পাই।...'

'পা তোলা পা ফেলা' প্রবন্ধেরও প্রায় এক দশক পরে যে কবিতা লিখবেন শঙ্খ ঘোষ, এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি হলো তারই জন্মমুহূর্তের সূচনার প্রাথমিক ভূমিকা। যদিও 'আত্মঘাত' কবিতাটির সরাসরি বা প্রত্যক্ষ উদ্দীপক নয় এই অংশটি, তবুও মনে রাখা ভালো যে এই অংশের মধ্যেও অনেক টুকরো অভিজ্ঞতা জমা হয়ে আছে। আশির দশকের প্রথমদিকে রচিত হয়েছে এই কবিতাটি। ইতিমধ্যে 'বাবরের প্রার্থনা', 'তুমি তো তেমন গৌরী নও', 'মূর্খ বড়, সামাজিক নয়' বা 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'-র মতো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। সময় সচেতন ধীমান এই কবির কবিতায় বহুমাত্রিক আয়তন তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে; বিশেষত সত্তর দশকের রাজনৈতিক বিবেকবোধ থেকে শুরু করে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদী স্বর অর্জন তাঁর স্বাভাবিক আয়ত্তে। ঝকঝকে নাগরিক রুচিতে শীলিত তাঁর কবিতা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সত্য হয়ে উঠছে বাংলা কবিতার পথিকের কাছে। আর এই সময়েই ১৯৮১-র পঁচিশে বৈশাখের ভোরবেলায় শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা একটি গ্রামের ছেলের আত্মহত্যা যেন সংহত করে আনল শঙ্খ ঘোষের এতদিনের ভীরুতা আর অসহায়তাকে। তার ক্ষোভ আর প্রতিবাদকে। গ্রাম থেকে এসে শান্তিনিকেতনের পরিশীলিত মাটিতে ঠোক্কর খেতে খেতে, বন্ধু সহপাঠিনীদের তির্যক মন্তব্য সহ্য করতে করতে শেষ মুহূর্তের চূড়ান্ত প্রতিবাদের ধরণে যে বেছে নিয়েছিল আত্মঘাতের পথ; বাবাকে চিরকুট লিখে যে জানিয়ে গিয়েছিল তার ভাইকে যেন তিনি না পাঠান এখানে—সেই গ্রাম থেকে আসা ছেলেটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল ছাত্র চিত্তপ্রিয় আর অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের অভিজ্ঞতা। জানিয়েছেন তিনি, 'নিজের মুখ থেকে শুরু করে আমার দেখা সবকটি ঐ গ্রামীণ মুখ একসঙ্গে লাফ দিয়ে ওঠে চোখের সামনে।'

৬

যদি না-ও জানতাম আমরা কবিতাটির জন্মমুহূর্তের এরকম অভিঘাত, এর পিছনের কঠিন অথচ অশ্রুভারাতুর অভিজ্ঞতার রূপ, তাহলেও কিন্তু কম পেতাম না কবিতাটি

শেকে। খুব সহজেই ধরা যায় রবীন্দ্রনাথে লালিত শঙ্খ ঘোষকে, যিনি কবিতার প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তিতেই যেন রবীন্দ্রনাথের দিকে অভিমানী প্রশ্নচিহ্ন তুলতে পারেন—

এখানে আমাকে তুমি কিসের দীক্ষায় রেখে গেছ ?
এ কোন জগৎ আজ গড়ে দিতে চাও চারদিকে ?

আর এই ধারাবাহিকতায় কবিতাটিতে ধীরে ধীরে খুলে যায় এক ভুল পৃথিবী। গ্রামীণনিশ্বাস, সজলতা বা গ্রামের অশথের বৈপরীত্যে ধরা পড়ে সোনার ঝলকের জটিলভাষার কৃত্রিম আবহের ছাতিম শিরীষের চোখ-ঝলসানো জগৎ। ক্ষোভে, অভিমানে বিক্কারে ছড়িয়ে পড়তে চায়—'কী ভাষায় আমাদের একান্ত বাঁচাও হোল পাপ'-এর মতো পঙ্‌ক্তি। কিন্তু তবুও সমস্ত অস্বীকারের মধ্যেও শঙ্খ ঘোষ একটি বিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়ে যান। তাই শেষ পঙ্‌ক্তিতে পৌঁছে আত্মহননের ভিত্তিতে পঁচিশে বৈশাখের সঙ্গে বাইশে শ্রাবণও যুক্ত হয়ে গেল জীবনের প্রতি আস্তিক্যের ভাবনায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর নির্ভরতায়। যা ছিল প্রবল প্রতিবাদের, প্রত্যাখ্যানের, ধিক্কারের নেতি-র অভিজ্ঞান, শঙ্খ ঘোষ তাকেই বিশ্বাসের অনুকূলে টান দিলেন। বুঝতে অসুবিধে হয় না এ কবিতা রাবীন্দ্রিক শঙ্খ ঘোষের,'তাই আমার বিশ্বাস আজও কিছু বেঁচে আছে' পঙ্‌ক্তিটিতে, অনন্তর, হয়তো কঠিনও, তবুও এক 'মানবিক' সমাজের কল্পছবি লালন করেন তিনি।

কিন্তু কবিতার জন্মমুহূর্তের উদ্দীপক ঘটনা যেন আরও একটু বেশি ভাবনার দিকে প্ররোচিত করে। যেন পঞ্চাশ বছরের টুকরো টুকরো অনেক শঙ্খ ঘোষের শেষবারের মতো আছড়ে পড়া, যার মুখের সঙ্গে মিলে যায় বালিগঞ্জ-পাইকপাড়ার বাসের ড্রাইভারের মুখ, 'বাপজান হে' বলে যে ভুল নগরবৃত্ত থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সোনাবৌ আমিনার দিকে। আত্মপরিচয়হীন সত্যকামের 'কী আমার গোত্র পরিচয় ?' যেন জড়িয়ে যায় এর প্রতিটি রক্ত কণিকায় ; সত্যকামেরই অভিজ্ঞতা যেন—

বুঝিনা কখনো ঠিক এরা কোন নিজের ভাষায়
কথা কয় গান গায় কী ভাষায় হেসে উঠে এরা
পিষে ধরে আমাদের গ্রামীণ নিশ্বাস সজলতা—

এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে ভেসে ওঠে। সত্যকাম, আঞ্চলিক উপভাষায় স্বাভাবিক গ্রামীণ মানুষ আর অনেক দেখা-না-দেখা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অভিজ্ঞতার গ্রাম থেকে আসা তরুণ একাকার হয়ে যায় কবিতায় পৌঁছে। শুধুমাত্র শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা বীরভূমের ঐ গ্রামীণ ছাত্রটির একার অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে না আত্মঘাত, 'বাপজান হে' সম্বোধনের গ্রামীণ যুবক আর জাবাল সত্যকাম—সবাই-ই যেন এই অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে চায়।

৭

গত দশবছরের কবিতায় শঙ্খ ঘোষ অনেক অন্তরকম। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে', বা 'লাইনেই ছিলাম বাবা'-তে রাজনীতি সচেতন সময়-মনস্ক কবির যেমন দেখা পাওয়া যায়, তেমনি এ সময়ের প্রধান ভর হয়ে থাকে তাঁর কবিতায় দেশ-ভাবনা। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর কবিতায় বারবার দুলে ওঠে। গদ্যে পদ্যে সর্বত্রই ফুটে ওঠে একজন ভারতীয়ের মুখ। শোণিত বিদ্রূপে আর অস্থির বেদনায় এই কবি যেন বিবেকের মতো দিক নির্দেশক হয়ে ওঠেন। আর এই পর্বেই লক্ষ করলে দেখা যাবে তাঁর কবিতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে গ্রাম আর শহরের পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম অথচ অসমতার দ্বান্দ্বিক বেদনার ছবি।

তবুও সদ্য গ্রাম থেকে নগরে আসা কোনো অনভ্যস্ত তরুণ শিক্ষার্থীর ঠোঁটের কোনায় যখন বিড়বিড় করে ওঠে জাবাল সত্যকামের পরিচয়হীনতার বেদনা, কিংবা বন্ধুমহলে নিজের মাটি কামড়ে ধরবার সময়ে গোপনে গোপনে আউড়ে যায় 'আত্মঘাত'-এর অনর্গল পঙ্‌ক্তি, তখন বোঝা যায় গ্রাম-শহরের জটিল সম্পর্ক বিন্যাসের মাঝখানে কোথাও যেন এক যন্ত্রণাকাতর হাতের দিকে স্নিগ্ধ হাত বাড়িয়ে দেয় শঙ্খ ঘোষের কবিতা। ভুল নাগরিকতা থেকে মুক্ত করে দিয়ে যেন কোনো সহজ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে দিতে চায় তাঁর কবিতা। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির ইঙ্গিতে শাসন করতে থাকে নির্বাক মুখ আর সবাক চোখ। এই চোখ সত্যকামের, এই চোখ প্রাকৃতজনের।

...

স্লোগান ও দাঁড়ের শব্দ

এমনিভাবে থাকতে গেলে শেষ নেই শঙ্কার
মারের জবাব মার

বুকের ভিতর অন্ধকারে চমকে ওঠে হাড়
মারের জবাব মার

বাপের চোখে ঘুম ছিল না ঘুম ছিল না মার
মারের জবাব মার

কিন্তু তারও ভিতরে দাও ছন্দের ঝংকার
মারের জবাব মার

কথা কেবল মার খায় না কথার বড়ো ধার
মারের মধ্যে ছলকে ওঠে শব্দের সংসার

স্লোগান / আদিম লতাগুল্মময়

অনুভবের নানারকম প্রবণতা ব্যবহার ক'রেই কবিতা লেখা যায়, একটি-দুটি নির্ধারিত বিন্যাসে কবিতাকে সীমিত রাখার প্রচারিত অভ্যাস এখন অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে বাংলা কবিতাবলয় ; একজন কবিই নম্র ও শমিত কোনো বিষয় নিয়ে যতটা সঞ্চার ঘটান, তিনিই কখনো কখনো সরব ও প্রকাশ্য কোনো ঘটনা-বিন্যাসে হয়ে উঠতে পারেন এতটাই মুখর, প্রত্যক্ষ।

কখনো, তাও নয়। বিস্তীর্ণ ও কলরবময় কোনো বিষয় অনুচ্চ স্বরায়ণেও কবিতা হয়ে উঠতে পারে। 'স্লোগান' কবিতাটি যেমন। কবিতার নামে এবং শ্রেণী-অহঙ্কার তত্ত্ববাচক ব্যবহারবহুল কলিটি ('মারের জবাবে মার') সত্ত্বেও প্রধানত শব্দগুচ্ছের চাল আর দুরন্ত অস্পষ্টতায় কবিতাটি আড়ালে রেখেছে তার অন্তর্বয়ান। শব্দগুচ্ছের এমন আপাতবিরোধী ব্যবহার বাংলা কবিতায় খুব বেশি দেখা যাবে না। শব্দগুচ্ছের যে-অনুষঙ্গের সঙ্গে বাংলা কবিতাপাঠকের কান পরিচিত, তা কবিতাটির দিগন্তপ্লাবী বিষয়স্বভাব চিনতে, অন্তত প্রাথমিকভাবে, বাধা দেয়।

প্রাথমিকভাবে। কিন্তু সময়ের সরব ও রক্তাক্ত ধ্বনিচিহ্নিত কলিটি বারবার ধাক্কা দিয়ে অস্বস্তি ঘটায়, তারপর, ক্রমশ, চেনা যায় কবিতাটির ঢেউয়ে ঢেউয়ে জেগে ওঠা ছারখার সোনার ছেলেদের মুখ, তিমিরের ছিন্ন শির, শেষ সময়ের নিশ্বাস, দেয়ালে দেয়ালে ফুটে ওঠা চরম : 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস', দশকের পর দশকের সব সমর্পণ। আর তখনি, ছন্দের গূঢ় কৌশল কতটা অনিবার্য এই কবিতায় তা ধরা পড়ে।

দে'জ প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা (জানুয়ারি ১৯৮৩) তৃতীয় সংস্করণের 'অনুক্রম' অংশে 'আদিম লতাগুল্মময়' (স্লোগান' কবিতাটি যে-বইয়ের অন্তর্গত) বইটির পাশে লেখা আছে : রচনা ১৯৭০-৭১ / প্রকাশ ১৯৭২। অর্থাৎ, সেই পরাক্রান্ত সময়! সেই সময়ে লেখা শঙ্খ ঘোষের বহু কবিতায় ধরা পড়েছে মুহূর্তের নানা রঙ, বাঁক, প্রবণতা। সবসময়েই, খুব নিজস্ব ধরনে। এই নিজস্বতার একটি দিক হলো : ব্যঙ্গ ও কৌতুকের ধার। কখনো তা শব্দবিন্যাসে, কখনো নিঃশব্দে, ছন্দের চলে। 'বড়ো বেশি দেখা হলো ধর্মত বা দেখা অপরাধ' (বড়ো বেশি দেখা হলো : মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়), 'কেউ মারে কেউ মার খায় / ভিতরে সবাই খুব স্বাভাবিক কথা বলে / স্নানদান করে' (ক্রমাগত : আদিম লতাগুল্মময়), 'সুন্দরী লো সুন্দরী / কোন মুখে তোর গুণ ধরি' ('মার্চিং সং' : বাবরের প্রার্থনা) সহ পরিচিত অনতিপরিচিত নানা কবিতায় শব্দকে ধ'রে আছে ব্যঙ্গ ও কৌতুকপ্রবণতা। কিন্তু 'স্লোগান' কবিতায় ব্যঙ্গ শব্দনির্ভর নয়, ছন্দের ভাঁজে ভাঁজে জড়ানো। এরকম কবিতা শঙ্খ ঘোষেরও খুব কম। স্বরবৃত্তের আশ্রয় নেবার ফলেই কবিতায় এতটা নিরাসক্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

একটু অন্তভাবে দেখলে বলা যায়, থিসিস-অ্যান্টিথিসিসের অনুচ্চ অবয়ব পেয়েছে এই কবিতা। মণিভূষণ ভট্টাচার্যর 'একটি স্লোগানের জন্ম' নামে প্রায় সহমর্মী একটি কবিতা আছে। 'গান্ধীনগরে রাত্রি' বইয়ের অন্তর্গত কবিতাটির একটি অংশে দেয়াল-লিখন প্রসঙ্গে উচ্চারিত কবির স্বগতভাষণের কিছুটা উদ্ধার করছি :

"যখন পড়ি, 'কমরেড কানু সান্যালকে জেল ভেঙে ছিনিয়ে আনুন'—তখন ভাবি এঁরা অন্যের উপর দায়িত্ব দিয়ে চলে গেলেন কেন? কিংবা আলকাতরা এবং ত্রাশের নৈশসংঘর্ষে যখন দেয়ালে ফুটে ওঠে, 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' তখত ক্ষমতার আগে 'রাজনৈতিক শব্দটা নেই বলে আমি আঁতকে উঠি এবং খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি…'।

লক্ষণীয়, দু'টি দেয়াললিখন প্রসঙ্গেই কবির সপ্রশ্ন অস্বস্তি রয়েছে। শঙ্খ ঘোষের কবিতাটিতে এই অস্বস্তি রূপ নিয়েছে সব্যঙ্গ অথচ নিঃশব্দ প্রত্যাখ্যানের। শ্রেণী-ঘৃণার দু'টি স্লোগানই ('বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস', 'মারের জবাব মার') একসময় বাংলাপ্লাবিত ছিল। এই প্লাবন এবং তার জোয়ারে ভেসে যাওয়া

সময়ের নানা চিহ্ন 'স্লোগান' কবিতাতেও ধরা পড়েছে। সেন্ট্রাল জেল কিংবা কার্জন পার্কে ঝরে যাওয়া সোনার ছেলেদের স্মৃতিকণা ঝলক দেয় 'বুকের ভিতর অন্ধকারে চমকে ওঠে হাড়'-এর কথায়। স্মৃতির লালন আর নির্মম মৃত্যুকে একই সঙ্গে ধরে রেখেছে 'হাড়' শব্দটি। আর তারপরেই, 'মারের জবাব মার' অসহায় বৈপরীত্যে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

তারপরেও, স্লোগানের বিপরীত টংকার আবার ধরা পড়েছে 'বাপের চোখে ঘুম ছিল না ঘুম ছিল না মা-র' এই আর্দ্র উচ্চারণের পরেই তার ব্যবহারে।

এই পর্যন্ত যদি কবিতাটিতে একটি থিসিস গড়ে ওঠে, তবে অ্যান্টিথিসিস তার পরের অংশে। আর এখানে কবি সটান, ব্যঙ্গ-প্রবণতা থেকে সমূলে বাইরে। 'কবিতার মুহূর্ত' বইটিতে শঙ্খ ঘোষ 'বিকেলবেলা' কবিতা রচনার প্রসঙ্গ আলোচনায় জানিয়েছিলেন : 'বহুপক্ষ হয়ে গেছে আজ। সকলেই বলে মার্কস-বাদের কথা, কিন্তু পরস্পরের প্রতি আজ প্রখর তাদের ঘৃণা। কোথায় নিয়ে চলেছে এই ঘৃণা ?' ঘৃণার এই সর্বগ্রাসী চেহারা দেখেছেন যিনি, তিনিই পারেন শ্রেণীঘৃণার ধরনকেও অস্বীকার ক'রে নির্মোহ ব'লে উঠতে :

> 'কথা কেবল মার খায় না কথার বড়ো ধার
> মারের মধ্যে চলকে ওঠে শব্দের সংসার।'

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী'র 'অহো দিব্যমূর্তি কবি' কবিতায় এক দণ্ডিত কবির কথা ও বর্ণনা আছে :

> 'আমি যমধার খড়্গ, শব্দ ও জীবন
> দুইদিকে শাণিত রেখেছি, এই অপরাধে,
> সকালের আলো না ফুটতেই
> ঘুম থেকে টেনে তুলে এখানে এনেছে'

শব্দকে শাণিত ক'রে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ক'রে রাখার কথাই এখানেও বলা হয়েছে। শঙ্খ ঘোষও বললেন : 'কথার বড়ো ধার।' রমেন্দ্রকুমার ও শঙ্খ ঘোষ দুজনে মেজাজের দিক থেকে অনেকটাই আলাদা গোত্রের কবি। 'গোষ্ঠী থেকে সমাজের দিকে এগিয়ে এল কবিতা ? ঘর থেকে পথে ? আত্মকেন্দ্রিকতার বদলে ঘটতে পারল আত্মবিস্তার ? (আত্মতৃপ্তির বাইরে : কবিতার মুহূর্ত)—এমন ব্যগ্র জিজ্ঞাসা শঙ্খ ঘোষের স্বভাব চিনিয়ে দেয়, রমেন্দ্রকুমারে এ প্রসঙ্গ তত প্রকাশ্য নয়, ধরনে ও গন্তব্যে তা অন্তরকম। কিন্তু দু'জনেই শব্দের দুর্জয় ক্ষমতায় বিশ্বাসী। এই সাযুজ্যের কোনো ব্যাখ্যা হয় না। শুধু ভালো লাগে শব্দের সামর্থ্যে দুই কবির আস্থা নির্ভরতায়।

শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে, অন্তত এই কবিতার নিরিখে, এই নির্ভরতার অন্য মাত্রা

আছে, নিঃসন্দেহে। 'মারের জবাব মার'-এর প্রত্যুত্তরেই এই নির্ভরতার প্রতিষ্ঠা। কবিতার অ্যান্টিথিসিসও এইখানে। কথার গুরুত্ব নির্দেশে। 'আদিম লতাগুল্মময়' বইয়েরই আরেকটি কবিতা 'বিরলতা'র শব্দের অন্ত তরঙ্গ : 'তুমি আজ এমন করে কথা বলো মনে হয় শব্দ যেন শব্দের / সন্ন্যাসিনী'—বোঝা যায়, দুটি কবিতার শব্দের স্বভাব এক নয়। 'বিরলতা'র শব্দ কারো প্রতিপক্ষ নয়, তার নিজস্ব সত্তারের স্তরান্তরই কবিতার বিষয়। কিন্তু 'স্লোগান'-এ 'অসি'র সাপেক্ষে 'মসী'র সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত। এবং তা-ই হয়ে উঠেছে আরেকটি স্লোগান, একটি বিকল্প উচ্চারণ।

...

নেমে আসুন পথে

যদিও আলো আছে তবু ধরা যাক একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি
কিংবা চলেছে আমাদের এই মন্থর যান

কখনো থামছে কখনো চলছে কিন্তু আমরা নামছি না কখনো
এই জানলার ধার ছেড়ে

দুধারে দেয়ালের উলকিগুলি হাতছানি দেয় অনেকরকম
কিন্তু দিশেহারা হবার ভয়ে আঁকড়ে আছি পাল্লা

আর আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন খনির মধ্যে চাপে
কখনো এই একইরকম একইরকম একইরকম

একই পথ দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের যাওয়া আর
ফিরে আসাও কখনো কখনো

আমাদের মগজের মধ্যে নামিয়ে আনে বকেয়া কত ঘুম আর
ঝিমিয়ে পড়ে অনেকদিনের মাথা

আমরা চলছি না থেমে আছি ঘুমের মধ্যে বোঝা যায় না
আবছা হয়ে ভেসে যাচ্ছে দেয়ালগুলির লেখা

মাঝেমধ্যে ঝাঁকুনি দিয়ে কোনো কোনো স্বপ্ন-আভাস
মুছে নেয় চারপাশের আদল

স্রোতের অনেক ভিতর ছিঁড়ে অতর্কিত মাছের মতো
চঠকে হঠাৎ দেখি আলোর দিকে

কয়েকজন যুবা আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলে, এই-যে,
আগুন জ্বালব, নেমে আসুন পথে।

(নেমে আসুন পথে / মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)

একদিন আমাদের চলা ছিল খোলা রাজপথে, আলোর ভেতর। মানুষের মুখের ভাষার স্পন্দন ঢেউয়ের মতো আঘাতে আঘাতে এগিয়ে নিয়েছে পথ চলা। এখন—

যদিও আলো আছে তবু ধরা যাক একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি
কিংবা চলেছে আমাদের এই মন্থর যান

প্রথম দুটি স্তবকের এই অভ্রমান অনিশ্চয়তার তল হারিয়ে আমরা সেঁধিয়ে যাই স্বপ্নবাস্তবের এক চোরা জগতে, যেখানে সুড়ঙ্গের ভেতর এক অপ্রাকৃত আলোয় কিছুই সুস্পষ্ট নয়। এমনকি আমাদের এই চলাও এক অনৈচ্ছিক সমর্পণমাত্র; কারণ, আমরা চলেছি কিংবা আমাদের নিয়ে চলেছে এই শব্দহীন মন্থর যান। গতির এই ঘোরলাগা বিভ্রমে একজনও কণ্ডাক্টর নেই যে আমাদের বলে দেবে— 'পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন।' অথবা কোনো সহযাত্রীর লক্ষ্যভেদী মন্তব্য লহমায় ছিঁড়ে দেবে চেতনার ঘুম—'ছোট হয়ে নেমে পড়ুন মশাই; সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই।'

তবু আমরা যারা দখল করে নিয়েছি জানলার ধারগুলিকে (বহুকাল ধরেই চলে আসছে আমাদের এই শ্রেণীগত দখলদারি) সুড়ঙ্গের দেয়ালের দুর্বোধ্য উল্কিগুলি নিছক উদাস প্রকৃতির ছবি হয়েই হারিয়ে যায় না আমাদের কাছে। আমাদের হাতছানি দেয়, ডাকে, অশান্ত করে এই রহস্যময় সংকেতলিপি। দিশেহারা হবার ভয়ে আমরা আঁকড়ে থাকি পাল্লা, পদ-প্রতিষ্ঠা-সম্পদের মধ্যবিত্ত আবর্তে আরো বেশি বেশি করে নিজেদের সমর্পণ করে নাকচ করে দিতে চাই দেয়ালের উল্কিগুলোকে, অর্থহীন করে দিতে চাই আমাদের এই ঘেরাটোপের বাইরে জীবনের দগদগে রূপগুলোকে।

দেয়ালের উল্কিগুলি কি সত্যি, না কি আমাদের চেতনারই প্রক্ষেপমাত্র? মনে পড়ে যায় কবির অনুবাদে গুণ্টার গ্রাসের 'ডিম্ববর্তী ভাইসব' কবিতাটির কয়েকটি লাইন—

আমাদের বসবাস এক ডিমের মধ্যে
শত্রুদের নাম লিখে
আর নোংরা ছবি এঁকে
ভরে ফেলেছি এই খোলসের ভেতরটা
তা-দেওয়া হচ্ছে আমাদের।

কিন্তু তারপর ডিম্ববর্তী ভ্রূণেদের বিদ্ধ করে এক প্রবল সংশয়—এমন যদি হয় যে তা দেওয়া হচ্ছে না? যদি এ খোলস নাই ভাঙে কোনদিন? এমন যদি হয় যে এই আঁকিবুকিগুলোই দিগন্ত!

ঘরই তার আকাশ মনে করে একটি চড়ুই পাখি উড়াল দিয়েছিল, কিন্তু কিছু ক্ষণের মধ্যেই সরে গিয়েছিল বিভ্রম :

কিন্তু কোথায় উড়াল দেবে ? পুব পশ্চিম ওপর নিচে
শাদা কেবল শাদা কেবল শাদা

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল তার, ঠিক যেমনভাবে—

…আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন খনির মধ্যে চাপে
কেননা এই একইরকম একইরকম একইরকম

একই পথ দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের যাওয়া আর
ফিরে আসাও কখনো কখনো

আমাদের মগজের মধ্যে নামিয়ে আনে বকেয়া কত ঘুম…

আপাত চলমান এই স্থবিরতায় পুনরাবৃত্তির বিকারে এক গভীর আচ্ছন্নে অবসাদে ডুবে যায় সত্তা। তখন এমনকি এই স্থবিরতার চরিত্র নির্ণয়ও কঠিন হয়ে পড়ে: তখন আমরা চলছি না থেমে আছি বোঝা যায় না, আর দেয়ালগুলির লেখা আবছা হয়ে গিয়ে মুছে যায় দগদগে জীবন-যাপনের হাতছানিও।

তবু এই মন্থর যানের পেটের ভেতর ঘুমে চেতনা যখন অবশ, তখন অবসাদের গভীরতর তল থেকে পাক খেয়ে উঠে আসে স্বপ্ন, উঠে আসে ইতিহাসের নিয়মেই—

মাঝেমধ্যে ঝাঁকুনি দিয়ে কোনো কোনো স্বপ্ন-আভাস
মুছে নেয় চারপাশের আদল

স্রোতের অনেক ভিতর ছিঁড়ে অতর্কিত মাছের মতো
চমকে হঠাৎ দেখি আলোর দিকে

কয়েকজন যুবা আমায় ঘুম ভাঙিয়ে বলে, এই-যে,
আগুন জ্বালব, নেমে আসুন পথে।

একদা জার্নালে কবি লিখেছিলেন—'না-এর পর না দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখতে রাখতে কোন্ শীর্ণতায় এর পরিণাম, বর্জনে বর্জনে বর্জনে কোন্ এককত্বে সর্বনাশ, কেন্দ্রের কোন্‌খানে আর থাকবে যদি পরিধি যায় বিচ্যুত হয়ে, স্পর্শ যদি না থাকে কোনো স্পর্শক তবে কাজ করবে কোথায়।'

সমস্ত স্থবিরতা, বিচ্ছিন্নতা, শীর্ণতা, বর্জনে বর্জনে এককত্বের সর্বনাশ পুড়িয়ে দেবার অগ্ন্যুৎসবে ডাক দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছেন যে যুবারা, সেকি সত্যিই ঘুম ভেঙে ওঠা ? এই জাগরণ কোথায় ? ঘুমের ভেতরেই অন্য কোনো গভীরতর তলে ? এও কি জেগে ওঠা, নাকি কাফকার শ্বাসরোধী অর্থহীন জগতের আদলে ঘুমের মধ্যে খুলে যাওয়া, তল থেকে আরো অতলের দিকে চলে যাওয়া কেবলই ? স্থির বন্ধ

জলায় যেমন দপ করে আলেয়া জ্বলে ওঠে, তেমন এই স্থবির অস্তিত্বের বাষ্পজাত স্বপ্ন ? স্বপ্নের প্রসার ?

আমরা লক্ষ করব আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপ ছেড়ে পথে নেমে পড়ার এই আহ্বান তাঁর কবিতায় এসেছে বারেবারে ; কখনো তা এসেছে প্রচ্ছন্নভাবে, কখনো স্পষ্ট, সরাসরি, কোনো পরিচিতের দ্বিধাহীন উচ্চারণে—

সেই মেয়েটি আমায় বলেছিল :
সঙ্গে এসো, বেরিয়ে এসো, পথে।

কিন্তু মুক্তির দশকের স্বপ্ন-দেখা সেই সময়ে এই আহ্বানের মধ্যে যে আর্তি ছিল স্পষ্ট, আহ্বানে সাড়া দিতে না পারার যে গ্লানি ছিল প্রত্যক্ষ, আটের দশকে সেই আহ্বান স্থবিরতার খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসার। বস্তুত চার দশকের অধিক সময় ধরে কবির সৃষ্টিকর্মে বারেবারে ফিরে আসে যে কয়েকটি মোটিফ, সময় তাতে যোজনা করে নতুন নতুন মাত্রা। যেমন, 'নিহিত পাতালছায়া' কাব্যগ্রন্থের 'কিউ' কবিতাটিতে যে স্থবিরতার চিত্র ছিল, তাতে অন্তত আলোচ্য কবিতার এই শ্বাস-রোধী দুঃস্বপ্নের ছোঁয়া ছিল না—

একটু এগোও একটু এগোও
তখন থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি একটু এগোও
হে সর্পিণী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক-চড়ুক !

মানুষের সমবেত পদচালনায় ভেঙে দেওয়া যেতে পারে যে স্থিতাবস্থা, তার সঙ্গে বর্তমান কালের এই জড়ত্বের তফাৎ এই যে এখানে চেতনা এক প্রবল অনীপ্সার নিগড়ে বন্দী। অস্তিত্বের অচলায়তন ভেঙে, অবসাদের ঘুম ভেঙে জেগে উঠবার জন্য এখানে তাই অপেক্ষা করতে হয়, অপেক্ষা করতে হয় কখন ক্রান্তদর্শী যুবাদের ব্যাকুল আহ্বান জাগিয়ে তুলবে রূপকথার জীয়নকাঠির মতো। অপেক্ষা করতে হয় সেই সময়ের জন্য যখন—'অন্ধকারের ভিতর দিয়ে স্তবকে স্তবকে উঠে-আসা নিঃশব্দ গানে ভিজে যায় ঘাস, ভিজে যায় অবোধ প্রাণীদল, ঘূর্ণিত হতে থাকে সময়, গ্রহণে গ্রহণে গ্রহণে ভরে যায় অঞ্জলি, করপুট উঠে যায় আলোড়িত আকাশের দিকে। না-এর মধ্য দিয়ে ঝলকে ঝলকে এগিয়ে আসে অস্তি, অশ্বথের গুঁড়ি ছুঁয়ে মধ্যরাত বলে : স্তব্ধ হও, শোনো। শুনি। অবিরল উত্তরোল অনাবিল পদধ্বনি শুনি সারারাত।' (জার্নাল)

প্রভাতকুমার দাস

•••

শঙ্খ ঘোষ : ছোট পত্রিকারই গৌরব

একটি আত্মজীবনী-মূলক গদ্য রচনায় কবি শঙ্খ ঘোষ নিজের কাব্যচর্চার সূচনা-পর্ব বিষয়ে সংক্ষেপে লিখেছিলেন , তাঁর পদ্মাপারের ছোট্ট জন্মভূমির একদিকে নদী আর একদিকে বন, তার মাঝখানে বারো বছর বয়সে তাঁরও একদিন শুরু হয়েছিল ছন্দমেলানোর খেলা, একেবারে দায়হীন, প্রগল্‌ভ। খাতার পর খাতায় নিছকই খেলাচ্ছলে এই সব রচনায় তাঁর কাব্যচর্চার সূত্রপাত—তাতে নিশ্চয় তাঁর পারিবারিক পটভূমি একটা বাতাবরণ তৈরি করে থাকবে। কিন্তু, তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত জন মাত্রেই জানেন, দায়হীন আর প্রগল্‌ভ কাব্যচর্চার প্রথম প্রহর-গুলি বেশিদিন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখেনি, প্রায়ই অল্পভাষী এই মানুষটি আমাদের কাব্যজগতের প্রাঙ্গণে এক গভীর দায়বোধসম্পন্ন কবি হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে উঠেছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হওয়ার আগের বছর ১৯৪৬ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকার 'ছোটদের পাততাড়ি' বিভাগে তাঁর কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয়। এর পর ইন্টারমিডিয়েট পড়বার সময় সহপাঠী বটকৃষ্ণ দে সম্ভবত 'মহানগর' নামের এক পত্রিকায় তাঁর একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন, সেটিও প্রথম প্রকাশিত কবিতা-গুলির অন্যতম।

একথা ঠিক, লাজুক প্রকৃতির শঙ্খ, তাঁর কবিতার অনুরাগী কয়েকজন সহ-পাঠীর নিত্য উৎসাহে খুবই বিব্রত বোধ করলেও, প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁদেরই তাড়নায় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কখনো নিজে কবিতা পাঠিয়েছেন, কিংবা তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন অথবা পৌঁছে দিয়েছেন সমকালীন সম্পাদকদের হাতে। চল্লিশ-পঞ্চাশের যে কোনো কবিযশ:-প্রার্থী তরুণের কাছে তাঁর রচনার সঠিক মূল্যায়ন, পরীক্ষা বা স্বীকৃতির প্রকৃত নির্ণায়ক হিসেবে গণ্য করা হতো বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাকে। হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজে শঙ্খর সহপাঠী ছিলেন। তাঁর পরামর্শ ছিল, 'কবিতা' পত্রিকায় কবিতা পাঠাতেই হবে। সেই পরামর্শ একসময় প্রায় ভয়ঙ্কর দাবিতে পরিণত হল : না পাঠালে হীরেন নিজেই পাঠিয়ে দেবেন তাঁর প্রিয় কবি-বন্ধুর এক-দুটি কবিতা। এই দাবিকে সমর্থন জানালেন হীরেনের পিসতুতো ভাই দেবদাস পাঠক, কেননা কবিতাভবনের প্রতি সেও অনুরক্ত এবং বুদ্ধদেবের প্রশ্রয়ধন্য। শেষ

পর্যন্ত কথা হল শঙ্খ না পাঠালে, চীয়েন নিজেই পৌছে দিয়ে আসবেন বুদ্ধদেবের কাছে। শঙ্খর ধারণা, নিশ্চয় বুদ্ধদেব মনোনীত করবেন না তাঁর কবিতা, সুতরাং এই প্রত্যাখ্যানের অভিজ্ঞতা অন্যের মাধ্যমে না হয়ে সরাসরি তাঁর নিজের মাধ্যমে হলে অপমানটা গোপন থাকবে। একদিন সলজ্জ ভয়ে মার্চ মাসের কোনো এক সন্ধ্যার দিকে উপস্থিত হলেন কবিতা ভবনের দরজায়, বুদ্ধদেব স্বয়ং দরজা খুললেন এবং কবিতা তিনটি হাতে নিয়ে বললেন সাতদিন পরে খোঁজ নেবার জন্য। যথারীতি সাতদিন পরে বুদ্ধদেবের কাছে গেলেন, দ্বিতীয় দর্শনে বুদ্ধদেব সাদরে ডেকে নিয়ে বসালেন এবং অস্বস্তিকর প্রশ্ন করলেন, 'নিজের নামের বানান ভুল লেখো কেন' ? আসলে শঙ্খ নিজের নামের বানান লিখেছিলেন অনুস্বর দিয়ে - কিন্তু অনুস্বর দিয়ে শঙ্খ বানান কেন হয় না, বুদ্ধদেব সেজন্য 'চলন্তিকা' দেখে নেবারও উপদেশ দিলেন। আবাল্য বানানের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী শঙ্খ তৎক্ষণাৎ বুদ্ধদেব-এর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন, নিছকই তর্কের প্রয়োজনে। শম্+খঃ এইভাবে কেন 'শংখ' হবে না, এরকম প্রশ্নও রাখলেন বুদ্ধদেবের কাছে।

প্রশ্ন শুনে বুদ্ধদেব একটু অবাক হলেন বোঝা গেল, তাঁর লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে, অস্বস্তিকর আঙুল চালাতে-চালাতে নিজেই সংশয়ের বৃত্তে আবর্তিত হলেন যেন। 'এটা তো কোনোদিন ভেবে দেখিনি', 'এটা নিশ্চয় ভেবে দেখতে হবে', বললেন শঙ্খকে। জানালেন, তাঁর 'পাথেয়' কবিতাটি তিনি 'কবিতা'র পরবর্তী সংখ্যার জন্য নির্বাচন করে রেখেছেন। বাকি দুটি কবিতাও সেই সঙ্গে ফেরত দিয়ে দিলেন। আরো কিছুক্ষণ আলাপের পর, অভিভূত শঙ্খ ফিরে এলেন এক আনন্দিত অভিজ্ঞতা নিয়ে। 'কবিতা' পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৫৬) 'পাথেয়' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। অবশ্য কবিতাটি নিয়ে মুদ্রণ-পরবর্তী এক অস্বস্তিকর অবস্থাও সৃষ্টি হল, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনায় স্বয়ং শঙ্খ ঘোষ সুবীর রায়চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন[২] :

> গরমের ছুটিতে খড়্গপুরে আছি যখন, বন্ধুদের চিঠিতে খবর জানলাম 'কবিতা'য় আমার লেখা বেরিয়েছে। অবিশ্বাস্য এই মর্যাদায় আপ্লুত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে উঠলাম, কলকাতায় এসেই দৌড়লাম পাতিরামে। শোভমান 'কবিতা'র হলুদ মলাটের ওপর অন্য সব কবির সঙ্গে আমারও নাম মুদ্রিত দেখে প্রায় মূর্ছিত হবার দশা—তারপর ছাপা হরফে নিজের লেখাটিকে দেখা — গিয়েই চমক লাগল, এবং সমস্ত আহ্লাদ নিমেষে চুকে গেল। কেননা লেখাটি পড়ে মনে হলো যেন অন্য কারো লেখা, আমার নয়। ছোট্ট সেই কবিতাটি এখনো আমার মনে আছে ; ঠিক চল্লিশ বছর পরেও। ছিল :

এমনও—যে দিন ছিল না তা নয়
যখন তোমার চলনে দেখেছি
বিদ্যুদ্বেগী ছলনা।
এমনও গিয়েছে সময় যখন
অভ্রংলিহ দম্ভ তোমার
ছড়িয়েছে বিস্ময়।
জানিনা এখনও সেই সব খেলা
তেমনি করো কি করো না
যত বসে ভাবি, শুধু মনে পড়ে
তোমার চোখের করুণা।

তৃতীয় লাইনে একটি শব্দ আর পঞ্চম-ষষ্ঠ লাইনে পুরোটাই পালটে দিয়ে বুদ্ধদেব 'কবিতা'য় ছেপেছিলেন অন্য 'পাথেয়', আর তাতে আমার অগাধ অপমানের বোধ হলো। 'হীরেনে'র কাছে বুদ্ধদেব শুনেছিলেন যে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি, তিনি নাকি আরো একবার বিস্মিত হন এবং বলেন—কবিতাটি কি এতেই ভালো হয়নি? উত্তরে, হীরেনকে আমি জানাই, হ'তে পারে ভালো, কিন্তু ওটা তো আমার কথা নয়, আমার কবিতা নয়।

এবং, এই অভিমানে, 'কবিতা'তে লিখিনি আর কোনো দিন, বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখাও করিনি প্রায় বারো বছর।

আজ অবশ্য বুঝতে পারি যে আমার অভিমানটা ছিল মূঢ়ের মতন, নতুন লেখকের লেখায় একটু-আধটু কলম চালালে কোনো দোষ তো নেই-ই, বরং সচেতন বিবেকবান সম্পাদকের সেটা অবশ্যকরণীয়। বুদ্ধদেব যে এই কবিতাটির ভালোই চেয়েছিলেন তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো তাড়াহুড়োয় (কেননা, মার্চে দেওয়া কবিতাটি যে মাসেই বেরিয়ে গিয়েছিল) তরুণটিকে সামনে ডেকে আর বলতে পারেননি সংশোধনের প্রস্তাব, সেটুকু হলে কিছুই আর বলবার থাকত না।

'কবিতা'য় যে আর লিখিনি, এ নিয়ে অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ হয়নি কখনো। কিন্তু আজও পর্যন্ত আক্ষেপ হয় এই ভেবে যে, নির্বোধের মতো বুদ্ধদেবের সান্নিধ্য থেকে অকারণে নিজেকে বঞ্চিত করেছি।'

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও এতে বোঝা সহজ হবে, শঙ্খ তাঁর নিজের কাব্যচর্চার প্রতি কতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, কবিতা প্রকাশের প্রাথমিক পর্বেই। এই সময় তাঁরা থাকতেন কলাবাগানের বাসায়—১৯৪৯-৫৫ পর্যন্ত সময়-সীমায়, তাঁর দাদার তদানীন্তন বাসস্থানে। 'কবিতা' পত্রিকায় 'পাথেয়' প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৫২ সাল নাগাদ 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'কবর' শীর্ষক একটি কবিতা। বাড়ির ঘরোয়া আড্ডা থেকে একদিন দাদা সত্যপ্রিয়-র বন্ধু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শঙ্খকে না জানিয়ে খাতা থেকে নকল করে কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন 'অগ্রণী'-তে। 'অগ্রণী' ছাড়াও 'ক্রান্তি'-তেও তাঁর দু-একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। একদিন 'দেশ' পত্রিকাতেও একটি কবিতা ছাপা হয়ে গেল, সেটির নাম—'অকালবৃষ্টি'।

পাণ্ডুলিপি অবস্থায় সদ্য-রচিত 'যমুনাবতী' কবিতাটি পড়েছিলেন সহপাঠী প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য; কবিতাটি তাঁর এমনই ভালো লেগে গিয়েছিল যে পরিচিতজনদের ধরে ধরে শোনাচ্ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত একদিন এসে জানালেন, কবিতাটি 'সাহিত্যপত্র'-এ প্রকাশের জন্য তিনি সরাসরি বিষ্ণু দে'র হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কোনো বর্ষীয়ান কবির মাধ্যমে। না জানিয়ে এভাবে পাঠানোতে একটু বিরক্ত হয়েছিলেন শঙ্খ। কিছুদিন পরে প্রদ্যুম্ন এসে জানালেন, বিষ্ণু দে প্রশংসা করেছেন কবিতাটির, কিন্তু মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন 'প্রিকশাস'। কবিতাটির মধ্যে একটা 'Conceit' আছে বলে মনে হয়েছিল তাঁর। অথচ কবিতাটি রচিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ১৯৫১ সালের কোনো এক সকালবেলায় খবরের কাগজের এক অগ্নিময় সংবাদের উৎস থেকে। কলেজস্ট্রীট বাজারের পেছন দিকে এক গলিতে দাদার রেল কোয়ার্টার্সে থাকেন তাঁরা। বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন, ইউনিভার্সিটির নতুন জীবন শুরু হবে কবে তার জন্য প্রতীক্ষা। অলস, মন্থর এমন একটি দিনে কোয়ার্টার্স থেকে দেখা 'নিচের সচল বস্তি জীবনের' দিকে তাকিয়েই এক মাসের পুরনো কুচবিহারের ভয়াবহ দিনটিই কবিতায় বেদনার ভাষা হিসাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন পুলিশের হাতে স্বাধীন এক কিশোরীর মৃত্যু —কবিতাটির মূল সুরে মূর্ত হয়েছিল। সুতরাং, গভীর মমতায় রচিত হয়েছে যে কবিতা, সে কবিতা সম্পর্কে প্রবীণ কবির মন্তব্যে অভিমান হয়েছিল শঙ্খর, সেজন্য ফেরত আনিয়ে নেন কবিতাটি।

কিন্তু আশ্চর্য, কোনোভাবে সে কবিতা একদিন পড়ল 'পরিচয়' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। মুগ্ধ সম্পাদক তরুণের কবিতায় আকৃষ্ট হয়ে লেখেন : আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। দ্রুত আমাদের দপ্তরে এসে যোগাযোগ করুন। হয়তো অজ্ঞাত এক তরুণ কবিকে শুধু উৎসাহিত করার জন্য এই আহ্বান নয়, প্রত্যক্ষ পরিচয় হলে একটা রহস্যও উৎঘাটিত হতে পারে এই আকাঙ্ক্ষায়, কেননা তাঁর ধারণা হয়েছিল, কোনো বিখ্যাত কবি হয়তো ছদ্মনামে কবিতাটি পাঠিয়েছেন। এই অনুমান থেকে সুভাষ, অসীম রায়কেও প্রশ্ন করেছিলেন আলোচ্য ছদ্মনামের প্রকৃত লেখক তিনি কি না। এরকম সম্পাদকীয় জল্পনার অবসান হলো একদিন, বিচলিত তরুণ কবি স্বয়ং হাজির হলেন ধর্মতলা স্ট্রীটের 'পরিচয়' দপ্তরে। অচিরকালের মধ্যে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'যমুনাবতী' কবিতাটি মুদ্রিত হল (২১ : ৬ পৌষ ১৩৫৮ পৃ ২৯-৩০)। চিত্তপ্রসাদ অঙ্কিত প্রচ্ছদশোভিত সংখ্যাটিতে প্রচ্ছদে অন্য বছরের মতো সম্পাদকের নাম নেই, কিন্তু সুভাষই

সম্পাদক ; সংখ্যাটিতে 'জানুয়ারি ৫২' শিরোনামে তাঁর তিনটি কবিতাও মুদ্রিত হয়েছে, যার প্রথমটির শিরোনাম 'পাঁচ-সালা', পরবর্তীকালে অনেকের মুখে মুখে ঘুরে জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল কবিতাটি, যার শুরু এই রকম 'রাস্তার মোড়ে লালবাতি জ্বেলে / শকুনেরা দেয় সন্ধ্যে / জোড়াবলদকে শূলে লটকিয়ে / ঠোঁট চেটে বলে, ভোট দে—'। সুভাষের পরবর্তী কবিই, এক অর্থে তখন পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞাত এক তরুণ, শঙ্খ ঘোষ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলার ছাত্র। কিন্তু কবিতাটি প্রকাশমাত্রেই বিখ্যাত হয়ে উঠল, চতুর্দিকে সরব-প্রশংসায় পাঠক-মহলের একটা বড় অংশের আগ্রহেই কবিতাটির সঙ্গে-সঙ্গে কবিকেও অকস্মাৎ এক জনপ্রিয়তায় উত্তীর্ণ করে দিল। এমনকি, সিটি কলেজের বাংলা ক্লাসে, অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর মতো প্রতিষ্ঠিত মানুষও ছাত্রদের সামনে সপ্রশংস উল্লেখ করলেন একদিন। সবেমাত্র কবিতার জগতে আবির্ভূত হচ্ছেন, এমন সব তরুণদের হৃদয়েও সাড়া দেখা দিল একদিন, এই কবিকেও নিজেদের সঙ্গী হিসাবে পাওয়ার জন্য।

কবিতাটিকে কেন্দ্র করে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটল শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলায়। বিভাগোত্তর পূর্ব-পশ্চিম বাংলা সাহিত্য (১৩৫৪-১৩৫৯) বিষয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্য ১৫-১৭ ফাল্গুন, ১৩৫৯, তিন দিনের এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন দুই বাংলার সাহিত্যিকরা। বিগত পাঁচ বছরের বাংলা কবিতা পর্যালোচনার দায়িত্ব পড়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপর। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন[৪] : গত পাঁচ বছরের বাংলা কবিতায় আঙ্গিকের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য যদি কিছু থাকে, তা হলো লৌকিকের স্পর্শ : 'আধুনিক কবিতায় চলতি প্রবাদ প্রবচনের হাওয়া লেগেছে অনেকদিন আগে, কিন্তু তাকে নাচাতে পারেনি। ছড়ার সুরও কিছু কিছু লেগেছিল। কিন্তু সেটা ছিল মাঝে মধ্যে বাড়িতে বাউল ডেকে একতারার গান শোনার মত ভদ্রলোকের শখ মেটানোর ব্যাপার। কিন্তু এই পাঁচ বছরে দেখা যাচ্ছে ছড়া হয়ে উঠেছে আধুনিক কাব্যের অন্যতম বাহন।' সুভাষ তাঁর আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণ সহযোগে অন্নদাশংকরের রচনার উদ্ধৃতির পরই তরুণ কবি শঙ্খ ঘোষের 'যমুনাবতী' কবিতাটির দুটি স্তবক বাদ দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়লেন। উদ্ধৃতি পাঠ করার পূর্বে সুভাষ বললেন : 'একটা প্রকাণ্ড অধ্যায়কে এমন অনায়াসে স্পর্ধার সঙ্গে দেখিয়ে দেওয়া একমাত্র ছড়াতেই সম্ভব। সহজ এখানে অতি-সারল্য নয়, তার মধ্যে রয়েছে পরস্পরের মধ্যে জটিল সম্বন্ধে গ্রথিত সমৃদ্ধ আবেগ। ছড়াকে ভেঙে-চুরে, দরকার মত তাকে মেজে ঘষে নিয়ে আধুনিক কবি তার সম্ভাবনাকে আরও প্রসারিত করেছেন।' প্রবন্ধ পাঠ করে সুভাষ নেমে যাওয়ার মুখে, অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়েছিলেন, হঠাৎ-উত্তেজিত বুদ্ধদেব বসুর দ্বারা। বক্তৃতার সমস্তটা না শুনেও সুভাষের প্রতিবাদ করে বুদ্ধদেব বললেন :

'কবিতা এক গাঢ়তর বোধের জগৎ, ভাত ভাত বলে সরল চিৎকার করলেই সেটা কবিতা হয় না।' বুদ্ধদেব উচ্চকণ্ঠ কবিতাটির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বললেন : "খুব চেঁচিয়ে কিংবা নাচুনি ছন্দে বললে মন ও প্রাণ সহজেই আকর্ষণ করে। কিন্তু সেটাই কি কবিতার আদর্শ হবে ?···গত ক'বছরে নতুনেরা ভালো লেখা লিখছেন। এঁদের ছন্দ ও বক্তব্যের আপাত-সারল্যের পিছনে দুর্দান্ত আবেগও রয়েছে। পুরনোদের ভিতর যেমন নজরুলের ছিল, সুইনবার্ণেরও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের রচনা অতিকথন দোষে দুষ্ট এবং তার প্রায় সবটাই চীৎকার ভরা। লেখাটা যদি গলার জোরের উপর নির্ভর করে, তা হলে সে কবিতা বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়। জোড়াসাঁকোয় এক সভায় রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'চেঁচালে কখনো দুঃখের কথা বলা যায় না।' ফুল্লরার সেই আমানি খাবার শোকক্রন্দন নানাভাবে আজকাল নানান লেখায় দেখা দিচ্ছে।' শ্রোতার আসনে বসে এই বাদানুবাদ প্রত্যক্ষ করলেন অভিযুক্ত তরুণ কবি শঙ্খ ঘোষও, সামনে-পেছনে তাঁর বন্ধুরাও উপস্থিত ছিলেন সেদিন। অবশ্য শঙ্খ, সাহিত্যমেলায় যোগ দিয়েছিলেন কোনো আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের প্রতিনিধি হিসাবেই সাহিত্য মেলার ঘটনাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করবার জন্য গিয়েছিলেন।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সের যে কোনো কবির পক্ষে এই ঘটনা নিশ্চয় শ্লাঘার বিষয়, প্রকাশ্য কোনো সাহিত্যসভায় জীবিতদের মধ্যে অন্যতম জীবনানন্দ দাশ কিংবা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার বিপরীত মেজাজের উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাঁর নাম উদাহরণ সহযোগে উদ্ধৃত হওয়া। এমনকি বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিতাপ্রাণ সম্পাদক কবি যে সেই উদাহরণ তাঁর তাৎক্ষণিক যুক্তিতে অনুমোদনযোগ্য মনে করেননি, সেও এক অর্থে তরুণ কোনো কবির কাছে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে ট্রেনে পরিচয় হয়েছিল আনন্দ বাগচীর সঙ্গে। সেখানে পৌঁছে আলাপ হলো আর এক বিশ্বাবউণ্ডুলে কবি দীপক মজুমদারের সঙ্গে। তাঁরা জানিয়েছিলেন, ফেরার পরে শীঘ্রই বাস্তবায়িত করবেন একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা। 'হিসেববন্ধন বা দলীয়তার বাইরে' উৎসাহী তরুণদের উদ্যোগে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার আয়োজনে প্রথম থেকেই ডাক পেলেন শঙ্খ। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাটিকে জন্মলগ্ন থেকে ঘোষণা করে জানানো হলো, তরুণতম কবিদের মুখপত্র হিসাবে। সুতরাং প্রথম থেকেই তরুণতমদের শিরোমণি হিসেবেই চিহ্নিত হলেন শঙ্খ ঘোষ ; অভিভূত দীপক, শঙ্খর একটা পুরো কবিতার খাতা চেয়ে নিয়ে গিয়ে নির্বাচন করলেন একটি কবিতা, 'দিনগুলি রাতগুলি'। অবশ্য কবিতাটির মুদ্রিত রূপে সন্তুষ্ট হতে পারেননি শঙ্খ—কেননা কবিতাটি খাতায় লেখার সময় ভেতরের ছন্দ ঠিক রেখেও টানা গদ্যে পঙ্‌ক্তিগুলি বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন কবি। কিন্তু খাতায় হাতে লেখা একটি পঙ্‌ক্তিকে

যতগুলি শব্দে লেখা যায়, মুদ্রিত পরিসরে তার চেয়েও বেশি শব্দ ধরানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরাসরি খাতার পাণ্ডুলিপির অনুসরণে কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছিল বলেই টানা গদ্যের ধরনটি পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে অনুস্যূত হয়নি। পরে 'দিনগুলি রাতগুলি' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময়, কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী কবিতাটির পংক্তিগুলি বিন্যস্ত হয়েছিল। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার বিষয়ে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন[৫] : 'সেই সময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান তরুণ কবি শঙ্খ ঘোষের পুরো একটি কবিতার খাতা আমাদের হস্তগত হয়। তার থেকে আমরা প্রকাশ করি 'দিনগুলি রাতগুলি' নামে দীর্ঘ কবিতাটি। প্রথম সংখ্যার সেই অনবদ্য প্রথম কবিতাটির জন্যই পত্রিকাটি সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।' প্রায় চল্লিশ বছর আগে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শঙ্খর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন সুনীল, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাতেই 'কৃত্তিবাসের একবছর' শীর্ষক একটি রচনায়[৬] : কৃত্তিবাসের পাতায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি শঙ্খ ঘোষ। তার কারণ তিনি প্রথম পাঠেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই দৃষ্টি ক্রমে মুগ্ধতায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটাকে আমি তার গুণ বলব না—কেননা সেটা তাঁর শব্দের সঙ্গে গভীর সখ্যের ফল। শব্দকে তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন—এই শক্তি তাঁর আছে, কিন্তু এই তাঁর একমাত্র শক্তি কেন হবে? তাই তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে যে মুগ্ধতা—কবিতা শেষ হলে তা পরিণত হয় দুঃখে। যে কথা তিনি বলতে শুরু করলেন, তাই নিয়ে তিনি বিস্তর তান বিস্তার করলেন, কিন্তু দুঃখ পুনরায় সঞ্চারীতে ফিরে এলেন না। তাঁর ভাষাতেই বলি—'যে কথাটা বলব সেটা ...... হয়না কিছু।' তবুও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত দিনগুলি রাতগুলি শুধু তরুণ কবিদের নয়—বাংলা কবিতার এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। শঙ্খ ঘোষের অপর কৃতিত্ব এই যে তিনি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অক্লান্ত এবং আমার মতো তাঁর অনুরাগী পাঠকরা গতিপথের প্রতি উৎকণ্ঠায় চেয়ে আছে।'

'কৃত্তিবাস'-এর প্রথম দুটি সংখ্যার প্রথমতম কবি হিসেবেই শুধু নয়, তদানীন্তন তরুণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই কবির খ্যাতি বহুভাবে প্রসারিত করবার বাসনাতেই হয়ত দীপক মজুমদার উৎসাহিত হন শঙ্খর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করতে। আবু সয়ীদ আইয়ুব-কৃত নির্বাচন অবলম্বন করে শঙ্খর কাব্যগ্রন্থ মুদ্রণের কাজও শুরু হয়ে যায় দীপকের একক তত্ত্বাবধানে। তৃতীয় সংখ্যার চতুর্থ প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় : 'একদিকে / লোকজীবনের প্রতি সহমর্মিতায় / ও লৌকিক কাব্য-রীতির সাঙ্গীকরণে / অন্যদিকে সুখ-দুঃখ-ভালোবাসায় বিচিত্র ব্যক্তি জীবনের / রসস্নিগ্ধ চিত্ররচনায় / তরুণকবি শঙ্খ ঘোষ / অল্পকালের মধ্যেই / আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন / শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলায় / কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় /

দ্বিধাহীন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন / শঙ্খ ঘোষের জীবনবোধদীপ্ত কবিতাকে / সাময়িক পত্রপত্রিকায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে / কৃত্তিবাস প্রকাশনীর দ্বিতীয় পরিবেশন রূপে।

অন্য অনেকের মতো শঙ্খও এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই নিজের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের খবরটি প্রথম জানতে পারেন। কেননা, 'কৃত্তিবাস'-এর অধীনে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারটি দীপক সম্পূর্ণ নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। আইয়ুব-এর নির্বাচন অনুসরণ করে গ্রন্থটির মুদ্রণ কাজও শুরু হয়ে যায়, কিন্তু অচিরকালের মধ্যে দীপক তাঁর স্বভাব অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন 'কৃত্তিবাস' থেকে। সে-সময় সুনীল সম্পূর্ণ নিজস্ব দায়দায়িত্বে পত্রিকার হাল ধরেন, যেহেতু দীপক-এর এই উদ্যোগ বিষয়ে তাঁর অনবধান, গ্রন্থটির ভবিষ্যৎ বিষয়েও তাঁকে বিব্রত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই স্থগিত হয়ে যায়। কেন 'কৃত্তিবাস' থেকে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সুনীল দীর্ঘ একটি চিঠিতে শঙ্খকে অবহিত করান। এইসময় শঙ্খ-র এক কলেজের সহপাঠী কমল রায় নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁর কবিতার বইটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রকাশ করতে চান। এম-এ পাস করার পর বঙ্গবাসী কলেজে মাত্র দু-মাস পড়িয়ে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর কলেজে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানেও মাস পাঁচেক পড়িয়ে বহরমপুর কলেজে তখন পড়াচ্ছেন। একদিন কলেজ থেকে কলকাতায় এসে, বন্ধুরা তাঁর হাতে তুলে দিলেন তাঁর কবিতার বইটি : 'দিনগুলি রাতগুলি' (প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ / আশ্বিন ১৩৬৩)। পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য কৃত সুদৃশ্য প্রচ্ছদ শোভিত, উত্তম কাগজ, বিন্যাস ও মুদ্রণ রুচিসম্মত,—বইটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুমহল তাঁর কবিকৃতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

'কৃত্তিবাস' সপ্তম সংকলন থেকে একটি নতুন পদক্ষেপ নিলেন সম্পাদক, সমকালীনদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁদের এক-একজনকে অবলম্বন করে, এক-এক সংখ্যায় একটি করে নিবন্ধ প্রকাশ করা হবে। এই পরিকল্পনায় প্রথমে 'আলোক সরকারের কবিতা' শিরোনামে অস্বাক্ষরিত নিবন্ধটি লিখলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অষ্টম সংকলনে এই অভিপ্রায়ে উৎপলকুমার বসু লিখলেন তরুণতর কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভাবান কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর বিষয়ে। নবম সংকলনে [১৩৬৪ বঙ্গাব্দ] অলোকরঞ্জন অবলম্বন করলেন কবি শঙ্খ ঘোষকে। আর এ ঘটনাও উল্লেখ করতে হয়, নবম সংকলনেই প্রকাশিত হল চমকপ্রদ একটি সংবাদ : 'কৃত্তিবাস কবিতার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া আবশ্যক মনে করে। কৃত্তিবাসের সামর্থ্য কম—তবে প্রত্যেক সংখ্যায় অন্তত: একজন কবিকেও রচনার জন্য পনের টাকার সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হবে। এ সংখ্যায় শঙ্খ ঘোষ।' জীবনের এই রোমাঞ্চকর প্রথম পুরস্কারটি সংগ্রহ করেছিলেন নগদ মূল্যে নয়,

পরবর্তীকালে সম্পাদক সুনীল পুরকায়স্থ শঙ্খকে জানিয়ে দিলেন, এই অর্থমূল্যে সিগনেট প্রেস থেকে তিনি তাঁর পছন্দমত বই যেন সংগ্রহ করে নেন। শঙ্খ যথারীতি এই অর্থমূল্যে সংগ্রহ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু অনূদিত 'কালিদাসের মেঘদূত', সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'কুলায় ও কালপুরুষ' ও 'স্বগত' এই তিনটি বই, যা তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হিসেবেই এখনো মনে করেন তিনি, কেননা পরবর্তী অনেক নামীদামি পুরস্কারের চেয়ে তার মূল্য নগণ্য নয়।

'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় তাঁর কাব্যগ্রন্থটি সামনে রেখে, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা' শীর্ষক বিস্তারিত আলোচনার প্রারম্ভে অলোকরঞ্জন কবির সংক্ষিপ্ততম পরিচিতি জ্ঞাপন করলেন: 'শঙ্খ ঘোষ—জন্ম ১৯৩২। বর্তমানে কলকাতার সিটি কলেজে বঙ্গভাষার অধ্যাপক। ছদ্মনাম ব্যবহার করেন—বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি' কিছুকালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৯৫৭-এর ফেব্রুয়ারিতে শঙ্খ সিটি কলেজে যোগদান করেন। শঙ্খ ঘোষের কাব্যগ্রন্থটি সামনে রেখে, ভূমিকায় উত্তর-রবীন্দ্র কাব্যধারার বিবর্তনের প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বাঙালি-কবিদের নাম ঘোষণা করা হলো। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার যে তিনজন নিয়ন্ত্রীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় বলে উল্লেখ করলেন অলোকরঞ্জন, তাঁরা হলেন আলোক সরকার, শঙ্খ ঘোষ ও অরবিন্দ গুহ। এঁদের পিছনে রবীন্দ্রনাথ, কল্লোল যুগ ও উত্তর-কল্লোল কবিতার তিনটি যুগ। সম্ভবত এই তিনটি পর্বের যুক্তস্বর বা combination-tone এঁদের প্রত্যেককেই স্বকীয় জীবনদর্শনে আবিষ্কৃত হবার পথে প্রস্তুত করে দিয়েছে। বিষ্ণু দের উচ্চারণ-ভঙ্গির সঙ্গে শঙ্খর সহমর্মিতা কত গাঢ় সে কথা উল্লেখ করে লিখলেন: 'বক্তব্যের দিক থেকে, এই স্তর পার হতে গিয়ে তিনি আত্মগত এবং সমাজগত, আপনকথা ও সম্মেলক কণ্ঠধ্বনি—দুই মেরুতেই নিরন্তর যাওয়া আসা করেছেন। এ ব্যাপারে বিষ্ণু দের পরে তিনি অন্যতম স্মরণীয়। একদিকে 'খণ্ডিতা', অন্যদিকে 'যমুনাবতী', এ দুয়ের মধ্যে গুণগত ভেদরেখা টানতে যাওয়া ভুল। এই তফাৎ বড় জোর মাত্রাগত এবং 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কার' কবিতাটি তার উল্লেখযোগ্য সাক্ষী। কিন্তু 'দিনগুলি রাতগুলি'র কবি প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং নিজের কাছেই তাঁর সে প্রত্যাবর্তন।'

কয়েকমাস পরে 'পরিচয়' (২৮ : ৬ পৌষ ১৩৬৫) পত্রিকাতেও একটি সমালোচনা প্রকাশিত হল, লেখক সমকালীন আর এক তরুণ কবি সুরজিৎ দাশগুপ্ত। সুরজিৎ তাঁর আলোচনার সূচনায় সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রবণতার কথা উত্থাপন করে লিখলেন:

'নিন্দুকের মুখে আগুন দিয়ে আধুনিক কবিতার গুণগ্রাহীর সংখ্যা বিবর্ধমান এবং আধুনিক কবিদের রচনাবলী যে গঠন কৌশলে নিপুণ ও নিখুঁত, ভাব-

সত্ত্বে প্রাঞ্জল, সুসমঞ্জস ও অর্থবান, একথা আজ স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু তরুণ কবিদের লেখনীর উপরে যখন প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস কর্তাগিরি ফলায় তখন বলতেই হয় যে এঁরা তারুণ্য খুইয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এসব তরুণদের যদি একটি কাব্যসংকলন বের করা সম্ভব হয় তাহলে সৎ পাঠক মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করবেন যে এইসব রচনা আধেয় ও আধারে শোচনীয় রূপের পুনরুক্তি পরায়ণ। এগুলির পেছনে একই হিসাবী, বিচক্ষণ ও ভীরু মনের সক্রিয়তা নিদারুণ, কবিতাগুলি যদিও লেখা হয়েছে বিভিন্ন লেখনীতে তো বটেই, এমন কি বিভিন্ন কবির দ্বারা।'

পরবর্তী অনুচ্ছেদেই সুরজিৎ লিখলেন :

'এইরূপ পরিস্থিতিতে শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' প্রকাশ সবিশেষ উৎসাহ উদ্দীপক। কারণ মুষ্টিমেয় যে-কজন তরুণ কবি কোনো মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চাইতে নিজের বিশিষ্ট অনুভূতিকে কাব্যে রূপদানে আগ্রহী শঙ্খ ঘোষ তাঁদের অন্যতম। একথা সত্যি যে অনুপ্রাসের প্রতুলতায় ছন্দের হিল্লোল, চিত্রকলার বৈচিত্র্যে যেমন তাঁর শিল্পচেতনা মুক্তি খোঁজে তেমনই চাঞ্চল্য ও উচ্ছ্বাসের দ্বারাও তিনি কখনো কখনো আক্রান্ত হন। কিন্তু নতুন পথ সন্ধানের উৎসাহ যদি তাঁর তরুণ চিত্তকে মধ্যে মধ্যে সত্যি অতিক্রমে প্ররোচিত করে থাকে তবে তা সহ্য করে নেওয়াই সমীচীন।'

প্রেমই যে প্রধান প্রসঙ্গ শঙ্খর কবিতায়, এবং সেই পুরাতন প্রেম, সে কথা উল্লেখ করলেন সুরজিৎ। এমন-কি 'বড়ো কল্পনা বড়ো ভাবনা'র অনুপস্থিতি সত্ত্বেও শঙ্খর কবিতায় তাঁর অকৃত্রিম অনুভূতিগুলি যে বাস্তবের সঙ্গে সাবলীলভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে, প্রশংসাসূচক ভাবে সে প্রসঙ্গও উত্থাপন করে তিনি লিখলেন : 'বাস্তবের অব্যর্থ সংসর্গে কবি চিত্তে যে প্রতিক্রিয়া জাগে শঙ্খ ঘোষ সেটাকেই কাব্যে রূপদানে সচেষ্ট।' অবধারিত ভাবে 'যমুনাবতী'র কথাও উচ্চারিত হল : 'সামাজিক সংকটকে উপলক্ষ্য করে কবিতাকে কতদূর অনবদ্য করা যায় এটি তারই এক অনন্য নমুনা।' গোটা কবিতাই উদ্ধৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেও স্থানাভাববশে তার খণ্ড উদ্ধৃতিও প্রকাশ করেননি লেখক, কবিতাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল তাঁর। প্রাচীন ছড়ার ছন্দ ও রূপকল্পকে পুরোপুরি বজায় রেখে কী অসাধারণ মুনশিয়ানায় কবিতাটি উত্তীর্ণ হয়েছে সে কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখলেন : 'আমাদের খুব চেনা কথাগুলির মধ্যে এসেছে অসাধারণ তেজ। পাঠকের ঠিক বুকের মধ্যে গিয়ে ধাক্কা মারে।' এতৎসত্ত্বেও সমালোচনার শেষাংশে কিছুটা অতৃপ্তির কথা ঘোষণা করে সুরজিৎ লিখলেন : 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা আজকাল পত্রপত্রিকাতে বিশেষ দেখতে পাইনে। জানিনে কোন গূঢ় সাধনাতে

তিনি মগ্ন। এই একটি গ্রন্থেই তিনি নিজেকে জাত কবি প্রমাণ করেছেন। সুতরাং তাঁর সাম্প্রতিক নীরবতা নিশ্চয় সাময়িক।'

১৯৫৫-এর মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত বছর চারেকের সময়বৃত্তে শঙ্খ ঘোষ-এর কাব্যচর্চা প্রায় বন্ধ ছিল, ঈষৎ একটি দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া। আসলে 'দিনগুলি রাতগুলি'র পরে, বন্ধু মহলে এবং আধুনিক কাব্যরসিক মহলে গ্রন্থটির কিছুটা সমাদর সত্ত্বেও, কবি স্বয়ং এই কাব্যগ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারছিলেন না। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের যে কাব্যাদর্শ বা এসথেটিকস্, ততদিনে সেটা তাঁর ভালো লাগছে না আর। সমসাময়িক বন্ধুদের রচনাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না, যদিও এই কালপর্বে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় তাঁর দু-একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ 'কৃত্তিবাস' ছিল সবসময় অনিয়মিত, ফলে চাহিদা অনুযায়ী দু-একটি লেখা তাতে যোগান দেওয়াও অসম্ভব হতো না। অন্যরকম ভাবে লিখতে হবে—এই চিন্তায় লেখা থামিয়ে রাখতে হচ্ছে তাঁকে এই ক'বছর, আর তারপর ধীরে ধীরে অন্য ধারায় প্রবাহিত হলো স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর পরবর্তী পর্বের কবিতা—'নিহিত পাতাল ছায়া'র কবিতাগুলি সেই নতুন বাঁকের নমুনা।

এই নতুন বাঁকের দিকে অগ্রগমনের কালে সংশয়ের যে দোলাচল তার কবি-চিত্তে নীরব প্রশ্ন বাজিয়ে দিয়েছিল, তারও কিছু প্রভাব চিহ্ন হয়ত পাওয়া সম্ভব তাঁর তদানীন্তন কাব্যচর্চায়। 'কৃত্তিবাস'-এর অষ্টম সংকলনে (২৫ বৈশাখ ১৩৬৪) প্রকাশিত 'কোন ভাষায়' কবিতাটির দিকে এই উপলক্ষ্যে একবার তাকানো যেতে পারে:

> কিন্তু বলবে কোন ভাষায়? না এই পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া কথা তোমার ঠোঁটে ধরো
> না—সেই তোমার ঠোঁটে, যাকে আমি দেখেছিলাম মলিন, মেঘের মতো ঝিমিয়ে
> থাকতে, কিংবা উথলে উঠতে ঝড়ের রাতের ঝঞ্ঝার মতো উন্মত্ত ভালোবাসায়, না
> —তোমার সেই ঠোঁটে তুলে নিয়ো না কত কত জন্মের ঐ ব্যবহৃত ভাষা, জীর্ণ, উচ্ছিষ্ট।

লেখা বন্ধ থাকলেও, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ডাক এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর সেদিনের কাব্যচর্চায় 'কৃত্তিবাস'-এর সূচনাকালের ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে পরবর্তীকালে এক নাতিদীর্ঘ স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন[৭]: 'হিসেববন্ধন ও স্বকীয়তার বাইরে থেকে কৃত্তিবাস তখন ডাক দিয়েছিল সমস্ত তরুণকে। আমারও জুটল ডাক। এরপর অতি দীর্ঘকাল জুড়ে এই পত্রিকার অবাধ প্রশ্রয়ও পেয়েছি আমি, এতটাই যা পাবার হয়তো অধিকার ছিল না আমার। আর এরই মধ্য দিয়ে প্রাথমিক ভীরুতা একদিন পৌছল এসে ভালবাসায়।' অথচ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার কেন্দ্রীয় চরিত্র যাঁরা, আলগা ধরনের জীবনযাপনের কুখ্যাতি নিয়ে 'সুসামাজিকদের

কোলাহলময় নিন্দে'র ভেতর যাঁরা অভ্যস্ত—তাঁদের সঙ্গে শঙ্খের ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় সামান্য কোন মিল খোঁজা অসম্ভব। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন[৮], 'তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠাবান, সাবধানী এবং মনুষ্যোচিত বহুগুণসম্পন্ন মানুষ' এই শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খ কোনো হৈ-চৈ-এর মধ্যে না থেকেও 'কৃত্তিবাসী'দের সঙ্গেই আত্মীয়তা অনুভব করেন বেশি, যদিও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়[৯] 'মত্তপানশালায় তো কল্পনাতীত, কফি হাউসের নিরীহ আড্ডাতেও তাঁকে দেখা যেত কদাচিৎ...... সেই কৃত্তিবাসের আমল থেকেই শঙ্খ ঘোষ খানিকটা দূরের মানুষ, অথচ খুব কাছের কবি। তিনি একাকী ও অনন্ত, অথচ সকলের প্রিয় কবি।' তাঁর বিদেশবাসের এহেন শঙ্খকে প্রত্যক্ষ করে, পল এঙ্গেল তাই বিস্ময়কৌতুক মেশানো উচ্চারণে পরিচয় শুরু করেছিলেন : 'এ ম্যান ফ্রম ক্যালকাটা ডাজ্ নট্ ড্রিঙ্ক?'

নিজের কবিতার পালাবদল আর কলকাতায় নতুন আস্তানার সন্ধান, এক অন্বেষণের বিন্দুতে তখন কম্পমান। স্মরণ করা যেতে পারে সমকালের অন্য আর একটি কাব্যপত্রিকা 'শতভিষা'য় আমন্ত্রিত হয়েছেন অনেক বিলম্বে এবং মাত্র দুবার কবিতা লিখেছেন তিনি ওই পত্রিকায়। 'শতভিষা' পত্রিকায় তাঁর 'ঘর' নামের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, হয়তো 'কৃত্তিবাস'-এর দ্বাদশ সংখ্যায় (১৩৬৬) সেই অন্বেষার গোপন উৎসার থেকেই ভাষা পেয়েছিল আরও একটি রচনা যেটির শিরোনাম 'বাড়ি' এবং প্রথম পংক্তি : বাড়ি তো পেয়েছি আমি বহুদিন / মনে মনে— / বাড়ি চাই বাহির ভুবনে।' হয়তো এই কবিতাটি প্রকাশের আগে-পরে তার অজ্ঞাতবাস পর্বে ধাক্কা দিয়েছিল সমকালীন তরুণ সম্পাদক বন্ধুর আন্তরিক আহ্বান, যা তাৎপর্যময় মনে করেছিলেন তিনি পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে। তখন নিজের লেখায় বিরক্ত লাগছে বলে কিছুদিনের মতো কবিতা ছাপানো বন্ধ রেখেছেন। এই অনুপস্থিতির অভ্যাসে বন্ধুরাও আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাচ্ছেন, 'কবিতা তাহলে লিখছ না আর?' এরকম একটা সময়ে, সবেমাত্র ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে নতুন আস্তানায় যখন তাঁর অধিষ্ঠানের সুযোগ হয়েছে, হঠাৎ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর পোস্টকার্ড পেলেন[১০] : 'শুনেছি আপনি বাড়ি পেয়ে গেছেন। এখন তো আর কোনো অসুবিধে নেই, এবার তাহলে কবিতার দিকে মন দিন।' 'লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায়, কিছুটা বা বিস্ময়ে' তার মনটা কেঁপে উঠেছিল এই শব্দগুলি দেখে। এই মুহূর্তে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার পাঠকরা হয়তো স্মরণ করতে পারবেন, একবিংশ সংকলনে (১৯৬৫) 'এই সংখ্যার লেখক' শিরোনামে যে কবি পরিচিতি প্রকাশিত হতো, তাতে শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল : আজকাল প্রায়ই বলছেন, উনি হয়তো আর কবিতা লিখবেন না। সুতরাং অনুরাগী পাঠকরা ১১৭/২ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলকাতা ৩৭ এই

ঠিকানায় ওঁকে চিঠি লিখে বিরত করুন। কিন্তু দেখা করতে যাবেন না। খুব লাজুক প্রকৃতির মানুষ।'

তাঁর এই লাজুকতার গুণেই তিনি যা কিছু প্রকাশ্য বিষয়েই যেন দূরবর্তী থাকতে ভালবাসেন, প্রথমাবধি একটা আড়াল তৈরি করে নিজেকে অনেক কিছু থেকেই সরিয়ে রাখতে চান তিনি। কবিতা নিয়ে কোনো কোলাহল কিংবা সমাবেশ, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই সেসব থেকে দূরে থেকেছেন চিরদিন, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত সেই বিশাল মাপের প্রথম কবি সম্মেলনে তরুণদের সঙ্গে শঙ্খও আমন্ত্রিত ছিলেন কবিতা পাঠের জন্য। অতবড় একটা সভায় কবিতা পাঠের সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি, যেজন্য কবিতা পড়া সম্ভব নয় জেনেও উপস্থিত হয়েছিলেন নামকরা সব কবিদের কাছ থেকে দেখতে পাবেন বলে। মঞ্চের থেকে সামান্য দূরে এক দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিলেন কবিতা পাঠ, অদূরে মঞ্চে উপবিষ্ট সুভাষ মুখোপাধ্যায় চোখের ইশারায় শঙ্খকে কাছে ডেকে নিতে চাইছিলেন। শঙ্খ সে ইশারা দেখেও দেখেননি, এমন ভান করে দাঁড়িয়েছিলেন কিছুটা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। ইশারায় কাজ না হওয়ায় মঞ্চ থেকে সুভাষ নেমে এলেন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য, অমনি তিনি হারিয়ে যেতে চান ভিড়ের মধ্যে, তাই খুব দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পেছনের রাস্তায় চলে এসেছেন। ততক্ষণে সুভাষ প্রায় নাছোড় দ্রুততায় তাঁকে অনুসরণ করে পেছনে-পেছনে ধরবার জন্য ছুটছেন এবং নাম ধরে ডাকছেন। শেষ পর্যন্ত শঙ্খকে ধরা সম্ভব হয়নি সেদিন।

এমনই আরও একবার ওই বছরের শেষের দিকে, ডিসেম্বর নাগাদ, আরও একটা কাণ্ড ঘটল, ইডেনে যুব উৎসবের কবিতা পাঠের আয়োজনে। সুভাষ সে সভায় অনেক বুঝিয়ে শঙ্খকে রাজি করাবার চেষ্টা করেছিলেন কবিতা পড়বার জন্য, এবং যথাসময়ে না অন্তর্ধান ঘটে সেজন্য এক হাতে ধরেও রেখেছেন শঙ্খর এক হাত। সিনেটের দু-দিনের অনুষ্ঠানের তুলনায় ইডেনের সভায় কবিদের সংখ্যাও প্রচুর। শঙ্খর আগে কবিতা পড়বেন পূর্ণেন্দু পত্রী, তিনি একটি ছোট্ট কবিতা নির্বাচন করে নিয়েছেন। পূর্ণেন্দুর পূর্ববর্তী কবি পাঠ করে চলে আসার পর অকস্মাৎ মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি কাজী আবদুল ওদুদ মশাই একটি ঘোষণা করলেন : পরের কবিকে ডাকবার আগে আমার একটি কথা বলার আছে। আজকের সভায় কবিদের সংখ্যা অনেক, সকলকে কবিতা পাঠের সুযোগ দিতে হলে সময় কুলোন প্রায় অসম্ভব, যেজন্য পরবর্তী কবিদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যদি তাঁদের কবিতার শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু পাঠ করেন তাহলে ভালো হয়। এই ঘোষণা শোনার পর মনে হল এখুনি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটবে, কেননা পরবর্তী কবি পূর্ণেন্দু হয়তো মঞ্চে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করবেন। পূর্ণেন্দু

মঞ্চে প্রবেশ করলেন, গম্ভীরভাবে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে খুঁজে নিলেন হস্তধৃত কাব্যগ্রন্থের একটি চারপৃষ্ঠা ব্যাপী কবিতা। পূর্বেন্দুর কবিতা পাঠ শুরু হতেই হাত ধরে থাকা, এক অস্বস্তিভরা সুভাষের মুখের দিকে তাকালেন শঙ্খ এবং প্রশ্ন করলেন : 'সুভাষদা, এর পরেও কি আর কবিতা পড়ার জন্য বলবেন আমাকে ?' না, আর সত্যিই প্রয়োজন নেই, এই মনোভাব নিয়েই সভার বাইরে বেরিয়ে এলেন দুজনেই।

এর কয়েকবছর পরে ১৯৬৬ সেপ্টেম্বর নাগাদ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার উদ্যোগে যে কবিতাপাঠের আয়োজন হয় ওভারটুন হলে, সেখানে কবিতা পড়েছিলেন শঙ্খ। হয়তো এর পূর্বে মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে কবিতা পড়েন—সম্ভবত সেই প্রায় প্রকাশ্যভাবে কোনো কবিতা পাঠের আসরে তাঁর যোগদান। এমনকি ওই একই বছরে, বহরমপুরের এক অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছিলেন—শক্তি, সুনীল, অমিতাভ, অলোক, মোহিত প্রভৃতি কবি বন্ধুদের সঙ্গে—যাঁদের কেউ কেউ 'কৃত্তিবাসে'র কালাপাহাড়ী কর্মকাণ্ডে খুবই পরিচিতি পেয়েছিলেন। সে সভায় মনীশ ঘটকও কবিতা পড়েছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক, তাঁর সমকালীন অনেকের মতো সবরকম কবিতাপাঠের আসর মানেই তাঁর উপস্থিতি পাওয়া যাবে, এরকম আর ভাবেন না তাঁর অনুরাগীরা।

'জানি তুমি কোথাও যেতে চাও না, যেতে চাইলেও কথা বলতে চাওনা, কথা বলতে চাইলেও কবিতা পড়তে চাও না, কবিতা পড়তে চাইলেও…' এরকম একটা অদ্ভুত পরিচয় দিয়েছিলেন পল এঙ্গেল, টেলিফোনে শঙ্খকে—শঙ্খরই সম্পর্কে।[১৮] কিন্তু এর অনেকটা সত্যি হলেও সম্পূর্ণটা সত্য নয়—কেননা আপাত-লাজুক শঙ্খকে বাইরের থেকে যাঁরা দেখেন, তাঁরা হয়তো জানেন আলাপ-চারিতায় তাঁর মুখর প্রকৃতি। তত্ত্ব আর তথ্যের প্রসঙ্গে তাঁর অফুরন্ত আগ্রহের কথা। সম্পূর্ণ নিজস্ব জগৎ বলে একটা কিছু হয়তো আছে তাঁর, কিন্তু সেই জগৎটার বাইরে যা কিছু, তার দিকেও তাঁর উন্মুখর জিজ্ঞাসা, যেজন্য সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর কোনো কিছুকে তিনি অবজ্ঞা করতে পারেন না, বরং অকপটে স্বীকার করেন[১৯]। 'হাংরি বা বামপন্থী বা 'অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত' অনেক তরুণ কবির প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, একইসঙ্গে সমান উন্মুখতায় আমি বুঝতে চাই এদের সকলেরই লেখা, পছন্দও করি অনেককে।' এই অপার আগ্রহের গুণেই শঙ্খ ঘোষ শুধু লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের একজন অন্যতম গৌরবজনক লেখক নন, পাঠকও। আর এই গৌরবের আসন থেকেই লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন কখনো-কখনো যে তাঁর অন্য ভাবনার রচনাকে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়নি, সে তথ্যও তাঁর সাহিত্য-জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল একবার শঙ্খ ঘোষের পরিচয়-দান প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের এই জোরের দিকটি উল্লেখ করে লিখেছিলেন 'অমৃত'

পত্রিকায় (২৯ এপ্রিল ১৯৭৭): 'কিন্তু এই নয় যে রাষ্ট্রীক ব্যবস্থার অচলতার বিরুদ্ধে কয়েকটি তীক্ষ্ণধার কবিতা আর টানা আটবছর লেখা ছেড়ে দিতে পারার কবি-চরিত্রটাই শঙ্খ ঘোষের একমাত্র উপার্জন। যেখানে সমসাময়িক অন্যান্য লেখকরা হয়তো আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার তাগিদে আর রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন না, সেই সময়ের সেই দেশেই তাঁদের একজন সতীর্থের ভূমিকায় শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রবর্গ প্রায় প্রবাদতুল্য ও জনপরিচিত। এই অর্থে, সব থেকে বড়ো ঝুঁকি নিয়েও শঙ্খ ঘোষ এ পর্যন্ত তাঁর কবিতায় সফল রয়েছেন—তাঁর কবিতার খ্যাতি আমাদের জীবনযাপনের সর্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে।'

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় যখন যে কোনো রচনাই মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে সরকারী ছাড়পত্রের জন্য পাঠাতে হত, সে-রকম সময়ে হঠাৎ একদিন শোনা গেল, শারদীয় 'দেশ' ও 'আনন্দবাজারে'র জন্য আমন্ত্রিত হয়ে শঙ্খ যে লেখা দুটি পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি ছাপা যাচ্ছে না—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শুনে কোনো বন্ধু শঙ্খকে এই খবর জানান। এর পর, সাগরময় ঘোষের কাছে চিঠি লিখে খবরটির সত্যতা বিষয়ে জানতে চাইলেন শঙ্খ। সাগরময় জানান, ঘটনাটি সত্যি, সরকারী ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি। 'not to be printed' এই সরকারী ছাপ-সহ কবিতা দুটির প্রুফ কপি পাঠিয়ে দিয়ে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন শীঘ্রই দুটি নতুন কবিতা পাঠানোর জন্য। শঙ্খ উত্তরে লিখেছিলেন, তখনকার সব রচনাই যেহেতু একই সময় পরিধিতে রচিত, সেজন্য সেই কবিতাগুলির ক্ষেত্রেও নিশ্চয় একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে, আবার পাঠানো তাই নিরর্থক। 'দেশ' পত্রিকায় সে বছর কোনো রচনাই আর পাঠানো হয়নি।

একদিন 'লা পয়েজি'র সম্পাদক বার্ণিক রায় এসে একটি কবিতা চান। তাঁকে শঙ্খ জানান, ফেরত আসা দুটি কবিতার যে কোনো একটি তিনি ছাপাতে পারেন। কিন্তু শর্ত: কবিতাটি ছাপতে হবে সরকারি দপ্তরে না পাঠিয়ে, কোনো অনুমতি না নিয়ে, সম্পাদকীয় মনের জোরেই। বার্ণিক, 'রাধাচূড়া' কবিতাটি গ্রহণ করেন এবং সেটি মুদ্রিত হয়। 'সাহিত্যপত্র'তে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয়টি—'আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে'; অবশ্য ছাপার পরে কবিতা দুটি নিয়ে কোনো অস্বস্তিকর অবস্থা হয়নি।

পরের বছর (১৯৭৬) কলকাতার রাজভবনে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এক সন্ধ্যায়। শঙ্খরও আমন্ত্রণ ছিল সে সম্মেলনে। কিন্তু তিনি যাননি প্রতিবাদের চিহ্ন হিসাবে। অবশ্য অলোকরঞ্জন বলেছিলেন, যেতে হবে, এবং গিয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। সেই সভায় ইন্দিরা গান্ধীর প্রশ্ন ছিল: এখানকার সাহিত্যিকরা কোনো অসুবিধা বোধ করেন কিনা। জবাব হিসাবে অলোকরঞ্জন জানিয়েছিলেন: পশ্চিমবাংলার কবি-

সাহিত্যিকরা আজকাল নিজের পছন্দমতো লিখতে পারছেন না, তাঁদের লেখা সেনসর্ করা হচ্ছে। পাশে বসে ছিলেন সিদ্ধার্থশংকর, তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রধানমন্ত্রী সত্যি এরকম কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কি না। সিদ্ধার্থশংকর অবশ্য অস্বীকার করলেন এই অভিযোগ, বললেন : এর কোনো ভিত্তি নেই। তখন অলোকরঞ্জন জানালেন : পশ্চিমবঙ্গে আমার এক বন্ধুর রচনা সম্প্রতি সেনসর হয়েছে, শঙ্খর সাম্প্রতিক কবিতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার উদাহরণ দিয়ে, প্রমাণস্বরূপ 'দেশ' পত্রিকার থেকে ফেরত আসা প্রুফ কপিটি পাঠিয়ে দেন, যদিও শেষপর্যন্ত সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ-প্রাপ্তির ফল কী হয়েছিল তা জানা যায়নি।

'দেশ' পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যায় তাঁর কবিতা প্রথম ছাপা হয়। প্রকাশিত হওয়ার পর জানতে পারেন, কবিতাটি অনিল চক্রবর্তী দিয়ে এসেছিলেন 'দেশ'-এর দপ্তরে। এর পরে 'কলহপর', একবিংশ বর্ষের ছত্রিশতম সংখ্যায়। পূর্বোক্ত সময়সীমার পর, যখন তিনি নতুন করে আবার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকেন, তখন আবার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয়, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আগ্রহে। ১৯৬১ জানুয়ারি থেকে যখন ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে ছিলেন, একই রাস্তায় কয়েকটা বাড়ি পরে থাকতেন নীরেন্দ্রনাথ। আগে তাঁর সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় ছিল। প্রতিবেশী হওয়া সূত্রে এখানে সে-আলাপ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পৌঁছায়। সেই সময়ে তিনি একদিন কয়েকটা কবিতা চাইলেন, যাতে কবিতাগুলি পর পর 'দেশ'-এ ছাপতে পারেন। সেই মৌখিক আমন্ত্রণে তাঁকে কয়েকটি কবিতা দিয়েছিলেন। সেগুলি ছাপাও হয়। ৬১-৬২ সালেই পুজোসংখ্যা 'দেশ'-এ কবিতা লেখার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

এইসময়, এক অর্থে 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য ঘটনা—একটি গদ্যরচনা। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত একদিন সাগরময় ঘোষ-এর একটি প্রস্তাব জানান, বিগত একবছরের প্রকাশিত কবিতা অবলম্বন করে একটা প্রবন্ধ লিখুন শঙ্খ, 'দেশ' পত্রিকার জন্য। ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, শঙ্খ তাতে আমন্ত্রণ পেয়ে যোগদান করেন। শান্তিনিকেতনে তখন বসন্ত উৎসব চলছে, সেখানেও সাগরময় তাঁকে প্রস্তাবিত রচনাটির বিষয়ে তাগাদা দেন। ফিরে এসে, 'দুই বসন্তে' নামে একটি গদ্য লেখেন 'দেশ' পত্রিকায়। এইরকম শিরোনামের উদ্দেশ্য জানাননি রচনাটিতে, কিন্তু প্রবন্ধটির নামকরণের একটা অর্থও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বাংলা কবিতায় তিরিশের দশকে শুরু হয়েছিল এক বসন্ত, পঞ্চাশের কবিতায় দেখা দিয়েছে নতুন আর এক বসন্তকাল। আবার, এক বছরের কাব্যচর্চার সময়-সীমা নির্দিষ্ট করবার জন্য তিনি বিগত বসন্তকাল থেকে বর্তমান বসন্তকাল পর্যন্ত কালপর্বে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন আলোচনাটি। রচনাটিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং আলোক

সরকার প্রাধান্য পেয়েছিলেন। নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিশেষত শক্তি-সুনীলের মতো 'অবক্ষয়ী' কবিদের কেন প্রাধান্য দিয়েছেন আলোচ্য নিবন্ধে, তা নিয়ে অনেক গঞ্জনা শুরু হয়েছিল প্রকাশ্যে। 'দর্পণ' কাগজে এক পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনায় শঙ্খকে আক্রমণ করা হয়েছিল। এমন কি অলোকরঞ্জনও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। 'দেশ' পত্রিকায় পর পর কয়েক সংখ্যা জুড়ে বিতর্কের একটা ঢেউ উঠেছিল সে সময়।

চিন-ভারত সংঘর্ষের সময় কমিউনিস্ট-বিরোধী একটা প্রচার গড়ে উঠেছিল 'দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শিরোনামে এক-একটি সংখ্যায় অনেক লেখক বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের মতামত লিখছিলেন—এমনকি প্রগতিপন্থী লেখক হিসেবে পরিচিত যাঁরা, তাঁরাও। 'দেশ' পত্রিকার এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে, শঙ্খ ও অলোকরঞ্জন নিজেদের মতামত প্রবন্ধাকারে লিখেছিলেন 'অয়ন্ত্রী' পত্রিকায়। এই ঘটনার পরে বেশ কিছুকাল 'দেশ' পত্রিকায় আর লেখেননি। পরবর্তীকালে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হলেও ১৯৮৪ সাল থেকে আবার 'দেশ' পত্রিকায় তিনি অনুপস্থিত।

অবশ্য একথা ঠিক, শঙ্খ যখন 'দেশ' পত্রিকায় লেখেন, তার আগেই কবিতা পাঠক মহলে তাঁর একটা পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। যেজন্য কোনো পর্যায়েই তাঁর কবিখ্যাতির জন্য 'দেশ' পত্রিকার উপর নির্ভর করতে হয়নি। শুরু থেকেই তিনি যেসব ছোট পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিলেন, তাতে সেগুলির গুরুত্ব অনেক। 'অগ্রণী', 'ক্রান্তি', 'পরিচয়', 'কৃত্তিবাস', 'যাত্রী', 'পাণ্ডুলিপি', 'কবিপত্র' কিংবা 'জলার্কের' মত পত্রিকার পরিমণ্ডলেই তাঁর স্ফুরণ, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়েছিল। ষাটের সূচনা তাঁর কবিতার নতুন বাঁক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পাঠক মহলে সবিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল, এই সময় 'সম্প্রতি' নামের ছোট পত্রিকার সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় একটি অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কবিদের নিজস্বতার নিরিখ যাচাই করবার জন্য, কবিতার সঙ্গে কবির নাম সংযুক্ত না করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। শঙ্খ ঘোষ এই কবিতা গুচ্ছের অন্যতম কবি হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন—সেই কবিতায় তাঁর 'নিহিত পাতাল ছায়া'র সময়-পরিধির মূল সুর উপস্থিত ছিল।

প্রায় এগারো বছরের ব্যবধানে, 'এখন সময় নয়' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, আর এক মাসের মধ্যেই সেই পুস্তিকাটি সংযুক্ত করে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'নিহিত পাতাল ছায়া'র প্রকাশ। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলি, তাঁর কাব্য-প্রবাহে নতুন ধারা বহন করে এনেছিল, ভাব, ভাষা এবং ব্যঞ্জনায় কবিতাগুলির স্বাদ তদানীন্তন কবিতাচর্চায় নতুনতর সংবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। পংক্তির পরিমাপে কবিতাগুলি শুধু ছোটো নয়, কাব্যগ্রন্থটির আকারও ছোটো, কিন্তু

কবিতাগুলির বিন্যাস, গ্রন্থসজ্জাতেও অভিনবত্বের পরিচয়। এই সময়, একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল, 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় তাঁর দুটি কবিতার প্রকাশ নিয়ে। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, তখন নতুন করে 'সাহিত্যপত্র' সম্পাদনার ভার নিয়েছেন, এই উপলক্ষ্যে পত্রিকার নতুন কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করা হয়। ১৩৭২ সনের শারদীয় সংখ্যায় 'দুটি ছোট কবিতা' শিরোনামে একপাতায় দুটি কবিতা ছাপা হয়, একটি 'ইহাদের করো আশীর্বাদ' অন্যটি 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগ'। একদিন নৈহাটির এক বন্ধু এসে প্রদ্যুম্নকে রহস্যচ্ছলে জানালেন এক বিপত্তির কথা, শেষোক্ত চার লাইনের কবিতাটি পাঠ করে ক্রুদ্ধ এক গ্রাহক বার্ষিক চাঁদা ফেরত নিতে চান, কেননা কবিতা নিয়ে এই ধরনের ছেলেখেলা তাঁর পছন্দ নয়; কবিতার সত্যিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এইসব কাব্যচর্চার আয়োজনে। 'সাহিত্যপত্রে'র পরবর্তী সংখ্যায় (পৌষ ১৩৭২) অবশ্য শঙ্খ লিখেছিলেন, আরো দুটি কবিতা 'উদাসীনা', 'নষ্ট'। 'সাহিত্যপত্র' বিশেষ সংখ্যাতেই (১৩৭৩) জানা গেল, শঙ্খর নবতম কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশ সংবাদ।

'নিহিত পাতাল ছায়া' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পাঁচ মাস পরে, 'এক আকস্মিক আহ্বানে' আমেরিকার আয়ওয়া চলে যান, 'পোয়েট্রি ওয়ার্কশপ' নামে আন্তর্জাতিক এক সাহিত্য-কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে। পরবর্তী বছরে জুন মাসে, পৃথিবীর নানা প্রান্তের লেখকগণের মিলনমেলা ভাঙার পর দেশে ফিরে আসেন। আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই বিশালমাপের আয়োজনে তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল 'অচেল নিষ্কর্মণ্যতা'। নির্দিষ্ট কিছু করনীয় ছিল না, 'কেবল শিল্পের স্বাধীনতা ভোগ' করাও তাঁর কাছে পীড়াদায়ক, সবমিলিয়ে একটা ঘরকাতুরে মনোভাবের মধ্যেও সহপাঠী বন্ধু অশ্রুকুমার সিকদারকে জানিয়ে দিলেন[১৩] আয়ওয়ার গ্রন্থাগারে নবাবিষ্কৃত স্পেনীয় ভাষায় লেখা একটি বইএর খবর; 'Tagore on Las Barrancas de San Isidro', লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। মাস ছয়েক পরে, দেশে ফিরে এলে, এই বইটির যে অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে 'সুনীলকুমার নন্দী সম্পাদিত 'অনুক্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা তার রবীন্দ্রচর্চার একটি শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। এই পত্রে, অশ্রুকুমারকে তিনি তার কাব্যগ্রন্থ 'নিহিত পাতাল ছায়া'র প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নিজের অভাব জানিয়েছিলেন: এ পর্যন্ত ঠিক যে শব্দ বিষয়ে 'দিনগুলি রাতগুলি'র তুলনায়, এ বইতে অনেক ভেবেছি, অনেক বেশি চেষ্টা করেছি বাচালতা বর্জনের। মাত্রাযোজনা এবং চলতিবুলি আর শালীন প্রয়োগের সমন্বয়—এদুটো ব্যাপারই আমার বিশেষ অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল। তার কিছুটা ও কবিতায় ধরা পড়েছে জেনে খুব ভরসা হচ্ছে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমি জানিনা ঝাপসা হয়ে আসছে কিনা কবিতা। কেন যে মিষ্টিক বলে তার নিছক স্নেহহীন বলে পরিচয় হচ্ছে আমার কবিতার ঠিক বুঝতে পারছি না।

এই কথা লেখার সময় হয়ত তাঁর মনে ছিল, বিগত বর্ষে আয়ওয়া যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তাঁর কবিতার মিষ্টির আবেদন নিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকার উদ্বৎ আলোচনা শুরু হয়েছিল ভিন্নতর ভাবে—'পরিবর্জনে নয় পরিগ্রহণে' শীর্ষক নিবন্ধে মিষ্টি-সিমন্ত্র-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শঙ্খ ঘোষের নাম উচ্চারিত হয়েছিল। 'পরিচয়' পত্রিকায় (আগস্ট ১৯৬৭) পরবর্তী একটি সংখ্যায় সুতপা ভট্টাচার্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তারও একটা উত্তর নিয়ে অরুণ সেন 'সাহিত্যপত্রে' প্রকাশিত 'ইহাদের করো আশীর্বাদ' আর 'রাঙা মামিমার গৃহত্যাগ' কবিতা দুটির উল্লেখ করে লিখেছিলেন : 'যেন অলক্ষিতে ছায়ার মতো একটা অশরীরী রহস্যময়, অস্পষ্ট জগতের ছবি ফুটে উঠেছে, অন্তত আমার মতো সাধারণ পাঠকের কাছে।' একথাও স্মরণ করা দরকার 'অলিন্দ পত্রিকায় অলোকরঞ্জন, তাঁর কাব্যগ্রন্থের, আলোচনার শিরোনাম দিয়েছিলেন "স্বনিকেত মানুষ ও মানুষের কবিতা', সে আলোচনার সূচনায় তিনি লিখেছিলেন : 'শঙ্খ ঘোষ এই মুহূর্তে বাংলাদেশের পারমার্থিক কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রণী'।

ইতিমধ্যে তাঁর বিদেশবাস কালেই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে পত্রপত্রিকায় বেশ কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হলে, শঙ্খ ঘোষের কবি-কৃতিত্ব প্রসঙ্গে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হলো পাঠক মহলে। সম্ভবত প্রথমতম আলোচনাটি প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় (মার্চ ১৯৬৮, ফাল্গুন ১৩৭৪); 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা' শিরোনামে হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন : 'নানা জায়গায় ছড়ানো কিছু কবিতা পড়ে আমি শঙ্খ ঘোষের কবিতা সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়েছিলাম। এখন এক সঙ্গে 'নিহিত পাতাল ছায়া'র কবিতাগুলি পেয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে তিনি একেবারে নিজস্ব ধরনে, একজন বড় কবি—তাঁর কবিতা একটি পরিণত গভীর ও সংযত মনের প্রকাশ। এত ছোটো-ছোটো কবিতায় বা এত মন্থণতার মধ্যমে যিনি এতটা তীব্রতা প্রকাশ করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই বড়ো শিল্পী। কিন্তু এও আমার মনে হয়েছে যে শঙ্খ ঘোষের শৈলীর সংযম ও স্বরের আপাতমৃদুতা তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কিছু ভুল বোঝার কারণ হবে। লেখাগুলিতে যে কতখানি জোর লুকনো রয়েছে তা হয়তো এই চাপা গলা ও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত শব্দরাজী ও মধ্যবিত্ত শ্লীলতার জন্য কারু-কারু চোখে নাও পড়তে পারে।'

স্মরণ করা যেতে পারে বছর খানেক আগে 'সাহিত্যপত্র'-য় (১৩৭৪) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার পঁচিশ বছর' শীর্ষক একটি রচনায়, পঞ্চাশের কবিদের প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পারস্পরিক প্রভেদের উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন : 'প্রথম জন পরিমার্জিত, মৃদুকণ্ঠ কিন্তু স্বভাবী। যে-গুণের জন্য তাঁর সীমাবদ্ধতা তিনি অতিক্রম করেন তা হলো এই অন্তর্লীন শক্তি।' শুধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় নয়, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে

বিগত পাঁচ বছর জুড়ে যে নতুন রীতির কাব্য প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, শঙ্খ ঘোষের কাব্যচর্চায় তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, যদিও তখন পর্যন্ত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গেই তাঁর সংযোগ অবিচ্ছিন্ন। ষোড়শ সংকলনের পর থেকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রতিটি সংখ্যাতে তিনি হয়তো উপস্থিত নেই, কিন্তু 'কৃত্তিবাসী'দের প্রকাণ্ড কর্মকাণ্ডে সবসময় সংযুক্ত না থেকেও, তিনি তাঁদের একজন বলে ভেবে এসেছেন। পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে, সমকালীন বাংলা কবিতার প্রধান আবহ থেকে শঙ্খ ঘোষের ভাবনার ও ভাষার বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন : 'সম্প্রতি বাংলা কবিতা এক ধরনের আত্মসচেতন যৌনতা, নিচুতলার শব্দ ও চিত্রকল্প ও একধরণের বিদেশী কবিতার ভাবের দ্বারা আক্রান্ত।'

মাস চারেকের ব্যবধানে, 'সারস্বত' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫) কাব্যগ্রন্থটির সমালোচনা লিখলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। প্রণবেন্দু, শঙ্খর কাব্যকৃতির বিস্তারিত প্রশংসা করে আলোচনার এক জায়গায় লিখলেন . 'বাংলা কবিতার যে ধারাটি সম্প্রতি জনপ্রিয় হয়েছে, তাতে সংযত, অস্ফুটকণ্ঠ কবিতার বিশেষ অবদান নেই ; যে অল্প কিছু কবিতালেখক এই রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে কবিতা-চর্চা করে চলেছেন ও এখনো টিকে আছেন, তাঁদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ সর্বাগ্রগণ্য ও সবচেয়ে খ্যাতিমান।' কাছাকাছি সময়ের মধ্যে আরো দুটি আলোচনাও উল্লেখযোগ্য 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় (চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫), অন্তত্র আর একজন কবির একটি কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে একত্রে আলোচিত হলেন, 'নিহিত পাতাল ছায়া'র কবি ; রচনাটির লেখক অলোকরঞ্জন—তিনি লিখলেন 'অলিন্দ' পত্রিকায় (যুগ্ম সংকলন ১৩৭৪-৭৫)। আর, পঞ্চম আলোচনাটি নিঃসন্দেহে সব থেকে অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ, 'সারস্বত, পত্রিকায় (শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৫) মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, 'একটি কবিতা-বই আলোচনা প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধ, ইতিপূর্বে প্রকাশিত পূর্বোক্ত চারজনের সমালোচনা সামনে রেখেই তাঁর নিজস্ব ভাবনাকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। মৃণাল, আলোচ্য রচনাটির সূচনাতেই সমকালীন বাংলা কবিতার প্রতি একটা নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন, 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা পার্সনালিটির অধিকারী হতে পারছে না'—তা সত্ত্বেও তিনি লিখলেন . 'কেবল একটিমাত্র সাম্প্রতিক কবিতা-বইয়ে গভীর পার্সনালিটি আমার চোখে পড়েছে, বইটি শঙ্খ ঘোষের 'নিহিত পাতাল ছায়া'। সুখের কথা বইটি আজকাল অনেকেরই রচনাযোগের বিষয় হয়েছে। যাঁরা বইটি আলোচনা করেছেন, সকলেই বইটিকে যথোচিত শ্রদ্ধা-সংকারে এবং আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়েছেন। তবে আলোচনা গুলিকে আমার সর্বাংশে মাস্ত মনে হয়নি, নানা কারণে।' দীর্ঘ রচনাটিতে তিনি পূর্ববর্তী আলোচকদের সঙ্গে কোথায়-কোথায় ঐকমত্য পোষণ করতে দ্বিধা

পোষণ করেন, সে সব বিস্তারিত বলেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর মনে হয়েছে 'হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সচেষ্ট এবং আন্তরিক।'

হিমানী তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনার উপসংহারে লিখেছিলেন : 'শঙ্খ ঘোষের মনের ও আত্মিকের পরিণতি বোঝার ও মেপে দেখার জন্য প্রথম বইটিকেও ভুললে চলবে না, আর ভোলা চলবে না নানা সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত ছন্দ-বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলি।'

ষাটের দশকের সূচনায় কয়েকটি ছন্দ বিষয়ক রচনা ছোট কাগজে প্রকাশিত হলে তাঁর গদ্য-রচনার প্রতিও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এবং ক্রমান্বয়ে, তাঁর কবিতার মতো গদ্য রচনাগুলিও জনপ্রিয় হতে থাকে। ১৯৫০ সাল নাগাদ তাঁর গদ্য রচনার সূত্রপাত ঘটে, সরোজকুমার রায়চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য পত্র 'বর্তমান'-এর মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতাকে কেমন দেখেন তদানীন্তন তরুণরা তারই একটা পর্বভিত্তিক পর্যালোচনার আয়োজন করা হয় আলোচ্য পত্রিকাটিতে। সুশীলকুমার নন্দীর মাধ্যমে, 'বর্তমান'-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী শঙ্খ ও 'হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রঙ্গলাল' শীর্ষক অংশটি লেখেন, তখন তিনি স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র। সম্ভবত এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ। এরপর ১৯৫৭ সালে বিভূতি চৌধুরী সম্পাদিত একটি ছাত্র পাঠ্য রচনা সংকলনের জন্য 'পথের পাচালি' অবলম্বনে একটি রচনা লেখেন, তিনি তখন সদ্য সিটি কলেজে যোগদান করেছেন, সংকলনটির উল্লেখযোগ্যতার একটি দিক হল, উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রত্যেক অধ্যাপকই লিখেছিলেন। একথা ঠিক, এই রচনাটি পাঠ করলে, শঙ্খ ঘোষ-এর বর্তমান গদ্যরীতির সঙ্গে প্রভূত পার্থক্য লক্ষ্য পড়বে। কিন্তু সেই সময়ে, তাঁর চিন্তা চেতনার যে প্রকাশ আলোচ্য নিবন্ধটিতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, নিজস্বতার গুণেই তা আজও আদৃত হওয়ার যোগ্য। একদিক থেকে অধ্যাপনা বৃত্তির মধ্যে থেকেও, নিছকই ছাত্র-তোষণ গদ্য রচনার প্রবণতা তিনি প্রথম থেকেই সরিয়ে রেখেছিলেন। সম্ভবত তাঁর বৈশিষ্ট্যের দিকটিও সহজে চোখে পড়ার মতো, নিজে কবি হয়েও—নিজের গদ্যচর্চার পরিধি শুধু কবিতা বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন নি। পূর্ববর্তী যুগের প্রতি তাঁর যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনোযোগ, সমকালকেও তিনি সমান আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করে চলেছেন। 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর 'রাজা' অবলম্বনে 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় (১৯৬৪) নাট্য সমালোচনায় তাঁর নিজস্বতা মণ্ডিত নিপুণ আলোচনা, 'বহুরূপী' পত্রিকায় পরবর্তী বর্ষে রবীন্দ্র নাটকের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়েই হয়তো তাঁর অন্তরের আলোচনার সূত্রপাত। এবং পরবর্তীকালে বাংলা নাট্য বিষয়ে তাঁর অনুধ্যানের পরিচয় দেখতে পাবো, বিভিন্ন সময়ে, প্রায় তিরিশ বছর ধরে। এই সেদিনও সত্য ভাদুড়ী সম্পাদিত 'ম্যাস' পত্রিকায় (১৯৯৩) যখন তিনি রবীন্দ্রনাথ আর শম্ভু মিত্রর নাট্যচর্চার আলোচনায়, পাঠকের

মনে নতুন ভাবনা সঞ্চার করে তোলেন, তখন মনে হয় একালের নাট্য আলোচনায় তাঁর অধিকার অবিসংবাদিতভাবে নতুন। এরকম, রবীন্দ্র সংগীত বিষয়েও তাঁর যে কবিত্ব মণ্ডিত বিশ্লেষণ—সেখানেও তাঁর এক অন্তরঙ্গ পরিচয় আমাদের চেতনার জগতকে সমৃদ্ধ করে। আলোচনার পদ্ধতিও যে বিষয়কে অবলম্বন করে বারবার বদলে যেতে থাকে, একই আলোচকের হাতে তাঁর আলোচনা-সমালোচনা নিবন্ধগুলি অনুসরণ করলে বোঝা যায়। ইদানীংকালে সংলাপ-সজ্জিত তাঁর যে বক্তব্য প্রকাশের প্রচেষ্টা, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে তার অনন্যবাদ অনস্বীকার্য। আর 'কৃত্তিবাস' বা দৈনিক কবিতা', 'কবিতা পরিচয়' কিংবা 'কলকাতা', 'সম্প্রতি', 'অন্তর', 'অন্ধযুগ', 'ক্ষুধার্ত', 'কৌরব', 'প্রমা', 'বিভাব', 'এক্ষণ', বা 'অনুষ্টুপ', 'অনুক্ত', যেখানেই লিখুন না কেন, যাই লিখুন না কেন, বিষয় ভাবনা এবং বক্তব্যের গুরুত্বে অসাধারণ আকর্ষণ গড়ে তোলেন ; এমন কি নিছকই তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নিয়ে কোনো স্মারক পত্রিকায় যখন তাঁর লেখা পড়ার সুযোগ ঘটে, তখন রচনাটির পরিসর যত ছোটই হোক না, যত ছোট পত্রিকাই সেসব রচনার বাহন হোক না কেন—শুধু ক্ষণকালীন আগ্রহের মধ্যেই সেসব রচনার আয়ু শেষ হয়ে যায় না। সুখপাঠ্য গদ্য অথচ তথ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাময় অনুরাগ, কোনো সময় ভাষার কাঠিন্যে পাঠকের কাছে বাধা হয়ে ওঠেনি, যেজন্য ছোট পত্রিকার পক্ষেও সেসব রচনার ভার বহন করতে অসুবিধে হয়নি। প্রচার-স্বল্প ছোট পত্রিকার প্রতি এই তাঁর যে অকুণ্ঠ অবলম্বন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, তাঁর কাব্যচর্চার সূচনার কাল থেকেই বেশ কয়েক দিন বাদ দিয়ে, ষাটের দশকের শেষ থেকে প্রায় প্রত্যেক বছরই যে কবিতার অথবা গদ্যের বই প্রকাশিত হয়ে চলেছে—তার প্রায় সব রচনাই প্রাথমিক প্রকাশবাহন এই (১৯৮২) অজস্র ছোট পত্রিকা। 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' এর ব্যতিক্রম। কেননা সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থ হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে এই একটিই। একই সঙ্গে কবি এবং প্রাবন্ধিক হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছেন, অথচ প্রাতিষ্ঠানিক পত্র পত্রিকা ও বিত্তবান বহুল প্রচার প্রকাশনের পুরোপুরি সমর্থন ও সহযোগ গ্রহণ না করেই ; সব মিলিয়ে বাঙালি কবিদের মধ্যে এমন উদাহরণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

তাঁর পাঠকের কাছে নিজের কবিতার মিস্টিক-পরিচয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আয়ওয়া থেকে লিখেছিলেন বন্ধু অশ্রুকুমারকে, যদি লিখতে পারেন কবিতা ভবিষ্যতে তাহলে এরপর ভেবে এগোতে হবে এবং একথাও লিখেছিলেন [৫] : 'আর যে পারব লিখতে, এমন তো প্রত্যয় হয়না।' আসলে, 'নিহিত পাতাল ছায়া'র মিতকথন, কিছুটা আত্মগত একাকিত্বের অনুভব থেকে তাঁকে আবার রাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখব আমরা। যেন অকস্মাৎ একটা ধাক্কায় আবার তাঁর পথ বদলে যাবে, হয়তো বিদেশ যাত্রার পূর্বেই সেই পর্বের সূত্রপাত ঘটেছিল

'না বলা সব কথা'র স্রোত নিয়ে। হয়তো 'বাংলা কবিতা'র সম্পাদক শান্তি লাহিড়ীর উপর্যুপরি তাগাদায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত একটা বড় কবিতাও লিখতে হলো, যেন 'নিহিত পাতাল ছায়া'র কাব্যগুলোর পাশে কিছুটা সংগতিহীন, প্রায় শ'খানেক লাইনের সদ্য রচিত কবিতাটির নাম 'জাবাল ও সত্যকাম'। আর বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, জলপাইগুড়ির প্রাকৃতিক বন্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই কবিতাটি একই সঙ্গে দুটি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল, কিংবা পরপর, 'অলিন্দ' (সপ্তম সংখ্যা ১৩৭৪-৭৫) এবং 'বাংলা কবিতা'য় (১৩৭৫)। আর যে পারব লিখতে'র সংশয় ছিন্ন করেই, তাঁকে কাব্যজগতে আবার ভেসে উঠতে দেখা যাবে প্রকাশ্যে, 'সারস্বত' পত্রিকার 'জলস্রোত কবিতাগুচ্ছ' কিংবা 'একণের আরুণি উদ্দালক'-এ। এরও কিছুদিন পরে, তাঁর কবিতার আরও গূঢ়তর বাঁক, 'আমাদের অন্ধ ইতিহাসের পাতায়, মুক্তিপথের সংগ্রামী কিশোর যুবকদের কাহিনীর অবিশ্বাস্য নৃশংসতার মুখোমুখি হয়ে'।

সত্তরের পরবর্তী সময়ে, আর থামা নয়—অবিরাম যাওয়া, 'অবিশ্রাম পা তোলা পা ফেলার' মধ্যে তাঁর এই অনিঃশেষ পথপরিক্রমা। আর চলমান সেই যাত্রার আনুপূর্বিক পদচিহ্ন ধরে রেখেছে, এখনও বাংলা ভাষার খ্যাত-অখ্যাত অসংখ্য ছোট পত্রিকা; বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়[১৬] সাহস, নিষ্ঠা, গতির একমুখিতা নিয়ে — সময়ের সেবা না-করে সময়কে সৃষ্টির চেষ্টা করে গিয়েছে।

উৎস নির্দেশিকা

১ 'পা তোলা পা ফেলা', কবিতার মুহূর্ত / শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী মাঘ ১৩৯৩, পৃ ১৩-১৬।

২ "'কবিতা' ও সেযুগের লেখকসমাজ', সুধীর রায়চৌধুরী, দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯১, পৃ ১২৩-২৪।

৩ দ্র. 'কবিতা' সংকলন ২ / মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত, প্যাপিরাস ১ বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ ১৩১-৩২।

৪ 'পাঁচ বছরের কবিতা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যমেলা / স. ক্ষিতীশ রায় বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আষাঢ় ১৮৭২ শকাব্দ, পৃ ১২৩-১৩৬।

৫ কৃত্তিবাস সংকলন ১ / স. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্যাপিরাস ১৩৯১ বৈশাখ ২৫, পৃ ৭।

৬ তদেব, পৃ ৬২।

৭ 'পা তোলা পা ফেলা', শঙ্খ ঘোষ, তদেব, পৃ ১৬।
৮ 'ডাক নাম থেকে নামডাক', শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, মাঝি ১৩৯৯, পৃ [৮]।
৯ 'প্রিয় কবি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মাঝি ১৩৯৯, পৃ [১]।
১০ 'চন্দন কাঠের বোতাম', শঙ্খ ঘোষ, মহাদিগন্ত ১২ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, মার্চ ১৯৮১, পৃ ১২৮।
১১ ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম / শঙ্খ ঘোষ, প্রতিক্ষণ ১৯৮৬, পৃ ১৩১।
১২ 'সাক্ষাৎকার : শঙ্খ ঘোষ', অরুণেশ ঘোষ, ক্ষুধার্ত ৬, নভেম্বর, ১৯৮১, পৃ ১৪।
১৩ 'বন্ধুকে শঙ্খ ঘোষ : চিঠির টুকরো', অশ্রুকুমার সিকদার, কলমের ফ্রন্ট চতুর্দশ বার্ষিক সংকলন ১৯৯৩, পৃ ৮।
১৪ সম্প্রতি ড. অলক রায় আমাকে কথা প্রসঙ্গে জানান আলোচ্য রচনাটি পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।
১৫ 'বন্ধুকে শঙ্খ ঘোষ : চিঠির টুকরো ; তদেব পৃ ৮।
১৬ 'সাহিত্যপত্র', বুদ্ধদেব বসু, দেশ ২০ : ২৮, ২৬ বৈশাখ ১৩৬০।

একটি ভিন্নতর রচনার প্রয়োজনে বেশ কিছুকাল ধরে শঙ্খ ঘোষ আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। অত্যন্ত আন্তরিক প্রশ্রয়ে তারও কিছু কিছু ব্যবহার করতে হয়েছে নিরুপায় হয়ে আলোচ্য নিবন্ধে।

দেবব্রত পাণ্ডা

ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার ও শঙ্খ ঘোষ

অতি-আধুনিক বাংলা কবিতার মর্মোদ্ধার সাধারণের কম্মো নয়। কবিতা-পাঠের আসরে এক-আধবার উঁকিঝুঁকি মেরে বুঝেছি, সে-কবিতা হজম করতে পরিপাক-শক্তির জোর লাগে যথেষ্ট। পাঠের শেষে কোন বিচার-বিশ্লেষণ নয়, বোদ্ধারা ঘাড়-মাথা দুলিয়ে 'বেশ বেশ, চমৎকার চমৎকার' বলতে বলতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। সেই ফাঁকে 'বুঝিলাম না'হি বুঝিলাম, জয় তব জয়' গোছের স্বগতোক্তি ক'রে কেটে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। তবু যে কবিতার বই ছাপানোর কাজে একবার জড়িয়ে পড়েছিলাম তার কারণ, সে বইয়ে ছিল এমন কতকগুলি কবিতার বাংলা রূপান্তর যা সাধারণের জন্যে লেখা হলেও আমাদের অভিজ্ঞতার নিরিখে এক অর্থে অসাধারণ। কবিতা ও গানের এই সঙ্কলনটিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না নিছক বুদ্ধি ও বাকচাতুর্যের লেখা। জীবন, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের ধ্বনিতে মুখর এ কবিতাগুচ্ছ জনতার মুক্তিসংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ এক কবির হৃদয়ের নির্যাস। ভাষান্তরে কবিতাগুলি যে রীতিমত চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব প্রাপ্য শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষের। 'ঐতিহ্যের বিস্তার'-এ প্রয়াসী এই কবির অনুবাদকর্মের ভূমিকা সম্পর্কে দু-চার কথা বলার জন্যে এ লেখা।

চেরাবাণ্ডারাজুর 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার'[১] এর অনুবাদ প্রসঙ্গে এ আলোচনা। ১৯৭৯-৮০ সালের কথা। রাজু তখন ব্রেন-টিউমারে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসার সাহায্যের জন্যে কত মানুষের তৎপরতা দেখেছি তখন। 'চারণদল' একটি নাটক মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্রসদনে। বহুজনশ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গদা ও তাঁর 'মাস সিঙ্গার্স' গোষ্ঠী গান গাইলেন এ অনুষ্ঠানে। পাশাপাশি চেষ্টা চলল যত দ্রুত সম্ভব রাজুর কয়েকটি কবিতা ও গানের একটি অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের। প্রস্তাব পাঠাতে সোৎসাহে কিছু ইংরেজি তর্জমা পাঠালেন কে ভি আর—অনুবাদ তাঁর, ওয়ারাওয়ারাও এবং জগমোহনের। তখনো অনুবাদকের টীকা সম্বলিত 'Sword Song—Selected poems of Cherabandaraju' বেরোয় নি।[২] তথ্য হাতের কাছে প্রায় কিছুই নেই। কোন্ বিশেষ পটভূমিতে লেখা তা-ও আমাদের অজ্ঞাত। রচনাকাল সম্পর্কিত সামান্য কিছু তথ্যমাত্র সম্বল। তারপর বাড়তি জ্যাসাদ, অনুবাদ মূলানুগ হচ্ছে কি-না দেখা। এটুকুই মাত্র জানা ছিল, 'দিগম্বর'

পর্বের রচনা বাদে রাজুর কবিতামাত্রই গীতিধর্মী। তেলাঙ্গানা অঞ্চলের লোকধারায় প্রচলিত বহু গানের সুরে তিনি কথা সাজিয়ে দিচ্ছিলেন 'বিপ্লসম' পর্বটিতে। কিন্তু ওইসব গানের সুরের সঙ্গেও বা আমাদের পরিচয় কতটুকু? এ-অবস্থায় অনুবাদককে স্বাধীনতা নিতেই হবে, ইংরেজি বয়ানের অনুসারী হয়ে বাংলায় কবিতা দাঁড় করাতে হবে।

কীভাবে হবে সেই কাজ? অনুবাদের দায়িত্ব কি দেওয়া হবে একজনকে, না কি বেশ ক'জনকে ভাগ ক'রে? সাংগঠনিক চৌহদ্দিতে একটি তালিকা তৈরি হলো, কয়েকজনের অনুবাদও এসে গেল হাতে। তখনি তো সমস্যা হলো, অনূদিত পংক্তিগুলিতে কবিতার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে কি-না, সেটি স্থির করবেন কে? এরকম ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সামাধানসূত্র খুঁজে বের করা শক্ত। যোগ্যতম ব্যক্তিকে ঘিরেও প্রশ্ন ওঠে, এটাই বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদীমহলে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। অনুমোদনের অপেক্ষায় না থেকে আমার অগ্রজতুল্য সহকর্মী অচিন্ত্যপ্রিয় ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হলাম। শঙ্খদার সহযোগিতা ও নির্দেশনা যাতে নিশ্চিতভাবে জোটে সেবিষয়ে প্রয়োজনীয় গৌরচন্দ্রিকা ক'রে নেবার দায়িত্ব পড়ল তাঁর ওপর। শঙ্খদা রাজি হলেন, কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে? সাহিত্যের জগতে দুই স্বনামধন্য ব্যক্তি প্রশ্ন তুললেন, বিপ্লবী কবিতার অনুবাদে শঙ্খ ঘোষের এক্তিয়ার কতটুকু? তাঁরা দুজনেই আমার শ্রদ্ধাভাজন, শঙ্খ ঘোষও তাঁদের অনুজপ্রতিম। রীতিমত অস্বস্তির ব্যাপার। সিদ্ধান্ত একটা নিতেই হয়। ঠিক করলাম, এ জাতীয় সমালোচনা নির্ঘাত ভুল ভাবনা থেকেই উঠছে; যাঁরা বলছেন বিরূপ কথা, ভুল তাঁদের ভাঙবে একদিন না একদিন। এসব কথায় আমল দিলে চলবে না। শঙ্খদার কানে অবশ্য পৌঁছে গিয়েছিল এ খবর। মুখের স্বাভাবিক হাসিটা মিলিয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু তাই ব'লে তিনি কি আর আহত হ'ননি আদৌ? কাজেও অসুবিধে ঘটেছে। প্রথমটায় অন্যের লেখায় কলম চালাতে ইতস্তত করেছেন অনেকখানি। একটা নমুনা দিই। একটি স্তবক মূল অনুবাদক রেখেছিলেন :

'মাংস এবং মদের ফোয়ারায়
অসাড় ঘুমে যখন জমিদার
তখন রাখাল স্রোতের মুখে ভাসে
বিস্মরণে নিজের পরিবার।'

অনুবাদে হাত দেওয়া কতখানি সমীচীন হবে ভেবে ইতস্তত করে শঙ্খ ঘোষ শুধরে লিখলেন :

'মাংস এবং মদের শেষে যখন
ঘুমের নেশায় ঢুলছে জমিদার

তখন রাখাল স্রোতের মুখে ভাসে
বৌছেলেকে মনেও নেই তার।'

এরকম অল্পস্বল্প রিফু ক'রে অনুবাদগুচ্ছ হাতে দিয়ে বললেন, 'নিয়ে যান, মোটামুটি ঠিকই আছে।' নাছোড়বান্দা না হয়ে আমার উপায় ছিল না। অনেক জায়গাতেই কেমন বিদ্‌ঘুটে ঠেকছিল। সসঙ্কোচে বললাম, এগুলো-ও বরং আপনি-ই অনুবাদ করে দিন।'

একটু চিন্তান্বিত মনে হলো। বললেন, 'আচ্ছা 'রেখে যান।' স্পষ্ট বোঝা গেল, দায়িত্ব সচেতন শঙ্খ ঘোষের ইতিকর্তব্য স্থির হয়ে গেছে। নিজের ভাষার সাহিত্যের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে যাঁর মন তৃপ্তি খুঁজে পায় না, অনুবাদের এ কাজটি তাঁকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতেই হবে। কেননা, তিনি যে বিশ্বাস করেন, 'অনুবাদের অভাবেই আমাদের সংলাপ বন্ধ, বন্ধ সব চেতনা'।

২

বেপরোয়া হওয়া দূরের কথা, অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ মাত্রাতিরিক্ত হিসেবি ও সাবধানী। এলিয়টের অনুবাদে বিষ্ণু দে যে অবাধ স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়েছেন, তার সমালোচনা প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন,

'…মূল কবিতা যদি সঙ্গেসঙ্গে পড়বেনই কেউ (বা, অনেকসময় বলা যায়, যদি পড়তে পারবেনই কেউ) তাহলে অনুবাদকবিতার আর তাৎপর্য রইল কোথায়? পাঠকের দিক থেকে ভাবলে, অনুবাদ তো একটা কবিতাকে নিজস্ব ভাবে পাবার স্বাদ, সে তো কেবল তুলনামূলক বিচারের বিষয় নয়।' অনুবাদে শঙ্খ ঘোষ যে আদর্শ প্রয়োগ করেন, তার আংশিক পরিচয় উদ্ধৃত বাক্য ক'টিতে পাওয়া যাবে। অনুবাদ কি তাহলে প্রতিরূপ না অনুরূপ, বা এ-দুয়ের মাঝামাঝি কোনো কিছু, তা নিয়ে আর সমস্যা থাকে না। অনুবাদকবিতায় যেমন কবিতার স্বাদ পাবেন পাঠক, তেমনি খুঁজে পাবেন, মূল কবিকেও। সেই অর্থে 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার'-এর অনুবাদকর্ম নিঃসন্দেহে সাফল্যের দাবি রাখে।[৩] ছেপে বেরুনোর দুমাসের মধ্যেই দু হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল, সাংগঠনিক নৈপুণ্যের দৌলতে নয়, অনুবাদের গুণে। এর আগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু বিপ্লবী তেলুগু রচনা বাংলায় বেরোয়নি, তা নয়। তবে অনেক সমঝদার পাঠকই বলেছেন, 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার'-এ 'বিরসম্'-এর কবিতার মেজাজ খুঁজে পাওয়া যায় অনায়াসে। আরো কিছু কবিতার অনুবাদ জড়ো করে এ সঙ্কলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের তাগাদা আজো আসে। বইটি যে কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এর থেকেই তার প্রমাণ পাই।

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নেবার পর শঙ্খ ঘোষ যখন একের পর এক কবিতাকে ঠিকঠাক ক'রে দাঁড় করালেন, দেখা গেল প্রথমে যিনি অনুবাদ করে-ছিলেন, তার তুলনায় সংশোধিত বয়ানটি আলাদা, একেবারে আলাদা স্বাদেরও। যে স্তবকটি একটু আগে উদ্ধৃত করেছি তার চূড়ান্ত রূপটি দেখুন :

'আয়েশভরে সাঙ্গ ক'রে মুরগি আর তাড়ি
নেশায় ঢুলে পড়ে যখন গাঁয়ের জমিদার
তখন জলে স্রোতের টানে রাখাল চলে ভেসে
ভেবেও তবু বৌছেলেকে মনে পড়ে না তার।'

(দেখো আকাশ চোখের জলে)

অনুবাদের দু-একটি নমুনা এবার পরখ করে দেখা যাক, অনুবাদ কতখানি সার্থক হয়েছে :

No more will be current your lies and tales,
White ants have destroyed all your morals
That old tumble-down chariot of yours
Cannot now move, 'it's broken and gone.

শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে দাঁড়াল :

'তোমাদের এই ধাপ্পা বাপু চলবে না তো আর
উই খেয়েছে কুরে তোমার মনোবলের সার!
থুবড়ে-পড়া হদ্দ বুড়ো ওই তোমাদের রথও
নড়তে চড়তে পারে না আর, চূর্ণ এবং গত।'

কিংবা 'গম্যম্' কবিতাটির অনুবাদের কথাই যদি ধরি, তাহলে দুই অনুবাদকের কাজে কত তফাত! স্থানাভাবে পুরো কবিতাটি উল্লেখ না ক'রে তার দুটি স্তবক বিচ্ছিন্নভাবে রাখছি পাশাপাশি। ইংরেজিতে রয়েছে :

...

Forlorn and alone
I am not
A starling awaiting the night
And paling in moonlight.

...

'Hunger—that's my name
Armed from head to foot I am,
Endless extension is my occupation

Movement is my very breath.
And our place—Revolution.

একজন এর অনুবাদ করেছেন :

'...
নিঃসঙ্গ একাকী—
আমি কোন তারা নই
রাত্রির আশায় যার—
যায় উন্মনা সময় ;
তারপর পাণ্ডুরতা, জ্যোৎস্নার আলোয় ॥
...
ক্ষুধা—নাম
মাথা থেকে পা পর্যন্ত অস্ত্রে সুসজ্জিত,
সীমাহীন-ব্যাপ্তি—কাজ,
আন্দোলনই আমার নিশ্বাস
আমার নিবাস…বিপ্লব, বিপ্লব ॥'

[সেতু সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত (১৯৮৫) 'চেরাবাণ্ডারাজু—ব্যক্তিত্ব ও কবিকৃতি' বই থেকে উদ্ধৃত, অনুবাদ কার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।]

এ অনুবাদে আক্ষরিকতা বজায় আছে, কিন্তু কবিতার স্বাদ পাওয়া গেল কি ? মিলিয়ে দেখুন—শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ :

'...
আমি নই সেই একাকী তারকা
রাত্রি প্রতীক্ষায়
চাঁদের সোনালি আলোয় যে শেষে
পাণ্ডুর হয়ে যায়।
...
মাথা থেকে পায়ে অস্ত্র-সাজানো
ক্ষুধাই আমার নাম
সীমাহীন শুধু ছড়িয়ে যাওয়ায়
আন্দোলনের শ্বাসের হাওয়ায়
বিপ্লবে পরিণাম।'

৩

এ তো গেল অনুবাদ প্রসঙ্গ। এবার সংকলনটির সম্পাদনা প্রসঙ্গে দু এক কথা বলা দরকার। সম্পাদনা করতে বসে অযথা কলম চালানো শঙ্খ ঘোষের স্বভাব বিরুদ্ধ। আলোচ্য সংকলনটিতে মণিভূষণ ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে একটিও শব্দের পরিবর্তন হয়নি। সমর সেনের অনুবাদে একটিমাত্র শব্দ পাল্টে দেওয়া হয়েছে এবং সমরবাবু সানন্দে তার অনুমোদনও করেছেন (এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি 'অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা'-য়)। তিনটি কবিতা প্রায় আগাপাশতলা পালটে গেছে সম্পাদনায়—কিংবা বলা যেতে পারে, অনুবাদ কবিতা একেবারে নতুন চেহারা পেয়েছে শঙ্খ ঘোষের কলমে। অথচ প্রথমে যাঁরা অনুবাদে হাত লাগিয়েছিলেন, তাঁদের নামই রইল অনুবাদক হিসেবে। বলেছিলাম, অসুবিধে কোথায়, অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ রাখলে? তার উত্তরে তক্ষুণি যা বলেছিলেন, তাতে সব যুক্তিই হার মেনে যায়—'দেখুন এঁরা সবাই তরুণ। কত যত্ন করে, চেষ্টা করেছেন দাঁড় করাতে। ওঁদের নামটাই থাক'। 'তথাস্তু' বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? এ তিনটি কবিতার সম্পাদনার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া যাক। 'আমাদের যেতে হবে' কবিতার শেষ তিনটি স্তবকের মূল অনুবাদ ছিল

'আমাদের ঘষে মেজে হতে হবে তীরের শাণিত ফলা
ছিলায় টান টান বেঁধে নেবো গরীবের যাবতীয় জ্বালা
শুধতে হবে সব সাথীদের রক্তের ঋণ ভাইয়ো
হেইয়ো হো হেইয়ো।

লাখ লাখ মানুষকে দিতে হবে খাবার পানীয়
পণ রেখে আমাদের সুখ-আহ্লাদ যাবতীয়
সেই প্রতিশ্রুতিতে এগোতে হবে যে ভাইয়ো
॥ হেইয়ো হো হেইয়ো ॥

আমাদের যেতে হবে বদলা নিতে
যাতে ক'রে এগোতে পারি দূর লক্ষ্য ছুঁতে
এখনের সব হতাশার মুহূর্ত দূরে ঠেলে দেব ভাইয়ো
॥ হেইয়ো হো হেইয়ো ॥'

সম্পাদনার পর স্তবক তিনটি দাঁড়াল

'গরিবের জীবনের জ্বালা আজ যতটুকু জানি
শাণিত তীরের মতো করে নিতে হবে সবখানি
তারপর জুড়ে নিতে হবে তাকে সটান ছিলায়
যেতে হবে ॥

পণ রেখে আমাদের নিজেদের সুখ যাবতীয়
লাখ লাখ মানুষকে দিতে হবে খাবার পানীয়
যেতে হবে ॥

আজ যা হতাশ করে সেইসব ঠেলে দিয়ে দূরে
আমাদের যেতে হবে বহু প্রতিশোধ বুকে পুরে
পৌঁছতে পারি যাতে আমাদের ঠিক পরিণামে
যেতে হবে ॥'

আগাগোড়া পুরো কবিতাটি ঠিক এইভাবে নতুন রূপ পেয়েছে। আরেকটি কবিতার মাঝখানের দুটি স্তবক নিচ্ছি। একজন অনুবাদ করলেন :

'মায়ের খোঁজে ব্যস্ত বাছুরগুলো
ডাকছে কেন ছুটছে এধার-ওধার
দেখে রাখাল এই কাঁদে এই হাসে
কেন যে তা নিজের কাছেই আঁধার।

বাজ পড়ল পিছু আলোর ঝলক
খাপখোলা এক তলোয়ারের দ্যুতি
চমকে বাছুর গর্তে পড়ে, দূরে
যেন দুভাগ হলো হ্রদের হৃদি'

শঙ্খ ঘোষ যেভাবে দাঁড় করালেন :

'মায়ের খোঁজে বাছুরদের ত্রস্ত ডাক শুনে
কেন যে মন আকুল হয় হাসিতে-কান্নায়।
কোথাও বুঝি পড়ল বাজ, বিদ্যুতের ফলা—
সদ্যোজাত বাছুর এক গর্তে ডুবে যায়।

এপার থেকে ওপার জুড়ে আকাশ যেন হঠাৎ
ঝলক দিয়ে উঠল কোন মুক্ত তলোয়ার

গাঁয়ের থেকে দূরের ওই হ্রদের বুকও যেন
দুভাগ হলো, ছড়িয়ে দিল জলের ধারা তার।'
(দেখো আকাশ চোখের জলে)

সম্পাদনার সুবাদে কিছু নতুন শব্দ এসে পড়েছে, ইংরেজি প্রতিরূপের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি থাকার প্রয়োজনে।

এবার একটি গানের অনুবাদের ওপর দৃষ্টি ফেরানো যাক। প্রথম চারটে লাইন মূল অনুবাদক রেখেছিলেন—

'ধর্মের মত নেই কোন বিষাক্ত আফিং।
আমরা জনগণ চাই না একমুহূর্তও আর এরকম
দিনযাপনের গ্লানি।
আমাদের দুর্দশার মূল ভাগ্য নয়।
জন্মচক্র, পূর্বজন্মের কর্মফল—এসব কথা শুধু
দুঃখযন্ত্রণার সেবা।'

পরবর্তী পংক্তিগুলিতে পুরো গানটাই বয়ে চলল এভাবে। আমরা পড়ছি যেন কোনো প্রবন্ধ। শঙ্খ ঘোষের কলমের ছোঁয়ায় এই গানটিকে পেলাম নবকলেবরে :

'ফাঁপা ধর্মের মতো আর কোনো বিষানো আফিম নেই
এক লহমাও আমরা কখনো চাইব না তার স্বাদ।

আমাদের যত দুর্দশা তার মূল তো ভাগ্যে নয়,
'কর্মফল' বা 'জন্মচক্র' ফন্দিবাজের ফাঁদ।'

পরপর স্তবকগুলিতে কোনো বাড়তি শব্দের আমদানি নেই, শুধু সম্পাদনার সময় নতুনভাবে বিন্যাস করা হলো একই কথার।

আবার কোনো ক্ষেত্রে সম্পাদনা করতে এক-আধটা পংক্তি পাল্টে দেওয়া হয়েছে, বাদবাকি অনুবাদের কোথাও হাত পড়েনি। যেমন 'লাল সেলাম' গানটিতে একজায়গায় রয়েছে

**The gallows are trembling, unable to take away
your brealh,
And this edifice can't stand after robbing
you of your breath.**

মূল অনুবাদক লিখলেন :

'ফাঁসীকাঠ কাঁপছে
তোমাদের নিশ্বাস বন্ধ করার ক্ষমতা ওর নেই

আর ফাঁসীর এই মঞ্চ
তোমাদের শ্বাসনালী আটকে দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।'

শঙ্খ ঘোষের সম্পাদনায় পংক্তিগুলিকে আমরা পাচ্ছি একেবারে সাবলীল গদ্যে

'ফাঁসীকাঠ কাঁপছে
তোমাদের নিশ্বাস রোধ করার ক্ষমতা ওর নেই
ফাঁসীর এই মঞ্চ
তোমাদের নিশ্বাস রোধ ক'রে টিঁকে থাকবে না আর।'

খুব অল্পসময়ে সারা হয়েছিল অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ। তাই বলে যত্নের ত্রুটি ছিল না। কে ভি আর-এর লেখা কবি-পরিচিতির উপর ভিত্তি ক'রে একটি পরিচয় বাঙলা গদ্যে লিখেছিলেন একজন সাহিত্যের শিক্ষক। কিন্তু গদ্য ঝরঝরে নয় আদৌ, অনেক জায়গায় কেমন আড়ষ্টতার ভাবও যেন। শঙ্খদাকে এবার আলাদা ক'রে বলতে হলো না কিছু। তাঁর অনবদ্য গদ্যে, এই সঙ্কলনের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় থাকে এমন এক গদ্যে তিনি কবি-পরিচিতিটিও লিখে দিলেন পুরোটাই। (ঠিক হলো যিনি পরিচিতি পেশ করেছিলেন প্রাথমিকভাবে বই-এর শুরুতে প্রকাশকের তরফে তাঁর সহায়তাদানের কথা স্বীকার করা হবে।)

এত কাজ সেরে—পুরো সম্পাদনা নয় শুধু, অন্যের নামে ছাপান লেখা আদ্যন্ত নিজেই লিখে দিয়ে শঙ্খ ঘোষ রয়ে গেলেন যবনিকার আড়ালে। মনোরঞ্জন বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে একদিন হানা দিয়েছিলাম শঙ্খদার বর্তমান নিবাসে। শীতের রাত, তখন ন'টা। কনকনে ঠাণ্ডা। ঘরের মেঝে দেখি জলে জলময়। মুখ তুলে তাকাতেই মৃদুভাষী শঙ্খ ঘোষ জানালেন, 'শক্তি এসেছিল'। চেয়ারে বসেছি সবে। এল প্লেটভর্তি মিষ্টি। হেসে বললেন, 'শক্তি এনেছিল।' ভালোই হলো, বললাম একটা আর্জি আছে। 'মধুর আবেদন', মনোরঞ্জনদা যোগ করলেন হেসে। শেষমেষ না-মঞ্জুর হলো সে আবেদন। শঙ্খ ঘোষ কিছুতেই সম্মত নন, তিনি যে সম্পাদনা করেছেন, বই-এ ছাপার অক্ষরে তার উল্লেখ থাকবে না। কিন্তু কেন? তাঁর এই অসম্মতিতে ধরা পড়ে যায় একটি গভীর সত্য, যে দিকে পেছন ফিরে রয়েছেন এদেশের সংগ্রামীরা।

॥ চার ॥

সংগ্রামীরা এদেশে আজ বহুধা বিভক্ত। এটাই এদেশের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনের একমাত্র সমস্যা নয়। সমস্যাটা আরো একজায়গায় মস্ত জট পাকিয়েছে সংগ্রামীদের উপলব্ধিতে একটা জায়গায় শূন্যতা রয়েছে মস্ত। জনতার মুক্তি-

সংগ্রামে গতিসঞ্চার করতে গেলে শুধু রাজনৈতিক মঞ্চে ঝড় তোলাটাই যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরের সংগ্রামকে বিকশিত করতে গেলে মানুষের ভাবনা-চিন্তার জগতেও আলোড়ন তুলতে হবে। অন্ধ গুরুভক্তি, কুসংস্কার এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন ব্যাপক দেশবাসীর চিন্তাভাবনা। তাদের সে পঙ্কিলতা থেকে টেনে বের করবেন মাত্র গুটিকয়েক মার্কসীয় চেতনাসম্পন্ন মানুষ? অসম্ভব। অসম্ভব আরো এই কারণে যে মার্কসবাদের প্রতি বিরূপতার বাতাবরণ তৈরি করেছে দেশ-বিদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদমাধ্যম এবং বিশেষ করে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় ভণ্ড মার্কসবাদীদের গণস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ। এদেশেও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সততা নিয়ে প্রশ্ন কম নেই মানুষের মনে। এ-অবস্থায় জনতার প্রতিবাদ দানা বাঁধানো সত্যিই কঠিন কাজ, প্রতিরোধ তো দূর অস্ত। সবচেয়ে বড় কথা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তো ব্যাপক সংখ্যক জনতার অংশগ্রহণ দরকার। তাকে সুনিশ্চিত করতে হলে সত্যিকারের সংগ্রামীদের সঙ্গে চাই শক্তিমান লেখক-শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী। তবে এই শক্তিমান লেখক-শিল্পীদের বেশিরভাগই আবার জনজীবনের সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন। তাঁদের মধ্যে দু-চার জনই মাত্র এগিয়ে আসবেন জনতার কাছাকাছি, এবং সেটা স্বাভাবিকও বটে। অথচ এ দুর্ভাগা দেশের সংগ্রামীরা বুঝি উন্নাসিক কিছুটা, অথবা লাজুক, হয়তো বা ভোগের কিছু মিথ্যা অহং-এর পীড়নে। নইলে শঙ্খ ঘোষেরা আজও দূরবর্তী হয়ে আছেন কেন?

সম্পাদনায় তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকার বিষয়টি ছাপার অক্ষরে না যায় যেন, এই কথাটার মধ্যে শঙ্খ ঘোষের সসঙ্কোচে ব্যবধান বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে ব'লে যদি কেউ ভাবেন, মস্ত ভুল হবে। তাঁদের অবগতির জন্যে দুটি কথা জানাই। এক, শঙ্খদা বললেন, 'সঙ্কলনটির প্রকাশক বিপ্লবী লেখক-শিল্পীদের একটি সংগঠন। এখানে ব্যক্তির ভূমিকা কি খুব বড় করে দেখা উচিত? আমিও তো কোনোদিন আপনাদের সঙ্গে পথ চলতে পারি।' দ্বিতীয় কথা, এ বই বেরিয়ে যাবার কিছুদিন পর বাড়ি থেকে নেমে আমাদের বাস ধরার জায়গা পর্যন্ত কথা বলতে বলতে এগিয়ে দিতে এলেন একদিন রাতের বেলায়। সঙ্গে অচিন্ত্যদা। শঙ্খদা আমায় বললেন, 'এরকম যদি কিছু মালায়ালাম, তেলুগু বা অন্যভাষার কবিতা এনে দিতে পারেন, অনুবাদ করার খুব ইচ্ছে আমার।'

তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা করা গেল না, কেন? মার্কসীয় চেতনার লেখক-শিল্পীদের সর্বভারতীয় যোগাযোগের মঞ্চও তৈরি হয়েছে। এ. আই. এল. আর. সি. বা অল ইণ্ডিয়া লীগ ফর রেভল্যুশনারি কালচার তার নাম। তবু বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের মধ্যে, লেখকদের মধ্যে নিবিড় যোগ গড়ে উঠতে

এখনো চের দেরি। এতে কি শিল্পসাহিত্যের আন্দোলন যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে না?

শঙ্খ ঘোষেরা তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন চুপচাপ? হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁদের সৃষ্টি পথ করে নেন। দায়িত্ববোধের তাড়নায় সংগ্রামী সাহিত্যের সীমাবদ্ধতাও তাঁরা খুঁজে বের করেন, তাকে অতিক্রম করতে চান। এ আই এল আর সি-র দ্বিতীয় সম্মেলনের কাছে পাঠানো বার্তায় শঙ্খ ঘোষের ক্রমবিকাশমান চিন্তার এ বিশেষ দিকটি নজরে পড়বে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বার্তাটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করাই সমীচীন।

'প্রতিরোধের জন্য, প্রতিবাদের জন্য সংগ্রামী যে লেখক-শিল্পীরা অবিরাম তাঁদের সৃষ্টিকে ব্যবহার করছেন, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রচনাকে প্রায় অস্ত্র ক'রে তুলেছেন, তাঁদের জন্য গৌরব বোধ করি। আমরা, যারা পুরোনো অভ্যাস আর সংস্কারের জাল ছিঁড়ে এখনো সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারিনি, ওইসব রচনার বা রচয়িতার সাহচর্য আমাদেরও অনেকটা পথ দেখায়, সাহায্য করে।

'তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ধরণের রচনার কিছু সীমাবদ্ধতাও যে অনুভব করি না তা নয়। আমাদের ভাষার একজন বিপ্লবী কবি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লিখেছিলেন অল্পদিন আগে: 'যোদ্ধার হৃদয় বলে কিছু নেই?' একটি ছবির ব্যবহার করেছিলেন তিনি, 'যেখানে সন্ধ্যাবাতি জ্বলে, শিশুকোলে / মানবী ছায়ার মতো—শীর্ণ প্রতীক্ষায়'…আর তারপর এই প্রশ্ন তুলেছিলেন আবার বন্দুকের নল ছাড়া তার চোখে আর কোনো স্বপ্ন নেই?'

'এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। আমাদের মধ্যে যাঁরা বিপ্লবী লেখক হতে চান, তাঁরা অনেকসময় ধরে নেন যে লেখার বিষয় হলো কেবলই কোনো-না-কোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রোধ এবং যুদ্ধঘোষণা। এমন কী ভালোবাসার কথা উঠলেও সেটা বলতে হবে একটু উচ্চকিত ভাষায়। নদী নয়, বন্যা চাই; ফুল নয়, বজ্র চাই; এই ধরনের কিছু কথা এলেই আমরা ধরে নিই যে সংগ্রামী জনগণের খুব কাছাকাছি যাওয়া হলো। বজ্র বন্যা অস্ত্র ধ্বংস এসব শব্দগুলোর অবশ্যই দরকার হবে বৈপ্লবিক রচনায়, কিন্তু সবার জন্য যে সুস্থ আর সুন্দর জীবন তৈরি করার স্বপ্ন আছে বিপ্লবে, সেই স্বপ্নটা যেন অনেকসময়ে অস্পৃষ্ট থেকে যায় এসব রচনায়। এটাও কি ভেবে দেখবার নয়?

'শ্রেণীর এবং শ্রেণীসংগ্রামের একটা দৈনন্দিন চেতনা তৈরি করা আর সংগ্রামের একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম দেওয়া, এর মধ্যে একটু প্রভেদ হয়তো আছে। আন্দোলনের যে কাজ নিশ্চয় প্রোগ্রামভিত্তিক হবে। কিন্তু লেখার মধ্য দিয়ে চেতনা-সঞ্চারের যে কাজ, সেখানে কেবল প্রোগ্রামটাই উপরিতলে উঠে এলে সঙ্কারের

(Communication) সম্পূর্ণ জোরটা পৌঁছয়, না কি সেটা সীমাবদ্ধই হয়ে যায়, সেটাও ভাববার।

'একথাটা অবশ্য স্বীকার করি যে এসব ব্যাপারে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা খুব প্রত্যক্ষ নয়, তাই আমার দূরাগত এই ধারণায় অনেক অস্পষ্টতা এবং ভুল থাকবারই সম্ভাবনা। আর এটাও মনে করিয়ে দিই যে আমি কেবল সেইটুকুই বলছি যেখানে কিছু মতভেদ থাকা সম্ভব। এ পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে এ কথাগুলি তার কোনো বিরোধিতা করবার জন্য নয়। সকলের বিবেচনার জন্য এ কথাগুলি কেবল একটা সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিতে চায়।

সম্মেলনের সর্বৈব সফলতার প্রত্যাশা করি।

শঙ্খ ঘোষ
১২ অক্টোবর ১৯৮৫'

যে সম্প্রসারণের প্রস্তাব করেছেন শঙ্খ ঘোষ, তাকে কার্যকর করার প্রস্তুতি এগিয়েছে কি আদৌ ?

টীকা

১. চেরাবাণ্ডারাজুর গান ও কবিতার এই সঙ্কলনটির প্রকাশক বিপ্লবী লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রস্তুতিসম্মেলনের আহ্বায়কপরিষদ, প্রচ্ছদ প্রবীর সেনের, (পরিবেশক কথাশিল্প, সেপ্টেম্বর, ১৯৮০)
২. বিরসম্ ইংরেজি সঙ্কলনটি প্রকাশ করেন অক্টোবর ১৯৮৩-তে। আমাদের কাছে রাজুর কবিতা ও গানের যে ইংরেজি বয়ান পাঠিয়েছিলেন কে ভি আর, তার সঙ্গে দু-এক জায়গায় এ বই-এর অনুবাদে পার্থক্য রয়েছে।
৩ অবশ্য সঙ্কলনটিতে তিনটি মারাত্মক ভুল থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। এক, 'কামারশালায় লেগেছে আগুন' গানটির শেষ দুটি লাইন বাংলায় অনূদিত হয়নি। অনুবাদটি ঠিকই আছে ব'লে শ্রদ্ধেয় প্রয়াত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেন। বীরেনদা একথা বলায়, শঙ্খদা বলেছিলেন, তাহলে দেখার দরকার নেই। অবশ্য-অনুবাদক-ও চাননি তাঁর লেখা কেউ দেখে দিন বরং কেউ হাত দিলে যেন ছাপা না হয়।'—চিঠি লিখে একথা জানান প্রদীপ গোস্বামী। দ্বিতীয়ত, 'লড়ে নিতে হবে' গানটিতে একজায়গায় রয়েছে

It's just a matter of time for the toiler to rise to the gadi
While religiosity deep-rooted, has to wither away
and cease to be.

অনুবাদে ছাপা হয়েছে

মেহনতীদের ক্ষমতাদখল শুধু সময়ের ব্যাপার
ততদিনে এসো শিকড়নামানো ধর্ম শুকিয়ে মারি

বংলায় এসে গিয়েছে ধর্মকে নির্মূল করার সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান। অথচ রাজনীতিসচেতন রাজুর বক্তব্য, সংগ্রামের আঘাতে আঘাতে দুর্বল হয়ে একদিন ধর্ম আপনা থেকেই শুকিয়ে যাবে। তিন নম্বর বিভ্রাট কবির নামের সঠিক উচ্চারণ নিয়ে। এর সমূহ দায়িত্ব আমার-ই উপর বর্তায়। দক্ষিণ ভারতীয়দের উচ্চারণ ঠিকমত অনুধাবনের ব্যর্থতাই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে। 'কলমের ফ্রন্ট' পত্রিকায় লিখে (সে লেখাটি মুদ্রণ প্রমাদসহ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে সেতু সাহিত্য পরিষদের উল্লিখিত বই-এ) আমি এ ভুলের জন্যে মার্জনা চেয়েছি, সম্ভবত ১৯৮৩-তে। তার আগে বেশ কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনে চেরাবাণ্ডারাজু এই সঠিক উচ্চারণের কথাটি লিখে আগের ভুল শোধরানোর কিছুটা অক্ষম চেষ্টা চালিয়েছি মাত্র।

সাক্ষাৎকারের বদলে

বলাই বাহুল্য, কোনো অবস্থাতেই এ-রকম একটি সংখ্যার জন্য কবির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। 'সাক্ষাৎকারের বদলে' শিরোনামে তাই এ-পর্যন্ত গৃহীত কবির সাক্ষাৎকারগুলি থেকে কয়েকটি বেছে নেওয়া হলো পুনর্মুদ্রণের জন্য। সঙ্গে রইল একটি পঞ্জি, যা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। সকলেই জানেন, ছোটো-বড়ো সব ধরনের পত্রপত্রিকাতেই লিখে থাকেন এই কবি, সম্ভবত ছোটো পত্রিকাগুলিতেই তিনি লিখেছেন বেশি। সে-কারণে বাংলার বিভিন্ন কোণে নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা সাক্ষাৎকারগুলি একত্র করা সময়সাপেক্ষ কাজ।

দেশের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজনিত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কবির নেওয়া রবীন্দ্রনাথের কাল্পনিক সাক্ষাৎকারটিও সংযোজিত হলো এখানে। এই কাল্পনিক কথোপকথন থেকে যেন বেরিয়ে আসে সমস্যাটি সম্পর্কে তাঁর নিজেরও মানসিক চলন। অবশ্য সে-ব্যাপারে কবির নিজস্ব একটি সাক্ষাৎকারও থাকছে এইসঙ্গে।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো প্রশ্নগুলির উত্তরের বেলায়ও কবি আন্তরিক, মিতবাক এবং যথাযথ। একটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তরকেও অর্থবহ করে শোনালেন তিনি, আবার কখনো কখনো তত-স্বচ্ছ-নয় প্রশ্নও নিজেই সাজিয়ে নেন। 'কালপুরুষ' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি ভিন্ন ধরনের। সেখানে ধরা আছে "বুড়িয়া জটলা করে" কবিতাটির রচনা-পর্ব ও রহস্য সম্পর্কে অন্তঃসাক্ষ্য।

স ম্পা দ ক

১

অরুণেশ : আপনি যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন এবং আজ যা লিখছেন, এই সময়ের মধ্যে কবিতা সম্পর্কে আপনার ধারণার কি পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন ?

শঙ্খ : খুব মৌলিক কোনো বদল হয়েছে বলে মনে হয় না। আগে কোনো-কোনো ধারণা হয়তো অস্ফুট আর অস্পষ্ট ছিল, এখন হয়তো-বা তার কোনোটি স্ফুটতর বা স্পষ্টতর হয়েছে, এই পর্যন্ত বলা যায়। এটাও বলা যায় যে নিজের লেখার নিষ্ফলতা বিষয়ে ধারণা আরো প্রবল হচ্ছে দিনে দিনে।

অরুণেশ : প্রায় পঁচিশ বছর কবিতা লেখার পর আজ যথার্থ কবিতার স্বরূপ আপনার কাছে কি মনে হয় ?

শঙ্খ : এক সময়ে লিখেছিলাম যে সত্যি কথা বলাই হলো কবিতার একমাত্র কাজ। যথার্থ কবিতার স্বরূপ বলতে এইটেকেই বুঝি আমি এখনো। কিন্তু সত্যি কথা যে কাকে বলে, সেই নিয়েই মুশকিল। আমাদের একটা ব্যক্তিগত সত্য আছে, সমাজের সত্য আছে, গোটা জীবনেরও কোনো সত্য প্রচ্ছন্ন আছে কোথাও। তিনদিক থেকে এসে কোনো-এক বিন্দুতে এদের সংঘর্ষ হয় একটা, আর সেটাই হয়ে ওঠে কবিতার সত্যের মুহূর্ত। যোগ্য কোনো ভাষা যদি হঠাৎ ছুঁতে পারে সেই মুহূর্তটিকে, একবার কিংবা বারে বারে, তার থেকেই তবে জন্ম নিতে পারে সত্যিকারের কবিতা। অল্প সময়েই হয়তো ঘটে সেটা।

অরুণেশ : কবিতা সম্পর্কে হাংরি কবিদের যে ধারণা তা আপনার কাছে কতটা সমর্থনযোগ্য ?

শঙ্খ : কবিতা সম্পর্কে হাংরিদের ধারণা কতটা সমর্থনযোগ্য, তার উত্তর দেবার আগে সেই ধারণাটা নিশ্চিতভাবে বোঝা দরকার। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকারই একটি সংকলন থেকে জেনেছিলাম যে সে-ধারণার কিছুই বুঝিনি আমি। ফলে এই সমর্থন বা অসমর্থন বিষয়ে কোনো কথা বলা ঠিক হবে না।

অরুণেশ : অনেকে মনে করেন পুরস্কার লাভ প্রকৃত কবির পক্ষে ক্ষতিকর। আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে এ ব্যাপারে আপনার কি অভিজ্ঞতা ?

শঙ্খ : অনেকে মনে করেন কি না জানি না, কিন্তু আমি খুবই মনে করি। মনে পড়ছে, আমার অন্যতম প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমনি একটা পুরস্কার পাবার মুহূর্তে খুশি হবার চেয়ে ভয় পেয়েছিলাম বেশি, আর এর ঔচিত্য নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক করেছিলাম আমার বন্ধু অলোকরঞ্জনের সঙ্গে। ঘটনাক্রমে অনেক পরে যখন সে-পুরস্কারের সঙ্গে আমারও নাম যুক্ত হলো, পুরোনো সেই ধারণাই জোর পেল তখন বেশি। কেননা তখন আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলাম, জাল কোন্ কোন্ দিক থেকে ঘিরে ধরতে চায়। প্রতিষ্ঠান আর প্রলোভনের হাত-বাড়ানো নানা দিক থেকে এগিয়ে আসতে চায় তখন, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক না থাকলে নিজের বিষয়ে কতগুলি মূর্খ ধারণা তৈরি হবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেটা যে ক্ষতিকর, তাতে সন্দেহ কী।

অরুণেশ : 'এস্টাবলিশমেন্ট' নামে বহু-ব্যবহৃত শব্দটি এখন অচল বলে আপনি মনে করেন কি না, একটু বুঝিয়ে বলুন।

শঙ্খ : বহু-ব্যবহৃত বলে কোনো-কোনো শব্দকে আর টেনে আনতে ইচ্ছে হয় না, সেটা সত্যি। কিন্তু তাই বলে ধারণাটা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না। যে-সমাজের মধ্যে আমরা টিঁকে আছি কোনোমতে, সেখানে এস্টাবলিশমেণ্ট ব্যাপারটাকে অচল ভাবব কী করে? অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

অরুণেশ : 'এস্টাবলিশমেন্ট' বাংলা সাহিত্যের কোনো ক্ষতি করছে বলে কি আপনার মনে হয়?

শঙ্খ : প্রতিমুহূর্তেই করছে। সাহিত্যের, সমাজের, আমাদের মূল্যবোধের, আমাদের জীবনযাপনের সামূহিক ক্ষতি করাই এস্টাবলিশমেন্টের কাজ। কিন্তু এখানে আরো একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের ভাবনায় বা আমাদের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে খবরের কাগজকেই ধরে নেওয়া হয় এসটাবলিশমেণ্ট, আর সে-কাগজও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে একটি-দুটি নামের মধ্যে। কিন্তু সেই একটি-দুটি নামে তো নয়, শুধু কাগজেই তো নয়, প্রতিষ্ঠান তো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়ানো। স্কুলে-কলেজে, অ্যাসেম্বলি বা রাইটার্স বিল্ডিং-এ, ট্রামে-বাসে, সর্বত্রই যে আছে এক সচল প্রতিষ্ঠান, সেকথা ভুললে চলে না।

অরুণেশ : সরাসরি কোনো প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও দেখা যায় অনেক কবি বা লেখক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সেবামূলক মনোভাব পোষণ করে এবং ধ্বংস হয়ে যায়, এটাই বা কেন হয়?

শঙ্খ : যা সচল এবং বহুল, তার প্রশ্রয় পেলে সমকালীন সফলতার সম্ভাবনা

বাড়ে, এইটেই হয়তো দুর্বল মনের পক্ষে মস্ত এক আকর্ষণ। যে-কোনো শিল্পের মধ্যেই আছে এক অমনস্যতা, অবাধ্যতা। প্রতিষ্ঠান চায় মান্যতা আর বাধ্যতা। তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে ভিতরে-ভিতরে এক লড়াই। দুর্বলেরা যে সে-লড়াইতে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে তো স্বাভাবিক।

অরুণেশ : দু'একজন সম্ভাবনাপূর্ণ কবি, লেখক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেই অতিক্রত নিঃশেষিত হয়ে যায়—প্রতিষ্ঠানই কি তাদের ছোবড়া করে ফ্যালে, নাকি সেই কবি বা লেখকই ফুরিয়ে যায় ?

শঙ্খ : রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে একটি দরকারি সংলাপ আছে, অনেক সময়ে সেটা আমাদের লক্ষ্য এড়িয়ে যায়। নন্দিনীকে রাজার মনে হয়েছিল ছোট্ট একটি ঘাসের মতো, তার দিকে তিনি হাত বাড়াচ্ছেন। এর আগে কত উর্বরা ভূমি তিনি লেহন করে নিয়েছেন, কিন্তু তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, অল্প-একটু ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে তিনি পাচ্ছেন না। বোঝা যায় নন্দিনীর আগে অনেক মেয়ে এসে নিঃশেষ হয়ে গেছে এখানে। এখানে রাজার ঘর থেকে বেরুনো ছিব্‌ড়ে-হওয়া পুরুষদের বলা হয় 'রাজার এঁটো'। উচ্ছিষ্ট আর পিষ্ট এই লোকজনের প্রতিষ্ঠানে এসেও নন্দিনী নিজেকে উচ্ছিষ্ট হতে দেয়নি, এখানকার সকলের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে তার সাধ্যমতো ভাঙতেই চেয়েছে এই প্রাতিষ্ঠানিকতা, ছিঁড়তে চেয়েছে জাল। কাজেই, ফুরিয়ে যাওয়াই বলুন আর 'ছোবড়া' হয়ে যাওয়াই বলুন, সেটা হবে কি হবে না, তা নির্ভর করে চরিত্রের উপর। আর, এক হিসেবে, বাইরের দিক থেকে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে আছি তো আমরা সবাই। আগে যেমন বলেছি, গলিত এই সমাজটাই তো সেই প্রতিষ্ঠান। ভিতরে থেকেও বাইরে থাকতে পারি কতটা, লেখক বা শিল্পীর সবসময়ের পরীক্ষাই হচ্ছে সেইটে।

অরুণেশ : আপনি কবিতায় শব্দ ব্যবহার করেন অল্প, মনে হয় প্রতিটি শব্দই প্রাচাস্তিত কিন্তু অনিবার্য। অন্যদিকে আমাদের কবিতায় শব্দের বহুলতা লক্ষণীয়, এমনকি শব্দের অসচেতন প্রয়োগ প্রচুর হয়ে থাকে, এটা কি কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর বলে আপনার মনে হয় ?

শঙ্খ। এ-প্রশ্নের মধ্যে দুটি ভিন্ন কথাকে আপনি প্রায় সমার্থক ভঙ্গিতে ব্যবহার করছেন : শব্দের বহুলতা আর শব্দের অসচেতনতা। এর কোনোটিকেই অবশ্য আমি কবিতার পক্ষে ক্ষতিজনক বলে মনে করি না। কিন্তু কী অর্থে তা বলছি, সেটা বোধহয় একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। যে কবিতায় অল্প শব্দেরই ব্যবহার হচ্ছে, তারও মধ্যে কোনো-কোনো

শব্দকে মনে হতে পারে বাহুল্যময়। বহুলতা এখানে নিষ্প্রয়োজন-বোধক। আবার যে-কবিতায় বহু শব্দের প্রয়োগ আছে, তার প্রতিটি শব্দই হয়তো হয়ে উঠতে পারে কবিতার পক্ষে অব্যর্থ। বহুলতা এখানে কেবল পরিমাণ-বাচক। ঠিক তেমনি, অসচেতন কথাটিরও দুই ভিন্ন দিক আছে মনে হয়। কোনো-একটি লাইন, বা সম্পূর্ণ কোনো-একটি কবিতা কেউ হয়তো লিখে যেতে পারেন আচ্ছন্নের মতো, আর সেই মুহূর্তে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে থাকে এক অসচেতনতা। এই অর্থে অসচেতনতা কবিতার ভিতরকার জোরকে বাড়ায় বলেই মনে হয় আমার। কিন্তু যে-অসচেতনতা নিজের লেখার কোনো দায়িত্ব নিতে পারে না, সেইটেকে মনে হয় ভয়ের।

একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে। অসচেতন একটা ধাক্কা না থাকলে আমি ছোটো-বড়ো কোনো কবিতাই লিখতে পারি না। আমার কবিতার 'প্রতিটি শব্দই সুচিন্তিত', এই কথাটি যদি গুণবাচক হয় তো স্বীকার করতে হবে যে সে-গুণের আমি অধিকারী নই।

অরুণেশ : প্রথম দিকে আপনার কিছু দীর্ঘ কবিতা আমরা পড়েছি, কিন্তু ক্রমশ দেখা যাচ্ছে আপনার কবিতার আকার সংক্ষিপ্ত থেকে আরও সংক্ষিপ্ত হচ্ছে—এর কারণ কি ?

শঙ্খ : 'সংক্ষিপ্ত থেকে আরো সংক্ষিপ্ত' এই কথাটি বলছেন হয়তো আমার শেষ কবিতার-বইটি পড়ে। ওখানে একটা বিশেষ মেজাজের কবিতা আছে, খুবই ছোটো বলতে পারেন, আবার সব-মিলিয়ে একটিই মাত্র বড়ো কবিতা, তাও বলতে পারেন*। এখন এমন-একটা সময় যে সে দাবি করে প্রবল স্রোতের মতো টানে কোনো দীর্ঘ এক কবিতা। সেইরকমই লিখতে ইচ্ছে করে আমার। পারি না বলেই ছোটো লিখি। অর্থাৎ, অসচেতনের সেই ধাক্কাটা অনেক দূর পর্যন্ত ঠেলে দেয় না, যতদূর দেয় তারই মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখা সংগত মনে করি। আর তা নইলেই হয়তো মিথ্যাচরণ হবে।

অরুণেশ : বুদ্ধি, আবেগ এবং অভিজ্ঞতা—যথার্থ কবিতায় এদের কার স্থান কতটা হওয়া উচিত ?

শঙ্খ : এ কি কোনো রান্নার রেসিপির মতো বলে দেওয়া যায় যে কার স্থান কতটা, কার পরিমাণ কতটা। অভিজ্ঞতা ছাড়া লেখাই সম্ভব নয়, আর সে-অভিজ্ঞতাকে ধারণ আর প্রকাশ করবার জন্য বুদ্ধি-আবেগের যোগ্য মিলন চাই—এইটুকু শুধু বলা যায়।

* বইটির নাম 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'।

অরুণেশ : আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে গত ত্রিশ বছরে লেখা বাংলা কবিতার স্থান কিরকম বলে আপনার মনে হয়?

শঙ্খ : এ নিয়ে ঠিকমতো কিছু ভাবিনি কখনো। স্থান যে কীভাবে নির্দিষ্ট করা যায়, বুঝতেও পারি না সেটা। বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতটাই তো আমাদের কাছে খুব অস্পষ্ট। আমাদের আধুনিকতার ধারণা বা আমাদের বিশ্বসাহিত্যের বোধ মূলত ইংরেজিভাষা আর পশ্চিমিসাহিত্য-নির্ভর। কিন্তু সেইটেই তো একমাত্র জগৎ নয়। আমাদের বোধবুদ্ধিমতো বলতে পারি যে বাংলা কবিতা আজও সেন্টিমেন্টের পিছুটানে আর প্রগল্‌ভতার চোরাবালিতে থেকে-থেকেই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমার নিজের লেখাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ যে-কবিতা পড়ে উজ্জীবিত বা ব্যথিত হতে পারে, তেমন লেখাও বাংলাতে পড়েছি অনেক।

অরুণেশ : গত কুড়ি বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য সমেত বিশ্বসাহিত্যে কয়েকটি তীব্র এবং বিদ্রোহী কবিতা আন্দোলন দেখা গেছে; এসব আন্দোলনের ফলশ্রুতি কতটা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

শঙ্খ : গত কুড়ি বছর কেন, পঞ্চাশ বছর জুড়েই এদেশে-ওদেশে কবিতার আন্দোলন হয়েছে অনেক। কিন্তু এর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখি, সূচনায় যে তীব্রতা থাকে ঘোষণায়, যে প্রতিশ্রুতি থাকে বিদ্রোহের, বা যে সম্ভাবনা থাকে ব্যাপক উল্লম্ফনের, শেষ পর্যন্ত আর থাকে না সেই তীব্রতা, সেই প্রতিশ্রুতি, সেই সম্ভাবনা। এর সবচেয়ে বড়ো ব্যতিক্রম ছিল মনে হয় সুররিয়ালিজমের আন্দোলন, সাহিত্যে শিল্পে এইটেকেই বলা যায় এই শতাব্দীর সবচেয়ে তাৎপর্যময় আন্দোলন, যার ফল আর প্রভাব থেকে পরবর্তী প্রায় সব আন্দোলনই ঋদ্ধ হয়েছে কোনো-না-কোনো ভাবে। বাকি ছোটো লড়াইগুলির কোনো মূল্য ছিল না, তা বলি না। তবে তাদের প্রভাব খুব দূরস্থায়ী নয়।

অরুণেশ : অনেকে মনে করেন বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ফলে আজ বেশ কিছু সচেতন পাঠকের পক্ষে বাংলা সাহিত্য জগতের প্রকৃত অবস্থা বিচার করতে সুবিধা হচ্ছে; না হলে হয়ত ভঙ্গীসর্বস্বতাই (যারা বিদ্রোহের ভান করে) বাজার মাত করে রাখতো। আপনিও কি তাই মনে করেন?

শঙ্খ : অল্প-কিছু সচেতন পাঠক সবসময়েই থাকেন, যাঁরা বাণিজ্যিক সাহিত্যচর্চা থেকে লেখার জগৎকে আলাদা করে দেখতে জানেন। এও নিশ্চয় ঠিক যে হাংরি জেনারেশনের আন্দোলন তেমন কিছু পাঠক তৈরি

করেছে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মনে হয় না যে এখনো তার পরিমাণ খুব উল্লেখযোগ্য। সে-কথাটা স্বীকার করে নিলেই বোধ-হয় রিয়্যালিটি-বোধের পরিচয় দেওয়া হবে।

অরুণেশ : হাংরি কবিতাকে এখনও অনেকে অশ্লীল বলে মনে করে; আবার কেউ কেউ এদের নৈরাজ্যবাদী বলে মনে করে—এ ব্যাপারে আপনার মত কি ?

শঙ্খ : অশ্লীল যারা মনে করে, তারা ঠিক কবিতার বা সাহিত্যের পাঠক নয়, তারা সামাজিক লোকজন। সত্যিকারের পাঠকের কাছে এই 'অশ্লীলতা' কথাটির কোনো মানে হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপাত-শ্লীলতার মধ্যে দিয়েও বহু লেখা ব্যর্থ হয়, আপাত-অশ্লীলতার মধ্য দিয়েও বহু লেখা উত্তীর্ণ হয়। প্রশ্ন এই ব্যর্থতা আর উত্তীর্ণতার, শ্লীলতা-অশ্লীলতার নয়।

কিন্তু নৈরাজ্যবাদ বিষয়ে সে-কথা বলা যায় না। হাংরিদের ইস্তাহার যতটা লক্ষ্য করেছি আর তাদের কবিতা বা গদ্যের সঙ্গেও যতটুকু পরিচয় হয়েছে, তাতে মনে হয় যে তাদের চেতনায় নৈরাজ্যবাদের একটা লালন অবশ্যই আছে।

অরুণেশ : আমরা (হাংরি কবিরা), বামপন্থী কবিরা কিম্বা অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত তরুণ কবিরাও আপনার প্রতি দুর্বলতা পোষণ করে, আপনি কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করবেন ?

শঙ্খ : এই তথ্যে একটু বিস্ময় বোধ হচ্ছে। সত্যিই কি সবার আছে এই দুর্বলতা ? সম্ভব নয় সেটা। যদি-বা সম্ভব হতো তার কারণ বিচার করাটা আমার কাজ হতে পারত না। অবশ্য, উলটো দিক থেকে ধরতে পারি প্রশ্নটাকে। হাংরি বা বামপন্থী বা 'অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত' অনেক তরুণ কবির প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, একইসঙ্গে সমান উন্মুখতায় আমি বুঝতে চাই এদের সকলেরই লেখা, পছন্দও করি অনেককে। এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব ? জীবন বা কবিতার যে সত্যের কথা বলি, তার আছে এক বিস্তৃত জটিল বহুমুখী রূপ, সর্বতোভাবে তাকে ছুঁতে ইচ্ছে করে। এক-এক ধরণের লেখায় সেই সত্যের এক-এক অংশের বিচ্ছুরণ দেখি, যদি দেখি, আর তাই তার সব ধরণকে তুলে নিয়ে একটা মোজেইক তৈরি করি মনে মনে, সবাইকেই বুঝতে চাই তাই। এইটেই হয়তো ব্যাখ্যা।

অরুণেশ : আধুনিক জীবনে রবীন্দ্র সাহিত্যের স্থান কতোটা ?

শঙ্খ : জীবনের পরিকল্পনায়, জীবনের আদর্শসৃষ্টিতে, এর যে বিশেষ কোনো

ভূমিকার ব্যবহার হচ্ছে তা আমার মনে হয় না। আধুনিক জীবনে রবীন্দ্রসাহিত্যের খুবই বড়ো একটা 'স্থান' চলছে কেবল প্রতিপত্তি-রচনায়, ব্যবসায়িকতায়, জীবিকার্জনে। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা জানি যে রাজনৈতিক বিতর্কেও রবীন্দ্রসাহিত্যকে ব্যবহৃত হতে হয় এপাশে-ওপাশে। কিন্তু এর কোনোটাই যথার্থ সাহিত্যিক বিবেচনা নয়।

অরুণেশ: রবীন্দ্রনাথের কবিতার চাইতে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান আমাদের আকৃষ্ট করে—এটাই বা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

শঙ্খ: প্রশ্নের ধরনে মনে হয় যে ধরে নিচ্ছেন, আগের প্রশ্নের সঙ্গে কোনো যোগ আছে এই প্রশ্নের। কিন্তু বস্তুত এটা এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। এটা হলো শিল্প আস্বাদনের সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে তাঁর কিছু গানই যে অনেকের ভালো লাগে, সেটা আমার বেশ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমাদের ভাষায় কবিতার যে সেন্টিমেন্টাল অতিকথনের বিষয়ে বলছিলাম আগে, তার প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে দুর্বল করে দেয় অনেক সময়ে। গান সেইখানে তাঁর মুক্তি। সমস্ত বাহুল্য ছেড়ে তাঁর নিজের নিভৃত জগতের সত্যের কথা গানেই সবচেয়ে সহজে বলতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ, বলতে পেরেছেন সবচেয়ে গূঢ়ভাবে। সেই সত্যের জন্য, ভাষাগত সেই সংযমের জন্য, এই গান হয়তো আপনাদের মতো আরো অনেকের প্রিয়। আর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথও জানতেন তাঁর এই ভবিষ্যতের কথা। একথা প্রায়ই বলতেন তিনি: বাঙালি তাঁর আর সবকিছু ভুলে গেলেও গানকে ভুলবে না।

অরুণেশ: হেনরি মিলার এক জায়গায় বলেছেন, অত্যন্ত মার্জিত এবং সুচারু সাহিত্যের চেয়ে অনেক সময় অমার্জিত কিন্তু সজীব রচনার গুরুত্ব অনেক বেশি, আপনিও কি তাই মনে করেন?

শঙ্খ: হ্যাঁ, আমিও তা মনে করি। কিন্তু সেইসঙ্গে আমি এও মনে করি যে মার্জিত হয়েও কোনো রচনা হতে পারে সজীব। মার্জিত অজীবের চেয়ে অমার্জিত সজীব পছন্দ করি বটে, কিন্তু জীবনে বা সাহিত্যে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি মার্জিত সজীবকে।

অরুণেশ: কবিতা কি সমাজের ক্ষতি বা মঙ্গল কোনোটিই করতে পারে? করলে, কিভাবে?

শঙ্খ: এ খুব পুরোনো প্রশ্ন, উত্তর দিতে গেলে একটি রচনা লিখতে হয়। ক্ষতি বা মঙ্গল দুই-ই করতে পারে কবিতা, তবে তার ক্রিয়া চলে খুবই ধীর আর অলক্ষ্য গতিতে, কেননা তার কাজ মানুষের চেতনার উপর।

অরুণেশ : গত ২০-২৫ বছর যাঁরা বাংলা ভাষায় কবিতা লিখেছেন বা এখনো লিখছেন তাঁদের মধ্যে কার কার লেখা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় আপনার কাছে ?

শঙ্খ : এ-রকম একটি তালিকা করা শক্ত। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে অনেকেরই লেখা বেশ গুরুত্বপূর্ণ লাগে আমার।

অরুণেশ : কিছুদিন আগের একটি 'রেডিও টকে' শৈলেশ্বর ঘোষকে আপনি 'প্রতিবাদী' কবি হিসেবে উল্লেখ করলেন ; প্রতিবাদী কবি বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন ? শৈলেশ্বরকে শুধুমাত্র 'প্রতিবাদী কবি' এরকম একটা অভিধায় আবদ্ধ করা কতটা সংগত ?

শঙ্খ : কোনো কবিকেই কোনো একটিমাত্র অভিধায় আবদ্ধ করা সংগত নয়, সম্ভবও নয়। শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতার পরিচয় দিতে গেলে কাউকেই আমি বলব না যে ইনি একজন প্রতিবাদী কবি। এমনকী, 'ইনি একজন হাংরি কবি' একথা বলতেও আমার ইচ্ছে হবে না। শৈলেশ্বর যে কবি, সেইটেই যথেষ্ট কথা। তাহলে কেন আমি রেডিওটকে বলেছিলাম ওই শব্দ ? বলেছিলাম জীবনানন্দ বিষয়ে একটি বিশেষ কথা বোঝাবার জন্যে। এইটুকু আমি সেখানে বলেছিলাম যে পরবর্তী নানা ভিন্নরুচির কবি জীবনানন্দের কবিতায় তাঁদের জীবনের কিছু সত্য খুঁজে পেয়েছেন। রুচিভিন্নতার সেই ঝোঁকটি বোঝাবার জন্যই শৈলেশ্বর প্রসঙ্গে ওই শব্দটির দরকার হয়েছিল সেদিন।

অরুণেশ : হেনরি মিলার বলেছেন, কবি-শিল্পীদের উপর আস্থা রাগলে মানুষ এক বিশৃঙ্খল জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করবে, কিন্তু সেটা হবে এক আনন্দময় অবস্থা—এ বিষয়ে আপনার মত।

শঙ্খ : এ বিষয়ে আমি কী বলতে পারি ? কবি শিল্পীরা সবাই যদি এক বিশৃঙ্খল জগতের আনন্দময় অভিজ্ঞতা দিতে চান পাঠককে, তবে পাঠকেরা তো তা-ই পাবেন। কিন্তু কবি-শিল্পী মাত্রেই যে সেই বিশৃঙ্খল জগতের দিকে নিয়ে যেতে চাইবেন পাঠককে, তা তো নয়। অন্তত আমার তা মনে হয় না।

অরুণেশ : আমরা বিশ্বাস করি প্রকৃত কবিতার জন্ম অভ্যন্তরীণ এক চূড়ান্ত ও বিশুদ্ধ নৈরাজ্য থেকে—এ বিষয়ে আপনার মতামত শুনতে চাই।

শঙ্খ : এটা মনে করেন বলেই আপনারা নৈরাজ্যবাদী নামে চিহ্নিত হন। অভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত আর বিশুদ্ধ নৈরাজ্য থেকে একধরণের কবিতা লেখা হয়তো সম্ভব, যা কোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কাছে নিয়ে যায় কবিকে আর তার পাঠককে। কিন্তু আগে আমি বলেছি যে বুদ্ধি আর আবেগের

যোগ্য মিলন চাই আমরা কবিতায়। সেই বুদ্ধির প্রভাবকে স্বীকার করলে মনে হয় এই বিশুদ্ধ বিশৃঙ্খলার রাজ্যে আর যাওয়া যায় না। অন্তত, সেইটাকেই সবচেয়ে কাম্য বলে আমার মনে হয় না।

অরুণেশ : আপনার কবিতায় কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের ছাপ পাওয়া যায় না, তবে কি আপনি বিশ্বাস করেন যে কোনো ধরণের রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা মানুষের সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়?

শঙ্খ : সার্বিক মুক্তি কথাটার সত্যি কোনো মানে যদি থাকে, তাহলে এটা ঠিক যে কোনো রাজনৈতিক দর্শনের মধ্য দিয়ে সেটা পাওয়া সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক মত থাকলে যে কোনো অসুবিধে আছে তা নয়, কেননা সেই সার্বিক মুক্তির আগেও মানুষের কোনো কোনো প্রাথমিক মুক্তি দরকার। আর, সন্দেহ নেই যে তেমন মুক্তির পথ তৈরি করে দিতে পারে কোনো রাজনৈতিক দর্শন। কিন্তু মতবর্তী হওয়া এক কথা, আর দলবর্তী হওয়া হলো আরেক কথা। আর এও সত্যি যে, মত থাকা মানেই এ নয় যে কবিতাকে করে তুলতে হবে সেই মতের কয়েকটি পদ্যসংস্করণ মাত্র। কবিতায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারটা অনেক সময়েই প্রতিফলিত হয় খানিকটা তির্যকভাবে, অনেকটা ভিতরের দিক থেকে তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে।

অরুণেশ : সভ্যতার যে কোনো সন্ধিক্ষণেই মানুষ বারবার প্রকৃত সাহিত্যের খোঁজ করে; তবে কি মানুষ অসচেতনভাবেই বিশ্বাস করে যে প্রকৃত সাহিত্যই তার মুক্তির পথ নির্দেশ করবে?

শঙ্খ : কখনো কখনো একইরকম পরিবেশে কোনো সামাজিক বিপ্লব, কোনো বিদ্রোহ, আর তার পাশাপাশি কোনো বিদ্রোহী বা বৈপ্লবিক সাহিত্য দেখা গেছে। একই ধরণের কারণের দুই সম্পৃক্ত ফল হিসেবে দেখা গেছে তাদের। কিন্তু সাহিত্যই শেষ পর্যন্ত কোনো মুক্তির পথ নির্দেশ করে, এরকম বিরাট ভরসা সমাজের আছে বলে মনে হয় না। দুচারজন লোকের সে-ধারণা থাকতে পারে ঠিকই, সাহিত্যপাগল দুচারজন লোকের। কিন্তু দুচারজন লোকেই তো গোটা মানবসংসারের পরিচয় নয়। সাহিত্যে-শিল্পে মুক্তির যে বোধ প্রকাশ পায়, সমাজমনে তার কাজ হতে থাকে অনেক মন্থর চালে, অনেকদিন ধরে। দ্রুত ফলের আশা অনেক সময়েই তাই নিরাশার সৃষ্টি করে। চুয়াত্র বছর বয়সে সার্ত্রকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আপনি কি বলবেন যে আপনার লেখালেখির ফলে কোথাও কিছু পালটে গেছে? উত্তরে সার্ত্রকে বলতে হয়েছিল: এক চুলও নয়। কিন্তু তবু সময়ের একটা মূর্তি, তার

চালচলন, ভবিষ্যতের দিকে তার অভিমুখিতা গড়ে তুলতে চান লেখক তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। অল্পকিছু লোকের উপর তার প্রতিক্রিয়াও হয় কিছু।

অরুণেশ : কি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বার বার কবি ও লেখকদের উপর প্রচণ্ড নিপীড়ন দেখা যায়—যদিও দুরকম রাষ্ট্রের নিপীড়নের পদ্ধতি ভিন্ন; তবে কি সবরকম রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই কবিদের সম্পর্কে প্লেটোর উক্তিই মান্য?

শঙ্খ : প্লেটোর কথাটা এখানে তোলা বোধহয় সংগত নয়। প্লেটো যাকে সত্য বলে জানতেন, তাঁর ধারণায় সমস্ত শিল্পই হলো তার নকলেরও নকল, তাই তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে কোনো শিল্পীর ভূমিকা নেই। কিন্তু সত্যিকারের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যবহারিক এক সত্যের দিকে চূড়ান্ত ঝোঁক পড়ে বলে প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী লেখকদের সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটোর আপত্তি ছিল লেখকেরা মিথ্যে বলেন ভেবে। আর রাষ্ট্র আপত্তি করে লেখকেরা সত্যি বলেন জেনে।

অরুণেশ : কারো কারো মতে বিংশ শতাব্দীর এই গোধূলি বেলায় মানুষের নৈতিকতার সামগ্রিক পতন হয়েছে ; আমাদের মনে হয় পুরানো নৈতিক বোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং জন্ম হচ্ছে স্বাধীন মুক্ত নৈতিকতার। পুরানো নীতিবোধের জায়গায় হৃদয়ের বিশুদ্ধ আবেগ মানুষকে চালিত করবে এই আমাদের বিশ্বাস···এ ব্যাপারে আপনার কথা জানতে চাই।

শঙ্খ : নূতন এক নৈতিকতার জন্ম হবে, এবং হচ্ছেও অনেক দেশে, একথা অবশ্যই বিশ্বাস করি। কিন্তু এখানে আরো একবার বলি, 'হৃদয়ের বিশুদ্ধ আবেগ' একলা বেশিদূর নিয়ে যেতে পারে বলে মনে হয় না, এখানেও চাই বুদ্ধির সহযোগ। নৌকোয় বসে ন্যায়ের তর্ক করতে করতে পরাভূত বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিমাই গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন তাঁর রচনা, তাঁর ন্যায়ের পুঁথি। তারপর তিনি বিশুদ্ধ হৃদয়ের পথে চালনা করতে চান গোটা একটা দেশের নৈতিকতাকে। সাময়িক কিছু সুফল থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশের পক্ষে তার ফল ভালো হয়েছে বলে মনে হয় না।

অরুণেশ : ভালোবাসাহীনতাই কি পৃথিবীর প্রধান অসুখ বলে মনে হয় আপনার? যদি তাই হয় তবে ভালোবাসা পুনরুদ্ধার কিভাবে হতে পারে?

শঙ্খ : একে অসুখ বলা যায়, আবার অসুখের ফলও বলা যায় হয়তো। কিন্তু পুনরুদ্ধারের কথায় মনে হয়, একদিন যেন সবার মনেই ছিল এই

ভালোবাসার সহজ সঞ্চার। সমাজের ইতিহাস তো দেখায় যে কোনো-দিনই ছিল না তা। সবসময়েই মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা এগিয়ে দেবার পরামর্শ দিতে হয়েছে; যিশু বলুন, বুদ্ধ বলুন, সবাইকেই। উদ্ধারের নয়, এঁরা সকলকেই চেষ্টা করেছেন এই ভালোবাসার সৃষ্টির কোনো পথ খুঁজতে। পথ কেউ কেউ বলেছেন বটে, কিন্তু কাজে লাগেনি সেটা। নিজের চেষ্টায় ভালোবাসাই ভালোবাসার পথ, এছাড়া আর অন্য কোনো সরল উপায়ের কথা আমি জানি না। তবে এটা মনে হয়, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সমস্যাটা কিছু কম।

অরুণেশ : হাংরিরা ঘুমন্ত সমাজকে জাগাবার জন্য নানারকম আক্রমণাত্মক কাজকর্ম করেছে (লেখালেখি ছাড়াও)। আপনার কি মনে হয় এইসব কাজকর্মের দ্বারা হাংরিদের আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া গেছে?

শঙ্খ : লেখা ছাড়া আর ঠিক কী ধরনের কাজকর্ম? আমার ঠিক জানা নেই সেটা। ব্যক্তিগত জীবনযাপনের একটা বিশেষ ধরণ তাঁদের আছে, সেটা লক্ষ করেছি। একেই কি বলেছেন কাজকর্ম? এর মধ্য দিয়ে কতকগুলি সংস্কার আর মূল্যবোধ ভেঙে দেবার চেষ্টা: আমাদের সমাজে মূল্যবোধের কিছু বদল ঘটছে অনেকদিন ধরে, ধীরে ধীরে। কিন্তু আমি মনে করি না যে তার সঙ্গে হাংরিদের লেখা বা কাজকর্মের বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে। আপনাদের এটা জানাই উচিত যে সমাজের যে-বিশাল অংশকে নিয়ে এই মূল্যবোধের সমস্যা, বা এই ঘুমের সমস্যা, সেই অংশ সাহিত্য নিয়ে খুব কমই ভাবিত হয়, হাংরিদেরও কোনো অস্তিত্ব নেই তার চেতনায়।

অরুণেশ : যদিও আমরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের মধ্যেই আছি তবুও একজন প্রকৃত কবি বা লেখক সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিলে রাজনীতি কি তাকে ধ্বংস করবে, না, নতুন কোনো দিগন্ত খুলে দিতে পারবে?

শঙ্খ : এও নির্ভর করে কবির আত্মপ্রত্যয়ের উপর, তার চরিত্রশক্তির উপর। সরাসরি রাজনীতি নিশ্চয় একজন লেখককে কোনো নূতন দিগন্ত খুলে দিতে পারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দিয়েছিল। পুরোনো দিকের চেয়ে এই নূতন দিক কতটা ভালো বা মন্দ, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে অবশ্য, কিন্তু ভিন্ন একটা অভিজ্ঞতার স্বাদ তো আমরা পাচ্ছি তাতে। রাজনীতির কুক্ষিগত হওয়া যেমন দুঃখের, রাজনীতির আতঙ্কে গ্রস্ত হওয়াও কবিদের পক্ষে ততটাই দুঃখের আর লজ্জার।

অরুণেশ : শৈলেশ্বর ঘোষ সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ও জীবনানন্দ দাশ, 'বাংলা সাহিত্যের ট্রাডিশনের মধ্যেই দুষ্টু ছেলে' এবং আরও মন্তব্য করেছেন, 'জীবনানন্দ ও মাণিক সম্পর্কে প্রথমে আমরা সকলেই খানিকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছি। সার্বিক শূন্যতার সামনে অন্ততঃ আমরা কিছুটা ভরসা পাবো এই আশা ছিল—কিন্তু খড়কুটো ধরে তো আর সমুদ্র পার হওয়া যায় না।'—এই দুটি মন্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

শঙ্খ : তরুণদের অনেকেরই কাছে অনেককিছু পাই যেমন, তেমনি পুরোনোদেরও অনেকের কাছে পেয়েছি অনেককিছু। হাংরি সম্প্রদায় বা শৈলেশ্বর যে সার্বিক শূন্যতা দেখেন আমাদের কবিতার ঐতিহ্যে, আমিও যদি তাই দেখতাম তবে তো হাংরি হতাম আমিও। বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমি তা নই। শূন্যতার ওই ধারণায়, ঐতিহ্য বিষয়ে ওই ধারণায়, এটা প্রায় স্বাভাবিক যে জীবনানন্দ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়েও হাংরিদের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস ফিকে হয়ে আসবে অল্পে অল্পে, তাঁদেরও মনে হবে খড়কুটো। খড়কুটো ধরে সমুদ্র পার হওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু এ-সমুদ্র এমন-এক সমুদ্র যে কখনোই কোনোভাবেই পার হওয়া যায় না তা। খানিকটা হাবুডুবু খাওয়াই হচ্ছে ভবিতব্য। হাত-পা ছোঁড়ার মধ্যে জলবিন্দুর কয়েকটি উৎক্ষেপ, সেই হচ্ছে কবিতা। পার হতে আর কে পারে? চায়ই বা কে?

আরও একটা কথা মনে রাখা ভালো। লেখাকে দিয়ে আমি যে-কাজটা করিয়ে নিতে চাই, তার কাছে আমার যা দাবি, তার সম্পূর্ণটাই যদি পেয়ে যেতাম পূর্বতন কোনো লেখকের কাছে, অর্থাৎ খড়কুটো না হয়ে যদি তাঁরা ভেলাই হতেন, তাহলে তো আমার লিখবার কোনো দরকারই হতো না আর, সেই ভেলাতেই তো ভেসে পড়তে পারতাম। আমার সময়ের ইচ্ছে পুরোনো লেখকদের কারো কাছেই পুরোপুরি মিটবার নয়, প্রথই থেকে এটা বুঝে নিলে আর মনোভঙ্গের বেদনা হয় না, নিজের লেখারও একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

অরুণেশ : কিছুকাল আগে দেবেশ রায় হাংরিদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই সাহিত্য আন্দোলন তত্ত্ববিশ্বের ক্ষেত্রে নকশাল পন্থার প্রথম ইঙ্গিত'—আপনার মতও কি তাই?

শঙ্খ : 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার যে সংখ্যায় দেবেশ রায় ওই কথা লিখেছিলেন, সে-সংখ্যাতেই অনুরূপ মন্তব্য করেছিলাম আমিও, দেবেশ-নিরপেক্ষভাবেই। হ্যাঁ, এ-দুয়ের মধ্যে এখনো একটা ক্ষীণ সমান্তরাল দেখতে পাই। চিন্তার বা আদর্শের দিক থেকে নয়, পদ্ধতির দিক থেকে।

অরুণেশ : অনেক সমালোচক বলেন হাংরি সাহিত্য ভারতবর্ষে যৌন বিপ্লবের প্রেরণা দিয়েছে এবং আজ দেখাও যাচ্ছে তরুণ সমাজ পুরাতন যৌন-নৈতিকতা থেকে মুক্ত হতে চাইছে, মনে হয় এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই ভারতবর্ষ তার স্বকীয় এবং স্বাধীন যৌন-চেতনার অধিকারী হবে—এ বিষয়ে আপনার বিস্তারিত মতামত জানতে পারলে ভালো হয়।

শঙ্খ : এই হলো আবার সেই বাড়িয়ে ভাববার প্রবণতা। হাংরি সাহিত্য কি সত্যি সত্যি এতদূর বিস্তারিত যে গোটা ভারতবর্ষের কোনো যৌন-বিপ্লবের প্রেরণা হতে পারবে সে? তরুণ সমাজ যে পুরোনো যৌন-নৈতিকতা থেকে মুক্ত হতে চাইছে, সেটা খুব স্পষ্ট নয় এখনো। ছেলেমেয়েদের মেলামেশা বাড়ছে, আচরণের বাইরের ধরণ পালটাচ্ছে কিংবা ফিল্ম-থিয়েটার-উপন্যাসে আরেকটু খোলামেলা হচ্ছে যৌন-সম্পর্কগুলি, এইটুকু থেকেই নূতন নৈতিকতার বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়া যায় না। ভিতরকার মূল্যবোধে একটা অনড়তা থেকে গেছে তবু। বিশৃঙ্খল একটা আচরণে অভ্যস্ত হয় অনেকে সুযোগসন্ধানী হিসাবে। কিন্তু আচরণ আর সংস্কারের, ব্যবহার আর নৈতিকতার, মৌলিক একটা সংঘর্ষ ভিতরে থেকে যায় বলেই অল্প সময়ের মধ্যে মানসিকভাবে চুরমারও হয়ে যায় তারা। একে ঠিক নূতন নৈতিকতা বলা চলে না।

অরুণেশ : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটলেই কি মানুষের যৌনমুক্তি ঘটবে বলে আপনি মনে করেন? অথবা যৌনমুক্তি কথাটাই আপনি বিশ্বাস করেন না?

শঙ্খ : এটা মনে হয় যে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটলে সমাজে নারীর ভূমিকায় বদল হবে, নারীকে পুরুষ তার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করবে না আর, দূর হবে তার নির্যাতন আর অধিকারের প্রবণতা। তখন নারীপুরুষের সম্পর্ক হতে পারবে অনেক স্বাভাবিক, এবং ব্যক্তিগত রুচিবিবেচনার উপর নির্ভরশীল—এ ছাড়া অন্য কোনো যৌনমুক্তি বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। অর্থনৈতিক বন্ধনের মধ্যে নারীর প্রতি অসম্মান আর অত্যাচারের একটা গড়ন তৈরি হয়, তেমনি আবার যৌনমুক্তির নাম করেও যে তুলে আনা যায় আরেক ধরণের অত্যাচার, এই ভয়টা থেকেই যায়।

অরুণেশ : আমাদের মতে বাংলা কবিতা সবদিক দিয়েই যতটা এগিয়ে গেছে বাংলা উপন্যাস বা নাটক ততটা এগোতে পারেনি। আপনার অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে কি বলে?

শঙ্খ : গল্প বা উপন্যাস বিষয়ে একথা বলতে একটু দ্বিধা বোধ হয়। এগিয়ে যাবার

ধরণটা তো সব শিল্পে ঠিক একইরকমভাবে ঘটে না। কবিতার চেয়ে অনেক বেশি বাধার মুখোমুখি হতে হয় গল্প-উপন্যাসকে সেকথা সত্যি, কিন্তু সেখানে আমরা কোনোই নূতন অভিজ্ঞতা পাচ্ছি না আর, একথা ততটা সত্যি নয়।

অরুণেশ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'হাংরি সাহিত্য তৃতীয় শ্রেণীর আমেরিকান সাহিত্যের অনুকরণ'—এই মন্তব্যে আমরা তো হো-হো করে হেসেছিলাম—আপনিও কি হেসেছিলেন?

শঙ্খ : না, আমি হাসিনি। কোনো কথা আমার মনোমতো না হলে, এমনকী আমার একেবারে বিরুদ্ধবাদী হলেও, আমার হাসি পায় না, ভাবনা হয়। সময়সময়েই এই ভয়টা আমার থেকে যায় যে সত্যের খুব কমই আমি জেনেছি, খুব অল্পই হয়তো বুঝতে পারছি আমি। তাই অন্যের ভাবনাচিন্তা শ্রদ্ধা নিয়েই জানতে চাই। আমার বিরুদ্ধেও কোনো কোনো তীব্র লেখা পড়েছি অনেক সময়ে। একথা বললে মিথ্যে বলা হবে যে তাতে কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। কিন্তু রাগ হয়নি তাতে, বা উপহাস করবার কথা মনে হয়নি। বুঝতে চেয়েছি আমার বোঝানোতে বা আমার প্রকাশে কোথায় ছিল ত্রুটি, বুঝতে চেয়েছি সেই সমালোচকেরও বুঝবার ত্রুটি কোথায়। এইভাবে মনে মনে নিজের সঙ্গে মীমাংসা করে নিয়েছি নিজের। এমন নয় যে মনে মনেও সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছি সেই অভিযোগ, কিন্তু তাই বলে উড়িয়ে দিতে বা এড়িয়ে যেতে চাইনি তাকে। হাংরি জেনারেশন বিষয়ে সুনীলের ওই মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই, সেটা ঠিক। কিন্তু না, সেজন্য হাসিনি আমি, কষ্ট পেয়েছি।

অরুণেশ : বাংলা সাহিত্যের এমন তিনটি নাম বলুন যাঁদের এক্ষুনি আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া উচিত—তদ্বির করে নয়, আপনার মতো যোগ্যতার ভিত্তিতে—

শঙ্খ : কিন্তু কী করেই-বা জানলেন যে আমিও তদ্‌বির করেই পাইনি? কথাটা কী জানেন, অল্প দুচারজনেই হয়তো করে এসব কাণ্ড, কলঙ্কটা পৌঁছয় সকলের গায়ে। যাঁদের আমরা পছন্দ করি না, তাঁরা পুরস্কৃত হলেই রাগ করে ধরে নিই যে এর মধ্যে কোনো অসাধুতা আছে। অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দই হচ্ছে যোগ্যতা-অযোগ্যতা এবং সাধুতা-অসাধুতার মাপকাঠি।

এসব পুরস্কারের তো সত্যিই তেমন-কোনো নির্দিষ্ট মান নেই, তাই যাঁরাই লিখছেন তাঁরা সকলেই এ-মুহূর্তে পেতে পারেন পুরস্কার, এই তো আমার মনে হয়। তিনটি নাম কেন?

অন্য একটি কথা এখানে তুলতে চাই। আগে বলেছিলাম, লেখক-কবিদের

পক্ষে এ পুরস্কার ক্ষতিজনক। এখন বলি, গোটা সমাজেরই পক্ষে ক্ষতিকর এইসব পুরস্কার ব্যবস্থা। সেই ক্ষতির একটা দৃষ্টান্ত এই যে, আপনাদের মতো বিদ্রোহীরাও 'পুরস্কার' ভাবনাটিকে টেনে আনছেন কেবলই। এর পোষকতা করা যেমন অসংগত, একে আক্রমণ করে সময় নষ্ট করাও তেমনি নিষ্প্রয়োজন। চেতনার মধ্যে একে এতটা বেশি জায়গা দেওয়া কি ঠিক?

অরুণেশ: আপনাকে আমরা বাংলাদেশের একজন scholar বলে জানি। আপনার অগাধ জ্ঞান কবিতাকে কতোটা সাহায্য করে?

শঙ্খ: 'অগাধ জ্ঞান' কথাটা কি ঠাট্টাসূচক? সে যাই হোক, এটা আমাদের দেশের মস্ত এক দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে আমাকেও আপনারা কেউ কেউ scholar বলে জানেন। সত্যিকারের জ্ঞানী কাকে বলে, স্কলারশিপের সত্যি চেহারাটা যে কী, তা আমরা দেখেছি কখনো কখনো। দেখেছি বলেই জানাতে পারি যে আমি কোনো অর্থেই পণ্ডিত নই।

হতেও চাই না অবশ্য। সামান্য কিছু পড়াশুনো করতে ভালোই লাগে, কিন্তু 'ডাকঘর' নাটকে অমল যে সভয়ে বলেছিল, 'না পিসেমশাই, আমাকে পণ্ডিত হতে বলো না, আমি পণ্ডিত হব না', সেইটেকেই সুবিধেজনক পথ হিসেবে জীবনের আদর্শ করে নিয়েছি। যদি থাকত কোনো 'অগাধ জ্ঞান', কবিতাকে তা সাহায্য করত কি না বলতে পারি না, তবে এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো সাহায্য পাইনি।

অরুণেশ: একজন কবির পক্ষে সবসময় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা কি ক্ষতিকর?

শঙ্খ: বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের 'চেষ্টা' বলতে ঠিক কী বোঝায়? চেষ্টা করে কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গেলে জীবনের পক্ষে সেটা কৃত্রিম হবার সম্ভাবনা, কবিতারও পক্ষে ভালো মনে হয় না সেটা। কিন্তু 'জীবনযাপনের' মধ্যেই যদি না থাকেন কবি, তবে সেও তাঁর এক-রকমের ব্যর্থতা। প্রতি মুহূর্তে জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে চাওয়া, হতে পারা, কবিতার পক্ষে সেটা ক্ষতিজনক তো নয়ই, বরং সেটাই কবিতাকে বাঁচাতে পারে বলে আমি মনে করি।

অরুণেশ: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তরুণ ও অতিতরুণ কবিদের মধ্যে নামধামের জন্য লোভ ও লালসা অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে, এরা অতি সহজেই কবি হতে চায়—এর কারণ আপনার কি মনে হয়?

শঙ্খ: সবাই জানেন, ধনতান্ত্রিক সমাজের নিশ্চিত এক নিয়ম হিসেবে সাহিত্য

এখন পণ্য হয়ে গেছে। আর পণ্যের নিয়মে প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞাপন, লাভ এবং ক্ষতির বৃত্তের মধ্যেই ঘুরছে লেখার জগৎ। অনেকেই এর বাইরে দাঁড়াতে চান, কেউ কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন এর বাইরে, কিন্তু তাহলেও ওই উজ্জ্বল বৃত্তের ঘূর্ণি দ্রুত আকর্ষণ করে সবাইকে, দ্রুত ছুঁতে চায় তারা সেই ফলটাকে। লোভ এবং মত্ততা চারিদিকে ছড়ানো আছে বলে খুব স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিতভাবেই ঘটেছে এটা।

অরুণেশ : কমলকুমার মজুমদারের রচনা ভবিষ্যৎ বাংলা গদ্যের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে বলে কি আপনার মনে হয়?

শঙ্খ : প্রভাবের নানারকম দিক আছে। যে-ধরণের গদ্য লিখতেন কমলকুমার, মনে হয় না যে তার থেকে বাংলা গদ্যের কোনো ধারা তৈরি হবে। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরা দেখা দেন দ্বীপের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে। খুবই অল্প লোকে পড়তে শুরু করবে তাঁর লেখা, তার চেয়েও অল্প লোকে পড়ে শেষ করবে সেটা। কিন্তু যারা শেষ করবে, তাদের মনের উপর কমলকুমারের প্রত্যক্ষণের শক্তি বা তাঁর প্রতিমাসৃষ্টির প্রতিভার একটা প্রভাব থেকে যাবে কোথাও। অনেক পরবর্তী রচনাতেও এইভাবে কমলকুমারের একটা পরোক্ষ প্রভাব থাকা সম্ভব।

অরুণেশ : কমলকুমার মজুমদার প্রায় লেখার শুরুতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বন্দনা করে লেখা শুরু করতেন—কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে ঐ লেখা পড়লে রামকৃষ্ণদেব কমলকুমারকে থাপ্পড় মারতেন?

শঙ্খ : না, একেবারেই তা মনে হয় না আমার। অপছন্দ নিশ্চয়ই করতেন রামকৃষ্ণ, কেননা তিনি কথা বলতেন সহজ ভাষায়। কমলকুমারের এই ভাষা যে মানুষের কোনো কাজে লাগবে না, একথা বোঝাবার জন্য রামকৃষ্ণ নিশ্চয় কোনো-একটা প্যারেব্‌ল্ বলতেন মুখে, আমরা আরো একটা অনবদ্য লৌকিক গল্প পেয়ে যেতাম তাঁর কাছ থেকে, আর, হয়তো ঈষৎ লজ্জিত হয়ে উঠে আসতেন কমলকুমার, কিংবা তিনিও শুনিয়ে দিতেন দুচারটে কথা। না, থাপ্পড় মারতেন বলে তো মনে হয় না।

অরুণেশ : সম্প্রতি কলকাতা গিয়ে আমার ধারণা হলো যে কলকাতায় সত্যিকারের কবিতা পাঠক প্রায় নেই-বা খুবই অল্প—অথচ মফঃস্বল শহরগুলোতে আমি ঘুরে দেখেছি সেখানকার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কবিতা পড়া ও বুঝার আগ্রহ প্রবল—আপনার অভিজ্ঞতাও কি অনুরূপ?

শঙ্খ : কলকাতায় তো আপনি অল্পই এসেছেন, আর অল্পই থেকেছেন। তার থেকেই এত বড়ো সিদ্ধান্ত করা কি ঠিক হবে? এটা ঠিক যে, কলকাতার কয়েকটা বিশেষ কেন্দ্রকে আমরা ভুল করে ধরে নিই সাহিত্যচর্চার,

সাহিত্যপাঠের পীঠস্থান। সেসব জায়গায় খোলা চোখ নিয়ে ঘুরলে আপনার প্রতিক্রিয়া খুব সংগত বলেই মনে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, কলকাতারও আছে অলিগলি, কলকাতাতেও আছে শহরতলি। এমন অনেক পাঠক-পাঠিকা হঠাৎ-হঠাৎ আমি দেখেছি এই শহরেই, কবিতা যারা শরীর দিয়ে পড়ে, পড়ে সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে। তারা যতদিন নামহীনভাবে দূরে থেকে যায় ততই ভালো। এটা ঠিকই যে রুচিকেন্দ্রের অধিকারের মধ্যে চলে এলে এদের শেষ পর্যন্ত এক বোধহীন চাতুর্যের দিকে দৌড়াতে হয়, পাঠকের হয় সর্বনাশ। মফঃস্বল শহরগুলিতে কেন্দ্রের এই অধিকার তুলনায় অনেকটা কম বলে সেখানকার তরুণদের পড়ার আগ্রহ হয়ত বেশি, কিন্তু সে-বিষয়ে আমার তেমন কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই।

অরুণেশ : 'ক্ষুধার্ত' ২নং সংখ্যায় 'শব্দ আর সত্য' প্রবন্ধে যে মতামতগুলি আপনি প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

শঙ্খ : অলজ্জ ভাবেই বলতে হচ্ছে যে সেগুলি সম্পর্কে আমার ধারণার বড়ো রকমের কোনো বদল হয়নি এখনো। যে বিপদগুলির কথা মনে হয়েছিল তখন, তার কয়েকটি পরে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে সম্ভাবনার কথা বলেছিলাম, তাও মিথ্যে হয়নি শেষ পর্যন্ত। হতে পারে যে আরো কিছুদিন গেলে ওই প্রবন্ধের ভুলগুলি আমি বুঝতে পারব। অপেক্ষা করছি।

অরুণেশ : আমরা মনে করি ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর পর বাংলা-চলচ্চিত্রে জীবনের নিষ্ঠুর সত্যকে প্রকাশ করার ক্ষমতা এখন আর কারুরই নেই— না সত্যজিৎ রায়ের, না মৃণাল সেনের—এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?

শঙ্খ : তাঁর ছবিতে ঠিক যে জায়গায় আঘাত করতে পারতেন ঋত্বিক ঘটক, বাংলা ছবিতে এখনো পর্যন্ত সেটা যে করতে পারেন নি আর কেউ, তা ঠিক। আমাদের সমসাময়িক সত্যের সঙ্গে চকিতে জীবনের একটা মৌল সত্যকে মিলিয়ে দেবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ঋত্বিকের, সেটা আর কারো ছবিতেই পাই না। ঠিক সেই জায়গাতেই ছবিকে মনে হতো কবিতার মতো। বাংলা ফিল্ম যে কবিতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না, এটা বেশ দুঃখের।

তরুণদের কয়েকজন পরিচালক শুরু করেছেন তাঁদের কাজ। দেখা যাক, এঁরা কী করেন।

অরুণেশ : আপনি সারাদিনে কতক্ষণ পড়াশুনা করেন, কতক্ষণ লেখেন?

শঙ্খ : এই একটি প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে আমিও হয়তো এক ধরণের নৈরাজ্যপন্থী। পড়াশুনো করার বা লেখার কোনো সামগ্রিক হিসেব একেবারেই নেই আমার। অনেক শুনেছি যে লেখকেরা দিনের একটা বিশেষ সময় চিহ্নিত করে রাখেন লেখার জন্য, লিখতে না পারলেও নিয়মিত লেখার টেবিলে বসেন। আমার কোনো লেখার টেবিল নেই। কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাসও চলে গেছে এক লাইনও না লিখে, এমনকী একটা চিঠিও। আবার হঠাৎ, লিখতে কখনো ইচ্ছে হলে সারা দিনরাত্রি জুড়ে লিখছি, এমনও হয়। কবিতা লিখি পথে পথে, গদ্য লিখি ঘরে। কিন্তু যে-কোনো লেখাই একটানা শেষ করে তারপর থামি, বহুদিন আর লেখার সঙ্গে দেখাশোনা হয় না। গদ্যের দাবিদাররা চাপ দিতে দিতে যখন শেষ সীমায় এনে ফেলেন, ত্রস্ত আর কুণ্ঠিত ভাবে তখনই কেবল লিখতে বসি অগত্যা, শুধু সেই দিনটাই আমার লেখার দিন। পড়ার অবস্থা হয়তো এর চেয়ে সামান্য একটু ভালো, কিন্তু বেশি ভালো নয়।

অরুণেশ : কোন কোন বই আপনার প্রিয়, যা আপনি প্রায়ই পড়েন?

শঙ্খ : না পড়া বইয়ের সংখ্যা এখনো এত বেশি যে একই-বই প্রায়ই পড়ার বিলাসিতা করতে পারি কম। তাহলেও ফিরে ফিরে পড়ি রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি বই, বিশেষত তাঁর 'ছিন্নপত্র' আর 'গীতবিতান', আর ইওরোপীয় কয়েকজন শিল্পী আর কবির স্মৃতিকথা, ডায়েরি, চিঠিপত্র। বারে বারেই ঘুরতে ভালো লাগে এইসব রোমাঞ্চকর জীবনের মধ্যে।

অরুণেশ : আপনি কবি হলেও একজন সংসারী মানুষ, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনার কবিসত্তার ক্ষতি করে কি না?

শঙ্খ : যখন লিখতে পারি না কিছু, কিংবা লিখে মনের মতো হয় না একেবারেই, তখন মনে মনে সাব্যস্ত করি যে সাংসারিকতার জন্যই ঘটল এই বিপর্যয়। সেটা যে নিজেরই কোনো অক্ষমতা বা ব্যর্থতা, তা স্বীকার করতে ইচ্ছে করে না। অন্য কিছুর উপর দায় চাপিয়ে দেওয়া আমাদের মর্মগত অভ্যাস। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে কবিতা আর জীবনের সম্পর্ক বিষয়ে যেভাবে ভেবেছি আমি, তাতে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে পালাবার কোনো উপায় নেই। তাকে মেনে নিয়েই, তার চূড়ান্ত সংঘর্ষগুলোর যে সত্তা জেগে ওঠে, তাকেই আমি কবিসত্তা বলে মনে করতে চাই।

অরুণেশ : কবিতা লেখার জন্য কি আপনি কোন অলৌকিক প্রেরণা বা উন্মাদনার উপর নির্ভর করেন, অথবা কবিতা লেখাকে একটা সামাজিক ক্রিয়া বলে মনে করেন?

শঙ্খ : সম্ভবত আগের কোনো প্রশ্নের উত্তরে ইতিমধ্যেই বলেছি যে অসচেতন একটা আলোড়ন এসে না পৌঁছলে লিখতে পারি না আমি। একেই হয়তো প্রেরণা বলা যায়। উন্মাদনা বা অলৌকিক, এই শব্দগুলি হয়তো আমার পক্ষে একটু বেশি ভারি হয়ে যাবে। তবে এটা ঠিক যে আর পাঁচটা সামাজিক কাজকর্মের মতো কবিতা-লেখার কাজটাও ইচ্ছেমতো পরিকল্পনা নিয়ে করতে পারি না, সম্ভব নয় সেটা। কিন্তু ভিন্ন একটা অর্থে কবিতা তো সামাজিকই। চলতি একটা ভুল সামাজিকতার বিরুদ্ধে কবিতা একটা নূতন সামাজিক ক্রিয়া, সে-বিষয়ে সন্দেহ কী।

খোয়াই, নভেম্বর ১৯৮১ সাক্ষাৎকার : অরুণেশ ঘোষ

২

প্রশ্নাবলী

ক-গুচ্ছ

১. কবিতার ভাবপ্রকাশে ছন্দ কি সহায়তা করে, না বাধা জন্মায়? কেউ কেউ মনে করেন, ছন্দের ইতিহাস এক হিসেবে কবিতারই ইতিহাস—এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

২. আপনার বিবেচনায় সাম্প্রতিক কবিতায় ছন্দের গতি কোন দিকে, বিকাশের দিকে না রিক্ততার দিকে? রবীন্দ্র-ব্যবহৃত ছন্দের তুলনায় আধুনিক ছন্দ কোন্ কোন্ বিষয়ে অগ্রগতি, স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা লাভ করেছে?

৩. কবিতার ছন্দসম্পর্কে আপনার নিজের চিন্তায় এমন কি বিশিষ্টতা আছে, যা আপনার রচনায় প্রকাশ পেয়েছে?

৪. আধুনিক কবিতার ছন্দ-বিকাশে পাশ্চাত্ত্য ছন্দোরীতির কোনো প্রতিফলন ঘটেছে কি? যদি ঘটে থাকে তবে কোন্ কোন্ বিষয়ে? বাংলায় মুক্তরীতির ছন্দ (vers libre বা vers libere) প্রবর্তন সম্পর্কে আপনার কি মত?

৫. 'এ যুগ ছন্দ-সন্ধানের যুগ—প্রবোধচন্দ্রের এই মন্তব্য আপনি কি ভাবে গ্রহণ করেন?

খ-গুচ্ছ

১. বাংলা ছন্দশাস্ত্রের একটা গ্রহণযোগ্য কাঠামো মোটামুটি তৈরি হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন? তিন ছন্দোরীতির বিভিন্ন নাম সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? বিভিন্ন নামের মধ্যে কোন্ কোন্ নাম আপনার মতে স্বীকৃতিযোগ্য?

২. ছান্দসিকের ছন্দচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া কি কবিদের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক? ছান্দসিক ও কবির মধ্যে ছন্দচিন্তার যোগাযোগের বা বিনিময়ের কি কোনো সার্থকতাই নেই?

৩. উদীয়মান কবিদের পক্ষে কি ছন্দ-ব্যাকরণের জ্ঞানলাভের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে?

উত্তর :

ছন্দের ইতিহাসকেই কবিতার ইতিহাস কে বলেছেন, আমি জানি না ঠিক। যদি কেউ বলে থাকেন, তাঁর সঙ্গে আমার ভাবনার মিল হবে না। বাংলায় এ-রকম বই ইতিমধ্যেই দুচারটি লেখা হয়েছে, যেখানে ধরা আছে আমাদের ছন্দের ইতিহাস। তার যোগ্যতা অনেক, কিন্তু সেসব বই থেকে কবিতার বা কবিহৃদয়ের কোনো ধারা পাওয়া যায় না। উল্টোপক্ষে, এটা ঠিক যে কবিতার ইতিহাস এমন করে লেখা সম্ভব, কবিমনের পরিচয় এমন ভাবে আবিষ্কার করে নেওয়া সম্ভব, যার থেকে পরোক্ষে গড়ে ওঠে একটা ছন্দেরও ইতিহাস। তাই ইচ্ছে করলে বলা যায়, কেউ কেউ বলেও থাকেন, কবিতার ইতিহাস হলো তার টেকনিকের ইতিহাস। দুটো কথা ঠিক এক নয়। আর এই দ্বিতীয় কথাটি যে আরাগঁ-র, বিষ্ণু দে'র সৌজন্যে এখন তা অনেকেই জেনে গেছেন।

অল্পবয়সীদের মধ্যে যেমন, জ্ঞানীগুণী অনেকের মধ্যেও তেমনি, 'ছন্দ' শব্দটি খানিকটা গোলমাল তৈরি করে। সকলেই জানেন, কিন্তু খেয়াল করেন না অনেক সময়ে যে দুটো ভিন্ন অর্থে এই শব্দের ব্যবহার হতে পারে। প্রকৃতির একটা ছন্দ আছে, ওই মেয়েটির চলার ছন্দ বেশ কিংবা ওর জীবনযাপনের ছন্দ নেই কোনো—এসব বললে আমাদের কারো অসুবিধে হয় না। অন্যদিকে, 'বাংলা ছন্দের কটা রীতি' এই প্রশ্ন তুললেই ও-শব্দের আরেকটা বিশিষ্ট

অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। দুয়ের মধ্যে একটা যোগ আছে নিশ্চয়, অথচ দুই একেবারে এক জিনিসও নয়।

মুশকিল হতো না, যদি প্রথম অর্থ টার প্রয়োগ শৈলীবিচারের জগতেও না চলে আসত। কথা বলার সুচারু ছন্দ যদি হতে পারে, তবে সুষমাময় গদ্যেরও কি একটা ছন্দ হতে পারে না? পারে নিশ্চয়। কিন্তু এ হলো ব্যাপকতর অর্থে ছন্দ, যার ইংরেজি বলা যায় rhythm। বিশিষ্ট অর্থে যে ছন্দ, যার ইংরেজি metre, তারও মধ্যে নিশ্চিত আছে এক rhythm; কিন্তু rhythm মাত্রেই metre-বদ্ধ নয়। ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে অসুবিধে নেই, বাংলায় যখন দুক্ষেত্রেই ছন্দ বলছি, তখন কোথায় কোন্‌টিকে লক্ষ করছি বুঝিয়ে বলা শক্ত হতে পারে অনেক সময়ে। এই জটিলতা, প্রয়োগের এই অস্পষ্টতা এড়িয়ে যাবার জন্ম পবিত্র সরকার বা শিশিরকুমার দাশের মতো কেউ কেউ দুক্ষেত্রে দুই ভিন্ন শব্দের প্রস্তাব করছেন আজকাল। করতে পারলেই ভালো। আমি নিজে অনেকদিন ধরে লিখে আসছি স্পন্দ আর ছন্দ।

স্পন্দ বা rhythm অর্থে যে ছন্দ, তার অস্তিত্ব ছাড়া কোনো কবিতা উত্তীর্ণ হতে পারে না। কিন্তু metre অর্থে যে ছন্দ সেটা কখনো-বা ভাবপ্রকাশের বাধা হয়ে দাঁড়াতেও পারে। বাধা হয়ে উঠছে না উপায় হয়ে থাকছে, তা নির্ভর করে কবির প্রকৃতির উপরে, কবিতার প্রকৃতির উপরে। গিন্সবার্গের Howl বাঁধা ছন্দে লেখা হবে, এটা ভাবা মুশকিল। শক্তির 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়' বিষয়েও বলা চলে ওই একই কথা।

এই যে metre অর্থে ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাঁধা হয়ে গিয়েছিল তার তিন রীতি, পরবর্তী কবিদের এ নিয়ে তেমন আর ভাবতে হয়নি। তাঁরা কেবল দেখছিলেন যে বাঁধনগুলিকে কোথাও কোথাও অল্প পরিমাণে খুলে নিলে নতুন কোনো ধ্বনি তৈরি হয় কি না এর থেকে। সেদিক থেকে, রবীন্দ্রনাথের পর, বড়ো কিছু কাজ হয়েছে অক্ষরবৃত্ত বা স্বরবৃত্তে। অক্ষরবৃত্তের যে সংশ্লেষণ আর বিশ্লেষণ প্রবণতা আছে, সে-দুটিকেই চূড়ান্ত ব্যবহার করেছেন আধুনিক কবিরা এই চল্লিশ বছর জুড়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা মঙ্গলাচরণের অত্যাশ্চর্য সংশ্লেষণ ভঙ্গি বা জীবনানন্দের নিরন্তর বিশ্লেষণের মেজাজ পরবর্তী কবিরা অনায়াসেই নিয়ে আসেন তাঁদের লেখায়, উৎসের খোঁজ না রেখেও। এতেই বোঝা যায় যে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে আজ। আর স্বরবৃত্তে প্রতিটি পর্ব যে চার দলেই বিন্যস্ত হবে, এই রাবীন্দ্রিক প্রয়োগ বা প্রবোধচন্দ্রীয় হিসেব লঙ্ঘন করে পাঁচ দলের সম্প্রসারণ প্রায়ই আনছেন কবিরা। এটা ঠিক যে এর ফলে আসছে একটা পৃথক স্পন্দ, স্বরবৃত্তের একটা নতুন সম্ভাবনা এখনো

সাধনে খোলা আছে মনে হয়। এরই সঙ্গে লেখেন অনেকে গদ্যস্পন্দের আয়ত্তনে, কিন্তু সে যে কেবল ছন্দজ্ঞানের অভাববশত তা নয়, লিখতে ভালো লাগে বলেই লেখেন। তাই, 'কবিতার ছন্দের গতি রিক্ততার দিকে' এমন কথা আমি মনে করতে পারি না কিছুতেই।

কিন্তু আমার রচনায় ঠিক কী প্রকাশ পেয়েছে, সেটা বোধ হয় অন্যের বিবেচনার বিষয়। কিছু যে প্রকাশ পেয়েছে, এও জোর করে বলা শক্ত। এমনও দাবি করা যায় না যে এ-প্রসঙ্গে আমার চিন্তায় তেমন কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে। এইটুকু কেবল বলা যায় যে, অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে যে ছন্দ-ভাবনায় ভুলভাবে দুই প্রান্তের সৃষ্টি হয়েছে কবিসমাজে। অনেকে মনে করেন যে ছন্দে বা মিলে কবিতা লেখা মানেই আধুনিকতার পরিপন্থী হয়ে ওঠা, কুমুদরঞ্জনের পৃথিবীতে পিছিয়ে যাওয়া। আবার অন্যেরা ভাবেন যে ছন্দের মিলের কারুকাজ ছাড়া কবিতা হতেই পারে না কখনো। 'এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল', মনে হয়েছিল আমার। এই দুরকমই লিখতে পারেন কোনো কবি, তাঁর খুশিমতো, আবার নিতে পারেন এক তৃতীয় পথও। এই তৃতীয় পথটায় আমার কৌতূহল আছে। ছন্দোহীন ভাবে শুরু হয়ে কবিতা সহসা, অগোচরে প্রায়, এগিয়ে যেতে পারে ছন্দেরই দিকে, যেমন, ছন্দ দিয়ে শুরু করেও তিনি পৌঁছে যেতে পারেন ছন্দোহীনতায়, নিছক-স্পন্দে। এই যাওয়া-আসাতে যদি কোথাও কোনো অসংবৃত ধাক্কা না লাগে, তাহলে সেটাই হতে পারে আমাদের আজকের দিনের অনায়াস ছন্দ, বাক্‌স্পন্দের সবচেয়ে কাছাকাছি, আমাদের প্রতিদিনকে ধরবার যোগ্য এক কাব্যকৌশল।

অনেক সময়ে বলা হয় বটে যে আধুনিক কবিতায় পাশ্চাত্ত্য ছন্দোরীতির প্রতিফলন আছে। 'রীতি' কথাটা যে-অর্থে আসে ছন্দের আলোচনায়, সে-অর্থে ওই প্রতিফলনের ধারণা বিশেষ সত্যি বলে মনে হয় না আমার। ছন্দে স্তবক পরিকল্পনা, মিল-বুনোনের ধরণধারণ, প্রবাহ বা সংঘাত তৈরী করবার প্রবণতা কখনো কোনো বিদেশী কবিতাকে মনে করিয়ে দেয় বটে—কিন্তু এর সঙ্গে ছন্দোরীতির কোনো সম্পর্ক নেই। একমাত্র গদ্যস্পন্দের প্রয়োগে বিদেশী রচনার অনুষঙ্গ কিছুটা মনে পড়ে, আর অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা পড়তে গিয়ে চলে আসতে পারে হপকিন্সের স্প্রাং রিদমের ঈষৎ স্মৃতি, এই শুধু।

ছন্দের কিছু আওয়াজ রেখেই তার মধ্য থেকে যদৃচ্ছ স্বাধীনতা নেওয়া, বিভিন্ন ছন্দকে মিলিয়ে দেওয়া অনায়াসে, কিংবা ওই আগে যেমন বলেছি, ছন্দ থেকে ছন্দোহীনতা বা ছন্দোহীনতা থেকে ছন্দে পৌঁছে যাওয়া অগোচরে

—এরই মধ্য দিয়ে হয়তো তৈরী হতে পারে ভাবীকালের যোগ্য মুক্তছন্দ বা ফ্রী ভার্স। এখানে মনে করিয়ে দেবার বোধহয় দরকার নেই যে ফ্রী ভার্স বলতে 'আমি ঠিক গদ্যস্পন্দকেই বুঝি না, তার জন্য আছে ভিন্ন একটি শব্দ : prose poem।

'এ যুগ ছন্দ-সন্ধানের যুগ' কথাটি প্রবোধচন্দ্র কী অর্থে বলেছেন, প্রসঙ্গ-বিচ্যুত ভাবে সেটা ঠিক করা যায় না। যদি গোটা এই আধুনিক যুগের কথা হয়, তাহলে কথাটি সব অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ। ছন্দের ব্যাকরণ ছন্দের ইতিহাস যেমন ভাবে লেখা হচ্ছে সম্প্রতিকালে, কবিরা ছন্দের বন্ধন এবং মুক্তির বিচিত্র পরীক্ষার মধ্যে যেভাবে জড়িয়ে রেখেছেন নিজেদের, তাতে একথা বলা নিশ্চয় অসংগত নয় যে এ যুগ ছন্দসন্ধানের যুগ।

ছন্দ নিয়ে সূক্ষ্ম তর্কের অবশ্য শেষ নেই এখনো। তাহলেও বলা চলে, গত প্রায় ষাট বছরের চেষ্টায় বাংলা ছন্দশাস্ত্রের একটা গ্রহণযোগ্য কাঠামো তৈরি হয়েছে। তর্কের ঔৎসুক্য যাঁদের, তাঁরা আরো বহুদিন তর্ক করবেন, সাধারণ পাঠকের এই নিয়ে বিশেষ সমস্যা হবে না।

কিন্তু কাঠামো মানে নাম নয়, পরিচয়। বাংলায় তিন রীতির ছন্দকে চিনে নেবার যে পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন, সেইটেকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তবে ছন্দ-নাম হিসেবে অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্তকে চলতে দিলে তেমন-কোনো অসুবিধে ছিল না হয়তো। বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায়, নামের মধ্যেই বিষয়ের পরিচয় ধরবার চেষ্টায় প্রবোধচন্দ্র আজ মিশ্রবৃত্ত কলাবৃত্ত দলবৃত্ত নামগুলির প্রয়োগ করেন। কিন্তু মুশকিল এই যে প্রবোধচন্দ্রেরই চেষ্টায়, ষাট বছরের চেষ্টায়, আজ ব্যাপক হয়ে উঠেছে ছন্দ-ব্যাকরণের ভাবনা বা পরিচয়, আর সে-পরিচয় অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত নামের উপর ভর করেই সাধারণের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আজ আর এই পরিভাষাগুলিকে কনোটেটিভ করে তুলবার আয়োজন না করে ডিনোটেটিভ দশাতেই রেখে দেওয়া বরং ভালো। তারপরে এই রীতিগুলির চরিত্রবিচার চলতে পারে অনেকদিন ধরে, সেটা ছান্দসিকদের ব্যাপার।

অবশ্য, ছান্দসিকদের এত সব ভাবনার সঙ্গে যদি পরিচিত হতে চান কবিরা, হন যদি, সে তো ভালোই। কিন্তু সেটাকে তাঁদের পক্ষে এত বেশি 'প্রয়োজনীয়' বলে মন্তব্য করা সহজ নয়। ছন্দ-ব্যাকরণে অনেক অজ্ঞতা বা অস্পষ্ট বোধ নিয়েও ছন্দের প্রখর বোধে পৌঁছে আছেন, এমন উদাহরণ কবিসমাজে বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার প্রমাণ, আধুনিক কালে বিষ্ণু দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার প্রমাণ। বরং, আমার কখনো কখনো আশঙ্কা হয়, ছন্দ-ব্যাকরণ নিয়ে অতিশয় মাতামাতি কবির পক্ষে

অল্পস্বল্প ক্ষতিজনকও হতে পারে। তখন হয়তো সত্যি সত্যি তাঁদের কবিতায় ছন্দের ইতিহাসই থাকবে শুধু, তাঁদের ছন্দের কবিতার ইতিহাস তৈরি হবে না আর। ছন্দের ইতিহাস লিখবার জন্য বিজয়চন্দ্র মজুমদারের পঙ্ক্তিপঙ্ক্তির উদাহরণ দেওয়া যায় অনেক সময়ে, কিন্তু কবিতার ইতিহাস লিখবার জন্য মনে করবার দরকার করে না তাঁদের মতো রচয়িতাদের।

সিদ্ধার্থ, বিশেষ ছন্দ সংখ্যা ১৩৮৫

৩

কবির চিন্তায় বাংলা ছন্দ

১। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোনৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যের গুরুত্ব কতখানি? তার দ্বারা বাংলা কাব্য কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে?

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথ এত কিছুই করেছেন, এর প্রধান তিনটি ছন্দ-রীতিকে এমন ভাবেই মার্জিত করেছেন, আর এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে এত যে, আজ আর নতুন করে এ বিষয়ে বলবার কোন মানে নেই। বাংলা ছন্দে তাঁর গুরুত্ব স্বতঃসিদ্ধ। কেবল, প্রশ্নটিতে ওই মস্ত নামের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কথা আছে বলেই হয়তো একটা মন্তব্য করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময় বলা হয়েছে ছন্দের যাদুকর, ছন্দের দিক থেকে কেউ কেউ তাঁকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও গণ্যমান্য ভেবেছিলেন একদিন। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দ-চর্চা ছিল কেবল বাইরের সাজসজ্জা। তার জৌলুশ ছিল খুব, কিন্তু কবিতার সঙ্গে তার ভিতরকার যোগ ছিল খুব কম। ছন্দের কতরকমই তো পরীক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কখনো সে-পরীক্ষা এতটা উৎকট হয়ে ওঠেনি যে কবিতা ছাড়িয়ে গিয়ে ছন্দ তার নিজের চেহারাই দেখাবে। সেরকম যখন ঘটে, তখন সেই রচনাকেই লোকে বলে ছন্দোনিপুণ। সত্যেন্দ্রনাথের ছিল সেইটে, আর সেইজন্যেই আজকালকার বাঙ্‌লা কবিতায় তাঁর ছন্দ বিশেষ কোনো কাজে লাগে না আর।

২। আধুনিক কবিদের রচনায় তাঁদের ছন্দের কোন প্রভাব আছে কি? থাকলে কতখানি আছে ও তার গুরুত্ব কি?

সত্যেন্দ্রনাথের ব্যাপারে এ-প্রশ্নের উত্তর এর আগেই বলা হয়ে গেছে। আর রবীন্দ্রনাথ? বাংলা ছন্দকে যে-রকম সর্বতোভাবে নমনীয় করে তুলেছিলেন

তিনি, তার ফলেই সে ছন্দ আজ সবার হাতে খেলছে অনায়াসে। এইটেকে যদি বলা যায় প্রভাব, তবে রবীন্দ্রনাথের ছন্দোরীতির প্রভাব আজও আছে, তা বলতে হবে। এমন-কি, যেখানে আজকের কবিরা ছন্দ বা মিল ছেড়ে দিয়ে লিখতে চাইছেন অনেকে, সেখানেও মনে রাখতে হয় রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামিতার কথা। একে আলাদা করে প্রভাব বলবার মানে নেই অবশ্য, বলতে হয় যে এটা আজ ঐতিহ্যের অংশ মাত্র।

৩। ছান্দসিকের ছন্দ-আলোচনার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে কি? তাতে কবিদের ছন্দ-সচেতনতার ও ছন্দ-রচনার কোন সহায়তা হয়েছে কি? হয়ে থাকলে কিভাবে ও কতখানি হয়েছে?

পৃথিবীর যে-কোন বিষয়কে জানাবার এবং তার আলোচনা করবার একটা সার্থকতা আছে, জ্ঞানই মুক্তি, তাই ছন্দ-আলোচনারও নিশ্চয় সার্থকতা আছে একটা। কিন্তু এই আলোচনা থেকে কবিরা খুব উপকৃত হন, এটা মনে করা শক্ত। ভাষার পরে যেমন তার ব্যাকরণ, কবিতার পরে তেমনি তার ছন্দ-বিচার। যে-কবির ছন্দের কান নেই, ছান্দসিকদের কাছে বুঝে নিয়ে সেই কান বা পরীক্ষা তৈরি করবেন তিনি—এ রকম আশা করা বাতুলতা। পদ্য-লেখকরা কখনো কোনো ছান্দসিকের সূত্রে লক্ষ রেখে ছন্দ রচনা করেন হয়তো, কিন্তু সে তো কবিতা নয়!

৪। বিভিন্ন ছান্দসিকের মতামত সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? প্রবীণ ও নবীন ছান্দসিকদের ছন্দ-আলোচনায় দৃষ্টিভঙ্গীগত কোন পার্থক্য আছে কি? যদি থাকে তবে পার্থক্য কোথায়?

পঞ্চাশ বছর জুড়ে বাঙলার একটি নিজস্ব ছন্দশাস্ত্র গড়ে তুলতে চাইছেন প্রবোধচন্দ্র সেন। আলোচনা করছিলেন আরো অনেকে: রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, দিলীপকুমার রায় কিংবা অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। এঁদের মতবিরোধের পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কেবল এইটুকু বলা যায় যে অন্যের এবং নিজের ধারণার নিরন্তর পুনর্বিচারে প্রবোধচন্দ্র প্রায় একটা বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। ছন্দ-আলোচনার একটি ব্যবহার-যোগ্য রূপ দিয়েছেন তিনি, আধুনিকদের কাছে গ্রাহ্যও হয়েছে সেই রূপ।

নবীন ছান্দসিক? নবীন কোন ছান্দসিক নেই। এটা ঠিক যে গত পনেরো বছরে ছন্দ আলোচনার একটা নতুন ঢেউ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এ আলোচনা কোন মৌলিক ভাবনা নির্ভর নয়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে, নবীনেরা যা করেছেন তা হলো ছাত্রপাঠ্য সরলীকরণ। ছন্দ-সমস্যায় যে নতুন কোনো প্রশ্ন তাঁরা তুলছেন, তা নয়। আর তাই, এসব প্রবন্ধ বা বইয়ের লেখককে ছান্দসিক বলার কোনো মানে নেই।

বাংলা ছন্দের ভিত্তি-পরিচয় একরকম তৈরি হয়েছে। আজ আলোচনার দরকার ছিল তার ভিতরকার স্পন্দনের চরিত্র, কবিতার সঙ্গে ছন্দের যোগ। কিন্তু সে আলোচনায় আজও পর্যন্ত উৎসাহ বড়ো কম।

৫। আধুনিক কবিদের রচনায় পাশ্চাত্ত্য ছন্দের প্রভাব কতখানি? তাতে বাংলা কাব্য কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে?

ছন্দ-চরিত্র ভাষা-চরিত্রেরই উপর নির্ভর করে, তাই ভিন্ন দেশের ভিন্ন ছন্দের কোন সত্যিকারের প্রভাব থাকবার কথা নয় বাঙলায়। বাইরের দু'একটি ধরণধারণে থাকে হয়তো কিছু যোগাযোগ। এখনকার প্রবীণ কবিরা—বিশেষত বিষ্ণু দে—পশ্চিমী বিন্যাস মনে রেখে অনেক সময়ে লিখেছেন ভিলানেল বা ট্রিয়োলেট বা বালাদ, এইটুকু মাত্র বলা যায়। একদিন যেমন লেখা হতো সনেট।

৬। আপনার নিজের রচনায় রাবীন্দ্রিক ও পাশ্চাত্ত্য ছন্দের আনুপাতিক প্রভাব কতখানি এবং আপনার নিজের বিশিষ্টতা কি? এই বিশিষ্টতা অর্জিত হল কিভাবে? নবীন কবি ও ছান্দসিকরা তার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছেন?

আমার রচনায় ছন্দের যদি কোন বিশিষ্টতা থাকে, সেটা আমিই বলে দেব কেন? চেষ্টা হয়তো করেছি কিছু কখনো,—কিন্তু যদি কারো তেমন-কোন আগ্রহ হয়, তিনি নিজেই সেটা বুঝে নেবেন একদিন, আশা করি।

বাংলা ছন্দ সমীক্ষা, এপ্রিল ১৯৭৭, গবেষণা পরিষদ, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৪

প্রসঙ্গ : বুড়িরা জটলা করে

বুড়িরা জটলা করে
আগুনের পাড়ায়
দু-ধারে আঁধার জল
পাতাল নাড়ায়

আবছায়া জাহাজ ঘিরে
মাতালের সাঁতার

কেউ-কেউ আলোক ভাবে
কেউ-কেউ আঁধার

রাত্রির কুণ্ডলীও
কুয়াশায় কাঁপে
বুড়িদের জটলা নড়ে
অতীতের ভাপে

বুড়িরা জটলা করে
বুড়িরা জটলা করে

প্রশ্ন ।। শঙ্খ, আমার প্রথম প্রশ্নটি, বলা যায়, ঐতিহাসিক দিনক্ষণ সংক্রান্ত। কোন্ পরিবেশে এই বিশেষ কবিতাটি লিখেছেন আপনি ?

উত্তর ।। পরিবেশ মানে, নিশ্চয়ই, আমি লেখার সময় কি ভাবছিলাম, না এই ব্যাপারটা কীভাবে আসছিলো ?

প্রশ্ন ।। দুটোই হয়তো। কেন এই প্রশ্ন তুললাম তার কারণটা বলি। অলোকরঞ্জন আমাকে প্রাসঙ্গিক একটি আভাস দিয়েছিলেন। তিনি এমন-কী আপনার এই কবিতার প্রস্থানভূমি সংক্রান্ত একটি বিশেষ সিচুয়েশনের কথাও আমাকে বলেছিলেন।

উত্তর ।। আচ্ছা, অলোক কি বলেছে…জানি না ঠিক আমি ওকে বলেছিলাম কিনা কখনও।

প্রশ্ন ।। আলোকরঞ্জনকে নিশ্চয়ই ব'লে থাকবেন। আপনাদের দুজনের দীর্ঘ পথে-পথে হাঁটার কোনো একটি মুহূর্তে হয়তো কোনো ভাবানুষঙ্গ এসেছিল। কোনো একটি চক্র বা মণ্ডলী আপনার দেখার মধ্যে ছিল হয়তো। তিনি কি তাহলে ভুল বলেছেন, নাকি আমি ভুল বললাম ?

উত্তর ।। হ্যাঁ, ঠিকই—ওটা…আমার যতদূর মনে পড়ছে, এটা প্রায় দশ-এগারো বছর আগের লেখা—আমি সন্ধ্যায় ফিরছিলাম, একটু বেশি রাতেই—বাড়ি ফিরছিলাম—শীতের রাত। আর ঐ-রকম কয়েকটি বুড়ি, যারা মোটামুটি রাস্তাতেই বা বস্তিতেই থাকে, সে-রকম কয়েকজন ঘিরে ব'সে আছে একটা আগুনের কুণ্ডলী—শীত তাড়াচ্ছে—তাপ নিচ্ছে ওখান থেকে। আমি বাড়ি ফিরবার পথে সেটা দেখেছি—সেই ছবিটা আছে এই কবিতাটার মধ্যে—সেই ছবিটা ঠিকই আছে। তবে আমার যতটুকু মনে পড়ছে—লেখার ব্যাপারটা—সেটা…আমার সে সময়ে মনটা একটু নানা কারণে বিধ্বস্ত ছিল। ফলে ছবিটা দেখার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য কতকগুলো ছবি ঘিরে আসতে থাকে। যেমন একটা—

ওদের দেখেই আমার...কয়েকজন বুড়ি বসে আছে, আগুনের তাপ নিচ্ছে—এ কথাটা ভাবতে ভাবতেই সঙ্গে-সঙ্গে—এটা কেন হয় আমি জানি না—Macbeth-এর witches-দের ছবি ফুটে ওঠে হঠাৎ আমার কাছে। এট আগেও দু'একবার হয়েছে এরকম। এও হতে পারে যে সেই ছবিতে ছিল···তিনজন বুড়িই ছিল আসলে, ব'সে ছিল। তখন—এটা ঠিক আমি বলতে পারব না যে কীভাবে হয়েছে, কিন্তু অনেকগুলো জিনিস একসঙ্গে ঘ'টে যায়—ঐ witches-দের ছবির কথা মনে হয়, ফলে জীবনের যে একটা ভীষণ কোনো ভাবষ্যৎ ইঙ্গিত, সেই কথা মনে হয়। অথচ এরা যে বসে আছে, সেটা সবগুলো অতীতের উপর—past-এর উপর ব'সে আছে—আর আমার কাছে flash করছে ভবিষ্যৎটা। এইটে ভাবতেই, দুটো জিনিস একত্রে মিলিয়ে গিয়ে হঠাৎ লাইনটা চ'লে আসে। তারপর লিখতে শুরু ক'রে দেখেছি, সত্যি এটা শুধু এই কবিতায়ই নয়, অনেক সময়ই এটা হয়েছে যে আমি—আমি জানি না অন্যেরা কীভাবে লেখেন—কিন্তু প্রায় কোনো কবিতায়ই পুরো কবিতাটা কী হবে বা theme-টাই বা কী, সেটা আমার কাছে আগে কিছু স্পষ্ট থাকে না। ছবিটা আসে, কয়েকটা লাইন হয়তো আসে, সেইটে যতটা বাড়ে সেইখানে নিয়ে যাই। এবং তারপর হয়তো···তার মানে কিছু হলো কিনা আমি জানি না—খুব যে ভেবেছি এর মানে নিয়ে তা নয়—তবে ঐ সময়কার ঐ মন-খারাপের ব্যাপারটা, শীত তাড়ানোর ছবিটা, ম্যাকবেথ-এর কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে যাওয়া, আর এরা এখনও বাঁচবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ—এই এটা কি রকম contrast-এর মতো লাগতে থাকে, এই সব মিলিয়ে এটা লিখে ফেলেছি। আমি জানি না, ঠিক উত্তর হলো কিনা, কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু আর বলবার নেই।

প্রশ্ন ।। আপনার ছিমছাম ছোট্ট এই রচনার আরেকটি দিক নিয়ে এবারকার প্রসঙ্গ। আপনার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে বারকয়েক আলোচনা করার সুযোগও হয়েছে। তা হলো ভাষার 'কাব্যিক' ব্যবহার। আপনার মাতৃভাষার দৈনন্দিন ব্যবহারের একটি এলাকা আছে—রাজনীতিজ্ঞ, সংবাদপত্র, পোস্টার, পথের মানুষ যা কাজে লাগায়। এই প্রতিবেশে আপনার কাব্যভাষার স্থানটি কোথায়? কী ক'রে কবিতা নির্মাণ করেন আপনি?

উত্তর ।। এটা খুব বড় প্রশ্ন। আমাকে হয়তো তাহ'লে একটু পুরনো কথা বলতে হবে। আমি যখন লিখতে শুরু করেছি গোড়ায়, প্রথমদিকে যখন লিখতাম, তখন আমার লেখায় খুব, যাকে poetic language বলা যায়··· কিছুটা উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা বা খানিকটা সাজানো কথা—সেগুলো খুব ভিড় ক'রে আসত, খুব বেশিই ছিলো। এবং খুব অল্প বয়সেও সেটা কারও-কারও মনে হয়েছিলো যে সেটা খুব ভালো। আমি তখন ভালোমন্দ খুব বুঝতাম

না, লিখেছি এ-রকম। কিন্তু তারপর একটা ব্যাপার হয়—এই চারদিকে কবিতা লেখা দেখতে দেখতে আমার খুব ক্লান্ত লাগে—you have a feeling of that right now, I think—যে বড় বেশি লেখা—সবাই···চতুর্দিক থেকে চিৎকার—লেখার মধ্যেই একটা চিৎকার শুনতে পাওয়া যায় যার কোন মানে নেই মনে হয়।

তখন এটা হয়েছিলো যে আমি কিছুদিন লেখার জগৎ থেকে একটু দূরে ছিলাম। আর আমার মনে হয়েছিল যে আমিও যা-কিছু লিখছি সেটা কোনো লেখা নয়, আর চারপাশে যে লেখা হচ্ছে সেও কিছু লেখা নয়, কেননা বানানো কথা এগুলো মনে হয় সব। আর তখনই, poetic language বলতে যেটা বোঝায়—মানে, আমার এখন মনে হয় যে কোনো particular poetic language ব'লে কিছু নেই—কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ মনে তৈরি হ'তে থাকে। তখন আমি ছোট-ছোট কিছু লেখা লিখতে শুরু করি যেটা আয়তনে ছোট আর শব্দ ইত্যাদির ব্যবহারে একেবারে ঘরোয়া, চলতি—যা লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় সেইরকম শব্দ চ'লে আসে। সেগুলো লিখতে থাকি—আর তখন আমার প্রায় তিরিশ বছর বয়স—কিন্তু তখন আমার সেই সাহস ছিল না সে গুলোকে ছাপতে দেবার। আমার মনে হয়েছিল যে এগুলো লেখা নয়, তার কারণ চলতি লেখার সঙ্গে তো মিলছে না কিছুতেই, এগুলো নিশ্চয়ই লেখা নয়, এইটে মনে হতো। তারপরে অবশ্য ছাপা হয়েছে সেগুলো, সেরকমই একটা 'বুড়িরা জটলা করে'। আমি যখন 'বুড়িরা জটলা করে' লিখেছি তখন আমার কবিতা খুব কম ছাপানো হতো, খুবই কম। আর সেইটে আমার কাছে একটা মস্ত relief ছিল যে, আমি একেবারে একলা গোপনে লিখতে পারছি—কেউ তো পড়বে না, কাজেই আমার ভয় নেই কিছু। এর থেকেই, চলতে ফিরতে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়—যেমন ঐ 'ভিড়' কবিতাটায় সে-রকম আছে—ওরকম আরও অনেকগুলো লিখেছিলাম। সত্যি-সত্যিই ওর কথাগুলো একেবারেই বাসে-ট্রামে শুনতে পাওয়া কথা, সেইটেই বসিয়ে যাওয়া। তার থেকেই আমার মনে হয়, হবে না কেন, তাতেও তো কবিতা হ'তে পারে! আর পরে দেখেছি—অনেক পরে—যে, সেটা মোটের উপর পাঠকের কাছে কোথাও-না-কোথাও পৌঁছেও যাচ্ছে। অন্তত দু'চারটে ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে যে সেইগুলিই অনেকের কাছে ঠিক-ঠিক পৌঁছচ্ছে। এখন এতদিন পর আমার মনে হয় যে—খানিকটা প্রায় তত্ত্বগত ভাবে ভাবতে শুরু করেছি যে—আমি কবিতার ভাষাকে সেরকম ভাবতে চাই যার মধ্যে এই সাজানো ব্যাপার একেবারেই থাকবে না বা থাকলেও সামান্যই, মানে যত না থাকে ততই ভালো।

যাকে ভাষার একেবারে ভেতরে যাওয়া বলে—core of the language—সেইটে ছুঁতে পারা যায় এর মধ্যে থেকে, এইটে আমার মনে হয়। যেমন একটা জিনিস—আমি জানি না এটা out of the way হ'য়ে যাচ্ছে কিনা. কিন্তু এইটে বলছি যে—অনেকদিন পর্যন্ত আমার একটা নিজের কবিতার বিষয়ে দ্বিধা ছিলো যে এটা বোধ হয় তেমন কবিতা নয়। তার কারণ, বাংলা সমালোচনায় বা বাংলা কথাবার্তায় ঐ ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো যে উপমাই কবিত্ব—simile is the essence of poetry। আর এটা এত বেশি বলা হয়েছে এবং যাঁরা লেখেন তাঁরা সত্যি-সত্যি এত ভালো উপমা ব্যবহার করতে পারেন যে আমি অনেক সময় বিপন্ন বোধ করেছি যে, আমি তো পারি না সে-রকম কিছু লিখতে। আমি খুঁজে দেখেছি যে, আমি সেরকম ব্যবহার করতে পারি না। একটা সময় আমার মনে হতো, এটা একটা ত্রুটিই হয়তো আমার। কিন্তু আমি সে ত্রুটিটা মিটিয়ে নেবার কোন চেষ্টা অবশ্য করিনি, কারণ যা পারি না তাতো আর পারা যায় না, কী করা যাবে। কিন্তু এখন আবার, মাঝে দু'তিন বছর ধ'রে, এটা আমার জোর ক'রেই মনে হচ্ছে যে সেই সমস্ত বাদ দিয়েই যত বেশি লেখা সম্ভব, সেটাই লেখার ঠিক-ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারে। কবিতার ভাষা সম্পর্কে আমার মনে হয় যে, একেবারে সাদাসিধে কথাবার্তা তুলে আনা, সেইটেই কবিতা – তার চেয়ে বড় কবিতা নেই কিছু।

প্রশ্ন ।। শঙ্খ, এই কবিতায় আপনি অন্ত্যমিলের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এটা কি আপতিক, না আবশ্যিক ছিল?

উত্তর ।। ছন্দের ব্যাপারটা—অনেক সময় এটা হয়। আমি বলেছি তো একটু আগেই যে, এটা…পথ চলতি ছবিটা দেখছি, দেখতে-দেখতে এগুচ্ছি। আমার অনেক কবিতাতেই—বেশির ভাগ কবিতায়ই হয়তো—এই চলার ব্যাপারটা আছে, অর্থাৎ হাঁটতে-হাঁটতে লেখা। কখনও কখনও হয়তো ব'সে কোনো কবিতা এসেছে, বা শুয়ে কবিতা এসেছে—সেটা অন্য ধরণ হ'য়ে যায়। হাঁটার মধ্যে যেটা হয়, হাঁটারই একটা rhythm কাজ করতে থাকে এবং সেইটে fina(l) ক'রে আসে কবিতার মধ্যে। ওটায় একটা জিনিস এই যে, চলতে চলতে ছবিটা চোখে পড়েছে, তার থেকে ভাবছিলাম, তারপরে হাঁটার মতন ক'রেই কথাগুলো এসে গেছে। এ ছাড়া ঐ বিশেষ কবিতাটাতে হয়তো আর একটা জিনিস থাকতেও পারে—এটা অবশ্য a sort of after-thought—যে, বুড়িরা জীবনের শেষে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু বাঁচবার চেষ্টা করছে, আগুনের সামনে বসে তাপ নিচ্ছে—এই contrast-টা আমার মনে হয়েছিলো এই যে,

এই অন্ন ছন্দে এটা হয়তো আসতে পারে আরও ভালোভাবে। তবে সেটা একেক সময় একেক রকম মনে হয়, কিন্তু rhythm-টা অনেক সময় আগে থেকেই বোঝা যায় বুঝতে পারি। এটা খুব আশ্চর্য লাগে যে, অনেক সময় বোঝা যায় যে এখন একটা কবিতা লিখবো, ভেতরটায় ঐ একটা rhythm…। রবীন্দ্রনাথ, অনেক সময় শুনেছি যে, গান লিখতেন, আগে সবটা হ'য়ে যেত, তারপর নাকি কথা লিখতেন। কবিতার ব্যাপারে এটা রবীন্দ্রনাথ কখনও বলেননি, কিন্তু আমার মনে হয় কবিতাতেও সেটা কখনও কখনও হয় —যা আগে, তার rhythmটা পুরো এসে যায়, পরে হয়তো কথাগুলো আসতে থাকে। এবং সেটা যখন বেশি ক'রে আসে তখন ছন্দটা চলে আসে। আবার এটা হয় যে, কয়েকটা কবিতা পর-পর লিখেছি হয়তো যাতে ছন্দ আছে, তখন একটা প্রতিক্রিয়া হয়…reaction—তার বাইরে ভেঙে বেরুতে হবে। তখন আবার হয়তো চ'লে এলাম। এই ভাবেই হয়েছে কিছু।

প্রশ্ন ।। দু'টো ব্যাপার আছে। একটি আপনার সদ্য আগে উল্লিখিত পাঠক-প্রসঙ্গ। কোন ধরণের পাঠকদের ছবি আপনার মনে থাকে? নাকি আদৌ পাঠকের কথা ভাবেন না আপনি। এই সূত্রে অলোকরঞ্জনের সঙ্গে আমাদের সেই আলাপের কথা মনে পড়ছে। তিনি কথাচ্ছলে আপনার পপুলারিটির কথা বললেন। কথাটার নিশ্চয়ই একটা ভিত্তি আছে। কীভাবে আপনার পাঠক-প্রিয়তা আপনি ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর ।। এটা খুব শক্ত প্রশ্ন। তার কারণ, অলোক যদিও বলেছিল, কিন্তু আমি এটা এখনও বিশ্বাস করি না যে আমার কবিতা খুব বেশি লোকে পড়ে, এটা আমার ধারণা নয়। এটা মিথ্যে হতে পারে, আমার ধারণাটা ভুল হতে পারে, কিন্তু এখনও আমার ধারণা নয় যে আমার কবিতা খুব বেশি লোকে পড়ে। যদি পড়ে তাহলে অবশ্য খুব ভালোই লাগবে আমার নিশ্চয়ই। কিন্তু এই-একটা ব্যাপারে আমি খুব চিন্তিত নই। আমি যখন লিখি—একটু আগেই যেমন বলছিলাম যে একটা সময় আমি অনেকদিন পর্যন্ত লিখেছি—আড়ালে থেকে, নিজে-নিজে লিখেছি, প্রায় ছাপাই হয়নি। কিন্তু তখন আমার লিখতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কেননা, একটা জিনিস আমার সব সময়ই মনে হয়েছে যে, যদি লেখাটা লেখা হয় তাহ'লে কেউ-না-কেউ পড়বেই। এই একটা খুব বিশ্বাস আছে আমার। আর যদি না হয়, তাহ'লে না পড়াই উচিত। খুব সহজ কথা। কাজেই পাঠক সম্পর্কে ভেবে কোনো লাভ নেই, এটা আমার মনে হয়। আমি কখনই—এই, কি ধরণের পাঠক পড়ছে, পড়ছে না—এটা নিয়ে খুব ভাবিনি। আর এমনি লক্ষ করেছি—হয়তো

ভুলই আমার লক্ষ্য হতে পারে, জানি না—যে, খুব বেশি বোধ হয় পড়েও না।

প্রশ্ন ॥ এবার তাহ'লে সবশেষের প্রসঙ্গ। আমাদের দু'জনের বন্ধু অলোকরঞ্জনের কথা এখানে আবার উল্লেখ করতে চাই। আপনাদের দশকের কবিতা সম্পর্কে তাঁর একটি পছন্দসই কথা, 'মহতী অনিশ্চিতি', তাঁর কোনো-কোনো প্রবন্ধে হয়তো কথাটার ব্যবহার আপনি লক্ষ ক'রে থাকবেন। যদি তাঁকে ঠিক বুঝে থাকি, উদ্দেশ্যসর্বস্ব রচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পেই এই শব্দবন্ধের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তিনি। আপনার নিজের কবিতার প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে কি আপনি একমত ?

উত্তর ॥ অলোক যেটা বলে, তার জন্যে আসলে হয়তো আমাদের কবিতার যে···ঠিক আমাদের আগে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কথাটা মনে রেখেই হয়তো এই প্রশ্নটা ওঠে, আর সেই হিসেবেই হয়তো বলে। একটা কি হয়েছিলো যে, আমি যখন লিখতে শুরু করেছি তখন লেখার জগতে এই জিনিসগুলো দেখে—যতটা আমি দেখেছি—যে, এ কি লিখবে, ও কি লিখবে, এসবগুলো যেন আগে থেকে ঠিক করা আছে। একটা চিন্তার ধরণ কিংবা ধরা যাক রাজনৈতিক commitment-এর ধরণ, এগুলো সব ঠিক ক'রে দেওয়া আছে—এ এই দিক থেকে লিখবে, এ ঐ দিক থেকে লিখবে, এর কবিতার বিষয় এইটে, ওর কবিতার বিষয় এইটে। আমার যেটা প্রথম আপত্তিকর লেগেছিল সেটা হলো কবিতার বিষয়ের এই ব্যাপারটাতেই। যেমন একটু আগেই বললাম যে আমি খুব নিশ্চিত থাকি না একটা কবিতা লিখতে গিয়ে যে কি হতে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত, বা আদৌ কিছু হচ্ছে কিনা। আমার লিখতে ইচ্ছে করছে, আমি লিখে ফেলছি—সেটা হলো কি হলো না, কি জাতীয় হলো, কি কথা বলা হচ্ছে সেটা পরে ভাবলেও চলবে—এ রকমই ভেবেছি। সেই দিক থেকে অলোকের কথাটা আমার ঠিক মনে হয়—আমার কবিতার বিষয়ে তো বটেই—যে, আগে থেকে কোনো একটা নিশ্চিত পথ ধরে আমি লিখতে এগুচ্ছি না, লিখবার কথা ভাবছি না। তার কারণ, আসলে আমার কাছে একটা কবিতা লেখা, সেটা আসলে নিজেকেই আর একটু তৈরি করা হ'য়ে গেল ব্যাপারটা—making of a poem is making myself, practically—এবং সেটা যখন হচ্ছে তখন তো আমি জানি না যে আমি কি হতে যাচ্ছি, সে কবিতাটিই আমাকে হইয়ে দিচ্ছে তো খানিকটা। এই অর্থে হয়তো uncertainty কথাটা বলে অলোক, এবং এই অর্থে আমার মনে হয় ঠিকই বলে।

৫

প্রশ্ন :

১. আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে ব'লে আপনার মনে হয় ? যদি করে, কীভাবে ?

২. অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলা দেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে ব'লে আপনার মনে হয় ? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ব'লে আপনি মনে করেন ? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কী রকম ব'লে আপনি মনে করেন ?

৩. কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনো বিরোধ আপনি কি কখনো অনুভব করেছেন ? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী ? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা নির্মাণই আপনার লক্ষ্য ? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় ব'লে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন ?

৪. জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হ'লে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরো বেশি লোককে আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে ব'লে আপনি মনে করেন ?

৫. এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার ?

উত্তর :

১. সামাজিক অস্থিরতার বোধ থাকে কবিতার মজ্জায়, আজ দেখছি কখনো কখনো তা ভেসে উঠতে চায় শরীরে। জানি না, হয়তো এইটেকেই বলা যায় সময়ের প্রভাব, কেননা এতো শারীরিক চিহ্নের বাহুল্য আমি চাইনি।

২. সমাজমানস ? কিন্তু কাকে বলে বাংলার সমাজ ? বাংলার কি একটাই সমাজ ? একটাই মন ?

হালকা একটি ইংরেজি কোষগ্রন্থে লেখা আছে, এদেশের কৃষকেরা নাকি রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে খোলা মাঠে ধান কাটে। ইয়েট্‌সও একদিন ঐক্যময় এক বঙ্গসংস্কৃতির কল্পনা করেছিলেন গীতাঞ্জলির ভূমিকায়। অলীক কল্পনা, অলীক কৃষক। সত্যের ছবি হলো আরেকরকম। সেদিন এক সেলুনে

কাঁচি চালাতে চালাতে রেডিয়োর রামপ্রসাদী শুনছিলেন তদ্‌গত কয়েকজন। কিন্তু ঘোষক যখনই বললেন 'এবার রবীন্দ্রসংগীত'—অমনি তাঁরা বিরক্ত হাতে ঘুরিয়ে দিলেন চাবি। এইরকমই আজ হবার কথা।

ছিন্ন এই সমাজকে এক-মুঠোয় ধরবার মতো আয়োজন কবিতা থেকে স্খলিত হয়ে গেছে অনেকদিন। অনেকদিন ধ'রেই কবিতা একটা ছোট সমাজের কাণ্ড, অল্পলোকেই তা পড়ে। আজ যে তারও চেয়ে নতুন কোনো উদাসীনতা দেখা দিয়েছে, আমি তো অন্তত সেটা ধরতে পারছি না।

৩. নদীর জল ঘড়ায় নিলে সে কি একই জল থাকে? নদী কি তাকে নিজের ব'লে চিনতে-পারে আর? আধারের বদল হলে বিন্যাসও বদলে যায়।

মুখের ভাষা আর কবিতার ভাষায় যদি কোনো ভিন্নতা না থাকে তো কবিতা লিখবার দরকার কী? মুখের ভাষা আর কবিতার ভাষা যদি একেবারে ভিন্ন হয় তো কবিতা লিখবার মানে কী? দুয়ের মধ্যে এই মিল-অমিলের দ্বন্দ্বে তৈরি ভাষা, তাকেই বলি কবিতার ভাষা। নদীর মতো, সাধারণ মানুষও তখন তাকে আর নিজের ব'লে চিনতে পারে না, হয়তো-বা অভিযোগ করে।

৪. জীবনযাপনের সমস্যা নিয়েই তো লেখা হয় কবিতা। বলবার ভঙ্গিতে সেটা আর ঠিক সে-রকম শোনায় না হয়তো। না, বিষয় পালটে নিলেই যে বেশি পাঠক তৈরি হবে এমন আশা কম।

৫. কোনো সময়ই কবিতা লিখবার পক্ষে প্রতিকূল নয়। আর চারদিকটা যদি এমন হয়ে ওঠে যে আপাত চোখে তাকে মনে হয় বাধা, কবিতার পক্ষে সে তো আরোই ভালো। সময়ের সঙ্গে এই সংঘর্ষ থেকেই কবিতা তার স্ফুলিঙ্গ পেয়ে যায়, সমস্ত শরীর নিয়ে জেগে ওঠে কবি।

কিন্তু আমি যদি না পারি সে হলো আমারই অক্ষমতা, সময়ের কোনো অপরাধ নয়।

কবিতা-পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

৬

প্রশ্ন :

১. ৬ ডিসেম্বর '৯২ অযোধ্যায় সংগঠিত ভয়াবহ ঘটনা ও তারই ফলস্বরূপ দেশজুড়ে দাঙ্গার ঘটনা যেমন নগ্ন সত্য, পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির তুমুল প্রতিক্রিয়ায় গর্জে ওঠাও বাস্তব সত্য। আপনি কি মনে করেন এইসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক এবং দেশ ও সমাজ অল্পদিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে আসবে?

২. আপনার কর্মজীবনে এই ভয়ংকর ঘটনা কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে?

৩. আপনার কর্মজীবনে / সৃষ্টিজীবনে যে পরিবেশে আপনি আছেন সেখানে কী প্রতিক্রিয়া দেখেছেন? যদি সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন তা কি শুধু কথা আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ, না কি কোন কর্মসূচীতে বা সৃষ্টিমূলক কাজে এর অভিব্যক্তি ঘটছে?

৪. বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও আমরা দেখছি যে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। অনেকে এর মধ্যে যুক্তও আছেন। কেন এমন হচ্ছে?

৫. কেন্দ্রীয় প্রচারমাধ্যম বিশেষত দূরদর্শন ধর্মান্ধতা প্রচার থেকে মুক্ত নয়। বিশেষত ৬ ডিসেম্বরের ভয়াবহ ঘটনার পর যেন এটা আরো বেড়েছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী।

৬. ৬ ডিসেম্বরের ভয়াবহ ঘটনার পর মনোজগতের গভীরে সুপ্ত থাকা অনেক বিষ প্রকাশিত হতে দেখেছি। বলা যায় ওই ঘটনা সামগ্রিকভাবে মনোজগতকেও আলোড়িত করেছে। এই জায়গাতেই বোধহয় সংস্কৃতি কর্মীদের কাজ। আপনি কী বলেন?

৭. এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি কর্মীদের কাজের ধরন আজ কি হওয়া উচিত?

৮. একইভাবে আপনার কাছে শুনতে চাই আজকের পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে সম্প্রীতির নাটকের বিষয়বস্তুতে কোন্ দিকটি সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়া উচিত?

৯. আপনি নাটকের কাছে যা প্রত্যাশা করেন তা কতখানি দেখতে পাচ্ছেন?

১০. আপনি একজন স্রষ্টা / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব / শিক্ষক / সম্পাদক / শিল্পী হিসেবে কিছু করার কথা নিশ্চয় ভাবেন, ভাবছেন, ভেবেছেন। সেই সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

উত্তর :

১. অযোধ্যা থেকে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, অল্পদিনের মধ্যে না হলেও কিছু-দিনের মধ্যে তা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে। তবে স্বাভাবিক তো আপনা আপনি হবে না, তার জন্য ধারাবাহিক প্রস্তুতি আর কর্মসূচির দরকার। সে রকম কোনও স্থায়ী কর্মসূচির যে অভাব আছে দীর্ঘকাল জুড়েই, তার একটা ইঙ্গিত কিন্তু প্রচ্ছন্ন আছে আপনাদের এই প্রশ্নের মধ্যেই। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী শক্তিটা যে জেগে ওঠে (আপনাদের ভাষায় 'গর্জে ওঠে') কেবল প্রত্যক্ষ কোনও ভয়াবহ ঘটনা ঘটলে, এটা যে অন্য একটা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই শুধু দেখা দেয়, আর ক্রিয়াটা না থাকলে প্রতিক্রিয়াও থমকে থাকে, এরই মধ্যে একটা বিপদ আছে বলে মনে করি। অযোধ্যাকাণ্ড বা যে-কোনও সাম্প্রদায়িকতার মূর্তি তো একদিনের রচনা নয়, অনেকদিন ধরে ভিতরে ভিতরে তা বেড়ে উঠেছে। জায়মান সেই অশুভ শক্তি-গুলিকে আমরা লক্ষ্য করিনি ঠিক ভাবে, কখনও বা কোনও আশু ফলের আশায় প্রশ্রয়ও দিয়েছি তাকে, কাজেই এত সংকট।

২. অনেকদিন ধরেই মনে হচ্ছে যে এই সাম্প্রদায়িকতাই আমাদের সামাজিক আর রাষ্ট্রিক জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদ। ব্যক্তিগত স্তরে প্রায় সকলেরই সঙ্গে এ সব নিয়ে ভাবনা বিনিময় করতে চাই, তাই দেখতে চাই আমাদের কী কী করণীয় আছে আজ।

৩. চারপাশে যা দেখেছি তার চেহারাটা খুব ভালো নয়। উগ্র সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলেন, এমন লোক যে খুব বেশি দেখেছি তা হয়ত নয়। কিন্তু এর বিরোধিতা করলেও অনেকেরই চিন্তার মধ্যে, আচরণের মধ্যে অনেক পিছুটান জমে আছে। আলোচনায় একটু দূর এগোলেই হঠাৎ দেখা দিতে থাকে 'কিন্তু' 'তবে কিনা'-র অনেক টানাপোড়েন। ওরা আর আমরা, এই বিভেদের বোধটা মাথা থেকে যায় না কিছুতেই। চিন্তাতেই যখন এত অস্পষ্টতা, যথার্থ কর্ম-সূচির দেখা পাওয়া তো তখন শক্তই হবে। এখানে 'যথার্থ' শব্দটা ব্যবহারের একটা তাৎপর্য আছে। বাইরের দিক থেকে এই চার মাসে বেশ কিছু কর্মসূচি আমরা দেখেছি : অনেক সভা অনেক বক্তৃতা অনেক মিছিল। মানবশৃঙ্খল, প্রদীপ জ্বালান, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকরকম কাজ হয়েছে সন্দেহ নেই। এ-সবের যে কোনও সাময়িক প্রয়োজন নেই তা নয়, কিন্তু সত্যিকারের সমস্যা নিরসনের পথে এ কোনও কর্মসূচিই নয়। দুই সম্প্রদায়কে (বা, আরও অনেক সম্প্রদায়কে) পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কীভাবে নিয়ে আসা যায়, কীভাবে ঘুচতে পারে আমাদের দুস্তর অপরিচয়, তার প্রক্রিয়া সন্ধানের মধ্যেই

আছে যথার্থ কর্মসূচি। সে রকম কাজ শুরু হবার কোনও চিহ্ন আমি দেখিনি।

৪. ঠিক-ঠিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক শিক্ষার অভাবেই এমন ঘটেছে। আর সেই অভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিসন্ধিময় রাজনীতির ঘোলাটে আর সুবিধেবাদী কাজকর্ম। দারিদ্র্যের সংকটকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য ধর্মান্ধতা সৃষ্টির একটা ব্যাপক আয়োজন যে এদেশে চলবেই, এ নিয়ে কোনও সংশয় থাকবার কথা নয়। 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথকে তাই গুরুত্ব দিয়েই দেখাতে হয়েছিল গোঁসাইজীর চরিত্র, অস্ত্রশালা, মদের ভাণ্ডার আর জপের মালাকে দেখাতে হয়েছিল একেবারে পাশাপাশি। গোঁসাইজীরা যাতে সমাজে সফলতা না পান, তার বিশেষ আয়োজন আমরা রাখিনি, কোথাও আমরা অপেক্ষা করে থেকেছি কোনও 'ক্রিয়া' ঘটলে তার 'প্রতিক্রিয়া'র জন্য।

৫. কেন্দ্রীয় প্রচারমাধ্যম যে ধর্মান্ধতার প্রচার থেকে মুক্ত নয়, সেটা খুব স্পষ্ট কথা। এতক্ষণ যা বললাম, সে দিক থেকে ভাবলে এটা প্রত্যাশিত কথাও বটে। তবে, ডিসেম্বরের পরে দূরদর্শনে সে-ধরণের প্রচার আরও বেড়েছে, এই তথ্যটা আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। আমি অবশ্য দূরদর্শনের খুব নিয়মিত দর্শক নই।

৬. ঠিকই সেটা। অনেক দিন ধরে অনেকরকম সাংস্কৃতিক কাজের মধ্য দিয়ে মনের সেই অস্বচ্ছতাকে দূর করবার চেষ্টাই থাকবে সবার, এ-রকম আশা করা যায়।

৭. এই ঔচিত্য নিয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত। নিজের নিজের মাধ্যমকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রত্যক্ষ প্রচারের দিকে এগিয়ে নেওয়াটাকে কারও খুব জরুরি মনে হতে পারে, কিন্তু তার ফল খুব বেশিদূর এগোয় বলে আমার মনে হয় না। প্রচারের মধ্যে নয়, নিজের নিজের কাজের মধ্যে কোথায় আমরা সম্প্রদায়চিহ্নকে প্রকট করে তুলে অন্য সম্প্রদায় থেকে নিজেদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখছি, খুঁজে দেখা দরকার সেই জায়গাটা। তারপর বদল করা দরকার সেই প্রবণতাটা। ব্যক্তিগত স্তরে, সঙ্ঘগত স্তরে।

৮. আগের উত্তরটি থেকে হয়ত বুঝতে পারবেন যে আলাদা ভাবে 'সম্প্রীতির নাটক' বিষয়ে আমার বিরাট কোনও ভরসা নেই। স্বাধীনতার আগে অন্তত দশ বছর জুড়ে বিস্তর সম্প্রীতির নাটকের অভিনয় হয়েছে গোটা বাংলায়, 'হিন্দুমুসলমানের মিলিত মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা' কিংবা 'বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়',—নির্মলেন্দু লাহিড়ীর এই উদাত্ত সংলাপ গাঁয়েগঞ্জের প্রতিটি কোণে কোণে যেত তখন, কিন্তু তাতে

আটকে থাকেনি কলকাতা বা নোয়াখালির দাঙ্গা, তাতে আটকে থাকেনি সাম্প্রদায়িক দেশভাগ। সাহিত্যে শিল্পে সময়ের একটা চিহ্ন এসে লাগেই, তাই আজ নাটকে বা অন্য শিল্পে এইসব সমস্যার চাপ গিয়ে পৌঁছবে নিশ্চয়। কিন্তু যদি কেউ ভাবেন যে এটা হল সমাধানের উপায়, তা হলে, তাঁর সঙ্গে আমার ধারণার খুব মিল হবে না।

৯. এ প্রশ্নটা এখানে আর প্রাসঙ্গিক লাগছে না।

১০. কিছু যে ভাবিনি তা নয়, কিন্তু অন্য অনেকেরই মতো আমারও ভাবনা নিশ্চয় অস্পষ্ট আর দিশেহারা। কয়েকটা প্রশ্ন আমার মনে জাগে কখনও কখনও। সম্প্রীতির মিছিল নিয়ে যেসব পথে আমরা যাব, তার দুপাশে যদি দেখতে পাই 'হিন্দু স্কুল', 'হিন্দু হস্টেল'-জাতীয় বাড়িঘর, তা হলে একাত্মতার কথা আমরা ভাবব কেমন করে? ছাত্রদের যদি এক করেই ভাবতে চাই আমরা, কেন তবে মুসলমান ছাত্রদের জন্য আজও দরকার হবে স্বতন্ত্র কোনও জায়গার? এই সব স্বাতন্ত্র্যই যে দীর্ঘস্থায়ী বিচ্ছেদের বীজ বুনে দেয় অল্পবয়সীদের মনে, সে কথা কেন বুঝব না আমরা? স্বাধীনতার পরেপরেই আমার একটা অবোধতায় মনে হয়েছিল যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বা মুসলিম ইনস্টিটিউট নামগুলি থাকবে না আর, যেমন থাকবে না আদর্শ হিন্দু হোটেল। কিন্তু থেকেছে তার সবই, দূর থেকে গেছে দূরে। এই কদিন আগে, ঈদের উৎসবের সময়ে, ভেবেছি যে এই সম্প্রীতি সচেতন বছরটায় হয়ত মেলামেশার একটা সমারোহ আমরা দেখতে পাব। শারদীয়া সময়টায় কাগজে কাগজে বহুদিন ধরে যেমন নানা উৎসবের আয়োজন চিহ্ন পড়তে থাকে, তার একটা ভগ্নাংশ হয়ত এবার দৈনিক কাগজগুলিতে প্রতিফলিত হবে এবারকার ঈদে। হয়নি তা। কলুটোলার গলিতে গলিতে ঘুরে যে আনন্দময় মেলার প্রবাহ দেখেছি কদিন, যার সঙ্গে মিল হয়ে যেতে পারত যে কোনও রথের মেলার, তার সঙ্গে সামান্যতম যোগ তৈরি হয়নি একটু পাশেই বড় রাস্তার ব্যস্ত চলাচলের। বুঝেছি যে ওই-খানেই বিচ্ছিন্নতা, মনের ভিতর থেকে সুদূর এক বিচ্ছিন্নতা! তার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য ভিন্ন আয়োজন চাই।

গ্রুপ থিয়েটার, মে-জুলাই ১৯৯৩

৭

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েক মিনিট

আমার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে. সকাল এগারটায়। সময় মত গিয়ে দেখি, ঘরে টেবিলের সামনে বসে আছেন, ঝুঁকে পড়ে লিখছেন কিছু। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে ডাক দিলেন ভিতরে, বললেন

র. এই যে, এস। বস। বিশির ছাত্র তো তুমি? বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? আমার সাঙ্গোপাঙ্গোরা কেউ আটকে দিয়েছিল?

প. না না, তা নয়। আপনার লেখার সময়ে বিরক্ত করলে আপনার অসুবিধে হতে পারে

র. তার চেয়ে অনেক বেশি অসুবিধে হয় কাউকে অকারণে অপেক্ষায় রাখলে। তোমারও তো সময়ের দাম আছে। কেউ এসে দূরে অপেক্ষা করবে, এ ভারি অন্যায়।

প. সামান্যই একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে

র. কারও নামকরণ নয় তো? না কি নূতন কোনও পত্রিকা বার করছ?

প. না না, সেসব কিছু নয়। বলতে পারেন, এসেছি একটু অস্থির হয়ে। দেশের চারদিকে যে অবস্থা চলছে আজ। সেকথা ভেবে মনটা ভাল থাকে না। তাই ভাবছিলাম আপনি যদি কিছু বলেন এ নিয়ে—

র. আমি কিছু বলব? কী বলব?

প. এসব দেখে আপনি যা ভাবছেন। ভাবছেন তো কিছু নিশ্চয়ই?

র. ভাবিও যদি কিছু, বলব কেন তা নিয়ে? আর, কাকেই বা বলব? কেই বা শুনছে আমার কথা, কেই বা মানছে!

প. শুনছে না? মানছে না? আপনি কি জানেন যে আপনার—

র. জানি যে আমার যুগ শেষ হয়ে গেছে বহুকাল, তোমরা এখন সব রবীন্দ্রোত্তর যুগের মানুষ।

প. এ ধিক্কার আপনার কাছে আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু আপনিও নিশ্চয় মনে মনে জানেন যে ওটা নিছক মুখের কথা। নিশ্চয় জানেন যে যখনই কোনও সংকট দেখা দেয় দেশে, যে কোনওরকম বিতর্ক জেগে ওঠে যখন, সবারই শুধু আপনার কথা মনে পড়ে প্রথমে। আপনারই লেখা থেকে সবাই জবাব খুঁজে বেড়ায় সাহস নির্দেশ মীমাংসা। আজও সবাই আশা করে আছে, এত বড় সংকটে আপনার কিছু বলবার আছে নিশ্চয়। 'আর্তমআর্তের সেই

লাইনগুলি 'Milton ! thou shouldst be living at this hour/ England hath need of thee' আপনারও বিষয়ে মনে মনে উচ্চারণ করছে কত লোক। ভাবছে, হয়ত কিছু বলবেন, হয়ত কোনও নতুন কবিতা
র. (মুখে একটা সুদূরতা এনে) কী আর বলব। বস। অমিয়কে লেখা আমার চিঠিগুলি পড়েছ কখনও? ওকে একবার লিখেছিলুম, যেসব কথা একবার বলা হয়ে গেছে তাতে জল মিশিয়ে আবার নূতনভাবে পরিবেশন করা একরকমের সাহিত্যিক দুর্নীতি। এই যে চারিদিকে এত বিচ্ছেদবোধ, এত আত্মঘাত, এ নিয়ে তো প্রায় একশ বছর ধরে কথা বলছি আমি, গদ্যে, কবিতায়। কতই তো সতর্ক করেছি তোমাদের, তোমাদের নেতাদের। কে আর তাতে কান দিয়েছে বল।
শ. কিন্তু এই যে অযোধ্যায় রাম নিয়ে—
র. (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) অযোধ্যা? উচ্চারণ কোরো না ও নাম আমার সামনে। কবিতার কথা বলছিলে তুমি? কার জন্যে কবিতা? 'কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো', এসব কথা কি লিখিনি অনেক আগে? 'সঞ্চয়িতা'য় রাখিনি বলে ওটা হয়ত পড়নি তোমরা—
শ. আমাদের ঠিক অতটা মূর্খ ভাববেন না। ও-লেখাটা প্রায় সকলেরই জানা।
র. জানা? কিন্তু কী লাভ হল জেনে? একটা দেশ, যুগযুগধাবিত যাত্রী নিয়ে এই আশ্চর্য একটা দেশ, সেখানে মানুষের আজ এমনই মতি হল যে সকলের হৃদয়ের রামকে এনে বসাতে হল ইটকাঠের খাঁচায়? আর, সেইজন্যে তোমাদের চোখের সামনে ও-রকম একটা গরিমাময় স্থাপত্যকে চূর্ণ করে দিল নিমেষে? এও যদি বর্বরতা না হয় তো বর্বরতা আর কোথায় আছে?
শ. সেকথা তো আমরাও বলছি।
র. কিন্তু কী মানে আছে তোমাদের এই বলার? তোমাদের বলার সঙ্গে তোমাদের কাজের কোনও সামঞ্জস্য নেই। দেশকে কীভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হয় তা কোনওদিন ভাবনি তোমরা। তোমরা চেয়েছ শুধু আশু-ফল, যে-কোনও ছলাকলায়, কালকের ফলের দিকে তাকাওনি তোমরা। 'জনগণ ঐক্যবিধায়ক' বলে স্বপ্ন দেখেছিলুম একদিন, ভারতকে ভেবেছিলুম মিলনতীর্থ, ভেবেছিলুম মহামানবের সাগরতীর, হায়, কোথায় সেই মিলনের সামান্যতম ইশারা! যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনও বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর সেইটেই হয় সকলের চেয়ে সর্বনাশা বিভেদ। সেই বিভেদ নিয়ে তোমরা মেতে আছ—

প. কিন্তু আমরা অনেকেই তো চেষ্টা করছি সেই বিভেদের বিরুদ্ধে কথা বলতে—

শ. করছ। সম্প্রীতির কথা বলছ। হিন্দুমুসলিম ভাই ভাই বলছ। সভা করছ মিছিল করছ—

প. এসব করা কি অন্যায় ?

শ. না, অন্যায় নয়। কিন্তু অসম্পূর্ণ। আর সেইজন্যই, শেষ বিচারে, আত্মপ্রবঞ্চনার ভিত্তি। দেখ, প্রীতি তো ভাল কথা, ভাল ধারণা। কিন্তু কার সঙ্গে প্রীতি ? তাকে কি তুমি জানো ? সে কি তার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে যে তুমি তাকে জানো ? মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে তাদের মনের মিল হয় না, কেননা তাদের কাজের যোগ থাকে না। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মতের অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড় হয়ে দেখা দেয়। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তাহলেই দেখতে পাব মানুষ বলেই মানুষকে আপনার মনে করা সহজ।

প. সেমন চেষ্টাই তো সাধ্যমত করছি আমরা।

শ. করছ কি ? ভেবে দেখ তো একটা কথা। এই যে কদিন আগে ঈদের মত এত বড় একটা উৎসব চলে গেল, তোমাদের দৈনিক পত্রিকার লেখাগুলিতে কিংবা ওই যাকে তোমরা বল সম্পাদকীয় স্তম্ভ, সেখানে—কতটুকু চিহ্ন দেখতে পেলে ? শরতের হাওয়া বইতে শুরু করলেই কাগজে কাগজে তার চিহ্ন ফুটে ওঠে, প্রতিমা তৈরির মুহূর্ত থেকে শুরু করে বিসর্জনকাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ছবি তৈরি হয়ে যায় তোমাদের কাগজপত্রে। পুজোয় কে কোথায় যাবেন, কে কী ভাবেন, সব নিয়ে দৈনন্দিন কত না খবর ছাপা হয়ে যায়। অন্যায় বলছি না তাকে। হোক, সবই হোক। কিন্তু এই দেশেই যে আরও একটা বড় সম্প্রদায় আছে, তার উৎসব নিয়ে তার বিশ্বাস আর আনন্দ নিয়ে কোনও আগ্রহ থাকবে না তোমাদের ? এ চেতনায় কিছুই যদি না থাকে তো ভাই ভাই কথাটার কতটুকু আর তাৎপর্য থাকে বল। দেখেছ কি কখনও এই আমাদের বাড়ির থেকে কয়েকটা পা এগোলেই, গলিতে গলিতে কেমন মেলা বসে গিয়েছিল এই কদিন ?

প. কিন্তু ও তো ধর্মের ব্যাপার—

শ. ধর্মের ব্যাপারই শুধু নয়, সংস্কৃতির ব্যাপার, সামাজিকতার ব্যাপার। ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েও এক একটা সামাজিক মিলনের স্বর হিসেবে দেখতে পার একে। মেলায় গিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে এক অনাবিল আনন্দের ছবি। সে মেলায় ধর্ম কিন্তু নেই, আছে মানুষ। ওইখানে, মানুষের সঙ্গে

মানুষের হাত মেলাবার একটা জায়গা রয়ে গেছে তোমাদের। সেই মেলার মধ্যে, কিংবা ধর আমাদের প্রতিদিনকার চলাফেরার মধ্যে পারস্পরিক যাওয়া আসার কোনও জায়গা রাখিনি আমরা। তাই আজ মানুষের হাতে শানিত ছুরি, বাড়িতে বাড়িতে গোপন দুর্গে বোমা। রাজনৈতিক দুর্বুদ্ধি চারদিকে এর ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে। কিন্তু ভিতর থেকে একটা ঐক্যবদ্ধ সমাজ তৈরি করবার আয়োজন থাকলে সে দুর্বুদ্ধিকে একদিন পরাভূত হতেই হবে।

শ. সেই আশাদের কথাই তো আপনার কাছে শুনতে চাই আমরা।

র. শুনতে তো চাও, কিন্তু সেদিন রাত্রে কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলুম জানো? দেখলাম যেন স্বর্গলোকে ঝড় উঠেছে। সে অবর্ণনীয়। দাউ দাউ করে চারদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা—গেলুম গেলুম রব।—একটা যেন প্রলয় কাণ্ড, সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নরকের এমন একটা বীভৎস রূপ সে কল্পনাতেও দেখা যায় না। হয়ত সেদিন শিগগিরই আসছে, আমি আগে থাকতেই দেখে নিলুম।…না, স্বপ্নটা তোমাকে বলা হয়ত ঠিক হল না। ভয় পাচ্ছ? ভয় পেয়ো না।

শ. না, ভয় পাব না। আপনি তো বলেছিলেন মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ

র. হ্যাঁ, বলেছিলুম। আজো তাই বলতে চাই আমি। নানা দেশের মানুষ তাদের সাধনা দিয়ে ইতিহাসের যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলবার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব—যদি ইচ্ছের জোর থাকে, যদি কাজের আগ্রহ থাকে। আর, হাঁ, একটা মাত্রারও বোধ যদি থাকে। যেমন ধর, তুমি না বলেছিলে আমার সঙ্গে সামান্যই একটা কথা আছে? কিন্তু এ কি একটা সামান্য কথা হল? এটাই কি এখন তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা হবার ছিল না?

শ. ওটা শুধু ভয়ে বলেছিলাম।

র. ভয়ে? বিশির ছাত্রের ভয়? না হে, তুমি তো ঠিক বিশির ছাত্র নও। কী রে বনমালী, বাবুকে এক গ্লাস শরবৎ দিবি না?

শরবতের প্রতীক্ষায় বসে থাকি আমি।

পঞ্জি : সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর
[অসম্পূর্ণ]

১. কবিতা পরিচয় বিশেষ প্রশ্নমালা সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৯৭৭ সম্পাদনা অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২. বাংলা ছন্দ সমীক্ষা এপ্রিল ১৯৭৭ গবেষণা পরিষদ বাংলা বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. কালপুরুষ শীত ১৩৮৪ সম্পাদনা সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত সাক্ষাৎকার 'বুড়িয়া জটলা করে' কবিতাটি সম্পর্কিত

৪. সিদ্ধার্থ বিশেষ ছন্দসংখ্যা ১৩৮৫ সম্পাদনা দেবতোষ বসু

৫. ক্ষুধার্ত নভেম্বর ১৯৮১ সম্পাদনা শৈলেশ্বর ঘোষ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অরুণেশ ঘোষ

৬. গাঙেয়পত্র পঞ্চম সংকলন শ্রাবণ ১৩৮৪ সম্পাদনা অঞ্জন সেন সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আশিসকুমার দে

৭. অন্তলাস্তিক তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা নভেম্বর জানুয়ারি ১৯৮২-৮৩ সম্পাদনা প্রভাতকুমার দত্ত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তরুণ চক্রবর্তী

৮. শব্দ শাব্দিক ৫০ ত্রয়োদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা শারদ ১৩৯৫

৯. পিলসুজ ২৩ সম্পাদক সমীর দে অক্টোবর ১৯৮৯

১০. সাহিত্যিকা শান্তিনিকেতন ১৯৮৯

১১. গোধূলি সংগীত বীরভূম জানুয়ারি ১৯৯০

১২. ওভারল্যাণ্ড ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৩ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বীথিকা ঘোষ

১৩. সময় শারদীয় ১৪০০ সংখ্যা ২ প্রধান সম্পাদক শুভশীল বসু

১৪. গ্রুপ থিয়েটার সংহতি সম্প্রীতি সংখ্যা ১৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৯৯৩ সম্পাদক রমণ মহেশ্বরী সল্ট লেক সংগ্রাহক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫. সকাল ২ এপ্রিল ১৯৯৩ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাল্পনিক সাক্ষাৎকার : শঙ্খ ঘোষ

৮

দুটি অনুবাদ কবিতা

'ভিতা নুওভা'-র একটি

এক বছর হলো তার চিরন্তনতার দিন, আমি বসে ফলকের ওপর আঁকছিলুম দেবদূত, তাকে মনে ক'রে। ছবির রেখার টানে চোখ সরিয়ে দেখি, ওরা আমায় ঘিরে আছে প্রতীক্ষায়, ওদের জানানো চাই স্বাগতম্। ওরা দেখছিল আমার কাজ, আর পরে জানতে পেরেছিলুম, ছিল অনেকক্ষণ ধরে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নত হয়ে বলি : একজন কে ছিল আমার সঙ্গে এখুনি, আমি তাই ভাবছিলুম। তখন ওরা ফিরে গেল, আমিও ফিরে গেলাম আমার দেবদূতের মুখে। আর তখনই 'আমার মনে হলো বর্ষযাপিকা এক কবিতা লিখব আজ, আগতজনের উদ্দেশে।...

এর অল্প পর যখন মনে ভাবছিলুম অতীতের স্মৃতি, নিবিড় ভাবনা আর বেদনার পলকে মুখে লেগে ছিল দারুণ বিহ্বলতা। কিন্তু ভয় হলো কেউ কি দেখে নিচ্ছে, দেখছে আমার এই মুখচ্ছবি ? চোখে পড়ে এক তরুণী লাবণি বালা—কতো যে করুণাভরা দৃষ্টি তার জানালার ধারে ; সকল আবেগ যেন মুখে তার স্তব্ধ হয়ে আছে। সমানুভূতির টানে নিঃস্বখ মানব যেমন হঠাৎ আলোড়িত হয়, যেন-বা নিজেরই জন্য আর্দ্র দয়াতুর—আমারও চোখ ভরে আসে জলে। আমি চাইনি যে এরা-সব জেনে যাক আমার অভাগা জীবন, দয়াবতী মহিলার চক্ষু থেকে সরে যাই তাই, মনে মনে বলি, এঁরই তো সমীপে আছে মহীয়সী প্রেম। তাই একটি সনেট এঁকে নিয়ে, দরকার এতে সমস্ত কথা বলা। এই সেই সনেট, শুরু যার, 'আমার দু'চোখ জানে'।

আমার দু' চোখ জানে, সকরুণ মায়া
কেমন পড়েছে ঝরে ওই মুখভাগে—
জেনেছো যখন কোন্ ঝলসিতরাগে
নিবিড় বিহ্বল আমি বিষাদের ছায়া।

আরো মনে হয় তুমি জানো অনুমানে
আমার জীবনভরা ঘন তমোভার !

পুঞ্জ গ্লানি যেন কোনো অভিজ্ঞান তার
না রাখে এ চোখে—মন বড়ো ভয় মানে।

দূরে সরে যাই তাই, তোমারই প্রতিমা
উদ্বেলিত ক'রে দেয় বুকের গহনে
ঝরোঝরো অশ্রুবাহ—যেন মনে হয়।

ফিরে ডেকে বলি 'হিয়া, রে বিষাদক্ষীণা,
সেই একই প্রেম আছে এ-বালার মনে—
রোদসী আবেগে তাই ভরেছি সময়।'—গদ্য ৩৫।৩৬ সনেট ১৯।

শঙ্খ ঘোষ অনূদিত

এক্ষণ/দান্তে বিশেষ সংখ্যা পৌষ-মাঘ ১৩৭২

AN INTENSE BOMBARDMENT

The earth is burning : through her smoke there looms
The wreckage of the immemorial years ;
The fruit of all that labour, all those tears
Now in an hour collapses and consumes.
Those monstrous masses of black oily fumes
Are so much vaster than the men, whose cheers
In this apocalyptic din none hears.
They seem like angels who fulfil God's dooms.
The breastwork there, that with its long brown wave
Threatened the oities that we die to save
Boils as a cauldron, its defenders hurled
To darkness and confusion and the grave,
And overhead great black clouds densely curled
Hide from the sun the anguish of the world.

April 1916. 'SAFETY-CATCH'
(JBSH)

তীব্র এক বোমার বর্ষণে

(জে বি এস হলডেন)

পৃথিবী জ্বলছে ; তার ধূম্রজাল থেকে দেখা যায়
যুগ-যুগান্তর যেন ধ্বংসরাশি হয়ে পড়ে আছে ;
এক প্রহরেই সব ধ্বসে যায়, গিলে নেয় গ্রাসে
সময় গড়েছে যাকে এত শ্রমে এত অভ্রদায়ে।
পুঞ্জে পুঞ্জে জেগে ওঠে কালো ওই শিখা মহাকায়
মানুষের চেয়ে বহু বিশালতা নিয়ে, সে-উচ্ছ্বাসে
কিছুই যায় না শোনা প্রভাময় কোলাহলপাশে,
বিধির প্রলয় হাতে তারা যেন দেবদূত প্রায়।
যেসব শহর আমরা প্রাণপাতে চেয়েছি বাঁচাতে
বাধার দেয়াল তার দীঘল ধূসর ঊর্মিঘাতে
কটাহের বুকে ওই জ্বলে যায়, আর ঝাঁকে ঝাঁকে
প্রহরীরা ঢলে পড়ে বেঘোরে কবরে তমসাতে ;
ঘন কালো মেঘ শুধু মাথার উপরে পাকে পাকে
সূর্যের গোচর থেকে পৃথিবীর দাহ ঢেকে রাখে।

শঙ্খ ঘোষ অনূদিত

গণদর্পণ/অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৩

শ ঙ্খ ঘো ষ

আর এক আরম্ভের জন্য*

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন কলকাতার এক উদ্‌ভ্রান্ত ছবি দেখেছিল স্বাতী, বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' উপন্যাসের নায়িকা। মেঘলা দিনের ভিজে নরম আলোয় সে দেখেছিল 'ভিড়ের এক আশ্চর্য আলোড়ন, এসপ্লানেডের পক্ষেও আশ্চর্য। স্যুটপরা আপিশচাকুরে, কালোকোর্তা উকিল, ছাতাহাতে আধবুড়ো বাবুরা, ছিপছিপে ছোকরাকেরানি, ইংরেজ, চিন, মাদ্রাজি, পাদ্রি, পার্শি ; চৌরঙ্গি, ধরমতলা, কার্জন পার্ক, কর্পোরেশন স্ট্রীট—সব দিক থেকে সব দিকে আসা যাওয়া করছে সকলে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ঠিক যেন জানে না, একটু-যেন দিশেহারা ; আপিশ ছুটি হ'লেই সোজা বাড়ি ফিরতে হবে, এই মুখস্থ কথাটা অনেকেই যেন ভুলে গেছে। …লক্ষ্যের নিশ্চয়তা আজ হারিয়ে ফেলেছে সবাই… ।'

দিশেহারা এই শোকার্ত ভিড়ের পাশাপাশি সেদিন আরো একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল স্বাতীর। তার দেখা হয়েছিল এক কবির সঙ্গে, একা একা দোকানে বসে মদ খাচ্ছিলেন যিনি, যাঁর মনে হয়েছিল জনতার ওই শোকোচ্ছ্বাস একটা বুদ্বুদ মাত্র, কেননা 'যারা "কথা ও কাহিনী" ছাড়া কিছু রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, পড়লেও বোঝেনি, বুঝলেও মানেনি', 'যাদের সমস্ত অস্তিত্বটাই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতা', তাদের কাছে আজ রবীন্দ্রনাথের অভাবটা সত্যিকারের কোনো ব্যথা হতে পারে না। ধ্রুব দত্ত নামে কাল্পনিক এই কবিটি অবশ্য কলকাতার সাহিত্যসমাজের একমাত্র পরিচয় নয়, কিন্তু সন্দেহ নেই যে এও তার অন্যতম এক চরিত্র। বিলাস আর আত্মম্ভরি, জনতা বিষয়ে উন্নাসিক, এইরকম লেখকদেরই একজন প্রতিভূ হিসেবে রেস্তোরাঁয় বসে 'ঠোঁট বেঁকিয়ে' বলতে পারেন এই কবি : 'আমি বেরিয়ে ছিলাম, অনেকক্ষণ ঘুরলাম রাস্তায়-রাস্তায়, তারপর টিঁকতে না-পেরে ঢুকে পড়লাম এখানে।'

* সাহিত্যের ইতিহাস নয়, 'কলকাতায় সাহিত্য সৃষ্টির আবহাওয়া (১৯৪১-৮০)' বিষয়ে একটি ফরমায়েসি প্রতিবেদন। সুকান্ত চৌধুরী-কৃত এর ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়েছিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত *Calcutta, the Living City*-র দ্বিতীয় খণ্ডে।

তিরিশের যুগের প্রধান একজন কবির লেখা এই উপন্যাস, 'তিথিডোর'। এ-উপন্যাসের সাহিত্যপ্রেমিক নায়কনায়িকার কাছে ধ্রুব দত্ত কিছুটা অবহেলাই পান, মনে হয় পানীয়বিলাসী মিনারবাসী কবিদের এই ধরনটাকে একটু উপহাসই করে নিচ্ছেন এর লেখক। কিন্তু, এ প্রশ্ন কেউ তুলতেও পারেন, বুদ্ধদেব নিজেও কি কখনো এঁদেরই সগোত্র ছিলেন না? বাইশে শ্রাবণে ধ্রুব দত্তের ওই প্রতিক্রিয়া কি কিছু-পরিমাণে বুদ্ধদেবের নিজেরও প্রতিক্রিয়া নয়? জনতা বিষয়ে একটা আমূল অবজ্ঞা কি তাঁরও সাহিত্যদর্শনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল না?

বুদ্ধদেব বসুর বাসভবন ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউর পরিচয় ছিল 'কবিতা-ভবন' নামে, তাঁর সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকাকে উপলক্ষ্য করে নিয়মিত আড্ডা বসত সেখানে। যে-কোনো আধুনিক কবিরই জন্য খোলা আহ্বান ছিল সেই পত্রিকায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পত্রিকার আর এই আড্ডার একটা নিজস্ব চরিত্র গড়ে উঠেছিল দিনে দিনে। সে-চরিত্রের লক্ষণ ছিল একটা নান্দনিক অভিমান। জনতা আর তার দৈনন্দিন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে 'শুদ্ধ কবিতা'র চর্চা ছিল তার আদর্শ। সেইজন্যে তার পক্ষপাত ছিল শুধু সেই রচনার জন্য 'যেটা চির-কালের ভালো, চিরকালের সুন্দর, যেটা অনুভব করতে হ'লে চিত্তের শুদ্ধতা ও পরিবেশের নীরবতা দরকার।'

পুব থেকে পশ্চিমে ছড়ানো রাসবিহারী অ্যাভিনিউর এক প্রান্তে ছিল এই 'কবিতাভবন'। আর তার একেবারে বিপরীতে, পশ্চিম প্রান্তে ওই রাস্তারই থেকে বেরিয়ে-যাওয়া ১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে আরেক কবি বিষ্ণু দে-র বাড়িতে ছিল আরেক ভিন্ন রকমের আড্ডা। ভৌগোলিক অবস্থানের মতো নান্দনিক অবস্থানেও এ-দুই আড্ডা ছিল একেবারে বিপরীত। সামাজিক দায়-বদ্ধতায় মানুষের কাছাকাছি থাকবার প্রেরণা নিয়ে এঁদের সাহিত্যসৃষ্টি, 'কবিতা' পত্রিকার তেরো বছর পর (১৯৪৮) একদিন এখান থেকেই দেখা দিয়েছিল নতুন একটি পত্রিকা 'সাহিত্যপত্র', অবক্ষয়ের বিরোধিতা আর নৈর্ব্যক্তিকতাই যার কাছে সাহিত্যের বড়ো আদর্শ।

চল্লিশের মধ্যপর্ব থেকে কলকাতার সাহিত্যসমাজে বেশ প্রকট হয়ে উঠছিল সমান্তরাল এই দুই ধরন। কিন্তু তার ঠিক আগে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, এতটা আলোড়িত হয়ে উঠছিল আমাদের জাতীয় আর আন্তর্জাতিক পরিবেশ, এতটাই সংকটময় হয়ে উঠেছিল আমাদের অস্তিত্ব যে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে স্পষ্ট একটা পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছিল সেই মুহূর্তে। সময়টা ছিল জটিল। রবীন্দ্রবিহীন কলকাতায় স্বাতী দেখেছিল যে, স্থির লক্ষ্যের নিশ্চয়তা হারিয়ে ফেলেছে ভিড়ের মানুষ। কিন্তু কেবল ওই একটি দিনের জন্যই নয়, এর পর ওইরকমই লক্ষ্যহারা উদ্‌ভ্রান্ত হতে হবে কলকাতার মানুষকে অনেকদিন ধরে,

যুদ্ধে মন্বন্তরে দাঙ্গায় দেশভাগে, প্রায় গোটা দশক জুড়ে তাকে অপেক্ষা করতে হবে আর এক আরম্ভের জন্য।

২

১৯৪২ সালের আটই মার্চ বেলা তিনটের ঢাকা শহরে ফ্যাসিস্টবিরোধী এক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য মিছিল নিয়ে চলেছেন বাইশ বছরের এক যুবক, সোমেন চন্দ। মিছিলটি আক্রান্ত হলো হঠাৎ, খুন করা হলো নেতৃস্থানীয় সেই যুবককে, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব। সম্ভাবনাময় এক গল্পলেখকের আকস্মিক মৃত্যু হলো, সমস্ত পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল ছোটো একটা শহরের স্থানীয় ঘটনা।

প্রতিবাদ উঠল কলকাতায়। ফ্যাসিবাদের সমস্যাকে একেবারে ঘরের মাঝখানেই যেন দেখা গেল এবার, লেখকদের পক্ষ থেকে তাই আয়োজন হলো এক সভার। ২৮ মার্চ তারিখের সেই সভায় পৌরোহিত্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন প্রবীণ 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত বা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'তে অনেকদিন যাঁরা যুক্ত ছিলেন কেবল তাঁরাই নন, সব স্তরের লেখকেরাই সমবেত হলেন এখানে, বামপন্থী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা গোপাল হালদারের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এলেন পরম বামবিরোধী প্রমথনাথ বিশী বা সজনীকান্ত দাস, একই সঙ্গে এলেন বিষ্ণু দে আর বুদ্ধদেব বসু। 'প্রগতি' নামটা পালটে নিয়ে, এই সভা থেকেই জন্ম নিল 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। যামিনী রায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আবু সয়ীদ আইয়ুবদের মতো ভিন্ন রুচির মানুষকে মিলিয়ে-নেওয়া এই সংঘের প্রাথমিক অফিস তৈরি হলো বিষ্ণু দের ১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে। ঠিকানাটা অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই পালটে যাবে ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে, এরপর থেকে যে-বাড়িটি হয়ে উঠবে প্রগতি-আন্দোলনের দীর্ঘকালীন একটি কেন্দ্র।

সংঘের যুগ্মসম্পাদক বিষ্ণু দে আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গল্প কবিতা নাটিকা প্রবন্ধ ছবি বা কার্টুন পাঠাবার ধুম পড়ে গেল। সুশোভন সরকার বা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো ইতিহাসবিদেরা যে 'স্বাধীনতার শত্রু জাপান' বা 'জাপানী শাসনের আসল রূপ' নিয়ে লিখবেন সেদিন, সেটা তত আশ্চর্যের নয়। আশ্চর্যের এই যে বুদ্ধদেব বসুও তখন লিখছেন 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজ্‌ম' বা 'সোভিয়েত রাশিয়ায় শিল্প ও সংস্কৃতি', প্রতিভা বসু লিখছেন 'ফ্যাসিজ্‌ম ও নারী'। 'রাজনীতি আমার জীবনে কখনো আলোচ্য বিষয় ছিল না' তাঁর 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজ্‌ম'-এর মধ্যে লিখছিলেন বুদ্ধদেব—'বাল্যকাল থেকে জেনেছি আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমার মধ্যে যা-কিছু খাঁটি তা রচনা

চর্চাতেই একান্তে প্রয়োগ করেছি।' কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে তাঁর, 'পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না।' প্রকাশ্য জনসভায় অথবা ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের বৈঠকে স্বর মেলাচ্ছেন তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত আর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভিন্ন প্রদেশ থেকে কখনো-বা আসছেন সাজ্জাদ জহীর, কায়ফি আজমী বা রাহুল সংকৃত্যায়ন। প্রতিবাদের কবিতা লিখছেন অমিয় চক্রবর্তী বা সমর সেন, লোকের মুখে-মুখে ফিরছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ / রুখব দস্যুদলকে আজ / দেবে না জাপানি উড়োজাহাজ / এদেশে ছুঁড়ে স্বরাজ'। একটির পর একটি ফ্যাসিবাদবিরোধী কাব্যসংকলন সম্পাদিত হচ্ছে তখন। 'প্রাচীর', 'একসূত্রে', 'আগল', 'জনযুদ্ধের গান'; হিরণকুমার সান্যাল আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কেন লিখি' বইতে ছাপা হচ্ছে লেখকদের সমাজমুখী জবানবন্দী।

আর, এইসব উত্তেজনার মধ্য দিয়ে উঠে আসছেন নিতান্ত কিশোর একজন কবি, সুকান্ত ভট্টাচার্য, ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের এক 'বুধবারের বৈঠক'-এ কাঁপা কাঁপা গলায় পড়া তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি শুনে বুকে জড়িয়ে ধরছেন তারাশঙ্কর। বুধবারের ওই বৈঠকগুলিতেই কখনো-বা 'হারানের নাতজামাই'-এর মতো সদ্যরচিত গল্প পড়ে শোনাবেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্প পড়বেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ননী ভৌমিক সুলেখা সান্যাল গোলাম কুদ্দুসেরা। এই ৪৬ নম্বর থেকেই প্রকাশিত হতে থাকবে (১৯৪৪) 'পরিচয়' পত্রিকার নবপর্যায়, শেষ হয়ে যাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনাকাল।

ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের এক বছরের মধ্যে কলকাতার সামনে এসেছিল আরেক অভিজ্ঞতা। মানুষেরই তৈরি করা এক দুর্ভিক্ষের তাড়নায় হাজার হাজার লোক মরছে তখন বাংলায়, একমুঠো ভাত অথবা একটু ফ্যানের খোঁজে বুভুক্ষুরা গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে শহরের দিকে। এ এক উলটো দৌড়। কিছুদিন আগে জাপানি সেনার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে দলে দলে লোক পালাচ্ছিল নিরাপদ মফস্বলে. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুবর্তন' উপন্যাসে তার একটা ছবি ধরা আছে। আজ আবার কলকাতা ভরে উঠছে ভিড়ে, কিন্তু সে-ভিড় শুধু মুমূর্ষুর আর মৃতের।

লেখকেরা কী করবেন তখন ? '১৯৪৩ সালের মার্চ বা এপ্রিলের একদিন'—লিখেছেন তারাশঙ্কর—'শুনলাম গণেশ অ্যাভিন্যুতে "পূর্বাশা" আপিসে একটি সাহিত্যিক আলোচনা-সভা আছে। আলোচ্য বিষয়—যুদ্ধকালীন সাহিত্য।' প্রেমেন্দ্র মিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুবোধ ঘোষ সজনীকান্ত—অনেকেই ছিলেন সেই সভায়, আর আলোচনা থেকে ফিরতে ফিরতেই তারাশঙ্করের 'মনের মধ্যে

"মন্বন্তর" রচনার বীজটি নিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।' কলকাতার নাগরিক জীবন নিয়ে এই তাঁর 'প্রথম প্রচেষ্টায়' ব্যবসায়ী মহলের 'সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধা' আর গরিবের 'অসহায় আত্মবিক্রয়'-এর ছবি এঁকে তুললেন তারাশঙ্কর। বিভূতিভূষণ লিখছেন 'অশনি-সঙ্কেত', মানিক নারায়ণ নবেন্দু ঘোষেরা লিখছেন একটির পর একটি মন্বন্তরের গল্প, আর এরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তৈরি হয়ে উঠছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বঙ্গীয় শাখা।

১৯৪৩ সালের ২৫ মে বোম্বাই শহরের একটি সম্মেলনে IPTA প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষিত হয়েছিল, বলা হয়েছিল যে দেশের সামনে তখন দ্বিমুখী বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে **'external agression by the Fascist hordes'** আর **'internal repression by an alien Government'**, আর তাই : **'It is the task of the movement to enthuse our people to build up their unity and give battle to the forces ranged against them with courage and determination...'**। এই কাজে, সম্মেলনের লক্ষ্য হলো গান নাটক কবিতাকে সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য রূপে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আর লোকশিল্পগুলির উজ্জীবন ঘটানো।

প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গণনাট্যসংঘ এই এক মস্ত বড়ো দায়িত্বের মুখে এসে দাঁড়ায় : মন্বন্তরের সঙ্গে লড়াই। জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে গান আর নাটকের ভূমিকা অনেক বড়ো হয়ে ওঠে এখানে, একদিকে বিনয় রায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস দেবব্রত বিশ্বাসের গানে, অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্য বিনয় ঘোষ শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চায়। আবারও এর কেন্দ্রে রইল ওই ৪৬ নম্বর বাড়ি, যেখানে আলোচনায় মহড়ায় এঁরা যেতে থাকেন সবাই, যেখানে মাঝে মাঝে এসে পৌঁছন হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আর শিখিয়ে যান গান। 'সুরিয় অস্ত্ হো গয়া / গগন মস্ত্ হো গয়া' কিংবা 'অব্ নভ্ মে পতাকা / নাচত হ্যায় নাচত হ্যায়'।

হরীন্দ্রনাথের গান-শেখানোর এই ছবিটি ধরা আছে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্মৃতিকথায়। কলকাতার পথ থেকে এই জ্যোতিরিন্দ্র সেদিন তুলে আনছিলেন নতুন এক সাংগীতিক প্রেরণা। লিখেছেন তিনি : 'আর ঘরে থাকা যাচ্ছিল না। জমাট সাহিত্যিক আড্ডা ও রিহার্সাল ছেড়ে আমরা সবাই রাস্তায় নেমে পড়লাম। চরম বিপর্যয় ও বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।...অস্থির পায়ে দৌড়তে দৌড়তে হেঁটে চলেছি আর মনে মনে বলছি—We won't allow people to die—মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষ মানব না, প্রতিরোধ করব, উত্তীর্ণ হব।...সুর আর কথা মনের বেদনা আর যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎসমুখ থেকে ঝর্ণার মতো বেরিয়ে এল। শুরু হল "নবজীবনের গান"।'

এই 'নবজীবনের গান' আর শম্ভু মিত্রের আবৃত্তিধন্য তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'মধু-

বংশীর গলি' সেদিন একটা উদ্দীপনা এনে দিল শ্রোতাদের মনে। আর এরই পাশাপাশি, ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর, বাংলা নাটক আর মঞ্চের একটা যুগান্তর ঘটে গেল বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'নবান্ন'র অভিনয়ে। সমকালীন গ্রামজীবন, মন্বন্তরের বিভীষিকা, শহরে ঔদাসীন্য বা নিষ্ঠুরতা আর সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ —প্রথাভাঙা এই নাট্যবিষয় এক সহজ আঙ্গিকে দর্শকের সামনে এসে পৌঁছল। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে পর পর সাত রাত শম্ভু মিত্র তৃপ্তি ভাদুড়ি (পরে মিত্র) বিজন ভট্টাচার্য শোভা সেন সুধী প্রধান চারুপ্রকাশ ঘোষ গঙ্গাপদ বসুদের সেই অভিনয়ে দপ্ দপ্ করতে লাগল সমকাল। একদিকে কালিদাস রায়ের মতো পুরনো যুগের কবি তখন লিখছেন যে এ-নাটক দেখে তাঁর 'নিজের আরাম বিলাসের হৃদয়হীন জীবনযাত্রার প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে—ভবিষ্যতে আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু করিবার জন্য সংকল্পও জাগিয়াছে', আর অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নতুন যুগের ঔপন্যাসিক ভাবছেন যে 'সাহিত্যিক হিসেবে আমার একটি ভীরুতা সম্বন্ধে এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন।' গণনাট্যসংঘের কাজ দেখে তাঁর দৃষ্টি বদল ঘটছে, বুঝতে পারছেন যে পাঠক-সাধারণকে বোধহীন বলে মনে করাটা লেখকেরই দুর্বলতা, তাঁর মনে হচ্ছে যে এবার 'নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।'

সত্যিই উন্নতি হলো কি না, তা নিয়ে অবশ্য সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত ধারাবাহিক এক তর্ক চলে আসছে। 'দিবারাত্রির কাব্য' 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'পদ্মানদীর মাঝি'র মতো প্রগাঢ় উপন্যাস যিনি লিখেছিলেন, কম্যুনিস্ট হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করবার (১৯৪৪) পর তার তুল্য আর কিছু কি লিখতে পেরেছিলেন তিনি? এই প্রশ্ন তুলে বুদ্ধদেব বসুর মতো অনেকেই আক্ষেপ করলেন যে মানিকও শেষ পর্যন্ত লিখছেন তাত্ত্বিক লেখা **'like the great quantities of verse and fiction (if we must call them so) being written in Bengal at the moment merely to illustrate some particular political doctrine'**!

প্রগতিলেখক, ফ্যাসিস্টবিরোধী বা ভারতীয় গণনাট্য, সমস্ত সংঘেরই স্পষ্ট একটা মানবিক দিক ছিল বলে সচেতন শিল্পীমাত্রেই তার সঙ্গে নিজেকে অল্পবিস্তর যুক্ত করতে চেয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে সকলের পক্ষে এই সংঘগুলির রাজনৈতিক দৃষ্টিকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অল্পদিন পরে সমমতাবলম্বীদের মধ্যেই দেখা দিল সূক্ষ্ম মতাদর্শের সংঘাত, শম্ভু মিত্রের মতো কেউ কেউ নিজেকে সরিয়ে নিলেন গণনাট্য থেকে। এও যখন সম্ভব হলো, তখন বোঝা যায় যে মার্ক্সবাদবিরোধীরা এইসব সংঘে খানিকটা বিপদেরই ছায়া দেখতে পাবেন। ফ্যাসিস্টবিরোধী সংঘ বিষয়ে তারাশঙ্কর সরলভাবেই লিখেছেন তাঁর

স্মৃতিকথায়, 'আমি সেদিন এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিছক রাজনৈতিক দলের একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠান ব'লে প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারিনি। কারণ ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয়দের নাম আমাকে একথা বিশ্বাস করতে দেয়নি।' কিন্তু বুঝবার পর, কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি পি. সি. যোশীকে তিনি জানান : 'As regards your party-policy, I disagree with you in many points.... My creed is Ahimsa and Truth'। বলা যায়, এই 'creed'-এর আস্থা নিয়ে এবার গড়ে উঠল একেবারে বিপরীত এক দল : 'কংগ্রেস সাহিত্যসংঘ'। 'শনিবারের চিঠি'র সূত্রে এর অধিনায়ক হয়ে উঠলেন সজনীকান্ত দাস। মোহিতলাল, তারাশঙ্কর আর বনফুলের মতো লেখকদের তিনি ব্যবহার করতে পারলেন এই সংঘের পরিপোষণে, সাংস্কৃতিক স্তরে কম্যুনিস্টবিরোধিতার একটা কেন্দ্র হয়ে উঠল ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী এই সংঘ। সুকৃতি সেনের গানে আর সজনীকান্তদের আয়োজনে 'অভ্যুদয়'-এর মতো নাটকে এ-সংঘ সেদিন খানিকটা জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল।

এটা কিন্তু লক্ষণীয় যে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের বড়ো একটা পর্বকে প্রায় পাশ কাটিয়েই গেছে। ফ্যাসিবাদে সমস্ত পৃথিবী যখন বিপন্ন, ঠিক তখনই যে বৃটিশের চূড়ান্ত নির্যাতন চলছিল দেশেরই মধ্যে, কম্যুনিস্ট মতাদর্শ তাকে কিছুটা উপেক্ষা করেছে তখন। তাই ১৯৪২ সালের আগস্টে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যে মন্থন তুলেছিল গোটা দেশে, সে-বিষয়ে সচেতনতার কোনো চিহ্ন থাকে না এই সংঘের লেখকদের মধ্যে। সংঘের বাইরে থেকে মনোজ বসু লিখেছেন বটে 'আগস্ট, ১৯৪২', কিন্তু শিল্পের বিচারে তা অনেকটা অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়ায়। বরং সেই সময়ে, কলকাতার নয়, বাংলার বাইরে থেকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের এক অজানা লেখক চমকে দিলেন পাঠকদের, বিয়াল্লিশের এই আন্দোলন নিয়ে স্মরণীয় একটি উপন্যাস ছাপা হলো অখ্যাত এক প্রকাশনা থেকে, ১৯৪৫ সালের শেষে। উপন্যাসের নাম 'জাগরী', লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী।

বেদনাকোমল এই রাজনৈতিক উপন্যাসটিকে সঙ্গে-সঙ্গেই বরণ করে নিলেন পাঠকেরা। সন্দেহ নেই যে রচনার নিজস্ব মূল্যেই সেটা সম্ভব হতে পেরেছিল সেদিন। কিন্তু এও ঠিক যে এ-আস্বাদনের মধ্যেও এসে গেল বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী দ্বন্দ্বের চিহ্ন। এক কাহিনীর মধ্যে ছিল কম্যুনিস্টদের বিষয়ে একটা কটাক্ষ, হয়তো সেই কারণে একটা মহলে এর রচয়িতাকে নিয়ে উৎসাহ হলো একটু বেশি। নীরেন্দ্রনাথ রায় বা গোপাল হালদার সতীনাথের অকুণ্ঠ প্রশস্তি করেও তাঁর কম্যুনিজম-বিরোধিতাকে আক্রমণ করতে ভোলেন না, অন্তপক্ষে অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পূর্ণ শিখু হন তাঁর 'সাহিত্যিক সত্যদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি'তে।

বস্তুত, দুপক্ষেই, রাজনীতি দিয়ে সাহিত্যবিচার করবার অভ্যাসটা তখন বড়ো হয়ে উঠেছে। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে যিনি লিখতে পেরেছেন 'ধাত্রীদেবতা' 'কালিন্দী' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' 'কবি' আর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মতো উপন্যাসগুলি, ফ্যাসিস্টবিরোধী সংঘের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর তাঁকে শুনতে হলো বামপন্থীদের প্রতিকূল মন্তব্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হাওড়ার এক অধিবেশনে 'হাঁসুলী বাঁক' বিষয়ে বলা হলো 'এটা সাহিত্যই নয়, এটা অ্যাডভেঞ্চারাস রোমান্টিসিজম বা রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারিজম…'। আবার, তাঁর মন্বন্তর বইটিতে কম্যুনিস্টদের ঈষৎ প্রশস্তিই আছে বলে সেই বইকে ধিক্কারযোগ্য ভাবেন উলটো শিবিরের লেখকেরা। একদিকে, বুদ্ধদেব বসু চিঠি লিখছেন যক্ষ্মাতুর মৃত্যুমুখী সুকান্তকে, 'রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছ তুমি; তোমার জন্য দুঃখ হয়'। আর অন্যদিকে, বিষ্ণু দে-র কবিতাও যথেষ্ট মার্কসবাদী বা গণপন্থী নয় বলে ভর্ৎসনা করছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, বলছেন যে এসব কবির 'পেশাই হলো ফাঁকিবাজী, ফাঁকির শূন্যকে আঙ্গিকের ফাঁপা চটকে মুড়ে লোকঠকানো'।

কিংবা ধরা যাক জীবনানন্দ দাশের কথা। গুরুত্বহীন এক কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্যের কবিতাবইয়ের আলোচনায় সেদিনকার তরুণ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও লিখে বসেছিলেন যে জীবনানন্দের আত্মক্ষয়ী অবসাদের তুলনায় দেশমুখ্যের সবল আশাবাদ অনেক বেশি বরণীয়! জীবনানন্দের মতো স্বভাবত নীরব মানুষকেও সেদিন এর প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে হয়েছিল, বোঝাতে হয়েছিল কবিতাপাঠের যথার্থ পদ্ধতি। দৃষ্টি একটু আচ্ছন্ন ছিল বলেই অনেকে তখন লক্ষ্য করেননি যে আমাদের এই আলোচ্য সময়ে জীবনানন্দ পেরিয়ে এসেছেন তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কাল', পৌঁছে গেছেন 'মহাপৃথিবী' বা 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতায়। তিনি তখন তাঁর চারপাশে দেখছেন 'অদ্ভুত আঁধার', কেননা 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা'; ১৯৪৬-৪৭ সালের কলকাতায় বসে ঘোষণা করেই বলছেন তিনি :

'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
ব'লে যাবে 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির…'

হ্যাঁ, আমরা এসে পৌঁছই একেবারে স্বাধীনতার কূলে, দাঙ্গার কলকাতায়।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে, রশীদ আলি দিবসের আন্দোলনে যেদিন হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে পা মিলিয়ে চলছিল ধর্মতলা স্ট্রিট দিয়ে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'চিহ্ন' উপন্যাসের রশ্মুলের মতো অনেকেরই সেদিন মনে হয়েছিল যে 'সে যেন কত যুগ-যুগান্ত ধরে এমনি গরম হৃদয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সমস্বর প্রার্থনা করে আসছিল তার দেশের মানুষের কাছে, আজ এখানে দেখতে পাচ্ছে তার কামনা পূর্ণ হবার সূচনা'। সেদিন কেউ কল্পনা করেনি যে এর অল্পদিনের মধ্যেই দেখা দেবে ষোলই আগস্টের সাম্প্রদায়িক সর্বনাশ। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বানে যে চারদিনের তাণ্ডব শুরু হলো সেদিনকার কলকাতায়, তারই ফল হিসেবে পরের আগস্টে এসে পৌঁছল দেশভাঙা এক স্বাধীনতা। দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, আবারও দাঙ্গা : এই আবর্তগুলিতে আরো একবার একযোগে মিললেন নানা মতের শিল্পী-লেখকেরা। 'প্রগতি লেখক সংঘ' আর 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'র যুগ্ম উদ্যোগে দাঙ্গাবিরোধী মিছিলে বক্তৃতা করছেন তারাশঙ্কর, দাঙ্গাপ্রতিরোধের চেষ্টায় আহত হচ্ছেন বিষ্ণু দে। একটি কবিতার উৎসকথা জানাতে গিয়ে এই কবি আমাদের শুনিয়েছেন সেই কাহিনী, কীভাবে তাঁর প্রতিবেশী ভিন পাঠান করজোড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছিলেন আক্রমণমুখী জনতার কাছে, কীভাবে আত্মরক্ষার্থে একজন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জলে আর সেইখানেই পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছিল তাঁকে, কীভাবে শিল্পী নীরদ মজুমদারের সাহায্যে সেই আহত পাঠানকে নিরাপদ জায়গায় রাখতে গিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন তাঁরা, কীভাবে এই অভিজ্ঞতা থেকেই সূচিত হয়েছিল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'জল দাও'।

শুধু দাঙ্গারই নয় অবশ্য, ও-কবিতার মধ্যে জড়িয়ে যায় আমাদের যাবতীয় লাঞ্ছনার স্মৃতি, আমাদের দেশভাগের দীর্ঘশ্বাস—

এখানে-ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছার্উনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কী যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় না কি সে ঢাকায়

কিন্তু এইসব যন্ত্রণার সঙ্গে জেগে থাকে আমাদের ভবিষ্যতেরও আশ্বাস, কেননা

আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
এ-কূলে ও-কূলে আমাদেরই বর্তমানে

আর তাই, 'একরাশ শাদা বেলফুল' ফোটাবার জন্য সময়ের মর্মের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে সমগ্রের এই প্রার্থনা : জল দাও—

জল দাও আমার শিকড়ে।

৩

১৯৫২ সালের দোসরা এপ্রিল। পার্ক সার্কাস ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিস্ময়মুগ্ধ একজন তরুণ দেখছে : কোণাকুণি পথ ভেঙে দীর্ঘ পদক্ষেপে বিশাল প্যাণ্ডেলের দিকে ওই এগিয়ে চলেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; তুর্কী কবি নাজিম হিকমতের কবিতার টাইপ-করা ইংরেজি স্লিপ্ট হাতে নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইণ্টারভিউ দিচ্ছেন এক অবাঙালি সাংবাদিকের কাছে, প্রেস-চিহ্নিত ঘেরাওয়ের মধ্যে বসে বিবরণী লিখবার জন্য তৈরি হয়ে আছেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মঞ্চ থেকে সভাপতিমণ্ডলীর নাম ঘোষিত হচ্ছে একের পর এক—ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, উদয়শঙ্কর, যামিনী রায়, মামা ওয়রেকার, সুমিত্রানন্দন পন্থ, ভাল্লাথোল, মুল্‌করাজ আনন্দ, কৃষণ চন্দর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সৈফুদ্দিন কিচলু, পৃথ্বীরাজ কাপুর···

পৃথ্বীরাজও কি এসেছেন এর মধ্যে? হ্যাঁ, ওই যে দশ-হাজার-মানুষের ভিড়ে-লুকিয়ে থাকা কিংবদন্তির মানুষটি ধবধবে শাদা পোশাকে স্মিতমুখে এগিয়ে চলেছেন মঞ্চের দিকে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে নানারকম সৃষ্টিজগতের মানুষেরা একই মঞ্চের ওপর বসবেন আজ সপ্তাহব্যাপী সর্বভারতীয় এই শান্তি-উৎসবে। কলকাতায় আজ একসঙ্গে মিলবে মহারাষ্ট্রের 'তামাশা' বিহারের 'ঝুমুর' আর মালদহের 'গম্ভীরা'। প্রেমচন্দের 'গোদান'-এর পাশাপাশি অভিনয় হবে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার', আলি সর্দার জাফরি আর পারভেজ শাহীদীর মুশায়েরার পাশেই উদাত্ত গলায় গাইবেন লোকগায়ক গুরর শেখ, কবির লড়াই জমবে শেখ গোমানি আর রমেশ শীলের মধ্যে। আর, এই সমস্তটা নিয়ে বলা হবে শুধুই শান্তির কথা, বলা হবে : **Let us strive for peace on the basis of the values of life in which we believe—the dignity of man, the freedom of peoples, the brotherhood and equality of nations!**

খুব সরাসরি না হলেও, কলকাতার নবীন সাহিত্যসমাজে এর একটা দূরপ্রসারী ভূমিকা ছিল মনে হয়। এই ঘটনার সঙ্গে যদি যুক্ত করে দেখি কয়েক বছর পরপর চীন-ভারতের পঞ্চশীল প্রস্তাব, বান্দুং সম্মেলন আর চৌএন লাইয়ের 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' স্লোগান, বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের সাড়াজাগানো ভারত সফর, তাহলে বুঝতে পারব কেন সেদিন এক সরলীকৃত আশাবাদ সঞ্চার হচ্ছিল চারপাশে, যেন সরে যাচ্ছিল একটা জগদ্দল চাপ। আবহাওয়ার মধ্যে এই কথাটি যেন জেগে উঠছিল যে অনেক লড়াইয়ের পর এবার তবে ঘরে ফেরার দিন।

প্রায় একই সময়ে কলকাতা তখন প্রত্যক্ষ করছে রবিশঙ্করের শম্ভু মিত্রের সত্যজিৎ রায়ের বিপুল উত্থান, পরপর দু বছরে 'রক্তকরবী'র মতো নাটক আর 'পথের পাঁচালী'র মতো চলচ্চিত্রের আবির্ভাব। ১৯২৪ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায়

ছাপা 'রক্তকরবী'কে পাঠকেরা ভেবেছিলেন আরো-একটা হেঁয়ালিভরা রবীন্দ্র-রচনা। ঠিক তিরিশ বছর পর ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্রকে এসে দেখাতে হলো কী প্রবল সমকালীন সত্য স্তরে স্তরে নিহিত ওই নাটকে। পালটে গেল রবীন্দ্রনাট্য বিষয়ে আমাদের যাবতীয় পুরোনো ধারণা, তৈরি হলো বাংলা মঞ্চেরও একটা নতুন ইতিহাস। আর, তার ঠিক পরের বছরেই, প্রায় পঁচিশ বছর আগে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'কে নিয়ে সত্যজিৎ রায় সঞ্জীবিত করলেন আমাদের চলচ্চিত্রের বোধ। এদেশে, যেন ওই প্রথম, চলচ্চিত্রও হয়ে উঠল যথার্থ কোনো সৃষ্টি, অন্য যে-কোনো সৃষ্টিকাজের পক্ষে প্রেরণাময়। সেনেট হলের প্রশস্ত সভায় এই কথাটাকে ঘোষণা করবার আয়োজন করলেন রাম বসুর নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণ লেখক আর ছাত্র। লিখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী : 'মনে আছে মোটা তুলি আর সাদা পোস্টার কালার দিয়ে আলপনা আঁকছি সেনেটের সামনের ফুটপাতে। ধুয়ে গেল হঠাৎ ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টিতে। মাথার উপরে ছাতা ধরে আছে সন্দীপন। মোছা আলপনা আঁকছি আবার।' কেননা, এ হলো 'কতদিন পরে জীবনের অথবা বাস্তবের আঁকাড়া অবয়বকে শিল্পের পূর্ণতায় পৌঁছতে দেখার উল্লাস।'

ঘরে ফেরার আয়োজন ছিল এই সবকিছুরই মধ্যে। কয়েক বছর ধরে শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্যনিবন্ধগুলিতে কেবলই লিখছিলেন এক ভারতীয় নাট্যাদর্শের কথা, মঞ্চ-রূপায়ণেও ধরতে চাইছিলেন তার আভাস। অন্যদিকে, অপু-ত্রয়ী 'জলসাঘর' বা 'দেবী'র মতো প্রথম পর্বের ছবিগুলিতে সত্যজিৎ ছুঁতে চাইছিলেন আমাদের গ্রামীণ প্রবাহ। আর তাই, এটা প্রত্যাশিতই লাগে যে এই পরিবেশে এখন থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে থাকবে 'বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন' নামে একটা বাৎসরিক উৎসব। আমাদের সংস্কৃতির এক সামগ্রিক পরিচয় সাজিয়ে ধরবার লক্ষ্য নিয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে এই সম্মেলন হলো মহম্মদ আলি পার্কে, ঠিক দশ বছর আগে যেখানে 'রবীন্দ্রনগর' নাম দিয়ে আর 'সোমেন চন্দ তোরণ' বানিয়ে ফ্যাসিস্টবিরোধী অধিবেশন বসেছিল একবার। কয়েকবছর পর এ সম্মেলন সরে গেল মার্কাস স্কোয়ারে, আরো কয়েক বছর পর কলকাতার একেবারে কেন্দ্রে, ময়দানে। নানা শিল্পকলার বিচিত্র সম্ভারের সঙ্গে এই সম্মেলনগুলির বিশিষ্ট এক অংশ হয়ে উঠল কবিতা পড়ারও আসর, আধুনিক কবির সঙ্গে পাঠকদের একেবারে মুখোমুখি করে দেবার আয়োজন।

এ আয়োজনের সূচনা হচ্ছিল অবশ্য কয়েক বছর আগেই। ১৯৫২ সালে, অরুণকুমার সরকার বা নরেশ গুহর মতো সেদিনকার তরুণ কবিরা পথে পথে ঘুরে চমক তৈরি করছিলেন একটা নতুন ধরনের স্লোগানে : 'আরো কবিতা পড়ুন'। সোৎসাহ সমর্থনে বুদ্ধদেব লিখছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায় : 'শনিবারের বিকেলে, আপিশ-ছুটির ভিড়ের মধ্যে, কলকাতার ফুটপাতে হঠাৎ রোল উঠলো, "কবিতা

পড়ুন। কবিতা পড়ুন! কবিতা না পড়লে বাঙালি বাঁচবে না!"—আর অমনি কিছু ভিড় জ'মে উঠলো চারদিকে, আর একদল যুবক কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাতে লাগলেন—যদি-বা তাতে হঠাৎ কারো মনের কোনো বন্ধ জানলা খুলে যায়। এইরকম দুটি পথ চলতি সভার আমরা খবর পেয়েছি এ-পর্যন্ত, একটি এসপ্লানেডে, অন্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, এবং ভবিষ্যতে শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও এর পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা আছে ব'লে শুনেছি।'

খুব-যে বেশি পুনরাবৃত্তি আর হয়েছিল তা অবশ্য নয়, কিন্তু এরই থেকে তৈরি হয়ে উঠল ভিন্ন ধরনের আরো কয়েকটি আয়োজন। যাঁরা আরো তরুণ, সবেমাত্র কলেজের ছাত্র যাঁরা, তাঁদেরই কারো কারো চেষ্টায় স্কটিশচার্চ কলেজে এক কাব্য-সভার আয়োজন হলো ১৯৫৩ সালের মার্চে, যে-সভার বক্তা ছিলেন অজিত দত্ত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কবিরা। ঠিক হয়েছিল যে বছরে চারবার আহূত হবে এইরকম কাব্যসভা, আর তাহলেই না কি—সদ্য তরুণ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়—'আত্মকেন্দ্রিক কবিকে চোখ তুলে তাকাতে সহায়তা করা' হবে।

না, এ সভাও বছরে চারবার হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এরই কয়েক মাস পরে ঘটে গেল সেনেটহলের ঐতিহাসিক প্রথম কবিসম্মেলন। পুরোনো দিনের ঐতিহ্য নিয়ে গোলদীঘির মুখোমুখি দাঁড়ানো গম্ভীর সেনেট হল, ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে যাবার পর বিশাল স্তম্ভওয়ালা প্রশস্ত বারান্দা, আর তারপর হলঘরের বিস্তার। ১৯৫৪ সালের ২৮-২৯ জানুয়ারির দুই সন্ধ্যায় সেই ঐতিহ্যবাহী ঘরটিতে কলকাতা দেখল এক নতুন ধরনের সমাবেশ, প্রবীণ থেকে নবীনতম পর্যন্ত বাহাত্তর জন কবিকে ডাকা হলো তাঁদের কবিতা পড়বার জন্য। আহ্বায়ক ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব আর দিলীপকুমার গুপ্ত, ডি. কে. নামেই যাঁর পরিচয়। জরাট ভিড় উপচে পড়ছে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে সিঁড়িতে জীবনানন্দের নিজের গলায় রোমাঞ্চিত শ্রোতারা শুনতে পাচ্ছেন 'বনলতা সেন' আর 'সুচেতনা', সুধীন্দ্রনাথের গলায় 'নান্দীমুখ' আর 'যযাতি'। একদিকে এইসব খ্যাতিমানকে দেখবার/শুনবার উত্তেজনা, অন্যদিকে নতুন স্বর আবিষ্কার করবার বিস্ময়। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, যাঁর বয়স তখন কুড়ি, ওই বিরাট সমাবেশের মধ্যে তার একটিমাত্র কবিতা 'আমার ঠাকুমা' পড়েই অভিভূত করছেন শ্রোতাদের।

এর পর থেকে কবি সম্মেলন হয়ে দাঁড়াল আমাদের যে-কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এক সুনিশ্চিত অংশ। 'বঙ্গসংস্কৃতিসম্মেলন' যে বার বার তাকে আশ্রয় দেবে, সেকথা বোঝা যায়। কিন্তু কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে আবারও তার দেখা পাওয়া গেল ১৯৫৭ সালের মে মাসে, জোড়াসাঁকোয়। এবার আর শুধু কবিতা পড়া নয়। 'কবিতামেলা' নাম দিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরা আহ্বান করলেন তিনদিনের

এক আসর (২৭-২৯ বৈশাখ)। যে-আসরে থাকবে কবিতা বইয়ের প্রদর্শনী, থাকবে আধুনিক শিল্পীদের ছবি। প্রাচীন বাংলা কবিতা আবৃত্তি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক একশো তিরিশ জন কবির কাব্যপাঠ, বাউলগান বা কবিগান, নাটক আর নৃত্যনাট্য—সবই হবে সেই মেলার অঙ্গ। আরো অনেক কিছুর সঙ্গে সেই মেলা সংবর্ধনা জানাবে দুজন কবি-সম্পাদককেও; বুদ্ধদেব বসু আর সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য! পঞ্চাশের সূচনাদিনগুলিতে এই এক গুরুত্বময় নাম। কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধ। উল্লেখযোগ্যভাবে এর সবই লিখবেন তিরিশের এই লেখক, কিন্তু তরুণেরা বেশি আগ্রহী ছিল তাঁর মাসিকপত্র 'পূর্বাশা'র জন্য। অনেক দিনের পত্রিকা এই 'পূর্বাশা', কিন্তু ৫০-৫১-র দিনগুলিতেই বোধহয় তার আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশি। ইংরেজি মাসের ঠিক দ্বিতীয় দিনে ছিমছাম সুঠাম চেহারার সে পত্রিকা নিশ্চিতই পাওয়া যাবে স্টলে, এই জেনে উন্মুখ থাকত সেদিনকার সাহিত্য-প্রেমীরা। ধারাবাহিক তখন ছাপা হচ্ছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর উত্তেজক 'কল্লোল যুগ', এক-এক মাসে এক-একটি গল্প লিখে চমক তুলছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সন্তোষকুমার ঘোষ, জীবনানন্দের মননজটিল কবিতার পাশাপাশি ছাপা হচ্ছে তরুণ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অরবিন্দ গুহর উজ্জ্বল কিছু রচনা। প্রতিটি সংখ্যায় এই শতাব্দীর ইওরোপীয় মহারথীদের ছোটো একটা সচিত্র পরিচয় লিখছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিজে, কখনো সার্ত কখনো কাম্যু কখনো-বা কাফকার কথা। পাঠকেরা তাকিয়ে থাকছেন কলেজ স্ট্রিটের দিকে, আর লেখকেরা ৫৪ নম্বর গণেশ অ্যাভিনিউতে 'পূর্বাশা'র দপ্তরে তৈরি করে তুলছেন একটা আড্ডা।

'পূর্বাশা'র সেই দপ্তর ছিল এখনকার 'হিন্দ্‌' সিনেমার পাশে। আর 'বীণা' সিনেমার কাছাকাছি শিবনারায়ণ দাস লেনে 'অগ্রণী' পত্রিকার অফিসে ছিল আরেক আড্ডা। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য আর প্রফুল্ল রায় -সম্পাদিত এই বামপন্থী পত্রিকার আহ্বান ছিল উদার, সেখানে লেখা ছাপাবার অবাধ সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও, তর্কেবিতর্কেও তাঁরা কখনো কখনো মিলতে পারেন সেখানে। কম্যুনিস্ট পার্টির সাহিত্যিক মুখপত্র হিসেবে 'পরিচয়' পত্রিকাও ততদিনে জায়গা পালটেছে ৮৯ নম্বর মহাত্মা গান্ধী রোডে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাত পেরিয়ে সম্পাদনার দায়িত্ব পৌঁছেছে ননী ভৌমিকের হাতে। সান্ধ্য আলোচনায় কখনো বা প্রশ্ন ওঠে : প্রচার সূত্রে 'কল্লোল' কি তবে গোটা একটা যুগেরই পরিচয় হয়ে দাঁড়াল? 'পূর্বাশা'য় অচিন্ত্যকুমারের লেখার প্রতিবাদ হিসেবে হিরণকুমার সান্যাল তাই লিখতে শুরু করেন 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর'। এইভাবে, দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী দুই সাহিত্যচেতনার লড়াই চলছেই সমানে, একটির লালন যদি 'কবিতা' 'পূর্বাশা' বা হুমায়ুন কবিরের 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়, অন্যটি তবে দেখা দিচ্ছে 'অগ্রণী'

'পরিচয়' বা বিষ্ণু দের 'সাহিত্যপত্র'তে। নতুন কোনো লেখকের লেখা পেলেই সবাই বুঝে নিতে চান তিনি ঠিক কোন্ শিবিরের লোক।

শিবির ভাগের এই জগৎ থেকে সরে এসে সাহিত্যের ভিন্ন কোনো পথ পাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ? 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় জীবনানন্দের কবিতাকে যে তীব্র ভর্ৎসনায় লাঞ্ছিত করছিলেন সুভাষ, সেটাই কি সাহিত্য বিচারের একমাত্র দৃষ্টি ? কোনো কোনো তরুণের মনে এসব প্রশ্ন উঠছিল সেদিন। দুই শিবির থেকেই দূরে সমস্ত তরুণের জন্য নতুন এক পত্রিকার সম্ভাবনা হলো তাই। ১৯৫৩ সালের আগস্টে দেখা দিল ত্রৈমাসিক 'কৃত্তিবাস', দীপক মজুমদার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দ বাগচীর সম্পাদনায়, আর দিলীপকুমার গুপ্ত বা ডি. কে.-র উৎসাহে।

পঞ্চাশের কলেজ স্ট্রিট কখনো ভুলতে পারে না এই ডি. কে.-র নাম। কোনো প্রকাশক যে সাহিত্যরুচি নির্মাণে এতদূর প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেন, ডি. কে. তার এক বিস্ময়কর উদাহরণ। সিগনেট প্রেস : তাঁর পরিচালিত প্রকাশনার এই নামটাই যেন যথেষ্ট তখন, বইয়ের জগতে এই নামের সঙ্গে যেন জড়ানো থাকে যাবতীয় সুরুচি আধুনিকতা আর সাহিত্যপ্রেম। প্রতিষ্ঠিত লেখকদেরও বইছাপানো যখন সহজ ছিল না, সেই দুর্দিনে, প্রকাশনা বিষয়ে আমাদের ধারণা পালটে দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা স্নিগ্ধ মলাটে একের পর এক হাতে আসছে সবার : 'বনলতা সেন' 'সংবর্ত' 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর মতো কবিতার বই, 'সাহিত্যচর্চা' 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' বা 'স্বগত'-র মতো প্রবন্ধের বই। শুধু বইয়ের প্রকাশ নয়, আধুনিক সাহিত্যের পাঠক তৈরি করবার জন্য (আর নিশ্চয় সম্ভাব্য ক্রেতা তৈরি করবার জন্যেও) সাহিত্যের ধাঁধা বা খবরাখবর ছাপা হচ্ছে 'টুকরো কথা' নামের সুদৃশ্য এক পাক্ষিক বুলেটিনে। যে-কোনো মানুষের অবাধ প্রবেশ তখন বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের 'সিগনেট বুক শপ'-এ, যারা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে উলটে-পালটে বই দেখতে পারেন পড়তে পারেন যে-কেউ, কিনতে যদি না-ও পারেন, কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে এও এক বিরল অভিজ্ঞতা।

সেই ডি. কে.-র সক্রিয় পরামর্শে 'তরুণতম কবিদের মুখপত্র' হিসেবে বেরোল 'কৃত্তিবাস', তার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হলো যে সমস্ত তরুণ কবির একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা দরকার, কেননা, 'দলের সম্মিলিত আড্ডায় কবিদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং পারস্পরিক বন্ধুত্ব যত দৃঢ় হয় লেখার আত্ম-স্বতন্ত্রতা তত বৃদ্ধি পায়।'

এটা ঠিক যে তত্ত্বরুচিনির্বিশেষে সব তরুণেরই কবিতা ছাপা হতো ওখানে, কিন্তু তবু এ-পত্রিকার বিরোধীই ছিলেন সম্পাদকদের সমবয়সী অন্য কয়েকজন তরুণ। অল্পে অল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে 'কৃত্তিবাস'-এর প্রধান ঝোঁকটা আত্ম-জৈবনিক আত্মকেন্দ্রিক রচনায়। ওদিকে, কলকাতার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আরেক

পত্রিকা 'শতভিষা'য় খোঁজা হচ্ছিল কবিতার এক 'শুদ্ধ সত্তা', সে-পত্রিকার সম্পাদনায় ছিলেন অশোক সরকার দীপংকর দাশগুপ্ত আর তরুণ মিত্র। অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্ত ছিলেন এর নিকট-সহমর্মী। উত্তর কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটের বা শ্যামবাজারের কফি হাউসে কিংবা দেশবন্ধু পার্কের সান্ধ্য নিরালায় নিজেদের নতুন লেখা নিয়ে হৈ হৈ করছেন 'কৃত্তিবাস'-এর দলবল, আর দক্ষিণ কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের মুখোমুখি 'সুতৃপ্তি' চায়ের দোকানে কাব্যতত্ত্ব নিয়ে তর্ক তুলছেন 'শতভিষা'র কবিরা, পঞ্চাশের শেষভাগে এ ছিল একটা নিত্যপরিচিত ছবি।

এই দুই প্রান্তের অন্য একটা প্রভেদও অবশ্য ছিল। কবিতাপত্রিকা হলেও 'কৃত্তিবাস' তার সঙ্গে রেখেছিল গদ্যলেখকদেরও। দেশবন্ধু পার্কে তাঁদের আড্ডায় —লিখেছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়—'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আসতেন। না জেনে পড়তেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে।...নিজের সম্পর্কে [তখনো] প্রচণ্ড দ্বিধা ও সংকোচ ছিল তাঁর।' এই সন্দীপন অথবা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো লেখকেরা ছিলেন 'কৃত্তিবাস'-এর একেবারে আপনজন, তার লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এ-পত্রিকায় তাই অমিয় চক্রবর্তী বা বিষ্ণু দে-র কবিতাবইয়ের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কথা তুলতে হতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা কমলকুমার মজুমদারকে নিয়েও।

কমলকুমার মজুমদার! একটা নতুন সময় তাহলে আসছে। ১৯৫৯ সালের এক অখ্যাত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ছাপা হলো এঁর উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা', খুব অল্প পাঠকই লক্ষ্য করলেন সেটা। কিন্তু এ লেখা আবিষ্কার করে আলোড়িত হয়ে উঠল তরুণ লেখকসমাজ, চিরাচরিত ভাষাপদ্ধতিকে মুচড়ে দিয়ে নতুন কিছু ছোঁবার জন্য যাঁরা উন্মুখ ছিলেন সেদিন। ওই ঝোঁক নিয়ে তরুণদের মধ্যে শক্তিমান্ এক ঝাঁক গল্পলেখকের আবির্ভাব হয়েছে হঠাৎ: মতি নন্দী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় দেবেশ রায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। 'এদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু ভালো লিখছে বিমলবাবু। আমি ওদের মাস্টারমশাই বলে বলছি না'—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন বিমল করকে। 'সাহেব বিবি গোলাম' 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' জাতীয় বিমল মিত্রের বিশাল কাহিনীগুলির পাশে 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' নামে এক ক্ষীণকায় গ্রন্থমালা নিয়ে যেতে আছেন তখন বিমল কর, সেখানে তিনি ছাপছেন দীপেনের 'জটায়ু' বা সন্দীপনের 'বিজনের রক্তমাংস'র মতো গল্পগুলি। 'সন্দীপনের ওই গল্পটি যদি বড় কোনো পত্রিকায়, এমনকি পরিচিত কোনো পত্রিকায় ছাপা হত'—লিখেছেন বিমল কর—'একটিমাত্র গল্পেই সন্দীপন বিখ্যাত হয়ে উঠত'।

'বিজনের রক্তমাংস' গল্পে পাস্তেরনাকের দুটি লাইন ব্যবহার করা হয়েছে, জানিয়েছিলেন সন্দীপন। পাস্তেরনাক কেন হঠাৎ? কেননা ১৯৫৮ সালে পাস্তের

নাকের নোবেল প্রাইজ পাবার সঙ্গেসঙ্গে কলকাতার সাহিত্যসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল আরো একবার, কেউ কেউ এ পুরস্কারের মধ্যে দেখেছিলেন কম্যুনিস্ট-বিরোধিতার পরিকল্পিত চক্রান্ত, আর কেউ-বা খুশি হয়েছিলেন পাস্তেরনাকের সোভিয়েত-সমালোচনার ধরনে। 'ডক্টর জিভাগো' পড়ে উত্তেজিত বুদ্ধদেব মন্তব্য করছেন : 'জিভাগোর কবিতা যিনি লিখেছেন তিনি যে একজন মহাভক্ত ও মহা-প্রেমিক, আর অনেক বয়স অবধি বেঁচে থেকে তিনি যে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, তা আর কাউকে ব'লে দিতে হয় না' ; 'আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে লিখছেন : 'ডাক্তার জিভাগো উপন্যাস মধ্যমতি রচনা নয়। পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রেরণা তার মজ্জায় মজ্জায়' ; আর এ দুইয়ের সামঞ্জস্য করবার ধরনে বুদ্ধদেবকে তাঁর পত্রপ্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী জানাচ্ছেন : 'এই অর্থ-পোলিটিক্যাল নোবেল-প্রাইজের যুগে…পাস্টেরনাক বিপর্যস্ত হলেন উভয় পক্ষের মল্লদের হাতে…কোনো পক্ষেরই জিৎ হবে না ঐ বইয়ের জোরে।' তরুণদের লেখাতেও তাই অনায়াসে উঠে আসছে এই প্রসঙ্গ, কখনো সন্দীপনের গল্পে, কখনো দীপক মজুমদারের প্রবন্ধে।

শেষ হয়ে আসছে একটা দশক, অবসন্ন হয়ে আসছে তিরিশের লেখকদের জগৎ। বড়ো কয়েকটি মৃত্যুতে চিহ্নিত এই দশক অবসান দেখছে আমাদের প্রধান দুই ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ (১৯৫০) আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৫৬), প্রধান দুই কবি জীবনানন্দ (১৯৫৪) আর সুধীন্দ্রনাথের (১৯৬০)। আকস্মিক এই মৃত্যুগুলির পর কবিতায় জীবনানন্দ আর উপন্যাসে মানিক হয়ে রইলেন তরুণদের কাছে প্রধান দুই আদর্শ, বন্ধ হবার উপক্রম হলো 'কবিতা' পত্রিকার, চোখের সামনে ভেঙে ফেলা হলো ঐতিহ্যেভরা সেনেট হলটিকে। ক্যামেরাহাতে দিনের পর দিন সেই ভাঙনের ছবি তুলে রাখতেন পূর্ণেন্দু পত্রী, স্কেচ করতেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, আর গল্পলেখা ছেড়ে কবিতার নেশায় পৌঁছে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখতেন 'সেনেট ১৯৬০' :

আজ সুন্দরতর তৃষ্ণা তুলে ফেলছে স্ট্রিম্‌লাইন্‌ড বাড়ি
কুপিয়ে বুকের মাটি সাধ্য করে সংযোগ স্থাপন।
তোমাদের শেষ নেই, তৎপর কর্নিক্ নিয়ে হাতে
সংস্কারপান্থ, হে বন্ধু, ভেঙে যাচ্ছো পুরোনো কলকাতা…

৪

১৯৬২ সাল। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে কলকাতার পথে পথে স্বদেশী গান গেয়ে প্রভাতফেরি করছেন কয়েকজন লেখক, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়দের 'সংস্কৃতি-পরিষদ'-এর আয়োজনে। সাধারণের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে ভরসা,

কেননা অবিশ্বাস্য এক ঘটনায় ত্রস্ত আজ সবাই। সংঘর্ষ শুরু হয়েছে চীনভারত সীমান্তে।

চীনভারতের সংঘর্ষ ? কয়েক বছর আগেই কি 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই'-এর মনমাতানো ধ্বনি শুনিনি আমরা ? সেসব কি ফাঁকা বুলি ছিল তবে ? ক্রুশ্চেভের স্টালিনবিরোধী ঘোষণায়, হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত ট্যাঙ্কের অনুপ্রবেশে কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী মহলে যে দ্বিধার লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল এর আগেই, তা আরো জোরালো হলো এই সংঘর্ষের ফলে, ভাঙনের চিহ্ন দেখা দিল কম্যুনিস্ট পার্টিতে। আর অন্যদিকে, মার্কসবাদ-বিরোধের অস্ত্র হিসেবে এইটেকেই একটা সুযোগ হিসেবে তুলে নিল সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা, 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নাম দিয়ে প্রতি সপ্তাহে সেখানে ছাপা হতে শুরু করল প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ব্যক্তিমুখী জবানবন্দী, কুড়ি বছর আগে প্রকাশিত 'কেন লিখি' বইটির একেবারে উলটো পিঠ যেন। কিছুকাল আগে চীন সফর শেষে 'চীন দেখে এলাম' ধরনের উচ্ছ্বাসময় বই লিখেছিলেন যাঁরা (মনোজ বসু), প্রকাশ্যে তাঁরা আজ পুড়িয়ে ফেলছেন সেই বই।

'শিল্পীর স্বাধীনতা' 'স্বাধীন সাহিত্যসমাজ' এসবেরই তুল্য নাম নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের শাখা তখন কাজ করছে কলকাতায় : Congress for Cultural Freedom। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সম্পাদনায় ইংরেজি পত্রিকা Quest-এর বেশ প্রতিপত্তি তখন, লেকসংলগ্ন একটি বাড়িতে মাঝে মাঝেই অধিবেশন বসে এই সংঘের। সেই বাড়িতে 'কৃত্তিবাস'-এর কবিরা যেন এক বিচারসভায় এসে দাঁড়ালেন ১৯৬৩ সালের এক সন্ধ্যায়। বুদ্ধদেব অভিযোগ করেছিলেন যে তরুণদের লেখা দুর্বোধ্য আর কিছু-বা অশ্লীল, শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত। কেননা, তাঁর মনে পড়েছিল যে এর পঁয়ত্রিশ বছর আগে বুদ্ধদেবরাই বিক্ষত হচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে ওই একই অপরাধে, নিজের যৌবনে রবীন্দ্রনাথও শুনেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ। প্রবীণ এবং প্রধানত অ্যাকাডেমিকদের সামনে তরুণেরা তাই কবিতা পড়লেন প্রায় জেহাদ নিয়ে, তাচ্ছিল্যভরে মধ্যপথেই উঠে গেলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের মতো কেউ কেউ, কিন্তু সভাশেষে সভাপতি শশিভূষণ সবাইকে অবাক করে তাঁর দ্বিধাহীন প্রশ্রয় জানালেন এই নতুনদের ভাবী সম্ভাবনাকে।

বুদ্ধদেবের উত্তেজনার একটা কারণ অবশ্য ছিল। বছর দশেক যেতে-না-যেতে মরিয়া ধরনের একটা ক্ষিপ্ত চেহারা ফুটে বেরোচ্ছিল 'কৃত্তিবাস'-এ। যৌনতা, পাপবোধ আর নরকবিলাসের অতিপ্রাদুর্ভাবে এতটাই আচ্ছন্ন হচ্ছিল লেখা যে অস্থায়ী সম্পাদককেও (শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়) শেষ পর্যন্ত জানাতে হলো 'কৃত্তিবাস ক্ষুধার্ত বা কামার্ত রচনার সংকলন নয়'। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিনয় মজুমদার আর উৎপলকুমার বসুর নাম তখন যুক্ত হয়েছে সুনীলের সঙ্গে, কবিতা

খ্যাতির সঙ্গেসঙ্গে সর্বার্থে প্রমত্ত এঁদের জীবনযাপনও কলকাতার তরুণসমাজে হয়ে উঠছে কিংবদন্তি। ১৯৬২ সালেই বীটবংশীয় গিন্‌স্‌বার্গ এসে পৌঁছেছেন কলকাতায়, Howl-খ্যাত এই মার্কিনী কবির সঙ্গে অবাধ বন্ধুত্বের ফলে এখানকার তরুণদেরও তখন 'অনবরত আড্ডা, একইসঙ্গে আহার-বিহার ও ভ্রমণ। অনেক সন্ধে কাটে নিমতলা শ্মশানঘাটে, সাধুসংসর্গে ও গাঁজার নেশায়' (সুনীল)। একদিকে এই সঙ্গ, অন্তদিকে বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়র-অনুবাদের (১৯৬১) 'মারাত্মক মদগন্ধ, আর এক কুটিল বাতাস'-এর প্রভাবে মদ্যপতা বাউণ্ডুলেপনা আর পতিতাসংসর্গকে ধরে নেওয়া হচ্ছে লেখকের পক্ষে অবশ্য যাপনীয় জীবন-পদ্ধতি।

এইসব উন্মাদনা থেকেই 'হাংরি জেনারেশন' নামে একটি শাখা-আন্দোলন বেরিয়ে এল একদিন। 'সেরিব্রাল কর্টেক্সে কলম ডুবিয়ে ডুবিয়ে কবিতা বানাবার কাল শেষ হয়ে গেছে, এখন কবিতা রচিত হয় অর্গাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে'—১৯৬২ সালেই মলয় রায়চৌধুরীর ঘোষিত এই বুলেটিন আশ্রয় করে নতুন কিছু গদ্যপদ্যের প্রচার শুরু করলেন সুভাষ ঘোষ শৈলেশ্বর ঘোষের মতো কয়েকজন, শক্তি আর উৎপলকেও বলা হলো দলের অন্তর্গত। এঁদের অনেক ঘোষণাপত্রই তৈরি হয়েছিল ইংরেজিতে, আর এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল বীটনিকদের সঙ্গে। 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' (শৈলেশ্বর), 'শয়তানের মুখ' বা 'জখম' (মলয়) ধরনের বেশ কিছু বই ছাপা হবার পর ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে দলের অন্তর্গত বেশ কয়েকজনকে অশ্লীলতার দায়ে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শক্তি অস্বীকার করলেন এঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগের কথা, সুনীলও জানালেন 'হাংরি জেনারেশন নামে কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সঙ্গে কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত'। ওদিকে আমেরিকা থেকে গিন্‌স্‌বার্গ এই পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে উসকে দিতে চাইলেন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের, কঠোর ভাষায় চিঠি লিখলেন আইয়ুবকে, আর উত্তরে জানালেন আইয়ুব: 'You may think it your duty to promote in the name of cultural freedom such adolescent pranks in Calcutta from halfway round the world', কিন্তু, 'I do not agree with you that it is the prime task of the Indian Committee for Cultural Freedom to take up the cause of these Immature imitators of American Beatnik poetry'।

লেখকেরা অবশ্য হাজত থেকে বেরিয়ে এলেন কয়েকদিনের মধ্যে, কিন্তু অন্ততম অভিযুক্ত উৎপলকুমার বসু (যাঁর সুরিয়ালিস্ট লেখায় যৌন উত্তেজনার আতরেক খুঁজে পাওয়া শক্তই ছিল) হারালেন মেয়েদের কলেজের চাকরি, এই

প্রথম* অশ্লীলতার অভিযোগে কলেজশিক্ষকতা থেকে বিনা প্রতিবাদে সরিয়ে দেওয়া হলো একজন কবিকে। কিছুদিন বেকার থাকবার পর, একটি জব-সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে, — সন্দীপনের ভাষায় — 'কলকাতার গায়ে উড়োজাহাজের বিচ্ছিরি ছায়া বুলিয়ে বিলেত চলে যায়' উৎপল।

'এবার কবিতা লিখে চাই আমি পন্‌টিয়াক গাড়ি' কিংবা 'কবিতা লিখেছি আমি চাই স্তচ, সাদা ঘোড়া, নির্ভেজাল ঘৃতে পক্ব মুর্গির ঠ্যাং শুধু, বাকি মাংস নয়' এইসব লাইন লিখে শিল্পের সঙ্গে ব্যবহারিক ভোগবাদের যে স্মার্ট সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরা, তার একটা পরোক্ষ ফল দেখা গেল লেখকজীবনের একটা তাৎক্ষণিক উত্তেজনায়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে, প্রতি সংখ্যার মলাটে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা স্কেচ-সুদ্ধ 'কবিতা সাপ্তাহিকী'র সম্পাদনা করছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পরে সেটা হলো 'সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা'। সাপ্তাহিকই যদি, তবে দৈনিকই-বা নয় কেন? বিমল রায়চৌধুরী আর শান্তি লাহিড়ীর সম্পাদনায় তাই সে-মাসের পনেরো দিন ধরে বেরোতে লাগল 'দৈনিক কবিতা', সারা রাত জেগে কাজ করবার পর সকালবেলায় পথে পথে তা ফেরিও করতে লাগলেন তারাপদ রায়ের মতো অত্যুৎসাহীরা। 'দৈনিক কবিতা'র আয়োজনের কথা শুনেই সাতই যে বেলা দশটা থেকে সুনীল রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রকাশ করতে লাগলেন 'কবিতা-ঘণ্টিকী', কৌতুকটা পৌঁছল চূড়ান্তে।

চারদিকে যখন চটুলদির এই উদ্‌বেলতা, কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস যখন ভরে আছে হল্লোড়ে, তখন, সেই কফি হাউসেরই কোণের এক টেবিল নির্ধারিত থাকত একমনে প্রুফ-দেখে-যাওয়া একজন মানুষের জন্য, নির্মাল্য আচার্য তাঁর নাম। অভিনেতা-বন্ধু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে ১৯৬১ থেকেই তিনি শুরু করেছেন সত্যজিৎ রায়ের মলাট-ভূষিত দ্বিমাসিক এক মর্যাদাময় পত্রিকার প্রকাশ: 'এক্ষণ'। যে-কোনো লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের স্বভাবমতো, এ পত্রিকাও তার সময়ানুবর্তিতা খুইয়েছিল অল্পদিনের মধ্যেই, কিন্তু চারপাশের বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার মননশীল স্থৈর্য আর নিঃশব্দ প্রতিষ্ঠানবিমুখিতা একে একটা স্বতন্ত্র মহিমা দিয়েছে বহু বছর জুড়ে। একদিকে গত শতকের দুষ্প্রাপ্য গুরুত্বময় কিছু রচনার পুনর্মুদ্রণে আর অন্যদিকে কমলকুমার মজুমদারের 'গোলাপসুন্দরী'র মতো গল্প ছাপিয়ে শুরু থেকেই 'এক্ষণ' তার চরিত্র তৈরি করে নিয়েছিল সেদিন।

অবশ্য, কমলকুমারের নতুন স্বরের আশ্রয় ছিল একেবারে দুই বিপরীত ধরনের পত্রিকাতেই — 'এক্ষণ' আর 'কৃত্তিবাস'। ১৯৬৫ সালের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় তাঁর

* একটা ভুল ধারণার প্রচলন আছে যে জীবনানন্দকে সিটি কলেজ থেকে সরানো হয়েছিল একটি কবিতা লেখার অপরাধে।

সুদীর্ঘ 'সুহাসিনীর পমেটম' ছাপতে গিয়ে সুনীল লিখেছিলেন : 'এ সংখ্যার গল্পটি লিখতে ক'বছর লেগেছে জানি না, ছাপা হতে ছ'মাসের বেশি লাগলো। ওঁর দুই সহচর ইন্দ্রনাথ ও বেলালকে দিয়ে প্রেস থেকে প্রুফ চুরি করে আনা, একটি শব্দ বদলাবার জন্য কয়েক সপ্তাহের উদ্বেগ, গল্প শেষ না হবার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। এই গল্পটি লেখা সম্পর্কে : "বুঝলে, আমরা যে এই গল্পটা লিখছি…"। "আমরা মানে কি কমলদা, আপনি লিখছেন তার সঙ্গে…"। "আঃ, চুপ কর না! ঠাকুর তো গল্পটা লেখাচ্ছেন, তোমাকে দিয়েও লেখাতে পারতেন…।" এ রকম অসাধারণ শক্তিমান রহস্যময় লেখককে আমাদের জীবদ্দশায় সত্যিই রাত ন'টায় ওয়েলিংটনের মোড়ে স্বচক্ষে দেখতে পাই, বিশ্বাস হয় না।'

'একটি শব্দ বদলাবার জন্য কয়েক সপ্তাহের উদ্বেগ' কথাটা মনে করিয়ে দেয় আরেকজন কবির নাম, সিদ্ধেশ্বর সেন, যিনি তাঁর কবিতায় একটা কমা-চিহ্নের সমস্যা নিয়ে প্রেসের দরজা খুলিয়েছিলেন মধ্য রাতে, টাইপ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন লোকের ঘুম ভাঙিয়ে। অথচ এই হচ্ছে সেই সময়, যখন শারদীয় সংখ্যাগুলিতে উপন্যাসের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার, প্রতিবাদহীন এক-একজন লেখককে অল্প সময়ে লিখে ফেলতে হচ্ছে পাঁচসাতটি উপন্যাস আর অজস্র গল্প।

১৯৬৪-৬৫ সাল জুড়ে চিন্তাশীলদের আরেকটা স্মরণীয় মিলনকেন্দ্র ছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর তিনতলায়। গান্ধীবাদী নির্মলকুমার বসুর স্নেহচ্ছায়ায় স্বল্পভাষী নিরলস এক কম্যুনিস্ট তরুণ তখন 'এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট আন্দোলন'-এর স্বপ্ন দেখছেন, পরিষদ-প্রযোজিত 'ভারতকোষ'-এর সহ-সম্পাদনার সুবাদে। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, ধীরস্থির চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলছেন তরুণ সুবীর রায়চৌধুরী, নির্মল-কুমার বসুর সঙ্গে তর্ক করছেন শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন বা রমেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে মুহুর্মুহু, কাছেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে ছুটতে হচ্ছে কখনো-বা, সব বয়সের বিজ্ঞানী সাহিত্যিক দর্শনবিদ ইতিহাসবিদেরা ভিড় করে আছেন মস্ত এক গোল টেবিলের চারধারে, আর এই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে বত্রিশ বছর বয়সের একজন তরুণের নিষ্ঠা। এই তরুণ, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, 'ভারতকোষ'-এর সঙ্গেসঙ্গে 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকাটিরও দায়িত্ব নেন অল্পদিনের জন্য, প্রায় রিলে-দৌড়ের মতো সম্পাদনার হাতবদলের মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দে-র যে-পত্রিকা একটা সুস্থতা বাঁচাতে চেয়েছিল প্রায় দুই দশক জুড়ে।

প্রদ্যুম্ন ছিলেন নীরব, কিন্তু তাঁর চারপাশে ছিল একটা সংগঠন। আর অন্যদিকে, প্রগল্‌ভ এক কলেজপড়ুয়া অমরেন্দ্র চক্রবর্তী তখন একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন শ্যামবাজার থেকে নাকতলা, তাঁর পছন্দমতো কয়েকটি বাড়িতে, ভাবছেন আধুনিক কবিতা আলোচনার একটা আদর্শ গড়ে তুলবার কথা। প্রায় একক আয়োজনে,

হাতখরচের পয়সা বাঁচিয়ে, পাঁচটি কবিতার আলোচনা নিয়ে নিরাভরণ একটি মাসিকপত্রিকা বার করলেন তিনি ১৯৬৬ সালের মে মাসে। 'কবিতা' আর 'পরিচয়'-এর দুই বিপরীত ঐতিহ্যকেই শিরোধার্য করে সে-পত্রিকার নাম হলো 'কবিতা-পরিচয়'। কবি বিষয়ে নয়, কবিতারই বিষয়ে আলোচনা-প্রত্যালোচনায় দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই বেশ জমে উঠল এই পত্রিকা, উপযাচক হয়ে লিখলেন আইয়ুব বা বুদ্ধদেবের মতো লেখকেরাও, আগস্ট-সংখ্যায় মন্তব্য করে পাঠালেন বিষ্ণু দে : 'আমরা কবিতা-র প্রতি মনোযোগ না দিয়ে যাতে কবির দর্শন-জীবনী-ইত্যাদি বিষয়ে মন দিই, সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় সফলকাম। তাই এরকম চেষ্টা বিশেষ করেই সার্থক।'

'কৃত্তিবাস'-এর দলবল ততদিনে পৌঁছে গেছেন মধ্যতিরিশে, দু-চারজন চাকরি পেতে শুরু করেছেন 'আনন্দবাজার'-এর মতো পত্রিকাসংস্থায়, এমনকি পুরস্কার ঘোষণাও করছেন তরুণতরদের জন্য। তরুণতরদের একটা অংশ, স্বভাবতই, এবার খুঁজে নিতে চাইছেন ভিন্ন একটা পথ। কামার্ত ক্ষুধার্ত বা ভোগার্ত আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত একটা শান্ত স্বরের কবিতাকেন্দ্র খুঁজছিলেন তাঁর 'অলিন্দ' (১৯৬৪) পত্রিকায়, শোনা যাচ্ছিল ভাস্কর চক্রবর্তী বা কালীকৃষ্ণ গুহ-র মতো বিষাদময় নতুন স্বর, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটির-গন্ধ-মাখানো লেখা বা দেবারতি মিত্রের কবিতা। একদিকে তরুণদের একটা নতুন গোষ্ঠী গড়তে চাইছিলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কবিপত্র' পত্রিকায়, আর অন্যদিকে একাল-ওকালকে একত্র বাঁধবার চেষ্টায় প্রবীণ জগদীশ ভট্টাচার্য একার চেষ্টায় ছাপছেন ত্রৈমাসিক 'কবি ও কবিতা' (১৯৬৫), গীতা চট্টোপাধ্যায় শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো একেবারে বিরল স্বর আবিষ্কার করছেন সেখানে, কৃষ্ণনগর থেকে বার্ণিক রায় বার করছেন 'না পয়েজি'। 'কবিপত্র' 'শ্রুতি' 'ঈগল' 'এই দশক' নামের ছোটো ছোটো পত্রিকায় ভিন্ন ধরনের কবিতাগদ্য লিখতে চাইছিলেন অন্য তরুণেরা। 'কবিতা চিৎকার নয়, নিবিষ্ট উচ্চারণ' 'কবিতা হবে ব্যক্তিগত, মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী' 'গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব' 'গল্পে এখন যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে'—নিজেদের ইস্তাহারে এইসব কথা ছেপে নতুন কবিতা লিখছেন তখন পুষ্কর দাশগুপ্ত বা সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শাস্ত্রবিরোধী' নাম দিয়ে গল্প লিখছেন রমানাথ রায় শেখর বসু বা সুব্রত সেনগুপ্তরা।

চিৎকার আর চিৎকারের এই বিরুদ্ধতা, প্রগতিশীলদের বিবেচনায় এই দুই দলই অবশ্য অবক্ষয়ের শিকার, রাজনীতিভীতি এই দুই দলেরই এক সামান্যলক্ষণ। কিন্তু গল্পেকবিতায় প্রগতি-আন্দোলনের ঠিক পুরোনো সেই চেহারাটা নেই আর তখন। ১৯৬৫ সালের গোড়ায়, সদ্য অ্যাকাডেমি-পুরস্কার পাওয়া সুভাষ মুখো

পাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় সমাজের সব স্তরের মানুষের যে ভিড় জমেছিল, তার মধ্যে ছিল একটা প্রগতিশীল উত্তেজনা, সে-পুরস্কার যেন কোনো রাজনৈতিক জয়। কিন্তু এর ঠিক পর থেকেই সুভাষ বিষয়ে আগ্রহ কমে আসতে থাকে দলীয়-চেতনার পাঠকদের, আর ঠিক সেই একই সময়ে সমরেশ বসুও চিহ্নিত হয়ে যান প্রতিক্রিয়াশীলের শিবিরভুক্ত হিসেবে। ১৯৪৮ সালের 'পরিচয়' পত্রিকায় দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা 'আদাব' গল্পটি দিয়ে যে উদ্দীপক আবির্ভাব হয়েছিল সমরেশ বসুর, 'বি. টি. রোডের ধারে' 'উত্তরঙ্গ' লিখে নিজেকে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারাশঙ্করের বামপন্থী উত্তরসূরী হিসেবে, ষাটের দশকের মধ্যভাগে পর পর ছাপা তাঁর 'বিবর' 'পাতক' আর 'প্রজাপতি'। লেখাগুলি চিহ্নিত হলো existentialist ভাবনার প্রকাশ হিসেবে, সমকালীন লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করলেন এদের, বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'র মতো এসব নিয়েও মামলা হলো অশ্লীলতার দায়ে, শক্তিমান লেখকের এই পরিণতিকে পরম এক দুর্লক্ষণ বলে বুঝে নিল প্রগতি-শিবির।

এইসব যখন ঘটছে, কলকাতার রাজনৈতিক চেহারা কতই-না পালটে গেছে তখন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পরাভূত কুড়ি বছরের শাসক কংগ্রেস, তৈরি হয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকার। একেবারে আকস্মিক নয় এই ঘটনা। আপাতশান্তিময় পঞ্চাশের দশকেই ভিতরে ভিতরে জমছিল এর পূর্বাভাস, ১৯৫১ সালে কুচবিহারের ভুখামিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ থেকে শুরু করে ১৯৫৯ সালের খাদ্যআন্দোলন পর্যন্ত এরই আয়োজন চলছিল গোটা দশক জুড়ে। গল্পকবিতার তুলনায় এবার সে-আয়োজনের অনেক বেশি চিহ্ন ধরে রইল নাটক আর চলচ্চিত্র। আগের দশকে যেমন শম্ভু মিত্র আর সত্যজিৎ রায়ের, এ দশকে তেমনি দেখা গেল উৎপল দত্ত আর ঋত্বিক ঘটকের উত্থান! 'অঙ্গার' 'ফেরারি ফৌজ' 'কল্লোল' একটির পর একটি এইসব নাটক লিখে আর অভিনয় করে কলকাতাকে এক রাজনৈতিক বোধে মথিত করে তুললেন উৎপল দত্ত আর তাঁর লিট্‌ল্ থিয়েটার। দেশভাগের সর্বনাশকে নিয়ে 'স্বাধীন' মানুষের মর্মান্তিক জীবনযাপনকে সামনে নিয়ে এলেন ঋত্বিক। চলচ্চিত্রে সুডৌল আধুনিকতার সঞ্চার করেছিলেন সত্যজিৎ, ভিতর থেকে তাকে ভেঙে দিয়ে বিপর্যস্ত আঙ্গিকে আরেক বাস্তবতার আদল আনেন ঋত্বিক তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' 'কোমল গান্ধার' বা 'সুবর্ণরেখা'র মতো ছবি-গুলিতে। 'সুবর্ণরেখা'র প্রায় কোরাসের ধরনে, অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে ছমছমে গলায় আওড়াতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ—'রাত কত হলো? উত্তর মেলে না—', হতচেতন নায়ককে তিনি ফুসলে আনেন সেই কলকাতায়, যেখানে না কি উথলে উঠছে 'বীভৎস মজা'।

যাকে 'দুঃস্বপ্নের নগরী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে দিল্লিতে, সেই 'বীভৎস মজা'র কলকাতাতেই তাহলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল এক যুক্তফ্রন্ট সরকার। কিন্তু তবে কি একেবারে বামপন্থীদের হাতেই চলে গেল এই শহর, এই রাজ্য? সেই সম্ভাবনাকে রোধ করবার জন্য ষড়যন্ত্রের কোনো অন্ত ছিল না, বছরের শেষে সামান্য ছুতোয় ভেঙে দেওয়া হলো সরকার। প্রতিবাদে জ্বলে উঠল গোটা শহর, এবং আরো একবার লেখক-শিল্পীরা এসে দাঁড়ালেন সামনে। প্রতিবাদ-মিছিলে অংশ নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরা জেলে গেলেন আরো একবার। সুভাষের কবিতার একটি লাইন প্রায় স্লোগানের মতো অনেকের মুখে-মুখে ফিরত পঞ্চাশের দশকে: 'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত'। সেই সুভাষ, জেলে যাবার আগে, আরেকটা নতুন স্লোগান এবার তুলে দিলেন সবার মুখে: 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা'।

৫

১৯৭২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ঢাকায় ভাষাশহীদদের স্মৃতিবার্ষিকীতে এবার একসঙ্গে মিলেছেন দুই বাংলার লেখকেরা, সেটা হয়ে উঠেছে যেন কোনো মিলনোৎসব। নতুন একটা স্বাধীন দেশ তৈরি হয়ে গেছে তার দু'মাস আগে।

অথচ বছর জুড়ে কী তাণ্ডবই-না সইতে হয়েছে গোটা দেশের মানুষকে! মার্চের শেষ থেকে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানকে পালিয়ে আসতে হয়েছে এ বাংলার সীমান্তে, সাধ্যমতো এদের আশ্রয় দেবার জন্য এখানকার মানুষের কাছে দেখা দিয়েছে একটা নতুন সংকট।

৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে লেখকশিল্পীদের পুরোনো আশ্রয় তখন নেই, কিন্তু সেই রাস্তারই আরেক প্রান্তে আরেক জীর্ণ বাড়ির দোতলায় বড়ো একখানা ঘর নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি কেন্দ্র। ওদেশ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছেন যেসব কবি সংগীতশিল্পী চলচ্চিত্রশিল্পী, তাঁদের সকলের একটা মিলবার জায়গা হলো এইখানে। এখানে তাঁরা মহড়া দিচ্ছেন গানের, দলবদ্ধ যে গান গেয়ে তাঁরা ঘুরবেন এদেশের নানা অঞ্চলে, মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ আর সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টায়। এঁদের দেখাশোনার ভার বইছেন কলকাতার যে লেখকসমাজ, নিজের স্বাস্থ্য বিপন্ন করে তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলবলকে সেখানে গান শেখান সনজীদা খাতুন ওয়াহেদুল হক; চিত্রপরিচালক জহীর রায়হান আসেন তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ নিয়ে; তাঁদের পাশে সন্ধ্যাবেলায় সমবেত হন কলকাতার লেখককবিরা, বাংলাদেশ বিষয়ে তাঁদের আবেগে ভরে উঠতে থাকে এখানকার সাময়িক পত্রগুলি। এরই মধ্যে কোনোদিন হয়তো অন্ধকার সিঁড়িপথ দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অনুজ কোনো কবিকে পাশে

থেকে শোনাতে থাকেন তাঁর সদ্যরচিত (কিন্তু তখনো-পর্যন্ত-অসম্পূর্ণ) দীর্ঘ কবিতা 'ফেরাই', প্রশ্ন করেন 'হচ্ছে ঠিক?' বাংলাদেশের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের কাছে দাঁড়িয়ে বলা সেই কবিতা অবশ্য তরে থাকে একেবারে ভিন্ন সব ছবিতে, সে-ছবি শুধু নকশালপন্থী আন্দোলন থেকে জেগে-ওঠা কিছু দীর্ঘশ্বাসের।

পশ্চিমবাংলার লেখকদের সামনে এই প্রশ্নটাই তখন তুলতে চাইছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুবদিকের সামরিক অত্যাচার নিয়ে ক্ষুব্ধ আর ব্যাকুল এপার বাংলার লেখকেরা কি এই নিজের দেশে চোখ মেলে তাকান? এই ছিল তাঁর জিজ্ঞাসা। ১৯৬৭ সালের পর থেকে নকশালপন্থা নামে যে অভিযান বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল এখানে, তাকে দমন করবার জন্য এ-সরকারের বর্বরতাও কি কম ছিল কিছু? তবে কেন সে-বিষয়ে নীরব থেকে লেখকেরা কেবল পুবদিকেরই দুঃখ গাইছেন?

পুবদিকের কথাই যে বলছিলেন সবাই, তা অবশ্য নয়। নিজের নিজের ধরনে সমসময়ের আপনদেশ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল অনেকেরই রচনায়। সুকান্তর মৃত্যুর পর সেই কবে 'কবিতা' পত্রিকায় লিখেছিলেন বুদ্ধদেব: 'যে-চিলকে সে ব্যঙ্গ করেছিল, সে জানতো না সে নিজেই সেই চিল; লোভী নয়, দস্যু নয়, গর্বিত নিঃসঙ্গ আকাশচারী, স্খলিত হ'য়ে পড়লো ফুটপাতের ভিড়ে, আর উড়তে পারলো না, উঠতেই পারলো না।' বহুদিন পর, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে, যেন এ কথারই এক অতিদূর কাব্যরূপান্তর মিলল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কলঘরে চিলের কান্না' কবিতায় (১৯৭১)। এ কবিতায় কবি লেখেন:

> গগনবিহারী চিল! যারা ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, আর
> পারে না বলেই যারা
> পৃথিবীর
> ভাগাড়ে ও আঁস্তাকুড়ে কাপুরুষ মাস্তানের মতো
> দঙ্গল পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের
> হাতে কি কখনো আমি ঊর্ধ্বচারী মানুষের
> লাঞ্ছনা দেখিনি?

আজ তিনি দেখছেন মেঝের ওপর স্থির ও নিঃশব্দ পড়ে আছে চিল, স্বভাবত যে সঙ্গীহীন সম্রাটের মতো তেজস্বী ছিল, আজ যাকে ঘিরে কাকের মেলা বসে গেছে! একদা-সম্রাট সম্প্রতি-অসহায় এই চিলের মধ্যে সমকালীন রাজনীতিরই একটা ছায়াপাত ঘটে যায়। রাজনৈতিক কবি হিসেবে পরিচিত নন নীরেন্দ্রনাথ, কিন্তু 'উলঙ্গ রাজা'র অনেক কবিতাই ভিতরদিক থেকে হয়ে ওঠে রাজনৈতিক। কেবল, এর দৃষ্টিকোণটা হলো ভিন্ন।

'উলঙ্গ রাজা'র সঙ্গে একই বছরে (১৯৭১) ছাপা হয়েছিল বীরেন্দ্র চট্টো-

পাধ্যায়ের 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চীৎকার করে'। আশ্চর্য নয় যে প্রায় কবির লড়াইয়ের ধরনে তখন তিনি লিখছেন :

> নীরেন ! তোমার ন্যাংটো রাজা
> পোশাক ছেড়ে পোশাক পরেছে !
> না কি তোমার রাজাই বদলেছে ?

বীরেন্দ্র তাঁর কবিতাবইয়ের নামের মধ্য দিয়েই ছুঁতে থাকেন সেই 'সময়ের রক্তপাত : 'মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়' 'আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা' 'অনুক সহস্র চিতা অহোরাত্র এপাড়ায় ওপাড়ায়' 'বাহবা সময় তোর সার্কাসের খেলা'। একটি সাক্ষাৎকারে কবি জানিয়েছেন পরে : 'কোন্‌টা কবিতা হলো আর কোন্‌টা হলো না—এটা ভেবে দেখার সময় তখন ছিল না', কেননা 'কাব্যগুণহীন জার্নালিজম' দিয়েই তিনি পুলিশি তাণ্ডবের প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত, এইভাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গড়ে তুলছিলেন নতুন এক **antipoetry**-র কাব্য-ভাষা, আর সেই পথে এগিয়ে আসছিলেন অনেক তরুণ।

কবিতায় যেমন বীরেন্দ্র, গল্পেউপন্যাসে তেমনি এই সময়ে সবার চোখের সামনে এসে দাঁড়ান মহাশ্বেতা দেবী। নিজের পুরোনো লেখার ছক ভেঙে 'দ্রৌপদী' বা 'স্তনদায়িনী'র মতো গল্প লিখে, 'হাজার চুরাশির মা' 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' 'অরণ্যের অধিকার'-এর মতো উপন্যাস লিখে সরাসরি তিনি কাজ শুরু করেন আদিবাসীদের মধ্যে, মধ্যবিত্ত সমাজের ভণ্ডতাকে আঘাত করতে থাকেন তাঁর প্রতিটি কাজে আর উচ্চারণে।

নকশালপন্থার দৃষ্টি নিয়ে শহরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে ছাপা হতে থাকে অনেক ছোটো পত্রিকা, পুরোনো 'অনুষ্টুপ'-এর পাশাপাশি দেখা দেয় নতুন 'প্রস্তুতিপর্ব' 'নক্ষত্রের রোদ' 'স্পন্দন', কখনো কখনো পত্রিকার স্টল থেকে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তা। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে খুন হন কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ, কারাবরণ করেন সমীর রায় বা সব্যসাচী দেব, স্বপ্নভরা 'রাজহংস' সিরিজের কবিতা ছেড়ে দিয়ে মণিভূষণ ভট্টাচার্য লিখতে থাকেন 'গান্ধীনগরে রাত্রি'র বিস্ফোরময় উচ্চকণ্ঠ কবিতাগুলি, কবিতাতেই তিনি জানান যে কবিতা পড়ার বদলে 'এখন শুধু গদ্য পড়ি ফ্রন্টিয়ারে/সময় সেনের'।

সময় সেনের 'ফ্রন্টিয়ার'। উনিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে চমকপ্রদ কিছু গদ্যকবিতা লিখে সাহিত্যজগৎ থেকে হঠাৎ সরে গিয়েছিলেন যিনি, অনেক দিন পরে তিনি ফিরে এসেছেন বিবেকবান্ এক সাংবাদিক হিসেবে। প্রথমে হুমায়ুন কবির প্রবর্তিত সাপ্তাহিক 'Now' পত্রিকা, পরে তার থেকে উৎখাত হয়ে মট্ লেনের ছোট্ট এক ঘরে আত্মীয়বন্ধুদের চাঁদায় 'Frontier'-এর সম্পাদনা শুরু আর দীর্ঘকাল তাকে বয়ে যাওয়া : জীবনের শেষ দুই দশক জুড়ে এই ছিল তাঁর কাজ।

প্রথম যুক্তফ্রন্টের সমকাল থেকে শেষদিন পর্যন্ত দক্ষিণবাম সমস্তরকম অনাচারের নির্ভীক সমালোচনা করে একটা শ্রদ্ধেয় স্বাতন্ত্র্য পেয়েছিলেন এই একলা মানুষ।

'সত্তরের দশক মুক্তির দশক' : দেয়ালে দেয়ালে তখন জলজল করছে তীব্র এই সাময়িক বিশ্বাস। পারস্পরিক হানাহানিতে ভরে যাচ্ছে শহরগ্রাম, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি থেকে ছেলেরা ফেরার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনজঙ্গলে গাঁয়ে-গঞ্জে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখছেন 'ছেলে গেছে বনে'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাহকাজ শেষ হবার পর কালীঘাটের মোড়ে এক চায়ের দোকানের আড্ডায় মৃণাল সেন উত্তেজিত হাত নেড়ে বোঝাচ্ছেন তাঁর আসন্ন 'ইন্টারভিউ' ছবিটির নতুন ধরনের বিষয় আর আঙ্গিক। তাঁরও ছবির জগতে একটা বদল আসছে একেবারে সমকালের চিহ্ন বুকে নিয়ে, 'কলকাতা ৭১' 'পদাতিক' বা 'কোরাস'এর মতো তাঁর রাজনৈতিক ছবিগুলিতে।

বদল ঘটেছে বাদল সরকারেরও। আগের দশকে যিনি লিখেছিলেন বিতৃষ্ণা-অবসাদ-মেশানো 'এবং ইন্দ্রজিৎ' 'বাকি ইতিহাস' বা 'ত্রিংশ শতাব্দী'র মতো নাটক, এবার তিনি লিখছেন 'ভোমা' 'মিছিল' 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' বা 'প্রস্তাব', যেখানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শোষণের রাজনীতিকে সরাসরি বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এখন তিনি আর শম্ভু মিত্রের 'বহুরূপী' সম্প্রদায়ের জন্য একজন নাট্যকার মাত্র নন, এখন তিনি নিজেরই নাট্যদল 'শতাব্দী'কে নিয়ে থিয়েটারেরও এক নতুন পরীক্ষায় ব্রতী। মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডি ভেঙে বেরোবার চেষ্টায় মঞ্চআলো-সাজসজ্জাহীন যে-কোনো খোলা জায়গায় এখন তিনি অভিনয় করেন পথচলতি লোকের সামনে, শহরে বা গাঁয়ে, প্রসিনিয়ম মঞ্চের বিরুদ্ধে তাঁর এই আন্দোলনের নাম দিয়ে দেন 'থার্ড থিয়েটার'। খোলা জায়গায় অভিনয়ের ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় এই দশকেরই এক রীতি, সে-রীতিতে রাজনৈতিক নাটকের অভিনয় করতে গিয়ে কার্জন পার্কে পুলিশের হামলায় প্রাণ দেন প্রবীর দত্ত।

আর অন্যদিকে, খোলা ময়দানে শনিবারে শনিবারে শুরু হয়েছিল রাজনীতিহীন (না কি সেও এক রাজনীতি?) একটা 'মুক্তমেলা'র আয়োজন, জ্যোতির্ময় দত্তের উৎসাহে। অফিসফেরৎ মানুষেরা দাঁড়িয়ে পড়েন ময়দানে, দেখেন ছবিআঁকা, শোনেন কবিতাপড়া, বা গল্পপড়া, নিজেরাও অংশ নেন তাতে। 'পুলিশ/ কবি দেখলে মাথার থেকে টুপিটা তোর খুলিস' এইরকম চটজলদি ছড়া বানিয়ে পুলিশের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন 'ব্যাণ্ডমাস্টার'-খ্যাত তুষার রায়। কিন্তু এই তুষার, অথবা এঁর মতো আরো অনেক তরুণ তিলে তিলে নিজেদের ধ্বংস আয়োজন করেন সবাই, মেতে ওঠেন এক আত্মক্ষয়ী নেশায়। শহরের অলিগলিতে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন মদের দোকান আর গোপন নেশার আখড়া, পথে পথে বেড়ে উঠছে শনিঠাকুরের পুজো। চারপাশে ছড়ানো একটা অস্থিরতা আর চাপা

উত্তেজনা। আর এর মধ্যে, ১৯৭৫ সালে, ভারত সরকার ঘোষণা করে বসলেন জরুরি অবস্থা, কেড়ে নেওয়া হলো আমাদের কথা বলবার স্বাধীনতা।

গোটা ভারত জুড়েই প্রশ্ন উঠল, লেখকেরা তাহলে কী করবেন এবার। সেন্সরের ভয় ঢুকে গেল কারো কারো মজ্জায়, কিন্তু সাহসিক প্রতিবাদ নিয়েও এগিয়ে এলেন অনেকে। জ্যোতির্ময় দত্ত বেশ কয়েকবছর ধরে সম্পাদনা করছিলেন মাসিকপত্র 'কলকাতা' (শেষ পর্যন্ত 'মাসিক' অবশ্য থাকেনি সেটা), সেই 'কলকাতা'র এক রাজনৈতিক সংখ্যা ছাপা হলো সরকারি জুলুমের বিরুদ্ধে। পুলিশ তাড়া করে ফিরল জ্যোতির্ময়কে, ফেরার হলেন তিনি, গৌরকিশোর ঘোষ গেলেন জেলে। সেদিনও প্রতিবাদের লেখা লিখতে ভুলে যায়নি কলকাতা, 'not to be printed'-এর তর্জন উপেক্ষা করে কেউ কেউ তা ছাপছিলেনও পত্রিকায়। ১৯৭৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে প্রতিবাদ হিসেবে কেউ কেউ যান না রাজভবনে, আর অলোকরঞ্জনের মতো কেউ-বা সেখানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন সরাসরি : শিল্পের ওপর কেন থাকবে এই অপমানজনক সেন্সর।

থাকেনি অবশ্য বেশিদিন আর। প্রত্যাহার করা হলো জরুরি অবস্থা। আর, তার অল্পদিন পরেই, পশ্চিমবাংলায় শুরু হলো বামফ্রন্টের সরকার, স্বাধীনতার তিরিশ বছর পর আবার একটা নতুন পর্যায় শুরু হলো যেন। লেখার পুরোনো আশ্রয়গুলি ক্ষয়ে এসেছে অনেকটা, কিন্তু গড়ে উঠছে টুকরো টুকরো লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের অনেক গোষ্ঠী। 'দেশ'-এর মতো সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার বেড়েছে কেবলই, পঞ্চাশ থেকে তার তিনগুণ মুদ্রণ বেড়েছে ষাটের দশকে, আর এই সত্তরে প্রায় সাতগুণ। এই প্রসারের সঙ্গেসঙ্গে সাহিত্যকে নানারকম সামাজিক আর আর্থিক প্রতাপ দিতে শুরু করেছে এইসব পত্রিকা আর প্রতিষ্ঠান, পুরস্কারে পুরস্কারে ভরে উঠছে চারদিক। তারাশঙ্কর, বিষ্ণু দে বা আশাপূর্ণা দেবীর মতো গুণীজনেরা 'জ্ঞানপীঠ'-এর মতো সর্বভারতীয় পুরস্কারে ভূষিত হলে অবশ্য খুশিই হন সবাই, কিন্তু অতিপুরস্কারের ফাঁদ আবহাওয়ার মধ্যে এনে দেয় একটা ক্লিন্নতা। সাহিত্যকে পণ্যমাত্র করে তুলবার আয়োজনে উদ্যত হয়ে ওঠে পরিবেশ, প্রকাশন থেকে শঙ্করের অনেক বই একসঙ্গে বিক্রি হয় 'এক ব্যাগ শঙ্কর' নামে, সত্যিই এক ঝুলিতে। শহরের কোণে কোণে এইসবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে সচেতন মানুষের মনে, ছোটো ছোটো দলে, ছোটো ছোটো পত্রিকায়।

ঠিক, এসব পত্রিকার অধিকাংশই দু-চার সংখ্যা বেরোবার পর বন্ধ হয়ে যায়, বছরে বছরে 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র মতো লক্ষণীয় সংকলন বার করতে গিয়েও প্রতিহত হন মণীন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু এসব চর্চাকে পাশ কাটিয়ে কিছুটা স্থায়ী আয়োজনেও বেরোতে থাকে শিবনারায়ণ রায়ের 'জিজ্ঞাসা', সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত-র 'বিভাব',

সুরজিৎ ঘোষের 'প্রমা', অশোক সেনের 'বারোমাস', এর দুই দশক আগে যেমন শুরু হয়েছিল সুনীলকুমার নন্দীর 'অনুক্ত'। সেই 'অনুক্ত' 'এক্ষণ' আর 'অনুষ্টুপ'-এর পাশাপাশি এভাবে গড়ে ওঠে আরো কয়েকটি সাহিত্যাশ্রয়। আর আছে 'পরিচয়', পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়ে আসছে তার অস্তিত্বের, দীর্ঘকাল এর ভার বয়ে অবসন্ন দীপেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো দশকের শেষ প্রান্তে, দায় তুলে নিলেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু দেবেশ রায়। চেতনার মধ্যে গোটা উত্তরবাংলাকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় তিনি স্থায়ীভাবে পৌঁছে গেছেন ততদিনে, পাঠকেরা এবার একটু বেশি করে পড়তে শুরু করেছে তাঁর লেখা, কেতকী কুশারী ডাইসন প্রশ্ন করছেন বিমল কর-কে : 'দেবেশের মতন লেখার স্টাইল ক'জনের আছে বলুন ?'

আত্মসচেতন স্টাইলের অতিবিশিষ্টতা কখনো-কখনো একটা সমস্যাও তৈরি করে অবশ্য, পাঠক আর লেখকের মধ্যে তৈরি করে একটা ব্যবধান। এই ব্যবধানের ফলে অমিয়ভূষণ মজুমদার বা অসীম রায়ের মতো ঔপন্যাসিকেরা নিজেদের অনেকটা উপেক্ষিত বলে ভাবতে থাকেন। উলটোদিকে, স্বচ্ছন্দ লেখার স্রোতে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা পৌঁছয় প্রায় কিংবদন্তিতে। এ কিংবদন্তির অন্যতম একটা অবলম্বন হয়ে ওঠে বাণিজ্যপত্র। সাহিত্যজগতে এই এক নতুন লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে, তার নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই সরে যায় যেন দৈনিক পত্রিকার হাতে। এক-একটি বড়ো পত্রিকার আশ্রয়ে চিহ্নিত হয়ে যায় এক-একটি লেখকদল, একদিকে যদি থাকেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রমাপদ চৌধুরী বা শংকর, অন্যদিকে তবে দেখা দেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফুল্ল রায় বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েরা। স্বভাবতই, এই দুই দিককেই অগ্রাহ্য করবার চেষ্টায় এগোতো থাকে টুকরো-টুকরো নানা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আয়োজন, ছোটো ছোটো পত্রিকার পরীক্ষাধর্মী অজস্র গদ্যে অথবা কবিতায়।

ছোটো আর বড়ো, প্রতিষ্ঠানলগ্ন আর প্রতিষ্ঠানবিরোধী, বাম আর দক্ষিণ—সাহিত্যের এইসব দলেরই মুখোমুখি হবার সুযোগ হয়ে যায় একটা বাৎসরিক উৎসবে, কলকাতার নতুন এক উৎসব 'বইমেলা'য়। 'ক্যালকাটা বুক ফেয়ার' নাম দিয়ে ১৯৭৬ সালের ৫ মার্চ বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের উলটো দিকের মাঠে শুরু হয়েছিল দশদিনের এই মেলা। তারপর বছরে বছরে অনুষ্ঠান হতে থাকে তার, কলেজ স্ট্রিট এসে উপচে পড়ে তার বইয়ের ভাণ্ডার নিয়ে। পাশাপাশি কয়েক'শ স্টল, ক্রেতা আর বিক্রেতার মেলামিলনের মাঝখানে লেখকপাঠকেরও মুখোমুখি হবার অবাধ সুযোগ। ভ্রাম্যমাণ প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাছাকাছি এগিয়ে যান ভক্ত পাঠকেরা, পাঠকদের দিকে ছোটো ছোটো পত্রিকা হাতে এগিয়ে আসেন উপেক্ষিত তরুণেরা কেউ কেউ। এলাহাবাদ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় এসে

গেছেন বর্ষীয়ান কবি অরুণ মিত্র, তরুণতমদের সঙ্গে এইখানে মিলে যান তিনি অনায়াসে। বড়ো প্রকাশকদের বড়ো স্টলের কাছাকাছি ছোটো ছোটো বৃত্তে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের পসরাকে তর্কে-বাগ্মিতায়-ঘোষণায় ভরে রাখেন স্ববিমল মিশ্রের মতো বিদ্রোহীরা, কিছুটা আড়ালে থেকে আপন মনে কবিতা লিখতে থাকেন সুব্রত রুদ্রের মতো কেউ কেউ, ছোটো পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে থাকে এক-ফর্মা দু-ফর্মার কবিতার বই, 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম যুগে 'এক পয়সার একটি' সিরিজের এক ফর্মার বইগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। 'মিনিবুক' প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কয়েকবছর আগে, বইমেলায় তিনি ঘুরে বেড়ান সেই 'মিনিবুক'-এর ট্রে গলায় ঝুলিয়ে, কাঁধ-ঝোলায় তাঁর এবং তাঁর অনুজদের ছোটো ছোটো বই নিয়ে ঘুরে বেড়ান বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের উৎসাহে তরুণ কবিরা এগিয়ে আসেন ওইরকমই ছোটো ছোটো বইয়ের প্রকাশে, ১৯৭৮ থেকে টেমার লেনে সন্দীপ দত্ত তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় গড়ে তুলতে থাকেন লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের এক লাইব্রেরি : কলকাতার অনড় প্রকাশনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই এক অভিযান আর অভিযান নিয়ে এগিয়ে আসেন লেখকদের দল, সাহিত্যজগতে দেখা দিতে থাকে বিকেন্দ্রীকরণের সমস্তরকম আভাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো 'আর এক আরম্ভের জন্য' প্রতীক্ষায় থাকেন সবাই, মনে মনে ভাবেন :

> আমি আর-একবার সেই আশ্চর্য স্বপ্ন
> যা আমার হারিয়ে-যাওয়া কবিতা
> যা আমার এবং যে-কোনো মানুষের একটাই বেঁচে থাকার পৃথিবী,
> তাকে খুঁজে বের করব।
> সেজন্য আমাকে যত মূল্যই দিতে হোক।

এই স্বপ্নই কলকাতার গর্ব, এই স্বপ্নই কলকাতার প্রতিশ্রুতি।

...

BENGALI—PHASE II

Is there, or can there be, a concept of modern Indian drama as distinct from the western type? Can it be modern and specifically 'Indian' at the same time? Sombhu Mitra (Śambhu Mitra, b. 1915), one of our foremost actor-playwrights, answers the question in the affirmative. He takes his cue obviously from Tagore (Rabīndranāth Thākur, 1861-1941) when he thinks that he would like to develop a contemplative kind of drama where 'we come closer to the character and move into his subjective world'.[1] Utpal Dutt (Utpal Datta, b. 1929), on the other hand, opposes the idea with some vigour. Asked to comment on the possibility of such Indianness, he simply declares : 'It doesn't exist.'[2] In his missionary zeal of taking theatre to the people, he propagates a different type altogether : a revolutionary theatre, where instead of too much of contemplation or internalization he would like to have raw action with a definite political attitude.

Social awareness being the dominant feature of the Bengali drama of this century, our playwrights have been vacillating between two extremes in search of a theatre which will belong to the soil. Exploration of myths, exposition of indigenous forms and presenting inner and outer life simultaneously in one action have been the goal of some ; while others, in an attempt to ban the word 'art' from their programme, have

বাংলা নাটকের রেখারূপ-সংক্রান্ত এই নিবন্ধটি শঙ্খ ঘোষ ইংরেজিতে লিখেছিলেন একটি কোষগ্রন্থের জন্য (Comparative Indian Literature, Volume I, 1984, Kerala Sahitya Akademi & Macmillan India Limited, Madras)। কোষগ্রন্থের লেখা হিসেবেই তাই একে পড়তে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চিত্তপ্রিয় শঙ্খ ঘোষের ছদ্ম নাম।

—সম্পাদক

tried to intervene in contemporary events, to educate the indifferent masses and to change society in favour of socialist democracy. This, in a nutshell, is the history of the hundred years of Bengali drama since 1881, when Tagore staged the first of his musical plays at his ancestral house in Jorasanko (in Calcutta).

TAGORE

The Musical Emotion. 'From drama to music should be an easy step for one who writes on Tagore', observed a noted Tagorite.[3] But, perhaps, the reverse is also true. Tagore's first major attempt at anything dramatic has been associated with his experiment in music, which was distinct from the Hindustani abstract modes with his bias for the human, for the individual and the specific.[4] When, after more than a year's sojourn in England, he was contemplating writing a play, 'a cascade of musical emotion was gushing forth day after day, hour after hour :...we wrote, we sang, we acted, we poured ourselves out on every side.'[5] This was the moment of Tagore's *Vālmīki-Pratibhā* (The Genius of Valmiki, 1881), composed in the prime of his life.

The form was not exactly an innovation in the context of Bengali drama which was only two decades old at that time. Even a few relatives of Tagore had tried their hands at some sort of operatic plays. But where he easily surpassed them all was in the immaculate projection of various kinds of moods with an articulated musical idiom. Perhaps his European experience of operas at the age of 17 was, to an extent, responsible for the integrity of his work. Herbert Spencer's essay on 'The Origin and Function of Music' was another inspiration. According to Tagore's own confession, Spencer's idea that through the development of emotional modulations of voice man first found music, appealed to him. 'Why should it not do, I thought to myself, to act a drama in a kind of recitative based on this idea ?'[6] *Vālmīki-Pratibhā* sprang out of this deliberation.

Tagore himself acted memorably in the pivotal role of Valmiki and the play was hailed as a big promise from a youth of twenty but it was not long before Tagore rejected the form and changed over to the popularly accepted mode of verse-drama. Was he not conscious that his preoccupation with music might sometimes be a drag on dramatic actions ? At least he himself differentiated *Vālmīki-Pratibhā* from *Māyār Khelā* (The Game of Maya, 1888) with the observation that the former was 'a garland of drama with a thread of songs' while the latter 'a garland of songs with just a thread of dramatic plot',[7] a definite retrograde move.

Drama of Action. So, in the beginning, Tagore took a plunge into the drama of action and produced two regular five-act plays with plots and subplots evolving out of the familiar motives of jealousy, revenge, love and hate, with kings and queens, fights and deaths in abundance. But through these well-worn devices he had been able to create a world of his own and at least one of these plays proved to be an all-time success on the Bengali stage. This was *Visarjan* (Sacrifice, 1890).

Apparently the theme of the play is the conflict between religious superstitions and the true religion of man. But this is only a secondary proposition. Raghupati, the royal priest, infuriated by the king's proclamation that animal sacrifice would henceforth be forbidden in the temple, begins to conspire against him, not so much because his deep-rooted faith in the goddess or in the age-old customs has been hurt, but because his priestly authority has been challenged. This is a problem of the ego which, incidentally, is a recurrent theme in most of Tagore's works. An intense conflict between the self and soul, between loyalty and love, has been powerfully depicted in Jaisinha, the adopted son of Raghupati. He is firm in his religious belief, so much so that he can innocently declare : 'Why ask the aid of soldiers ? We have the strength within

ourselves for the task given to us from above'[8], reminding us of Eliot's Becket, when he cries :

Unbar the door ! Unbar the door !
We are not here to triumph by fighting, by
strategem, or by resistance.
......We have only to conquer
Now, by suffering.[9]

Raghupati, in contrast, leans heavily on 'stratagem' rather than on suffering. In fact, he acts on apprehensions that Jaisinha is being torn away from him by the king, by a woman or even by the goddess herself. The king, on the other hand, is ready to renounce all—his knights, his kin, his throne and even his love—for the sake of Truth. Raghupati comes to sense only when, oscillating violently between the two extremes of 'to be or not to be', Jaisinha kills himself.

It should be noted here that Tagore's plays in translation are much different – both in form and content—from the originals. Tagore has dedicated his English translation of *Visarjan* 'to those heroes who bravely stood for peace when human sacrifice was claimed for the goddess of War'.[10] In most of his plays we shall come across these heroes ready to be martyrs in a variety of situations, the claimant not always the goddess of war, there being other goddesses as well. Raghu's daughter in *Prakrtir Pratiśodh* (Nature's Revenge, 1884), Kumar and Sumitra in *Rājā O Rānī* (The King and the Queen, 1889), Supriya in *Mālinī* (1896)—all had to sacrifice their lives, and these sacrifices have always been the highest points of sublimation in Tagore's plays.

From Convention to Experiment. In *Rājā O Rāṇī* or *Visarjan*, Tagore came very close to the Shakespearian structure. Judging by the standard of Bengali drama prevalent in the nineties of the last century, he had already gained a firm grip on the conventional form. Despite – or maybe because of this, Tagore stopped writing drama for more than a decade after

Citrāngadā (1892) and *Mālini* (1896). In these two plays he gradually advanced from verse-drama to dramatic verse, the lyrical being particularly intensified in *Citrāngadā*, and then came the sudden lull. The curtain rose again in 1908 with the production of *Śāradotsav* (Autumn Celebration) at Santiniketan opening up new vistas in Tagore's dramatic career,

In a drama where we are no longer rocked by violent or exceptional emotions, 'where life is seen and heard in twilight and in the meditation', Tagore seemingly found his proper idiom. When in an article[11] in 1903 he denounced our proscenium stage and drew our attention to the indigenous *Yātrā* where actors were not placed separated from spectators, he was in fact preparing himself for his future ventures of freeing Bengali drama from a 'vulgar type of realism', as he called it. From *Śāradotsav* onward, Tagore tried to dispense with rigid plots or mechanical divisions of a play in regular acts and scenes, so that it could have fluidity of movement and flexibility of form, and moved into the symbolic sphere of imagination. The dialogues were no longer set in verse. Subtle prose, a free and deliberate use of songs and symbols, images heaped upon images, spinning and weaving of new dramatic patterns—were the common features of this group of plays, the content of which tended to become more metaphysical than psychological. And herein, Tagore thought (as an Artaud could have thought)[12], lay the essence of Indian drama.

The Tune Itself. The theme of these plays is a search for an identity, aesthetic and social. In a constant struggle between being and becoming, Tagore's protagonists always endeavour to achieve 'the harmony that exists between the individual and the universal'.[23] In order to realize this wholeness of existence, thinks Tagore, one must be in close communion with nature, with his soul and with society at large. Accord-

ingly, the plays of this period can be divided roughly into three groups.

In *Śāradotsav* or *Phālgunī* (The Springness, 1916), there is a celebration of the seasons along with an interpretation of the joy of living. Nature here is not merely a backdrop, it is the vital part of these plays. The plots are thin. In the former play, a young boy works hard during the autumn holidays to repay the debts of his deceased master while his friends frolic around. In the latter, a group of young men on their way to celebrate the spring festival, seek the abode of Death or old age itself, in their bid to overcome it. As for the form of these plays, Tagore has this to say in his prelude (a dialogue between the King and the Court-poet) to *Phālgunī* :

> Have you got anything ready to hand ? Any
> play toward ? Any poem ? Any masque ? Any—
> Yes, King. I have got the very thing. But
> whether it is a drama, or a poem, or a
> play, or a masque, I cannot say.
> Shall I be able to understand the sense
> of what you have written ?
> No, King, what a poet writes is not meant
> to have any sense.
> What then ?
> To have the tune itself.
> What do you mean ? Is there no philosophy in it ?
> No, none at all, thank goodness.
> What does it say, then ?
> King, it says 'I exist.'[14]

A Vision of Life. The second group consists of two of Tagore's best-known plays, *Rājā* (The King, 1910) and *Dākghar* (The Post Office, 1912), where this 'I exist' has been given an elaboration.

The story of *Rājā*, with the universal theme of *la belle et*

la bête, has its roots in a narrative in the *Kuśa-Jātaka*. In the original story there is an ugly king with his beautiful queen. In Rabindranath's play the king is dark and terrible, and remains unseen throughout the action. He meets his queen Sudarsana only in a dark chamber, lest it be too much for her to endure his fiery appearance. Sudarsana imagines him to be beautiful. But her conception of beauty being nothing more than prettiness, she is easily enticed by the outward glamour of an impostor, Suvarna, who proclaims himself to be the real king. The King of Kanci, the most sceptical of all the people around who doubt the very existence of a king in the state, sets fire to the palace in a bid to kidnap the queen. It is then that the king comes to her rescue, and this becomes a crucial moment in Sudarsana's consciousness. She comes to know to her utter dismay that her king whom she imagined to be beautiful, is actually 'like the awful night when a comet swings fearfully into our ken – black as the threatening storm-cloud, black as the shoreless sea'.[15] Broken and exasperated, she moves away from the king and leaves for her father's home, closely followed by all the seven kings in chase who want to possess the unattached woman. Once again the king appears to subdue these rebels. The experience finally transforms Sudarsana, and Kanci as well. In humility they now surrender to the invisible king who has opened the doors of his dark chamber at last, and Sudarsana comes to realize that life is 'not handsome', but 'incomparable'.

Dākghar, on the other hand, is built on a simple story of an imaginative boy ailing and waiting for death. This boy, Amal, observes life keenly and identifies himself with everything and everyone he looks upon from his window. When a new post office, the King's Post Offiee as he is told, is set up, right in front of his home, he is made to believe that there will be a letter for him also :

Amal. Post Office ? Whose ?

Watchman. Whose ? Why, the King's surely.
Amal. Do letters come from the King to his office here ?
Watchman. Of course. One fine day there may be a letter for you in there.
Amal. A letter for me ? But I am only a little boy.
Watchman. The King sends tiny notes to little boys.[16]

Evidently, the watchman here is only cajoling a little boy. But this is more than enough to stir Amal's imagination. From now on, in his obsession with the king, he anxiously waits for him and feels that the king's postmen are coming down the ages in an eternal journey of time—Life and Beauty being that journey. Surrounded by the matter-of-fact people like the village headman, and with a firm belief in life and love, he dies peacefully.

It is idle to speculate whether this king stands for God or Death or both. The serenity of the action with its lyrical structure does not seem to invite the question, as it does for an embarrassed critic,[17] as to why a boy of Amal's age has to die, in the world of a benevolent God. Here, as Yeats said in the preface to the translation of this play, 'the meaning is less intellectual, more emotional and simple'.[18] Its basis is on a realistic level, resting on which we can only say with the aged Fakir of this play (Amal's friend, philosopher and guide) : 'My eyes are not young ; but you make me see all the same.'[19] *Dākghar* is a drama of this vision ; it means a lot only if it can make us see.

The Adding Machine. In the third group of plays, Tagore confronts the problems of organization and regimentation impinging on personality. In plays like *Acalāyatan* (The Immovable, 1912) and *Tāser Des* (The Land of Playing Cards, 193), the emphasis is on sarcasm with which he attacks the absurd orthodoxy or the tyranny of custom. But in *Muktadhārā* (Free Current, 1922), *Raktakaravī* (*Red Oleanders*, 1926) or

Kāler Yātrā (Time on the Move, 1932), the plays written between the two warld wars, the author deals with the problems of the state versus the individual, capital versus labour or/and the machine versus the man. The organized passion of greed in modern civilization, observes Tagore, 'assumes a terrific bigness, its physiognomy blurred through its cover of an intricate network,—the scienttfic system'.[30] In these plays a necessary revolt against this system has been indicated by the uprising of the common citizens or the labourers or the untouchables, all coming from the lower strata of life. In *Muktadhārā* Tagore reveals the impending danger of nationalism that sacrifices humanity to machine, while in *Kāler Yātrā*, there is a positive indication of the leadership of our society passing over to the proletariat.

In *Raktakaravī*, the most complicated and perhaps the most mature of the three plays, we find that people of all classes -- the oppressor and the oppressed alike—have lost their identity in a highly mechanized society. For the first time in a Tagore drama quite a few of the characters are identified by their occupational names or by mere numbers, and not by their names proper—Nandini and Ranjan being two notable exceptions. Nandini, a simple and lively village girl has been brought, we realize, to a big township Yakshapuri, inhabited by gold digging labourers, governor, officers, priests, professors and, of course, the king, who is very difierent from the earlier kings of Tagore. This king, the owner of all the accumulated wealth of Yakshapuri and alienated from his surroundings by an 'intricate network', pours his weary heart out to Nandini, who in her turn loves Ranjan about whom we hear but do not see. The internal suffering begins. There is a parallel action of protests and revolts among the labourers under tyranny, their leaders having been jailed (Bisu) or killed (Ranjan). When the king comes to know that he himself has caused the death of Ranjan without knowing or intending it, he realizes that even he has become a puppet in the hands of his officers who

run the system. He, in fact, is being controlled by a machine which he wrongly thought was under his control. The king now comes out of his closed doors, and along with his workers, takes up arms against the system, reminding one of the comparable metamorphosis of the Welsh social reformer Robert Owen.

No More of Catchwords. Very often than not, these plays of Tagore have induced critics to think of western playwrights like Maeterlinck, Hauptmann or Strindberg. Not that such a study in comparison will always prove to be a sterile exercise; particularly, the plays mentioned in the preceding section may draw our attention to the expressionist movement of German drama during the twenties where the degradation of man in an industrial civilization was sought to be traced. But it might be foolish sometimes and misleading always to label these plays (except, of course, a few like *Tāser Des Phālgunī*) as purely symbolic or allegorical or as an oriental counterpart of the western practice. Even if we may not concur with Tagore's emphatic declaration that Sudarasana (of *Rājā*) was as concrete to him as Lady Macbeth,[21] we should not fail to notice in her the pangs of human being with all her superficial ambitions and natural inclination to physical beauty. Amal is not a disembodied idea, or merely a new version of Hauptmann's Hannele, he only represents the *man* 'whose soul has the call of the open road'.[22] Nandini is a *woman*, innocent and eager to experience life. Her innocence or her very existence is a mystery to those who have been dehumanized in a modern capitalist system with all its brutal tyranny. She appears to be more of an everyday woman and an individual person than, say, an Agnes—the daughter of Indra in Strindberg's *A Dream Play*. Symbols are surely present in Tagore's plays, but they do not distort reality 'in a dreamy or vague way'[23] as a typical Maeterlinck piece does.

Idea of a Modern Ballet. In the last phase of his life Tagore

experimented with a new form in which dance, music and drama fused together. While travelling in Java in 1927, Tagore had the opportunity of seeing her traditional dances depicting well-known stories from the Indian epics.[24] It flashed upon him that acting was nothing but a music of the body, the perfection of which was dance. His dramatic career had begun with a form akin to opera, and here he evolved a sophisticated type of ballet, where to speak was to sing and to act was to dance. The cycle was complete.

Contrary to the natural apprehension that the theme in these dance-dramas might be more abstract than in his earlier works, Tagore here becomes overtly interested in psychological conflict as is shown in *Caṇḍālikā* (1938) and *Śyāmā* (1939). Physical passion has never been presented so poignantly in any other work of his. Syama, for example, is a beautiful courtesan, and can go so far as to persuade an admirer to take upon himself a life-sentence to save a foreigner, Vajrasen, with whom she is infatuated. But when in a moment of ecstasy Syama discloses to Vajrasen the price of gaining his freedom, a moral crisis begins. That their love rests upon a heinous crime is apparent to both. It is impossible therefore to live together as also to live apart. The situation assumes a tragic dimension rarely found in Tagore.

And all this has to be expressed on the stage through songs, mimes and dance—a form of dance in which traditional patterns, Indian or non-Indian (Ceylonese, for example)—have been freely synchronized. One enthusiast, who happened to witness an early performance, writes : 'The dramatic cubism of Kathakali, gloriously wedded to the sensitive lyricism of the Manipuri and occasionally punctuated with folk feelings, breathing an aroma of the dreamland......[25] When Tagore accepted the task, the challenge obviously was whether the form would be capable of containing modern sensibilities. That it amply did is evident from the exalted reaction of most of the connoisseurs who feel that Tagore had added in these

plays 'a depth and a vitality that transmuted them into unique new creations'.[26]

The End of a Lone Fight. But then, critics are not always certain as to where to place Tagore the dramatist in the history of Bengali drama. Their stance has sometimes been ambivalent, and whether it is proper to hail him as the greatest Bengali playwright has often been debated. One of the reasons for this scepticism is that Tagore's plays have hardly been presented on the stage with reasonable success. True, professional theatre has failed to produce him off and on. But does that indicate his failure as a dramatist ? Has not the Bohurupee troupe staged *Raktakaravī* with phenomenal success ? Bohurupee's production of that play has been looked upon as a milestone in the history of Bengali theatre. The troupe did not limit itself to this single production alone, so far as Tagore is concerned. Plays like *Rājā*, *Muktadhārā*, *Visarjan* and *Dākghar* have also been tried, not to speak of the dramatised version of his none-too-dramatic *Cār Adhyāy*, where the director has been able to bring out the poetry latent in the sophisticated dialogue of the characters. 'Through Tagore we must find a way to express the whole of a man',[27] thought Sombhu Mitra. And he, for one, did find the way.

Utpal Dutt has assured us that 'only after the revolution will the people really claim Tagore'.[28] Meanwhile, one may bear in mind that our modern concepts of an open theatre, little theatre, or the poetry of the theatre, owes something to the lone fight of Tagore's dramatic activities, when his contemporaries exercised in puerility.

AFTER TAGORE

The Legacy of the Past. Almost oblivious of Tagore, the playwrights of the thirties of this century mostly accepted the 19th-century norms to be their point of departure, mythical and historical plays being their primary attraction, often a peg

on which an author hung his contemporary experience. But the point is, even in an attempt to rouse in us a feeling of patriotism or of communal harmony, the playwrights of the thirties rarely escaped banality of expression while using episodes from the puranas or from history

One of the reasons of this steep fall has been perceptively pointed out by Buddhadev Bose (Buddhadev Basu, 1908-74), the poet. A cooperation between literature and theatre is absolutely necessary for the growth of drama ; but since Tagore's ascendancy in the field, Buddhadev observes, 'there has been an increasing hiatus between the two ; literature has grown more and more subtle and daring whereas the theatre has remained crude and conventional, depending mucn on the players and little on playwrights'.[20] It is interesring to note that in the poetry and fiction of about the same period, the atmosphere was charged with an intoxicating spirit of modernity and vitality. But despite our great actor Sisir Bhaduri's (1889-1959) admirable contribution to the regeneration of the theatre, Bengali drama was lagging far behind. Leaning too much on the public taste possibly had been its nemesis.

Even then, playwrights like Manmatha Ray (b. 1899) and Sachin Sengupta (1892-1961) deserve a special mention here. The preoccupation of the former is with the mythical stories ; of the latter, history. It is possible sometimes to read a political meaning in Manmatha Ray's plays. The portrayal of the prison of Kansa in his *Kārāgār* (The Prison, 1930) could be taken as an apt allegory of the situation when our political workers were being imprisoned *en-masse*. But, although the play ends with the submission of a tyrant, one must remember that the author had conceived this Kansa as a tragic hero. Perhaps, politically, he was not too sure of his theme.

The same year Sachin Sengupta arrived with his *Gairik Patākā* (The Brown Ensign, 1930), a play on Sivaji. This play, as also a few others which were to follow, shows his aptitude

for a rhetorical oratory, which—though not of any high merit—had a captivating power nonetheless. His *Sirājuddaullā* (1938) is perhaps the most popular of the historical successes to date, thanks to its availability on gramophone discs. Largely sentimental, Sachin Sengupta seemed to have known his audience perfectly well.

Bidhayak Bhattacharya (Bidhāyak Bhaṭṭācārya, b. 1910), yet another playwright of the period, is more interested in social and psychological problems. Not that Manmatha or Sachin had never written anything of the type, but Bidhayak was a little more conscious of the new experiments in the form of drama. With a journalistic approach to a grave social malady, *Bis Bachar Age* (Twenty Years Back, 1939) and—a much later one—*Ksudhā* (Hunger, 1957), are two of his many stage-successes.

These are the men who had to play second fiddle to an insipid stage, trying to repeat in a slightly modified manner what a Girish Chandra Ghosh (Giriścandra Ghoṣ, 1844-1912) or a D. L. Roy (1863-1913) had done earlier. They served a lot, but one can only lament with Buddhadev Bose : 'Theirs is a laudable martyrdom, and ours a sigh of regret.'[30]

Amateurs Step in. The only few plays of the period which are also readable, have been written by some of our noted novelists who felt drawn toward the theatre, though only for a short while. Tarashankar Bannerji (Tārāśaṅkar Bānerji, Beng. Bandyopādhyāy, 1898-1971) was one of them. He was interested in genuine character study in a decaying feudal society. Although the situations and dialogues are not always dramatically charged, his *Dui Purus* (Two Generations, 1942) and the dramatized version of his novel *Kālindī* (1941) offer us a feel of the soil. The proud yet hollow aristocracy of the landlords miserably facing the rise of a new generation and the coming of a new age was a favourite theme of Tarasankar in his novels, and in his plays he was no different.

Banaphul (pseud. for Balāicānd Mukhopādhyāy, 1899-1979) was another such novelist who wrote a few plays. His emphasis was on the biographical sketches of our 19th-century stalwarts, as in his *Śrī Madhusūdan* (1939) or *Vidyāsāgor* (1942). Banaphul explored these dramatic lives reasonably well, but it is interesting to note that none of his works were accepted by the public stage, in spite of the fact that a different script on the life of Madhusudan had been quite popular with the audience at that time.

This trend of biographical plays will be found later in Naroyan Ganguli's (Nārāyan Gāṅguli, Beng. Gangopādhyāy, 1917-70) *Rāmmohan* (1952) or in the plays of Chittaranjan Ghosh (Cittarañjan Ghoṣ, b. 1930) who has taken an interest in the cultural pattern of 19th-century Bengal in reconstructing the lives of Derozio, the 'Young Bengal' reformer of Calcutta. Binodini, an actress of great repute, or Nidhu-babu, a leading composer.

Mention may also be made here of Abanindranath Tagore (1871-1951), the artist nephew of Rabindranath. This exponent of oriental art left his brush aside for almost a decade during the thirties and with the folk forms as his primary source of inspiration engaged himself seriously in turning our epics or fables into scores of dramatized funs and frolics, which he liked to call 'the hysteria of imagination'. True, his works in this genre are mostly for children, but if one is interested in the history of the development of our theatre, one should not pass him by without a grateful acknowledgement. He had declared in unequivocal terms that the proscenium stage was, in fact, a thing of the past.[31] But none took any serious notice of him at all ; the theatre-scene in Bengal was content to hold on to a dead tradition.

Resurgence with Hunger. During the forties, however, the professional theatre showed definite signs of decay. The gate money of a Sisir Bhaduri production came down to thirty-seven

rupees one night, while the spectators waited in long queues in the neighbouring film houses to watch low-grade Hindi films. A new competition had started. The theatre was empty, the drama scarce.

An exciting resurgence heaved the scene of the Bengali theatre at this jurcture. Sane intellectuals all over the world had united in defence of humanity against Fascism and Imperialism. An anti-Fascist and progressive writers' association was also formed in India, which was facing war and famine and riots and all. It was not a long way from the slogan of 'Quit Indio' to that of 'Ye Āzādi Jhūṭa Hai' (This Freedom is False). This was the perspective when, in July 1943, the first bulletin of the 'Indian People's Theatre Association' (IPTA) declared that 'Old art forms with new and vibrant themes...are again bursting into life.'[32] This was the first time in our theatre movement when all-India concern became evident in the activities seeking a link between 'the Andhra and Malabar peasant boys,...the Bengal peasantry or Bombay working class.'[33] This concern gave rise to a new group of talents for whom all art was people's art. Bijan Bhattacharya (Bhaṭṭācārya, 1917-78), one among them, created a sensation with his *Navānna* (Celebration of the New Rice, 1944), the production of which indicated the emergence of the 'other theatre' in Calcutta.

Hunger and Epidemic[34] was the name of a dance programme organized by the IPTA in 1944. This was followed by *Navānna*, the theme of which was the same as that of Bijan's earlier play *Javānbandi* (The Evidence, 1943) : the anguishes of a peasant family during the man-made famine of 1943. Here we can see the first real peasants in a Bengali drama since Dinabandhu Mitra's (1830-73) *Nil Darpan* (The Mirror the Indigo-Planters, 1860).

It was perhaps in the scheme of the IPTA that their plays would never end without a note of optimism. The famine-stricken people of *Navānna* rush to the metropolis only to come back having had experiences of hoarders, touts and debauches

—and a little of politics. Back in the village, the protagonist waits for the monsoons with this last cry: 'Resistance! Resistance this time!', though for this there is no adequate preparation in characterization or dramatic action. The same is true of his later plays also.

The hangover of *Navānna* is distinct in all of Bijan Bhattacharya's plays, of which particular mention should be made to *Devī-Garjan* (1966-69) and *Garbhavatī Jananī* (The Expectant Mother, 1969-71). In the former, the conflict is again between the landless peasants and the landowners, while in the latter is manifest the belief-pattern of a group of herb-collectors in a village. These plays have been structured in an epic manner, presenting 'a whole social milieu in a deliberately leisurely fashion working through rituals from birth to death.'[35]

Bijan's plays presaged a number of plays and playwrights. *Chenṣā Tār* (The Snapped String, 1950) by Tulsi Lahiri (1897-1959), *Bāstubhiṭa* (The Homestead, 1947) by Digindrachandra Banerjee (b. 1910) or *Natun Ihudī* (The New fashioned Jews, 1950) by Salil Sen are a few notable examples with portrayals of economically oppressed and uprooted rural people.

The importance of the IPTA, therefore, can never be minimised even if it started to disintegrate within a couple of years after its inception. Its far-reaching impact will be felt more if we remember that for the next thirty odd years Bengali drama entirely depended on the 'group theatres' (most of the leaders of which had their first training at the IPTA) instead of the professional ones.

Let Roots Have Wings.[36] The fifties and sixties witnessed a steady growth of these groups. But what would they stage? Their social awareness and an apparent sense of responsibility stood in the way of accepting old dishes as such. On the other hand, there were not many new plays ready on hand for a demanding generation. A new trend in Bengali drama deve-

loped under the circumstances, its horizon being widened by translations and adaptations from the western masters selected at random.

It was a significantly new orientation for the Bengali audience which came to be widely exposed to the varied worlds of Sophocles, Ibsen, Chekhov, Gorky, Pirandello, Ionesco, Anouilh or Brecht – to name only a few.[37] If the first 15 years of this period were thus dedicated to the West, the second 15 years can be marked with the gradual opening up of a new Indian scene, already latent in the IPTA movement but not quite worked out. Playwrights like Vijay Tendulkar (Marathi : *Śantata, Court calu Ahe*), Girish Karnad (Kannada : *Tuglak* and *Hayvadan*) or Mohan Rakesh (Hindi : *Ādhe Adhūre*) started to be translated and staged with an equal verve. The close association with these writers, particularly with the epic drama of Brecht, has been responsible for a radical change not only in the production technique of subsequent Bengali drama, but also in the writing of it.

And Wings Roots.[38] Exceptions are there, but the most important playwrights of this quarter of a century have been actors themselves. Sombhu Mitra is a case in point. By far the best actor in our times, Sombhu Mitra has given a definitive shape to our theatre movement by his sense of discipline and rigour, and his ways of interpreting the wide range of life at different levels. He first came into prominence with the production of *Navānna*. A few years later he had to build up his own troupe of 'Bohurupee' with the guidance of Manoranjan Bhattacarya (1889-1954), the veteran actor. But still later, after he became singularly noted for his productions of Tagore and Ibsen, Sombhu Mitra had to ask for something new to exemplify his much-pronounced ideas on Indian drama.

'But who is going to write the drama ?' he wondered.[38] In his youth he wrote a couple of plays, not memorable pieces though. Bijan, his friend, was surely one who had secured his

roots in the soil depending largely on the rituals and archetypal images. But, perhaps, Sombhu Mitra wanted to have a greater span where the plot would be 'burningly real and yet ethereally transcendent',[30] where the characters would be dealing with fundamental values even in their normal behaviour. In search of this, he himself came out with *Cānd Baniker Pālā* (The Play of Chand, the Merchant, 1977), his *magnum opus*, which he took at least ten years (1965-75) to complete. Nothing more elegant have we read in Bengali drama since Tagore.

The story of Chand, exploited by many modern writers, is the most popular story in pre-modern Bengali literature. In an age of abject submission to gods. Chand's exemplary defiance of the goddess Manasa at the cost of everything he possessed, has made him an apt symbol of heroic challenge to Fate. At the same time, the character gets a tragic dimension in so far as he has to stoop down ultimately yielding to his human affections. It is only natural that Sombhu Mitra used his hero as an archetypal character, transmuting his personal destiny into the destiny of mankind. His Chand is a modern man with a vision, and is destined to follow it alone in an alien world. Even when crushed to pieces he undauntingly cantinues to cry : 'Across, across, let us sail across the stream'.

Even a short comment such as this on the play cannot be complete without a note on its subtle use of language. Its dialogue pattern is in a regular rhythm with a smoothly balanced archaic tilt, moving freely from the mundane level of everyday speech to the heightened scale of poetic nuances, fulfilling thereby all the requisites of a modern poetic drama.

Towards a Poetic Drama. That takes us back to Buddhadev Bose, the most versatile author after Tagore. His readers quite often overlook that in the early thirties he tried his hand at plays also. But in the span of the last ten years of his life he made a glorious come-back with his play *Tapasvī O Taranginī*

(Tarangini and the Sage, 1966) followed by no less than eight fulllength pieces.

At the end of each play, Buddhadev added adequate notes for the probable producers but the plays have rarely been taken to stage and one suspects that they may not be quite successfully acted for a long time to come except over the radio. It is not that the author was unaware of this predicament, but unlike the earlier despairing youth, he was content to write these plays for a reading public, particularly because the possibility of a poetic drama had already been looming large on the scene.

Experimentation in poetic drama was much in vogue among younger poets of the time, viz. Dilip Ray (1919-78), Ram Basu (b. 1926), Alok Sarkar (b. 1931) and Alokeranjan Das Gupta (b. 1933). Without any intention to storm the stage they wrote plays which were performed sometimes before select gatherings. Obviously inspired by the theories of Eliot, these poets failed to note that in the theatre a play must have a direct surface meaning to have an immediate impact on the senses.

Buddhadev Bose, on the other hand, tried to structure his plays with an effort to produce this immediate impact. The dialogues of *Tapasvī O Taraṅginī* are of course set in a stylized prose, often reminding us of Tagore's prose version of *Caṇḍālikā*, but the internal dimension of its external action, its subtlety and poetic fervour gave way to his Mahabharata group of poetic dramas, viz. *Kālsandhyā* (The Ominous Evening, 1968), *Pratham Pārtha* (The First Son of Pṛtha, 1969), *Anāmni Aṅganā* (The Unnamed Woman, 1970) or *Samkrānti* (The Moment Between an End and a Beginning, 1970).

In the last phase of his life, Buddhadev was completely preoccupied with his romantic study of the Mahabharata trying to read in the epic a modern meaning which in its turn was not far from the core of his own poetry and drama. In *Tapasvi O Tarangini*, for example, the original story of Ṛṣyaśṛṅga's seduction by an enchantress, was transcreated as the awakening of

love and suffering through sexual passion, as also of an essential spirituality arising out of the conflict of the body and mind.

Buddhadev has a different type of plays in *Kolkkātār Electra* (The Electra of Calcutta, 1968) and *Punarmilan* (Reunion, 1970) where one is confronted with the absurdity of time and existence, as is focused in this typical dialogue :

> *Jayā* (smiling). Do you think you are dead ?
> *Nīlkaṇṭha.* I'm not sure.
> *Jayā.* You are suffering, Nilu. Does one suffer when Dead ?
> *Nilkaṇṭha.* How do I know ? Isn't it possible that we are dead, only that we don't know it ? Isn't it possible that we had been dead all through, but only didn't know it ?[40]

Yes, we are moving toward the Absurd.

From the Absurd to Commitment. Compare the above passage with the following piece from *Evam Indrajit* (1262, pub. 1965).

> *Playwright.* Where did you die ?
> *Indrajit.* I am not dead.
> *Playwright.* Are you sure ?
> *Indrajit* (after a long pause). No, I am not sure.[41]

From this life-in-death attitude or a sense of utter meaninglessness in our existence comes the state of a metaphysical anguish, which is the central theme of the Absurd. Badal Sircar (Bādal Sarkār, b. 1925) took up the thread in his *Evam Indrajit* (And Indrajit) in 1962, just when the movement seemed to have spent its force in the West. Not an accident, perhaps. That was the year of India's conflict with China, and the Communist Party of India showing all the signs of a split. That was the year when the *avant-garde* in Bengali poetry came in close contact with Allen Ginsberg to howl a protest against all possible norms of life. Fifteen years of Indian freedom yielding

only a state of frustration and increasing self-divisions, it was not unexpected of the petty-bourgeois intellectual to grow aware of his own nakedness and impotence his nothingness. Badal Sircar is one who tried to cope with this total waste when with a direct reference to the myth of Sisyphus he makes his characters say ; 'Those whom I see around me have no shape, no colour, no substance. They are undramatic. They are Amal, Bimal, Kamal, and Indrajit.'[42]

The personal middle-class inertia of *Evam Indrajit* gave way to a sense of guilt in *Bākī Itihās* (The Rest of the History, 1967) where we confront the whole history of 'inhuman' civilization. In *Triṁśa Śatābdī* (The Thirtieth Century, 1969) it is no more a question of guilt, it is a call for responsibility. Thus, in his trilogy, the entire experience of a modern man has been captured.

There had been a lot of talk against the picture-frame or proscenium stage in Calcutta, but Badal Sircar is perhaps the only one who has been fighting it persistently with his application of the idea of the Third Theatre, a concept of the Poor Theatre (in its literal sense ; somewhat different from Grotowski's idea of it),[43] since 1969, which was politically a significant year. West Bengal had already passed through the experience of the rise and fall of the United Front Governments : the upsurge of the ultra-left wing had been vehement ; the state had been pushed almost to the verge of a civil war. The existential stance of Badal Sircar changed to a direct social involvement.

The dramatization (1972) of Howard Fast's *Spartacus* had been an exercise for him preparatory to his approach to this involvement. It was followed by plays like *Michil* (The Procession, 1974,, *Bhomā* (1975) or *Sukhapāṭhya Bhārater Itihās* (A Delectable History of India, 1976), all of which could be performed without a stage, revealing his intention to enlighten the people about the pattern of colonial oppression suffered by the rural India. If one advances from *Bākī Itihās* to *Sukhapāṭhya*

Bhārater Itihās, one can trace Badal Sircar's development from the theatre of the Absurd to a deeper social commitment.

Nothing Less Than Revolution. 'From people like Bertolt Brecht and Arthur Miller I learned that all drama was political,' declared Kenneth Tynan,[44] the British critic. Utpal Dutt, the most prolific playwright in Bengal today would have preferred to substitute Gorky for Miller and called for nothing less than a revolutionary theatre. A formidable director and actor, more in the line of Stanislavsky and in content nearer Brecht,[45] Utpal Dutt has been writing for the last two decades unabashed propaganda plays leaping from slogan to slogan, documentary and street-corner plays sometimes, thus involving himself in political movements of our couutry during this period. How far truly Marxist his plays are has often been questioned, but there is no denying his rapport with the people in their struggle for progress.

Unlike Badal Sircar who tried to break through the old convention of well-knit story and character in a drama, Utpal believes in a massive story. His first significant play was *Angār* (Charcoal, 1959) where the theme was exploitation in coal mines. The manner in which owners flood mines on fire and kill miners in order to save coal was spectacularly staged for the drama. But since there was no 'call for the armed overthrow of the system'[46] on the part of the oppressed, Utpal himself denounced the play later. Perhaps because of this revolutionary zeal, the titles of his plays themselves make a big armoury : swords, arrows, cartridges and rifles. The stories of his plays are mostly taken from the history of revolutions of different nations, viz. the Vietnamese War, the Cuban Revolution, the Black Revolution or Hitler's Germany of 1933—not to speak of the various phases of our own freedom movement.

Largely influenced by Piscator,[47] Utpal endeavours to use facts of oppression directly from books and journals without

much embellishment ; and on the other hand he uses all the loud devices of our village *Yātrā*, the theatre-in-the-round.

In *Kallol* (The Roaring Waters, 1965), the next big hit after *Aṅgār*, his subject is the Naval Mutiny of Bombay 1946. That the play had faced an all-out attack from the bourgeois press is a proof of its comparative success in building up the thesis that our national leaders betrayed the cause of our freedom fight at a crucial moment, as has been shown in the action of the play. *Mānuṣer Adhikār* (The Human Rights, 1967) is a drama on racialism in which a Negro youth is on trial on the false charge of raping a white girl. In *Tiner Talvār* (A Foil of Tin, 1971), perhaps his best so far, he explores the dichotomy in our 19th-century Babu-culture. The play offers us an unforgettable dramatic moment when in a play within the play an actor playing in a farce suddenly transforms the farce into a drama on Titu Mir and himself becomes a rebel in ecstasy.

Twice arrested by the police (1965, 1967) for his plays, several times attacked by hooligans for staging a satire on this city of nightmares, Utpal has been something of a fighter all along.

Allies from all Sides. Other playwrights have joined him.[48] He thinks it significant that a talented playwright like Mohit Chatterjee (Beng. Caṭṭopādhyāy, b. 1935) has come down from the surrealistic planes of, say, *Kaṇṭhanālite Surya* (The Sun in the Gullet, 1963) to plays like *Rājrakta* (King's Blood, 1970) or that Manoj Mitra (b. 1937) is crossing over his earlier works to *Cākbhāṅgā Madhu* (Fresh Honey from the Honeycomb, 1971). The present efforts of Arun Mukherjee (Beng. Mukhopādhyāy, b. 1937), Nabhendu Sen (b. 1944) or Debasis Majumdar (b. 1952) also are pointing toward the growth of a political theatre in Calcutta.

Mohit, primarily a poet, was at first concerned with the Theatre of the Absurd. His protagonists were eccentric,

situations surreal, dialogues strewn with suffocating images—a good example of all of which is *Captain Hurrah* (1970). Here a ship is the symbol of the country, and the Captain is steering it through treacherous shoals to the fulfilment of a possible dream. But the dream was nebulous until Mohit came to write *Rājrakta* where he challenges the exploitative urban society a little more directly, without changing his favourite technique of intermingling reality with the unreal.

Manoj Mitra also, with plays in the lighter vein such as *Tāpur Tupur* (Drip and Drop, (1971) or *Śiber Asādhyi* (Baffling for the Gods, 1974), is at his best in *Cākbhāṅgā Madhu* where a forceful protest against rural exploitation has been powerfully dramatized by using in the plot a family of snake-charmers and a lecherous moneylender.

Sceptics may suggest, not without reason, that this political orientation does not always lead to analytic understanding of the socio-political situations, that mostly it turns out to be a romantic overture. Certainly there are some such examples, but these aberrations are only natural in the course of history.

NOTES

1. Mitra, Sombhu, 'Building from Tagore', *The Drama Review*, vol. 15, no. 3, New York, 1970, p. 203.
2. Dutt, Utpal, 'Theatre as a Weapon', *The Drama Review*, vol. 15, no. 3, p. 236.
3. Mukherjee, Dhurjatiprasad, *Tagore-a Study*, Calcutta, 1972 p. 87,
4. Ibid., p. 94.
5. Tagore, Rabindranath, *Reminiscences*, London, 1971, p. 198.
6. Ibid., pp. 194-95.
7. Ibid., p. 196.
8. Tagore, Rabindranath, *Collected Poems and Plays*, London, 1961, p. 513.

9. Eliot, T. S., *Collected Plays*, London, 1962, p. 46.
10. Tagore, Rabindranath, *Collected Poems and Plays*, London, 1961, p. 502.
11. ———, 'Rangamanca', *Ravindra-Racanāvalī*, vol. 5, Viśva-Bharati, 1955, pp. 449-53 ; see also vol. 21 ; p. 116.
12. Artaud, Antonin, 'Oriental and Occidental Theatre', *The Theatre and Its Double*, New York, 1958, pp. 68-73.
13. Tagore, Rabindranath, *Sādhanā*, London, 1947, p. 5.
14. Tagore Rabindranath, *Collected Poems and Plays*, London, 1961, p. 350.
15. ———, *The King of the Dark Chamber*, London, 1961.
16. ———, *The Post Office*, London, 1968, pp. 33-34.
17. Ayyub, Abu Sayeed, *Pāntha Janer Sakhā*, Calcutta, 1973, pp. 92-93.
18. Tagore, Rabindranath, *The Post Office*, London, 1968, p. v.
19. Ibid,. p. 68.
20. Tagore, Rabindranath, '*Red Oleanders* : Author's Interpretation', *The Visva-Bhārati Quarterly*, October 1925, p. 284.
21. 'Sudarsana is no more an abstraction than Lady Macbeth who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature'. Tagore, R. N., *Letters to a Friend*, London, 1928, p. 49.
22. Ibid., p. 172.
23. 'Perhaps the difference between him and most of the other writers was that he had very definite ideas to express, while others were contented to distort reality in a dreamy or vague way'. Aronson, A., *Rabindranath Through Western Eyes*, Allahabad, 1943, p. 115.
24. Tagore, Rabindranath, 'Jāvāyātrir Patra' (Letters from a Traveller in Java), *Rabindra Racanāvalī*, vol. 19, pp. 491-95.

25. *Amritabāzār Patrika*, (13 March 1936).
26. Sanyal, H. K., *The Plays of Rabindranath Tagore*; *A Centenary Volume, 1861-1961*, New Delhi, 1961, p. 242.
27. Mitra, Sombhu, 'Building from Tagore', *The Drama Review*, vol. 15, no. 3, New York, 1971, p. 204.
28. Dutt, Utpal, 'Theatre as a Weapon', op. cit., p. 237.
29. Bose, Buddhadev, *An Acre of Green Grass*, Calcutta, 1948, p. 98.
30. Ibid., p. 99.
31. Chanda, Rani, *Śilpiguru Abanindranāth* (Abanindranath, the Master Painter), Calcutta, 1972, p. 101.
32. Compiled in *Marxist Cultural Movement in India*. ed. Sudhi Pradhan, Calcutta, 1979, pp. 128-29.
33. Ibid., p. 129.
34. '*The Hunger and Epidemic Dance* done by Usha Dutta and Panu Paul moved the audience so much so that the crowd rushed forward to pay their humble mite for Bengal famine relief', ibid., p. 253.
35. Banerjee, Samik, 'Problems and Directions : Calcutta's New Theatre', a conversation, *The Drama Review*, vol. 15, no. 3, New York, 1971, p. 243.
36. From the famous aphorism of J. R. Jimenez : 'Let roots have wings and wings roots'.
37. A few important translations or adaptations are from : *Oedipus Rex* (Sophocles) : Sombhu Mitra ; *Antigone* (Sophocles) : Alokeranjan Dasgupta ; *A Doll's House* (Ibsen) : Sombhu Mitra ; *An Enemy of the People* (Ibsen) : Santi Basu ; *The Lower Depths* (Gorky) : (1) Umanath Bhattacharya, (2) Sibnarayan Ray ; *The Cherry Orchard* (Chekhov) : Ajitesh Bandyopadhyay ; *Six Characters in Search of an Author* (Pirandello) : Rudraprasad Sengupta ; *Rhinoceros* (Ionesco) : (1) Saonli Mitra, (2) Somendrachandra Nandi ; *Antigone* (Anouilh) :

Chittaranjan Ghosh ; *The Life of Galileo* (Brecht) : Ritwik Ghatak (Ṛtvik) ; *Mother Courage* (Brecht) : Utpal Dutt ; *The Threepenny Opera* (Brecht) : Ajitesh Bandyopadhyay ; *The Caucasian Chalk Circle* (Brecht) : Badal Sircar.

38. Mitra, Sombhu, 'In the Theatre', in *Modernity and Contemporary Indian Literature*, IIAS, Simla, 1968, p. 82.
39. Ibid., p. 81.
40. Bose, Buddhadev, *Punarmilan*. Cclcutta, 1970, p, 138.
41. Sircar, Badal, *Evam Indrajit*, tr. Girish Karnad, Calcutta, 1974.
42. Ibid.
43. Sircar, Badal, *The Third Theatre*, Calcutta, 1978, pp. 25-26.
44. Tynan, Kenneth, *Tynan on Theatre*, Middlesex, 1964, p. 13.
45. Dutt, Utpal, *Stanislavskir Path* (The Way of Stanislavski), Calcutta.
46. Dutt, Utpal, 'Theatre as a Weapon', *The Drama Review*, vol, 15, no. 35, New York, 1970, p. 226.
47. 'I have been thinking about Documentary Theatre since 1960, and I was mainly influenced by Piscator's Writings', Dutt, Utpal, Interviewed by Samik Bandyopadhyay, *Enact*, Aug.-Sept. 1972, nos. 68-69, p. 7.
48. 'We feel that our allies are coming forward from all sides, and they will stand by us in a losing battle and turn it into a victor', Samik Bandyopadhyay, op. cit., p. 8.

BIBLIOGRAPHY

BENGALI

1. Bandyopadhyay, Brajendranath, *Bangiya Natyasalar Itihas* (History of the Bengali Theatre), Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, 1933.

2. Basu, Shishir, *Ekso Bacharer Bangla Thieter* (The Bengali Theatre of a Hundred Years), Navana, Calcutta, 1974.
3. Bhattacharya, Shankar, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* (The Materials for a History of the Bengali Stage). State Book Board, Calcutta, 1982.
4. Dasgupta, Hemendranath, *Bharatiya Natyamanca* (The Indian Stage), 2 vols., Bangabhasa Samskriti Sammelan, Calcutta 1945, 1947.
5. Datta, Sunil, *Natya Andolaner 30 Bachar* (30 years of the Theatre Movement), Jatiya Sahitya Parishad, Calcutta, 1972.
6. Dutta, Utpal, *Cayer Dhnoa* (Smoke from Tea-cups) Jatiya Sahitya Pasishad, Calcutta, 1982.
7. Ghosh, Sankha, *Kaler Matra O Rabindranatak* (Time's Measure and Tagore's Drama), Dey's, Calcutta, 1981.
8. Mitra, Shambhu, *Prasanga Natya* (The Subject is Drama). Smskrta Pustak Bhandar, Calcutta, 1971.
9. Ray, Kumar, *Tilottama Silpa* (The Art that Builds up from Bits), Papyrus, Calcutta, 1980.
10. Raychaudhuri, Subir and Majumdar, Swapan, *Bilati Yatra theke Swadesi Thieter* (From the English Yatra to the National Theatre), Jadavyur University, Calcutta, 1972.
11. Sarkar, Pabitra, *Natmanca O Natyarup* (The Stage and the Dramatic Form), Prama, Calcutta. 1981.

ENGLISH

1. Dasgupta, Alokeranjan, *Buddhadev Bose*, New Delhi, 1977.
2. De, Sushilkumar, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1962.
3. Ghosh, J. C., *A History of Bengali Literature*, Oxford, 1949.
4. Guha Thakurta, Prabhucharan, *The Bengali Drama : Its Origin and Development*, London, 1930.
5. Naik, M. K. and Mokashi Punekar, S. (ed.), *Perspectives on Indian Drama in English*, Dharwar, 1977.

6. Pradhan, Sudhi (ed.), *Marxist Cultural Movement in India, Chronicles and* Documents (1936-47), Calcutta, 1979.
7. Raha, Kironmay, *Bengali Theatre*, New Delhi, 1978.
8. Rangacharya, Adya, *Indian Theatre*, New Delhi, 1969.
9. Sen, Sukumar, *History of Bengali Literature*, New Delhi, 1960.
10. Sircar, Badal, *The Third Theatre*, Calcutta, 1978.
11. ———, *Evam Indrajit*, tr. Girish Karnad, intro. Satyadev Dubey, Calcutta, 1974.
12. Swami Jagadiswarananda, *Girish Ghosh and His* Dramas, Calcutta, 1949.
13. Thompson, Edward, *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist*, Calcutta, 1979.

ARTICLES

1. Bandyopadhyay, Samik, and Sircar, Badal, 'Middle-Class Responsibilities', *Sangit Nāṭak*, New Delhi, Oct.-Dec. 1971, pp. 5-18.
2. Bandyopadhyay, Samik, 'Utpal Dutt Interviewed', *Enact*, New Delhi, Aug.-Sept. 1972, pp. 2-9.
3. Paul, Rajinder, 'Ajitesh Banerjee Interviewed', *Enact*, New Delhi, May 1972, pp. 9-10.
4. Sen Gupta, Rudraprasad, 'The Other Theatre in Calcutta', *Sangit Nāṭak*, New Delhi, Oct.-Dec. 1971, pp. 63-68.

JOURNALS

1, *The* Drama *Review*, vol. 15, no. 3, Now York, 1971.

Oct-Nov, 197?

স রো জ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

আধুনিক কবির অন্তরঙ্গ ভাব ও ভাবনা

ডায়েরি আর জার্নাল শব্দ দুটির মধ্যে আভিধানিক অর্থসম্বন্ধ থাকলেও লক্ষ্যার্থে তারা দুটি পৃথক ব্যাপার। ডায়েরি যদি দিনলিপি, জার্নাল তাহলে মনোজীবনের চলৎলিপি। ডায়েরি যে কেউই লিখতে চাইতে পারেন, জার্নাল আমরা তাঁর কাছেই আশা করব যাঁর 'গভীর চলা' বাইরে যতটা ব্যক্ত, অন্তর প্রবাহে প্রসারিত তার থেকে কম নয়। যদি বলি বাইরের অভিব্যক্তির নেপথ্য কলাপ জার্নালে ব্যক্তিমানস মেলে ধরে—তাহলেও ঠিক বলা হবে না। জার্নালের আসল কথা আত্মকথা নয়, স্বগত ভাবনা। ব্যক্তির সংস্পর্শে, বিষয়ের অভিঘাতে মনে মনে যে জিজ্ঞাসা আলোড়িত হয়, ভাবনা মুকুলিত হয়, জার্নালে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া। ব্যক্তি অনুসারে তার স্বাদের হেরফের ঘটে। ধূর্জটিপ্রসাদের জার্নাল আর শঙ্খর জার্নাল স্বাদে সৌরভেই আলাদা। শঙ্খ ঘোষের জার্নালে আমরা তাঁর পরিণত প্রবন্ধের পূর্বাভাস কখনো কখনো নিশ্চয় পেয়ে যাই। লেখক তো নিজেই তার একটু-আধটু হদিশ দিয়েছেন—উল্লেখ করি 'আধুনিকতা' নামে লেখাটির শেষ কয়েক ছত্র (৪৪ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এই জার্নাল আমরা পড়ব সেই অনুসন্ধিৎসার থেকেও স্বতন্ত্র আর এক কারণে। একটি পূর্ণায়ত কবিমানসের স্নিগ্ধ সান্নিধ্য এই লেখাগুলি দিতে পারে—এটাই এ জার্নালের প্রধান গুণ। একটি বা দুটি পড়বার পর বই মুড়ে রাখি। মনে মনে তখন আলাপ শুরু হয় লেখকের সঙ্গে। তখনই শঙ্খের মারফত অমিয় চক্রবর্তীর কাছে জানতে ইচ্ছে করে রেলগাড়ি বা রেলওয়ে স্টেশন নিয়ে কবিতা লিখলে স্পেণ্ডারের মতোই লিখতে হবে এ আবশ্যিকতা কে নির্দিষ্ট করে দিলেন? 'ইস্টেশন'-এ ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশনের যে প্রকৃতি ফুটে ওঠে, অথবা রাতের গাড়িতে—সেটাই রবীন্দ্রনাথের স্বভূমিলব্ধ এবং স্বোপার্জিত নয় কি? পড়তে পড়তে সচকিত হই আমরা আধুনিকতার বিষয়ে শঙ্খের এই অন্তর্গূঢ় মন্তব্যে—"মনীষার ব্যাপ্তি বা অবচেতনের উৎসার যে আধুনিকতার ভিত্তি, সে কি অনেকটা ধসে পড়ছে না আজ? আধুনিক যুগ কি আধুনিকোত্তর এক যুগে পৌঁছচ্ছে না এখন, অন্তত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে? সে-হিসেবে হয়তো বলা যায় যে এই 'আধুনিকতা'ও এক সীমাবদ্ধ—dated—ধারণা"। এই ব্যাখ্যা হয়তো সবাই মানবেন না, কিন্তু তিরিশের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার যে

সংস্কার্থ প্রায় একটা নিয়তিবাদে পরিণত হয়েছে, তা থেকে মানবিক উত্তরণের অভীপ্সার মধ্যেই রয়েছে হয়তো আধুনিকতার আধুনিকতর সংস্কার্থ, এ অনুমানকে উপেক্ষা করা চলে না। জার্নালের স্বাভাবিক আধার অনুযায়ী শঙ্খর জার্নালেও আমরা তিন ধরনের লেখা পাই। একধরনের লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে নানা ব্যক্তিত্ব সান্নিধ্য জনিত ভাবনা। আরেক ধরনের লেখায় অনিবার্য ভাবে ছায়া ফেলেছে দু-একটি সাময়িক ঘটনা। তৃতীয় ধরনের লেখায় নিবিড় হয়ে উঠেছে কবি ও কাব্যরসদ্রষ্টা শঙ্খ ঘোষের নিবিষ্ট নান্দনিক ভাবনা। প্রথম ধরনটির মধ্যে শঙ্খ চৌধুরীর মতো সৌন্দর্য স্রষ্টা মানুষ, অমিয় চক্রবর্তীর মতো স্নিগ্ধ আর গভীর-স্বভাব কবিব্যক্তিত্বের সৌরভ। আছে শোভনলাল আর পুলিনবিহারীর সানন্দ সুন্দর সংসারবিস্মৃত মুহূর্তের ছবি। আর আছে দাতারাম। এমন অসাধারণ সাধারণত্ব দাতারামের যে লেখকের এ মন্তব্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে—"এই হলো আরেকরকম মানুষ। মানুষ যেমন হতে পারত। মানুষ যেমন হবার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে আমরা এমন হলাম কেন?" এই পর্যায়ের সব লেখাগুলি মেলালে এক অন্তরময় মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের রেখারূপের দেখা পাই। জার্নালে জটিলতা থাকে না—থাকে জটিলতার আভাস মাত্র। ব্যক্তিপাত্রগুলিরও সমগ্রস্বরূপ এখানে লেখকের অনুসন্ধেয় নয়, তা যেটুকুতে যেখানে যেখানে আস্বাদ্য হয়েছে এ লেখায় শুধু সেটুকুরই সঞ্চয়।

দ্বিতীয় ধরনের লেখাগুলিতে ছায়া ফেলেছে কিছুকাল আগের বন্যার মতো শোচনীয় ঘটনা। 'কালোসময়' লেখাটিতে একজন সৎ সামাজিকের বেদনার প্রগাঢ় মূর্তি। দারুণ দুর্দশায় বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর একটা ব্যাকুলতা আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। স্বদেশচিন্তা এখানে কবিকে আচ্ছন্ন করেছে।

তৃতীয় ধরনের লেখাগুলির মধ্যে পড়ে "কবিতার ভাষা" 'বিশ্বাস-অবিশ্বাস'। 'আধুনিকতা', 'চীনে কবিতা আর রবীন্দ্রনাথ', 'বই লুকাচ', 'বই : টলস্টয় আর সিনক্লেয়ার', 'উইল ডুরান্ট', প্রভৃতি। জীবনানন্দ কতখানি ব্যক্ত করেন? তাঁর শেষদিকের কবিতার সামাজিক দিক কতটা অর্থবহ? কোথায় মালার্মে ও এলিয়টের সঙ্গে তাঁর অমিল—অথবা রবীন্দ্র প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদারের প্রশ্ন—অবিশ্বাসীরও কেন ভালো লাগবে বিশ্বাসের কবিতা—এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কবিতার আপাতধর্মীয় লেখার আড়ালে ভিন্ন মাত্রার সন্ধান—এই সমস্ত নিবিড় ভাবনায় মুখ্য হয়ে ওঠে। ভাবনার স্রোত বেয়ে চলে যেতে যেতে তিনি যখন আধুনিকতার চরিত্র নির্ণয়ে বলেন, 'দ্বিধাপন্ন মানুষের আর সমাজের নির্যাস (essence)-টাকে তুলে ধরাই আধুনিকতার চরিত্র'—তখন আমরা একটা বিতর্কের সূত্র অথবা ছুতো পেয়ে যাই। সাম্প্রতিক আধুনিকতার একটা চরিত্র কি এই নয় যে, শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী ক্রমবর্ধমান অনন্বয়ের হাত থেকে মানুষকে তথা ব্যক্তিকে

মুক্তিদানের চেষ্টা? গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির ঘন সংহত রূপকৃতি ব্যক্তির—নিঃসন্দেহে আধুনিক ব্যক্তির অনন্বয়ের বেদনাসঞ্জাত প্রতীক্ষার মূর্তি—চরিতার্থতার জন্য প্রতীক্ষা। আধুনিকতা শীর্ষক লেখাটির মধ্যে আমরা আলোচ্য লেখকের একাধিক পরিণত প্রবন্ধের ভাবনাবীজ প্রত্যক্ষ করি। কোনও কোনও লেখায় মধ্যবিত্তর জীবনের আত্মকেন্দ্রিক লক্ষ্যসর্বস্বতার স্বরূপকে লেখক তুলে ধরেন এই ভাষায়—"আমরা কেবল না এর দিকটাকে বড়ো করে তুলেছি, ইতির দিকে ভর আমাদের কম। করার দায়িত্ব নিতে নিজেদের আমরা তত প্রস্তুত করিনি, না করার সুযোগ নিতে যত। আমরা দাবি করেছি, কিন্তু দায় নিইনি। আমরা সমালোচনা করেছি কিন্তু সৃষ্টি করিনি।" আজ শঙ্খ যে ভাষায় কথাগুলি বললেন, এ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও একই ভঙ্গিতে এই মধ্যবিত্ত জীবনসম্ভব কপটতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এই জার্নালে ভাবনানুষঙ্গে বারে বারে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। সকৌতুক আত্মসমালোচনা করেছেন শঙ্খ—"যে কোনো কথা থেকেই রবীন্দ্রনাথে গড়িয়ে আসবার এই অভ্যাসটা ভালো না।" হায়, তিনি যদি জানতেন, তিনি যেটাকে মন্দ বলছেন, আমরা তাঁর সেই 'দোষ'-টাকেই ভালোবাসি! কেননা এর ফলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে নানা মাত্রায় দেখার সুযোগ পাই। স্বপ্নের প্রসঙ্গে বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ, উপায় আর লক্ষ্যের আলোচনায় 'বিসর্জন' নাটকের জয়সিংহ, বৃষ্টিদিনে তো বটেই, এমন কি, নিবিড়সম্বন্ধ দম্পতির ভালোবাসা প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ। রিল্‌কে ও ওয়ালেস স্টিভেন্স প্রসঙ্গে তো রবীন্দ্রভাবনা অনিবার্য হয়েছেই। এর ফলে একটা ব্যাপার ঘটে, রবীন্দ্রনাথ আর কেতাবি ব্যাপার থাকেন না। তিনি যে সগৌরব স্মৃতিপট মাত্র নন—চলন্ত সঙ্গী, সে কথা প্রমাণিত হয়। আর সব থেকে বড়ো কথা—এটা একজন প্রধান আধুনিক কবির মনের কথা। এর গুরুত্ব আলাদা।

বইটিতে শেষে সংযুক্ত হয়েছে কয়েকটি লেখা—যারা স্বধর্মে জার্নাল নয়। গোপাল হালদারের ত্রিদিবার আলোচনায় ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্যকে শঙ্খ ঠিক প্রেক্ষিতে ধারণ করেন। জীবনানন্দ বিষয়ক দুটি লেখার মধ্যে শঙ্খ দেখিয়েছেন জীবন সম্বন্ধীয় কোন্ নৈতিক সচেতনতায় জীবনানন্দ ছিলেন ধৃত ও বিশিষ্ট। এই লেখাগুলি অবশ্যই প্রবন্ধ-বীজ। জার্নালের অন্য লেখাগুলিতে আমরা যেমন সখ্যসম্মিত আলাপে সহৃদয় হৃদয় সংবাদ পাই, এ লেখাগুলির দেয় তা থেকে পৃথক।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫ নভেম্বর ১৯৮৫

অরুণকুমার সিকদার

শঙ্খ-কে, জন্মদিনে

কবির বয়স বাড়ে না। জগৎ তাঁর কাছে নতুন থাকে, তিনি সব সময় পৃথিবীকে নতুন করে দেখান। শিশুর চোখে এই দুনিয়া যেমন সদ্যোজাত, কবির চোখ দিয়ে দেখলে পৃথিবীকে তেমনি নিত্যনতুন লাগে। আর তাছাড়া কবির কাজ গোষ্ঠীর ভাষাকে অমলিন রাখা। ব্যবহারে ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ হয় শব্দ বাক্‌বন্ধ উপমা; ক্লিশের ক্লিষ্টতায় খচিত হয়ে ভাষা হয়ে যায় ম্রিয়মাণ আর পঙ্গু। সেই ভাষা কবির হাতে সজীব সপ্রাণ আর টাটকা হয়ে ওঠে। তাই কবির বয়স বাড়ে না। কিন্তু যে শরীরকে আশ্রয় করে কবিত্বের বিভা প্রকাশ পায় সেই শরীরের তো বয়স বাড়ে। পেশী তেমন সটান থাকে না, ধমনী-শিরায় রক্ত চলাচল তেমন নির্বাধ থাকে না, চোখে চশমা ওঠে, চালসে পড়ে; কবিরও হঠাৎ হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়। শঙ্খ, ১৯৬৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তুমি আমাকে লিখেছিলে 'দুদিন আগে চৌত্রিশ বছর পুরো করে এলাম, চল্লিশের দিকে এগুচ্ছি ভাবতে হাত-পা হিম হয়ে আসে…' এই ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তোমার বয়স যখন অর্ধ-শতাব্দী পূর্ণ হয়ে গেল, তখন কি তোমার হাত-পা সব হিম হয়ে আসে? মনে হয় তা আসেনি। যৌবন যখন চলে যেতে চায়, দূর থেকে বিদায়ের রুমাল ওড়ায়, তখন আমরা ভয় পেয়ে যাই। কিন্তু সেই চলে যাওয়া এক সময়ে মেনে নিই আমরা; আত্মস্থ হই, চারিদিকের সঙ্গে, বয়সের সঙ্গে একটি বোঝাপড়া অজানতে ঘটে যায়। একটা কারণ হয়তো চতুর্দিকে মৃত্যুর পদাঘাত বড়ো স্পষ্টভাবে শোনা যায়—'সে যে আসে, আসে, আসে।' চলে যায় কতোজন—খুকু ও বৌদি, শচীন-দিনেশের মতো বন্ধু, চারুর মতো পরিচারিকা—১৯৭৮ সালে দিনেশের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি তাই লিখেছিলে, 'মৃত্যু বেশ ভালো রকমেই ঝাপটে ধরেছে আমাদের।' মৃত্যুর নিত্যনৈমিত্তিক অস্তিত্বই বয়সকে মেনে নিতে আমাদের পরামর্শ দেয়। তাছাড়া যৌবনে যৌবনই একমাত্র সম্পদ, তাই যৌবনকে হারাতে ভয় পাই। কিন্তু পঞ্চাশে পৌঁছে যিনি দেখেন—তবু শূন্য শূন্য নয়—ত্রিরিশ বছর ধরে তিলে-তিলে তৈরি হয়ে উঠেছে এক বাঙ্ময় পূর্ণতা, খেত ভরে উঠেছে ধানে, তিনি তো সময়ের বিরুদ্ধে রচনা করে ফেলেছেন এক সমর্থ প্রতিরোধ। বয়স বাড়ায় তাঁর কোনো বয়স বাড়ে না—কবির। কারণ, তাঁর রচনার বয়স বাড়ে না। শব্দের এক অমর ভঙ্গিমায় তারা নিত্যনবীন।

শঙ্খর কথা আজ তার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে যখন ভাবি তখন তো শুধু কবি শঙ্খ ঘোষের কথাই ভাবিনা, ভাবি আমার সমান বয়সী ত্রিশ বছরের বন্ধুর কথা। একই এম. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলাম আমরা, তবু ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রথমে ক্লাসের বাইরে। কিরণদা, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগারের বইয়ের তালিকা তৈরি করেছিলাম আমরা দু'জনে। যে-সময়ে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত তার 'যমুনাবতী' নিয়ে খুব সাড়া পড়ে গিয়েছে সেই সময় আমার যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছে তাদের শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের দোতলার একঘরের বাসায়। বৃদ্ধা ঠাকুমার নামাবলির মতো ঘুঁট দেয়াল, সেই ঘরের দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে। 'যে দেয়ালেই চোখ পড়ে তার সে দেয়ালেই ক্ষয়।' এক কোণে তার পিতৃদেব মণীন্দ্র-কুমার ঘোষ নিঃশব্দে কাজ করছেন, অন্য কোণে সত্যপ্রিয়দার উৎসাহে ব্রে খেলার আসর জমে উঠেছে, তৃতীয় কোণে বসে হয় আমরা উৎসাহে কলের গান বাজিয়ে গান শুনছি অথবা গল্প করছি। সেই-যে সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেল, আজ ভাবি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান দুজন মানুষের মধ্যে একজন শঙ্খ ঘোষ। তার বিয়েতে আমার ভূমিকাকে বহুগুণে বাড়িয়ে ঠাট্টার ছলে সে লিখেছিল এই বিয়ের জন্য মূলতই দায়ী আমি 'মহাপাতকী'—কারণ জীবনসঙ্গিনী প্রতিমার সঙ্গে শঙ্খর পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলাম আমি। কতো স্মৃতি ভিড় করে আসে—শান্তিসম্মেলনে 'ছেঁড়া তার' দেখে মধ্যরাত পার করে পার্ক সার্কাস ময়দান থেকে পায়ে হেঁটে কলেজ স্ট্রীটে ফিরে আসা, গণেশ এ্যাভেনিউয়ের লাগোয়া ছোট্ট পার্কে রাস্তার আলোয় তার 'সংবর্ত' কবিতা পড়া, বৃষ্টির মধ্যে ময়দান দিয়ে র‍্যামপার্টের দিকে হেঁটে যাওয়া, যে অভিজ্ঞতার রূপান্তর ঘটে যায় বর্ষামেদুর 'হোম করে নাও' কবিতায়। অথবা নারকেলডাঙ্গা রেলোয়ে কালোনির বাড়ির চিলেকোঠায় তার একমাত্র ছোট গল্প শোনা। ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাসায় দিন দশেকের জন্য অগোছাল দিন যাপন করে দুই যুবা—পত্রিকার খাতা ঢাখে আর 'সপ্তসিন্ধু দশ-দিগন্ত'-এর অনুবাদ সম্পাদনা নিয়ে নানা ভাবনা ভাবে—একজন প্রোষিত-পত্নীক, অন্যজন তখনো অবিবাহিত। জলপাইগুড়ির বাড়িতে সারা দুপুর ধরে বিরতিহীন গুঞ্জন, শিলিগুড়িতে পথের ধারের দোকানে দাঁড়িয়ে রেডিয়োয় মোহন-বাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলার ধারাবিবরণী শোনা অথবা পথের ধারের বাড়ির বারান্দায় বৃষ্টির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে একসঙ্গে কাজ, অস্থায়ী বাসার বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে অঝোর বর্ষার বিখ্যাত উদ্দামতা ঢাখা, অথবা জ্যোৎস্নারাতে সুকণ্ঠী গায়িকার গান শোনা। এই সেদিন 'আক্রোশ' ফিল্মের শেষার্ধ দেখে ভাঙা খোঁড়া সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে পৌঁছনো গেল বিবেকানন্দ রোডের সেই চায়ের দোকানে, যেখানে ন্যাড়া দরিদ্র টেবিলে একদিন লেখা হয়েছিল 'ভূমধ্যসাগর' কবিতা। আর তারই গলায় আমার এই

প্রিয় কবিতাটি যখন ক্যাসেট থেকে মুক্তি পেয়ে গমগম করে উঠছিল বিধান শিশু-উদ্যান সংলগ্ন ফ্ল্যাটে তখন শঙ্খ প্রতিমা স্বামীস্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল এই ছবি আমৃত্যু আমার বুকের মধ্যে বেঁচে থাকবে। আর দেখা হলেই গল্প-গল্পচর্চা-হাসি আর কুশলবিনিময়ের মধ্যে চালাচালি হয়েছে সাহিত্যের কথা, কবিতার কথা—কে কী লিখছে তাই শুধু নয়; কেন লেখা, কেমন করে লেখা, লেখার তাৎপর্য, তার মাধ্যম, তার গড়নধরণ সব কিছুই। আমি নিজে যা লিখতে পেরেছি সেও মূলতঃ তারই জন্যে। আর দুজনে দুজনের রচনা সম্বন্ধে নির্লিপ্ত সমালোচনা করতে পেরেছি। কোনোদিন এক লহমায় এই ভাবনা মনে জাগেনি যে বন্ধুত্ব আহত হতে পারে।

মানুষটিও ঈষৎ আলাদা। সুখী পরিবার তার, কিন্তু সে আত্মতৃপ্ত গৃহস্থ নয়। কনজ্যুমারিজমের চিহ্ন তার সংসারে নেই। পোষাকে আশাকে পরিপূর্ণ বাঙালি, চিন্তাভাবনায় পরিপূর্ণ আধুনিক মানুষ—যে মানুষের চিন্তা-অনুভূতি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে স্পন্দিত হয়। সৃজনশীল সমস্ত শিল্পজগতের সঙ্গে তার নিত্য সংযোগ। তার কাছে যারা আসে তারা লেখে বা লিখতে শিখছে, গান গায়, ছবি আঁকে, নাটক করে, ফিল্ম তোলে। অল্পবয়সীদের সে সমকক্ষের মর্যাদা দেয়। চাকরি বা গোপন মসলিনে মসৃণ প্রমোশন নিয়ে চর্চা সেখানে হয় না বললেই চলে। সাহিত্য বা শিল্পজগৎ নিয়ে চর্চায় নিন্দামন্দ হয় না বললে মিথ্যে বলা হবে, কিন্তু তার মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে কৌতুকবোধ। বিখ্যাত তার সৌজন্য। ব্যক্তিগত আবদারকে, অনাহ্য আবদারকেও সে না বলতে জানে না। অবুঝ আগন্তুকের জন্য খাবার জুড়িয়ে যায়, অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা কাজের পরিকল্পনা বিশৃঙ্খল হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়; ভিতরে-ভিতরে যে যতোই উৎকণ্ঠ হয়ে উঠুক বাইরে সে সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যরহিত থাকে। যতোদিন সে ছিল শহরের নাভি আলগা খোলা শ্যামবাজারে ততোদিন সে অভ্যাগতকে পৌঁছে দিত বাস বা ট্রাম ষ্টপ পর্যন্ত লোডশেডিঙের রাতে টর্চ হাতে। প্রায় ভোরে দরজার ঘন্টা বেজে ওঠে—হয়তো হায়াৎ মামুদ ঢাকা থেকে মস্কো যাবার পথে দেখা করতে এসেছেন। বহু মানুষের আনাগোনা। সিনেমা থিয়েটার আড্ডা গান রিভিয়ু কিছুই বাদ যায় না; হয়তো খানিকটা বাদ যায় সাংসারিক কর্তব্য। শরীরও সব সময় ভালো থাকে না। কখন সে পড়ে, কখন সে লেখে, ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। ট্রামে বাসে মনে-মনে চিন্তাগুলো গুছিয়ে নেয়, প্রবন্ধ লিখতে হলে সে হয়তো বাড়ি থেকে পালিয়ে অন্য বাড়িতে আশ্রয় নেয়, হাসপাতালে অথবা খবরের কাগজের দপ্তরে বসে লিখে ফেলে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে সে না বলতে পারে না, কিন্তু নীতিগত ব্যাপারে খুব নম্র ভঙ্গিতে অথচ অনমনীয় ভাবে সে না বলে। উচ্চতর পদমর্যাদার হাতছানি তাকে অবিচলিত রাখে,

বিদেশ যাত্রার অভিজ্ঞতা তার জীবনযাত্রায় তিলমাত্র ছায়াপাত করে না। যা তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তাকে বিনীত নম্রতায় ফিরিয়ে দিতে জানে। তার সমস্ত আচরণ ও কার্যকলাপের মধ্যে এক বলীয়ান ইনটিগ্রিটি অনুভব করা যায়। খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও, আজকের ভাষায় 'Public place'-এও তার 'Private face' কখনো মুখোশে পর্যবসিত হয় না।

আমাদের দেশে খুব জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সাহিত্যের উপর জীবিকা হিশেবে নির্ভর করা সম্ভব নয়। মাত্র সেই কারণেই শঙ্খ কিন্তু শিক্ষক নয়। সাহিত্য থেকেই জীবনযাপনের ইন্ধন জুটে যায়, এমন অসম্ভব ঘটনাও যদি ঘটে যেতো, আমার মনে হয়, তবু সে শিক্ষকতা ত্যাগ করতো না। কলকাতাকে যেমন তার চাই, ছাত্রদেরও তেমন তার চাই। তাই জঙ্গীপুর, বহরমপুর, আইওয়া, দিল্লি, শান্তিনিকেতনে সে কিছু কিছু সময় কাটায় বটে, কিন্তু তাকে ফিরে আসতেই হয় কলকাতায়। বাইরে গিয়ে চাকরিগত উন্নতির সম্ভাবনা তাকে যে উপেক্ষা করতে হয়, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই অপ্রতিরোধ্য কলকাতার আহ্বান। শিক্ষকতাও তাকে করতেই হয়। কারণ, নিজের সাহিত্যবোধকে সে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায়। অন্যদিকে, প্রাণবন্ত ছাত্রছাত্রীর সাহচর্যে নিজের মনের তারুণ্যের শিখাকে সে দীপ্ত রাখতে চায়। তরুণ ছাত্রদের সংসর্গ তাকে তাপ। মাষ্টারির নিরাপদ দুর্গে অনেকেই জীবন থেকে সরে এসে আশ্রয় নেয়; মাষ্টারি তেমন দুর্ভেদ্য দুর্গও নয় তার পক্ষে। শিক্ষকতা তার কাছে অনেক জীবন্ত, অনেক প্রাণময়। তাই শিক্ষকতা থেকে জীবনায়ন, জীবনায়ন থেকে কবিতায় চলাচল সে এতো সাবলীলভাবে করতে পারে। ক্লাসঘরের মধ্যে কেমন সে পড়ায়, কতোটা উঁচুদরের শিক্ষক সে, তা আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি না। পরোক্ষভাবে জানি, তার শান্তিনিকেতনের বক্তৃতার সুখ্যাতি থেকে, পরীক্ষার্থী ছাত্রদের খাতা থেকে। বুঝতে পারি কতোটা নিয়মিত নিষ্ঠায় সে নিজেকে অধ্যাপনার জন্য প্রস্তুত করে। সেই উঁচুমান বেশি লোক ছুঁতে পারেন বলে আমার মনে হয় না। বাইরে কোনো কাজে নিয়ে গেলে শর্তই থাকে ক্লাসের সময় ঠিক তাকে পৌঁছে দিতে হবে। ক্লাসঘরের বাইরেও শিক্ষকের দায় থাকে, সেই দায় তাকে সানন্দে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে দেখি। কোনো সময় এই ভাবনা তার মনে আসে না যে এই সব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার সময় নষ্ট হচ্ছে। তার শিক্ষকতার আদর্শ গড়ে উঠেছে, আমি অনুমান করি, তার পিতৃদেবের ছাঁচে। ক্লাসের বাইরে তার শিক্ষকমূর্তির চমৎকার নমুনা পেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী উপলক্ষে। তুমি কফিহাউসে বসে ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দিচ্ছিলে, সমস্ত পরিকল্পনা রচনা করছিলে তাদের

সহযোগিতায়। পোষ্টারের জন্য উপযুক্ত উদ্ধৃতি খুঁজছিলে, কিছু নিজে রচনা করছিলে। বাড়ি থেকে স্তূপাকার লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গিয়েছিলে ছাত্রদের সঙ্গে। সেই নিয়ে যাওয়ার গল্পটাও হয়েছিল চিত্তকার্ষক। ইদানীং প্রায়ই যখন দেখি পড়ানো ব্যাপারটা এবং ছাত্রছাত্রীদের অস্তিত্বকে বর্জনীয় নুইসেন্স বলে গণ্য করা হয়, তখন এই অনায়াস নিষ্ঠা মুগ্ধ করে।

শঙ্খ পণ্ডিত হতে চায়নি, পণ্ডিতিকে বরং সে ভয় পায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞের পাণ্ডিত্য তার নেই একথা মনে করলে খুব ভুল করা হবে। যে বিষয় সে জানে, সে তন্নতন্নভাবে জানে—তার তথ্য ও তত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে তার আয়ত্তের অধীন। আসলে দুর্বিনীত পণ্ডিতের মতো কোনো পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী সে সাজায় না। যে স্কলারশিপ বিনা সমালোচনা হয়ে পড়ে ভাসা-ভাসা সুভাষিতাবলী, নিতান্ত ইম্প্রেসনিষ্টিক আয়োজন, সেই স্কলারশিপের অস্তিত্ব তার সমালোচনা প্রবন্ধের অন্তরালে অনুভব করা যায়। এই স্কলারশিপই তার সমালোচনার মেরুদণ্ড। রচনা সংক্রান্ত প্রারম্ভিক সব তথ্য, সনতারিখের পরম্পরা, অন্যান্য রচনার সঙ্গে মিলনতুলনা, রচনাটির নিহিত পাঠগত বিশ্লেষণ—এই সবের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তার সমালোচনা, যদিও লিখিত সমালোচনার পিছনের সেই স্বেদচিহ্ন নজরে পড়ে না। সে খেয়াল করতে ভোলে না যে 'গীতাঞ্জলি' বইয়ের ৮৫টি মাত্র রচনায় সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বাকি ৭২টি কবিতায় দেননি; হিসেব করে চাখে 'মুক্তধারা'-র পর, 'চিরকুমার সভা' ও 'তাসের দেশ' বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাটকে গানের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে; সুবীন্দ্রনাথের ১৩০টি কবিতার মধ্যে ৯০টি অক্ষরবৃত্তে, ৩০টি মাত্রাবৃত্তে এবং ১০টি মাত্র স্বরবৃত্তে লেখা। ইচ্ছে করলে সে-ও প্রচুর পাদটীকা ভারাক্রান্ত গবেষণাপত্র লিখতে পারে। প্রমাণ, রবীন্দ্রশতবর্ষে প্রকাশিত 'নাটকে গান, রবীন্দ্রনাথের নাটক' প্রবন্ধটি, যদিও প্রবন্ধটির পরবর্তী প্রকাশনায় পাদটীকাগুলি অপসারিত করা হয়েছে। আরো প্রমাণ 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি। সেখানে পাই বিপুল সংখ্যক তথ্যাবলীর উপর পরিপূর্ণ অধিকার আর সেই তথ্যাবলীর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মতো অমোঘ বিশ্লেষণ দক্ষতা। একটা উদ্ধৃতির জন্য তাকে খুঁজে নিতে হয় গ্রন্থের মহাকায় উপন্যাসের বিপুল সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলি নিপুণ নিষ্ঠায়, এমন কি হাওড়া স্টেশনে কারো জন্যে অপেক্ষা করতে করতে। ইংরেজিতে On the Edges of Time-এ যেখানে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৯২০-র চার বছর পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাম্পোর দেখা, সেখানে ঐ বইয়ের অনুবাদ 'পিতৃস্মৃতি'তে লেখা হয় ছয় বছর পরে, কিন্তু সে দেখায় সেই সাক্ষাৎকার ঘটে দশ বছর পরে। তথ্যের উপর সার্বভৌম অধিকার থাকলেই অন্যের তথ্যাবলীর বিভ্রম সহজে ধরতে পারা যায়। অন্তত রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্যের তথ্য

বিষয়ে তার অধিকার প্রায় পুলিনবিহারী সেনের প্রতিস্পর্ধী। তার কাছে অনেক সময় প্রভাতকুমারের মতো রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞকেও হার মেনে যেতে হয়। তার অনর্গল প্রমাণ আছে 'উর্বশীর হাসি' বইতে। এই বইয়ের রিভিয়ু করতে গিয়ে তাই কবি শঙ্খ ঘোষের ঘর্মাক্ত গবেষকে অধঃপতন ঘটবে কিনা এই ভেবে সন্তোষকুমার ঘোষ ছদ্ম-আতঙ্ক বোধ করেন। পণ্ডিতি কাজের একটা হল সম্পাদনা। সেই সম্পাদনা কুশলতার প্রমাণ শঙ্খ যেমন 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'-এ দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী'-তে। শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকা—গ্রন্থপ্রসঙ্গ যে কুশলতায় রচিত হয়েছে তা আধুনিক সাহিত্য সম্পাদনার ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। 'অবনীন্দ্র রচনাবলী' ও নতুন 'রবীন্দ্ররচনাবলী'-র সম্পাদনাতেও তার সুপরামর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়, অবিসংবাদিত যোগ্যতার জোরেই।

শঙ্খ এই সময়ের একজন রবীন্দ্রসমালোচকও। তাই তার মধ্যে যেন মিশে গেছে পুলিনবিহারী সেন ও প্রমথনাথ বিশীর যোগ্যতা। সে দেখিয়েছে, শিকড়ের সন্ধানী রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে কীভাবে কতো জীবনের স্পন্দন এনে ফেলেন, করেন জাতীয় সত্তাকে আবিষ্কার। সে দেখায়, পথ কীভাবে পটভূমি থেকেও উত্তীর্ণ হয় প্রতীকে। নাটকের গান ও গানের নাটককে মেলায় নৃত্যনাট্যের নাচে। রবীন্দ্র-নাটকে সময়বোধের ব্যবহার সম্পর্কে বেশ কিছু মৌলিক ভাবনার পরিচয় আছে তার প্রবন্ধাবলীতে। নাটকে এক সময় কালই হয়ে ওঠে নাটকের বিষয়; পরে তাই নাটকের রূপ বা গড়ন। কোথায়ও আবদ্ধ কালের সংহতি, কোথায়ও বা আপাত-সংহতির মধ্যে প্রসারিত মুক্তি। প্রত্যক্ষকাল থেকে ধারণাকালে যাওয়া-আসায় গড়ে ওঠে সুন্দরের বোধ। পরিবারহারা পরিচয়হারা মানুষের মধ্যে ধরা পড়ে সময়ের বিষাদ। রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনায় তার সমালোচনা স্বতন্ত্র স্তরে উঠে যায়—বিশ্লেষণ পৌঁছে দেয় সংশ্লেষণে। রবীন্দ্রনাথের গান নিবিড়তম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায় আমাদের, নিয়ে যায় এক অদীন ভুবনে। তাই আধুনিক মানুষের পক্ষেও এই গান এত গভীরভাবে আস্বাদ্য। ধর্মচেতনা বা ঈশ্বরমুগ্ধতার দরকার হয় না তার জন্যে। 'তুমি' যে পরম তার কাছে আত্মনিবেদন এই গানে; এই গানে নিজেকে জানার অভিযান, আত্ম-নির্ভরতার যাত্রা। বিরামহীন আত্ম-জাগরণ ও আত্মদীক্ষার গান রবীন্দ্রসংগীত। শঙ্খ দেখায়, 'গীতাঞ্জলি' একটি সংকলন মাত্র নয়, তার মধ্যে একটা নিহিত প্যাটার্ন আছে। মেদ-ঝরানো সারাৎসার আর নিরলঙ্কার এই কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর বাইরের আবেগের প্রস্রবণ, আর গান তাঁর ভিতরের দিকের ক্ষরণ—'গীতাঞ্জলি'-তে এই দুই পরম সুষমায় মিশে গেছে। এই বইয়ের ভাষায়, উপমায়, সত্তায় নীরবতা—কেননা তার মধ্যে আছে কবির সত্তার গোপন পরিচয়। 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'-র সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র

স্বাতন্ত্র্য ও সম্পর্ক নিবিড় বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তি ও পরমের সম্পর্কের তিনটি স্তর, তিন অঙ্কের একটি ছোটো নাটক যেন আমরা পেয়ে যাই এই তিনটি গীতার্ঘ্য গ্রন্থে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত, রবীন্দ্রনাথের কাছে ভালোবাসা তিন শব্দের যোগ : তুমি আমি আর গান। আর গানের মধ্য দিয়েই তিনি ভুবনখানি দেখেন বলে গানেই মেলে তার তাদাত্ম্য, সৃজনশীল রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড ডিজাইন। আর রবীন্দ্রনাথের গানের নীরবতা, সত্তার সন্ধান, আত্ম-আবিষ্কারের অভিযান তর্জনী নির্দেশ করে শঙ্খর নিজের কবিতার দিকে। তাই এই সমালোচনা যতোটা রবীন্দ্রনাথের গরজে, ঠিক ততোটা আলোচকের নিজের গরজে। গানের আলোচনায় এসে যায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথা, 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধটির কথা, 'চতুরঙ্গ'—'ঘরে বাইরে' 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কথা। এসে যায় কীর্কেগার্ড, ভালেরি, মালার্মে, রিলকে, পাস্কালের মতো দার্শনিক ও কবির কথা। শঙ্খর সমালোচনা তথ্যভিত্তিক, টেক্সচুয়াল, কিন্তু তথ্য ও পাঠের সীমাকে পেরিয়ে আত্মোপলব্ধির দিকে, বোধির দিকে নিয়ে যায় এই সমালোচনা। তার রবীন্দ্র-আলোচনার গভীরতম প্রকাশ আমরা হয়তো পেয়ে যাবো যখন একজন আধুনিকের চোখে রবীন্দ্র-স্বরূপ উন্মোচিত হবে, যার প্রথম আভাস আমরা পেয়েছি 'বারোমাস' পত্রিকার 'নিজের মুখের ছবি' প্রবন্ধে। অথচ কোথায়ও ভক্তির অন্ধতা নেই, রবীন্দ্র-অনুরাগে পূজার আচ্ছন্ন আবেগ অনুপ্রবেশ করেনি। কিন্তু শুধু রবীন্দ্র-সমালোচক হিসেবে সে কৃতী নয়, আধুনিক কবিতারও সে একজন প্রধান আলোচক। তার 'ছন্দের বারান্দা' প্রবোধচন্দ্র সেন বা অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের মতো ছন্দের গণিত নয়, তার মধ্যে বিশ্লেষিত হয়েছে ছন্দের শীলনমূর্তি। কাকে বলে আধুনিক ছন্দ, বাক্‌ছন্দ, ছন্দস্পন্দ, ছন্দের মুক্তি বলতে কী বোঝায়, এইসব তার ভাবনার বিষয়। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার আশ্চর্য বিশ্লেষণ শুধু অবনীন্দ্রনাথের আলোচনায় বদ্ধ থাকে না, সেখানে দেখানো হয় গদ্য কীভাবে ভিতর থেকে বাইরের দিকে চলে আর কবিতার চলন বিপরীত। জীবনানন্দের ছন্দের আপাত শৈথিল্যের মধ্যে সে আবিষ্কার করে ব্যক্তিগত ছন্দ—নামটাও তারই দেওয়া। এই ব্যক্তিগত ছন্দ কীভাবে খুঁজে নেন সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে বা বুদ্ধদেব বসু এই বই তারই আলোচনা। এই আলোচনা তাই শুধু ছন্দের আলোচনা নয়, ছন্দের সূত্রে কবিতার মর্মের আলোচনাও বটে।

কিন্তু শঙ্খর সব চেয়ে বড়ো পরিচয় তো কবি হিসেবে। তার সমস্ত স্বতন্ত্র মনীষার সেখানেই পূর্ণতার ডিজাইন। উনিশ'শ তিরিশে যে আধুনিক বাঙলা কবিতার শুরু আজ পঞ্চাশ বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়ে তার মধ্যে, মনে হয়, দুটো পৃথক তরঙ্গ সনাক্ত করা চলে—প্রত্ন-আধুনিকতা আর নব্য-আধুনিকতার তরঙ্গ। তিরিশের

প্রত্ন-আধুনিক কবিদের রচনায় পশ্চিমী আদলের ছাপ স্পষ্ট। পশ্চিমী মডার্ন গুরুদের আদর্শ সামনে রেখেই তাঁদের অগ্রগতি। একথা বলার অর্থ অবশ্য তাঁদের অবিসংবাদিত প্রতিভার মৌলিকতা অস্বীকার করা নয়। পঞ্চাশের দশক থেকে পশ্চিমী প্রভাবমুক্ত স্বাবলম্বী নব্য-আধুনিক কবিতার আত্মপ্রতিষ্ঠার আরম্ভ। রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে এই ঘটনার একটা সমাজতাত্ত্বিক যোগসূত্র থাকতেও পারে। চল্লিশের দশকের সমাজসচেতন কবিতা (যেখানে সমাজ-সচেতনতার অর্থ সামাজিক মানুষ হিসেবে যা অভিপ্রেত মনে হয় তাই কবির উপর আরোপ করা) এই দুই তরঙ্গের মধ্যে যেন যোজকের কাজ করছে। পঞ্চাশের দশকে যখন এই নতুন তরঙ্গের সূত্রপাত তখন কতো কবির ভিড়। মুহূর্তে বিশ-পঁচিশ জন কবির নামের তালিকা রচনা করা যেতো। আজ তিরিশ বছরের ব্যবধানে দুটো নামই মাত্র একসঙ্গে উচ্চারণ করা চলে—শক্তি চট্টোপাধ্যায়, স্বভাবকবি, 'sheer poet' এবং শঙ্খ ঘোষ। যাকে আমি নব্য-আধুনিক কবিতা বলছি তার পোয়েটিক্‌স্ শঙ্খ রচনা করেছে 'নিঃশব্দের তর্জনী' বইতে। শব্দের যখন অবমূল্যায়ন হয়েছে বাণিজ্যে, বিজ্ঞাপনে, প্রচারে, মিডিয়ায়, তখন কবিকে 'লিখতে হবে নিঃশব্দে কবিতা এবং নিঃশব্দ কবিতা।' বাক্যের মধ্যে এনে ফেলতে হবে অবাচ্যকে। 'নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায়।' আর কবিতা খোঁজে কবির অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বর—স্বরভঙ্গি বা tone-এর মধ্যেই বজায় থাকে কবির ব্যক্তিগত ছন্দ, তার ছন্দমাত্রা। নিজের সময়ের কবিদের অভীপ্সা ও উদ্দেশ্যের কথাও বলে বটে, কিন্তু এই বইয়ের সূত্রগুলো অন্য কবিদের পক্ষে পুরো সত্য না হোক, শঙ্খর কবিতাকে চিনতে ও বুঝতে খুবই সহায়ক।

'দিনগুলি রাতগুলি'—শঙ্খর প্রথম সংকলনের কবিতাগুলি অবশ্য নিঃশব্দ কবিতা নয়। তার মধ্যে শব্দবিলাস শব্দের উল্লাস অনেক বেশি। আঠারো থেকে বাইশ বছরের লেখা কবিতায় সেইটেই স্বাভাবিক—কবিতাগুলি যৌবনের উত্তাপে লেখা, প্রেমের উষ্ণতায় লেখা। সেখানে 'বদ্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা'-কে অতিক্রম করে 'রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।' ছন্দ নিয়ে, শব্দ নিয়ে, সে এক তুমুল পরীক্ষার সময়—প্রথম পদক্ষেপের উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা, উল্লাস, সবই তার মধ্যে আছে। আর আছে হৃদয়ের মধ্যে ধানে-গানে পরিপূর্ণ বসুধাকে, তার অপার ভালোবাসাকে টেনে নিয়ে আসা।

দুচোখ ভরা স্নেহের প্লাবন, শূন্যে নাচে প্রাণের মুঠো,
বাঁধনহারা কাঁপন তেলে উদাসী দিনরাত্রি দুটো— ।

প্রথম বইটি পড়ে শঙ্খকে যা লিখেছিলাম তার উত্তরে শঙ্খ জানিয়েছিল (২৫ মে, ১৯৫৭) 'আমার কবিতার এমন বিশ্লেষণ শুনে আমার শরীরের মধ্যে একটা ভয় কাঁপতে থাকে, সমস্ত মন অস্থির হয়ে ওঠে। মনে হয়…তবে একদিন আমি তো তাকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমার মনের উত্তাপে এরা সম্পূর্ণ আবেগে প্রকাশ হতে পেরেছিল। তাহলে সেই সৃষ্টির অশান্ত রক্তিম তপ্ত উজ্জ্বল শক্তিটা কোথায় হারিয়ে যায় ? আমি কি তাকে ধারণ করবার উপযুক্ত !' শক্তি হারিয়ে যায়নি, তুমি যে সেই শক্তিকে ধারণ করার যথার্থই উপযুক্ত তার প্রমাণ দিয়েছো 'নিহিত পাতালছায়া' থেকে পরবর্তী কবিতার বইগুলোয়, বারে-বারে। 'নিহিত পাতালছায়া' থেকেই তুমি তোমার স্বতন্ত্র স্বর খুঁজে পেয়েছো—সেখান থেকেই শুরু হয়েছে তোমার আত্ম-আবিষ্কার। অশান্ত রক্তিম তপ্ত উজ্জ্বলতার পরিবর্তে শুরু হয়েছে তীব্র এক অনুসন্ধান। এই কবিতাগুচ্ছ রচনার আগে-আগেই তুমি আমাকে লিখেছিলে (৩১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮), 'জীবনকে অত্যন্ত প্রসাদের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবার অভ্যাস আমি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি।' একদিকে তাই যেমন চলে আত্ম-পরিচয় খোঁজা, অন্যদিকে প্রখর হয় সমাজবিষয়ে চৈতন্য—অথবা হয়তো দুটো কথা একই কথা। বিশ্বসমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতনতার দরুণ সে মার্কিন-প্রবাসকালে আইওয়া থেকে লেখা প্রত্যেক চিঠিতে ভিয়েৎনাম সম্পর্কে জনসন-কেনেডি-ম্যাকার্থির ভূমিকা বিষয়ে লিখতে ভোলে না, মার্কিন যুবসমাজের যুদ্ধ-বিরোধিতার কথা না জানিয়ে পারে না, কবিতা বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে লেখে, 'বরফজমা শীতের মাঠে প্রতিবাদরত মেয়েদের উপর মুগুর তোলে গণতন্ত্রী পুলিশ'। প্রদেশের রাজনীতি-সমাজনীতি সম্পর্কেও তীব্রভাবে সজাগ থাকে তার মনীষা ও ইন্দ্রিয়। এই সবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিজের সত্তাকে সন্ধান। একদিন ঠাট্টা করে সে বলেছিল, সন্ন্যাসের দিকে তার প্রবণতা আছে। সবটুকুই কি তার ঠাট্টা ? 'সন্ন্যাসী হয়েছ সবটুকু ? / সবটুকু। / ছেড়ে দিতে পারো সব ? রাজি ? / রাজি।' এই সন্ন্যাস কোনো ঈশ্বরমুখী বা কর্মসাধনার সন্ন্যাস নয়, এই সন্ন্যাস সত্তামুখী আত্মানুসন্ধানের সন্ন্যাস। সে খোঁজে অস্তিত্বের মানে : 'থাকা, কেবল থাকা মানেই কি অস্তিত্ব, নাকি তাকে উত্তরণ করেই সেই অস্তিত্বের যথার্থতা ?' আর সবই বলা হয়েছে, বিরল ব্যতিক্রম গণ্য না করলে, অত্যন্ত ইঙ্গিতময় 'শব্দহীন' ভাষায়—নিজেকেই তর্জনী তুলে বলেছে সে, 'এত বেশি কথা বলো কেন ? চুপ করো।' কারণ 'যখনই বলাও কথা তখনই তা মিথ্যা হয়ে যায়।' কিন্তু যদি কেউ ভাবে নীরবতা মানেই শূন্যতা, অভাব, নাস্তি, তবে খুব ভুল হবে—

> শূন্যতাই জানো শুধু ? শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে
> সে কথা জানো না ?

একদিকে বিপুল পৃথুলা পৃথিবী, অন্যদিকে সে তুমি বা আমি এই তিন সর্বনামের নাট্যের মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় সন্ধান। দুইয়ের ডায়ালেকটিক চলতেই থাকে, ঘর আর বাইরের। 'বাড়ি তো পেয়েছি আমি বহুদিন—/ মনে-মনে, / বাড়ি চাই বাহির-ভুবনে।' বিশ্বসংসারকে, বাহির-ভুবনকে বাদ দিয়ে আত্মপরিচয়ও নেই—তাই হাজারদুয়ারি তার ভালোবাসা। সেই ভালোবাসায় সমস্ত আকাশ তাপ রেখে যায়। সেই বাইরের জগতে শাবল হাতে এক পাড়ার বালক দাঁড়িয়ে থাকে, 'অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জেগে ওঠে', বন্যার জলস্রোতে ত্রিজগতি বলকে মিলায়, খুনোখুনিতে মত্ত চারিদিকে যেন যাদববংশীয়েরা, 'যে-কোনো সবুজ ঘাস হাতে নিলে হয়ে ওঠে মুষল মুদ্গর ধ্বংসবীজ', পুলিশ রুল হাতে জানিয়ে যায় ময়দানে অসামাজিক শুয়ে থাকা অবৈধ, সারা শহর জুড়ে নপুংসকের নীর্বীজীকরণের আয়োজন চলে, ধ্যানধন নষ্ট হয়ে যায়, চারিদিকে ইতরতা শুধু পঙ্কিলতা, সাজানো সংসারের দম্পতির আত্মসর্বস্ব বুকের মধ্যে আসলে লাফায় বুড়ো ব্যাঙ। এইসব নিয়ে শাণিত হয়ে ওঠে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ধিক্কার। 'মানুষের চারধারে মানুষ বড়ো বেশি / লাঙুল তুলেছে এ-বসন্তে।' কখনো ছড়া-সর্বস্ব পদ্যময় ব্যঙ্গে কবিতা চরিত্রভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তা বিরল। অত্যন্ত প্রসাদের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে বলে নিসর্গও সন্দিগ্ধ, বিষণ্ণ ও অ-সরল। দৃশ্যময় নিসর্গের মধ্যে আসে রহস্যনীল গাছের বিষাদ, নীরবতাময় জলের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ শুশুক জেগে ওঠে, শুদ্ধ সাঁওতাল দিঘিতে কাউকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা হয়, সনাতন মহানিমগাছ বিকেলের ঝড়ে পড়ে যায়, ঝড়ে-ভাঙা লাইটপোষ্ট একা পড়ে থাকে ধানক্ষেতে, জায়ের রক্তের রঙে রাত্রির আকাশে চাপা রাগ। বাইরে মনে হয় শান্ত নম্র পরিশীলিত পদাবলী, কিন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে বারুদ, আগুন।

এখন লেগেছে বড়ো বেশি ব্যক্তিগত হাওয়া। কিন্তু শঙ্খর কবিতা নিতান্ত ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বের পটে ব্যক্তি সেখানে নিজেকে খোঁজে; সমাজ দৃষ্টিহীন বা বধির জেনেও তাকে এড়িয়ে যায় না। এক দীন আর্তনাদের পুনরুক্তি শুনি, 'কী আমার পরিচয় মা?' দেশের প্রেক্ষায় এই সন্ধান। দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুমচির অন্ধকার, আমার শরীর ভেঙে জেগে ওঠে ভবিতব্য দেশ, দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর, আয়তনহীন এই দশ দিকে আজ আর আমার দুঃখের কোনো ভারতবর্ষ নেই—এই বিষাদময় দেশচেতনা বাদ দিয়ে শঙ্খর আত্ম-আবিষ্কারময় কবিতার কথা ভাবা যায় না। 'আমি চাই আরো কিছু নিজস্বতা'—শঙ্খের কবিতার নিজস্বতা সত্যাশ্রয়ের মধ্যে। কবিতা তার কাছে নান্দনিক বিলাস বা ব্যসন নয়, কবিতাকে সে সত্যের বাহন করতে চায়। তাই বারে-বারে বলে, 'সত্য সে হয়নি বটে, তবুও সত্যের কাছে যেতে চেয়েছিল', 'অন্ধকারে সত্য কথা হোক'—

দিনের বেলায় মুখোশ নালা খুলে
সাহস করে সত্য কথা বল।

সেই সত্য কথা বলার সাহস এমার্জেন্সির অন্ধকারে বা মরিচঝাঁপিতে সন্ত্রাসের দিনে দেখাতে সে ভোলেনি। কিন্তু নিজের কাছে, নিজের সত্যের কাছে পৌঁছুতে গেলে পার হতে হয় অনেক দ্বিধা, সংশয়, অনেক ভুল পদক্ষেপ। 'আমি যদি নষ্ট হই তুমি ব্যাপ্ত করো আর্দ্র হাত'; অথবা এক জায়গায় সে প্রশ্ন করে—

আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?

অন্য জায়গায় সে জবাব দেয়—

তোমার দুখানি পায়ে ফিরে এলে মনে হয়
আমি আজ আমার সমান।

কে এই তুমি? কার আর্দ্র হাত, কার দুখানি পা?—সে কি ঈশ্বরের। 'প্রভু' সম্বোধনের পুনরুক্তিতে সন্দেহ জাগতেও পারে। কিন্তু 'তোমার দেবতা নেই তোমার প্রেমিক শুধু আছে!' 'আজ আর কেউ নেই, মাঝে-মাঝে কার কাছে যাব'—যার কাছে যাবো সে এই প্রেমিক, আপনারই গূঢ় গভীর সত্তা। কিন্তু যেমন সত্যকে তেমনি তাকেও তো অবিশ্বাসে সংশয়ে খুঁজে নিতে হয়। কে কোথায় আছি কে-বা জানে, একবার মনে হয় এতো ছায়াচ্ছন্ন ভালোবাসা ভালো নয়, কখনো-বা মনে হয় সরে যাওয়া ততো ভালো নয়। লোকে ভুলে যেতে চায়, সহজেই ভোলে। 'এতো যে প্রণয় করো, অতীতের জলস্রোত এড়াতে পারো না।' জলপ্লাবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রতীকের পরমার্থতা পেয়ে যায়। 'সকলেই আছে বুকজলে / কেউ জানে কেউ বা জানে না।'—শঙ্খর কবিতাবলী যখন পড়ি তখন বারে-বারে 'আদিম লতাগুল্মময়'-গ্রন্থের 'অঞ্জলি' কবিতাটির কথা আমার মনে হয়। 'ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়,' চতুর্দিকে ধাবমান জল, 'প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতিহীন,' সেই সমূহ সর্বনাশের পটভূমিতে জলবেষ্টিত টিলার উপর কবি যেন একা, দুই হাতে শুষ্ক করে ধরা আছে করোটি, দেশকালের ভয়ঙ্কর সত্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ করছেন, আর তার গূঢ় তাৎপর্যগুলিকে আত্মস্থ করতে চেষ্টা করছেন। 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'—এর ৬৩ সংখ্যক স্তবকে যেন তোমার নিজের কবিতারই কথা:

মাটি খুব শান্ত, শুধু খনির ভিতরে দাবদাহ
হঠাৎ বিস্ফারে তার ফেটে গেছে পাথরের চাড় ।
নিঃসাড় ধুলায় দাও উড়িয়ে সে লেখার অক্ষর
যে লেখায় জ্বর নেই, লাভা নেই, অভিশাপও নেই ।

তোমার সদ্‌গুণে ভরে উঠেছে এই রচনা। তাকে কি আগামীকাল বস্তুনিষ্ঠ বলে মেনে নেবে, না কি এই রচনাকে বন্ধুর উচ্ছ্বাস অথবা প্রশস্তির প্রচলিত ধারা বলে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে বিদ্রূপই কুড়াবে? আমার হয়ে উত্তর দিন শেক্সপীয়র, সুধীন্দ্রনাথের তর্জমায়—

'প্রেমে সত্যসন্ধ আমি, অপলাপে ফুরাব না মসী' এবং

প্রবাদবিলাসী যারা অতিকথা তাদেরই মানায় :
আমি তো পসারী নই, গুণগানে আমার কি দায় ?

আরো মনে পড়ছে ইয়েট্‌সের একটি কবিতার কথা। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ডাবলিনের পৌর চিত্রশালায় গিয়ে দেখেন সারি-সারি বিলম্বিত রয়েছে তাঁর বন্ধুদের প্রতিকৃতি—হিউ লেন, অগাস্টা গ্রেগরি, জন মিঙ্ ইত্যাদির। দেখে তিনি ভাবলেন—'my glory was I had such friends'। আমি শুধু অতীতকালকে বর্তমানকাল, বহুবচনকে এক বচন করে নিতে চাই ।

দিনকাল ১৩৮৮

বিষয় : শঙ্খ ঘোষ

পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

[পাঁচের দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শঙ্খ ঘোষ (জন্ম ১৩৩৮)-এর সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশ পেয়েছে মূল্যবান নিবন্ধ। এখানে সেই সমস্ত লেখাগুলির একটি পঞ্জি করা হলো। আলোচক, আলোচনার শিরোনাম, পত্রিকা, বর্ষ, সংখ্যা প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা সংখ্যা এইভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পত্রিকার পাশে ব্র্যাকেটে প্রকাশস্থানের আদ্যক্ষর দেওয়া আছে ; যথা ক কলকাতা, বী. বীরভূম। গ্র. আ. অর্থে গ্রন্থ আলোচনা বোঝাবে। বলাইবাহুল্য পঞ্জিটি অসম্পূর্ণ। উৎসাহী পাঠক এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করার জন্য লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র (১৮/এম টেমার লেন, কলকাতা-৯)-এ যোগাযোগ করতে পারেন।]

ক. শঙ্খ ঘোষের কবিতা, কাব্য, প্রবন্ধ, সম্পর্কিত আলোচনা :

অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কবিতার আমি ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা' পত্রোল্লাস (হা) ২ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৮১

„ 'জলের আন্তর শব্দ' চেনামুখ (ক) ৫, ১৯৮২

„ 'মিলের মধ্যে অমিল' অর্কিড (ক) ৫/২ ১৯৮২ পৃ ১৯-২০

„ 'ত্রিতাল : শঙ্খ ঘোষ' পত্রপুট (ক) ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

„ 'আসক্তি ও নিরাসক্তির' বিন্যাসে গড়া সময়' গাণ্ডীব (ন) ৩/৪ জুন-অক্টোবর ১৯৯০

„ 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' সমকালীন কোরাস (ক) ৬/১ ডিসেম্বর ১৯৯০

„ 'প্রসঙ্গ বাবরের প্রার্থনা' কলমের ফ্রন্ট (উ. ২৪) ১১/১ ১৯৯১ পৃ ৯-১৬

„ শঙ্খ ঘোষের কাব্য-ভাবনা' চিত্রকল্প (কো বি) ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ পৃ ৫-৭

„ 'শঙ্খ ঘোষ : সংক্ষিপ্ত জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ক-গ

„ 'শঙ্খ ঘোষের কাব্য-ভাবনা' চিত্রকল্প (কো. বি) ২৭ অক্টোবর ৯২

„ 'সময়ের দলিল : শঙ্খ ঘোষের কবিতা' পাবলিক (উ. ২৪) ১৪ জুলাই ১৯৯৩

অমলেন্দু ভট্টাচার্য, 'কবিই শুধু নিজের জোরে মাতাল : শঙ্খ ঘোষ' অমৃতলোক (মে) ৬০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ পৃ ৯০-৯৭

অম্বুজ বসু, 'শঙ্খ ঘোষের সাম্প্রতিক' (মিনি বুক ২০ কবিতা) ধানসিড়ি (বে) ৬/১ মে ১৯৭৮ পৃ ১৪-১৭

অরুণ সেন, 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' পরিচয় ৫৩/১১-১২ জুন-জুলাই ১৯৮৪ পৃ ৩৩-৪৮

• 'নিঃশব্দের তর্জনী' (গ্র. আ) সাহিত্যপত্র (ক) ১৮ বর্ষ মে ১৯৭৩ পৃ ৭৫-৭৭

অরুণকুমার রায়চৌধুরী 'উর্বশীর হাসি' (গ্র. আ.) পরিচয় ৫১/৯ এপ্রিল ১৯৮২ পৃ ১২১-১২৫

অরুণাংশু ভট্টাচার্য, 'কবিতার প্রাণ ও পরাবাস্তবতা' (বৈরাগীতলা) কবিকৃতি (হা) ২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ পৃ ২৩-২৭

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নিহিত পাতাল ছায়া' আজ কাল পরশু (ক) ১৩ মে ১৯৮২ পৃ ১৯-২০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা' মহারাজ (ক) ১৯-২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ পৃ ৫-১০

আশিসকুমার দে, 'শঙ্খ ঘোষ' (প্রশ্নোত্তর) গাঙেয় পত্র (ক) ৫ জুলাই ১৯৭৭ পৃ ৪০-৪১

• 'মহাভারত ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (অংশ) ধ্বক ২০/৫ অক্টোবর ১৯৯১ পৃ ৩-১৩

আশীষ মজুমদার, 'নিহিত পাতাল ছায়া' (গ্র. আ) সাহিত্যপত্র এপ্রিল-জুন ১৯৬৯ পৃ ১০৪-১১১

ঈশ্বর ত্রিপাঠী, 'বাবরের প্রার্থনা' হেমলক (বাঁ) ১/১ জানুয়ারি মার্চ ১৯৭৮ পৃ ১-২

• উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' (গ্র. আ.) পরিচয় ৪৩/৬-৭ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ পৃ ৬৪৭-৬৫১

• উৎপলকুমার বসু, 'ভোরের প্রথম পাখি' মহানগর (ক) ১/৮ আগস্ট ১৯৮২ পৃ ১৬

উদয়কুমার চক্রবর্তী, 'শঙ্খ ঘোষ-এর একটি কবিতা ; (যমুনাবতী) ছন্দোরীতি বদল' ধ্রুত (ক) ২/১ মে ১৯৯২ পৃ ৩৯-৪৫

কালীপদ চৌধুরী, 'বাংলা কাব্য-সংসারে কবিতা নায়ক চরিত্র' (অংশ) কবিতা সাময়িকী (মে) ১/৫ অক্টোবর ১৯৭৯ পৃ ১৬-২১

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শঙ্খ ঘোষ : জাবাল সত্যকামের পুনর্জন্ম' সংবেদ (ক) নব ৯ জুন ১৯৮৭

• গোপাল ভৌমিক, 'শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে' কল্লবাণী (ক) ৭/১১ মার্চ ১৯৭৬ পৃ ১৩-১৪

গৌতম রায়, 'ভূমিকম্প : গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও শঙ্খ ঘোষ' রক্তিমা (হু) ৪/৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ পৃ ১২-১৯

জয়া মিত্র, 'শঙ্খ ঘোষের জাবাল সত্যকাম : একটি আলোচনা' বোবাযুদ্ধ (ব) ১৫-১৬ অক্টোবর ১৯৮২ জানুয়ারি ১৯৮৩ পৃ ১১-১২

তপোধীর ভট্টাচার্য, 'পঞ্চাশের কবিতা' (অংশ) লাল নক্ষত্র (হু) ১৩/২৩ অক্টোবর ১৯৮৯ পৃ ৫১-৬২

তরুণ পাইন, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতার মুহূর্ত' (গ্র. আ.) প্রাকৃত (মু) ১/৩ জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৮ পৃ ৫৪-৫৯

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা' বিভিন্ন কোরাস (হা) ১/২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ পৃ ১-৭

তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'স্মৃতির শিল্প : নগ্ন নির্জন হাত' অন্তস্বর (কো. বি.) জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৮৪ পৃ ২৪-৩১

তপেন্দ্র চৌধুরী, 'আধুনিক জনপ্রিয় কবিদের কবিতায় নদী' (অংশ) ঊর্মি (হু) ১৭ মার্চ ১৯৮৭ পৃ ১২-১৬

তাপস ঘোষ, 'নিঃশব্দের তর্জনী থেকে' জলসিঁড়ি (মু) ১৫/২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ পৃ ১৯-২০

তারাপদ আচার্য, 'জার্নাল : শঙ্খ ঘোষ' (গ্র. আ.) কবিতা কথা (উ. ২৪) ২/২-৩ এপ্রিল ১৯৮৬ পৃ ৩৮-৪৩

" 'সুকুমার নান্দনিক ভূমি' লা পয়েজি (ক) ১৬/১-২ জানুয়ারি-জুন ১৯৮২ পৃ ৫২-৬৮

" 'গ্রন্থপঞ্জি' লা পয়েজি (ক) ১৬/১-২ জানুয়ারি-জুন ১৯৮২ পৃ ৮৫-৮৮

বার্ণিক রায়, 'জীবনপঞ্জি' লা পয়েজি (ক) ১৬/১-২ জানুয়ারি-জুন ১০৮২ পৃ ৮৯-৯৬

দেবকুমার ঘোষ, 'প্রসঙ্গ : খড়' পাণ্ডু ১/১ মার্চ ১৯৮৬ পৃ ৫-৮

দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিক্ষত সময়ের প্রাণের নিঃশ্বাস : শঙ্খ ঘোষের কবিতা' সাহিত্য ও সংস্কৃতি (ক) ২৫/৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৯ পৃ ৩২৯-৩৩৮

দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'চিত্তপ্রিয়' লা পয়েজি ১৬/১-২ জানুয়ারি-জুন ১৯৮২ পৃ ১-২

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-পুরস্কার ১৯৮৯' বঙ্গ-সাহিত্য ত্রৈমাসিক পত্রিকা ১৭/২ ১৯৮১ পৃ ৫১-৫৩

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, 'বাবরের প্রার্থনা' (গ্র. আ.) দর্শক (ক) ১৮/৮ নভেম্বর ১৯৮৭ পৃ ১-২ ও ৩-১১

নিশীথ ভড়, 'চোখের শুশ্রূষা হ'ল এই শুধু' কলকাতা ৫/৫ ডিসেম্বর ১৯৭৭ পৃ ৪৮-৪৯

● নীলরতন সেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ' সারস্বত (ক) ১৪/১ এপ্রিল-জুন ১৯৮১ পৃ ২৯-৪২

পবিত্র মুখোপাধ্যায়, 'পঞ্চাশের কাব্যচর্চা সম্পর্কে' (অংশ) দুই বাংলার কবিতা ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ পৃ সংযুক্ত ১-৬
পবিত্র সরকার, 'চাবুক' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
পবিত্র সরকার, 'শঙ্খ ঘোষ : সমালোচক গদ্য লেখক' লা পয়েজি ১৬/১-২ জানুয়ারি-জুন ১৯৮২ পৃ ৭০-৮৪
„ 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা' বিভাব ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ পৃ ৮৪-৮৮
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, 'বাবরের প্রার্থনা' বিভিন্ন কোরাস (হা) পৃ ৯-১২
পিনাকী ঠাকুর, 'একটি সোনালী উত্তপণ' পাণ্ডু ১/১ মার্চ ১৯৮৬ পৃ ৯-১০
পুলিন দাস, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা : আগুনের স্তব' সাহিত্য সম্প্রতি (মে) ১১/১০ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৭ পৃ ৫২-৫৭
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, 'পিকনিক : শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা' লা পয়েজি ১৬/১-২ জানুয়ারি-জুন ১৯৮২ পৃ ৫০-৫১
প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, 'প্রথম দিনের সূর্য : শঙ্খ-আইয়ুব বিতর্ক' অনুষ্টুপ ১৭/১ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ পৃ ৪২-৭৫
প্রদীপ দাশগুপ্ত, 'বিষন্ন শঙ্খ ঘোষ' সম্প্রতি (মে) ২৮ জুন ১৯৭৮ পৃ ২১-২৩
প্রফুল্ল অধিকারী, 'বাবরের প্রার্থনা' অমৃতলোক ১/৮-১১ মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৮ পৃ ২১-২৩
• প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলা ছন্দ প্রসঙ্গে' শতভিষা (ক) ২৫ বর্ষ ১৯৭৬ পৃ ১২২-১৩০
• ঐ চিঠি / শঙ্খ ঘোষ „ „ „ পৃ ১৩১-১৩২
প্রভাত মিশ্র, 'মুণ্ডমালার দিন ও বাবরের প্রার্থনা' মরীচি (মে) ৯ আগস্ট ১৯৭৮ পৃ ১০-১৭
„ 'খড়' পাণ্ডু (হু) ১।১ মার্চ ১৯৮৬। পৃ ৩-৫
বাণিক রায়, 'শঙ্খ ঘোষের গঙ্গাযমুনা' লা পয়েজি ১৬/৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮২ পৃ ৪২২-৪২৬
„ 'শিশুসাহিত্যে ও অনুবাদে শঙ্খ ঘোষ এবং আধুনিকতা' লা পয়েজি ১৬/১-২ জানু-জুন ১৯৯২ পৃ ৭০-৮৪
„ 'গঙ্গাযমুনা : শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা' „ „ „ পৃ ৪৪-৪৯
„ 'বাবরের প্রার্থনা : শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা' „ „ „ পৃ ৪০-৪৩
বাণীব্রত মৈত্র, 'মনে হয় তিনি নাটকেরই লোক' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ১১৩-১১৭
• বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, 'গদ্যকবিতা আর শঙ্খ ঘোষ' সাম্প্রত (দা) ২ বর্ষ সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৯৮৮ পৃ ১৫-২২

বৃন্দাবন কর্মকার, শঙ্খ ঘোষের দায়বদ্ধ উচ্চারণ 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' অঙ্গীকার (মে) ৭/২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ পৃ ৪১-৫৭
মনোতোষ চক্রবর্তী, 'শিলচর সাহিত্যসভার ভাষণ' (অনুলিখন) শব্দশাব্দিক ৯/৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর '৮৪ পৃ ৫-১৫
মহীউদ্দীন আহমদ, 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা : জীবনের আনন্দ ও কাব্যের মুক্তি' কালপুরুষ ৪/২ ১৯৭৮ পৃ ৪৬-৬৪
মানবেন্দু রায়, 'শঙ্খ-কথামালা' ফার্নেস (ব) ১ জানুয়ারি '৮৯
মেঘ মুখোপাধ্যায়, পাঁচ পছন্দ (দেশহীন) অন্তরূপ (ক) ১৫ ১৯৮৭
মৈত্রেয়ী রায়, 'বাবরের প্রার্থনার গদ্যরূপ' তৃষ্ণার্ত জলপরী ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ পৃ ১০-১১
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শঙ্খ ঘোষ ও নির্জনতা প্রসঙ্গে' কল্পবাণী ২/১ জুন জুলাই ১৯৭০ পৃ ২৭-৩০
রণবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'খড়-এর ঘরে কিছুক্ষণ' পাণ্ডু ১/১ মার্চ ১৯৮৬ পৃ ১০-১২
● রবীন মণ্ডল, 'কবিতার পিগমেন্ট চিত্রকল্প' (অংশ) আত্মবর্গ (ছ) ১/১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ পৃ ৩-৫
রাজীব চৌধুরী, 'লিলিপুটদের দেশে শঙ্খ ঘোষ' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ৯৪-১১২
রামচন্দ্র প্রামাণিক, 'মাত্রাবৃত্ত ও আধুনিক মানসিকতা' সংবেদ আগস্ট ১৯৭২ পৃ ২৬-৩১
রুপতী সেন, 'কবিতা মুহূর্ত' (গ্র আ) বারোমাস (ক) ৯/১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ পৃ ১৪৫-১৪৯
রোহিতাশ্ব গুপ্ত, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতার মুহূর্ত' (গ্র আ) কবিতা কথা (ঔ. ২৪) ৪/৩ এপ্রিল জুন ১৯৮৮ পৃ ৩৯-৪৭
রাধাপ্রসাদ ঘোষাল, 'হিরন্ময় গদ্যের দ্যুতি ও শঙ্খ ঘোষ' যুগান্তর ১৯ নভেম্বর ১৯৯৩
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ডাক নাম থেকে নাম ডাক' মাঝি (ক) ৬৬ মে-জুলাই ১৯৯২ পৃ ১
শতভ্র চাকী, 'প্রসঙ্গ বাংলা প্রগতি কবিতা' (অংশ) ঐকতান (ক) ২/৩-৪ মে-অক্টোবর ১৯৮৯ পৃ ৪০-৬০
শ্যামলকুমার রায়, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতায় লৌকিক উপাদান' আবার এসেছি ফিরে (মৃ) জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯২ পৃ ১১-১৩
শ্যামলকুমার বিশ্বাস, 'একটি বিশুদ্ধ আয়না' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ৭৭-৭৯

শিখী মাইতি, 'ডানার শিকড়' কবি ও কবিতা (ক) ১২/২ জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭৮ পৃ ২২৯-২৪৯

শিবনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ওগো বিদেশিনী' (ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ) সারস্বত অর্ঘ্য (হা) ৫/২ মে ১৯৭৮ পৃ ৪৩-৪৫

শিপ্রা ঘোষ, 'নিজস্ব স্বর : শঙ্খধ্বনি' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ৫৬-৭১

শিবাজী গুপ্ত, 'কবির ঘর ঘরের সমস্যা' (অংশ) শিলীন্ধ্র ১৩/১২ এপ্রিল ১৯৮৬ পৃ ১৪-১৮

শ্যামাপ্রসাদ সরকার, 'শঙ্খ ঘোষ : কবিতার মুহূর্তে ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' সিসৃক্ষা (ক) ৯/১ জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৯ পৃ ৩৩-৩৮

● শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা ও আধুনিক বাংলা কবিতা' অনুক্ত (ক) ৫/৪ ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৩ পৃ ৩২৩-৩৩৪

শোভন সোম,১ 'পঞ্চাশের বাংলা কবিতা' সুমেরু কুমেরু (ক) ১/১ মে ১৯৭৩ পৃ ১৯-২৭

„ 'শঙ্খ ঘোষকে লেখা' (সম্পর্কের খতিয়ান) অনুষ্টুপ ২৩/২

শান্তনু দত্ত, 'একটি কবিতার মূল্যায়ন : বাবরের প্রার্থনা' অপর্ণা (হা) ২২ বর্ষ ১ সংখ্যা মে ১৯৯৩

সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, 'শঙ্খ ঘোষ : সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের খোঁজে' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ৮০-৯৩

সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, 'অভিযাত্রার মুহূর্ত' আলপথ (উ. ২৪) ৩/২ এপ্রিল ১৯৯০ পৃ ১৩-১৬

সংযম পাল, শঙ্খ ঘোষের সমাজ ভাবনা' পা (ক) ২/৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ পৃ ৭৩-৭৬

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা' বিভাব ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ পৃ ৯৭-৯৮

সমীর ঘোষ, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা : ব্যাপ্তির বিচিত্র অনুষঙ্গে কোরক (ক) সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ পৃ ৬৮-৭২

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে (গ্র. আ.) কবিতা কথা ১/১ অক্টোবর ১৯৮৪ পৃ ২৭-৩১

„ 'শঙ্খ ঘোষের : হেতালের লাঠি' „ ১/২ জানুয়ারি ১৯৮৫ পৃ ৩৩-৩৬

„ 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' (গ্র. আ.) কবিতা কথা ৪/১-২ জানুয়ারি ১৯৮৮ পৃ ৪৫-৪৯

„ 'সমুদ্র ও শঙ্খ' কবিতা কথা ৪/১-২ অক্টোবর-জানুয়ারি ১৯৮৮ পৃ ৪৫-৪৯

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয়' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ১২-২২

স্বপন দাসাধিকারী, 'কবিতা আলোচনা : শঙ্খ ঘোষের 'বাস্তু' ' জলার্ক ২ অক্টোবর ১৯৮০ পৃ ৩৩-৩৭
„ 'মুক্তপ্রাণ ও আজকের কবিতা' (অংশ) প্রতীতি (যে) ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ পৃ ২৪-২৮
সিদ্ধার্থ রায়, 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' সংবেদ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ পৃ ১৯-৩৪
সুতপা ভট্টাচার্য, 'এখন সময় নয় (গ্র. আ) পরিচয় ৩৮/৩ অক্টোবর ১৯৬৮ পৃ ৪৫৯-৪৬০
„ 'ছন্দের দিনরাত' অন্তসার (দ. ২৪ পরগণা) ২ মার্চ ১৯৯২ পৃ ৪৬-৫৮
„ 'শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ : শঙ্খ ঘোষের কবিতা' জিজ্ঞাসা (ক) ১/২ জুলাই ১৯৮০ পৃ ১৯৮-২১৩
„ 'কবিতার দর্শন ও কবি শঙ্খ ঘোষ' মাঝি ৬৬ মে-জুলাই ১৯৯২ পৃ ৭-৮
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা' সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩/৪ পৃ ৪৪৭-
„ 'এক একটা চূর্ণ চিন্তা' মাঝি ২৯ আগস্ট ১৯৮০ পৃ ৯-২০
„ 'শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা (আত্মঘাত) মাঝি ৬৬ মে-জুলাই ১৯৯২ পৃ ২
সুব্রত রুদ্র, 'শঙ্খ ঘোষের গ্রন্থপঞ্জি' মাঝি ৬৬ মে-জুলাই ১৯৯২ পৃ ৬
সুমিতা চক্রবর্তী, 'স্বাধীনতা উত্তর সমাজ : বাংলা কবিতা' (অংশ) প্রমা (ক) ১১/১ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮০ পৃ ৭৪-১০৫
„ 'কবিতা : পঞ্চাশ' অলিন্দ (ক) সেপ্টেম্বর ১৯৮১ পৃ ১৩-৩৩
„ 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা ও ছন্দ প্রসঙ্গ' লা পয়েজি ১৬/১-২ জানুয়ারি-জুন ১৯৮২ পৃ ২৭-৩৯
সুবোধ সরকার, 'কয়েকটি কবিতার প্রসঙ্গে কিছু কথা' (ত্রিতাল) অজ্ঞাতবাস ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ পৃ ২
সুমিতা দাস, 'আদিকল্প-অন্বেষা' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ৭২-৭৬
সুজিৎ ঘোষ, 'শব্দ থেকে সত্যে : শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধ' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ২৩-৬১
সুজিত সরকার, 'ইমেজিস্ট কবিতা' এবং (ক) ৩২-৩৩ মে-অক্টোবর ১৯৮৭ পৃ ২৮-৩০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রিয় কবি' মাঝি ৬৬ মে-জুলাই ১৯৯২ পৃ ১
সুশান্ত নিয়োগী, 'পঞ্চাশের কয়েকজন কবি' আলিমুন (জ) ৪ ১৯৮২ পৃ ১-১১
সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'শিল্পের বল্কল ছিঁড়ে ছিঁড়ে' কলমের ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ ৪২-৫৫
সুরজিৎ ঘোষ, 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' প্রমা ২/১ অক্টোবর ১৯৭৯ পৃ ১৭১-১৭৮

● সুবীর রায়চৌধুরী, 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' (গ্র. আ.) হীনযান (ক) পৃ ৩৫-৪৩

সুধীর দত্ত, 'কবিতা শঙ্খ ঘোষ ও একাল' সংবেদ এপ্রিল-জুন ১৯৮৫ পৃ ১৩-২০

হরপ্রসাদ মিত্র, 'নির্মাণ আর সৃষ্টি (গ্র. আ.) চতুরঙ্গ ৪৫/৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ পৃ ৪৪৪-৪৪৭

হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা' (নিহিত পাতাল ছায়া) পরিচয় ৩৭/৮-৯ মার্চ ১৯৬৮ পৃ ৭৬০-৭৬৭

খ. সাক্ষাৎকার :

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, 'কিছুক্ষণ : শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে' কৃত্তিবাস (ক) ২/১০ জুন ১৯৭৬ পৃ ১০৩৪-১০৩৬

" সাক্ষাৎকার শঙ্খ ঘোষ শব্দ-শাব্দিক (ক) ১৩/২ জুলাই অক্টোবর ১৯৮৫ পৃ ৩-১০

" ● 'কবি মনন ও কাব্যচিন্তা প্রসঙ্গে' অন্তমনে (ক) অক্টোবর ১৯৬৯ পৃ ৯৮-১০০

" ● 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ক' উত্তরস্বরণ ২১/৪ অক্টোবর ১৯৭৬ পৃ ১৮১-১৯৫

● ব্রজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 'সাক্ষাৎকার : শঙ্খ ঘোষ' গোধূলি সংগীত (বী) ৭ বর্ষ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ পৃ ১-৫

" 'গোধূলি সংগীতের প্রশ্নের উত্তরে' " ৫/১ জানুয়ারি পৃ ১-৫

" 'সাক্ষাৎকার : শঙ্খ ঘোষ' ক্ষুধার্ত ৬ নভেম্বর ১৯৮১ পৃ ১০

গ. বিশেষ সংখ্যা :

১. লা পয়েজি। সম্পাদক : বাণিক রায়। ১৬ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারি-জুন ১৯৮২, কলকাতা

২. পাণ্ডু। সম্পাদক : অরুণাংশু ভট্টাচার্য। ১ বর্ষ ১ সংখ্যা মার্চ ১৯৮৬। হুগলী

২. মাঝি। সম্পাদক : প্রশান্ত রায়। ৬৬ সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯২, কলকাতা

৪. কলমের ফ্রন্ট। সংখ্যা সম্পাদক : মণিভূষণ ভট্টাচার্য। সম্পাদক : অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপ রায়। উত্তর ২৪ পরগণা

๖

জীবনপঞ্জি

জন্ম ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ [২২ মাঘ ১৩৩৮] চাঁদপুর জেলা : ত্রিপুরা
মাতুলালয়
পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষ [১৮৯৮-১৯৮৯]
মাতা শ্রীমতী অমলাবালা ঘোষ
দেশ বাণারিপাড়া জেলা : বরিশাল

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের আদ্যভারতী পরীক্ষা ১৯৪৬
পাবনা জেলায় পাকৃশির 'চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ' থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ১৯৪৭
প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই, এ ১৯৪৯ বি, এ ১৯৫১
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ [বাংলা] ১৯৫৪

অধ্যাপনা বঙ্গবাসী কলেজ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ লিভ্ ভেকান্সি
জঙ্গীপুর কলেজ নভেম্বর ১৯৫৫—মার্চ ১৯৫৬

বিবাহ ১৯৫৬
স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা বিশ্বাস [ঘোষ] অধ্যাপিকা

বহরমপুর গার্লস কলেজ এপ্রিল ১৯৫৬—জানুয়ারি ১৯৫৭

বড়ো মেয়ে শ্রাবন্তীর [মিঠি] জন্ম ১৯৫৭

সিটি কলেজ [আমহার্স্ট স্ট্রিট] ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭—আগস্ট ১৯৬৫
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫—ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
অধ্যক্ষ রবীন্দ্রভবন শান্তিনিকেতন জুন ১৯৮৯—মে ১৯৯০

আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ্ রাইটিং প্রোগ্রামে আমন্ত্রিত ১৯৬৭-৬৮

ছোটো মেয়ে সেমন্তীর [টিয়া] জন্ম ১৯৬৯

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর ১৯৭৬

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো ১৯৭৮

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইটার ইন রেসিডেন্স ১৯৮৪

শিমলার ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি পোয়েট ইন রেসিডেন্স ১৯৮৭-৮৮

এমেরিটাস ফেলো ভারত সরকার ১৯৯৩ থেকে

নক্ষত্র পুরস্কার ১৯৭৬

নরসিংহ দাস পুরস্কার [দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়] ১৯৭৭ 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' কাব্যগ্রন্থের জন্য

কুমারন আসান পুরস্কার ত্রিবান্দ্রাম ১৯৮২ 'প্রহর জোড়া ত্রিতাল' কাব্যগ্রন্থের জন্য

শিরোমণি পুরস্কার ১৯৮৮ 'কবিতার মুহূর্ত' বইটির জন্য

রবীন্দ্র পুরস্কার ১৯৮৯ 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' কাব্যগ্রন্থের জন্য

'যুগান্তর' পত্রিকা মতিলাল পুরস্কার ১৯৯০ সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির জন্য

টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি ১৯৯২

কমলকুমারী ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর কালচার ১৯৯২ অসমের কমলকুমারী ফাউণ্ডেশন থেকে 'সাহিত্য-সংস্কৃতির' জন্য

গ্রন্থপঞ্জি

পৌষ ১৪০০। জানুয়ারি ১৯৯৪ পর্যন্ত।

১. বিদ্যাসাগর :

কিশোরপাঠ্য জীবনী।

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৬। প্রকাশক : স্বাক্ষর। প্রচ্ছদ শিল্পী : উল্লেখ নেই। ১১ বি, চৌরঙ্গি টেরাস। কলকাতা-৩। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৮+২। মূল্য : এক টাকা। উৎসর্গ : উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৫৯। প্রকাশক : ওরিয়েন্ট। প্রচ্ছদশিল্পী : উল্লেখ নেই। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪। মূল্য : এক টাকা। উৎসর্গ : কারো নাম উল্লেখ নেই।

তৃতীয় মুদ্রণ : ৫ই কার্তিক, ১৩৮৫ [২৩ অক্টোবর ১৯৭৮]। প্রথম বোধোদয় গ্রন্থমালা সংস্করণ। প্রকাশক : সাক্ষরতা প্রকাশন। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। ছোটো মাপের। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬০। মূল্য : দু'টাকা। গ্রাহক মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। উৎসর্গ : নাম উল্লেখ নেই।

চতুর্থ মুদ্রণ : ২০শে আষাঢ় ১৩৮৭ [৪ জুলাই ১৯৮০]। দ্বিতীয় বোধোদয় গ্রন্থমালা সংস্করণ। প্রকাশক : সাক্ষরতা প্রকাশন। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। হাল্কা বোর্ড বাঁধাই। ছোটো মাপের। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬০। মূল্য : দুই টাকা। গ্রাহক মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। উৎসর্গ : নাম নেই।

পঞ্চম মুদ্রণ : ২২শে ভাদ্র ১৩৯৭ [৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯০]। তৃতীয় বোধোদয় গ্রন্থমালা সংস্করণ। প্রকাশক : সাক্ষরতা প্রকাশন। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। হাল্কা বোর্ড বাঁধাই। ছোটো মাপের। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬২। মূল্য : ছয় টাকা। উৎসর্গ : কারো নাম উল্লেখ নেই।

২. দিনগুলি রাতগুলি :

কবির প্রথম কবিতার বই।

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৩ [সেপ্টেম্বর ১৯৫৬]। কবিতার সংখ্যা : ৩৩। প্রকাশক : কমলরঞ্জন রায়। এস রায় এ্যাণ্ড কোং। ১৭৬, বিবেকানন্দ রোড। কলকাতা-৬। উৎসর্গ : ইভা-কে। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৯। মূল্য : দু' টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৮৪ [ডিসেম্বর ১৯৭৭]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং।

কলকাতা-৯। উৎসর্গ : ইভা-কে। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪,। কবিতার সংখ্যা : ৩৩। মূল্য : চার টাকা।

তৃতীয় সংস্করণ : চৈত্র ১৩৯০ [মার্চ ১৯৮৪]। মূল্য : সাত টাকা। অন্য সব-কিছু পূর্ববর্তী সংস্করণের অনুরূপ।

৩. এখন সময় নয় :

মাত্র এক ফর্মার কবিতার বই।

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ [মে ১৯৬৭]। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬। কবিতার সংখ্যা : ২৭। প্রকাশক : অনুভব প্রকাশনী, কলকাতা-বারো। উৎসর্গপত্র নেই। প্রচ্ছদশিল্পী : উল্লেখ নেই। পেপারব্যাক। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

এই বইটি একমাস পরে প্রকাশিত 'নিহিত পাতাল ছায়া' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাগুলির বিন্যাসও কিছুটা বদল হয়েছে। তখন এই 'উপ-শিরোনাম' পর্যায়ের কবিতাসংখ্যা হয়েছে : ২৪। দুটি কবিতার শিরোনাম পরিবর্তিত হয়েছে। একটির নাম এখানে আছে 'কোন্ ভাষায়' ; 'নিহিত পাতাল ছায়া'য় হয়েছে 'এই তো, রাত্রি এলো।' একইভাবে 'দুপুর' নামের কবিতাটি হয়েছে 'দুপুরের পাখি।'

৪. নিহিত পাতালছায়া :

কবিতার বই।

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ [জুন ১৯৭৬]। প্রকাশক : বিদ্যা। ৬৯/এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-৯। উৎসর্গ : স্বতপা-প্রদ্যুম্ন-কে। প্রচ্ছদশিল্পী : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+৬৪। মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : কার্তিক ১৩৮৬ [নভেম্বর ১৯৭৯]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : স্বতপা-প্রদ্যুম্নকে। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮০। মূল্য: পাঁচ টাকা।

তৃতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ [জুন ১৯৯০]। অন্যসব অপরিবর্তিত। মূল্য : পনের টাকা।

৫. কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক :

রবীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়ে এক ভিন্ন ধরনের আলোচনাগ্রন্থ।

প্রথম প্রকাশ : ২ অক্টোবর ১৯৬৯। প্রকাশক : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। উৎসর্গ : বাবা/শ্রীচরণেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : উল্লেখ নেই। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬৯। মূল্য : ৬.৫০।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৮। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : বাবা / শ্রীচরণেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৫১। মূল্য : দশ টাকা।

এই সংস্করণে 'পরিশিষ্ট' শব্দটিকে বর্জন করে বইয়ের শেষাংশকে তৃতীয় পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর, সংযোজিত হয়েছে 'সময়ের দেশ' প্রবন্ধটি।

তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৮৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭১। দাম : কুড়ি টাকা। অন্যগুলি অপরিবর্তিত। তবে –

এই সংস্করণে সংযোজিত হলো ১৯৮১ সালে লেখা নতুন একটি প্রবন্ধ। শিরোনাম : 'অভিনয়ের মুক্তি এবং রবীন্দ্রনাথ'।

৬. শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা :

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৭। [এপ্রিল ১৯৭০]। প্রকাশক : ভারবি। উৎসর্গ-পত্র নেই। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২০। মূল্য : ছয় টাকা।

এ-সময় কবির দুটি মাত্র কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। সেই 'দিনগুলি রাতগুলি' থেকে এবং 'নিহিত পাতালছায়া' থেকে নির্বাচিত কবিতা নেওয়া হয়েছে। আরো নেওয়া হয়েছে 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' রচনাকাল [১৯৬৭-৬৯] পর্যায়ের অগ্রন্থিত কবিতা থেকে নির্বাচিত অংশ। অগ্রন্থিত থেকে আরো কিছু নির্বাচিত কবিতা নেওয়া হয়েছে, যাদের দুটি উপ-বিভাগীয় নাম 'জলস্রোত কবিতাগুচ্ছ' এবং 'শিকড়ের ডানা' [অনুবাদ কবিতা / অনুবাদকাল ১৯৬২-৬৯]।

দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৮৫, [জুলাই ১৯৭৮]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : শমী আর মিঠিকে। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪৪। মূল্য : আট টাকা।

এই সংস্করণের সংযোজন : 'আদিম লতাগুল্মময়', 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' এবং 'বাবরের প্রার্থনা' থেকে নির্বাচিত কবিতা।

বিয়োজন : 'শিকড়ের ডানা' শিরোনামের অনুবাদ-কবিতাগুলি। 'জলস্রোত কবিতাগুচ্ছ' নামের কোনো পর্যায়-নাম এখানে নেই।

তৃতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৮৮ [মার্চ ১৯৮২]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। 'উৎসর্গ' ও 'প্রচ্ছদশিল্পী' অপরিবর্তিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৯। মূল্য : বারো টাকা।

সংযোজন : 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' ও 'প্রহর জোড়া ত্রিতাল' থেকে নির্বাচিত কবিতা।

চতুর্থ সংস্করণ : মাঘ ১৩৯২ [জানুয়ারি ১৯৮৬]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। 'উৎসর্গ' ও 'প্রচ্ছদশিল্পী' একই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮০। মূল্য : ২০ টাকা।

সংযোজন : 'বন্ধুরা মাতি তরজায়' ও 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' থেকে নির্বাচিত কবিতা।

পঞ্চম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৯৭ [জুলাই ১৯৯০]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। 'উৎসর্গ' ও 'প্রচ্ছদশিল্পী' অপরিবর্তিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৮। মূল্য : ৩৫ টাকা।

সংযোজন : 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' থেকে নির্বাচিত কবিতা।

বর্জন : 'দিনগুলি রাতগুলি' থেকে : 'আকাঙ্ক্ষার ঝড়' ও 'পৃথিবীর জন্ম', শিরোনামের কবিতা দুটি।

'নিহিত পাতালছায়া' থেকে : 'মুহূর্তের মুখ', 'যে-ঘর ছেড়ে', 'পরাভব', 'জাবাল', 'যাবার মতো নই'।

'তুমি তো তেমন গৌরী নও' থেকে : 'শ্মশানবন্ধু', 'দুই হাতে দুই প্রান্ত', 'নিঃশব্দ', 'খোলা মাঠ', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'ভয়', 'থুতু', 'ঋণ',।

'আদিম লতাগুল্মময়' থেকে : 'প্রপাত', 'স্লোগান', 'যখন লোকে',।

'প্রহর জোড়া ত্রিতাল' থেকে : 'কঙ্কাল', 'রক্তদান', 'কাঁচ'।

ষষ্ঠ সংস্করণ : বৈশাখ, ১৪০০ [এপ্রিল ১৯৯৩]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। 'উৎসর্গপত্র' ও 'প্রচ্ছদ শিল্পী' অপরিবর্তিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৮। মূল্য : ৪০ টাকা।

কিছুমাত্র পরিবর্ধন ও পরিবর্জন না-থাকার জন্য এই প্রকাশকে তাই সংস্করণ না বলে পুনর্মুদ্রণ বলাই ঠিক।

৭. নিঃশব্দের তর্জনী :

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিকে বলা যেতে পারে 'কবির কৈফিয়ৎ' জাতীয় রচনা।

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৮ [মে ১৯৭১]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : অলোকরঞ্জনকে। প্রচ্ছদপট : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+১০৬। মূল্য : চার টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ২২ শ্রাবণ ১৩৮৪ [আগস্ট ১৯৭৭]। প্রকাশক : আশা প্রকাশনী। উৎসর্গ : অলোকরঞ্জনকে। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+১০৬। মূল্য : সাত টাকা।

তৃতীয় সংস্করণ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৯০ [ডিসেম্বর ১৯৮৪]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : অলোকরঞ্জনকে। প্রচ্ছদ : গৌতম চৌধুরী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২৯। মূল্য : ষোল টাকা।

৮. ছন্দের বারান্দা :

সৃজনধর্মী অভিনব ছন্দ-আলোচনাগ্রন্থ। একে বলা উচিত ছন্দের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার।

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৭৮ [ডিসেম্বর ১৯৭১]। প্রকাশক : চিত্রক। উৎসর্গ : সুবীর রায়চৌধুরী / প্রিয়বরেষু। প্রচ্ছদ : কমল সাহা। ছোটো মাপের সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+৯৩। দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৩৮২ [জানুয়ারি ১৯৭৬]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : সুবীর রায়চৌধুরী/প্রিয়বরেষু। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই [স্বাভাবিক আয়তন]। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+১১৬। দাম : সাত টাকা।

সংযোজন : ১. 'গদ্য কবিতা আর অবনীন্দ্রনাথ'। ২. 'শত জলঝরনার ধ্বনি'।

তৃতীয় সংস্করণ : নববর্ষ ১৩৮৭ [এপ্রিল ১৯৮০]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : সুবীর রায়চৌধুরী / প্রিয়বরেষু। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+১৩২। দাম : দশ টাকা।

সংযোজন : 'প্রথম শিথিল ছন্দোমালা'।

চতুর্থ সংস্করণ [পুনর্মুদ্রণ] : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ [জুন ১৯৮৬]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : সুবীর রায়চৌধুরী/প্রিয়বরেষু। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+১৩২। দাম : বার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কোনো সংযোজন নেই।

পঞ্চম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৯৫ [মে ১৯৮৮]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : সুবীর রায়চৌধুরী/প্রিয়বরেষু। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+১৫২। দাম : কুড়ি টাকা।

সংযোজন : 'নিঃশব্দতার ছন্দ' [সমর সেনের কবিতার ছন্দ]।

ষষ্ঠ সংস্করণ [পুনর্মুদ্রণ] : আষাঢ় ১৩৯৮ [জুন ১৯৯১]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : সুবীর রায়চৌধুরী/প্রিয়বরেষু। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬০। পঁচিশ টাকা।

৯. আদিম লতাগুল্মময় :

কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৩৭৯ [এপ্রিল ১৯৭২]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : বন্ধুকে, যে আর বন্ধু নেই। প্রচ্ছদপট : পূর্ণেন্দু পত্রী। সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ [জুন ১৯৯০]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : বন্ধুকে, যে আর বন্ধু নেই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। সুন্দর বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪। দশ টাকা।

১০. সকালবেলার আলো :

কিশোর উপন্যাস।

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭৯ [সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : যাকে, খুকুকে। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬+৭৫। তিন টাকা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৮৯ [মে ১৯৮২]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : যাকে, খুকুকে। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮০। ছয় টাকা।

তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৭ [জানুয়ারি ১৯৯১]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট। উৎসর্গ : যাকে, খুকুকে। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭৯। বারো টাকা।

১১. ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ :

ভূমিকা অনুবাদ অনুষঙ্গ/শঙ্খ ঘোষ : স্প্যানিশ ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক এই বইটির লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। স্প্যানিশ ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮০ [আগস্ট ১৯৭৩]। প্রকাশক : ভাবনা। পরিবেশক : দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি। উৎসর্গ : পুলিনবিহারী সেন/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির সহায়তায় রচিত প্রচ্ছদ। অত্যন্ত শোভন রুচিসম্মত পেপারব্যাক। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১০+১৮০। দাম আট টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ [পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত] : পৌষ ১৩৮৩ [ডিসেম্বর ১৯৭৬]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : পুলিনবিহারী সেন/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৭। বারো টাকা।

তৃতীয় সংস্করণ [পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত] : মাঘ ১৩৮৯ [ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : পুলিনবিহারী সেন/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৩। ষোলো টাকা।

চতুর্থ সংস্করণ [পরিমার্জিত] : পৌষ ১৩৯৫ [জানুয়ারি ১৯৮৯]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : পুলিনবিহারী সেন/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৯৪। তিরিশ টাকা।

১২. মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় :

১৯৭৭-এর নরসিংহ দাস [দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়] পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮১ [জুন ১৯৭৪]। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স। উৎসর্গ : শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়/প্রিয়বরেষু। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৮। মূল্য : চার টাকা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৮৫ [মে ১৯৭৮]। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স। উৎসর্গ : শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়/প্রিয়বরেষু। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৮। মূল্য : পাঁচ টাকা।

১৩. বাবরের প্রার্থনা :

১৯৭৭-এর অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতার বই।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৩ [আগস্ট ১৯৭৬]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : 'রূপ-রূপা-রূপমকে জন্মদিনে'। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪। মূল্য : চার টাকা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ :	পৌষ ১৩৮৪ [ডিসেম্বর ১৯৭৭]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
তৃতীয় মুদ্রণ :	মাঘ ১৩৮৪ [জানুয়ারি ১৯৭৮]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
চতুর্থ মুদ্রণ :	ফাল্গুন ১৩৮৪ [ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
পঞ্চম মুদ্রণ :	ফাল্গুন ১৩৮৪ [ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
ষষ্ঠ মুদ্রণ :	ফাল্গুন ১৩৮৪ [মার্চ ১৯৭৮]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
সপ্তম মুদ্রণ :	শ্রাবণ ১৩৮৫ [জুলাই ১৯৭৮]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
অষ্টম মুদ্রণ :	ফাল্গুন ১৩৮৫ [ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
নবম মুদ্রণ :	বৈশাখ ১৩৮৬ [এপ্রিল ১৯৭৯]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
দশম মুদ্রণ :	বৈশাখ ১৩৮৭ [এপ্রিল ১৯৮০]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
একাদশ মুদ্রণ :	ফাল্গুন ১৩৮৭ [মার্চ ১৯৮১]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
দ্বাদশ মুদ্রণ :	ফাল্গুন ১৩৮৮ [ফেব্রুয়ারি ১৯৮২]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
ত্রয়োদশ মুদ্রণ :	অগ্রহায়ণ ১৩৯০ [ডিসেম্বর ১৯৮৩]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
চতুর্দশ মুদ্রণ :	শ্রাবণ ১৩৯১ [জুলাই ১৯৮৪]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
পঞ্চদশ মুদ্রণ :	ফাল্গুন ১৩৯২ [ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
ষোড়শ মুদ্রণ :	কার্তিক ১৩৯২ [নভেম্বর ১৯৮৫]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
সপ্তদশ মুদ্রণ :	জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩ [জুন ১৯৮৬]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।
অষ্টাদশ মুদ্রণ :	কার্তিক ১৩৯৪ [নভেম্বর ১৯৮৭]	অন্যসব অপরিবর্তিত।
ঊনবিংশ মুদ্রণ :	ফাল্গুন ১৩৯৫ [ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯]	অন্যসব অপরিবর্তিত।
বিংশ মুদ্রণ :	আশ্বিন ১৩৯৭ [সেপ্টেম্বর ১৯৯০]	অন্যসব অপরিবর্তিত।
একবিংশ মুদ্রণ :	জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯ [জুন ১৯৯২]।	অন্যসব অপরিবর্তিত।

১৪. মিনি বুক :

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৭৮। পেপারব্যাক। প্রচ্ছদে বিদেশী পোষাকে সজ্জিত কবির ছবি। বইমেলা উপলক্ষে কুড়িটি কবিতার পুনর্মুদ্রণ। Editor, Printer & Publisher : Sandipan Chattopadhyay. 9A, Khairoo Place, Calcutta-700072 / Price 60 p.

১৯৭৮-এর মেলায় এই 'মিনি বুক' দু'বার ছাপা হয়েছিল।

১৫. তুমি তো তেমন গৌরী নও :

রচনাকাল : ১৯৬৭-৬৯। কবি স্বয়ং জানিয়েছেন : "'নিহিত পাতালছায়া' আর 'আদিম লতাগুল্মময়' বইদুটির মধ্যবর্তী এই বই স্বতন্ত্রভাবে ছাপা হলো এই প্রথম। এর অধিকাংশ রচনা কেবল 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অন্তর্গত ছিল এতদিন।"

বই আকারে আলাদাভাবে প্রকাশের সময় যেসব কবিতা যুক্ত হয়েছে : 'কখনো-বা মনে হয়', 'ঘণ্টাঘর', 'আমার সমান', 'অপমান'।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৫ [আগস্ট ১৯৭৮]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : হিমানীকে। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৮। বোর্ড বাঁধাই। দাম : চার টাকা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৯১ [জুলাই ১৯৮৪]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : হিমানীকে। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৮। বোর্ড বাঁধাই। দাম : ছ'টাকা।

১৬. নিকোলাস গিয়েনের চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা :

কিউবার কবিতা বাংলাভাষায়।

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৭৬ [ডিসেম্বর ১৯৭৯]। প্রকাশক : কালপুরুষ প্রকাশনী। অনুবাদকের উৎসর্গ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রিয়বরেষু। মলাটের ছবি : নিকোলাস গিয়েন। ভিতরের ছবি : দারিয়ো মোরা। পেপারব্যাক। কবিতার সংখ্যা : ৫৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯৬। দাম : ৭ টাকা ৯৫।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ১৯৮৬। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং : অনুবাদকের উৎসর্গ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রিয়বরেষু। মলাটের ছবি : নিকোলাস গিয়েন। ভিতরের ছবি : দারিয়ো মোরা। পরিকল্পনা : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পেপার-ব্যাক। কবিতার সংখ্যা : ৫৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯৬। দাম : ১০ টাকা।

১৭. পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ :

কবিতার বই।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৭ [এপ্রিল ১৯৮০]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ কবিতা :

ভোর এল ভয় নিয়ে, সেই স্বপ্ন ভুলিনি এখনো।

স্থির অমাবস্যা, আমি শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি দিগন্তের ধারে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে
আমার শরীর যেন আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে।

বুক থেকে হাতে খুলে নিয়েছি পাঁজর আর তালে তালে নাচে সেই হাত
গ্রহনক্ষত্রের দল ঝমঝম শব্দে বেজে ওঠে।
স্তূপ হয়ে অন্ধকারে সোনারঙা সুর ওই ওঠে আর উঠে ঝরে পড়ে।

সেই সুরে খুলে যায় নামহারা গহ্বরের মৃতদেহগুলি
পিছনে অলীক হাতে তালি।
অবশেষ ফিরে দেখি ঘাসের উপরে শুয়ে আছে

পুরোনো বন্ধুর দল
শিশির মাখানো শান্ত প্রসারিত হাতগুলি বাঁকা।

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। কবিতার সংখ্যা ৬০। প্রতিটি কবিতা মাত্র চার পংক্তির বিন্যাসে ধরা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭২। মূল্য : ছ'টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৯৬ [মে ১৯৮৯]। অন্তসব অপরিবর্তিত। মূল্য : দশ টাকা।

১৮. শব্দ নিয়ে খেলা :

গল্প বলার ধরনে কিশোরদের জন্য বানান শেখানোর সরস ও ঋজু গদ্যগ্রন্থ।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৭ [জুন ১৯৮০]। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স। উৎসর্গ : এই লেখাগুলির প্রথম পাঠিকা/শ্রীমতী টিয়াকে। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪৭। মূল্য : দশ টাকা।

এই বইটির লেখক 'কুন্তক', কবি শঙ্খ ঘোষের ছদ্মনাম।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৪ [জানুয়ারি ১৯৮৮]। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স। উৎসর্গ : এই লেখাগুলির প্রথম পাঠিকা/শ্রীমতী টিয়াকে। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪৭। মূল্য : পনের টাকা।

১৯. এ আমির আবরণ :

এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতরকার কবিতা। সেই সূত্রে এসেছে কবির আঁকা ছবি, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৭ [এপ্রিল ১৯৮০]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : আবু সয়ীদ আইয়ুব/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৫৩। মূল্য : চোদ্দ টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৮৯ [আগস্ট ১৯৮২]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : আবু সয়ীদ আইয়ুব/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৭। মূল্য : ষোল টাকা।

একটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজন হলো : 'এর পূরবী ওর বিভাস'।

তৃতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৯৮ [জুন ১৯৯১]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : আবু সয়ীদ আইয়ুব/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬৭। মূল্য : তিরিশ টাকা।

'১০২ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ একটি পাদটীকার সংযোজন হয়েছে।'

২০. কবিতা সংগ্রহ :

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৮৭ [ডিসেম্বর ১৯৮০]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : সমগ্র বইটির আলাদা কোনো উৎসর্গ নেই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৭২। দাম : কুড়ি টাকা।

১৯৮০-তে প্রকাশিত 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত সমস্তই এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো অনুবাদ-কবিতা এতে নেই।

দ্বিতীয় সংস্করণ : 'ক বি তা সং গ্র হ ১'। আষাঢ় ১৩৯৭ [জুন ১৯৯০] প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : সমগ্র বইটির আলাদা কোনো উৎসর্গপত্র নেই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী [সম্পূর্ণ নতুন প্রচ্ছদ]। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৫৩। দাম : চল্লিশ টাকা।

আছে : 'দিনগুলি রাতগুলি'। 'নিহিত পাতালছায়া'। 'তুমি তো তেমন গৌরী নও'। 'আদিম লতাগুল্মময়'। 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'। 'বাবরের প্রার্থনা'। 'বন্ধুরা মাতি তর্জায়'।

এই সংস্করণে যুক্ত হয়েছে 'বন্ধুরা মাতি তর্জায়' [১৯৮৪] কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি আর বিযুক্ত হয়েছে 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' [১৯৮০] কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি।

২১. কবিতা সংগ্রহ ২ :

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৭ [জানুয়ারি ১৯৯১]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। কোনো আলাদা উৎসর্গপত্র নেই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী ['কবিতা সংগ্রহ ১'-এ যে প্রচ্ছদ, এখানেও তাই ; শুধু রঙ্‌ অন্যরকম]। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৭১। দাম : ষাট টাকা।

আছে : 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'। 'প্রহরজোড়া ত্রিতাল'। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'। 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে'। 'বহুল দেবতা বহু স্বর'। 'নিকোলাস গিয়েন/চিড়িয়াখানা'। 'সবকিছুতেই খেলনা হয়'।

২২. উর্বশীর হাসি :

এক একটি বই নিয়ে আলোচনা [একটি এল. পি. রবীন্দ্রসংগীত-রেকর্ড সহ]। একেকটি বহুমাত্রিক প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। নানা ধরনের লেখালেখিতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক অনেকগুলি প্রবল তথ্যভুলের নিরসন সম্ভব হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৮ [এপ্রিল ১৯৮১]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : প্রবোধচন্দ্র সেন/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : অজয় গুপ্ত। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪৪। মূল্য : পনের টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৪০০ [আগস্ট ১৯৯৩]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : প্রবোধচন্দ্র সেন/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০০। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

সংযোজন : 'নিরন্তর সম্পাদনা', 'আত্মঘাতী মনীষা', 'টমসন সাহেব আর বাঙালি সমালোচক', 'রক্তকরবী' : কয়েকটি তথ্য'।

২৩. প্রহরজোড়া ত্রিতাল :

কবিতার বই। কবি কুমারণ আসান [ত্রিবান্দ্রাম] পুরস্কার [১৯৮২] পেয়েছেন এই কাব্যগ্রন্থের জন্য।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮৮ [জানুয়ারি ১৯৮২]। প্রকাশক : নাভানা। উৎসর্গ : সুব্রতা আর অভ্রকে। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। কবিতার সংখ্যা : ৪৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪। দাম : আট টাকা।

২৪. শব্দ আর সত্য :

এই গদ্যগ্রন্থটিকে বলা যেতে পারে 'নিঃশব্দের তর্জনী'র দোসর। কবি বা লেখকদের পক্ষ থেকে অনালোচিত এমন সব প্রসঙ্গ এসেছে এখানে, যার সবটাই মৌলিক ও সৃজনধর্মী।

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৮৮ [মার্চ ১৯৮২]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : কাকলি আর দেবেশকে। প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮ [পাইকা হরফে ছাপা]। মূল্য : বারো টাকা।

পুনর্মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৯৪ [নভেম্বর ১৯৮৭]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : কাকলি আর দেবেশকে। প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯২ [স্মল পাইকা হরফে ছাপা]। মূল্য : পনের টাকা।

২৫. নির্মাণ আর সৃষ্টি :

রবীন্দ্রনাথের শেষ পনেরো বছরের সৃষ্টি-জীবন নিয়ে এই আলোচনায় এক সমগ্র রবীন্দ্রনাথকেই পেয়ে যাই আমরা, যে-রবীন্দ্রনাথ ভাবুকতায় ও বিশ্বমনীষায় চির-কালের আধুনিক। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে তাঁর সাহিত্যকে, যার সর্বপ্রথম সূচনা আছে 'এ আমির আবরণে'র 'একটি রক্তিম মরীচিকা'র মধ্যে। পঞ্চাশের দশকের একজন প্রধানতম কবির মনীষানির্ভর কলমে এই আলোচনা হয়ে উঠেছে বিচিত্রভাবের সংঘর্ষসূত্রে ভাস্বর।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৯ [আগস্ট ১৯৮২]। প্রকাশক : রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী। উৎসর্গ : বৌদির স্মৃতিতে, দাদাকে। প্রচ্ছদ : কল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন্। নামাঙ্কন : দেবব্রত ঘোষ। অপূর্ব বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩০৪। মূল্য : ২৮.০০ টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : চৈত্র ১৩৯৯ [এপ্রিল ১৯৯৩]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : বৌদির স্মৃতিতে, দাদাকে। প্রচ্ছদ : কল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন্। নামাঙ্কন : দেবব্রত ঘোষ। প্রচ্ছদের অঙ্কন এবং নামাঙ্কন প্রথম সংস্করণের মতো, কোনো পার্থক্য নেই। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০৭। দাম : পঁচাত্তর টাকা।

'দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে' লেখক জানিয়েছেন : 'দু-চারটি শব্দগত বদল আর কয়েকটি উক্তির পরিমার্জনা ছাড়া এ-সংস্করণে আর নতুন কিছু নেই।'

আরেকটি জ্ঞাতব্য তথ্য : লেখক এই ভূমিকাতেই জানিয়েছেন : 'বিশ্বভারতীর আতিথ্যে একদিন লেখা হয়েছিল বইটি, তাই চেয়েছিলাম যে এর থেকে লেখকের প্রাপ্য রয়্যালটির টাকাটা যেন রবীন্দ্রভবন-তহবিলেই সমর্পিত হয়। সেদিনকার উপাচার্য শ্রীঅম্লান দত্ত এ-প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। একই রকম ভাবে, রবীন্দ্রভবনের পক্ষ থেকে বর্তমান উপাচার্য* এবারকার রয়্যালটির টাকাটাও নিতে রাজি হয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।' [১৫ চৈত্র ১৩৯৯]

২৬. রাগ করো না রাগুনি :

ছোটোদের জন্য বেশ সহজ ও মজার ছড়া-সংকলন।

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৮৩। প্রকাশক : আজকাল পাবলিশার্স। উৎসর্গ : বিতানকে আর তার মাকেও। প্রচ্ছদ ও ছবি : দেবব্রত ঘোষ। খুবই হালকা মলাটের নিউজ প্রিন্টের প্রচ্ছদ ও বইয়ের কাগজ। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩০। দাম : দু টাকা।

* শ্রী সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

২৭. মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে :

কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯০ [ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪]। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স। উৎসর্গ : ভাস্কর আর বাসবীকে/১৪ ডিসেম্বরের জন্য। প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪। মূল্য : ১০°০০।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ১৯৮৭।

তৃতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৯১।

২৮. বন্ধুরা মাতি তর্জায় :

কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৯০ [মার্চ ১৯৮৪]। প্রকাশক : স্বরলিপি। উৎসর্গ : অচিন্ত্য আর ঝর্ণাকে। প্রচ্ছদশিল্পী : শ্যামল নন্দী। পেপারব্যাক, চৌকো আকার। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২। দাম : পাঁচ টাকা।

জ্ঞাতব্য তথ্য : 'জরুরী অবস্থার সময় যে-লেখাগুলি ছাপা হয়েছিল ছোটো-বড়ো নানা পত্রিকায়, তার কয়েকটি 'বাবরের প্রার্থনা'র অন্তর্গত। কিন্তু সে-বই বেরোয় ১৯৭৬ সালের আগস্টে, জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার তারও কয়েকমাস পরের ঘটনা।'

'প্রকাশিত, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো বইয়ের মধ্যে সংকলিত নয়, প্রধানত এমন কয়েকটি লেখা নিয়েই টুকরো এই বই। খানিকটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনবার জন্য 'বাবরের প্রার্থনা'র অল্প কয়েকটি লেখাও এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।' বাবরের প্রার্থনা থেকে নেওয়া : 'রাধাচূড়া', 'আপাতত শান্তিকল্যাণ', 'মহাজন', 'হাতেম-তাই,' 'শৃঙ্খলা' 'বিকল্প'।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : পৌষ ১৩৯৫ [ডিসেম্বর ১৯৮৮]। প্রকাশক : অনুষ্টুপ। উৎসর্গ : অচিন্ত্য আর ঝর্ণাকে। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। চৌকো সাইজের পেপারব্যাক। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২। দাম : আট টাকা।

২৯. কল্পনার হিস্টিরিয়া :

বেশির ভাগ প্রবন্ধই অবনীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের খেয়ালখুশির লেখালেখি সম্পর্কিত আলোচনা। শেষের দুটি প্রবন্ধের একটি শিল্পী পিকাসোর নাট্য রচনা নিয়ে এবং অপরটি সুকুমার রায়কে নিয়ে।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৯১ [আগস্ট ১৯৮৪]। প্রকাশক : প্রমা প্রকাশনী। উৎসর্গ : শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়/শ্রদ্ধাস্পদেষু। প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৩১। দাম : পনের টাকা।

৩০. জার্নাল :

বিশ্বভারতীর ভিজিটিং ফেলো হয়ে লেখক ১৯৭৮-এ এক বছরের জন্য শান্তি-নিকেতনে থেকেছেন। সেই সময় লিখেছিলেন এই 'নিভৃত' ও 'ব্যক্তিগত' জার্নাল। বইটির শেষাংশে আছে জীবনানন্দ, কাফ্‌কা এবং রিল্‌কে বিষয়ে আলোচনা।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯২ [মে ১৯৮৫]। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ : জয় গোস্বামী / স্নেহাস্পদেষু। প্রচ্ছদ : উল্লেখ নেই। খুব সুন্দর বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২৬। দাম : কুড়ি টাকা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৯৮ [মে ১৯৯১]। অন্তসব অপরিবর্তিত। দাম : চল্লিশ টাকা।

৩১. ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম :

কবি ১৯৬৭-র অক্টোবর থেকে ১৯৬৮-র জুন পর্যন্ত আমেরিকার আয়ওয়া শহরে পৃথিবীর নানাদেশ থেকে আসা এক অভিনব লেখক-সমবায়ের মধ্যে দিন কাটিয়ে-ছিলেন। বিনিময় করেছিলেন ভাবনাচিন্তার। যাঁদের সঙ্গে মিশেছিলেন আমাদের এই কবি, তাঁদের সবার কথা আছে এই ডায়েরিধর্মী লেখায়।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯২ [কলকাতা বইমেলা ১৯৮৬] প্রকাশক : প্রতিক্ষণ। উৎসর্গ : অজিত আর দুলুকে। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। অঙ্গসজ্জায় সহযোগী : ভক্তিময় লাহিড়ী। চৌকো-সাইজ অপূর্ব বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪৮। দাম : ত্রিশ টাকা।

৩২. হয়বদন :

মূল নাটক : গিরিশ কারনাড। মূল কন্নড় ভাষা থেকে ইংরেজি করেছেন নাট্যকার নিজেই। Enact পত্রিকায় প্রকাশিত সেই ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন শঙ্খ ঘোষ।

অনুবাদ বিষয়ে কবি জানিয়েছেন : 'শ্যামবাজারের বাড়িতে, ১৯৭২ সালের বর্ষায় 'নক্ষত্র'-নাট্যগোষ্ঠীর শ্যামল ঘোষ একদিন Enact পত্রিকার একটি সংখ্যা তুলে দিলেন হাতে। গিরিশ কারনাডের হয়বদন ছাপা হয়েছে সেখানে, খুবই তাড়াতাড়ি এর একটি অনুবাদ চাই শ্যামলের, চার-পাঁচদিনের মধ্যে, কেননা তাঁর দল এবার এইটেরই মহড়া শুরু করবে। প্রতিবেশী বন্ধুকে প্রতিহত করব এমন শক্তি আমার নেই ;...... —

......কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে রচনাটি পড়বার পর প্রায় নেশাচ্ছন্ন দুদিনে এর অনুবাদ যে সম্ভব হলো সেদিন বন্ধুর দাবিটাই তার একমাত্র কারণ নয়।

অনুবাদের দুবছর পর 'বহুরূপী ৪৩' [সেপ্টেম্বর ১৯৭৪] সংখ্যায় প্রথম নাটকটি ছাপা হয়।

প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ : নববর্ষ ১৩৯৩ [এপ্রিল ১৯৮৬]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। অনুবাদকের উৎসর্গ : নাট্যবান্ধব চিত্তরঞ্জন ঘোষকে। প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ। হালকা বোর্ড বাঁধাই। লম্বাটে সাইজ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০। দাম : পনের টাকা।

৩৩. বহুল দেবতা বহু স্বর :

অনুবাদ কবিতা সংকলন। অনুবাদক কবির কথায় এই বইয়ের পরিচয় : '"দি ড্রাই স্যালোয়েজেস" থেকে উঠে এল বইয়ের পরিচয়। এলিয়েটের এই কবিতাটিতে সমুদ্রের ছিল বহু স্বর : Many gods and many voices! দেশদেশান্তরের যুগযুগান্তরের কবিদের স্বরই তো আমাদের কাছে কখনো কখনো হয়ে ওঠে সেই সমুদ্র, সেই মহাসময়!'

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৩ [এপ্রিল ১৯৮৬]। প্রকাশক : নাথ পাবলিশিং। উৎসর্গ : সুব্রত রুদ্র/স্নেহাস্পদেষু। প্রচ্ছদশিল্পী : উল্লেখ নেই। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯০। দাম : দশ টাকা।

৩৪. শঙ্খ ঘোষের কবিতার হিন্দী অনুবাদ :

রাজকমল পেপারব্যাক। শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অনুবাদক : প্রয়াগ শুক্ল/কেদারনাথ সিংহ।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭। প্রকাশক : রাজকমল প্রকাশন প্রা. লি./৮, নেতাজি সুভাষ মার্গ,/নয়া দিল্লী-১১০০০২। মূল্য : ১২'০০ টাকা।

সম্পাদক : অশোক বাজপেয়ী।

৩৫. কবিতার মুহূর্ত :

নিজের সমগ্র প্রকাশিত কবিতা থেকে কবি বেছে নিয়েছেন মোট পঁচিশটি কবিতা এবং তারপর লিখেছেন এগুলির সৃষ্টির নেপথ্য ইতিহাস। বাইরের জগতের বিভিন্ন ঘটনা কবিমনে যে আলোড়ন তৈরি করে, তার থেকে সৃষ্টি হয় কবিতা। সেই পরিচয় জানাতে গিয়ে কবি এখানে নজিরহীন আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। আর ভূমিকায় বলেছেন বইটির প্রথমার্ধ 'আত্মকথা'। এই শব্দটির বিশেষণ হিসেবে 'অলজ্জ' শব্দটি লিখেছেন। পাঠকদের উদ্দেশে এই এক আশ্চর্য সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। বইটির দ্বিতীয়ার্ধে আমরা পাই একজন কবির জীবনকাল পরিধিতে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার প্রতিবাদ। সেটাও তাঁর আত্মজীবনীর অংশ। সমকালের

এইসব ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা আলোড়িত কবি কতোখানি সময়োত্তীর্ণ, তারই সৃজনধর্মী প্রমাণ ছড়িয়ে আছে এই গ্রন্থে।

এই বইটির জন্য শিরোমণি পুরস্কার পান ১৯৮৮-তে।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৩ [জানুয়ারি ১৯৮৭] প্রকাশক : অনুষ্টুপ প্রকাশনী। উৎসর্গ :

আমারই বুক থেকে ঝলক
পলাশ ছুটছিল সেদিন

লোকেরও লাগছিল ভালো
লোকের ভালো লাগছিল

লোকে কি জেনেছিল সেদিন
এখনও বাকি আছে আর কে ?

আসলে ভেবেছিল সবই
উদাস প্রকৃতির ছবি।

তবু তো দেখো আজও ঝরি
কিছু-না থেকে কিছু ছেলে

তোমারই সেন্ট্রাল জেলে,
তোমারই কার্জন পার্কে !

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৩১। দাম : পনেরো টাকা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৪ [জানুয়ারি ১৯৮৮]। প্রকাশক, উৎসর্গ ও প্রচ্ছদ : অপরিবর্তিত। দাম : কুড়ি টাকা।

তৃতীয় মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৯৮ [জুন ১৯৯১]। প্রকাশক, উৎসর্গ ও প্রচ্ছদ একই। দাম : পঁচিশ টাকা।

৩৬. ধুম লেগেছে হৃৎকমলে !

কবিতার বই। এই বইটির জন্য কবি রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েছেন।

নির্যাতিত এবং অসহায় মেয়েদের সম্মানজনক সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য এই পুরস্কারের সমস্ত অর্থ অর্পণ করা হয়েছে শ্রীশিবশংকর চক্রবর্তীকে।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৪ [এপ্রিল ১৯৮৭]। প্রকাশক : প্রমা প্রকাশনী। উৎসর্গ : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত/প্রিয়বরেষু। প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪। দাম : দশ টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ [মে ১৯৮৯]। প্রকাশক, উৎসর্গ ও প্রচ্ছদ একই নাম, তবে প্রচ্ছটি সম্পূর্ণ নতুন। দাম : বারো টাকা।

তৃতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ [জুন ১৯৯০]। অন্যসব অপরিবর্তিত। দাম : চৌদ্দ টাকা।

৩৭. সবকিছুতেই খেলনা হয় :

ছড়ার বই। 'রাগ করো না রাগুনি'-র সমস্ত ছড়া নিয়ে এবং তার সঙ্গে কিছু নতুন 'লেখা' মিলিয়ে এই বই। বইটির নাম নির্ধারণ করছেন শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৯৪ [এপ্রিল ১৯৮৭]। প্রকাশক: দে'জ পাবলিশিং। উৎসর্গ :

কুড়োনো ফল পুরোনো ফল
নতুন কেবল ঝাঁকা
পুরোনো হাত নতুনকে দেয়
ইমনকে দেয় 'ফাঁকা'।

দেশ বিদেশের শিশুসাহিত্য : ৯ / সাধারণ সম্পাদক : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : গণেশ পাইন। লম্বাটে ধরনের বোর্ড বাঁধাই। দাম : দশ টাকা।

৩৮. কবিতালেখা কবিতাপড়া :

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা [১৯৮৮] এবং অন্যান্য লেখা।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৫ [জানুয়ারি ১৯৮৯]। প্রকাশক : কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণ কমিটি। উৎসর্গ : নিশীথ ভড়/প্রীতিভাজনেষু। প্রচ্ছদ : গৌতম বসু। পেপারব্যাক। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪০। দাম : ছ'টাকা।

৩৯. ঐতিহ্যের বিস্তার :

গদ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখক আমাদের মধ্যে এক উদার ভাবনা জাগিয়ে তোলেন এবং ঐতিহ্যসূত্রে তিনি আমাদের মনের এতোটাই বিস্তার ঘটিয়ে দেন যে, আমরা সেখানে খুঁজে পাই দান্তে, কাফ্‌কা, পিকাসো, এলিয়ট এবং লুকাচ-সম্পর্কিত বিশ্ব-সাহিত্য-ঐতিহ্যের ধারা। এই বই তাই আমাদের সবার কাছে হয়ে ওঠে অপরিহার্য।

জ্ঞাতব্য তথ্য : লেখক 'বিষয়গত সমীপতার জন্য' তাঁর 'কল্পনার হিস্টিরিয়া' বইটি থেকে 'পিকাসো : তুলি থেকে কলম' প্রবন্ধটি এখানেও এনেছেন।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৫ [জানুয়ারি ১৯৮৯]। প্রকাশক : প্যাপিরাস। উৎসর্গ : স্বপন আর নমিতাকে/বিস্তারে যাবার আগে/২৭ জানুয়ারি ১৯৮৯। প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ। অপূর্ব বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬০। দাম : তিরিশ টাকা।

৪০. সুপুরিবনের সারি :

'সকালবেলার আলো' বইটির দ্বিতীয় পর্যায়। কিশোরপাঠ্য উপন্যাস।

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ [ডিসেম্বর ১৯৯০]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। উৎসর্গ : খুদে সম্পাদক শ্রীমান্ আত্মদীপকে। প্রচ্ছদপট : প্রবীর সেন। দাম : চোদ্দ টাকা।

৪১. আমন ধানের ছড়া :

ছোটোদের জন্য ছড়ার বই।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৮ [এপ্রিল ১৯৯১]। প্রকাশক : প্রজ্ঞা প্রকাশন। উৎসর্গ :

এক হাতে মা, আরেক হাতে
বাবার আঙুল ধরা
শিউলি-শাদা জামায় আমন
যেন-বা অপ্সরা
এই হাসি এই চোখের জলের
বিষ্টিরোদে গড়া
আমন তোমার হাতে দিলাম
আমনধানের ছড়া।

প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি : পূর্ণেন্দু পত্রী। চৌকো ধরনের পেপারব্যাক। দাম : ষোল টাকা।

৪২. লাইনেই ছিলাম বাবা :

কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৯ [জানুয়ারি ১৯৯৩]। প্রকাশক : অনুষ্টুপ। উৎসর্গ : জয়া মিত্র। প্রচ্ছদশিল্পী : প্রবীর সেন। চৌকো ধরনের পেপারব্যাক। দাম : বারো টাকা।

৪৩. ছন্দোময় জীবন :

গদ্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টিকে মিলিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত বিভিন্ন সময়ে লেখা অথচ সামঞ্জস্যময় এক অভিনব মননধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ।

প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৪০০ [এপ্রিল ১৯৯৩] । প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং । উৎসর্গ : স্মিতা আর শিশিরকে । প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ । বোর্ড বাঁধাই । দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা ।

৪৪. কথা নিয়ে খেলা :

ছোটোদের জন্য কবিতার অলংকার বিষয়ক এই লেখাগুলো যখন ধারাবাহিকভাবে 'আনন্দমেলা'য় প্রকাশিত, হয়, তখন লেখকের নাম ছিল 'কুন্তক', কবি শঙ্খ ঘোষের ছদ্মনাম । কিন্তু এখানে বই আকারে বেরোবার সময় ছদ্মনামটি সরিয়ে নিয়েছেন লেখক ।

প্রথম প্রকাশ : লেখাগুলো পত্রিকায় প্রকাশের 'সতেরো আঠারো বছর' পর আশ্বিন ১৪০০ [অক্টোবর ১৯৯৩] । প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী । উৎসর্গ : শ্রীমতী রত্না, আর তার তকাইকে । প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রী । বোর্ড বাঁধাই [আকারে ছোটো] । দাম : কুড়ি টাকা ।

৪৫. Emperor Babur's Prayer/and other Poems :

Sankha Ghosh । Translated with an introduction/by Kalyan Roy । First Published 1992 । Sahitya Akademi । To Susama and Bidhan Chandra Roy । Cover design : Purnandu Pattrea/ based on Rodin's the Cathedral । Hard Board Binding । Price Rs. 40 । Sahitya Akademi Revised Price Rs. 50.00 ।

৪৬. Selected Poems/Sankha Ghosh :

Translated from Bengali by Dilip Kumar Chakravorty । A Writers Workshop Pablication 1993 । Dedication : to / the memory of/Professor David McCutchion । Hard Board Binding । Hardback Limited Edition : Rs. 50.00 / Flexiback Popular Edition : Rs. 20.00 ।

১৯৯৪-এর বইমেলায় প্রকাশিত হবে :

৪৭. গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ :

কাগজের বই ।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪০০ [জানুয়ারি ১৯৯৪] প্রকাশক : প্রমা । উৎসর্গ : অকালপ্রয়াত ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের/স্মৃতিতে । প্রচ্ছদ : চারু খান ।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র নিতান্ত জরুরী 'ভূমিকা' এবং 'প্রহরজোড়া ত্রিতাল'-এর ছোট্ট তিন লাইনের একটি টুকরো ইনফরমেশান ছাড়া কবিতার বই-এ এই প্রথম 'সূচনাকথা' শিরোনামে ভূমিকা লিখলেন কবি :

'কয়েক বছর আগে, বেশ কয়েকটা মাস কেটেছিল শিমলার এক পাহাড়-চূড়োর। মেঘকুয়াশায় চরাচর ঢেকে-দেওয়া সেখানকার এক সকালবেলায় অনেক-দিন পর একেবারে একঝোঁকে লেখা হয়ে গেল কয়েকটি কবিতা। পরে মনে হলো, হয়তো ঠিক 'কয়েকটি' নয় তারা, একটিই মাত্র লেখা, কেবল স্তরে স্তরে খোলা।

তারপর মাঝে মাঝে থমকে থমকে, সেই স্রোতটাকে আবার ছোঁয়া গেছে কখনো কখনো, তৈরি হয়ে উঠেছে আরো কয়েক টুকরো, বিচ্ছিন্ন অথচ গ্রথিত। বহুদিনের সেই সঞ্চিত টুকরোগুলির এই গুচ্ছ।

১০ জানুয়ারি ১৮৯৩ শঙ্খ ঘোষ

৪৮. শঙ্খ ঘোষের নির্বাচিত প্রেমের কবিতা :

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৯৪। প্রকাশক : বিকাশ গ্রন্থ ভবন। উৎসর্গ :

মাটিতে বসানো জালা, ঠাণ্ডা বুক ভরে আছে জলে
এখনো বুঝিনি ভালো কাকে ঠিক ভালোবাসা বলে।

যে কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে : দিনগুলি রাতগুলি [ইভাকে] / আকাঙ্ক্ষার ঝড় / হিমানী / বাউল / এই প্রকৃতি / ঘন মায়া / ধানে গানে বসুধায় / সকাল দুপুর সন্ধ্যা / ভাষা / কলহপর / আড়াল / সত্তা / মিলন / পরাভব / জল / মধ্যরাত / খাল / যেন কোনোদিন / আমাদের ভালোবাসা / হাজার দুয়ারি / প্রতিহিংসা / শুশুনিয়া / মিথ্যে / ভূমধ্যসাগর / আনন্দ / ব্যভিচার / প্রপাত / যৌবন / ত্যাগ / প্রেমিক / সন্ততি / গঙ্গা যমুনা / অন্ধকার / আয়ু / শূন্যের ভিতরে ঢেউ / যোরগ-ঝুঁটি / খড় / মিলন / এই রকমই / ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড / শুশ্রূষা / মিলের জন্য ব্যক্তিগত / দুই মুহূর্ত / মনকে বলো 'না' / পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ [৬, ১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ সংখ্যক কবিতাগুলি] / বৈরাগীতলা / প্রান্তিক / আড়াআড়ি / তুমি বলো ভয় / গান / জয় / ছন্দ / যদি / খুলে যাচ্ছে তোরণ / অশথগুঁড়ির জট / মাটিতে বসনো জালা / জন্মদিন / মেঘের মতো মানুষ / ঝড় / ভোর / মুখ / মর্মর / যন্ত্রের এপার থেকে / ভালোবাসা অর্থেক স্থপতি / তাই এত শুকনো হয়ে আছো / সৈকত / *ভালোবাসি / *অস্নাত / *প্রেমের জন্য দুই / *রাত্রিকথা / *লোকটার হয়ে গেছে।

এর মধ্যে তারকাচিহ্নিত শেষ পাঁচটি কবিতা অগ্রন্থিত ছিল।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় আছে :

কোনটা যে প্রেমের আর কোনটা নয়, তার ঠিক হদিশ করতে পারি না।

আমি। 'দিনগুলি রাতগুলি'র পর এতরকমের মিশ্র অনুভব কাজ করেছে কবিতাগুলির পিছনে যে ও-রকম কোনো চিহ্নে এদের বাঁধা বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোনো বন্ধু যখন বলেন যে প্রেমের কবিতা আমি লিখিইনি কখনো, সে-প্রস্তাবে আমার একটা সায়ই থাকে। অথচ প্রেম ছাড়াই-বা লিখেছি আর কটা?

এতসব বলে অবশ্য বন্ধুপুত্র শ্রীমান দীপংকরের উদ্যমকে প্রতিহত করা গেল না। ছাপতেই হলো বই। তবে নির্বাচনের কোনো ঝুঁকি আমি নিজে নিই নি, স্বেচ্ছায় সে-দায়িত্ব বহন করেছেন আমার ঘনিষ্ঠ এক পাঠিকা। কবিতার বই-গুলির বাইরে পড়ে থাকা কয়েকটি পুরোনো লেখাও নানা পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছেন তিনি। 'সৈকত'-এর পর এ-বইয়ের শেষ পাঁচটি কবিতায় রইল তার উদাহরণ।

৪৯. শঙ্খ ঘোষের একটি মিনি কবিতার বই-ও বেরোবে এই মেলায় :

কবিতা নির্বাচন কবিরই নিজস্ব।

সম্পাদক : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : আজকাল।

৫০. সেরা ছড়া / শঙ্খ ঘোষ :

প্রকাশ করছেন একটি নতুন প্রকাশন সংস্থা।

এ তে থা ক বে :

(১) এলাটিন বেলাটিন তেলাটিন চোর / (২) ওজন আমার একটু কম / (৩) আমন আমন আমনটি / (৪) এমনতর মজার কথা / (৫) এমন কেন কাঁদো রে / (৬) না-খাওয়ালে পার পাব যে / (৭) তখন থেকে এক বাটি দুধ / (৮) আমন বড়ো জেদী / (৯) ওই রে আমন হৈ রে আমন / (১০) আমন যখন জ্বরে পড়ে / (১১) লাল-টুকটুক নীল-চুকচুক / (১২) আমন যাবে লাট্টু পাহাড় / (১৩) বল্ দেখি কে পাগল / (১৪) উলুকঝুলুক গুলুক পাতায় / (১৫) নাম ছিল না ধাম ছিল না / (১৬) কেউ বে কানা, কেউ খোঁড়া / (১৭) রাগ করো না রাগুনি / (১৮) খেতে বসেন হতুমথুমো / (১৯) বরবেশে এসে / (২০) সুয্যি না কি সত্যি নিজের ইচ্ছেয় / (২১) দুঃখ সুখের ঝোঁকে / (২২) লোকে আমায় ভালোই বলে, দিব্যি চলনসই / (২৩) কী জপ্তে আর এ উঁকিঝুঁকি / (২৪) অনেক দিনের অনেক রাতের।

বিদ্যাসাগর। কিশোর পাঠ্য এই জীবনী গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে এবারে বই-মেলায়। প্রকাশক : প্যাপিরাস।

সম্পাদিত বই :

১. সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত।

বাংলাভাষায় বিশ্বকবিতা সংকলন।

সম্পাদনা : শঙ্খ ঘোষ / আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৯ [জানুয়ারি ১৯৬৩]। প্রকাশক : নতুন সাহিত্য ভবন। উৎসর্গ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮+৪৮৪। দাম : বারো টাকা।

কবি সংখ্যা : ফরাসি ২৬ / জার্মান ২৭ / ইতালীয় ৯ / স্পেনীয় ১৩ / ইংরেজি ৩৪ / মার্কিন ২৪ / রুশ ১২ / চীন ৪ / জাপানি ১৩ / প্রকীর্ণ লেখমালা ১৮ / মোট কবিতা সংখ্যা : ৪০৬।

বইটি নতুন করে আবার ছাপছেন 'প্রমা'।

২. ভারতকোষ। প্রথম খণ্ড [কোষগ্রন্থ]।

অওঘড়-উষানাথ সেন।

সম্পাদকমণ্ডলী : শ্রীসুশীলকুমার দে—সভাপতি / শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় / শ্রীনির্মলকুমার বসু / শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় / শশিভূষণ দাশগুপ্ত / শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার / শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী / শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য / সজনীকান্ত দাস।

সহ-সম্পাদকবৃন্দ :

শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য / শ্রীশঙ্খ ঘোষ / শ্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায় / শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী

প্রকাশক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ / কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭১ ॥ ১৮৮৬ শকাব্দ। বড়ো সাইজের (ডিমাই) বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : কুড়ি টাকা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতি-বিধানকল্পে প্রদত্ত সরকারী অর্থানুকূল্য লাভের ফলে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করা হইয়াছে।

৩. সতীনাথ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)।

সম্পাদক : শঙ্খ ঘোষ / নির্মাল্য আচার্য।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭৯ [জানুয়ারি ১৯৭৩]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ। প্রচ্ছদলিপি : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৭। মূল্য : পনেরো টাকা।

ভূমিকা : 'সতীনাথ ভাদুড়ী : প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা' এবং শেষাংশের 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৮২ [সেপ্টেম্বর ১৯৭৫] দাম : ছত্রিশ টাকা।

তৃতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫ [মে ১৯৮৯]। দাম : সত্তর টাকা।

৪. সতীনাথ গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)।

সম্পাদক : শঙ্খ ঘোষ / নির্মাল্য আচার্য।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮০ [জুলাই ১৯৭৩]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ। প্রচ্ছদলিপি : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ক—দ+৫১৫। মূল্য : আঠারো টাকা।

ভূমিকা : 'সতীনাথ ভাদুড়ী : নিঃসঙ্গ দীক্ষা' এবং 'গ্রন্থ প্রসঙ্গ' খুব গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৮৪ [অক্টোবর ১৯৭০]। অন্য সবকিছু অপরিবর্তিত। মূল্য : ত্রিশ টাকা।

তৃতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৯৯ [এপ্রিল ১৯৯২]······একশ' টাকা।

৫. সতীনাথ গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড)।

সম্পাদক : শঙ্খ ঘোষ /নির্মাল্য আচার্য।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮০ [জানুয়ারি ১৯৭৪]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ। প্রচ্ছদলিপি : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ক—ঠ+৫১২। মূল্য : কুড়ি টাকা।

ভূমিকা : সতীনাথ ভাদুড়ী : অসম্পন্ন সাধনা' এবং 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

৬. সতীনাথ গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খণ্ড)।

সম্পাদনা : শঙ্খ ঘোষ / নির্মাল্য আচার্য।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮২ [আগস্ট ১৯৭৫] প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ। প্রচ্ছদলিপি : পূর্ণেন্দু পত্রী। বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ক—চ+৬০৫। মূল্য : তিরিশ টাকা।

ভূমিকা : 'সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবনযাপন' এবং গ্রন্থ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৭. কবি অরুণ মিত্র

সম্পাদনা : শঙ্খ ঘোষ / অরুণ সেন।

প্রকাশক : কবি অরুণ মিত্র সংবর্ধনা সমিতি। পরিবেশক : অনুষ্টুপ প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৬। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। পেপারব্যাক। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪৩। মূল্য : কুড়ি টাকা।

এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখেছেন, শঙ্খ ঘোষ এবং 'অরুণ মিত্র : রচনা ও জীবন' —অরুণ সেন।

৮. সূর্যাবর্ত

রবীন্দ্রকবিতা-সংকলন। সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রী শঙ্খ ঘোষ।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৬ [৮ মে ১৯৮৯]। প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ / কলকাতা। সুন্দর বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৭৮। মূল্য : ৭৫.০০ টাকা।

'ভূমিকা' ও 'পাঠপ্রসঙ্গ' শঙ্খ ঘোষ :

'ভূমিকা' থেকে অংশবিশেষ : 'ছোটো বড়ো নানা মাপের প্রায় পাঁচশোটি কবিতা পাওয়া যাবে সঞ্চয়িতায়, আর এ-সংকলনে আছে দু'শো বাহাত্তরটি, যার মধ্যে একশো তিরিশটি রচনা সঞ্চয়িতার অন্তর্গত। অর্থাৎ সঞ্চয়িতায় আছে এ-বইতে নেই, এমন কবিতার সংখ্যা সাড়ে-তিনশোর কিছু বেশি ; আর, সঞ্চয়িতায় নেই কিন্তু এ-বইতে আছে, এমন লেখা পাওয়া যাবে একশো বিয়াল্লিশটি।'

পঙ্ক্তি : দীর্ঘবাদন রেকর্ড ও ক্যাসেট
বিন্যাস পরিচিতি সম্পাদনা সংকলন ভাষ্যরচনা
অংশগ্রহণ সাজিয়ে দেওয়া : শঙ্খ ঘোষ

১. নিজের কবিতাপাঠ।

বাংলা কবিতা দ্বিতীয় খণ্ড দীর্ঘবাদন রেকর্ড ১৯৭২

কবিতাগুলি পড়েছেন :
প্রতিশ্রুতি সুন্দর ভীড়

HMV ECLP.2517

২. রেকর্ড পরিচিতি লিখেছেন : শঙ্খ ঘোষ ১৯৭৭

আধুনিক কবিতা আবৃত্তি শম্ভু মিত্র দীর্ঘবাদন রেকর্ড

যেসব কবির যেসব কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে :

মধুবংশীর গলি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
হারিয়ে নিরর্থক জং মুখ প্রেমেন্দ্র মিত্র
বোধ শিকার সিন্ধুসারস জীবনানন্দ দাশ

INRECO 2425-0002

৩. রবীন্দ্রকবিতা গান রেকর্ড পরিচিতি বিন্যাস আবৃত্তি শঙ্খ ঘোষ

'একটি রক্তিম মরীচিকা' 'সানাই' থেকে সংকলন দীর্ঘবাদন রেকর্ড ১৯৮৩
প্রযোজনা : বিমান ঘোষ সংগীত-পরিচালনা : সুভাষ চৌধুরী

HMV ECSD 41525

৪. রেকর্ড পরিচিতি লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ

কী ধ্বনি বাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত গীতা ঘটক দীর্ঘবাদন রেকর্ড ১৯৮৩

পরিচালনা সন্তোষ সেনগুপ্ত

MUSIC INDIA 2393 931

৫. রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাষ্যরচনা ১৯৮৬

'গানের স্বরের ধারা' তৃতীয় খণ্ড [১৯১৫-১৯২৭] দীর্ঘবাদন রেকর্ড
দুটি রেকর্ডে মেশানো পুরোনো ও নতুন দিনের গায়কদের রবীন্দ্রসঙ্গীত

শঙ্খ ঘোষ রচিত ভাষ্য 'অন্তবিহীন আলিঙ্গনে'

HMV PMLP 1581-82

৬. বিন্যাস ভাষ্যরচনা ও পাঠ শঙ্খ ঘোষ ১৯৮৬

'বাসায় ফেরা ডানার শব্দ' ইওরোপে ১৯২৬-এ রচিত রবীন্দ্রনাথের গান

পরিচালনা : সুভাষ চৌধুরী প্রযোজনা : বিমন ঘোষ

HMV PSLP.1571

৭. রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা নাটক উপন্যাস গদ্যের নির্বাচিত সংকলন ও বিন্যাস
শঙ্খ ঘোষ ১৯৮৯ দীর্ঘবাদন রেকর্ড

'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : হে মহাজীবন'
গান কবিতা নাটক উপন্যাস গদ্যের নির্বাচিত সংকলনের সূত্রে সমগ্র রবীন্দ্র-
জীবনবোধের একটি কালানুক্রমিক আভাস

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে আবৃত্তি ও গানে সমৃদ্ধ

রবীন্দ্ররচনার মধ্যে যে লেখক-জীবন আছে, সেই ষাট বছরের সৃষ্টিজীবন ছ'টি
দশকে বিন্যাস করে দেখানো হয়েছে মোট ছ'টি দীর্ঘবাদন রেকর্ডে

এক. সংসার 'আমারে কে নিবি ভাই' ১৮৮১-১৮৯০

দুই. ভালোবাসা 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' ১৮৯১-১৯০০

তিন. স্বদেশ ও সংকল্প 'সে ঝড় যেন সই আনন্দে' ১৯০১-১৯১০

চার. বিশ্ব 'আপন হতে বাহির হয়ে' ১৯১১-১৯২০

পাঁচ. মুক্তি 'হবে হবে জয়' ১৯২১-১৯৩০

ছয়. মানুষ 'এল মহাজন্মের লগ্ন' ১৯৩১-১৯৪১

HMV PSLP 1680 1681 1682 1683 1684 1685

৮. রেকর্ড পরিচিতি শঙ্খ ঘোষ ১৪০০ সাল

'আজি হতে শতবর্ষ পরে' বাংলা চতুর্দশ শতকের পরিশীলিত নাগরিক গীতি-শৈলীর নির্বাচিত সংগ্রহ দীর্ঘবাদন রেকর্ড তিনটি রেকর্ডের অ্যালবাম

আনন্দধারা নিবেদিত ঢাকা বাংলাদেশ

আনন্দধারা শ ব ২-০১০০

৯ পাঠ আবৃত্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত

'সঙ্গীহারা অসীম শূন্য' ক্যাসেট ১৯৯৩

দিলীপ ঘোষ অরুণিমা চৌধুরী উমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সংকলন : শঙ্খ ঘোষ পরিচালনা : সুভাষ চৌধুরী

RPG HMV Cassette

পরি

বিদেশী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত রচনা

PROSE

1. BENGALI—PHASE II
   CHITTAPRIYA GHOSH [SANKHA GHOSH]
   An Original English Essay on
   MODERN INDIAN DRAMA
   [Written on Oct-Nov. 1979]

   THE BOOK : *Comparative Indian Literature*
   [Kerala Sahitya Akademi] Page 489-99

2. THREE CHANDAL MAIDENS / Sankha Ghosh
   Translated by Subha Dasgupta

   THE BOOK : *Kumaran Asan* The man and the poet edited by K. Ayyappa Paniker, Published by : Kumaran Asan Memorial Committee Thonnackol, Trivandram, Kerala / April 1988, Page 98-110

   বাংলা প্রবন্ধ : 'তিন চণ্ডালী'—শঙ্খ ঘোষ
   প্রকাশক : 'প্রমা' [রজত জয়ন্তী সংখ্যা] ১৯৮৫

3. 'TOWARDS A NEW BEGINNING' The literary world of Modern Calcutta, 1941-1980 An Essay by Sankha Ghosh Translated by Sukanta Chaudhuri

   THE BOOK : *Calcutta The Living City* Page 232-44 Edited by Sukanta Chowdhury, Vol II : The Present & Future / Published in : Calcutta / Oxford University Press Delhi, Bombay, Madras 1990

   মূল বাংলা রচনাটি এই 'অনুষ্টুপ / শঙ্খ ঘোষ' সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

4. Speech by Sri Sankha Ghosh/Award Winner in BENGALI

BOOK : *Sahitya Akademi Awards* 1977 Speech by the Award Winning Authors

POETRY

1. ANCESTRAL HOME / Sankha Ghosh

BOOK : *Bengal Poems on Calcutta* Selected and translated by Subharanjan Dasgupta & Sudeshna Chakravorty, A Writers Workshop Publication 1972 / Published by P. Lal from 162/92, Lake Gardens Calcutta-700045

বাংলা কবিতা : 'বাস্তু' [আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না]
কাব্যগ্রন্থ : 'নিহিত পাতালছায়া' / রচনাকাল ১৯৬০-৬৬ / প্রকাশ. ১৯৬৭ / পৃ. ১৫ / প্রকাশক : বিস্তা।

2. RED ROAD / Sankha Ghosh

BOOK : Bengal Poems on Calcutta

3. JOY / Sankha Ghosh

বাংলা কবিতা : 'রেড রোড' [খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছি ময়দানের গভীর তলদেশে]

কাব্যগ্রন্থ : 'আদিম লতাগুল্মময়'। / রচনাকাল ১৯৭০-৭১ / প্রকাশ. ১৯৭২/ পৃ. ৬৪ / প্রকাশক. সিগনেট [অরুণা]

3. JOY / Sankha Ghosh
4. OFFERING Do
5. TOADS Do
6. RENUNCIATION Do
7. FALLING RAIN Do

Translated by Marian Maddern

BOOK : *I have seen Bengal's face*, A selection of Modern Bengali Poetry in English Translation, Page 163-67, Edited by : Sibnarayan Ray & Marian Maddern, Publish : Calcutta / Editions Indian / 1974

বাংলা কবিতা : 3) 'আনন্দ' [তবে তো আমারই ভালো আনন্দই আছে ত্রিসংসারে] প. ১২ / 4) 'অঞ্জলি' [ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়] / পৃ. ৬৩ / 5) 'ব্যাঙ' [এ বাড়িতে / যা যা থাকা উচিত, সবই আছে] / পৃ. ৪০ / 6) 'ত্যাগ' [আমি খুব ভুল করে এ-রকম বৃষ্টিময় দিনে] / পৃ. ৫৮ / 7) 'বৃষ্টিধারা' [আমার মেয়েকে নিয়ে বুকজলে] / পৃ. ৫২ /
কাব্যগ্রন্থ : 'আদিম লতাগুল্মময়'
(রচনাকাল : ১৯৭৯-৭১ / প্র. ১৯৭২) / প্রকাশক : সিগনেট [অরুণা]।

8. OFFERING / Sankha Ghosh, Translated by Marian Madden

JOURNAL : *Hemisphere*, An Asian-Australian Monthly April 1974, Editor : Kenneth Russell Henderson Vol. 18 Number 4 / April, 1974.

বাংলা কবিতা : 'অঞ্জলি' [ঘর যায় পথ যায় প্রিয় পরিচিত যায়] / পৃ. ৬৩ / কাব্যগ্রন্থ : 'আদিম লতাগুল্মময়') রচনাকাল : ১৯৭০-৭১ / প্র. ১৯৭২) / প্রকাশক : সিগনেট [অরুণা]।

9. AGASTYA'S JOURNEY / Sankha Ghosh

BOOK : *Voices of Emergency*, An all India Anthology of Protest Poetry of the 1975-77 Emergency. Edited by : John Oliver Perry, Foreward by : David Selbourne, Page 8 Popular Prakashan / Bombay

বাংলা কবিতা : 'অগস্ত্যযাত্রা' [বিন্ধ্য বলেন 'অগস্ত্য···] / কাব্যগ্রন্থ : 'বন্ধুরা মাতি তরজায়' (রচনাকাল : ১৯৭৬-৮০ / প্র. ১৯৮৪) / পৃ. ৯ / প্রকাশক : স্বরলিপি। ২ সং / অনুষ্টুপ

10. THE END / Sankha Ghosh, Translated by Prithvindra Chakravarty with Beler Page 109.

11. THE ONE WITHOUT A COUNTRY / Sankha Ghosh Translated by Asok Mukhopadhyay, Page 109-10

BOOK : *Contemporary Bengali Literature* Poetry. Preface : Amalendu Bose, Edited by : Sukumar Ghosh Academic Publishers, Calcutta-9 / India

বাংলা কবিতা : 10) 'অন্তিম' [আমায় বেছে বেছে বরণ করেছিল] / কাব্যগ্রন্থে : 'নিহিত পাতালছায়া' (রচনাকাল : ১৯৬০-৬৬ / প্র. ১৯৬৭) / পৃ. ৫ / প্রকাশক : বিন্ধা, 11) 'দেশহীন' [আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই জয়] / কাব্যগ্রন্থ : 'আদিম লতাগুল্মময়' (রচনাকাল : ১৯৭০-৭১ / প্র. ১৯৭২) / পৃ. ৪৪ /

প্রকাশক : সিগনেট [অরুণা] ।

12. THE PROMISE / Sankha Ghosh

13. APARTMENT / Do

14. MY AUNT / Do
Translated by Sandip Sarkar

BOOK : *Anarchy and The Blue*, A contemporary collection of Drawings and Verses

'নীলিমা ও নৈরাজ্য'

সমকালীন বাংলা কবিতা ও রেখাচিত্রের সংকলন
Published : January 1976, Biswabani Prakasani, Calcutta-700009

বাংলা কবিতা : 12) 'প্রতিশ্রুতি' [এখন আমি অনেকদিন তোমার মুখে তাকাবো না] পৃ. ৯, 13) 'বাড়ি' [আমি একটি বাড়ি খুঁজছি বহুদিন], পৃ. ৩০, 14) 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগ' [ঘর, বাড়ি, আঙিনা], পৃ. ৪০ ।
কাব্যগ্রন্থ : 'নিহিত পাতালছায়া' (রচনাকাল ১৯৬০-৬৬, প্র. ১৯৬৭), প্রকাশক : বিন্ধা ।

15. THE OLD WOMEN / Sankha Ghosh
16. TIME / Do
17. OFFERING / Do
18. COMPANION / Do

Translated by Jermy Nelson of Australia 1983

বাংলা কবিতা : 15) 'বুড়িরা জটলা করে' [বুড়িরা জটলা করে/ আগুনের পাড়ায় পাড়ায়], পৃ. ৭, 16) 'সময়' [তোমরা এসেছো তাই তোমাদের বলি], পৃ. ৪৭,
কাব্যগ্রন্থ : 'নিহিত পাতালছায়া' (রচনাকাল : ১৯৬০-৬৬, প্র. ১৯৬৭)
প্রকাশক : বিশ্বা। 17) 'অঞ্জলি' [ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়],
কাব্যগ্রন্থ : 'আদিম লতাগুল্মময়' (রচনাকাল : ১৯৭০-৭১, প্রকাশ. ১৯৭২) ৬৩, সিগনেট [অরুণা], 18) 'সঙ্গিনী' [হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়] কাব্যগ্রন্থ : 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' (রচনাকাল : ১৯৭২-৭৩, প্র. ১৯৭৪), পৃ. ৬৭, প্রকাশক : আনন্দ।

19. REVENGE / Sankha Ghosh, Translated by Khondaker Ashraf Hossain

BOOK : 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের কবিতা' / বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার কবিতার পাণ্ডুলিপি সংকলন, 'BENGALI LOVE POEMS' A Collection of Manuscipts & translations, edited by FARID KABIR, Page. 83,
প্রকাশ : January 1986
প্রকাশক : Farid Kabir, Ghulam Hilali. Signorina, 11, Rankin Street, Wari, Dacca-3, Bangladesh,
বাংলা কবিতা : 19) 'প্রতিহিংসা' [যুবতী কিছু জানে না,],
কাব্যগ্রন্থ : 'নিহিত পাতালছায়া' (রচনাকাল ১৯৬০-৬৬ / প্র. ১৯৬৭), পৃ. ৫১,
প্রকাশক : বিশ্বা।

20. OLD WOMEN GATHER TOGETHER / Sankha Ghosh
Translated by Nabanita Deb Sen. 7.4.86
সম্ভবত কোনো বিদেশের লেখায় ব্যবহারের জন্য।

বাংলা কবিতা : 'বুড়িরা জটলা করে' [বুড়িরা জটলা করে, আগুনের পাড়ায় পাড়ায়]
কাব্যগ্রন্থ : 'নিহিত পাতালছায়া' (রচনাকাল : ১৯৬০-৬৬, প্র. ১৯৬৭), পৃ. ৭, প্রকাশক : বিশ্বা।

21. A POEM / Sankha Ghosh, Translated by an unknown person [No song in my body. The woodcutters come]
JOURNAL : *Kavibharati*, Triennial of Indian Poetry 28, 29, 30 March, 1987, Vagarth, Bharat Bhavan, Bhopal

বাংলা কবিতা : 'আমার শরীরে কোনো গান নেই। কাঠুরেরা আসে', ৪২ সংখ্যক কবিতা, কাব্যগ্রন্থ : 'পাজরে দাঁড়ের শব্দ' (রচনাকাল ১৯৭৬-৮০, প্র. ১৯৮০), প্রকাশক : দে'জ।

22. APARTMENT / Sankha Ghosh
23. MY AUNT / Sankha Ghosh, Translated by Sandip Sarkar
BOOK : *Vagarth*, Poets from Six continents, Edited by : Ashoke Vajpeyi, Vagarth World Poetry Festival / A Centenary Tribute to Jawaharlal Nehru in Bharat Bhavan, Bhopal 11-17 January 1989

বাংলা কবিতা : 22) 'বাড়ি' [আমি একটি বাড়ি খুঁজছি বহুদিন] পৃ. ৩০ / 23) রাঙামামিমার গৃহত্যাগ [ঘর, বাড়ি, আঙিনা], পৃ. ৮০ / কাব্যগ্রন্থ : 'নিহিত পাতালছায়া' [রচনাকাল : ১৯৬০-৬৬, প্র. ১৯৬৭], প্রকাশক : বিশ্বা।

24. HOLIDAY / Sankha Ghosh
•25. RESTORATION / Do
26. MY AUNT RANGA / Do
27. MUNYA / Do
BOOK : *Poetry from Bengal*, Translated by Ron D. K. Banerjee, Forest Books / Unesco, London 1989 Boston.

বাংলা কবিতা : 24) 'ছুটি' [হয়তো এসেছিল। কিন্তু আমি দেখি নি'], পৃ. 88 / • 25) পুনর্বাসন [যা কিছু আমার চারপাশে ছিল], পৃ. ২৬-২৭, কাব্যগ্রন্থ : 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' (রচনাকাল ১৯৬৭-৬৯, 26) 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগ' [ঘর, বাড়ি, আঙিনা],

পৃ. 80, 27) 'মুনিয়া' [মুনিয়া সমস্ত দিন বাঁধা ছিল], পৃ. ৩৬, কাব্যগ্রন্থে : 'নিহিত পাতালছায়া' (রচনাকাল ১৯৬০-৬৬, প্র. ১৯৬৭), প্র. ১৯৭৮), প্রকাশক : দেজে।

জার্মান ভাষায় অনুবাদ অনুবাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যে বইয়ে আরো অনেকের বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিতার জর্মন অনুবাদ আছে

Gelobt sei der Pfau
Indische Lyrik der Gegenwart
Herausgegeben
Von Alokeranjon Dasgupta
Schneekluth. Müchner Edition, 1986
পৃষ্ঠ সংখ্যা 29

ফরাসী ভাষায় অনুবাদ অনুবাদক পৃথ্বীন্দ্র মুখার্জি যে বইয়ে আরো অনেক বাংলা কবিতার ফরাসী অনুবাদ আছে :

Anthologie de
Ia Poésie bengalie
Par Prithwindra Mukherjee

© Noël BLANDIN, Paris, 1991

পৃষ্ঠ সংখ্যা 248-250

চেক্ ভাষায় অনুবাদ করেছেন BLANKA KNOTROVA 1993,

অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ :

ইংরেজি অনুবাদকবিতার বই : গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য
হিন্দীতে অনুবাদ বইয়ের কথা আছে 'গ্রন্থপঞ্জি'তে

তা ছাড়া আরো অনেক হিন্দী অনুবাদ বিভিন্ন পত্রিকা থেকে পঙ্ক্তিভুক্ত ' করার কাজ চলছে 'শঙ্খ ঘোষ রচনাপঞ্জি' শিরোনামের একটি প্রয়াসে।

মারাঠি ভাষায় অনুবাদ Veena Alase 1988
যে দীর্ঘ কবিতাটি ভাষান্তরিত হয়েছে : 'যমুনাবতী'

হিন্দীতে শঙ্খ ঘোষের গদ্য অনুবাদ অনুবাদক : অক্ষয় উপাধ্যায়
প্রবন্ধের নাম নাট্য-মুক্তি আউর রবীন্দ্রনাথ
পত্রিকা নাম পূর্বগ্রহ [কবিয়ো কা গদ্য] সম্পাদক অশোক বাজপেয়ী 1988-89

এ ছাড়া 'মলয়ালম' 'অসমীয়া' ও 'পঞ্জাবী' ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে।